মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

# যার ধর্ম

বাংলা ভাষায় প্রথম ধর্ম অভিধান

বাংলা ভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ধর্ম অভিধান *যার যা ধর্ম*। পৃথিবীর প্রধান ও অপ্রধান সব ধর্ম ও ধর্মসংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্য সংকলিত হয়েছে এ বইয়ে। একটিমাত্র বইয়ের সাহায্যে নিজ ধর্মের পাশাপাশি অন্য ধর্ম সম্পর্কে জানতে বাংলাভাষী পাঠকের জন্য এ বইয়ের বিকল্প নেই।

ISBN 978 984 8765 80 7

Taka 800.00

বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা ও মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য পরস্পরের ধর্ম সম্পর্কে জানার কোনো বিকল্প নেই। বাংলা ভাষার প্রথম এই ধর্ম অভিধানে পৃথিবীর প্রধান ও অপ্রধান বিভিন্ন ধর্মের মূলকথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, আচার-প্রথা, ধর্মীয় পুরুষদের জীবনী, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও তীর্থস্থান, মোট কথা ধর্মসংশ্লিষ্ট প্রায় সব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মূল উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান এই প্রয়োজনীয় ও শ্রমসাধ্য কাজটি করেছেন। ইতিপূর্বে *যথাশব্দ, কোরানসূত্র* ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি অভিধানকার হিসেবে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সব শ্রেণীর পাঠকের জন্য অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা এবং প্রায় দুই হাজার ভুক্তিসমৃদ্ধ এই কোষগ্রন্থ আশা করি প্রত্যেক বাঙালি পাঠকের কাছে একটি অবশ্যপাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

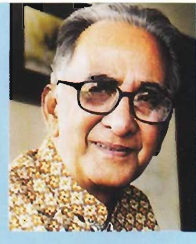

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

জন্ম ৩ ডিসেম্বর ১৯২৮, ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের দয়ারামপুর গ্রামে। ইতিহাসে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর। আইন বিষয়ে স্নাতক। ১৯৫৮ সালে আধুনিক ইতিহাস বিষয়ে স্নাতক সম্মান (অক্সফোর্ড) এবং ১৯৫৯ সালে ব্যারিস্টার হন। অধ্যাপনা করেছেন রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬৪ সালে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হন। বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯৬ সালে। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৮৫টির বেশি। উল্লেখযোগ্য বই : *যথাশব্দ; কোরানসূত্র; বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১১; ভাষার আপন পর; গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ; রবীন্দ্রবাক্যে আর্ট, সঙ্গীত ও সাহিত্য; তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়ভার; টোয়েন্টি-ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি স্পিক্‌স ফর অল ল্যাঙ্গুয়েজেস* ইত্যাদি। পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদক। ১১ জানুয়ারি ২০১৪ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

প্রচ্ছদ : **কাইয়ুম চৌধুরী**

# যার যা ধর্ম

## বাংলা ভাষায় প্রথম ধর্ম অভিধান

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

# যার যা ধর্ম

বাংলা ভাষায় প্রথম ধর্ম অভিধান

প্রথমা প্রকাশন

যার যা ধর্ম : বাংলা ভাষায় প্রথম ধর্ম অভিধান

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত প্রথম প্রথমা সংস্করণ : অমর একুশে বইমেলা ২০১৪
মাঘ ১৪২০, ফেব্রুয়ারি ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৯
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৮০০ টাকা

Jar Ja Dharma
by Muhammad Habibur Rahman
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 8180081
e-mail : prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 800 only

ISBN 978 984 8765 80 7

# উ ৎ স র্গ

**স্নেহাস্পদ**

আবরার আজিজ রহমান

জাহানারা রহমান

ও

লুৎফর রহমান

## প্রথমা সংস্করণের ভূমিকা

মুদ্রণপ্রমাদ ও ভুলত্রুটি সংশোধন ছাড়াও এই সংস্করণের সুযোগে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির ব্যাপক পরিমার্জন ও পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন কিছু ভুক্তি যেমন যোগ করা হয়েছে, তেমনি বেশ কিছু ভুক্তির পরিবর্জন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। এই কাজে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক-প্রাবন্ধিক মোরশেদ শফিউল হাসান এবং শিশুসাহিত্যিক আখতার হুসেন। এই সংস্করণে *প্রথম আলোর* সহকারী সম্পাদক অরুণ বসু এবং কলকাতার *আনন্দবাজার পত্রিকার* বিশেষ প্রতিবেদক মিলন দত্ত আমাকে কিছু ব্যাপারে সাহায্য করেছেন।

প্রথমার প্রধান সমন্বয়কারী জাফর আহমদ রাশেদ প্রকাশনার ব্যাপারে তদারক করেছেন। এঁদের সবাইকে আমার অশেষ ধন্যবাদ।

ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১৩

**মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান**
গুলশান, ঢাকা

# সূচিপত্র

## ই

খ



গ



ঘ



চ

## থ



## দ



## ধ



## ন



## প

## ফ



## ব

**ভ**



**ম**

## স

**হ**

## ভুক্তিক্রম

এই অভিধানের ভুক্তিগুলো সাজানো হয়েছে নিম্নরূপ বর্ণানুক্রমে। এ ক্ষেত্রে আমরা *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*-এর সাহায্য নিয়েছি। অনুসৃত বর্ণানুক্রমটি নিচে তুলে ধরা হলো :

অ আ ই ঈ
উ ঊ ঋ
এ ঐ ও ঔ
ং ঃ
ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ড় ঢ ঢ় ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য (য়) র ল
শ ষ স হ

**অংশুমান** সূর্যবংশীয় রাজা সগরের পৌত্র। সগর-রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ইন্দ্র অপহরণ করে মহর্ষি কপিলের আশ্রয়ে রাখেন। এতে সগর ও তাঁর ষাট হাজার পুত্র কপিলকে দোষারোপ করলে মহর্ষির যোগানলে তাঁরা ভস্মীভূত হন। তখন সগরপৌত্র অংশুমানকে কপিলের কাছে পাঠান। অংশুমান পাতালে গিয়ে মুনিকে স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট করে অশ্ব ফিরিয়ে আনেন এবং যজ্ঞ সমাপন করেন। কপিলের কাছে অংশুমান জানতে পারেন যে গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে এনে সেই জলে সগরপুত্রদের ভস্ম স্পর্শ করাতে পারলে তাঁরা উদ্ধার পাবেন। সগরের মৃত্যুর পর অংশুমান রাজা হন। গঙ্গাকে আনার জন্য তিনি তপস্যা শুরু করেন, কিন্তু সাফল্যের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

**অক্ষৌহিণী** হিন্দু পুরাণমতে, যে সৈন্যবাহিনীতে ২ লাখ ১৮ হাজার ৭০০ সৈন্য, যার মধ্যে ২১ হাজার ৮৭০ রথ, ২১ হাজার ৮৭০ হাতি, ৬৫ হাজার ৬১০ অশ্ব এবং ১ লাখ ৯ হাজার ৩৫০ জন পদাতিক থাকে।

**অগস্ত্যযাত্রা** শেষ যাত্রা। মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণের এ-সংক্রান্ত উপাখ্যানটি হলো: একদা বিন্ধ্যপর্বত তাঁর চূড়া এমন পর্যায়ে উন্নীত করেন যে তাতে সূর্যের পথপরিক্রমা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। বিন্ধ্য অগস্ত্য মুনিকে গুরু মানতেন। দেবতারা তাই পরামর্শ করে বিন্ধ্যকে নতশির করানোর জন্য অগস্ত্যকে অনুরোধ করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনে অগস্ত্য বিন্ধ্যকে বলেন, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত বিন্ধ্য যেন অবনত মস্তকে থাকেন। এই বলে বিন্ধ্য অনন্তকালের জন্য দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন। তাঁর যাত্রা শুরুর তারিখটা ছিল পয়লা ভাদ্র। এ কারণে হিন্দুরা ওই দিনে বিদেশযাত্রা থেকে বিরত থাকে।

**অগ্নি** হিন্দু পুরাণমতে প্রধান দেবতাদের অন্যতম। পার্থিব দেবতাদের মধ্যে অগ্নিই প্রধান। অগ্নির তিন রূপ: আকাশে সূর্য, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ ও পৃথিবীতে অগ্নি। অগ্নি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং দক্ষকন্যা স্বাহার স্বামী। পাবক, পবমান ও শুচি—এঁরা অগ্নির পুত্র। অগ্নির বাহন ছাগ। সাধারণত যজ্ঞাগ্নিরূপেই অগ্নি পূজিত হন। শ্বেতকী-রাজার যজ্ঞে অতিভোজনের ফলে অগ্নি নিদারুণ অগ্নিমান্দ্য রোগে আক্রান্ত হন। তখন ব্রহ্মার উপদেশে অগ্নি রোগমুক্তির জন্য খাণ্ডববনের সমস্ত জীবজন্তু ও দৈত্যদানব ভক্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু খাণ্ডববন দেবরক্ষিত বলে ইন্দ্র তাতে বাধা দেন। অগ্নি এরপর কৃষ্ণ ও অর্জুনের শরণাপন্ন হলে তাঁরা তাঁকে সাহায্য করতে রাজি হন। তবে এ ব্যাপারে তাঁরা তাঁদের অস্ত্রের অভাবের কথা বলেন। অগ্নি তখন বরুণদেবের কাছ থেকে কপিধ্বজ রথ, গাণ্ডিব ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় এনে অর্জুনকে দেন এবং কৃষ্ণকে দেন সুদর্শনচক্র ও কৌমদকী গদা। যুদ্ধে কৃষ্ণ ও অর্জুনের দ্বারা খাণ্ডবদাহন হলে অগ্নি তা খেয়ে রোগমুক্ত হন। পবিত্র কোরআনের সুরা ওয়াকিয়ার ৭১-৭৪ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা যে আগুন জ্বালো তা কি লক্ষ করে দেখেছ? তোমরাই কি গাছ সৃষ্টি করেছ যার থেকে আগুন তৈরি হয়, নাকি আমি? আমি একে করেছি এক নিদর্শন ও মরুবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু।'

**অঘোরপন্থী** উপাসক সম্প্রদায়, যাঁরা শিবের এক বিশেষ রূপ পছন্দ করেন। যে শিব সর্বব্যাপারে অনাসক্ত, যাঁর আচার-ব্যবহার সমাজরীতি-বহির্ভূত, যিনি পুরীষ-চন্দন সমজ্ঞান করেন, তিনিই অঘোরনাথ। অঘোরপন্থীরা এই অঘোরনাথেরই উপাসক। অঘোরমন্ত্রকে তাঁরা অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন মনে করেন। তারা নোংরা ও বীভৎস বস্তু সম্পর্কে বিকারহীন। অনেক বিষয়ে কাপালিকদের আচরণের সঙ্গে তাঁদের মিল থাকলেও তাঁরা কাপালিকদের মতো নরবলি দেন না। যদিও মৃত নরমাংস ভোজনে তাঁদের অরুচি নেই। শিবের মতোই তাঁরা শ্মশানচারী। অঘোরপন্থীরা উলঙ্গ থাকেন। তাঁরা লোকালয়ে বড় একটা যান না।

শ্মশানযাত্রী বা শববাহকদের কাছ থেকে তাঁরা আহার্য ও পানার্থে কারণবারি সংগ্রহ করেন। বুদ্ধদেব এঁদের মতো উলঙ্গ সাধু-সম্প্রদায়কে 'অচেলক' বলতেন। বর্তমানে অঘোরপন্থীদের দেখা যায় না।

**অঙ্গদ** কিষ্কিন্ধ্যার বানররাজ বালির পুত্র। বানররাজ সুষেণের কন্যা তারা তাঁর মাতা। বালিকে রাম হত্যা করলে পিতৃব্য সুগ্রীব রাজা হন। অঙ্গদকে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। বানরসেনাদের অধিনায়করূপে সুগ্রীব রামের হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা ও সীতা উদ্ধারে সহায়তা করেন। সুগ্রীবের মৃত্যুর পর অঙ্গদ কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হন।

**অঙ্গিরা** ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মার মুখ থেকে নিঃসৃত। তিনি কর্দম ঋষির কন্যা শ্রদ্ধাকে বিয়ে করেন। সপ্তর্ষি ও ১০ জন প্রজাপতির মধ্যে অন্যতম। ঋগ্‌বেদের বহু শ্লোকের তিনি রচয়িতা। অথর্ববেদের মন্ত্র সংকলনেও তাঁর ও তাঁর বংশধরদের খ্যাতি রয়েছে। কথিত আছে যে, ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঋষি অথর্বার কাছ থেকে অঙ্গিরা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। অথর্ববেদের অপর নাম তাই 'অঙ্গিরা বেদ'।

**অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব** শ্রীচৈতন্যের মুখনিঃসৃত বাণী থেকে কৃষ্ণতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর শিষ্যমণ্ডলী, যেমন রূপসনাতন, রামানন্দ, স্বরূপদামোদর প্রমুখ গোস্বামীরা যা অবগত হয়েছিলেন সেসব তত্ত্ব জীবগোস্বামী তাঁর *ভাগবতসন্দর্ভ* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। ওই গ্রন্থের ভূমিকায় প্রথম অচিন্ত্যভেদাভেদ মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ এই মতবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ মাত্র। জগৎ নশ্বর কিন্তু মিথ্যা বা অলীক নয়। জীবমাত্রই পরমব্রহ্মের জীবশক্তির অংশ। শক্তিমান ও শক্তির মধ্যে ভেদ ও অভেদ একই সঙ্গে বর্তমান। সংক্ষেপে এরই নাম অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব।

**অজ** দেবতা, যিনি কারও গর্ভে জন্মগ্রহণ করেননি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই শ্রেণীর দেবতা। মহাদেবের একাদশ রুদ্রমূর্তির অন্যতম। পরবর্তীকালের অন্যান্য দেবকল্পনায়ও অজ একপাদের প্রভাব স্বীকৃত হয়েছে। যেমন, শিবের একপাদ মূর্তি। মহাভারতে অজ একপাদ একাদশ রুদ্রের অন্যতম এবং শিবের উপাধি।

**অজন্তা** ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের ঔরঙ্গাবাদ জেলায় অবস্থিত বৌদ্ধ দেয়ালচিত্র ও ভাস্কর্যে সমৃদ্ধ গুহাসমষ্টি। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ থেকে ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত। প্রায় ২৫০ ফুট উঁচু একটি খাড়া পাহাড়ের পার্শ্বদেশ কেটে গুহাগুলো তৈরি এবং ১ হাজার ৮০০ ফুট জুড়ে অর্ধবৃত্তাকারে অবস্থিত। এগুলোর মধ্যে পাঁচটি বৌদ্ধমন্দির ও বাকি ২৫টি সঙ্ঘারাম। গুহার গায়ে আঁকা ও খোদাই করা এসব দেয়ালচিত্র ও ভাস্কর্যের মাধ্যমে বুদ্ধের জীবন চিত্রিত রয়েছে। এ থেকে বৌদ্ধ শিল্পকলার একটা ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়।

**অজমুখ** সতীর পিতা প্রজাপতি দক্ষের অন্য নাম। জামাতা শিবকে অপমান করার জন্য দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। ওই যজ্ঞে জামাতা শিব ও কন্যা সতী ছাড়া আর সব দেব-দেবীই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সতী বিনা নিমন্ত্রণেই যজ্ঞে উপস্থিত হওয়ার জন্য যাত্রা করলে শিব তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ান। সতী তখন কালী, তারা প্রভৃতি মূর্তি ধারণ করেন। এতে শিব ভীত হয়ে পালিয়ে যান। যজ্ঞের শুরুতে দক্ষ শিবনিন্দা আরম্ভ করলে সতী পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে যজ্ঞস্থলেই দেহত্যাগ করেন। তার আগে তিনি পিতাকে বলেছিলেন, যে মুখে পিতা তাঁর স্বামীর নিন্দা করেছেন, সেই মুখ ছাগমুখ হবে। সতীর দেহত্যাগের খবর পেয়ে শিব অনুচরসহ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ ভণ্ডুল ও দক্ষের মস্তক ছিন্ন করেন। দক্ষপত্নীর স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি পরে দক্ষের প্রাণদান করলেও তাঁর দেহে ছাগমুণ্ড সংযোজন করে দেন। সেই থেকে দক্ষের আরেক নাম 'অজমুখ'।

**অজাচার** অজ অর্থাৎ ছাগ বা মেষের মতো আচরণ। রক্তের সম্পর্ক আছে বলে বিয়ে নিষিদ্ধ এমন নিকটাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ সঙ্গমকে অজাচার বলা হয়। নিষিদ্ধ বিয়ে সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথক নিয়ম বা অনুশাসন চালু ছিল বা আছে। যেমন প্রাচীনকালে

কোনো কোনো সমাজে সহোদর ভাইবোনের মধ্যেও বিয়ের রীতি ছিল।

**অজিত কেশকম্বলীন** প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক। তাঁকে ভারতীয় দর্শনের লোকায়ত বা বস্তুবাদী ধারার প্রবক্তা হিসেবে গণ্য করা হয়। জন্ম খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। সেদিক থেকে তিনি বুদ্ধ ও মহাবীরের প্রায় সমসাময়িক। এ সময় গাঙ্গেয় উপত্যকায় নানা ধরনের বেদবিরোধী মতবাদ গড়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতের অন্যান্য লোকায়ত দার্শনিকের মতো অজিত কেশকম্বলীনেরও জীবন ও মতবাদ সম্পর্কে বেশি কিছু জানার উপায় নেই। বিভিন্ন গল্প-উপাখ্যান থেকে যতটুকু জানা যায় তা হলো, তাঁর পরিধেয় ছিল মানুষের কেশ দিয়ে তৈরি কম্বল, আর তা থেকেই কেশকম্বলীন কথাটার উৎপত্তি। অজিত কেশকম্বলীন অবস্তু ও অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ নাকচ করে তাঁর দর্শন প্রচার করেন। তাঁর মতে, মানবশরীর চারটি উপাদান দ্বারা গঠিত। যখন সে মারা যায় তখন মৃত্তিকা মৃত্তিকায়, জল জলে, আগুন আগুনে, বাতাস বাতাসে এবং ইন্দ্রিয়শক্তি শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। বিষয়টিকে তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, চারজন লোক শবদেহ খাটিয়ায় চড়ায়, শ্মশানঘাট পর্যন্ত তাঁর সম্বন্ধে গল্প করে, শ্মশানে তাঁর হাড় ঘুঘুর ডানার রং পায় এবং তাঁর সব অর্জন ভস্মীভূত হয়ে যায়। তাঁর মতে, নির্বোধেরা অযথাই দান-ধ্যানের কথা বলে, যারা আত্মার অমরত্বের কথা বলে তারাও অর্থহীন মিথ্যা প্রচার করে। যখন দেহের মৃত্যু হয় তখন নির্বোধ ও জ্ঞানীর, পাপী ও পুণ্যবানের মধ্যে কার্যত কোনো পার্থক্য থাকে না এবং উভয়েই তারা লয়প্রাপ্ত হয়। বস্তুত, জীবনের পরে জীবের আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

**অজ্ঞেয়বাদ** (Agnosticism) ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনিশ্চিত অবস্থানবাদী দর্শন। গ্রিক শব্দ agnostos (যার অর্থ, অজানা) থেকে ইংরেজি agnosticism কথাটার উৎপত্তি। প্রশ্নহীন ঈশ্বরবিশ্বাস ও নাস্তিক্যবাদ—উভয় ধারণা থেকেই এর দূরত্ব রয়েছে। অজ্ঞেয়বাদীরা মনে করেন, ঈশ্বরের প্রকৃতি, এমনকি তাঁর অস্তিত্ব আছে কি নেই, তা নীতিগতভাবে বা বাস্তবিক অর্থে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে অজ্ঞেয়বাদের সঙ্গে গভীর আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় অঙ্গীকার অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, নিকোলাস অব কুসা (১৪০১-১৪৬৪ খ্রি.) যার একটি উদাহরণ। অজ্ঞেয়বাদী দর্শন সাধারণত সামাজিক জীবনে ঈশ্বর বা ধর্মবিশ্বাসকে গুরুত্ব না দেওয়ার পক্ষপাতী। দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে এ প্রস্তাব করা হয় যে, ঈশ্বর আছেন কি নেই তা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

**অতিপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয়** বা **অলৌকিক** চর্মচক্ষে দেখা যায় না বা মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা ধরাছোঁয়ার সীমার বাইরে এমন কিছুতে বিশ্বাস, যা প্রায় সব ধর্মেরই মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। জগতের সবকিছুকে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত—এ দুই ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। প্রাকৃত বলতে বোঝায় যা সাধারণ বোধগম্য। আর অতিপ্রাকৃত বলতে প্রাকৃতের চেয়ে অতিরিক্ত কিছুকে বোঝায়, যা দৃশ্যমানতার বাইরে এবং সব সময় যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যেয় বা সহজে বোধগম্য নয়। অতিপ্রাকৃত বা অতীন্দ্রিয়ের জগৎ আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে পবিত্র জ্ঞান করা হয়। বিজ্ঞান অবশ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাইরে কিংবা যাকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা বা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, এমন কোনো কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সেদিক থেকে অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক বলে আসলে কিছুই নেই। এক দিক থেকে আবার এই প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃতের ধারণাটি আপেক্ষিক। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত সমাজের মানুষের কাছে যা প্রাকৃত বা স্বাভাবিক, অনুন্নত ও অনগ্রসর সমাজের মানুষের কাছে তা অতিপ্রাকৃত বলে মনে হতে পারে। মহাশূন্যে মানুষের পাড়ি জমানো, মুহূর্তের মধ্যে যোজন যোজন দূরত্বে বার্তা, কণ্ঠস্বর বা ছবি পৌঁছানো এসব আজ আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। কিন্তু পূর্বকালে বা ভিন্ন সমাজে তা-ই হয়তো অবিশ্বাস্য বা অতিলৌকিক বলে মনে হতো বা হয়।

**অতীশ দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান** বৌদ্ধ পণ্ডিত। ৯৮০, মতান্তরে ৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে মুন্সিগঞ্জ জেলার (বিক্রমপুর) বজ্রযোগিনী গ্রামে তাঁর জন্ম। আসল

নাম আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জন্য তিনি পরবর্তীকালে 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' উপাধি লাভ করেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে ১০১৩ সালে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান শতাধিক শিষ্য নিয়ে মালয় দেশের সুবর্ণদ্বীপে গমন এবং সেখানে ১২ বছর বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ভারতে ফিরে ১৫ বছর তিনি বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে বিক্রমশীলা মহাবিহারে অধ্যাপনা ও তা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। ১০৪১ সালে তিনি তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তিব্বতে তিনি হো-বো-জো নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি তিব্বতি ভাষায় দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। তাঁর অবদানের জন্য তিনি 'জোবো ছেনপো' অর্থাৎ মহাপ্রভু উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি তিব্বতে অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার ও তার প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি ভোট ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর মূল সংস্কৃত রচনাগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ১০৫৪ সালে তিব্বতের ঞেথাং বা ন্যাংথা বিহারে অতীশ দেহত্যাগ করেন। ১৯৭৮ সালের ২৮ জুন তাঁর দেহভস্ম চীন থেকে ঢাকায় এনে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কমলাপুর ধর্মরাজিক বৌদ্ধবিহারে সংরক্ষণ করা হয়।

**অত্রি** ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং ঋগ্‌বেদের মন্ত্রস্রষ্টাদের অন্যতম। অথর্ববেদে তাঁর প্রাধান্য দেখা যায়। অন্য মতে, তিনি ব্রহ্মার চক্ষু থেকে উৎপন্ন এবং সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। দক্ষকন্যা অনুসূয়া ছিলেন তাঁর পত্নী। পুত্র লাভের জন্য কোনো এক পর্বতে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে তপস্যা করেন। তাঁদের তপস্যায় প্রীত হয়ে ত্রিমূর্তি তাঁদের অংশ থেকে তিনটি পুত্র দান করেন। তাঁরা হলেন দত্তাত্রেয় অর্থাৎ বিষ্ণু, দুর্বাসা অর্থাৎ শিব ও সোম অর্থাৎ ব্রহ্মা। অত্রিকে দশ প্রজাপতির অন্যতম বলেও গণ্য করা হয়। বনবাসকালে রামচন্দ্র কিছুদিন তাঁর আশ্রমে বাস করেছিলেন।

**অথর্ববেদ** চতুর্থ বেদ। মনুসংহিতায় ও অমরকোষে তিন প্রকার বেদের উল্লেখ আছে: ঋক্, সাম ও যজু। কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে অথর্ববেদ নামে চতুর্থ আরেকটি বেদের কথা বলা হয়েছে। এই বেদের অনেক শাখা ও ভাগের মধ্যে এখন কেবল শৌনক শাখাটি পাওয়া যায়। অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ ভাগের নাম গোপথ ব্রাহ্মণ। এতে ৭৩০টি সূক্ত ও ২০টি খণ্ড বর্তমান। এর কিছু অংশ গদ্যে ও বাকি বৈদিক ছন্দে রচিত। অথর্ববেদের মন্ত্রগুলোর লক্ষ্য একদিকে অর্থলাভ, ব্যাধি নিরাময়, মঙ্গল ও সমৃদ্ধি, ভূতনিবারণ, মনোবাঞ্ছা পূরণ এবং অন্যদিকে শত্রুনিপাত, বিরুদ্ধপক্ষের শাস্তি, বিনাশ বা অমঙ্গল কামনা প্রভৃতি।

**অদিতি** হিন্দু দেবী। দেবমাতা নামে পরিচিত। কারণ ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, সূর্যসহ মোট ১২ জন দেবতার তিনি মাতা। অন্য পরিচয়ে তিনি প্রজাপতি দক্ষের কন্যা ও মহর্ষি কশ্যপের স্ত্রী। তাঁর ভগিনীর নাম দিতি, যাঁর গর্ভ থেকে দৈত্যদের জন্ম হয়। অদিতি গাভির রূপ ধারণ করতে পারেন। একই সঙ্গে তিনি অভিভাবিকা, সম্পদ আনয়নকারিণী এবং বিপত্তিনাশিনী। কৃষ্ণ ও ইন্দ্রের বিরোধ তিনি মীমাংসা করে দেন।

**অদ্ভুত রামায়ণম্** বাল্মীকি রচিত ও সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত রামায়ণ। সংক্ষেপে এই রামায়ণের কাহিনিটি হচ্ছে: বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষ-রাজার কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে নারদ ও পর্বত উভয়েই তাঁর পাণিপ্রার্থী হন, কিন্তু বিষ্ণুর কৌশলে তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ক্রুদ্ধ হয়ে নারদ ও পর্বত তখন বিষ্ণুকে মর্তে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দেন। ফলে বিষ্ণু দশরথের ঘরে রামরূপে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যদিকে মন্দোদরীর গর্ভে সীতার জন্ম হলে গর্ভনিঃসারণ করে মন্দোদরী তাঁকে কুরুক্ষেত্রে প্রোথিত করেন। হলকর্ষণে রাজর্ষি জনক সীতাকে ভূমির অভ্যন্তর থেকে প্রাপ্ত হন। পরে রামের সঙ্গে সীতার বিয়ে হয়। রামের বনবাসকালে রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক সীতা অপহৃত হন। কপি বা বানর সেনার সাহায্য নিয়ে রাম সীতাকে উদ্ধার করেন। অযোধ্যায় ফিরে সীতার মুখে রাবণের বৃত্তান্ত শুনে রাম তাকে বধ করতে পুষ্কর দ্বীপ গমন করেন। রামচন্দ্র পরাজিত হলে সীতা কালিকা মূর্তি ধারণ করে রাবণকে নিধন করেন। এই মূল রামায়ণ-কাহিনি অবলম্বন ও তা সামান্য অদলবদল করে বাংলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ, মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ কাব্য* প্রভৃতি রচিত হয়।

**অদ্বয়বজ্র** সহজযানী সিদ্ধাচার্য। বজ্রযান-সম্পর্কিত গ্রন্থ ও বৌদ্ধ সংকীর্তনের রচয়িতা। বজ্রাচার্য ও অবধূতী পা নামেও পরিচিত। আনুমানিক দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি কিছু বাংলা গ্রন্থও রচনা করেন। তিব্বতি ভাষায় যার অনুবাদ আছে। তিনি সোমপুর মহাবিহারের পণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র রচিত গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

**অদ্বৈতবাদ** বা **অদ্বয়বাদ** একটি হিন্দু দার্শনিক মতবাদ। ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় কিছুই নেই এবং সমস্ত জীব তাঁরই অংশ, তাঁর থেকেই উদ্ভূত, এটাই এই মতবাদের মূলকথা। প্রাচীন ভারতের এই দার্শনিক মতটি পরবর্তীকালে শঙ্করাচার্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন।

**অধিবাস** শুভ কাজের পূর্বে অবশ্যকরণীয় একটি হিন্দু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। বিয়ের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় অধিবাসের মধ্য দিয়ে। বিয়ের আগের দিন বর-কনে উভয়ের পিতা-মাতা নিরামিষ ও ফল-দুধ খান। পুত্র-কন্যার সুখী জীবন কামনা করে পিতা দেবতাদের উদ্দেশে পূজা দেন। অধিবাসের উপচার ২২টি : পঞ্চশস্য, অর্থাৎ—ধান, তিল, যব, সরষে ও মাষকলাই; গঙ্গামৃত্তিকা, চন্দন, শিলা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পঞ্চপ্রদীপ, দর্পণ, দধি, ঘৃত, মধু, ফুল, ফল, দূর্বা, শঙ্খ, সিঁদুর ও কাঁচা হলুদ। বর-কনের সুখী ও মধুময় জীবন কামনা করে ব্রাহ্মণ পুরোহিত আশীর্বাদস্বরূপ কুলায় সাজানো মাঙ্গলিক দ্রব্য বা উপচারগুলো তাঁদের কপালে ছুঁইয়ে দেন। তারপর বর ও কনেকে দিয়ে পাথরের নোড়ার সাহায্যে কুলার ওপর কলাই ও হলুদ ভাঙিয়ে সধবারা তা তাঁদের স্পর্শ করান। বিয়ের দিন বিকেলে আভ্যুদয়িক বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের পর উভয় বাড়ির সধবারা ওই দ্রব্যগুলো পিষে সুগন্ধি তেলসহ বর ও কনের গায়ে মাখিয়ে স্নান করিয়ে দেন। বর ও কনের অধিবাস যাঁর যাঁর বাড়িতে পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবাস অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে বর ও কনের হাতে মঙ্গলসূত্র বেঁধে দেওয়া হয়।

**অধ্যাত্মবিদ্যা** যে বিদ্যা বা শাস্ত্রে আত্মা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আত্মা হলো দেহ ও ইন্দ্রিয়াতীত বিশেষ চেতন পদার্থ। অধ্যাত্মবাদীদের মতে, আত্মা সম্পর্কে জ্ঞান থেকেই মোক্ষ বা সিদ্ধি লাভ হয়। চার্বাক ও তাঁর মতানুসারীরা ছাড়া ভারতীয় দার্শনিকদের সকলেই অধ্যাত্মবাদী। আর এতে উপনিষদ ও বেদান্তের স্থান সর্বোচ্চ বলে স্বীকৃত। পৃথিবীর প্রায় সব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেই অধ্যাত্মজ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যদিও অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে অল্পবিস্তর মতবিরোধ আছে।

**অনন্তব্রত** ব্রতবিশেষ। কোনো ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্দশী থেকে শুরু করে চতুর্দশ বছর এই ব্রত পালন করা হয়। এই ব্রতের দেবতা বিষ্ণু, যাঁকে অনন্তদেব রূপে কল্পনা করা হয়। যাঁরা এই ব্রত পালন করেন, তাঁদের চতুর্দশ সূত্র দ্বারা তৈরি এবং বিষ্ণু নামের দ্বারা বিশেষভাবে শুদ্ধীকৃত চতুর্দশ গ্রন্থিযুক্ত ডোর হাতে ধারণ করে অনন্ত ব্রতকথা শুনতে হয়।

**অনাগামীন** যিনি প্রত্যাবর্তন করেন না। থেরবাদ-মতে তৃতীয় পরিণতি। একজন শ্রমণ যখন আত্মায় বিশ্বাস, অনুষ্ঠানে বিশ্বাস, সন্দেহ, ইন্দ্রিয়ক্ষমতা ও হিংসা—এই পাঁচটি শেকল ছিন্ন করতে পারবেন তখন তিনি আর এ পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না, স্বর্গে বাস করবেন। সেখানে তিনি একজন 'অর্হৎ' (অর্থাৎ নির্বাণ লাভকারী) হবেন।

**অনাগারিক ধর্মপাল** বিখ্যাত বৌদ্ধভিক্ষু, ধর্ম ও সমাজসংস্কারক। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার কলম্বো শহরে ধনাঢ্য হেওয়া বিতরণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর বাল্য নাম ছিল ডন ডেভিড হেওয়া বিতরণ। ১৮৮৬ সালে ২২ বছর বয়সে তিনি 'ধর্মপাল' নাম গ্রহণ এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারে নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৮৯১ সালে একজন জাপানি ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভারতের বৌদ্ধতীর্থগুলো পরিভ্রমণ করেন। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শ্রীলঙ্কায় মহাবোধি সোসাইটি গঠন করেন। পরের বছর তাঁরই উদ্যোগে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় মহাবোধি সোসাইটি অব ইন্ডিয়া, তিনি যার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এস রাধাকৃষ্ণান, রাজা গোপালাচারীর মতো

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সোসাইটির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৮৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্মসভায় তিনি বৌদ্ধদের প্রতিনিধিত্ব করেন ও ভাষণ দেন। ওই একই সভায় স্বামী বিবেকানন্দও যোগ দেন এবং শিকাগো অবস্থানকালে বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অনাগারিক ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, থাইল্যান্ড, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। লন্ডনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি বৌদ্ধ মিশন আছে। প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালে অনাগারিককে ব্রিটিশ সরকার অন্তরীণ করে রাখে। ১৯২২ সালে তিনি সারনাথ মূলগন্ধকূটি বিহারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ ছাড়া সারনাথে তিনি ধর্মশালা, ইন্টারন্যাশনাল বুড্ডিস্ট ইনস্টিটিউট এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলেন। ভারতবাসীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জাগরণ এবং শিল্প-সংস্কৃতির উন্নতিই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে পৈতৃক সম্পত্তি দিয়ে তিনি 'অনাগারিক ধর্মপাল ট্রাস্ট' নামে একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেন। ১৯৩১ সালে ধর্মপাল মহাভিক্ষু ব্রত গ্রহণ করেন। একজন থেরর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে তিনি দেবমিত্র ধর্মপাল নামে পরিচিত হন। ১৯৩৩ সালের ২৯ এপ্রিল তিনি মারা যান।

**অনার্য** আর্যদের আগমনের পূর্বকাল থেকে ভারতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী। বস্তুত, অনার্য বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট জাতি বা শ্রেণীকে বোঝায় না। আর্যদের আগমনের পর অনার্যদের মধ্যেও অনেকে দাসরূপে আর্যসমাজভুক্ত হয়। তারা শূদ্র নামে পরিচিতি লাভ করে। আবার অনেকে দুর্গম পর্বত ও অরণ্যে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে। তারা দাস, নিষাদ, দস্যু প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। অনার্যদের কুৎসিত, অবোধ্যভাষী ও ধর্মহীন বলে উল্লেখ করেও তাদের পুরোপুরি পদানত করা আর্যদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অনার্যরাও যে উন্নত মানের সভ্যতার অধিকারী ছিল প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতাই তার প্রমাণ। কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুন্ডা, খাসিয়া, নাগা, কিরাত, পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি জনগোষ্ঠী প্রাচীন অনার্য জাতির বংশধর। তাদের ভাষা আর্য ভাষা থেকে পৃথক। আর্যদের রচিত বেদের ভাষা মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষা এই ভাষা থেকে উদ্ভূত। কিন্তু অনার্যদের ভাষা এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তামিল, তেলেগু, কানাড়ি, মালয়ালম প্রভৃতি ভাষা মূলত অনার্য ভাষা।

**অনিরুদ্ধ** হিন্দু পুরাণে প্রদ্যুম্নের পুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র। তিনি দৈত্যরাজ বাণের কন্যা উষাকে গন্ধর্বমতে বিয়ে করেন। বাণ তা জানতে পেরে অনিরুদ্ধকে বন্দী করেন। কৃষ্ণ ও বলরাম তখন বাণের রাজধানী শোণিতপুর আক্রমণ করে বাণকে পরাজিত ও অনিরুদ্ধকে মুক্ত করেন। পরে বাণ কন্যার বিয়েতে সম্মতি দেন। যদুবংশের বিনাশকালে অনিরুদ্ধের মৃত্যু হয়।

**অনির্বাণ** হিন্দু সন্ন্যাসী। জন্ম ১৮৯৬ সালের ৮ জুলাই ময়মনসিংহে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ ধর। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় স্বামী নির্বাণানন্দ সরস্বতী। পরে তিনি হিমালয়ের গভীর অরণ্যে অনির্বাণ নাম নিয়ে তপস্যা করেন। ১৯১৮ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি কোকিলামুখ আসাম-বঙ্গীয় সরস্বত মঠের পরিচালক ও ঋষি-বিদ্যালয়ের আচার্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ ছাড়া মাসিক *আর্য্যদর্পণ* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। সনাতন ধর্ম ও অধ্যাত্মশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অরবিন্দ ঘোষের *The Life Divine* গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেন এবং *বেদমীমাংসা* গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান। আলমোড়ায় অনির্বাণের প্রতিষ্ঠিত হৈমবতী আশ্রমে ভগিনী নিবেদিতার জীবনীকার মাদাম লিজেল রেঁমো তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রেঁমোর রচিত গ্রন্থ *To Live Within*-এ অনির্বাণের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। অনির্বাণের মতে, মানুষের অভিযাত্রা এক বিশ্বজনীন সহজ ধর্মের দিকে। নিজেকে তিনি 'সহজ বাউল' বলে পরিচয় দিতেন এবং মানবতাবাদের আদর্শ প্রচার করতেন। ১৯৭৮ সালের ৩১ মে তাঁর মৃত্যু হয়।

**অনুকূলচন্দ্র ঠাকুর** হিন্দু সাধক, চিকিৎসক এবং সৎসঙ্গ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৮৮ সালের ১৪

সেপ্টেম্বর পাবনা জেলার হেমায়েতপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক—এই তিন প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। আর শারীরিক সুস্থতা মানসিক সুস্থতার ওপর নির্ভর করে। মানুষের আত্মিক উন্নয়নের জন্য তিনি একটি কীর্তনের দল গঠন করেন। কীর্তনের সময় তিনি মাঝে মাঝে আবিষ্ট হয়ে পড়তেন। লোকে তাঁকে 'ঠাকুর' বলে সম্বোধন করত। তিনি পাবনায় প্রতিষ্ঠা করেন সৎসঙ্গ আশ্রম। শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ—এই চারটি হলো সৎসঙ্গের আদর্শ। ১৯৪৬ সালে তিনি বিহারের দেওঘরে আরেকটি নতুন আশ্রম গড়ে তোলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪৬। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সৎসঙ্গের আশ্রম আছে। ১৯৬৯ সালের ২৬ জানুয়ারি তিনি বিহারের দেওঘরে পরলোকগমন করেন।

**অনুগ্রহমূর্তি** শিবের বিভিন্ন মূর্তি। ভক্তদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে শিব নানা মূর্তি ধারণ করে তাদের দর্শন দান ও অনুগ্রহ বিতরণ করেন। যেমন বিষ্ণ্বানুগ্রহ মূর্তি বা চক্রদানমূর্তি, পাশুপতাস্ত্রদানমূর্তি, চণ্ডেশানুগ্রহমূর্তি, রাবণানুগ্রহমূর্তি প্রভৃতি।

**অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া** মৃত্যুর পরে হিন্দুদের শবদাহ ক্রিয়া। দাহের আগে মরদেহে ঘি মাখিয়ে স্নান করানোর পর চন্দন মাখিয়ে তার দুই কান, নাকের দুটি ছিদ্র, দুই চোখ ও মুখে মোট সাত টুকরা সোনা বা কাঁসা (অভাবে সোনা বা কাঁসা ধোয়া পানি) দিয়ে মৃতের উদ্দেশে পিণ্ড দান করা হয়। শব চিতায় স্থাপন করার পর তা তিনবার প্রদক্ষিণ করে মৃতের পুত্র (প্রধানত জ্যেষ্ঠ পুত্র) কিংবা কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাতে মুখাগ্নি করে। দাহ করার কাজে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে চন্দনকাঠ বা চন্দনগুঁড়া ব্যবহার করা হয়। দাহকার্য শেষে যিনি মুখাগ্নি করেন তিনি চিতাগ্নিতে এক-এক করে সাত টুকরা ছোট কাঠ দিয়ে সাতবার আঘাত করেন। অতঃপর জ্বলন্ত চিতার ওপর তিনি সাত কলসি এবং অন্যরা এক-এক কলসি জল ঢেলে চিতার আগুন নেভান। অদগ্ধ দেহাংশ, ভস্ম ইত্যাদি মাটির পাত্রে সংগ্রহ করে জলে ভাসানো হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে শবযাত্রীদের স্নান করে বাড়ি ফিরে নিমপাতা দাঁতে কেটে আগুন, লোহা, মটর ডাল ইত্যাদি (মতান্তরে পাথর, আগুন, জল, গোবর, সাদা সরষে) স্পর্শ করে বাড়িতে ঢুকতে হয়। সাধু-সন্ন্যাসী, শিশু, সর্পদষ্ট কিংবা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ জলে ভাসিয়ে দেওয়া কিংবা মৃৎসমাধি দেওয়ার রীতি আছে।

**অন্নকূট** হিন্দুদের উৎসব। গোবর্ধন পর্বতের নিকটবর্তী একটি পর্বতের নাম অন্নকূট। পর্বতচূড়ার আকারে অন্ন সাজিয়ে এই উৎসব করা হয় বলে এর এই নামকরণ। দেওয়ালির পরের দিন কার্তিকে শুক্লা প্রতিপদে কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দিরে এবং অন্যান্য স্থানের বৈষ্ণব মন্দিরে এ উৎসব পালিত হয়। অন্নকূট মূলত গোবর্ধন পূজা। এ পূজায় গোময় বা অন্নের দ্বারা গোবর্ধনগিরির প্রতীক নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। বাংলার স্মৃতিগ্রন্থে অবশ্য অন্নকূট উৎসবের নাম নেই।

**অন্নপ্রাশন** শিশুর মুখেভাত বা প্রথম ভাত খাওয়া অনুষ্ঠান। হিন্দুদের দশবিধ সংস্কারের মধ্যে এটি প্রথম। দ্বিতীয় সংস্কার 'নামকরণ'ও অন্নপ্রাশনের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়। ছেলেশিশুর বেলায় ছয় বা আট মাস এবং মেয়েশিশুর বেলায় সাত বা নয় মাস বয়সই অন্নপ্রাশনের উপযুক্ত বলে গণ্য করা হয়। অনুষ্ঠানটি গৃহে কিংবা মন্দির বা অন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও হতে পারে। সাধারণত শিশুর মামা তার মুখে প্রথম অন্ন তুলে দেন। এ উপলক্ষে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, হোম ইত্যাদিও অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে অবশ্য এসব আর অবশ্যকরণীয় বলে বিবেচিত হয় না।

**অবতার** জীবদেহধারী দেবতা। হিন্দুমতে, পৃথিবীর পাপভার মোচন, অধর্ম নাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর বিভিন্ন সময়ে অবতাররূপে পৃথিবীতে আগমন করেন। অবতার দুই রকমের : আংশিকভাবে অবতীর্ণ হলে অংশাবতার এবং পরিপূর্ণরূপে অবতীর্ণ হলে তাঁকে বলে পূর্ণাবতার। বিষ্ণু বা কৃষ্ণ যখন ধরাধামে অবতরণ করেন তখন মানুষ বা জন্তুরূপ গ্রহণ করেন। এই ধারণা বেদ বা উপনিষদে ছিল না। ভগবদ্গীতায় (৪, ১-৮) কৃষ্ণ বলেছেন, অপ্রশস্ত কালে নীতি পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি বারবার জন্মগ্রহণ করেছেন। গীতায় অবতারের সংখ্যা সম্পর্কে কিছু বলা না হলেও

মহাকাব্য ও পুরাণে উল্লেখিত দশাবতার হিন্দুসমাজে স্বীকৃতি লাভ করে। এঁদের মধ্যে মৎস্য অবতার মহাপ্লাবন থেকে মনুকে ত্রাণ করেন। কূর্ম অবতার দেবতাদের অমৃতের সন্ধান দেন, যা খেয়ে তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন। বরাহ অবতার সমুদ্রে নিমজ্জিত পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। নৃসিংহ অবতার দানব হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার থেকে ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন। বামন অবতার অসুর বলির কবল থেকে স্বর্গ ও মর্ত্যকে উদ্ধার করেন। পরশুরাম অবতার ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করেন। অবতার রাম রাবণকে ধ্বংস করে সীতাকে উদ্ধার করেন। কৃষ্ণ অবতার কংসের হাত থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করেন। তাঁকে পূর্ণ অবতাররূপেও গণ্য করা হয়। বুদ্ধ অবতার বেদের পবিত্রতা সংরক্ষণ করে মানুষকে এক নতুন অহিংসধর্মে দীক্ষা দেন। অবতার কল্কি বর্বর রাজাদের সিংহাসনচ্যুত করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকের মতে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার নন, স্বয়ং পরম পুরুষ। ভাগবত পুরাণে বাইশ অবতারের উল্লেখের পর বলা হয় অবতার অসংখ্য। বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে অবতারের কার্যকলাপ ভগবানের এমন লীলা, যা মানুষকে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ দেয়। তাঁরা মনে করেন, ভগবান স্বয়ং অবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। অদ্বৈতবাদীদের মতে, অবতারবাদের ধারণা অবাস্তব, কিন্তু উপদেশনার ক্ষেত্রে এর ব্যবহার চলতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের মতো যাঁরা পৌরাণিক বা অলৌকিক কাহিনিতে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা অবতারজ্ঞানে প্রাণীদের উপাসনার বিরোধী। কিন্তু ভগবদ্‌গীতা, রামলীলা ও কৃষ্ণলীলার সংখ্যা আজও অসংখ্য, যারা কোনো না কোনোভাবে অবতারবাদে বিশ্বাসী। অবতার শব্দের অর্থের ব্যাপ্তি ঘটিয়ে মহাত্মা গান্ধী, সত্যসাঁই বাবা, স্বামী ভক্তিবেদান্ত প্রমুখকেও অবতাররূপে বিবেচনা করা হয়। অনেকে যিশুখ্রিষ্ট ও মোহাম্মদ (সা.)-কেও অবতার হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন।

**অবতার নাচ** ফরিদপুর অঞ্চলে প্রচলিত এক রকম উৎসবনৃত্য। চড়ক ও গম্ভীরা উৎসবের সময় মন্ত্রপূত মুখোশ পরে এই নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এতে সাংকেতিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের দশ অবতারের রূপ তুলে ধরা হয়।

**অবধূত** যোগসাধনায় বিশ্বাসী বিশেষ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। ভিক্ষা করে জীবনধারণ এবং লোকালয়ের বাইরে বৃক্ষতলে বাস অবধূতদের বৈশিষ্ট্য। চৈতন্যের সহচর নিত্যানন্দ অবধূত ছিলেন। অবধূতদের মতে বর্ণাশ্রম, শাস্ত্র বা তীর্থ মোক্ষলাভের সহায়ক নয়।

**অবলোকিতেশ্বর** বৌদ্ধ মহাযানী সম্প্রদায়ের প্রধান বোধিসত্ত্ব। ধারণা করা হয়, গৌতমবুদ্ধের তিরোধান ও মৈত্রেয়ী বুদ্ধের আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর কাজ মানুষকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে চারদিক অবলোকন করা। অবলোকিতেশ্বর কথাটার উদ্ভব এ থেকেই। তিনি জ্ঞান ও করুণার প্রতিমূর্তি। নির্বাণ মুহূর্তে প্রাণীদের আর্তনাদ শুনে তিনি নির্বাণ-সংকল্প ত্যাগ করেন এবং সর্বপ্রাণীর দুঃখ-নিবৃত্তির প্রতিজ্ঞা নেন। তাঁর দক্ষিণ হস্ত বরদানের ভঙ্গিতে উত্থিত ও বাম হাতে ধৃত লাল পদ্ম। অবলোকিতেশ্বরের আরেক নাম তাই পদ্মপাণি। শতাধিক রূপে তাঁকে কল্পনা করা হয়।

**অবিদ্যা** কোনো কোনো উপনিষদে বলা হয়েছে, 'অবিদ্যা কেবল প্রয়োজনীয় বিদ্যার অভাব নয়, বরং এ এমন এক অবস্থা যা মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং তার মুক্তি ব্যাহত করে। অবিদ্যায় নিমজ্জিত ব্যক্তিরা নিজেদের জ্ঞানী ভাবেন কিন্তু আসলে অমরতীর্থে তাঁদের যাতায়াত, যেখানে অন্ধরা অন্ধদের পথ দেখায়। অবিদ্যার অশুভ পরিণতি থেকে রেহাই পেতে হলে অবিদ্যা ও বিদ্যার পার্থক্য বিচার করতে হবে। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাকে একসঙ্গে জানেন, তিনি মৃত্যুকে লঙ্ঘন করেন অবিদ্যা দ্বারা এবং অমরত্ব অর্জন করেন বিদ্যা দ্বারা।'

প্রাচীন শ্রৌত সাহিত্যে অবিদ্যা বলতে বিদ্যার অভাবকে বোঝাত, যা ধর্মীয়, নৈয়ায়িক ও নৈতিক কর্তব্যপালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যেমন বিশ্বাস ছিল, শব সৎকারের যথাযথ রীতিনীতি পালিত না হলে মৃতের অকল্যাণকর পুনর্জন্ম ঘটবে। নির্দিষ্ট প্রথাপালনে বিদ্যা বা জ্ঞানের যে প্রয়োজন তার তুলনা করে বলা হয়েছে, বিদ্যা ছাড়া

যদি কেউ অগ্নিকুণ্ড যজ্ঞ করে, তবে তা হবে জ্বলন্ত অঙ্গার সরিয়ে দিয়ে ভস্মের ওপর নৈবেদ্য ঢালা। অবিদ্যাকে জয় করা ব্রাহ্মণদের বিশেষ দায়িত্ব। পূজা-অর্চনা ও কর্তব্য পালন ছাড়া ব্রাহ্মণদের নিজেদের জীবিকা উপার্জনের জন্যও জ্ঞানের প্রয়োজন। অবিদ্যা অপূর্ণ এবং তা প্রত্যক্ষভাবে মোক্ষলাভে সহায়তা করে না, পক্ষান্তরে বিদ্যা অমরতা লাভে সহায়ক। অনন্ত ও অক্ষয় ব্রহ্মার মধ্যে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই নিহিত রয়েছে। অবিদ্যা মরণশীল এবং বিদ্যা অমর। যিনি উভয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি ঊর্ধ্বে গমন করতে সক্ষম।

**অভয়াকর গুপ্ত** একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বৌদ্ধ পণ্ডিত। তিনি রাজা রামপালের বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন। বজ্রাসন, নালন্দা ও দন্তপুর বিহারে মহাযানী পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। পরে তিনি বিক্রমশীল বিহারের সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি ২০টি বজ্রযান গ্রন্থের রচয়িতা, যার মধ্যে চারটি সংস্কৃত। তিব্বতি ভাষায় তাঁর বহু গ্রন্থ অনূদিত হয়। তিনি তিব্বতে 'পাঞ্চেনরিন পৌছেই' অর্থাৎ রাজগুণালংকৃত লামা হিসেবে অভিহিত হন।

**অভিধম্ম কোষ** পুরুষপুরের বৌদ্ধ পণ্ডিত ও দার্শনিক বসুবন্ধু বিরচিত বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত পুঁথিটি পাওয়া যায়নি। ব্যাখ্যা ও চীনা অনুবাদ থেকেই বর্তমানে বইটি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। ৮ খণ্ডে ও ৬০০ কারিকায় রচিত এই গ্রন্থে বসুবন্ধু বৌদ্ধধর্মের প্রায় সব বিষয়েরই আলোচনা করেছেন। শেষ অধ্যায়ে 'আত্মা' সম্পর্কে বৌদ্ধ মতবাদের একটি আলোচনা আছে। প্রধানত সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধদের জন্য রচিত হলেও *অভিধম্ম কোষ*-এর দার্শনিক উৎকর্ষের জন্য তা সব সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধদেরই একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।

**অভিনন্দ** কবি। তিনি গৌড়ের অধিবাসী ছিলেন। *রামচরিত* তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। পিতা শতানন্দও ছিলেন সংস্কৃত কবি। শতানন্দের *উদয়সুন্দরীকথা* থেকে জানা যায়, অভিনন্দ পালবংশীয় যুবরাজ হরবর্ষের সভাকবি ছিলেন। হরবর্ষ ও রাজা দেবপালকে কেউ কেউ অভিন্ন মনে করেন। চল্লিশ সর্গে বিভক্ত *রামচরিত*-এর প্রথম ৩৬টি সর্গ রচনা করেন অভিনন্দ এবং অবশিষ্ট চারটির রচয়িতা জনৈক ভীম। অভিনন্দ ন্যায়শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন।

**অভেদানন্দ, স্বামী** বেদান্ত পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী। ১৮৬৬ সালের ২ অক্টোবর তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃত নাম কালীপ্রসাদ চন্দ্র। যৌবনে রেভা ম্যাকডোরেল্ড, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সান্নিধ্যে তিনি খ্রিষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন। পরে কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতার বক্তৃতা এবং বিশিষ্ট দার্শনিক শশধর তর্কচূড়ামণির ষড়্‌দর্শনের আলোচনা শুনে তিনি হিন্দুদর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশের কাছে তিনি পতঞ্জলির যোগসূত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৪ সালে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্য লাভ করেন। অতঃপর ১৮৮৬ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে তিনি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে ১৮৯৬ সালে তিনি ইংল্যান্ড যান। সেখানে পল ডয়সন, ম্যাক্স মুলার প্রমুখ ভারত-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ইংল্যান্ডে তিনি রাজযোগ, জ্ঞানযোগ ও বেদান্ত সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি আমেরিকা যান ও সেখানে নিউ ইয়র্কের বেদান্ত আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকো, জাপান, হংকং প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণকালে এসব দেশে তিনি হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় দর্শন প্রচার করেন। ১৯২১ সালে হনলুলুতে অনুষ্ঠিত প্যান প্যাসিফিক শিক্ষা সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯২২ সালে কাশ্মীর হয়ে তিব্বত যাওয়ার পথে লামাদের বৌদ্ধমন্দির হেমিসগুম্ফায় তিনি যিশুখ্রিষ্টের অজ্ঞাত জীবনীর অংশ উদ্ধার করেন। তাঁর এই মূল্যবান আবিষ্কার পরে *কাশ্মীর ও তিব্বতে* গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ সালে কলকাতায় ফিরে তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি' এবং ১৯২৪ সালে দার্জিলিংয়ে 'শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৯ সালের ৮ সেপ্টেম্বর দার্জিলিংয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

**অমরাবতী** স্বর্গের অন্যতম নাম। ইন্দ্রের রাজধানী। বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত অমরাবতী দেবতাদের

আবাসভূমি। এটি সুমেরু পর্বতের ওপর অবস্থিত। সেখানে জরা, ব্যাধি, শোক, তাপ ও মৃত্যু নেই। সেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান। সেখানকার নন্দনকাননে মন্দার, পারিজাত, সন্তানক, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন—এই পাঁচটি প্রসিদ্ধ বৃক্ষ রয়েছে। অলকানন্দা নদী এই অমরাবতীর ভেতর দিয়েই প্রবাহিত। অমরাবতীতে রয়েছে সুরভি গাভি, ঐরাবত হস্তী ও উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব। অপ্সরা, গন্ধর্ব ও বিদ্যাধরেরা নৃত্যগীতাদিতে অমরাবতীকে মুখরিত রাখেন।

**অমাবস্যা** কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি। অথর্ববেদে অমাবস্যাকে দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোয় উল্লেখিত সিনীবালী ও কুহু নামক দেবীদ্বয় অমাবস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। অমাবস্যায় আচরিত অনুষ্ঠানগুলো চন্দ্রসংক্রান্ত বিবিধ প্রাচীন বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অমাবস্যা প্রধানত কৃষ্ণপক্ষ শিব এবং দেবীকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত। এ ছাড়া তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের জন্যও অমাবস্যাকে প্রশস্ত গণ্য করা হয়।

**অমিতাভ** পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধের অন্যতম। ধ্যানী বুদ্ধদের মধ্যে তাঁর স্থান চতুর্থ। মহাযানী বিশ্বাস অনুযায়ী বর্তমান কালটি অমিতাভের কাল। এর আগে আরও তিন ধ্যানী বুদ্ধ যথাক্রমে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, ও রত্নসম্ভার গত হয়েছেন। অমিতাভের বাহন জোড়া ময়ূর এবং প্রতীক হলো পদ্ম। ভারতবর্ষ, চীন ও তিব্বতে তাঁর অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে। এসব মূর্তি বা প্রতিমায় তাঁকে কোলের ওপর হাতের এক তালুতে অপর তালু রেখে সমাধি মুদ্রায় আসীন দেখা যায়। চীন, ভারতসহ প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অমিতাভের প্রচার থাকলেও জাপানেই তাঁর বেশি প্রভাব লক্ষ করা যায়।

**অমৃত** স্বর্গীয় পানীয়, যা পান করলে অমরত্ব লাভ করা যায়। পৃথু-রাজার উপদেশে ধরিত্রীকে গাভি ও ইন্দ্রকে বৎস করে দেবতাদের দ্বারা হিরণ্ময় পাত্রে দুগ্ধ দোহন করা হয় এবং তাতেই অমৃত উৎপন্ন হয়। দুর্বাসার অভিশাপে ওই অমৃত সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়। পরে সমুদ্রগর্ভ থেকে অমৃত আহরণ করা হয়। মহাভারতে বলা হয়েছে, অসুরদের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধে হীনবল হয়ে দেবতারা বিষ্ণুর কাছে অমরত্ব প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু তখন কূর্মরূপ ধরে দেবতাদের সমুদ্রমন্থনে সহায়তা করেন। মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকী সর্পকে মন্থনরজ্জুরূপে ব্যবহার করে সমুদ্রগর্ভ থেকে অমৃত আহরণ করা হয়।

**অম্বপালী বা আম্রপালী** বুদ্ধের শিষ্যা ও রাজনর্তকী। বৈশালীর রাজোদ্যানে তাঁর জন্ম। আমবাগানের মালি তাঁকে কন্যার মতো লালনপালন করায় তাঁর নাম হয় অম্বপালী বা আম্রপালী। তিনি অনিন্দ্যসুন্দরী ও রূপ-লাবণ্যবতী ছিলেন। বিভিন্ন দেশের রাজকুমারদের দেওয়া বিবাহপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি সভা-নর্তকীর পেশা গ্রহণ করেন এবং প্রচুর সম্পদ ও প্রতিপত্তির অধিকারিণী হন। একদা বৈশালীর উদ্যানে বুদ্ধকে দেখে অম্বপালী মুগ্ধ হন ও তাঁর কাছে ধর্মোপদেশ লাভ করেন। কথিত আছে যে, লিচ্ছবিরাজের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বুদ্ধ এই বারবনিতার ঘরেই নানা উপচারে ভোজন করেছিলেন। অম্বপালী বুদ্ধ ও ভিক্ষু সংঘকে একটি বিহার দান করেন। আপন পুত্রকে তথাগতের ধর্ম প্রচার করতে দেখে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। তিনি দৈহিক ও পার্থিব সকল বস্তুর নশ্বরত্ব উপলব্ধি করেন এবং অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। পালি পদ্যগ্রন্থ *থেরী গাথায়* অম্বপালীর জীবনদর্শন বর্ণিত রয়েছে।

**অম্বুবাচী** হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশেষ লোক-উৎসব। আষাঢ় মাসের সাত তারিখ থেকে তিন দিন এটি পালিত হয়। মনে করা হয়, এ তিন দিন আকাশ ও পৃথিবীর মিলন হয় এবং তাতে ধরিত্রী সিক্ত হয়ে কৃষিকাজের উপযোগী হয়। এ সময় ভূমিতে হাল দেওয়া বা মাটি খোঁড়া নিষেধ। হিন্দু মহিলারা এ সময় নানা ধরনের আচার পালন করেন। বিধবাদের কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। এ উপলক্ষে পিঠা-পুলির মতো বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয়।

**অরন্ধন** হিন্দু লোকাচার। বিশেষ দিনে রান্নাবান্না বন্ধ রাখাকে বলা হয় অরন্ধন। শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে, কার্তিক-সংক্রান্তির দিন, শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন, দশহরা, শ্রাবণ-সংক্রান্তি, সরস্বতী বা গঙ্গাপূজার

পরের দিন প্রভৃতিতে এই প্রথা পালন করা হয়। স্বদেশি আন্দোলনের শুরুতে বঙ্গব্যবচ্ছেদে দুঃখ প্রকাশ করে আশ্বিন-সংক্রান্তিতেও অরন্ধন পালিত হয়। অরন্ধনে আগের দিন রাত্রে রান্না করা খাদ্যদ্রব্য পরের দিন খাওয়া হয়। অঞ্চলভেদে আচারটির নাম কোথাও রান্নাপূজা আবার কোথাও গোটাসিদ্ধ খাওয়া, ঢেলাফেলা, পান্তাপালা প্রভৃতি। আঞ্চলিক ভাষায় অরন্ধনকে আরন্দও বলা হয়। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে যে অরন্ধন হয় তাকে 'বুড়ি-আরন্দ' এবং অন্যান্য দিনের অরন্ধনকে 'ইচ্ছা-আরন্দ' বলে। অরন্ধনের দিন গৃহিণীরা উনুনের ভেতরে ও বাইরে আলপনা দেন এবং ঘরে ঘরে মনসাপূজা করেন।

**অরবিন্দ ঘোষ** (১৮৭২-১৯৫০) ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা, যোগী ও দার্শনিক। তিনি শৈশবে ইংল্যান্ডে যান এবং লন্ডন ও কেমব্রিজে শিক্ষা লাভ করেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েও তিনি চাকরিতে যোগ দিতে পারেননি। পরে তিনি বরোদা কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেন। তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিপ্লববাদী আন্দোলনে অংশ নেন এবং একপর্যায়ে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। বিপ্লবী কাজে অংশ নেওয়ার দায়ে তাঁকে কারাভোগ করতে হয়। কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পর তিনি অধ্যাত্মসাধনায় নিমগ্ন হন। এ সময় তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচারেও ব্রতী হন। তিনি ইংরেজি সাপ্তাহিক *কর্মযোগিন* ও বাংলা সাপ্তাহিক *ধর্ম* সম্পাদনা করেন। 'আর্য' নামক একটি ইংরেজি সাময়িকপত্রেও অরবিন্দ তাঁর অধ্যাত্ম দর্শন ও সাধনা সম্পর্কে অনেক রচনা প্রকাশ করেন। পন্ডিচেরিতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তিনি অনেককে দীক্ষা দেন। দেশ-বিদেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজি ভাষায় অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে *The Life Divine, Essays on the Gita, Lights on Yoga* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

**অরুন্ধতী** মহামুনি বশিষ্ঠের পত্নী। কর্দম মুনির ঔরসে দেবাহুতির গর্ভে তাঁর জন্ম। পতিব্রত্যের উচ্চতম আদর্শ স্থাপনের পুণ্যফলে তিনি স্বামীর সঙ্গে নক্ষত্রলোকে গমন করেন। সেই জন্য সপ্তর্ষিমণ্ডলে বশিষ্ঠের পাশে অরুন্ধতীকে দেখা যায়। প্রচলিত বিশ্বাস হলো, যার পরমায়ু শেষ, সে ওই নক্ষত্র দেখতে পায় না। নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখানো হয়। অরুন্ধতীর পতিব্রত্যের আদর্শে নববধূ যাতে পুণ্যবতী হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

**অর্কব্রত** ব্রতবিশেষ। সূর্যদেবতার সন্তুষ্টির জন্য সাধারণত মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত পালন করা হয়।

**অর্ঘ্য** পূজার উপচার। হিন্দু পূজারীতি অনুসারে যেকোনো পূজায় দেবতার উদ্দেশে কিছু সামগ্রী নিবেদন করতে হয়। মঙ্গল্যসূচক এমন আটটি দ্রব্য বা সামগ্রী হলো : জল, দুধ, কুশাগ্র, দই, ঘি, আতপ চাল, যব ও সাদা সরষে।

**অর্জুন** তৃতীয় পাণ্ডব। পাণ্ডুপত্নী কুন্তির গর্ভে ইন্দ্রের ঔরসে তাঁর জন্ম। কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্যের কাছে তিনি ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেন। দ্রুপদরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করে তিনি তাঁকে দ্রোণের কাছে হাজির করেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করে তিনি দ্রৌপদীকে লাভ করেন এবং মাতার আদেশে অপর চার ভ্রাতাসহ তাঁকে বিয়ে করেন। ঘটনাচক্রে অর্জুনকে ব্রহ্মচর্য পালনের অংশ হিসেবে দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করতে হয়। এ সময় তিনি পরশুরামের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং নাগকন্যা উলুপী ও মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করেন। উলুপীর গর্ভে অর্জুনের এক পুত্র ইরাবান এবং চিত্রাঙ্গদার গর্ভে আরেক পুত্র বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। পরে তিনি দ্বারকা ভ্রমণে গেলে সেখানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তিনি তাঁর বোন সুভদ্রাকে হরণ করে বিয়ে করেন। সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। একবার কিরাত বেশধারী মহাদেবের সঙ্গেও তাঁর যুদ্ধ হয়, যদিও পরে মহাদেবের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে তিনি তাঁকে পূজায় সন্তুষ্ট করেন। মহাভারতের যুদ্ধে তিনি ছিলেন পাণ্ডবপক্ষের প্রধান সেনাপতি। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর রথের সারথি ও উপদেষ্টা। যুদ্ধে ভীষ্ম, কর্ণসহ কৌরবপক্ষের অধিকাংশ সৈন্যকে তিনি বধ

করেন। পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার অর্পণ করে অর্জুন দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন। কিন্তু হিমালয় পার হওয়ার পর দ্রৌপদী, মহাদেব ও নকুলের পতন ঘটলে তা দেখে অর্জুনেরও মৃত্যু হয়। অর্জুনের অনেকগুলো নাম, যেমন: ধনঞ্জয়, শ্বেতবাহন, সব্যসাচী, কিরীটী, পার্থ প্রভৃতি।

**অর্ফিয়ুস** গ্রিক পুরাণে বর্ণিত গায়ক কবি। অ্যাপোলোর ঔরসে এবং ক্যাপাইওপির গর্ভে তাঁর জন্ম। তাঁর বীণার সুরে বনের পশুপাখি, তরুলতা, ঝরনা এমনকি শিলাস্তূপ পর্যন্ত বিমোহিত হতো। স্বর্ণমেষের চামড়া আনার জন্য তিনি আরগোনটদের সঙ্গে সমুদ্র অভিযানে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে তিনি বনদেবী ইউরিডাইসকে বিয়ে করেন। সর্পাঘাতে ইউরিডাইসের মৃত্যু হলে অর্ফিয়ুস শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার আশায় তিনি যমপুরীতে গমন করেন। সেখানে তিনি তাঁর বীণার সুরে পাতালরাজ হেডিস ও রানি পার্সিফোনকে মুগ্ধ করেন। তাঁরা শর্ত সাপেক্ষে অর্ফিয়ুসকে তাঁর স্ত্রী ইউরিডাইসকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। শর্তটি হলো, অর্ফিয়ুস আগে আগে যাবেন এবং ইউরিডাইস তাঁকে অনুসরণ করবেন, কিন্তু মর্তে না পৌঁছা পর্যন্ত অর্ফিয়ুস পেছনে ফিরে স্ত্রীর দিকে তাকাতে পারবেন না। তাঁরা যখন পাতালপুরীর প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন অর্ফিয়ুস ঔৎসুক্য চেপে রাখতে পারলেন না, পেছনে ফিরে স্ত্রীকে দেখতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইউরিডাইস অন্তর্হিতা হন। এরপর অর্ফিয়ুসের বাকি জীবন শোকাকুল ও উন্মাদ অবস্থায় কাটে। তিনি নারীবিদ্বেষী এবং আনন্দের দেবতা ডায়োনিসাসের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। শেষে ডায়োনিসাসের পূজারি একদল মহিলা তাঁকে হত্যা করে। তাঁর কর্তিত মস্তক সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলে ইউরিডাইসের নামোচ্চারণ করতে করতে তা ভেসে বেড়াতে থাকে। লেসবস দ্বীপের অধিবাসীরা সেই মস্তক উদ্ধার করে সমাহিত ও সেখানে অর্ফিয়ুসের নামে একটি মন্দির নির্মাণ করে।

**অর্হৎ** শব্দটির অর্থ যোগ্য, সম্মানীয় বা সিদ্ধিপ্রাপ্ত। বিশেষ অর্থে নির্বাণপ্রাপ্ত বা নির্বাণের অধিকারী বৌদ্ধ কিংবা জৈন সন্ন্যাসী। বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী যাঁরা পার্থিব জীবনের তৃষ্ণামুক্ত হয়ে ধর্মজীবনের পরম লক্ষ্য নির্বাণকে উপলব্ধি করেছেন, কেবল তাঁরাই অর্হৎ বলে গণ্য। অর্হৎ মাত্রই রাগ-দ্বেষ-মোহ প্রভৃতি রিপু দোষ এবং যাবতীয় জাগতিক কামনা-বাসনাদি থেকে মুক্ত। ধ্যান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে নির্বাণলাভের যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সর্বশেষ স্তর হলো অর্হৎ। নার-পুরুষনির্বিশেষে যেকোনো বয়সেই অর্হত্ব লাভ সম্ভব। বুদ্ধের সঙ্গে একজন অর্হতের পার্থক্য এই যে, বুদ্ধ এমন কিছু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, যা একজন অর্হতের আয়ত্তের বাইরে।

**অলকা** হিন্দু পুরাণে উল্লেখিত সুরম্য নগর। যক্ষরাজ কুবেরের রাজধানী। এটি কৈলাস পর্বতের ওপর অলকানন্দা নদীতীরে অবস্থিত। গন্ধর্বদের আবাসস্থল।

**অলক্ষ্মী** দুর্ভাগ্যের দেবী। লক্ষ্মীর বড় বোন। সমুদ্র মন্থনকালে তিনি রক্তমাল্য ও রক্তকমলে ভূষিতা হয়ে সমুদ্র থেকে উত্থিত হন। দেবাসুরের মধ্যে কেউ তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হননি। শেষে দুঃসহ নামে একজন মুনি অলক্ষ্মীকে বিয়ে করলেও পরে তিনিও তাঁকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি দ্বিভুজা, গর্দভপৃষ্ঠারূঢ়া, কৃষ্ণবর্ণা ও লৌহ অলংকারে বিভূষিতা। কাঁকরের চন্দনে তাঁর সর্বাঙ্গ লিপ্ত এবং তাঁর এক হাতে সম্মার্জনী। অন্য মতে, স্থূলবদনা, শুভ্রদর্শনা, রক্তনয়না ও রুক্ষপিঙ্গলকেশী অলক্ষ্মীকে উদ্দালক মুনি বিয়ে করেন। কিন্তু অলক্ষ্মী মহর্ষির আশ্রমে প্রবেশ না করে বলেন, যেখানে পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হয় সেখানে তিনি থাকেন না, বরং তিনি সেখানেই থাকেন যেখানে সর্বদা পাপানুষ্ঠান হয়।

**অলক্ষ্মী বিদায়** হিন্দু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। দুর্ভাগ্য বা অশুভের প্রতীক অলক্ষ্মীকে বিদায় করে সৌভাগ্য বা মঙ্গলের প্রতীক লক্ষ্মীকে বরণ করার অনুষ্ঠান। দীপাবলির দিন সন্ধ্যায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু রমণীরা এই আচার পালন করেন। এ উপলক্ষে গোবর দিয়ে অলক্ষ্মীর এবং পিটুলি দিয়ে লক্ষ্মী, কুবের ও নারায়ণের মূর্তি তৈরি করা হয়। তারপর কলার ডোঙার ওপর অলক্ষ্মীর মূর্তি স্থাপন করে উঠোনের এক কোণে রেখে তার পূজা করা

হয়। পূজা শেষে মূর্তিটি রাস্তার তেমাথায় নিয়ে যাওয়া হয়। ছোট ছোট মেয়েরা এ সময় কুলা পেটাতে পেটাতে বড়দের সঙ্গে যায়। তেমাথায় অলক্ষ্মীর মূর্তি ফেলার সময় সবাই মিলে ধ্বনি তোলে : 'লক্ষ্মী আয়, অলক্ষ্মী যা'। পরে ঘরে ফিরে গৃহিণীরা লক্ষ্মীর পূজা করেন।

**অলি** আরবি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ অভিভাবক। যদিও অলি বলতে সাধারণত অধ্যাত্মসাধক বা দরবেশকে বোঝায়। সুফিবাদে অলি বলতে শুধু কামিল দরবেশকেই বোঝানো হয়ে থাকে, যদিও অলিদের মর্যাদারও তারতম্য আছে। সুফিদের মতে, অলি হতে হলে শরিয়ত ও তরিকত ধারায় ব্যুৎপত্তি ও অনুশীলন অপরিহার্য। শরিয়ত ও তরিকত উভয়ই পালন করে যিনি মারিফত ও হকিকত লাভ করেন তিনিই হচ্ছেন যথার্থ ওলি। যিনি আল্লাহভীরু এবং আল্লাহর উপদেশ-নির্দেশ যথাযথভাবে মেনে চলেন তিনিই ওলি। কোনো কোনো সময় আল্লাহর কৃপায় তাঁর কেরামত প্রকাশ পায়, যদিও তিনি তা গোপন রাখতেই সচেষ্ট থাকেন। সাধনার দ্বারা পুরুষের মতো স্ত্রীলোকও অলি হতে পারে। সুফিদের বিশ্বাস, আল্লাহর পৃথিবীতে সব সময়ই অলি বিরাজমান। সব অলি নিজেকে প্রকাশ করেন না। কেউ কেউ অজ্ঞাতবাসে থাকতে পছন্দ করেন। তরিকতপন্থীদের অনেকে মনে করেন বিশ্বের আধ্যাত্মিক প্রশাসনের দায়িত্ব অলিদের ওপর ন্যস্ত। বাংলাদেশের অলি ও আউলিয়ারা বেশির ভাগই চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া তরিকার অনুসারী। কালব বা আত্মার উন্নতিকল্পে ওলিরা জিকির, নির্জনতা, মুরাকাবা, তওবা ও তাওয়াক্কুলের ওপর জোর দেন। আধ্যাত্মিক সমুন্নতি অনুযায়ী অলিদের স্তরভেদ আছে। সর্বশ্রেষ্ঠ অলি যিনি তিনি হচ্ছেন গাওস, তাঁর পরের স্থান যাঁর তিনি কুতুব। আবদুল কাদের জিলানিকে এ দেশে অনেকে গাওসুল আজম বলে শ্রদ্ধা করেন।

**অশোক** মৌর্য বংশের রাজা (২৭৩-২৩২ খ্রিষ্টপূর্ব)। মগধাধিপতি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও বিন্দুসারের পুত্র। কথিত আছে যে আপন ভ্রাতাদের হত্যা করে তিনি সিংহাসনে বসেন। ইতিহাসে তিনিই প্রথম রাজা বা সম্রাট, যিনি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানকে একই সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করার সময় যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতিদৃষ্টে তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটে। উপগুপ্ত নামক এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ এবং শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। অশোক জীবহত্যা নিষেধ, সব ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং মানুষ ও প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শনের কথা বলেন। সাম্রাজ্যের নানা স্থানে তিনি পুকুর ও কূপ খনন, সড়ক ও পান্থশালা নির্মাণ এবং মানুষ ও প্রাণীদের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি আপন সাম্রাজ্যের বাইরে ম্যাসিডোনিয়া, সিরিয়া ও আফ্রিকায় পর্যন্ত দূত পাঠান। পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘামিত্রাকেও তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারে নিয়োগ করেন। গিরি ও স্তম্ভে উৎকীর্ণ তাঁর অনুশাসনমালা ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে পাওয়া গেছে। কথিত আছে, বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত এমন ৮৪ হাজার স্থানে তিনি চৈত্য বা স্তূপ নির্মাণ করেন। জীবনসায়াহ্নে অশোক ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। প্রজাহিতৈষী একজন শ্রেষ্ঠ শাসকের আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হয় তাঁকে।

**অশোক ফুল ও বৃক্ষ** ফুল ও বৃক্ষবিশেষ। অশোক ফুল গাঢ় লাল রঙের এবং তা মাঙ্গল্যের প্রতীক। অশোকপত্র দুর্গাপূজা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত কলাবৌ বা নবপত্রিকার অন্যতম উপকরণ। পঞ্চবটীর পাঁচ বৃক্ষের একটি। তপস্যাস্থল হিসেবে পঞ্চবটী নির্মাণে বেদির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অশোক বৃক্ষ স্থাপনের বিধান আছে। বৃহৎ পঞ্চবটী নির্মাণ করতে হলে বেদির চারপাশে বৃত্তাকারে পঁচিশটি অশোকগাছ রোপণ করতে হয়। অশোক ফুল লক্ষ্মী, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেব-দেবীর পূজায় লাগে। কামদেবের পঞ্চবাণের অন্যতম এই ফুল। যুবতীদের পদাঘাতে যা বিকশিত হয়। এই ফুল থেকে তৈরি ওষুধ স্ত্রীরোগে ব্যবহৃত হয়।

**অশোকবন** রামায়ণ অনুসারে লঙ্কায় অবস্থিত রাবণের প্রমোদোদ্যান। কথিত আছে, অশোকগাছ-বেষ্টিত এই উদ্যানে প্রবেশ করলে

সব শোক দূরীভূত হয়। লঙ্কারাজ রাবণ পঞ্চবটী বন থেকে সীতাকে হরণ করে লঙ্কার অশোকবনে লুকিয়ে রাখেন। সীতার সন্ধান পাওয়ার পর হনুমান অশোকবন ধ্বংস করেন।

**অশোকষষ্ঠী** ব্রতবিশেষ। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীর দিন সন্তানের মঙ্গল কামনায় হিন্দু নারীরা এই ব্রত পালন করে থাকেন। সারা দিন উপোস করে সন্তানের মা ছয়টি অশোক ফুলের কুঁড়ি মুগ ও দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দাঁতে না লাগিয়ে গিলে ফেলেন। মনে করা হয়, এই ব্রত পুত্রবিয়োগের শোক থেকে মাকে রক্ষা করে।

**অশোকাষ্টমী** চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমী। এই তিথিতে হিন্দু নরনারীরা ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করে থাকেন। একে অষ্টমী স্নানও বলা হয়। নারায়ণগঞ্জ জেলার লাঙ্গলবন্দ গ্রামে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে প্রতিবছর অশোকাষ্টমী তিথিতে মেলা বসে। অশোকাষ্টমীতে অশোক কলিকা বা কুঁড়ি দ্বারা রুদ্র অর্চনা এবং শোকমুক্তি কামনায় স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই আটটি করে অশোককলিকা পানের বিধান আছে।

**অশৌচ** শব্দটির অর্থ অশুচি বা অপবিত্রতা। মাতাপিতা বা স্বামীর মৃত্যুর পর এক বছর পর্যন্ত পুত্র বা স্ত্রীর অশৌচকাল। অশৌচকালে ধর্মীয় কৃত্যাদি পালন নিষিদ্ধ। রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্ব অনুযায়ী আত্মীয়তার ধরন অনুসারে এবং ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে অশৌচকাল এক মাস, ১১ দিন, ১০ দিন, তিন দিন কিংবা মাত্র এক দিনও হয়ে থাকে। এ জাতীয় অশৌচকে কালাশৌচ বলে। কালাশৌচে বিয়ে, পাদুকা, ছাতা, পালক, কাষ্ঠাসন, মালা ও মৈথুন বর্জনীয়। ক্ষৌরকর্ম ও মাছ-মাংস আহারও নিষিদ্ধ। যার অশৌচ হয়েছে তার তৈরি অন্নও গ্রহণযোগ্য নয়। এ ছাড়া দেহের কোনো অংশে রক্তপাত হলে এক দিনের ক্ষতাশৌচ পালনের নিয়ম আছে। স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতুস্রাবকে রজঃস্বলাশৌচ বলে। তখন তিন থেকে চার দিন মৈথুন এবং ধর্মীয় ও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ কাজ নিষিদ্ধ।

**অশ্বঘোষ** সংস্কৃত ভাষার বিশিষ্ট কবি ও বৌদ্ধ দার্শনিক। মহাযান সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলে খ্যাত। তাঁর জন্ম প্রথম শতাব্দীর শেষদিকে অযোধ্যার সাকেত নামক স্থানে (বর্তমানে যা অযোধ্যা নামে পরিচিত) এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। মৈত্রী, করুণা ও বুদ্ধভক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর দর্শনের ভিত্তিতেই প্রধানত মহাযান মতবাদের সূত্রপাত হয়। তাঁর তিব্বতি জীবনীকারের মতে, তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ও গীতিকার। কুষাণ-সম্রাট কনিষ্কের তিনি সভাকবি ছিলেন। মনে করা হয়, তাঁর প্রভাবেই কনিষ্ক বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন। হিউ এন সাংয়ের লেখায় অশ্বঘোষের উল্লেখ আছে। চীনে তিনি মা-মিং নামে পরিচিত। তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ১৭ সর্গে সমাপ্ত *বুদ্ধচরিত*। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *সৌন্দরানন্দ*ও বুদ্ধজীবনের কয়েকটি ঘটনা অবলম্বনে রচিত। এ ছাড়া তাঁর বিখ্যাত রচনার মধ্যে রয়েছে নাটক *শারিপুত্র প্রকরণ*। পৃথিবীর বহু ভাষায় এ পর্যন্ত বহুবার তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে।

**অশ্বত্থ** বৃক্ষবিশেষ। ডুমুর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের কাছে পবিত্র বলে গণ্য। হিন্দু পুরাণমতে, অশ্বত্থ বৃক্ষ বিষ্ণুর প্রতিরূপ। ভগবদ্‌গীতায় উল্লেখ রয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, 'সকল বৃক্ষের মধ্যে আমাকে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলে জানবে।' এ গাছের কাঠ ব্যবহার করা নিষেধ, এমনকি এর পাতা ছিঁড়লেও অকল্যাণ হতে পারে বলে হিন্দুদের বিশ্বাস। তাদের মতে, অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল বাঁধিয়ে দিলে এবং বৈশাখ মাসে তাতে পানি ঢাললে মহাফল লাভ হয়। পূজায় ঘটের পঞ্চপল্লবের মধ্যে অশ্বত্থ পাতাও থাকে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে অশ্বত্থ ও বটের বিবাহ অনুষ্ঠানকে হিন্দুরা একটি পূণ্যকর্ম হিসেবে বিবেচনা করে। গৌতম বুদ্ধ একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে ধ্যান করেই বোধি বা জ্ঞান লাভ করেছিলেন। অশ্বত্থকে তাই বোধিদ্রুম বা জ্ঞানবৃক্ষও বলা হয়।

**অশ্বত্থামা** মহাভারতের চরিত্র। দ্রোণাচার্যের পুত্র। জন্মেই উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের মতো রব করায় তাঁর ওই নাম। পিতার কাছ থেকে তিনি অস্ত্রশিক্ষা এবং ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র লাভ করেন। অতঃপর দ্বারকায় গিয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে সেই অস্ত্রের

বিনিময়ে সুদর্শন চক্র প্রার্থনা করেন। কিন্তু সুদর্শন চক্র উত্তোলনে ব্যর্থ হয়ে তাঁকে অধোবদনে ফিরে আসতে হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পিতার সঙ্গে মিলে তিনি দুর্যোধনের পক্ষাবলম্বন করেন। যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যকে সংহার করলে ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা পাণ্ডবনিধনের জন্য নারায়ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করেন, কিন্তু কৃষ্ণের কৌশলে তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর পাণ্ডবদের বিনাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি কৌরবপক্ষের সেনাপতি হন। মাতুল কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে সঙ্গে করে রাতের বেলা তিনি গোপনে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করেন এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, অগণিত সৈন্য হস্তী ও অশ্ব নিধন করেন। পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি তখন শিবিরে না থাকায় বেঁচে যান। পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদীর কথায় ভীম অশ্বত্থামাকে হত্যা করতে বেরিয়ে পড়েন। যুধিষ্ঠির ও অর্জুনও তাঁকে অনুসরণ করেন। কিন্তু গঙ্গাতীরে এসে তাঁরা দেখেন, অশ্বত্থামা ঋষিদের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। পাণ্ডবদের আক্রমণের মুখে অশ্বত্থামা একটি ঈষিকা অস্ত্র নিক্ষেপ করলে অর্জুন অস্ত্র মোচন করেন। বিপর্যয়ের আশঙ্কায় নারদ ও ব্যাসদেব তখন উভয়কে অস্ত্র সংবরণ করতে বলেন। অর্জুন তা করলেও অশ্বত্থামা অস্ত্র সংবরণ না করে অর্জুনের পুত্রবধূ উত্তরার গর্ভে তা নিক্ষেপ করে। তাতে উত্তরার গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু হয়। কৃষ্ণ অবশ্য যোগবলে শিশুটিকে জীবন দান করেন। অশ্বত্থামা পরাজয় স্বীকার করে পাণ্ডবদের মণি দান করে বনবাসে যান। দ্রৌপদী সেই মণি যুধিষ্ঠিরের মাথায় পরিয়ে দিয়ে শোকমুক্ত হন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার একটি হাতির নামও ছিল অশ্বত্থামা। যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের হাতে অযুত পাণ্ডবসৈন্য নিহত হলে কৃষ্ণ দ্রোণাচার্যকে নিরস্ত্র ও যুদ্ধে বিরত করার জন্য একটি কৌশল বের করেন। অর্জুনকে তিনি পরামর্শ দেন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার নিহত হওয়ার সংবাদ প্রচার করতে। কিন্তু দ্রোণাচার্য সংবাদটি শুনেও তা বিশ্বাস করেন না। তিনি জানান, একমাত্র যুধিষ্ঠিরের মুখ থেকে শুনলেই তিনি কথাটা বিশ্বাস করবেন। যুধিষ্ঠির সত্যনিষ্ঠ, এমন মিথ্যা বলতে অস্বীকৃত হন। তখন কৃষ্ণের প্ররোচনায় ভীম পদাঘাতে ইন্দ্রবর্মার হস্তীটি নিধন করেন। যুধিষ্ঠির তখন বলেন, 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ'। কিন্তু 'অশ্বত্থামা হত' কথাটা তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলেন, পক্ষান্তরে 'ইতি গজঃ' কথাটা বলেন অনুচ্চ স্বরে। যুধিষ্ঠিরের মুখে কথাটা শোনার পর দ্রোণ অস্ত্র সংবরণ করেন। দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন খড়্গাঘাতে দ্রোণের শিরশ্ছেদ করেন। মিথ্যা ভাষণের জন্য যুধিষ্ঠিরকে মহাপ্রস্থানের পর নরকদর্শন করতে হয়।

**অশ্বমেধ যজ্ঞ** যজ্ঞবিশেষ। প্রাচীন ভারতে রাজারা পুত্র কামনায়, রাজ্য বিস্তারে কিংবা সম্রাট হিসেবে আপন সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এই যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন। সব ধরনের যজ্ঞের মধ্যে এটিকেই প্রধান হিসেবে গণ্য করা হতো। ৯৯টি যজ্ঞের পর একটি সুলক্ষণযুক্ত অশ্ব, যা দেখতে মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণ, যার মুখ সুবর্ণতুল্য, দুই পাশে অর্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন অঙ্কিত, পুচ্ছ বিদ্যুতের মতো প্রভাযুক্ত, উদর কুন্দ ফুলের মতো শ্বেতবর্ণ, হরিৎ বর্ণের চরণ, কর্ণ সিঁদুরের মতো রক্তিম, জিহ্বা প্রজ্বলিত অগ্নির মতো, চক্ষু সূর্যের মতো তেজস্কর, বেগবান ও সর্বাঙ্গ সুগন্ধযুক্ত, তার কপালে জয়পত্র বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হতো। রাজার সৈন্যরা সেই অশ্বের অনুগমন করত। এক বছর কাল সে অশ্ব যথেচ্ছ ভ্রমণ করত। অশ্বটি অন্য রাজ্যে প্রবেশ করলে সেই দেশের রাজাকে হয় বশ্যতা স্বীকার করতে নয়তো যুদ্ধ করতে হতো। অশ্বের অধিকারী রাজা অন্য সব রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারলে রাজচক্রবর্তী উপাধি লাভ করতেন। এক বছর পর অশ্বটি ফিরে এলে শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞ শুরু হতো। যজ্ঞে অশ্বটিকে বধ করে তার বক্ষস্থলের মেদ অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হতো। এই যজ্ঞের ফলে যজ্ঞকর্তার সর্বপ্রকার পাপক্ষয় এবং স্বর্গ ও মোক্ষলাভ হতো। এভাবে শত অশ্বমেধকারী রাজা ইন্দ্রত্ব লাভ করতেন। এ জন্য ইন্দ্রের এক নাম শতক্রতু। রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির দুজনেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

**অষ্টবজ্র** হিন্দু পুরাণে আটজন দেবতার প্রধান অস্ত্রগুলোকে একত্রে অষ্টবজ্র বলা হয়। ব্রহ্মার

অক্ষ, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল, ইন্দ্রের বজ্র, দুর্গার অসি, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড এবং কার্তিকের শক্তি—এই আটটি নিয়ে অষ্টবজ্র। এগুলোর মিলনে উর্বশী অশ্বজন্ম থেকে মুক্ত হন।

**অষ্টবসু** হিন্দু পুরাণমতে আট গণদেবতা। এঁরা হলেন ধর, ধ্রুব, সোম, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাষ ও দ্যু। ধর্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যা বসুর গর্ভে এঁদের জন্ম। এঁরা সকলেই ইন্দ্রের অনুচর। বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী—দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বাস্তু ও বিভাবসু—এই আটজনকে নিয়ে অষ্টবসু। বশিষ্ঠের ধেনু নন্দিনীকে হরণ করায় বসুরা বশিষ্ঠের অভিশাপে গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

**অষ্টাঙ্গিক মার্গ** আট অঙ্গের সমন্বয়ে বুদ্ধের প্রদর্শিত দুঃখমুক্তির উপায়। অঙ্গ আটটি হলো: ১. সম্যক দৃষ্টি—চার আর্যসত্য ও দ্বাদশ নিদানযুক্ত প্রতীচ্য-সমুৎপাদ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান; ২. সম্যক সংকল্প—কাম, হিংসা ও প্রতিহিংসাবিহীন নিষ্কাম, মৈত্রী ও করুণার সংকল্প; ৩. সম্যক বাক্য—মিথ্যা, কুৎসা, কূট ও বৃথা বাক্য থেকে বিরত থেকে সত্য, প্রিয়, মিষ্ট ও অর্থপূর্ণ বাক্য ব্যবহার; ৪. সম্যক কর্ম—প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার ও মাদক হতে বিরত থেকে সত্য, দয়া ও বদান্যতা প্রদর্শন এবং চরিত্রবান থাকার উপযোগী কর্ম; ৫. সম্যক জীবিকা—অসৎ উপার্জন পরিহার করে সৎ জীবিকা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করা; ৬. সম্যক উদ্যম—ইন্দ্রিয়সংযম ও কুচিন্তা পরিত্যাগ করে সুচিন্তা এবং তার স্থিতি ও বৃদ্ধির চেষ্টা; ৭. সম্যক স্মৃতি—ক্লেশ, বেদনা, চিত্ত ও মানসিক ভাবগুলোর প্রকৃত স্মৃতি এবং এসবের মালিন্য, ক্ষণভঙ্গুরতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে সদা সতর্ক থাকা; ৮. সম্যক সমাধি—কাম ও অমঙ্গল চিন্তা থেকে বিরত হয়ে চিত্তের একাগ্রতা সাধন।

**অষ্টাদশ পুরাণ** হিন্দু পুরাণ। এই ১৮টি পুরাণ হলো যথাক্রমে: ব্রহ্মা, পদ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রাহ্মণ্ড।

**অষ্টাবক্র** হিন্দু পুরাণে উল্লেখিত মুনি। মহর্ষি উদ্দালকের কন্যা সুজাতার গর্ভে ও তাঁর শিষ্য কহোড়ের ঔরসে জন্ম। মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই তিনি সর্ববেদজ্ঞ হয়ে ওঠেন। কিন্তু সেই গর্ভে থাকাকালীনই একদিন পিতার বেদপাঠ শুনে তার ভুল ধরায় পিতৃ-অভিশাপে তাঁর দেহের আটটি স্থান বক্র হয়ে যায়। এ জন্যই তাঁর নাম অষ্টাবক্র। অষ্টাবক্র জনক-রাজাকে পারত্রিক মঙ্গল সম্পর্কে যেসব উপদেশ দান করেন তারই সংকলন *অষ্টাবক্র-সংহিতা* নামে পরিচিতি লাভ করে।

**অসুর** অর্থাৎ সুর বা দেববিরোধী। দৈত্য বা দানব অর্থে ব্যবহৃত হয়। যদিও আদিতে অসুর বলতে দেবতা, বিশেষ করে ইন্দ্র, বরুণ ও অগ্নিকে বোঝাত। পরে এর অর্থ পরিবর্তিত হয়। ঋগ্‌বেদে ও অথর্ববেদে যারা দেবতাদের সঙ্গে বিরোধ করে, সমুদ্রমন্থনে যারা সুধা পায়নি, তাদেরকেই অসুর বলা হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণমতে, প্রজাপতির প্রাণবন্ত নিঃশ্বাস থেকে অসুরের জন্ম। তবে বিষ্ণুপুরাণ মতে, এদের জন্ম ব্রহ্মার জঙ্ঘা থেকে।

**অস্তি ও নাস্তি** উপস্থিত ও অনুপস্থিত, বিদ্যমান ও অবিদ্যমান; দুয়ের দ্বন্দ্ব বা পার্থক্য বিচার। খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে গ্রিক দার্শনিক পারমেনাইডস বলতেন, নাস্তির বিষয়ে কথা বলাটা বড় রকমের নির্বুদ্ধিতা, কারণ যা কিছু সম্পর্কে ধারণা করা বা কথা বলা যায় তা যুক্তিসংগতভাবে অস্তিত্বের জগতে বিদ্যমান। তিনি অস্তিত্বকে এক একক, চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল অবস্থা ভেবে অন্য সব বিষয়কে মায়া বা অলীক বলে চিহ্নিত করেন। প্লেটোর কাছে অস্তিত্ব হচ্ছে অপরিবর্তনশীল, গুরুত্বহীন আকার বা ভাব, এবং 'হওয়া' হচ্ছে সতত পরিবর্তনশীল ও অনুভূতিযোগ্য বাস্তব বিষয়। তাঁর মতে পরম আকার, ভালোর আকৃতি অস্তিত্বের বাইরে। 'নাস্তি'কে অনস্তিত্ব কিংবা চূড়ান্ত অধিবিদ্যামূলক বাস্তবতা হিসেবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

উত্তর আফ্রিকার বিশপ অগাস্টাইন অস্তি ও নাস্তির ব্যাপারে একটা নৈতিক দিকনির্দেশ দেন। তিনি ঈশ্বরের সব সৃষ্টিকে ভালো বলে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, মন্দ হচ্ছে সেই নাস্তি, যার জন্য ঈশ্বর দায়ী নন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে এবং তাওবাদে চরম বাস্তবকে প্রায়শ নাস্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নাস্তি এ ক্ষেত্রে পরম অনস্তিত্ব নয়, বরং সব

অস্তিত্বের মূল। মহাযান বৌদ্ধমতে, চূড়ান্ত বাস্তবতা হচ্ছে শূন্যতা, নির্বিশেষ শূন্যতা। হিন্দুধর্মে ব্রহ্মার প্রকাশ সীমিত নয় এবং চূড়ান্ত বাস্তবতা হিসেবে কোনো বিশেষ অস্তিত্বে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সকল অস্তিত্বের সমাহার। সেদিক থেকে ব্রহ্মাকে নাস্তি হিসেবে কল্পনা করা হয়। তাওবাদীরা মনে করেন, সকল অস্তিত্বের নামকরণ বা বর্ণনা করা যায় কিন্তু নাস্তি অবর্ণনীয়। পৃথিবীর সব বস্তু অস্তি থেকে শুরু, কিন্তু অস্তির সূত্রপাত এমন এক উৎসে, যার অস্তিত্ব নেই এবং যাকে নাস্তি বলা যায়।

**অহংবাদ** এই মতবাদের মূলকথা হলো, আত্মকল্যাণই মানুষের সব কাজ বা আচরণের উদ্দেশ্য বা প্রেরণা। এর বিপরীত ধারণাটির নাম পরার্থবাদ, যেখানে অপরের বা সকলের কল্যাণই মানুষের কর্মপ্রয়াসের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইংরেজ দার্শনিক হারবার্ট স্পেনসার সামাজিক সংযমের মাধ্যমে এই দুই মতবাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের কথা বলেছিলেন।

**অহল্যা** হিন্দু শাস্ত্রমতে ব্রহ্মার মানসকন্যা। সব ধরনের হল্য বা কদর্যতামুক্ত সুন্দরী বলে ব্রহ্মা তাঁকে নাম দেন অহল্যা। পরে ব্রহ্মা তাঁকে গৌতম ঋষির আশ্রয়ে রাখেন এবং তাঁর সঙ্গে বিয়ে দেন। একদিন গৌতমের অবর্তমানে ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধরে অহল্যার সঙ্গে সঙ্গম করেন। এতে রুষ্ট হয়ে গৌতম ইন্দ্রকে অভিশাপ দেন এবং তাতে ইন্দ্রের অণ্ড খসে যায়। পরে ইন্দ্রের অভিশাপে অহল্যা হাজার বছরের জন্য বায়ুভুক পাষাণে পরিণত হন। অবশেষে রামের পদস্পর্শে অহল্যা শাপমুক্ত হন।

**অহুর মাজদা** পারসিক দেবতা। প্রাচীন পারস্যবাসীরা ছিল অগ্নি-উপাসক। তাদের ধর্মে অনেক দেব-দেবীর স্থান ছিল। তার মধ্যে অহুর মাজদাই শ্রেষ্ঠ। পারসিক ধর্মের প্রচারক জরথুস্ত্র যখন একেশ্বরবাদ প্রচার করেন, তখন অহুর বা অহুর মাজদা একমাত্র সৃষ্টিকর্তারূপে পরিগণিত হন। তিনি শুভ বা মঙ্গলেরও দেবতা। অহুর মাজদা প্রজ্ঞাময় পরমেশ্বর (আধুনিক ফারসিতে 'হোরমাজাদ্')। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আর কোনো দেব-দেবীর অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। তাঁর বিপক্ষশক্তি হিসেবে অংগ্র-মৈন্যুকে (আধুনিক ফারসিতে 'অহরমিন') কল্পনা করা হয়, যে কিনা অসত্য ও অন্ধকারের প্রতীক। এ দুয়ের দ্বন্দ্বই হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চালিকা শক্তি। যদিও পরিণামে পুণ্যের শক্তিরই অর্থাৎ অহুর মাজদার জয় হয়।

**অ্যাকিলিস** গ্রিক পুরাণের বীর। হোমারের *ইলিয়ড* মহাকাব্যের নায়ক। রাজা পেলিয়াস ও সাগরকন্যা থেটিসের পুত্র। অ্যাকিলিস যুদ্ধংদেহী তেজস্বিতার জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁর ডান পায়ের গোড়ালি ছিল দুর্বল। এই দুর্বলতার কারণে তিনি ট্রয়ের যুদ্ধে প্যারিসের হাতে নিহত হন।

**অ্যাকেলাস** গ্রিক কিংবদন্তি অনুযায়ী অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারিণী। সমুদ্র ও নদীর দেবী টাইটানের পুত্র এবং মিসরের অ্যাকেলাস নদীর দেবতা।

**অ্যাটলানটাইডিস** টাইটান অ্যাটলাসের সাত কন্যা। গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী তাঁরা আকাশে সাততারকা হয়ে ফুটে আছেন। তাঁদের আকৃতিকে ঐতিহাসিকভাবে কনস্টেলেশন বলা হয়।

**অ্যাটলাস** গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী টাইটানদের অন্যতম। অদম্য সাহসী ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তি। জিউসের সঙ্গে যুদ্ধে অ্যাটলাস ছিলেন টাইটান-পক্ষের প্রধান সেনাপতি। যুদ্ধে টাইটানরা হেরে গেলে জিউস তাঁদের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান দেন। অ্যাটলাসকে নিজের কাঁধের ওপর আকাশকে ধরে রাখতে হয়।

**অ্যাডোনিস** গ্রিক পুরাণে উল্লেখিত বৃক্ষজাত পুরুষ ও বিখ্যাত শিকারি। সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। আফ্রোদিতি বা ভেনাস তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন। আফ্রোদিতির আরেক প্রণয়ী রণদেবতা অ্যারিস বন্য শূকরের বেশে তাঁকে আক্রমণ করলে ব্যাপক রক্তক্ষরণে অ্যাডোনিসের মৃত্যু হয়। তাঁর রক্ত থেকে গোলাপ ফুলের জন্ম হয়। পাতালের রানি পার্সিফোন পরে বিশেষ শর্তে তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করেন। মিসর ও মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে অ্যাডোনিস শস্য ও ঋতুর দেবতা বলে পূজিত হতেন। তাঁর পুনরুজ্জীবনের উপলক্ষটি অ্যাডোনিয়া বা মধ্য-গ্রীষ্ম উৎসব হিসেবে পালিত হতো।

**অ্যাথানেসিয়াস** গ্রিক ধর্মযাজক (আনু. ২৯৭-৩৭৩ খ্রি.)। নিষ্ঠাবানদের পিতা বলেও পরিচিত। তাঁকে

পাঁচ বছর নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হয়। পরে রোমে পালিয়ে গিয়ে পোপ প্রথম জুলিয়াসের সাহায্য লাভ করেন। ক্যাথলিক মতবাদ গঠনে তাঁর রচনাবলির বড় প্রভাব ছিল।

**অ্যাথেনা** গ্রিক দেবী। গ্রিক পুরাণে তাঁকে জ্ঞান, শিল্পকলা ও শান্তির দেবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি অবশ্য যুদ্ধবিগ্রহেরও দেবী। অ্যাথেন্সসহ সব গ্রিক নগরেরও তিনি রক্ষাকর্ত্রী। অ্যাথেন্সের নামকরণ তাঁর নামেই করা হয়েছে। জিউসের প্রথম স্ত্রী মেটিসের কন্যা তিনি। গ্রিক দেবীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই চিরকুমারী।

**অ্যানটিক্রাইস্ট** অর্থ যিশুখ্রিষ্টের বিরোধী। খ্রিষ্টধর্মবিশ্বাস মতে, যে ব্যক্তি অশুভ শক্তির অধিকারীরূপে পৃথিবীতে যিশুখ্রিষ্টের বিরোধিতা করবে। অনেক লোককে সে ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে। যিশুখ্রিষ্টের পুনরাবির্ভাবকালে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। একই রকম বিশ্বাস জরথুস্ত্র ধর্মেও রয়েছে।

**অ্যানথেম** সমবেত কণ্ঠে গাওয়া ধর্মসংগীত। লাতিন উপাসনাসংগীত মোতেৎ-এর বিকল্প হিসেবে ইংল্যান্ডের খ্রিষ্টানরা এর প্রচলন করে। প্রশংসা বা আনন্দজ্ঞাপক সংগীত অর্থেও অ্যানথেম কথাটি ব্যবহৃত হয়। ন্যাশনাল অ্যানথেম বা জাতীয় সংগীত কথাটির উদ্ভব তা থেকেই।



**অ্যানাব্যাপটিজম** পুনর্দীক্ষাদান-সংক্রান্ত খ্রিষ্টীয় মতবাদ। ষোড়শ শতাব্দীতে সুইজারল্যান্ডে এক প্রটেস্ট্যান্ট গোষ্ঠী কর্তৃক প্রচারিত ধর্মমতে শিশুদের দীক্ষাদানের বিরোধিতা করা হয়। অ্যানাব্যাপটিস্টদের মতে, কেবল প্রাপ্তবয়স্ক সজ্ঞান-সচেতন ব্যক্তিরাই দীক্ষালাভের উপযুক্ত।

**অ্যাপোলো** গ্রিক ও রোমক পুরাণে সংগীত, কবিতা, ভবিষ্যদ্বাণী ও ভেষজের দেবতা। জিউস ও লিটোর পুত্র। আর্টেমিস তাঁর যমজ বোন। পুরুষোচিত সৌন্দর্য ও যৌবনের আদর্শ হিসেবে গণ্য হন। সূর্যদেব হিসেবেও তিনি পূজিত। বিশ্বাস যে, ডেলফির মন্দির থেকে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

**অ্যাবনোবা** প্রাচীন ইতালি, ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড অঞ্চলের বন ও নদীর দেবী। অনেকের বিশ্বাস, তাঁর উপাসনার উৎপত্তি জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্টে। ইউরোপজুড়ে বহু নদনদীর নামের সঙ্গে অ্যাভন বা এভন কথাটি যুক্ত রয়েছে। অ্যাভন থেকেই অ্যাবনোবা কথাটি এসেছে।

**অ্যাবানডেনটিয়া** উর্বরতার রোমক দেবী। কিংবদন্তি হলো, মধ্যরাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকেন, তখন তিনি গৃহস্থের ঘরে প্রবেশ করে সমৃদ্ধি ঘটান।

**অ্যাসটারটে** প্রাচীন ফিনিশার (বর্তমান ফিলিস্তিন অঞ্চল) উর্বরতা, মাতৃত্ব, সৌন্দর্য ও যুদ্ধের দেবী। তাঁকে ব্যাবিলনীয় দেবী ইজহাতার ও গ্রিক দেবী আফ্রোদিতির সমকক্ষ মনে করা হয়। নব্য প্রস্তরযুগ ও ব্রোঞ্জযুগের অন্যতম দেবী।

**অ্যাসপারগেস** রোমান ক্যাথলিক আচারানুষ্ঠান-বিশেষ, যেখানে পুরোহিত বিশেষ মন্ত্রসহযোগে উপস্থিত সবার ওপর পবিত্র বারি ছিটিয়ে দেন।

## আ

**আইউব (আ.), হজরত** অন্যতম নবী। পবিত্র কোরআনের সুরা সা'দ-এর ৪১-৪৪ আয়াতে বলা হয়েছে, 'স্মরণ করো আমার দাস আইউবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলেছিল, "শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট দিচ্ছে।" আমি তাকে বলেছিলাম, "তুমি তোমার দুই পা দিয়ে মাটিতে বাড়ি মারো! গোসল করার ও খাওয়ার জন্য (তুমি পাবে) ঠান্ডা পানি।" আমি তাকে তার পরিবার-পরিজন ও তাদের মতো আরও অনেককে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। এ আমার আশীর্বাদ এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য এক উপদেশস্বরূপ। আর (আমি বললাম), "এক মুঠো ঘাস নাও ও তা দিয়ে বাড়ি মারো আর শপথ ভেঙো না।" আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত ভালো দাস! সে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল।' বাইবেলেও 'জোব' বা 'ইয়োব' নামে আইউব নবীর উল্লেখ আছে।

**আইকন** দেব-দেবী বা সাধুসন্তের প্রতিকৃতি, মূর্তি বা খোদিত প্রতিমূর্তি, যা সাধারণত পূজার উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়। পবিত্র বা ধর্মীয় অনুষঙ্গ কিংবা তাৎপর্যসম্পন্ন যেকোনো মূর্তি বা ভাস্কর্যই এর অন্তর্ভুক্ত।

**আইসিস** প্রচীন মিসরীয় দেবী। কৃষিদেবতা ওসিরিসের পত্নী। শস্য ও প্রকৃতির দেবী। গ্রিক পুরাণে উল্লেখিত শস্যদেবী দিমিতিরের সঙ্গে তাঁর

অনেক মিল লক্ষ করা যায়। গ্রিসের কোনো কোনো অঞ্চলে দিমিতিরের সঙ্গে শস্যদেবী হিসেবে তিনিও পূজিত হতেন।

**আউলচাঁদ** কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আদিগুরু (১৬৯৪-১৭৭০)। বাল্যনাম পূর্ণচন্দ্র। কথিত আছে, মহাদেব দাস নামে একজন বারুই শিশু অবস্থায় তাঁকে তাঁর পানের বরজে কুড়িয়ে পান। মহাদেবের স্ত্রী শিশুটির সৌন্দর্য দেখে তাঁর পূর্ণচন্দ্র নামকরণ করেন। পালক পিতার গৃহেই আউলচাঁদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। পরে হরিহর ঠাকুরের কাছে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এক মতে, আউলচাঁদ মুসলমান ফকিরের শিষ্য ছিলেন; অন্য মতে, তিনি ফুলিয়ার বলরাম দাসের কাছ থেকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় আউলচাঁদ। তিনি প্রথমে রামশরণ পালসহ ২২ জনকে দীক্ষা দেন। এ থেকেই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সূত্রপাত। রামশরণ পাল 'কর্তাবাবা' ও তাঁর পত্নী সরস্বতী দেবী 'কর্তামা' রূপে পরিগণিত। শিষ্যরা আউলচাঁদকে চৈতন্যদেবের অবতাররূপে মান্য করে। শিষ্যদের উদ্দেশে আউলচাঁদের ১০টি উপদেশবাণী আছে।

**আকাশপ্রদীপ** হিন্দু লোকাচার। আশ্বিন-সংক্রান্তি থেকে কার্তিক-সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে বাঁশ বা কাঠের লম্বা খুঁটির মাথায় প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। লোকবিশ্বাস, আকাশপ্রদীপ সব ধরনের অমঙ্গল এবং অতিপ্রাকৃত বা দুষ্ট শক্তির রোষ থেকে মানুষকে রক্ষা করে। বৌদ্ধরা আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাস আকাশপ্রদীপ জ্বালেন।

**আকাশা ইবনে মুহসিন** হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবি। আবু মুহসিন নামেও পরিচিত। ইসলাম গ্রহণ করে রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে মদিনায় হিজরত করেন। বদর, ওহুদ ও অন্যান্য ধর্মযুদ্ধে অংশ নেন। প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর (রা.)-এর আমলে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ পরিচালিত বাহিনীর মুসলিম অগ্রভাগে ছিলেন। ভুয়া নবী তালাইহার আক্রমণে শহিদ হন।

**আকিকা** মুসলমান পরিবারে শিশুর জন্মের পর সপ্তম দিবসে আল্লাহর উদ্দেশে নবজাতকের মঙ্গল-কামনায় পালিত অনুষ্ঠান। এই দিন শিশুর নাম রাখা হয়। এ উপলক্ষে প্রথম চুলকাটা ও কোরবানি দেওয়া সুন্নত। কোনো কারণে সপ্তম দিবসে এ অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হলে এমনকি শিশু বড় হয়ে নিজেও তা করতে পারে। আকিকা উপলক্ষে জবাই করা পশুর মাংসের তিন ভাগের এক ভাগ দরিদ্র ও দুস্থদের মধ্যে ও এক ভাগ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিতরণ করতে হয়। বাকি এক ভাগ মা-বাবা ও পরিবারের জন্য রাখতে হয়। আকিকাতে ছেলে-শিশুর জন্য দুটি এবং মেয়ে-শিশুর জন্য একটি ছাগল কিংবা ভেড়া কোরবানি করার নির্দেশ রয়েছে। প্রাক-ইসলাম আরবেও আকিকার প্রচলন ছিল। ইহুদিরা কেবল পুত্রসন্তানের জন্য আকিকা দিত। রাসুল (সা.)-এর একটি হাদিস থেকেও তা জানা যায়। দাউদ-আল-জাহিরিসহ কতিপয় আলেম আকিকাকে অবশ্যকরণীয় ওয়াজিব বলে গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে, এটি শুধুই মুস্তাহাব বা পুণ্যজনক। শিশুর কর্তিত কেশকেও আকিকা নামে অভিহিত করা হয়। শরিয়তে এই কর্তিত কেশের সমপরিমাণ রৌপ্য দান করার নির্দেশ আছে।

**আখড়াই** বাংলা গানের একটি লুপ্ত ধারা। অষ্টাদশ শতকে নদীয়ার শান্তিপুরে এর উদ্ভব। ধারণা করা হয়, বৈষ্ণবদের আখড়া থেকে উৎপন্ন বলেই এই গানের নাম আখড়াই। প্রথম পর্যায়ে এ গানের দুটি অংশ থাকত খেউড় ও প্রভাতি। তখন গানগুলো ছিল কুরুচিপূর্ণ। পরবর্তী পর্যায়ে পূর্বের দুটি অংশের আগে ভবানীবিষয়ক গান যুক্ত হয়। অর্থাৎ এ সময় দুটির স্থলে তিনটি গান গাওয়া হতো। ভবানীবিষয়ক অংশে থাকত দেবীবিষয়ক গান, খেউড়ে মিলনপ্রত্যাশী লৌকিক প্রেমের গান এবং প্রভাতিতে রজনী-প্রভাতের আশাভঙ্গের গান। খেউড় ও প্রভাতির মহড়া ও চিতেনে, এমনকি কখনো কখনো অন্তরায়ও চৌদ্দ অক্ষরের একটি করে পয়ার পঙ্ক্তি থাকত। গান গাওয়ার সময় হাঁড়ি, কলসি প্রভৃতি ২২টি সরঞ্জাম বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলে গায়ক দলকে বলা হতো 'বাইশেরা'। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে আখড়াই

গানের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এ সময় মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের সভাগায়ক কলুইচন্দ্র সেনের সংস্কারের ফলে আখড়াই গানের মানবৃদ্ধি ঘটে। পরবর্তী সময়ে কলুই সেনের ভাগনে নিধু গুপ্তের হাতে আখড়াই গানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। ১৮০৪ সালে কলকাতায় আখড়া স্থাপন করে নিধু বাবু তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে আখড়াই গান শিক্ষা দিতে শুরু করেন। এ সময় আখড়াই গান অভিজাত শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার পরও এর জনপ্রিয়তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৮৩০ সাল নাগাদ বাংলা গানের এ ধারা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন এর সঙ্গে কবিগানের কিছু আঙ্গিক যুক্ত হয়ে এক নতুন ধরনের গানের উদ্ভব ঘটে, যা হাফ-আখড়াই নামে পরিচিতি লাভ করে। নিধু গুপ্তেরই শিষ্য মোহনচাঁদ বসু এই ধারা প্রবর্তন করেন।

**আখবারে এসলামীয়া** টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত ঊনবিংশ শতকের একটি মাসিক পত্র। টাঙ্গাইলের মোহাম্মদ নইমুদ্দিনের সম্পাদনায় ১২৯১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৮৪) এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। করটিয়ার জমিদার মাহমুদ আলী খান পন্নী ছিলেন পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ধর্মান্দোলনই ছিল পত্রিকাটির লক্ষ্য। ইসলামি ধর্মতত্ত্ব, মহাপুরুষদের জীবনী, মুসলিম ঐতিহ্য এবং সমকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়াদি পত্রিকাটিতে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হতো। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে পত্রিকাটি ছিল রক্ষণশীল, হানাফি মতের সমর্থক। আহলে হাদিস বা লা-মজহাবিদের বিপক্ষে পত্রিকাটিতে নিয়মিত প্রবন্ধ ছাপা হতো। এই হানাফি-আহলে হাদিস দ্বন্দ্ব ও গোবধ-গোরক্ষা প্রশ্নে দীর্ঘদিন ধরে টাঙ্গাইলের আরেকটি পত্রিকা *আহমদী*র সঙ্গে *আখবারে এসলামীয়া*র বিতর্ক চলে। গোবধ-গোরক্ষা নিয়ে মীর মশাররফ হোসেনের সঙ্গেও পত্রিকাটির সম্পাদক মৌলবী নইমুদ্দিন মামলায় জড়িয়ে পড়েন। ১০ বছর প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৯৫ সালের এপ্রিলে আবার প্রকাশিত হলেও তা বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনি।

**আখেরাত** শেষ বিচারের দিন ও পরকাল—দুই অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আখেরাত শব্দটির উৎপত্তি আখের, অর্থাৎ—শেষ কথাটা থেকে। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী মানুষের এই পারলৌকিক জীবন দুই ভাগে বিভক্ত: মৃত্যু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত তার কবরে অবস্থানকালীন সময় এবং আল্লাহর নির্দেশে সব প্রাণীর পুনরুত্থানের পর হাশরের ময়দানে শেষ বিচার থেকে অনন্তকাল অবধি। বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষণস্থায়ী ইহলৌকিক জীবনের চেয়ে আখেরাত বা অনন্ত পারলৌকিক জীবনই বেশি মূল্যবান। মুসলমানরা প্রার্থনার সময় ইহকালের পাশাপাশি পারলৌকিক জীবন বা আখেরাতের জন্যও শান্তি ও মঙ্গল কামনা করেন।

**আগম** কথাটার অর্থ তন্ত্রশাস্ত্র। কারও কারও মতে, 'আগত', 'গত' ও 'মত'—এই তিন শব্দের আদ্যক্ষর নিয়ে 'আগম' শব্দটি গঠিত। যা শিবমুখ থেকে আগত, পার্বতীর কর্ণে গত এবং বাসুদেবের মত দ্বারা সমর্থিত, তাই আগম। এর বক্তা স্বয়ং শিব এবং শ্রোত্রী স্বয়ং পার্বতী। অন্য মতে, আগম শব্দের অর্থ হচ্ছে, যা থেকে চতুর্দিকের বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়। আগমের আলোচ্য বিষয় সাতটি : সৃষ্টি, প্রলয়, দেবার্চনা, সাধনা, পুরশ্চরণ (অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধিজনক ক্রিয়া), ষটকর্মসাধন (যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ এবং মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি ছয় তান্ত্রিক ক্রিয়া) এবং চতুর্বিধ ধ্যানযোগ।

**আগমনী বিজয়া** বাংলা গানের একটি ধারা। গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা পার্বতীর বিয়ে হয় দরিদ্র শিবঠাকুরের সঙ্গে। বিয়ের পর কন্যা স্বামীগৃহে চলে গেলে সেখানে মেয়ের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের কথা চিন্তা করে মা মেনকার হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে। এক রাতে মাতা-কন্যা উভয়ে উভয়কে স্বপ্নে দেখেন। মেনকা স্বামীকে অনুরোধ করেন উমাকে নিয়ে আসার জন্য। পিতামাতার অনুরোধে উমা মাত্র তিন দিনের জন্য পিতৃগৃহে আগমন করেন। তার এ আগমনকে কেন্দ্র করে রচিত গানই আগমনী গান। পিতৃগৃহে তিন দিন অবস্থানের পর উমা যখন আবার স্বামীগৃহে ফিরে যান, তখন যে বিষাদময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তাকে উপলক্ষ করে রচিত গানগুলোই বিজয়া গান নামে পরিচিত। 'আগমনী' ও 'বিজয়া'—এ দুই

প্রকার গানকে একত্রে বলা হয় 'আগমনী বিজয়া গান'। শ্যামাসংগীতের পাশাপাশি বাংলা গানের এ ধারাটিরও প্রবর্তক কবি রামপ্রসাদ সেন (আনু. ১৭২০-১৭৮১)। এতে বাঙালি হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং বাস্তবতার চিত্র চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

**আজং** গারো সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিয়ের আশীর্বাদ রীতি। এ উপলক্ষে বর-কনেকে বিভিন্ন ধরনের উপহার প্রদান করা হয়। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে যে যত বেশি উপহার দিতে পারবে, সে তত বেশি মর্যাদার অধিকারী। যে একবার কারও বিয়েতে 'আজং' প্রদান করবে, তার বাড়িতে কোনো বিয়ে হলে সে একই ধরনের 'আজং' পাবে। এই রীতি 'গান্দাবারা' নামে পরিচিত।

**আজরাইল** প্রধান ফেরেশতাদের অন্যতম। মৃত্যুদূত। আল্লাহর নির্দেশে তাঁর ব্যবস্থাপনাতেই মানুষের মৃত্যু হয়। তিনি নিজে শুধু নবীদের জীবন নিতে আসতেন। অন্যদের বেলায় তাঁর সহযোগীদের প্রেরণ করা হয়। ইহুদি ধর্মেও আজরাইলের উল্লেখ আছে।

**আজান** নামাজের জন্য আহ্বান। ইসলামে প্রতি ওয়াক্তের ও জুমার নামাজে যোগ দেওয়ার জন্য মুসল্লিদের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আহ্বান জানানো হয়। পবিত্র কোরআনের সুরা জুমা-র ৯ আয়াতে অবশ্য 'আজান'-এর পরিবর্তে 'নিদা' [ডাকা] শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ওই আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে বিশ্বাসীগণ! জুমার দিনে যখন নামাজের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহকে মনে রেখে তাড়াতাড়ি করবে ও কেনাবেচা বন্ধ করবে। এই তোমাদের জন্য ভালো, যদি তোমরা বোঝো।' পবিত্র কোরআনের সুরা মায়িদা-র ৫৮ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর তোমরা যখন নামাজের জন্য ডাকো তখন তারা তাকে হাসি-তামাশা ও খেলার জিনিস বলে নেয়।' প্রার্থনার জন্য আহ্বান করতে খ্রিষ্টানরা ঘণ্টা বা কাঠের বাজনা ব্যবহার করত। ইহুদিরা শিঙা ফুঁকত। মোহাম্মদ (সা.) মদিনায় আজানের প্রবর্তন করেন। প্রথম মুয়াজ্জিন ছিলেন বিলাল ইবনে রাবাহ। ইসলাম ধর্মে প্রতিদিন পাঁচবার নামাজের জন্য আহ্বান করা হয়। আজান সাধারণত নামাজের আগে দেওয়া হয় মসজিদের ছাদ, দরজা বা বিশেষভাবে নির্মিত সুউচ্চ মিনার থেকে। আজকাল মাইক্রোফোন ব্যবহার করে মুয়াজ্জিন মসজিদের ভেতর থেকে আজান দেন। লাউড স্পিকার ছাদে বা মিনারে স্থাপিত থাকে। আজানে 'আল্লাহু আকবার' চারবার, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দুবার, 'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ' দুবার, 'হাইয়া আল্লাস্ সালাহ' দুবার, 'হাইয়া আলাল ফালাহ' দুবার, পুনরায় 'আল্লাহু আকবার' দুবার এবং পরিশেষে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একবার উচ্চারিত হয়। ফজরের নামাজের আজানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ'র পর 'আস্ সালাতু খাইরুম মিনাননাউম' দুবার বলা হয়। আবার ঠিক ফরজ নামাজের আগে ইমামের পেছনে দাঁড়ানো মুয়াজ্জিন পুনরায় আজান দেন, যাকে আকামত বলা হয়। আকামতে 'হাইয়া আলাল ফালাহ'র পর 'কাদকামাতিস সালাহ' বলা হয় দুবার। আজান শুনলে শ্রোতা আজানের শব্দ মনে মনে বলবেন। 'হাইয়া আলাস্ সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ'র পরিবর্তে 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবেন।

**আজাবুল কবর** অর্থ কবরের শাস্তি। মৃত্যুর পর কবরে অবস্থানকালীন পাপীদের যে শাস্তি দেওয়া হয়। বাংলায় গোর-আজাবও বলা হয়। কবরে মুনকির ও নকির নামের দুই ফেরেশতা মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহ ও রাসুল (সা.) সম্পর্কে প্রশ্ন করতে আসেন। যে ব্যক্তি সৎভাবে জীবনযাপন ও সৎকর্ম করে মারা গেছেন তিনি উত্তর দিতে সক্ষম হবেন আর তাঁর কবরকে শান্তিময় করে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে উত্তরদানে অসমর্থ ব্যক্তির কবরে শাস্তি শুরু হয়ে যাবে। এই শাস্তি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

**আজীবিক** ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন ধর্ম-সম্প্রদায়। এদের ধর্মমত ছিল সন্ন্যাসপন্থী, নাস্তিক ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মবিরোধী। এই ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন গোসাল (মৃত্যু : আনুমানিক ৪৮৪ খ্রিষ্টপূর্ব)। জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন তিনি। গোসালের মতে, মানুষের কর্ম তাঁর জন্মান্তরকে প্রভাবিত করে না। সম্রাট অশোকের আমল পর্যন্ত

এটি একটি প্রভাবশালী ধর্মমত ছিল। তার পরও চতুর্দশ শতক পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে এটি তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে ক্রমে বিলুপ্ত হয়।

**আজু গোঁসাই** অষ্টাদশ শতকের বাঙালি কবি। রামপ্রসাদের সমসাময়িক। ধর্মমূলক কবিতা রচনার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

**আঞ্জুমান ইসলামি** 'আঞ্জুমান' শব্দটির অর্থ সভা বা সমিতি। ১৮৫৫ সালের ৮ মে কলকাতায় আঞ্জুমানে ইসলামি গঠিত হয়। এটিই ছিল বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমানদের দ্বারা গঠিত প্রথম সংগঠন। কলকাতা আদালতের কাজি আল কুজ্জত ফজলুর রহমান এর সভাপতি এবং তাঁর পুত্র মোহাম্মদ মজহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, ভারতের মুসলমানদের কল্যাণসাধন। প্রতিষ্ঠালগ্নে তৎকালীন বিখ্যাত পত্রিকা *সোমপ্রকাশ* এমনকি ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনও আঞ্জুমানের আবির্ভাবকে স্বাগত জানায়। বলা যায়, ইতিপূর্বে গঠিত হিন্দু জমিদারদের সমিতি ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের (১৮৫১) পাল্টা সংগঠন হিসেবেই আঞ্জুমান গঠিত হয়। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের মতোই সরকারের অনুগ্রহ লাভ ও দেনদরবারের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সুবিধা আদায় এর উদ্দেশ্য ছিল। আঞ্জুমানের গঠনতন্ত্রে বলা হয়, মুসলমানরা বিধিসম্মত উপায়ে সরকারের কাছে আবেদন করবে এবং এমন কিছু করবে না, যাতে সরকারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের মতো আঞ্জুমানে ইসলামিও ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের বিরোধিতা করে। এমনকি বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে ১৮৫৮ সালের ১৪ নভেম্বর মহারানি ভিক্টোরিয়াকে একটি অভিনন্দনবাণীও পাঠানো হয়।

এই সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অধিকাংশই ছিলেন মাদ্রাসা-শিক্ষিত। আঞ্জুমানের মাসিক সভায় উর্দু ও ফারসি ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ ও আলোচনা করা হতো। খ্রিষ্টান মিশনারিরা ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করতেন, তার উত্তরে প্রবন্ধ লিখে আঞ্জুমানের সভায় তা পাঠ করা হতো এবং পরে তা *দুরবীণ* পত্রিকায় ছাপানো হতো। সংগঠন হিসেবে আঞ্জুমানে ইসলামি অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৮৬৩ সালে আবদুল লতিফ কর্তৃক মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি গঠিত হওয়ার আগেই আঞ্জুমানের কার্যক্রম শ্লথ হয়ে পড়ে।

**আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া** মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী। মুসলমান-সমাজে আধুনিক শিক্ষা, বিশেষত নারীশিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এর সদস্য ছিলেন। দেশের বিভিন্ন অংশে এর শাখা ছিল। সংগঠনটি নারীশিক্ষার জন্য পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্বতন্ত্র পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন করে। ছাত্রীরা পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে বাড়িতে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারত। আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া উত্তরপত্র পরীক্ষা করে ফল ঘোষণা করত।

**আঞ্জুমান-ই-উলামা-বাঙ্গালা** অবিভক্ত বাংলায় প্রতিষ্ঠিত উলামাদের একটি সংগঠন। ইসলাম প্রচার এবং পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলিম-সমাজের সংস্কারসাধনের লক্ষ্য নিয়ে এটি গঠিত হয়। খ্রিষ্টান মিশনারি ও অন্যদের ইসলামবিরোধী প্রচারের মোকাবিলা করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। পুস্তক ও প্রচারপত্র রচনা এবং তা প্রকাশের মাধ্যমে তাঁরা এটা করতে চেয়েছিলেন। আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা আবদুল্লাহিল বাকি ও ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। সংগঠনটির মুখপত্র ছিল *আল-এসলাম* (১৯১৫-১৯২১)। আঞ্জুমানের কর্মীরা বাংলা ও আসামের মুসলমানদের মধ্যে শিরক ও বেদাত সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করে। এ ছাড়া তাদের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক মক্তব-মাদ্রাসা নির্মাণ ও বায়তুল মাল তহবিল গঠন করা হয়। চট্টগ্রামে একটি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতেও চেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। ১৯২১ সাল পর্যন্ত আঞ্জুমান নিজ নামেই তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এই সময়ের মধ্যে

বগুড়ায় (১৯১৩), কলকাতায় (১৯১৭) ও চট্টগ্রামে (১৯১৮) আঞ্জুমানের তিনটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আঞ্জুমানের সদস্যরা অনেকেই খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। স্বদেশি পণ্য বিক্রির জন্য তাঁরা কলকাতায় একটি স্বদেশি খিলাফত স্টোর প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মপ্রচারে নিয়োজিত থাকলেও তাঁদের বক্তব্যে বা আচরণে কখনো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাব প্রকাশিত হয়নি। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পক্ষেই তাঁরা বরং সোচ্চার ছিলেন। ১৯২১ সালের পর সংগঠনটি জামিয়াত-উল-উলামা-ই-হিন্দের বঙ্গীয় শাখা জামিয়াত-উল-উলামা-ই-বাঙ্গালার সঙ্গে একীভূত হয়।

**আঞ্জুমান-ই-ওয়াজিন-ই-বাংলা** একটি ধর্মীয়-সামাজিক সংগঠন। হুগলির ফুরফুরার পীর মওলানা আবুবকর সিদ্দিক (১৮৫৮-১৯৩৯), মৌলবী ওয়াহেদ হোসাইন এবং *মিহির ও সুধাকর* সম্পাদক শেখ আবদুর রহিমের উদ্যোগে ১৯১১ সালে কলকাতায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মওলানা আবুবকর সিদ্দিকই ছিলেন সংগঠনটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সভাপতি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মওলানা আব্দুল হাই এর সভাপতি হন। আঞ্জুমানের উদ্যোগে অনেকগুলো পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যেমন, *মোসলেম হিতৈষী, ইসলাম দর্শন, হানাফি, শরিয়তে ইসলাম* এবং *সুন্নাত আল-জামাআত*। পবিত্র কোরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অনুসারে ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন পরিচালনাই ছিল আঞ্জুমানের ঘোষিত লক্ষ্য। অমুসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচার এবং কাদিয়ানি ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধও ছিল সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে আঞ্জুমানের তরফ থেকে বিপুলসংখ্যক বেতনভোগী ও অবৈতনিক প্রচারক নিয়োগ করা হয়। বাংলার বিভিন্ন এলাকায় মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি, বায়তুল মাল তহবিল গঠন এবং যুবসংগঠন প্রতিষ্ঠাও আঞ্জুমানের এক বড় কীর্তি। তাঁরা তরিকা-ই-মুহম্মদি ও আহল-ই-হাদিসপন্থীদের, বিশেষ করে *মোহাম্মদী* সম্পাদক মওলানা আকরম খাঁর বিরোধী ছিলেন। পীরদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মাইজভাণ্ডার, সুরেশ্বর প্রভৃতি স্থানে ওরস, মেলা প্রভৃতির আয়োজন এবং তাতে নাচ-গান পরিবেশনেরও তাঁরা বিরোধী ছিলেন।

আঞ্জুমানের নেতারা খিলাফত আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যদিও কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির সঙ্গে কিছু নীতিমালা ও কর্মসূচির প্রশ্নে তাঁদের সুস্পষ্ট ভিন্নমত ছিল। যেমন আঞ্জুমান হরতাল ও বিদেশি বস্ত্র পোড়ানোর মতো কর্মসূচি এবং 'হিন্দু-মুসলিম কি জয়', 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' ধরনের স্লোগানগুলোর তীব্র বিরোধিতা করে। আঞ্জুমান বেঙ্গল প্যাক্টকে (১৯২৩) সমর্থন কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০)-এর বিরোধিতা করে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে আঞ্জুমানের সভাপতি মওলানা আবুবকর সিদ্দিক মুসলিম লীগের প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার জন্য ফতোয়া জারি করেন। ১৯৩৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পর আঞ্জুমান নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এর অধিকাংশ নেতা ও কর্মী পরে জামিয়াত-ই-উলামা ও সমধর্মী সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করেন।

**আঞ্জুমান-ই-মুফিদুল ইসলাম** একটি সামাজিক সংগঠন। মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে সহায়তা করার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯০৫ সালে এটি গঠিত হয়। সুরাটের ইবরাহিম মোহাম্মদ কলকাতায় এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে মুসলমানদের বেওয়ারিশ লাশ দাফন করার মতো জনহিতকর কাজের জন্যই এটি অধিক পরিচিত। জনসেবায় প্রশংসনীয় অবদানের জন্য আঞ্জুমান ১৯৮৪ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার ও ১৯৯৬ সালে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার লাভ করে।

**আটকড়াই/আটকলাই** অর্থ আট রকম কলাই। এটি একটি আচার, যা সন্তান জন্মের পর অষ্টম দিনে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে ছোট ছেলেমেয়েরা কুলা পিটিয়ে অশুভ শক্তিকে তাড়ায়। তারা ছড়া কেটে নবজাতকের মঙ্গল কামনা করে। নবজাতকের পরিবার থেকে এই ছেলেমেয়েদের আট প্রকারের খাবার মুড়ি, চিড়া, খই, ছোলা, মুগ, কলাই, খেসারি ও মটরভাজা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

**আতিথ্য** পৃথিবীর সব ধর্মেই আতিথ্য বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে ইবরাহিম (আ.) ও লুতের (আ.) আতিথেয়তা দৃষ্টান্তস্থানীয় হিসেবে বর্ণিত রয়েছে। বিররা বা পুণ্যকর্ম হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা থেকে আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির ও সাহায্যপ্রার্থীদের এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করা। মিশকাত হাদিসেও মোহাম্মদ (সা.)-এর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, 'যে আল্লাহতে ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে তার উচিত অতিথিকে সম্মান করা। অতিথিকে আনুষ্ঠানিকভাবে না দেওয়া হলেও তার যা প্রাপ্য তা সে নিতে পারে।' পবিত্র কোরআনের প্রখ্যাত তফসিরকার আল জামাকশারি তাঁর কবরফলকের জন্য যে বাণীটি নির্বাচিত করেন তা এই: 'হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ! আমি দুনিয়ার বুকে তোমারই অতিথি আর অতিথির অধিকার প্রত্যেক মহানুভব মেজবানই মেনে নেন। আতিথেয়তার দান হিসেবে আমার পাপ তুমি ক্ষমা করো; দানটি বড়, কিন্তু তার চেয়ে বড় তোমার আতিথেয়তা।'

**আত্মহত্যা** স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণনাশ। ইসলাম ধর্মমতে আত্মহত্যা আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ, সুতরাং চরম গুনাহর কাজ। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করেন, তিনি দাফন-কাফনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা পেতে পারেন না। হিন্দুধর্মেও সহমরণ (এখন আইনবিরুদ্ধ) ছাড়া আত্মহত্যাকে ভয়ংকর পাপ বলে মনে করা হয়। অতীতে অবশ্য ভারতে, বিশেষ করে রাজপুত নারীরা শত্রুর হাতে বন্দী হওয়ার আগে সতীত্ব বা সম্মান রক্ষার্থে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতেন। তাকে বলা হতো জহরব্রত পালন। জাপানে আত্মহত্যার বিশেষ পদ্ধতি হারাকিরি প্রথা বিদ্যমান। এতে ছোরা বা তলোয়ারের সাহায্যে পেট ফেড়ে নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলা হয়। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারা অনুসারে আত্মহত্যার চেষ্টা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

**আত্মা** আত্মা এমনই একটি ধারণা, যার কোনো লয় বা মৃত্যু নেই এবং যাকে ধরাছোঁয়া যায় না। এই ধারণামতে, সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই আত্মার অস্তিত্ব আছে। কোনো প্রাণীর মৃত্যু হলে আত্মা শরীর ত্যাগ করে চলে যায়। ওই ধারণা অনুসারে শরীরের বাইরেও আত্মার অবস্থান ও বিচরণ আছে। প্রায় সর্বজনীন একটি বিশ্বাস হলো, মানুষের দুটি সত্তা: একটি তার রক্তমাংসের শরীর বা দেহ, অন্যটি আত্মা। আত্মা হচ্ছে প্রাণীর অন্তর্গত শক্তি। এর উপস্থিতি দেহকে সচল রাখে। অনুপস্থিতিতে দেহ হয়ে পড়ে নিশ্চল। ঘুমন্ত দেহ নিশ্চল। ফলে কারও কারও মতে, এ সময় আত্মা ভ্রমণে বের হয়। তাঁদের মতে, ঘুম বা সংজ্ঞাহীনতা হলো দেহ থেকে আত্মার সাময়িক প্রস্থান, পক্ষান্তরে মৃত্যু হলো দেহের সঙ্গে আত্মার স্থায়ী বিচ্ছেদ। কোনো কোনো বিশ্বাস বা সংস্কার অনুযায়ী, মৃত ব্যক্তির বিদেহী আত্মা প্রেতাত্মায় রূপান্তরিত হয়। আর সে অবস্থায় জীবিত ব্যক্তির আত্মা প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। প্রেতাত্মা মানুষের মঙ্গলামঙ্গলের নিয়ামক শক্তি। তাই তাকে পূজা-অর্চনার প্রথা চালু আছে। জড়বাদীরা আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। অন্যদিকে সর্বেশ্বরবাদীদের ধারণায় ব্যক্তিগত আত্মার কোনো স্থান নেই। তাঁরা এক বিশ্ব-আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনে আত্মা-সম্পর্কিত নানা ধরনের চিন্তার বিকাশ ঘটেছে। প্রাচ্যের কোনো কোনো ধর্মে মানুষের ও জন্তুর আত্মার মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হতো না।

ইসলাম ধর্মমতে, আল্লাহ তাঁর রুহ আদমের (আ.) দেহে প্রবেশ করিয়ে মানবাত্মার জন্ম দেন। আত্মা সচেতন এবং তার ভালো-মন্দের জন্য সে নিজেই দায়ী। ইসলামি ধারণায় মানবাত্মা বা নফসের ছয়টি অবস্থা: নফসে আম্মারা বা কুপ্রবৃত্তিসূচক আত্মা, নফসে লাউয়ামা বা আত্মভর্ৎসনাকারী আত্মা, নফসে মুলহামা বা অনুপ্রাণিত আত্মা, নফসে মুৎমাইন্না বা প্রশান্ত আত্মা, নফসে রাজিয়া বা পরিতুষ্ট আত্মা, নফসে মারজিয়া বা আল্লাহর প্রীতিভাজন আত্মা। শেষোক্ত অবস্থাকে কামেল বলে। কেয়ামতের দিন কবর থেকে মানুষের শারীরিক পুনরুত্থানের পর তাতে তার রুহ বা আত্মা পুনঃপ্রবিষ্ট করানো হবে।

হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পুনর্জন্ম মতবাদে ব্যক্তিগত আত্মার স্বীকৃতি নেই। অন্যদিকে

খ্রিষ্টধর্মে আত্মার গুরুত্ব সর্বাধিক। যদিও খ্রিষ্টানদের মধ্যে আত্মা-সম্পর্কিত দুটি ধারণা প্রচলিত আছে: (এক) সন্তানধারণ-মুহূর্তে বা জন্মমুহূর্তে ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা সৃষ্টি করেন এবং (দুই) সন্তানের জন্মকালে মাতাপিতা তার আত্মারও জন্ম দেন। এর মধ্যে প্রথম মতটিই অধিকতর প্রভাবশালী। থ্রোবাইন্ড দ্বীপের আদিবাসীরা বিশ্বাস করত, আত্মারও শরীর আছে। আত্মার শরীরকে তারা বলত 'কোসি'।

**আত্মীয়সভা** ব্রাহ্মধর্ম প্রচারার্থে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র। ১৮১৫ সালে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) কলকাতায় এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল মূলত একেশ্বরবাদ সম্পর্কে আলোচনার জন্য সমমনা ব্যক্তিদের একটি গোষ্ঠী। ধর্ম ও সমাজসংস্কার-সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়েও তাঁরা মত বিনিময় করতেন। আত্মীয়সভার সদস্যরা কলকাতায় রামমোহনের মানিকতলার বাগানবাড়িতে নিয়মিতভাবে মিলিত হতেন। তাঁরা মূর্তিপূজার অসারতা এবং বর্ণপ্রথা, সতীদাহ ও বহুবিবাহের কুফল এবং বিধবাবিবাহ প্রচলনের আবশ্যকতা নিয়ে আলোচনা করতেন। আত্মীয়সভা থেকে বেদান্ত ব্যাখ্যা ও উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। আত্মীয়সভাই পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসভায় রূপান্তরিত বা সেই নামে পরিচিতি লাভ করে।

**আদত** আরবি ও ফারসিতে শব্দটির অর্থ প্রথা, অভ্যাস বা রীতিনীতি। এখানে 'আদত' বলতে প্রাক-ইসলামিক যুগের যেসব আচার-ব্যবহার এখনো মুসলিম-সমাজে চালু আছে, তাকেই বোঝানো হয়েছে। শরিয়তের বিধান কখনোই কোনো মুসলিম-সমাজে মানুষের জীবনকে পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি। কোনো শাস্ত্রীয় বিধানই তা পারে না। অনুষ্ঠানাদির বেলায় যেমন তেমনি আইনকানুনের ব্যাপারেও এটা সত্য। উত্তর আফ্রিকায় ও ইরানে অশাস্ত্রীয় এসব প্রথাকে 'উরফ্', পূর্ব আফ্রিকায় 'দস্তুর' এবং তুরস্কে 'কানুন' বলে। এর দুই রকম ব্যবহার আছে: ১. যেখানে ফিকাহ শাস্ত্র বিষয়টি পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করেছে। যেমন, স্ত্রীর মোহর ও ফিতরার পরিমাণ নির্ধারণে। ২. রাষ্ট্রীয় আইন ও সামাজিক ব্যাপারে: (ক) এটা ধর্মীয় বিধানের পরিপূরক হিসেবে থাকতে পারে, যেমন তুরস্কে বিয়ের কাজ বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি কর্তৃপক্ষের সামনে সম্পন্ন করা; (খ) সুস্পষ্ট ধর্মীয় বিধানের বিপরীত প্রথাও আদালতে স্বীকৃত হতে পারে, যেমন কোনো কোনো দেশে ওয়াকফ্ প্রথা ও সুদ দেওয়া-নেওয়া আদালতে বেআইনি নয়। ৩. ধর্মীয় আইন ও আদালত বলবৎ আছে, কিন্তু জনসাধারণ মোকদ্দমা ভিন্ন তা মান্য করে না, স্থানীয় প্রথাই অনুসরণ করে। যেমন জাভায় ১৯৩৮ পর্যন্ত মুসলিম উত্তরাধিকার আইন এবং ৪. যেসব ব্যাপারে ধর্মীয় বিধান নাই, সেখানে প্রথা বা আদতই বিধানের মর্যাদা পায়। এমনকি, অনেকের মতে, শরিয়তের পরিপন্থী কিংবা শরিয়তে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ না হলে প্রথা ইসলামে গ্রহণযোগ্য। আবার যেসব অঞ্চলে ধর্মান্তরিতদের মধ্যে ইসলামীকরণ অসম্পূর্ণ রয়েছে, সেখানেও প্রথার আধিক্য লক্ষ করা যায়। ভারতে ইংরেজ আমলে বহু ব্রিটিশ আইন শরিয়তি আইনের স্থান অধিকার করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও বিবেকের দোহাই দিয়েও প্রথাকে আইনের মর্যাদা দেওয়া হয়। '১৯৩৭-এর শরিয়ত আইন' উপমহাদেশে শরিয়াবিরোধী বহু প্রথা বন্ধ করে। তার আগে ধর্মান্তরিত দেশীয় মুসলিমদের মধ্যে বহু হিন্দু রীতিনীতি চালু ছিল। খোজা, মেমন ও মোপলা সম্প্রদায় এবং কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও সিন্ধুর আরও কতক শ্রেণীর মুসলমান এর উদাহরণ। উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন অঞ্চলের শরিয়া বিধানের ওপর স্থানীয় প্রথার প্রভাব এবং তদনুযায়ী বিধানের ব্যতিক্রম হতে দেখা যায়। বিয়ের ব্যাপারে আদতের ইতিবাচক অবদান এই যে, তা যথেচ্ছ তালাক ও বহুবিবাহকে প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। তালাক-ই-তাফবিজ (স্ত্রীকে প্রদত্ত তালাকের অধিকার) ও মোহর-ই-মোয়াজ্জল (অনাদায়কৃত চাহিবামাত্র দেয় উচ্চমূল্যের মোহর), এই দুই প্রথা স্ত্রীর পক্ষে বড় অস্ত্র। অন্যদিকে কোনো কোনো অঞ্চলে হিন্দুসমাজের অনুকরণে পণপ্রথা, বলা যায়, আদত হিসেবেই মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

**আদব** আরবি শব্দ, বহুবচনে আদাব। অর্থ, ভদ্রোচিত নিয়মকানুন যা পালন করে মানুষ সমাজে মর্যাদা লাভ করে। ইসলামে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব কাজের সব স্তরের জন্য আদাব বা সমীচীন নিয়মকানুন রয়েছে। মহানবী (সা.) এসব ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি নিজেও কঠোরভাবে তা অনুসরণ করেছেন। নিজ কন্যা ফাতিমার গৃহেও তিনি অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করতেন না। আয়েশা (রা.) বর্ণনা থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.) এমনভাবে কথা বলতেন যে এক মজলিশে তিনি কটি কথা বললেন তা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যেত। এভাবে চলাফেরা, ওঠাবসা, কথাবার্তারও আদব রয়েছে। পরবর্তীকালে আদব বা আদাব শব্দ দুটি শিক্ষা, মানসিক উৎকর্ষ, সুকুমার সাহিত্য ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অমুসলমানরা কোনো পদস্থ মুসলমানকে সম্ভাষণের জন্য সালামের পরিবর্তে 'আদাব' কথাটি ব্যবহার করেন। ধারণা করা হয়, এর প্রথম প্রচলন সম্রাট আকবরের সময়।

**আদম (আ.), হজরত** হিব্রু 'আদম' শব্দের অর্থ মানুষ। বাইবেল ও পবিত্র কোরআন অনুসারে প্রথম মানব। ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মমতে, আদম ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া থেকে সমগ্র মানবজাতির সৃষ্টি। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির আগে ফেরেশতা ও জিন সৃষ্টি করেন। এমনকি চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র এবং পৃথিবীর বৃক্ষ-লতা, জীবজন্তু ইত্যাদিরও সৃষ্টি মানুষের আগেই। তার পরও আল্লাহ পৃথিবীকে আবাদ করার ইচ্ছা থেকে মানুষ সৃষ্টি করেন। ফেরেশতা আল্লাহর নুর থেকে এবং জিনরা আগুন থেকে সৃষ্ট। কিন্তু আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেন মাটি দিয়ে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সুরা হিজর-এর ২৬ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি তো ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি।' এই মাটির তৈরি মানুষকেই যখন আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধি বলে উল্লেখ করেন, তখন ফেরেশতারা আল্লাহকে বলেন, 'মানুষ তো দুনিয়ায় গিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করবে।' জবাবে আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেন, 'আমি যা জানি নিশ্চয়ই তোমরা তা জানো না।' আল্লাহ আদমকে এমন জ্ঞান দান করেন যা জিন ও ফেরেশতাদের অনায়ত্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ জিন ও ফেরেশতাদের নির্দেশ দেন আদমকে সিজদা করতে। তাঁরা সবাই আল্লাহর আদেশ পালন করেন, কেবল একজন ফেরেশতা ইবলিস ছাড়া। অবাধ্যতার শাস্তি হিসেবে আল্লাহর আদেশে সে শয়তান হয়ে যায়। এদিকে আদম বেহেশতে সব রকম আরাম-আয়েশ ও সুখৈশ্বর্যের মধ্যে দিন কাটালেও একজন সঙ্গীর অভাবে পীড়িত হচ্ছিলেন। আল্লাহ তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরে একদিন আদমের নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর বাঁ পাঁজরের হাড় থেকে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। আল্লাহ তাঁদের দুজনকে একটি গাছ দেখিয়ে তার ফল খেতে বিশেষভাবে নিষেধ করেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সুরা আ'রাফ-এর ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বাস করো এবং যেখানে ইচ্ছা যাও বা যা ইচ্ছা খাও, কিন্তু ওই গাছের কাছে যেয়ো না, গেলে তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' কিন্তু ইবলিস বা শয়তানের প্ররোচনায় আদম ও হাওয়া ওই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে ফেলেন। আর তখনই তাঁরা উপলব্ধি করেন যে তাঁরা নগ্ন। তাঁরা গাছের পাতা দিয়ে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁদের অবাধ্যতা বা সীমা লঙ্ঘনের শাস্তিস্বরূপ তাঁদের দুজনকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করেন। লোকবিশ্বাস মতে, আদম সরণ দ্বীপে (বর্তমান সিংহল) ও হাওয়া জেদ্দায় পতিত হন। আর এই লোকবিশ্বাস থেকেই শ্রীলঙ্কার 'অ্যাডামস পিক' বা 'আদম গিরি' মুসলমান ও খ্রিষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই পবিত্র বিবেচিত হয়। আদমের ইবাদতে সন্তুষ্ট হয়ে অবশ্য আল্লাহ দীর্ঘদিন পর আদম ও হাওয়াকে পুনর্মিলিত করেন। উভয়ের মিলনে প্রতিবার তাঁদের একজোড়া করে সন্তান (একটি কন্যা ও একটি পুত্র) জন্মে। এই পুত্র-কন্যাদের (ভাই-বোন) মধ্যে বিয়ে হয় এবং এভাবে তাঁদের সন্তানসন্ততির দ্বারা পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্যাবিলনীয় পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে এই সেমিটীয় বিবরণীর অনেক মিল রয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে অবশ্য আদম বা

প্রথম মানব সৃষ্টির বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে : 'পরে ঈশ্বর আপনার আদলে মানুষ সৃষ্টি করলেন ; তাদেরকে পুরুষ ও নারী হিসেবে সৃষ্টি করলেন।' এবং 'সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে নির্মাণ করলেন এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু প্রবেশ করালেন। তাতে মানুষ সজীব প্রাণী হলো।' ধারণা করা হয়, আদম পৃথিবীতে প্রায় ১ হাজার বছর বেঁচে ছিলেন।

**আদলেট** এস্কিমোদের দেবতাগোষ্ঠী। এস্কিমোদের বিশ্বাস অনুযায়ী একদল দেবতা মানুষ ও কুকুরের সংকরীকরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের দেবতাদেরই তারা আদলেট বলে।

**আদা** আরবি শব্দটির অর্থ পরিশোধ করা। ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় শরিয়তের বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে কোনো ধর্মীয় কাজ সম্পন্ন করাকে বোঝায়। আদা-ই-কামিল অর্থ সম্পূর্ণ আদা আর আদা-ই-নাকিস অর্থ অসম্পূর্ণ আদা। পবিত্র কোরআন পাঠের শেষে 'আদা' অর্থে উচ্চারণরীতি বা কিরাতের নিয়ম পালন বোঝায়। বাংলায় 'আদায়' অর্থে আদা শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

**আদাবে কালাম** কথাবার্তার নিয়ম। কথা পরিষ্কার ও সুন্দর ভাষায় বলা উচিত, তা সে কথাবার্তা যার সঙ্গেই হোক না কেন। কথায় বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি, ছোটদের জন্য স্নেহমায়া এবং বন্ধুদের প্রতি প্রীতি-ভালোবাসার আভাস থাকা চাই। কথার ভঙ্গি নম্র-ভদ্র এবং যাকে বলা হচ্ছে তার পক্ষে বোধগম্য হওয়া উচিত। মহানবী (সা.) এমনভাবে কথা বলতেন, যাতে শ্রোতারা তাঁর প্রতিটি কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। কথার উদ্দেশ্য অপরকে কোনো কিছু জানানো বা ধারণা দেওয়া, আত্মগরিমা বা দম্ভ প্রকাশ নয়। পবিত্র কোরআনের সুরা লুকমান-এর ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তুমি সংযতভাবে পা ফেলো আর তোমার গলার আওয়াজ নিচু করবে।'

**আদাবে তা'আম** ইসলামি প্রথায় আহারের নিয়ম। আহার গ্রহণের আগে হাত ধোয়া, বিসমিল্লাহ বলা, খাওয়ার সময় কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে বিনয়ের সঙ্গে চাওয়া, শুধু নিকটবর্তী সম্মুখভাগ থেকে আহার্য গ্রহণ করা, ছোট গ্রাসে খাওয়া, কোনো কিছু অপছন্দ হলেও তার প্রতি ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য প্রকাশ না করা, আহারের সময় বাজে কথা না বলা, খাওয়ার পর হাতমুখ ধোয়া—এসব হলো আদাবে তা'আম।

**আদাবে মজলিশ** মজলিশের অনুসরণীয় আচরণ বা নিয়মকানুন। মজলিশে প্রত্যেকেরই উচিত ধৈর্য-সহকারে অপরের কথা শোনা। কারও কথার মাঝে কথা না বলা। কিংবা বলতে হলে অনুমতি নিয়ে বলা। ভদ্র বা নম্রভাবে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করা। হাসিমুখে কথা বলা। কারও নিন্দা, পরচর্চা বা অপবাদ থেকে বিরত থাকা। কোনো কথা যেন অন্যের মনঃকষ্টের কারণ না হয়। মজলিশে বসা ও অন্যান্য আচরণের ক্ষেত্রেও শালীনতা রক্ষা করা উচিত। যেমন কোনো লোককে উঠিয়ে তার স্থানে বসা মজলিশের আদববিরোধী কাজ। অন্যের দিকে পা লম্বা করে দেওয়াও ঠিক নয়।

**আদাবে মোলাকাত** সাক্ষাৎকারের সময় অনুসরণীয় নিয়ম। এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্যের মোলাকাত বা সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সময় কতগুলো বিষয় মেনে চলা উচিত। প্রথমে সালাম দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। একে অপরের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। অপ্রয়োজনীয় অথবা অশোভন কথাবার্তা বলা উচিত নয়। সাক্ষাৎকার যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ধরে না হয়। সাক্ষাৎকারীর কথাবার্তায় যেন আন্তরিকতা প্রকাশ পায়।

**আদাবে লেবাস** পোশাক-পরিচ্ছদের আদব বা ভদ্রজনোচিত রীতিনীতি। পুরুষের পোশাক যেন তার মর্যাদাবৃদ্ধি ও কর্তব্য সম্পাদনের সহায়ক হয় এবং তার মধ্যে অহংকার সৃষ্টি না করে। একইভাবে নারীর পোশাকও যেন তার মর্যাদা, সম্মান ও আবরু রক্ষা করে এবং তার প্রতি কারও কামভাব না বাড়ায়।

**আদা-হলুদ** একটি হিন্দু আচার। চৈত্রসংক্রান্তি থেকে শুরু করে সারা বৈশাখ মাস হিন্দু সধবা নারীকে রোজ পাঁচ টুকরো আদা, পাঁচ টুকরো হলুদ, এক মুঠো ধান, মিষ্টি ও পয়সা দিতে হয়। চার বছর এই নিয়ম পালন করতে হয়।

**আদিনা মসজিদ** সুলতানি আমলের একটি বিখ্যাত মসজিদ। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ায়

অবস্থিত। ১৩৪৭ সালে সুলতান সিকন্দর শাহ এই মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু করেন। ১৩৬০ সালে তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের আমলে নির্মাণকাজ শেষ হয়। এই মসজিদের বিশালতাই এর মূল সৌন্দর্য। মসজিদটির প্রাচীর ইটের তৈরি এবং এর ওপরের আস্তরণ পাথরের। পশ্চিম দিকের প্রাচীরের প্রত্যেক সড়ক প্রান্তে মিহরাব আছে, যদিও এর কেন্দ্রীয় মিহরাবটি একটি বর্ধিত কোঠার মধ্যে অবস্থিত। এই কেন্দ্রীয় মিহরাবটি একটি অর্ধবৃত্ত হংসতোরণের অনুকরণে নির্মিত, এর পুষ্প-কারুকার্যের অন্তরালে হংসমূর্তিও দেখা যায়। মিম্বরের পাশে একটি পাথরে সিংহমুখ খোদাই করা। এর মিহরাবে টেরাকোটা-শিল্পের নিদর্শনও দেখা যায়। মসজিদটির উত্তর কোণে একটি মঞ্চ আছে, যা 'বাদশাহ কা তখত' বা বাদশাহের সিংহাসন নামে পরিচিত। এটি আসলে মহিলাদের গ্যালারি বা নামাজকক্ষ। এর নির্মাণোপকরণ প্রধানত প্রাচীন হিন্দুমন্দির থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

**আদিনাথ মন্দির** প্রাচীন হিন্দুমন্দির। ১৮১১ সালে নির্মিত এই মন্দির কক্সবাজারের মহেশখালী দ্বীপে একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। এতে দেবী অষ্টভুজার মূর্তি আছে। এই মন্দিরের কাছে একটি বৌদ্ধমন্দিরও আছে। স্থানটি আদিনাথ তীর্থ নামেও পরিচিত। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের একটি আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র।

**আদিবুদ্ধ** মূল বা প্রধান বুদ্ধ। এটি নিরাকার ঈশ্বরের মতোই একটি ধারণা। বৌদ্ধধর্মের মহাযানপন্থীরা এই ধারণার প্রবর্তক। বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না বলে একে আস্তিক্যবিরোধী বা জড়বাদী ধর্ম বলা হয়। মহাযান মতবাদে আদিবুদ্ধই সৃষ্টির আদি কারণস্বরূপ শূন্য বা বজ্র। আদিবুদ্ধ সর্বব্যাপী, সর্বকারণ, সর্বশক্তির আধার ও সর্বজ্ঞ। কারও কারও মতে, আদিবুদ্ধের ধারণার উৎপত্তি বাংলায়। এখান থেকেই তা নেপাল ও তিব্বতে পৌঁছায়।

**আদ্য পরিচয়** গূঢ় তত্ত্বমূলক গ্রন্থ। রচয়িতা পশ্চিমবঙ্গের মালদহের কবি শেখ জাহেদ। হেঁয়ালির ভাষায় রচিত এই গ্রন্থ মোট আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে সৃষ্টিরহস্য, মানবজীবন ও দেহতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান এবং আসন-প্রাণায়ামাদি দ্বারা যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভের কথা আছে। সুফির মারিফত, হিন্দুর তন্ত্র ও নাথের যোগ—এই ত্রিধারার মিশ্রণ রয়েছে এই গ্রন্থে।

**আধুনিক শিক্ষায় মুসলিম নেতৃবৃন্দ** আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একদল মুসলিম নেতার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি বা ইউরোপীয় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার লাভ করে। এঁদের মধ্যে ছিলেন নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৫), মওলানা ওবায়দুল্লাহ উবায়দি সুহরাওয়ার্দি (১৮৩৪-৮৫), নওয়াব ফয়জুননেসা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯৩৩) নবাব খাজা আহসানুল্লাহ (১৮৪৬-১৯০১), নবাব সৈয়দ আবদুস সুবহান চৌধুরী (১৯১৪), নবাব খাজা সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫) খানবাহাদুর মুহম্মদ আলী নওয়াব চৌধুরী (১৮৬০-১৯২১), নবাব হোসাম হায়দার চৌধুরী (১৮৬৮-১৯২১), নবাব সৈয়দ শামসুল হুদা (১৮৬২-১৯২২), খানবাহাদুর আবদুল আজিজ (১৮৬৭-১৯২৬), বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২), নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৮), ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (১৮৭১-১৯৩৬), খানবাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন আহমদ (১৮৬০-১৯৪১), আবদুল করিম (১৮৬৩-১৯৪৩), নবাব আবদুল করিম গজনবী (১৮৭২-১৯১৩), নবাব মির্জা শুজাআত আলী (১৮৬০-?), খুজিস্তা আখতার বানু (১৮৭৩-১৯১৯), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৯) প্রমুখ। এঁদের সবাই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং এ ধারার মধ্য দিয়েই সমাজের অগ্রগতি বা প্রগতি অর্জিত হবে বলে মনে করতেন। কেউ কেউ আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ইসলামি মূল্যবোধ ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারেও আগ্রহী ছিলেন।

**আধ্যাত্মিকতাবাদ** এমন এক ধরনের বিশ্বাস, যা মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের অন্যরূপ ধারাবাহিকতা এবং মৃতের সঙ্গে কোনো মাধ্যমে যোগাযোগ করার সম্ভাবনার কথা বলে। যদিও বিজ্ঞান সাধারণত এ ধরনের বিশ্বাসকে সমর্থন করে না। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ধর্মের একটা নিকট-সম্পর্ক আছে। বিশ্বের

প্রচলিত অনেক ধর্মই আসলে আধ্যাত্মিক চেতনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

**আনন্দময়ী মা** একজন সাধিকা। প্রকৃত নাম নির্মলা সুন্দরী। দাক্ষায়ণী, কমলা ও বিমলা নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার খেওড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য ছিলেন একজন সন্ন্যাসী। অল্প বয়সেই আনন্দময়ীর মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। নামকীর্তন শুনে তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না বললেই চলে। তাঁর স্বামী রমণীমোহন চক্রবর্তী সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভোলানাথ নামে পরিচিত হন। রমণীমোহন ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার নবাবের বাগানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলে নির্মলা তাঁর সঙ্গে শাহবাগে চলে আসেন এবং সিদ্ধেশ্বরীতে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা (১৯২৬) করে ধর্মকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। এই মন্দিরেই একদিন নির্মলা 'আনন্দময়ী মা' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ঢাকার রমনায় তাঁর আশ্রম গড়ে ওঠে। আনন্দময়ীর মতে, জগৎটা নৃত্যময়। জীবের মধ্যে যে প্রাণের স্পন্দন, এমনকি বীজ থেকে যখন অঙ্কুরোদ্গম হয় তখন সেখানেও একধরনের তরঙ্গ বা নৃত্যের সৃষ্টি হয়। যে মূল থেকে তরঙ্গ উত্থিত হয়, একসময় স্তিমিত হয়ে আবার সেই মূলেই তা মিলিয়ে যায়। এই রূপকের মধ্য দিয়ে তিনি আসলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ককে নির্দেশ করেছেন। নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর নৃত্য সম্পর্কে আনন্দময়ীর বিশ্লেষণ শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে আনন্দময়ী স্বামীর সঙ্গে উত্তর ভারতের দেরাদুনে চলে যান এবং সেখান থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণে বের হন। তীর্থস্থান নৈমিষারণ্যে গিয়ে তিনি সেখানে নতুন করে মন্দির নির্মাণ করেন। যজ্ঞ, কীর্তন, নৃত্য-গীত ইত্যাদির মাধ্যমে ভগবৎসাধনার ক্ষেত্র তৈরি এবং এভাবে মানুষকে সুন্দর জীবনযাপনে অভ্যস্ত করার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি পুরোনো তীর্থগুলোর সংস্কার সাধন করেন। ১৯৮৭ সালের ২৭ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**আনন্দমার্গ** একটি ধর্মীয়-সামাজিক সংগঠন। ১৯৫৫ সালের ১ জানুয়ারি ভারতের বিহার রাজ্যের জামালপুর শহরে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর দার্শনিক গুরু প্রভাতরঞ্জন সরকারের মতে, জীবের মধ্যে রয়েছে অনন্তের জন্য তৃষ্ণা। আর ব্রহ্ম হচ্ছে অনন্ত সত্তা। সুতরাং ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেই জীবের সর্বতৃষ্ণার নিবৃত্তি সম্ভব। যে মার্গ বা পথ মানুষকে এই অনন্ত ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে, তা-ই আনন্দমার্গ। আনন্দমার্গীরা মনে করেন, জীবমাত্রই বিশ্বপিতার সন্তান। আর সব মানুষের ধর্ম এক বিশ্বপিতাকে ভালোবাসা। গুরুবাদ, অবতারবাদ ও পুরোহিততন্ত্রে আনন্দমার্গীরা বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে, পশুবলি, পৌত্তলিকতা, ধর্মক্ষেত্রে জাতিগত অধিকারভেদ, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস, প্ল্যানচেট, দেবতার ভর—এ সবই কুসংস্কার। আনন্দমার্গীরা বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, আন্তপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক বিয়ের পক্ষে। আনন্দমার্গীরা আরও মনে করেন, পুরুষের মতো নারীরও জীবনের সব ক্ষেত্রে সমান অধিকার থাকা উচিত। তাঁদের মতে, সাহিত্য ও শিল্পের উদ্দেশ্য মানুষের সেবা ও কল্যাণ করা। আনন্দমার্গের মূলনীতি হলো যুগপৎ আত্মোন্নতি ও জনসেবা। ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, জাম্বিয়া, ঘানাসহ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিমের ('এমার্ট') ত্রাণ-তৎপরতা প্রশংসিত হয়েছে। জাতিসংঘ এমার্টকে এনজিও হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আনন্দমার্গীদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার এবং গুপ্ত সন্ত্রাসী-তৎপরতারও অভিযোগ রয়েছে। ভারত সরকার ১৯৭৫ সালে জরুরি আইনের অধীনে আনন্দমার্গকে নিষিদ্ধ, সংগঠন-পরিচালিত বিদ্যালয়গুলো বন্ধ এবং সংগঠনের প্রধান প্রভাতরঞ্জন সরকারসহ বহু কর্মীকে কারারুদ্ধ করে। ১৯৭৮ সালে লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনারকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তিনজন আনন্দমার্গীকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

**আনসার** শব্দটির অর্থ সাহায্যকারী। মক্কায় কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হজরত মোহাম্মদ (সা.) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে যখন তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন তখন সেখানকার নবদীক্ষিত মুসলমানরা হিজরতকারী

মুসলমানদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল। মদিনায় আসা মুহাজির বা শরণার্থীদের সঙ্গে তাঁরা এমনকি আহার, বাসস্থান ও জীবিকার সংস্থান ভাগ করে নিয়েছিলেন। রাসুল (সা.) ও তাঁর সঙ্গী শরণার্থীদের সাহায্যকারী এই মদিনাবাসীই ইসলামের ইতিহাসে আনসার নামে পরিচিত। আনসাররা রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে মুসলিম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিভিন্ন ধর্মযুদ্ধেও অংশ নেন।

**আনাস ইবনে মালিক (রা.)** সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবাদের অন্যতম। হিজরতের পর মা উম্মে সুলাইম তাঁকে ১০ বছর বয়সে মোহাম্মদ (সা.)-এর বাসায় কাজ করতে দেন। সেখানে তিনি নবী-পরিবারের একজন হয়ে বেড়ে ওঠেন। রাসুল (সা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত আনাস তাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। একমাত্র বদরের যুদ্ধ ছাড়া অন্য সব যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। খেলাফতের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল জুবায়েরকে সমর্থন করেন। হি. ৯৭-১০৭-এর মধ্যে বসরায় তাঁর মৃত্যু হয়।

**আনুবিস** মিসরীয় দেবতা। তাঁর শরীর মানবাকৃতির কিন্তু মাথা শেয়ালের মতো। তাঁর বাঁ হাতে রয়েছে একটা লাঠি। দেবতা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব হলো কবর পাহারা দেওয়া। তাই তাঁকে সমাধির দেবতা বলে গণ্য করা হয়। মমির স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে আনুবিস দেবতার প্রতিকৃতি খোদাই করা থাকে। আনুবিস মৃত ব্যক্তিকে বিচারের জন্য মৃত্যুদেবতা ওসিরিসের কাছে নিয়ে যান।

**আবওয়াব** বৈধ রাজস্ব নয়, এমন কর। বাংলা দেশে মুর্শিদকুলি খানের আমলে এই কর আদায় করা হতো। রাজস্বের অনুপাতে জমিদারদের ওপর এই কর আরোপ করা হতো। জমিদাররা আবার খাজনার অনুপাতে তাঁদের প্রজাদের ওপর এই করের বোঝা চাপাতেন। আওরঙ্গজেব ৮০ প্রকার আবওয়াব ও শুল্ক রহিত করেন। ব্রিটিশ আমলেও তহুরি, মাথোট, খরচা প্রভৃতি নামে এই করপ্রথা বিদ্যমান ছিল।

**আবদ** আরবি শব্দটার অর্থ গোলাম বা দাস। সাধারণত মুসলমানরা তাদের নামের আগে ব্যবহার করে। সেখানে পরের অংশটুকু আল্লাহর কোনো এক নাম হয়। যেমন, আবদুল্লাহ (আল্লাহর দাস), আবদুর রহমান (পরম করুণাময়ের দাস), আবদুর রহিম (অতি দয়ালুর দাস)। একইভাবে আবদুল অর্থ 'তাঁর দাস'। যদিও আরবি অর্থ না জানা থাকায় আমাদের দেশে অনেকে 'আবদুল' শব্দটিকে ভুল বা অসম্পূর্ণ অর্থে ব্যবহার করে।

**আবদুর রহিম, স্যার** বিশিষ্ট আইনবিদ ও রাজনীতিক। জন্ম ১৮৬৭ সালে মেদিনীপুরের এক জমিদার পরিবারে। ফৌজদারি ও ইসলামি আইনে পাণ্ডিত্যের জন্য ১৯০৭ সালে তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্যাগোর ল প্রফেসর পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ পদে নিযুক্ত থাকাকালে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতার সংকলন *প্রিন্সিপলস অব মোহামেডান জুরিসপ্রুডেন্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য সুন্নি স্কুল অব ল* মুসলিম আইনশাস্ত্র বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তিনি সিমলা ডেপুটেশনে অংশ নেন। মুসলিম লীগ গঠনেও তাঁর বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা ছিল। মুসলিম লীগের আলিগড় অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে তিনি মুসলমানদের হিন্দু-নিরপেক্ষ হয়ে চলার পরামর্শ দেন। তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে মুসলিমদের পদোন্নতি ও জুডিশিয়াল সার্ভিসের এক-তৃতীয়াংশ পদে মুসলিমদের নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তিনি স্যার উপাধিতে ভূষিত হন। বিভিন্ন সময় তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য এবং বাংলা সরকারের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২ সালের ১৫ আগস্ট করাচিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

**আবদুল আউয়াল জৌনপুরী** ধর্মপ্রচারক ও সংস্কারক। জন্ম ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে। তিনি মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর পুত্র। অল্পবয়সেই পবিত্র কোরআনে হাফেজ হন। লক্ষ্ণৌ ও মক্কায় অবস্থান করে যথাক্রমে আরবি ভাষা, হাদিস ও তফসিরে বুৎপত্তি অর্জন করেন। অবিভক্ত বাংলায় ইসলাম প্রচার এবং ধর্ম ও সমাজসংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বিশেষ করে, মুসলমান-সমাজে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আত দূর করার জন্য গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করে প্রচার চালান। ধর্মসভায়

ওয়াজের মাধ্যমে মুসলমানদের কুসংস্কার ও সামাজিক কদাচার থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকসহ উর্দু ও আরবি ভাষায় বহুসংখ্যক গ্রন্থের প্রণেতা। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**আবদুল করিম গজনবী, নবাব** (১৮৭২-১৯৩৯) টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের জমিদার ও রাজনীতিক। জন্ম ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালিতে শিক্ষা লাভ করেন। বিভিন্ন সময় তিনি ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য, ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য, সাইমন কমিটির সদস্য ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া সরকারি দূত হিসেবে তিনি সৌদি আরব, সিরিয়া, মিসর ও প্যালেস্টাইন সফর করেন। তাঁর প্রস্তাবক্রমে ব্রিটিশ সরকার ১৯১৩ সালে মোহামেডান এডুকেশনাল অ্যাডভাইজারি কমিটি গঠন করে। কমিটির বেসরকারি সদস্য হিসেবে তিনি মুসলিম শিক্ষানীতি, প্রাইমারি থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পাঠ্যসূচি, নারীশিক্ষা ইত্যাদির ব্যাপারে সুপারিশ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর অভিমত ছিল, মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র কোনো শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। উর্দুভাষী শিক্ষার্থীদের জন্য উর্দু-মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা রেখে, তিনি বাংলা দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাকেই শিক্ষার মাধ্যম করার কথা বলেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি প্রাইমারি থেকে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেন। ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনে প্রাইমারিতে অল্প আরবি শিক্ষার ব্যবস্থা রাখার পক্ষেও তিনি মত দেন। ১৯২৮ সালে হার্টগ কমিটিতে তিনি বাংলাকে বাঙালিদের সর্বজনীন মাতৃভাষারূপে গ্রহণের পক্ষে মত দেন।

**আবদুল মুত্তালিব** হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর দাদা। কুরাইশ বংশের সরদার। পুরো নাম আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম। অর্থাৎ হাসিমের পুত্র মুত্তালিব। জন্ম মদিনায়। পিতৃহীন অবস্থায় বাল্যবয়সেই তিনি তাঁর চাচার সঙ্গে মক্কায় চলে আসেন। তাঁর প্রচেষ্টায় জমজম কূপ পুনরাবিষ্কৃত হয় এবং তিনি হজের সময় হজযাত্রীদের মধ্যে ওই কূপের পানি সরবরাহের দায়িত্ব পান। ইয়েমেনের আবরাহা মক্কা আক্রমণ করলে তিনি মক্কাবাসীর পক্ষে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, নেতৃত্ব দানের যোগ্যতার জন্য মক্কায় তাঁর পরিচিতি ছিল। পিতৃমাতৃহীন মোহাম্মদ (সা.)-এর লালনপালনের দায়িত্বও তিনিই পালন করেন। দৌহিত্রের অসাধারণ গুণাবলি তখনই তাঁর চোখে পড়ে। ৮২ বছর বয়সে আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু হয়। তাঁর বিশাল পরিবারের প্রায় সবাই আগে-পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

**আবদুল লতিফ, নবাব** (১৮২৮-১৮৯৩) শিক্ষাব্রতী। জন্ম ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রামে। কলকাতা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। প্রথমে কিছুদিন শিক্ষকতা করলেও পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরও বিভিন্ন সময় মাদ্রাসা ও কলেজ পরিদর্শক, কর কমিশনার, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসেবে তিনি সরকারি দায়িত্ব পালন করেন। কিছুকাল দেশীয় রাজ্য ভূপালের নবাবের প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন। মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে তিনি প্রচার ও প্রচেষ্টা চালান। ১৮৫৩ সালে তিনি মুসলমান ছাত্রদের জন্য ইংরেজি শিক্ষার সুফল সম্পর্কে ফারসি ভাষায় একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। এতে রক্ষণশীলরা তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয় এবং তাঁকে ধর্মবিরোধী বলে আখ্যায়িত করে। যদিও তিনি আরবিশিক্ষার পক্ষেও যুক্তি তুলে ধরে একটি পুস্তিকা লেখেন। তিনি মাদ্রাসা-শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ইংরেজিশিক্ষা অঙ্গীভূত করার পক্ষপাতী ছিলেন। সমাজসেবায় তাঁর অবদানের জন্য ইংরেজ সরকার তাঁকে খানবাহাদুর ও নবাব উপাধিতে ভূষিত করে। সিপাহি বিদ্রোহের সময় তিনি সিপাহিদের বিপক্ষে ইংরেজ সরকারকে সমর্থন করেন। নিজে ভালো বাংলা জানলেও বাংলা দেশের অভিজাত বা উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের ভাষা হিসেবে তিনি উর্দুর পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। দুটি আত্মজীবনীমূলক পুস্তিকাসহ ইংরেজি ভাষায় তাঁর কয়েকটি মূল্যবান রচনা রয়েছে।

**আবদুল্লাহ** পুরো নাম আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। রাসুল (সা.)-এর পিতা। ৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে

মক্কার কুরাইশ বংশে তাঁর জন্ম। ২৪ বছর বয়সে জুহরি গোত্রের সরদার ওহাবের কন্যা আমিনাকে তিনি বিয়ে করেন। রাসুল (সা.)-এর জন্মের তিন মাস আগে মদিনায় খেজুর কিনতে গিয়ে আবদুল্লাহ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান।

**আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)** বিশিষ্ট সাহাবি। ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী দশম ব্যক্তি। মক্কায় প্রথম প্রকাশ্যে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতকারী। এ জন্য তাঁকে কুরাইশদের হাতে নির্যাতন ভোগ করতে হয়। রাসুল (সা.)-এর পরিবারের একজন হিসেবেই ধরা হতো তাঁকে। হিজরি ২০ সালে খলিফা ওমর (রা.) তাঁকে কুফার শাসনকর্তা আম্মার ইবনে ইয়াসিরের উপদেষ্টা করে পাঠান। তিনি ছিলেন সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। মোট ৮৪৮টি হাদিস তিনি বর্ণনা করেন। পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যাকার হিসেবেও তিনি পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। ৩২ হিজরিতে প্রায় ষাট বছর বয়সে তিনি মদিনায় পরলোকগমন করেন।

**আবদুহ মোহাম্মদ আবদুহ** (১৮৪৯-১৯০৫) মিসরীয় ধর্মতাত্ত্বিক ও সংস্কারক। এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ও অধ্যাত্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেন। পরে প্যান ইসলামিক মতবাদের প্রবক্তা জামালউদ্দিন আফগানির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সংস্কার আন্দোলনে অংশ নেন। *রিসালাত আল তাওহিদ* বা একত্বের ধর্মতত্ত্ব তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। এতে তাঁর বক্তব্য হলো, পবিত্র কোরআনের প্রচলিত তফসিরের প্রতি অন্ধ আনুগত্য ঠিক নয়। পবিত্র কোরআনকে সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্যভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যামূলক তাঁর *তফসির আল মানার* এমন একটি বিস্তৃত কাজ, যাতে গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অতীতের তফসিরগুলোর পর্যালোচনা করা হয়েছে। ধর্ম ও যুক্তিবাদ তথা আধুনিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। এ কারণে অনেকে তাঁকে নব-মুতাজিলাবাদী বলে অভিহিত করত। তিনি মনে করতেন, মুসলিম বিশ্বের পশ্চাৎপদতার জন্য ধর্ম সম্পর্কে মুসলমানদের অজ্ঞতা ও শাসকশ্রেণীর অপশাসন দায়ী। তিনি বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য চেষ্টা চালান। তাঁর মতে, প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব ইতিহাস ও বাস্তবতার আলোকে তার সরকারব্যবস্থা নির্ধারণের স্বাধীনতা থাকা উচিত। রাজনৈতিক মতবাদের জন্য ১৮৮২ সালে তাঁকে মিসর থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরে তিনি মিসরের প্রধান মুফতি নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

**আবরাহা** হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর সমসাময়িক আবিসিনিয়ার খ্রিষ্টান রাজা। ইবরাহিম নামেও পরিচিত। ৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইয়েমেন অধিকার করেন। মক্কার বাণিজ্যিক সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত আবরাহা ওই নগরের প্রভাব নষ্ট করতে ইয়েমেনের সানায় 'আল-কালিস' নামে একটি সুন্দর গির্জা নির্মাণ করেন। কিন্তু উক্ত কৌশলে কাজ না হওয়ায় ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এক বিশাল হাতির বহর নিয়ে মক্কা আক্রমণ করেন। সেই থেকে বছরটিকে 'আমুল ফিল' অর্থাৎ হাতির বছর বলা হয়। মক্কার কাছাকাছি পৌছে হাতিগুলো আর সামনে এগোতে চায় না। কথিত আছে, বাহিনীতে ব্যাপকভাবে বসন্তরোগ দেখা দেওয়ায় আবরাহা তাঁর অভিযান পরিত্যাগ করে ইয়েমেনে ফিরে যেতে বাধ্য হন। পবিত্র কোরআনের সূরা ফিলের আয়াত ৩ অনুসারে উড়ন্ত আবাবিল পাখিদের ছোড়া কঙ্কর বা পাথরের আঘাতে আবরাহার বাহিনী ধ্বংস হয়। সূরায় উল্লেখিত 'হিজারাতিম মিন সিজ্জিল' অর্থ অনেকে করেন 'প্রস্তরাঘাতসম'। তার মানে, আকাশ থেকে পাথর নিক্ষেপ না-ও হতে পারে। বায়ুবাহিত সংক্রামক রোগের রূপকও হতে পারে কথাটা।

**আবাবিল** এক প্রকার ছোট পাখি, বাবুইজাতীয়। মনে করা হয়, আবাবিল সুসংবাদ, প্রশান্তি ও আনন্দের বার্তাবহ। ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে একটি আবাবিল পাখি নাকি সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল। পবিত্র কোরআনের সূরা ফিল-এর ৩ ও ৪ আয়াতে মক্কায় আবরাহার হস্তীবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে আবাবিল পাখির ভূমিকার উল্লেখ আছে এভাবে : 'ওদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি পাঠিয়েছিলেন, যারা ওদের ওপর কঙ্কর ফেলেছিল।'

**আবু উবাইদা ইবনে আল জাররাহ (রা.)** সাহাবি। প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। তাঁর বন্ধু আবুবকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পরদিন তিনি মুসলমান হন। বদরের যুদ্ধে নিজ হাতে বাবাকে হত্যা করে তিনি ধর্মের প্রতি তাঁর প্রবল পরাকাষ্ঠার প্রমাণ দেন। জীবদ্দশায় যে ১০ জনকে মোহাম্মদ (সা.) জান্নাতের সুসংবাদ দেন সেই আশরাফুল মুবাশশারার তিনি অন্যতম। প্রথম খলিফা নির্বাচনের সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। খলিফা ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে তিনি সিরীয় বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন।

**আবুজর গিফারি (রা.)** বিখ্যাত সাহাবি। প্রকৃত নাম জুনদুব ইবনে জুনাদা। 'আবু জর' তাঁর উপনাম। তাঁর পূর্বপুরুষদের পেশা ছিল ডাকাতি। একসময় তিনিও ওই পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তবে গোড়া থেকেই তিনি মূর্তিপূজা ও অংশীবাদের বিরোধী ছিলেন। মক্কায় গিয়ে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পরে মদিনায় হিজরত করেন। রাসুল (সা.) তাঁকে শায়খুল ইসলাম খেতাব দেন। রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পর তিনি সিরিয়া গমন করেন। পরে হজরত ওসমান (রা.)-এর আদেশে সিরিয়া পরিত্যাগ করে জিনদাহ নামক একটি পল্লিতে বাস করতে থাকেন। মুসলিম শাসকেরা যখন সম্পদশালী ও ভোগবিলাসী হয়ে ওঠেন তখন তিনি তাঁদের সমালোচনায় মুখর হন। নীতিগতভাবে তিনি শুধু পুঁজিবাদবিরোধীই ছিলেন না, ব্যক্তিজীবনেও ধনসম্পদ সঞ্চয়ের বিরোধী ছিলেন। জ্ঞানের জন্য তাঁর তৃষ্ণাও ছিল প্রবল। ইসলামের একটি বিপ্লবী বা সাম্যতন্ত্রী ব্যাখ্যার প্রবক্তা হিসেবে তাঁর মতবাদের অনুসারী মুসলিম-সমাজে আজও অনেকে আছেন। তিনি বহু হাদিস বর্ণনা করেন, যার মধ্যে ৩১টি বুখারি ও মুসলিম হাদিসগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ৩১ হিজরিতে রবজাহ নামক স্থানে তাঁর মৃত্যু হয়।

**আবু জাহেল** বিশিষ্ট কুরাইশ দলপতি। মহানবী (সা.) ও ইসলামের প্রধান শত্রু। তাঁর আসল নাম আবুল হাকাম আমর ইবনে হিশাম ইবনে আল মুগিরা, কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে তিনি আবু জাহেল অর্থাৎ 'মূর্খতার পিতা' নামে পরিচিত। হিজরতের আগে ও পরে তিনি রাসুল (সা.)-এর শত্রুতা করেন। বদরের যুদ্ধে তিনি নিহত হন। তাঁর মৃত্যুতে ইসলামবিরোধী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

**আবুবকর (রা.)** ইসলামের প্রথম খলিফা। আসল নাম আবদুল্লাহ ইবনে উসমান। তাঁর ডাকনাম ছিল আবু কুহাফা অর্থাৎ 'ছোট উটের পিতা', প্রাণীগুলোর প্রতি তাঁর মমত্বের কারণে তাঁকে এই নাম দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন রাসুল (সা.)-এর বন্ধু ও শ্বশুর। রাসুল (সা.) তাঁর কন্যা আয়েশা (রা.)-কে বিয়ে করেন। বিবি খাদিজা (রা.) ও হজরত আলী (রা.)-এর পর তিনি তৃতীয় ব্যক্তি, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ধনশালী ছিলেন, কিন্তু মোহাম্মদ (সা.) এবং ইসলামের জন্য অর্থব্যয় করে তিনি কপর্দকহীন হয়ে পড়েন। তাঁর উপাধি আস-সিদ্দিক, অর্থাৎ 'সত্যদ্রষ্টা'। মোহাম্মদ (সা.)-এর মিরাজ গমন এবং আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনায় অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করলে আবুবকর (রা.) বলেন, 'যদি রাসুল (সা.) বলে থাকেন তো তা-ই ঘটেছে, কারণ তিনি সত্যবাদী।' রাসুল (সা.) মদিনায় হিজরতকালে আবুবকর (রা.)-কেই তাঁর সঙ্গী করেন। মহানবী (সা.) অসুস্থ হয়ে পড়লে ইমামতির দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়। রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পর তিনি প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। মাত্র দুই বছর তিনি শাসন করেন (৬৩২-৬৩৪)। সততা ছাড়াও তিনি তাঁর বিনয় ও সারল্যের জন্য সুপরিচিত ছিলেন।

**আবু লাহাব** অর্থ অগ্নিশিখার পিতা। আসল নাম আবদুল উজ্জা। সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর চাচা। আবু লাহাব ও তাঁর স্ত্রী উভয়েই ইসলামের চরম শত্রু ছিলেন। পবিত্র কোরআনের সুরা লাহাব-এর ১-৫ আয়াতে বলা হয়েছে, 'ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত! আর সে নিজে। তার ধনসম্পদ ও তার উপার্জন তার কোনো কাজে আসবে না। সে জ্বলবে অগ্নিশিখায়, আর তার জ্বালানি ভারাক্রান্ত স্ত্রীও, যার গলায় থাকবে কড়া আঁশের দড়ি।' আবু লাহাব এত প্রচণ্ড রকম ইসলামবিদ্বেষী ছিলেন যে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভের সংবাদ শুনে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর সপ্তাহকালের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।

**আবু সুফিয়ান বিন হারব (রা.)** কুরাইশ দলপতি। ইসলাম ও মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রধান শত্রুদের

একজন ছিলেন। বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। রাসুল (সা.)-এর জীবনের শেষ দিকে মেয়ে রামলা (উম্মে হাবিবা) রাসুল (সা.)-কে বিয়ে করার পর তিনি চাচা হজরত আব্বাসকে সঙ্গে নিয়ে রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। হুনায়ন ও তায়েফের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান মুসলমানদের পক্ষে লড়াই করেন। তাঁর স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা ইসলামের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কথিত আছে, ওহোদের যুদ্ধে রাসুল (সা.)-এর চাচা ও মুসলমান পক্ষের বীরযোদ্ধা হামজা (রা.) আহত অবস্থায় ধরাশায়ী হলে হিন্দা তাঁর বক্ষ ফেড়ে কলিজা ভক্ষণ করেন। পঞ্চম খলিফা মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন আবু সুফিয়ান (রা.)-এর পুত্র।

**আবু হুরাইরা (রা.)** বিশিষ্ট সাহাবি। মূল নাম আবদুস শামস। ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী তাঁর উমাইর নামকরণ করেন। ষষ্ঠ হিজরিতে খাইবারের যুদ্ধের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার পর থেকে রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে সব সময় একটি পোষা বেড়াল থাকত বলে মোহাম্মদ (সা.) তাঁকে আবু হুরাইরাহ অর্থাৎ 'বিড়ালের পিতা' বলে সম্বোধন করতেন। সেই থেকে তিনি এই নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি একাই প্রায় সাড়ে তিন হাজার হাদিস বর্ণনা করেন। তাই তাঁকে সুলতানুল হাদিস বা হাদিসের রাজা বলা হয়। দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমরের আমলে তিনি বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত হন। হিজরি ৫৯ সালে মদিনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

**আবুল আলা মওদুদি** জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা ও ইসলামি চিন্তাবিদ। জন্ম ১৯০৩ সালে হায়দরাবাদের ঔরঙ্গাবাদে। তরুণ বয়সে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মুখপত্র সম্পাদনা করেন। ১৯৩৩ সালে হায়দরাবাদ থেকে প্রকাশিত তাঁর *তরজমানুল কোরআন* তাঁকে পরিচিতি এনে দেয়। ১৯৪১ সালে তাঁরই উদ্যোগে জামায়াতে ইসলামী সংগঠনটি গঠিত হয়। তিনিই ছিলেন এর প্রথম আমির বা সভাপতি। তিনি ও তাঁর দল জামায়াতে ইসলামী মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করে। যদিও ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন করে। এই পর্যায়ে পাকিস্তানে ইসলামি বা শরিয়তি শাসন প্রতিষ্ঠাই তাঁদের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫৩ সালে লাহোরে কাদিয়ানিবিরোধী দাঙ্গায় উসকানি দেওয়ার অপরাধে সামরিক ট্রাইব্যুনালে মওদুদির বিচার ও মৃত্যুদণ্ড হয়। পরে তা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তন করা হয়। যদিও দুই বছর পর তিনি মুক্তি পান। নীতিগতভাবে নারী নেতৃত্বের বিরোধী হলেও তিনি ও তাঁর দল জামায়াতে ইসলামী ১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দলের ('কপ') প্রার্থী হিসেবে ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করে। ইসলামের ব্যাখ্যামূলক সুবিশাল *তাফহীম-উল-কোরআন*সহ মওদুদির লেখা বই-পুস্তিকা ও প্রচারপত্রের সংখ্যা শতাধিক। ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যামূলক তাঁর মতবাদের অনুসারীরা পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা—এই দেশগুলোতে জামায়াতে ইসলামী ও সমধর্মী অন্য সংগঠনগুলোর মাধ্যমে যথেষ্ট সক্রিয়। ১৯৭১ সালে ইসলাম ও পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এ সময় জামায়াতে ইসলামী ও তার সশস্ত্র শাখা আলবদর বাহিনী গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও শেষ পর্যায়ে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়ে ধিকৃত হয়। যার পরিণতিতে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৭৯ সালে ৭৬ বছর বয়সে নিউ ইয়র্কের বাফেলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মওদুদির মৃত্যু হয়।

**আবেস্তা** জরথুস্ত্র দ্র.।

**আব্বাস (রা.)** পুরো নাম আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব, মোহাম্মদ (সা.)-এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। সেইসূত্রে রাসুল (সা.)-এর চাচা। যদিও বয়সে রাসুল (সা.)-এর চেয়ে মাত্র

দুই বছরের বড় ছিলেন। আবদুল মুত্তালিব শেষ বয়সে একটি বিয়ে করেন। ওই সংসারে তাঁর দুই পুত্র আব্বাস (রা.) এবং হামজা (রা.) ছোটবেলায় রাসুল (সা.)-এর খেলার সাথি ছিলেন। আব্বাস (রা.) উম্মে ফজল (রা.)-কে বিয়ে করেন। তাঁর সৎবোন জয়নাব (রা.) ও মায়মুনা (রা.) ছিলেন যথাক্রমে মহানবী (সা.)-এর পঞ্চম ও দ্বাদশ স্ত্রী। সফল ব্যবসায়ী আব্বাস (রা.) উত্তরাধিকারসূত্রে মক্কায় পুণ্যার্থীদের পানীয় সরবরাহের কাজ পেয়েছিলেন। উম্মে ফজল (রা.) একেবারে প্রথম দিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেও নবী (সা.)-এর মক্কা-জীবনে আব্বাস (রা.) ইসলামের বিরোধিতা করেন। যদিও আবু তালিবের মৃত্যুর পর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেন। বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি বন্দী হয়েছিলেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের আগে তিনি প্রকাশ্যে মুসলমানদের পক্ষে কাজ করেন। তাই তাঁকে 'সর্বশেষ মুহাজির' নামে অভিহিত করা হয়। বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অভিযানে তিনি অর্থায়ন করেন। হুনায়নের যুদ্ধে ছত্রভঙ্গ মুসলিম বাহিনীকে সংগঠিত করতেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ গোসল করান যাঁরা, সেই সাহাবাদের মধ্যে তিনি একজন। উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে তিনি মদিনার মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য নিজের বাড়ি ছেড়ে দেন। হিজরি ৩২ মতান্তরে ৩৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। আব্বাসীয় খলিফারা তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর বংশধর।

**আব্বাস ইবনে মারওয়ান** বিশিষ্ট সাহাবি। উপনাম আবুল ফজল। তিনি আরবের বিখ্যাত কবিদের অন্যতম। মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের ঘটনা নিয়ে তিনি একটি হৃদয়স্পর্শী কবিতা রচনা করেন। হুনাইন, তাইফ ও আওতাসের যুদ্ধে অংশ নেন। আর প্রতিটি যুদ্ধজয়ের বর্ণনা দিয়ে তিনি কবিতা রচনা করেন। কিছু হাদিসেরও তিনি বর্ণনাকারী।

**আব্বাসীয় বংশ** মুসলমান খলিফাদের একটি বংশধারা যাঁরা ৭৫০ থেকে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ অবধি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মোট ৩৭ জন খলিফা এর অন্তর্ভুক্ত। পূর্বপুরুষ হজরত আব্বাস (রা.)-এর নামে এই বংশটি পরিচিতি লাভ করে। উমাইয়া বংশের পর তাঁরা শাসনক্ষমতায় উমাইয়াদের উত্তরাধিকারী হন। এঁদের একজন খলিফা আল মনসুর বাগদাদে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যের কেন্দ্র দামেস্ক থেকে বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার দিক থেকে আব্বাসীয় আমল বিশেষত খলিফা আল-মামুনসহ কয়েকজনের শাসনকাল মুসলিম ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলে বিবেচিত হয়। ৯৪৫ সালে বুহাইদদের বাগদাদ আক্রমণের পর আব্বাসীয় ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষ আব্বাসীয় খলিফা আল মুস্তাসিম ১২৫৮ সালে মঙ্গোলদের হাতে নিহত হন।

**আভে ভেরুম করপুস** লাতিন ভাষায় এর অর্থ 'স্বাগত হে দেহ'। চতুর্দশ শতাব্দীর ইউকেরিস্ট ধর্মীয় সংগীত। রচয়িতার নাম জানা যায় না। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বেনেডিকশনে বা যিশুভোজের আশীর্বাদে এই সংগীত ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

**আভে মারিয়া** লাতিনে 'স্বাগত মেরি'। মাতা মেরির কাছে রোমান ক্যাথলিকদের প্রার্থনা। শুবার্ট ও গুনের মতো বহু বিখ্যাত সংগীতকার এতে সুর সংযোজন করেন। ইংরেজি ভাষান্তরে সংগীতটির বাণী :

Hail Mary, full of grace!
The Lord is with thee.
Blessed art thou among women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God,
Pray for us sinners,
now, and at the hour of our death.
Amen.

বাংলায় অনুবাদ :

স্বাগত মেরি, মহাকরুণাময়ী,
প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। ধন্য তুমি
নারীদের মধ্যে,
আর ধন্য যিশু, তোমার গর্ভের ফল।
ওগো পুণ্যময়ী মেরি, ঈশ্বরের মাতা
প্রার্থনা করো আমাদের পাপীদের জন্য
এখন, এবং আমাদের মৃত্যুর সময়ে।
আমেন।

প্রথম অংশ বাইবেলের লুক ১: ২৮, ৪২ অনুসরণে।

দ্বিতীয় অংশ 'ওগো মেরি পুণ্যময়ী...প্রার্থনা করো আমাদের পাপীদের জন্য' অপরিবর্তিত রূপ নেয় ১৫০০ সালের মধ্যে।

**আমমার ইবনে ইয়াসির (রা.)** ইয়েমেনি সাহাবি, মা-সহ রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে দেখা করে ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে কুরাইশরা তাঁদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে। আবু জাহেলের বর্শাঘাতে শহীদ হন আমমার মা সুমাইয়া। একইভাবে তাঁর বাবা ও ভাইকেও হত্যা করা হয়। পরে তিনি রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে মদিনায় হিজরত করেন। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রা.) তাঁকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধের সময় তিনি আলী (রা.)-এর পক্ষ সমর্থন করেন। সিফফিনের যুদ্ধে ৯১ বছর বয়সে তিনি মারা যান। এই সাহাবি তাঁর সরল ও আড়ম্বরহীন জীবনযাপনের জন্য আলোচিত ছিলেন। কুফার গভর্নর থাকাকালেও তিনি নিজ হাতে বাজার করতেন এবং নিজেই তা বয়ে আনতেন। পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াতেও এই সাহাবির উল্লেখ আছে।

**আমর ইবনে আবাসাহ (রা.)** বিশিষ্ট সাহাবি ও আবুজর গিফারির ভাই। তিনি মক্কায় গিয়ে রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসুল (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের পর তিনিও হিজরত করেন। মক্কা অভিযান ও তায়েফের যুদ্ধে অংশ নেন। তাঁর বর্ণিত ৪৮টি হাদিস আছে।

**আমর ইবনুল আস (রা.)** বিশিষ্ট সাহাবি ও সেনাপতি। ইসলাম গ্রহণের পর এই ধর্মের প্রচার ও প্রসারে তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি উমান শাসকদের কাছে রাসুল (সা.)-এর পত্রবাহক হয়ে যান। শাসক ভ্রাতৃদ্বয় (জায়ফর ও আববাদ ইবনে জুলানদা) উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। হজরত আবুবকর (রা.)-এর খিলাফতকালে মুরতাদ বা ইসলাম পরিত্যাগকারীদের দমন-অভিযানে নেতৃত্ব দেন। তিনি সিরিয়া ও মিসর জয় করেন। হজরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে মিসরের গভর্নর হিসেবে তিনি ফুসতাত (বর্তমান কায়রো) নগরের গোড়াপত্তন করেন। সে সময় তাঁর উদ্যোগেই একবার সুয়েজ খাল খনন করা হয়। খলিফা উসমান (রা.)-এর সঙ্গে বিরোধে তিনি মুয়াবিয়ার পক্ষ নেন। মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে আলী (রা.)-এর নিযুক্ত গভর্নরকে পরাজিত করে তিনি পুনরায় মিসর দখল করেন। ৯০ বছর বয়সে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি মিসরের গভর্নর পদে বহাল ছিলেন।

**আমর ইবনে উমাইয়া (রা.)** বিশিষ্ট সাহাবি। প্রথম দিকে ইসলামের শত্রু ছিলেন। বদর ও ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। পরে ইসলাম গ্রহণ ও মদিনায় হিজরত করেন। পরবর্তী সব যুদ্ধে তিনি রাসুল (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। তিনিই প্রথম বিরে মাউনায় গমন করেন (চতুর্থ হি.)। মুনজির ইবনে উমরের নেতৃত্বাধীন ইসলামি তবলিগ দলকে বায়ল ও জকু গোত্রের লোকেরা হত্যা করলে দলের ৭০ জন সদস্যের মধ্যে কেবল আমর ইবনে উমাইয়া (রা.)-ই আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। ষষ্ঠ হিজরিতে আবিসিনিয়ার রাজা নাজাশির কাছে তিনি রাসুল (সা.)-এর পত্র নিয়ে যান। তাঁর বর্ণিত ২০টি হাদিস পরবর্তীকালে হাদিস সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

**আমর ইবনে সাঈদ ইবনুল আস (রা.)** সাহাবি। বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি খালিদ ইবনে ওলিদের নিকটাত্মীয় ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। খাইবারের যুদ্ধের (সপ্তম হি.) সময় মদিনায় আসেন। রাসুল (সা.) বিভিন্ন সময় তাঁকে তাবুক, খাইবার ও ফাদাকের গভর্নর নিযুক্ত করেন। রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পর প্রথম খলিফা আবুবকর (রা.)-এর উপর্যুপরি অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি খলিফা পদে থাকতে রাজি হননি। সিরিয়ার আজনাদাইন রণাঙ্গনে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে লড়াই করে তিনি শহীদ হন।

**আমর ইবনে হজম (রা.)** সাহাবি ও সেনাপতি। রাসুল (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের পর তাঁর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। খন্দকের এবং পরবর্তী সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। দশম হিজরিতে

নাজরানের গভর্নর নিযুক্ত হন। পবিত্র কোরআনের তফসির ও ফিকাহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এই সাহাবি আনসারদের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদকে খিলাফতে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে চাইলে তিনি তার বিরোধিতা করেন।

**আমর বিল-মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার** অর্থ সৎ কাজের জন্য বলা ও অসৎ কাজ থেকে নিবৃত্ত করা। সৎ বা ন্যায়সংগত কাজ করা এবং অন্যায় বা অসংগত কাজ থেকে বিরত থাকা যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্যকর্তব্য, তেমনি অপরকে সৎ বা ন্যায়সংগত কাজের জন্য আদেশ, উপদেশ বা উৎসাহ দেওয়া এবং অসৎ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখাও পবিত্র দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের সুরা আল-ই-ইমরান-এর ১১০ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল, মানবজাতির জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে। তোমরা সৎকার্যের জন্য নির্দেশ দাও, অসৎকার্য নিষেধ করো ও আল্লাহয় বিশ্বাস করো।' একই সুরার ১০৪ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা (লোককে) ভালোর দিকে ডাকবে ও সৎকর্মের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখবে। আর এসব লোকই হবে সফলকাম। এ ব্যাপারে হজরত মোহাম্মদও (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কোনো অন্যায় কাজ দেখতে পায় তবে নিজের শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে তা প্রতিরোধ করবে। আর যদি সে সামর্থ্য না থাকে, তবে উপদেশ দিয়ে সংশোধন করবে। আর যদি তা-ও না পারো তবে আন্তরিক ঘৃণা নিয়ে তা থেকে দূরে থাকবে, কিন্তু তা হবে দুর্বল ইমানের পরিচয়।'

**আমাজন** গ্রিক পুরাণে উল্লেখিত যোদ্ধা নারীজাতি। গ্রিক পুরাণে উল্লেখ আছে যে আমাজনরা এশিয়া-মাইনরে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল এবং পুরুষদের তাড়িয়ে সেখানে নারীর শাসন কায়েম করেছিল। নৃবিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে আমাজন হলো শক্তিশালী নারী তথা পুরুষরূপ নারীর উপাখ্যান। পুরুষশাসিত সমাজে নারীবিদ্রোহ বা নারীর স্বাধীন সত্তার প্রতীক হিসেবে আমাজন জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করা হয়।

**আমাতেরাশু** সূর্যদেবী। জাপানের রাজপরিবারকে তারই বংশধর গণ্য করা হয়। জাপানের জাতীয় দেবতা। 'ইসে' নামক মন্দিরে তাঁর মূর্তি সংরক্ষিত আছে।

**আমাল আল হাসানা** অর্থ যে কাজ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। ভালো চুক্তি। একজন মানুষ যখন আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে অর্থাৎ সৎভাবে জীবন যাপন করে, তখন তাঁর সবকিছু থেকে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। তাতে সমাজে সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। জগতের সার্বিক কল্যাণ ঘটে।

**আমিদা** হিব্রু শব্দটির অর্থ দণ্ডায়মান। ইহুদি প্রার্থনারীতি। তালমুদের নির্দেশনা অনুযায়ী জেরুজালেমের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে এই প্রার্থনা করা হয়। ঐতিহ্যগতভাবে উনিশটি বিষয় এই প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞান, বোধ, সব মানুষের জন্য পাপমুক্তি, ক্ষমা ও নিরাময় ছাড়াও, বিশেষ করে ইহুদিদের জন্য ইসরাইলের পরিত্রাণ, শরণার্থীদের সমাবেশ, জেরুজালেমের নির্মাণ ও দাউদ বংশের পুনরুত্থানের জন্য প্রার্থনা করা হয়।

**আমিদা, আমিতাভ, আমিতায়ুস** অর্থ অনন্ত আলো, অনন্ত জীবন। মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় এবং তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মে আরাধ্য বুদ্ধ।

**আমিন/আমেন** 'আমিন' বা 'আমেন' শব্দের অর্থ 'তা-ই হোক' বা 'তথাস্তু'। ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম এই তিন ধর্মেই প্রার্থনা শেষে 'আমেন' বা 'আমিন' শব্দটি উচ্চারিত হয়। 'প্রার্থনা পূর্ণ হোক' বোঝাতেই এই কথাটি বলা হয়ে থাকে।

**আমিনা ওয়াদুদ** ইসলামবিষয়ক পণ্ডিত ও পবিত্র কোরআনের নারীবাদী ব্যাখ্যাকার। জন্ম ১৯৫২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে। তিনি ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক। *কোরআন অ্যান্ড ওম্যান: রিরিডিং দ্য স্যাক্রেড ফ্রম আ ওম্যানস পারসপেকটিভ* তাঁর বিখ্যাত বই। ২০০৫ সালে নিউ ইয়র্কের এক মসজিদে প্রায় ১০০ নারী ও পুরুষ মুসল্লির জুমার নামাজে তিনি ইমামতি করেন। তিনি মনে করেন, শরিয়া সম্পূর্ণ

পিতৃতান্ত্রিক এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে পবিত্র কোরআনের পুনর্ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

**আমিনা বিনতে ওয়াহাব** রাসুল (সা.)-এর মাতা। কুরাইশ গোত্রীয়, যদিও আমিনার পিতা মদিনায় (তখনকার নাম ইয়াসরিব) বাস করতেন। আমিনা বিদূষী ছিলেন বলে তাঁর সঙ্গে আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র অর্থাৎ রাসুল (সা.)-এর পিতা আবদুল্লাহর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। আবদুল্লাহ সিরিয়া থেকে ফেরার সময় ইয়াসরিবে মারা যান। এর কিছুদিন পর রাসুল (সা.)-এর জন্ম হয়। আরবের প্রথা অনুযায়ী চার বছর তাঁকে দুধ-মা হালিমা সাদিয়ার কাছে রাখা হয়। আমিনার কাছে ফিরে আসার পর পুত্রের ছয় বছর বয়সে তিনি তাঁকে নিয়ে ইয়াসরিব গমন করেন। আবওয়া নামক একটি স্থানে তাঁর মৃত্যু হয়।

**আমির ইবনে ফুহাইয়া (রা.)** সাহাবি। অন্য নাম আবু আমর। তিনি ক্রীতদাস ছিলেন। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমান হলে তাঁর মালিক তাঁকে প্রহার করে মারাত্মকভাবে জখম করে। আবুবকর (রা.) তখন তাঁকে ক্রয় করে মুক্তি দেন। হিজরতের সময় রাসুল (সা.) ও আবুবকর (রা.) যখন মদিনার পথে সওর গুহায় আত্মগোপন করে ছিলেন তখন আবুবকর (রা.)-এর ছাগি নিয়ে তিনি সন্ধ্যার অন্ধকারে গুহার কাছে পৌছতেন এবং দুজনকে দুধ খাওয়াতেন। পরে তিনিও মদিনায় হিজরত করেন। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সব কটি যুদ্ধে তিনি অংশ নেন। চতুর্থ হিজরিতে রা'ল ও জাকওয়ান গোত্রের লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করে ইসলাম প্রচারে যাওয়া ৭০ জন সাহাবিকে হত্যা করে। আমির ইবনে ফুহাইয়াও এ সময় শহীদ হন।

**আমির ইবনে রবি'আ (রা.)** সাহাবি। আবু আবদুল্লাহ তাঁর উপনাম। হজরত ওমর (রা.)-এর পিতা খাত্তাব তাঁকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করায় তিনি আমির ইবনে খাত্তাব নামে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু দত্তক গ্রহণকে পবিত্র কোরআন অনুমোদন না করায় তিনি ফের আমির ইবনে রবি'আ নাম নেন। ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি সস্ত্রীক প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে সেখান থেকে মদিনায় হিজরত করেন। বদরসহ সব ধর্মযুদ্ধে অংশ নেন।

**আমির হামজা** দোভাষী পুঁথি। হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর পিতৃব্য আমির হামজার বীরত্ব, সাহস, লৌকিক-অলৌকিক নানা ঘটনা এবং যুদ্ধের কাল্পনিক বিবরণই এই পুঁথির উপজীব্য। আমির হামজার কাহিনি নিয়ে বাংলায় প্রথম কাব্য রচনা করেন আবদুল নবী ১৬৮৪ সালে। পরে মুন্সি গরীবুল্লাহ এই কাব্যের প্রথম খণ্ড এবং সৈয়দ হামজা দ্বিতীয় খণ্ড রচনা করেন। তবে মুন্সি গরীবুল্লাহ রচিত *আমির হামজা* (আনু. ১৭৬৬) পুঁথিটিই বেশি পরিচিতি লাভ করে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দোভাষী সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবেও কাব্যটির বিশেষ মূল্য রয়েছে।

**আমেরিকার আদিম ধর্মীয় আচার** সাধারণভাবে আমেরিকায় দ্বৈত *ঐশ্বরিক* ক্ষমতার অধিকারী একজন ঈশ্বরের ধারণা প্রচলিত ছিল। প্রথমত, তিনি একজন স্রষ্টা, যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে তিনি এভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি একজন পৌরাণিক ব্যক্তিত্ব, একজন বীর অথবা ঐন্দ্রজালিক, যিনি সাধারণ মানুষকে যথাযথ আচরণ শিক্ষা দেন এবং জীবনযাত্রার উপকরণ জুগিয়ে সাহায্য করেন। আর তাঁর প্রতিনিধিরা হলো প্রাকৃতিক শক্তিসম্পন্ন অদৃশ্য আত্মা, যাদের কেউ আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে, কেউ পাতালপুরীতে থাকে ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। ডাকোটানরা অবশ্য স্রষ্টা ও তাঁর প্রতিনিধিদের মধ্যে ঐক্যে বিশ্বাস করেন। সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে তাঁদের মধ্যে নানা রকম কাহিনি প্রচলিত আছে। যেমন, একটি প্রচলিত ধারণা হলো, সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীতে অনেক মানুষ বাস করত, যারা আস্তে আস্তে নানা প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকায় প্রচলিত লোকবিশ্বাস হচ্ছে, পৃথিবীপৃষ্ঠের নিচে অনেক অন্ধকার স্তর রয়েছে, যা বেয়ে বেয়ে মানুষ উঠে এসেছে। এভাবে একদিন একদল মানুষ ভূপৃষ্ঠের একটি ছোট্ট গর্ত দিয়ে ওপরে উঠে আসে এবং

নিজেরা গোষ্ঠী গঠন করে। এ রকম অনেক গোষ্ঠীর মধ্যে জটিল একধরনের লিপি প্রচলিত আছে। অন্য গোষ্ঠীগুলো মৌখিকভাবে তাদের ধর্মবিশ্বাসকে সংরক্ষণ করে। এসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৃত্যুর পরের জীবন, জন্মান্তরবাদ (মানুষ বা প্রাণী হিসেবে পুনর্জন্ম) ইত্যাদি সম্পর্কে নানা রকম ধারণা প্রচলিত আছে। এ ছাড়া মরার পর ভূত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসা বা অন্য জগতে চলে যাওয়ার ব্যাপারটিতেও অনেকে বিশ্বাস রাখত। আবার অনেকে মনে করত, পৃথিবী একাধিক স্তরবিশিষ্ট। দৃশ্যমান প্রাকৃতিক জগৎ তার মধ্যবর্তী একটি স্তরে অবস্থান করছে। পৃথিবী-বৃক্ষ নামে এক মহাবৃক্ষ স্তরগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে। এই গাছের শেকড় পাতালের গভীরে প্রোথিত। এর সুদীর্ঘ কাণ্ড উঠে গেছে প্রতিটি স্তরকে ভেদ করে। আর মাথা আকাশকে স্পর্শ করে আছে।

'শামান' বা ধর্মীয় পুরোহিত একটি সাইবেরিয়ান শব্দ হলেও এটি উত্তর আমেরিকায় প্রচলিত। মনে করা হয়, বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান চলাকালে শামানের শরীরে আত্মা ভর করে। তখন ড্রাম বাজিয়ে ও মন্ত্র পড়ে ব্যাপারটিকে উৎসাহিত করা হয়। এরপর আত্মাদের বলা হয়, তারা যেন দেহ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয় এবং তাদের কর্তব্য পালন করে। এভাবে শামানরা ঘোরের মধ্যে চলে যায়, বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে এবং ঈপ্সিত সমাধান বা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খোঁজে। কিশোর ছেলেরা এ প্রক্রিয়ার বয়ঃসন্ধির আগে ধ্যান, উপোস ও শারীরিক শ্রমের দীক্ষা নেয়। নিজেদের আলাদা করে নিয়ে তারা কিছুদিন বনে-জঙ্গলে বাস করে। সমভূমি অঞ্চলের আদিবাসীরা 'সূর্য-নৃত্য'কে প্রকৃতি সৃষ্টির উৎসব বলে মনে করে। তারা ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানায় এবং মানুষ ও জগতের প্রাচুর্য এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করে। এ ছাড়া এটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠান হিসেবেও বিবেচিত হয়। এ ছাড়া শিকারের আগে ও পরে সাফল্য কামনা করে পালিত হয় শিকার উৎসব।

**আয়াত** আরবি শব্দটির অর্থ নিদর্শন। পবিত্র কোরআনের এক-একটি ক্ষুদ্র অংশকে আয়াত বলা হয়। পবিত্র কোরআনের ১১৪টি সুরায় মোট ৬ হাজার ৬৬৬টি আয়াত আছে। পবিত্র কোরআন পাঠের সময় প্রত্যেক আয়াত শেষ করে কিছুক্ষণ থামতে হয়।

**আয়াতের পরিবর্তন** পবিত্র কোরআনের সুরা ইউনুস-এর ১৫-১৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন আমার স্পষ্ট আয়াত তাদের কাছে পড়া হয় তখন যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না; তারা বলে, এ ছাড়া অন্য এক পবিত্র কোরআন আনো বা একে বদলে দাও। বলো, নিজে থেকে এ পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমার ওপর যা প্রত্যাদেশ হয় আমি তারই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে ভয় হয় শেষ দিনের শাস্তির। বলো, আল্লাহর তেমন ইচ্ছা থাকলে আমি তোমাদের কাছে এ পড়তাম না, আর তিনি তোমাদের এ বিষয়ে জানাতেন না। আমি তো এর আগে তোমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিলাম তবু কি তোমরা বুঝবে না? যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বানায় বা আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড় সীমা লঙ্ঘনকারী আর কে? অপরাধীরা তো সফল হয় না।' পবিত্র কোরআনের সুরা নাহল-এর ১০১ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি যখন এক আয়াতের জায়গায় অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি, তখন তারা বলে, তুমি তো কেবল মিথ্যা বানাও। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তা তিনি ভালোই জানেন, কিন্তু ওদের অনেকেই তা জানে না।' সুরা বাকারা-র ১০৬ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি কোনো আয়াত রদ করলে বা ভুলে যেতে দিলে তার চেয়ে আরও ভালো বা তার সমতুল্য কোনো আয়াত আনি। তুমি কি জানো না যে আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান?'

**আয়ুর্বেদ** ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা-পদ্ধতি। ব্রহ্মাকে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের আদি স্রষ্টা জ্ঞান করা হয়। প্রাচীন ঋষিরা অনেকেই ছিলেন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রবিদ। এঁদের মধ্যে চরক ও সুশ্রুত সর্বাধিক বিখ্যাত। *চরকসংহিতা* ও *সুশ্রুতসংহিতা* তাঁদের সংকলিত আয়ুর্বেদশাস্ত্রের দুটি প্রসিদ্ধ সংকলন। ইংরেজদের ভারত আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদ, ইউনানি ও নানা ধরনের লোকজ চিকিৎসা-পদ্ধতি

চালু ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক বা কবিরাজরা প্রধানত ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবারের সদস্য এবং সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ। ব্যাধি শনাক্তকরণ ও রোগীদের ওষুধ দেওয়া ছাড়াও কবিরাজ ওষুধ সেবনের সময় রোগীকে যথাযথ পথ্য গ্রহণ ও নিয়মকানুন মেনে চলার পরামর্শ দিতেন। ওষুধের উপাদানগুলোর বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং নিজ হাতে বা নিজের তদারকিতে ওষুধ তৈরির ব্যাপারেও তাঁরা যত্নবান ছিলেন।

**আরকানে ইসলাম** ইসলাম ধর্মবিশ্বাসের মূল ভিত্তি বা প্রধান স্তম্ভগুলো। ইসলাম ধর্মমতে মুসলমানদের জন্য পাঁচটি কাজ ফরজ, অর্থাৎ অবশ্যকরণীয়: ১. কলেমা বা ইমান, অর্থাৎ আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন, ২. সালাত বা নামাজ, অর্থাৎ রোজ নিয়মিত নামাজ আদায়, ৩. সাওম বা রোজা, অর্থাৎ রমজান মাসে নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পানাহার বন্ধ রাখা, ৪. জাকাত, অর্থাৎ শরিয়তের বিধান অনুযায়ী সঞ্চিত ধনসম্পদের নির্দিষ্ট অংশ দান এবং ৫. হজ পালন।

**আরজ আলী মাতুব্বর** মুক্তবুদ্ধির চিন্তাবিদ। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৩ পৌষ বরিশাল জেলার লামচরি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। সব ধরনের অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি লিখে গেছেন। তাঁর বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার কথা তিনি একাধিক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। *সত্যের সন্ধানে, সৃষ্টির রহস্য* তাঁর লিখিত উল্লেখযোগ্য বই।

**আরণ্যক** বেদের অংশবিশেষ। বেদের উপসংহার অংশের নাম ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের উপসংহার অংশের নাম আরণ্যক। ব্রহ্মচর্য বিষয়ে গুরুর উপদেশগুলোই আরণ্যকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অরণ্য-আশ্রমে রচিত বলেই এর নাম আরণ্যক। আরণ্যক চারটি: কৌশিতকী, বৃহৎ, ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয়।

**আরতি** প্রদীপ ইত্যাদি দ্বারা দেবমূর্তি বরণ। আরাত্রিক শব্দের অপভ্রংশ। নীরাজন, নির্মন্থন ইত্যাদি নামেও অভিহিত। আরতির উপকরণগুলো হচ্ছে দীপমালা বা পঞ্চপ্রদীপ, জলপূর্ণ শঙ্খ, বস্ত্র (গামছা), আম্রপল্লব, পুষ্প, পাখা, ধূপধুনা, কর্পূরদীপ প্রভৃতি। বিশেষভাবে নির্মিত মৃন্ময় বা ধাতব পাত্রে ধূপধুনা প্রভৃতি উপচার নিয়ে প্রথমে দেবতার পদতলে চারবার, তারপর নাভিদেশে দুবার, মুখমণ্ডলে তিনবার এবং সর্বাঙ্গে সাতবার ঘোরাতে হয়। এ সময় স্তোত্রাদি পাঠ ও শাঁখ, কাঁসর, ঢাক-ঢোল প্রভৃতি বাদ্য বাজানো হয় এবং বাজনার তালে তালে হেলেদুলে নেচেনেচে আরতি করা হয়। আরতি শেষ হয় দেবতাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে।

**আরবি** ভাষাবিশেষ। সেমিটিক বা সামি ভাষা-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আরব অঞ্চলের দেশগুলোর ভাষা। মূল সামি ভাষাটির এখন আর কোনো অস্তিত্ব নেই। সেদিক থেকে আরবি মূল সামি ভাষার নিকটতম। অন্যান্য সামি ভাষার মতো আরবি ভাষায়ও কোনো স্বরবর্ণ নেই, তবে কিছু স্বরচিহ্ন রয়েছে, ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যা ব্যবহৃত হয়। আরবি ভাষায় পুরুষ ও স্ত্রী—এই দুটি লিঙ্গ এবং তিনটি বচন (একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন) আছে। এই ভাষা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লিখতে হয়। আরবি ভাষার লেখ্য রূপ পৃথিবীর সর্বত্র প্রায় এক হলেও বিভিন্ন দেশের কথ্যরীতির মধ্যে বিশেষত উচ্চারণগত পার্থক্য রয়েছে। আরবি ভাষার সঙ্গে এ দেশের মানুষের পরিচয় মূলত বাণিজ্যসূত্রে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে আরব বণিকদের বাংলায় যাতায়াতের ফলে বাঙালিরা আরবি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়। এর ফলে বহু আরবি শব্দ বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করে। বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলায় প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষায় প্রচুর আরবি শব্দ রয়েছে। যেমন, চট্টগ্রামের উপভাষায় ক্রিয়াপদের আগে না-সূচক শব্দের ব্যবহার আরবি ভাষার প্রভাবের ফল। ফারসির মাধ্যমেও বহু আরবি শব্দ বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ ও স্থান করে নিয়েছে।

**আরবি শিক্ষা** ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম বিজয় সূচিত হওয়ার আগে এ দেশে আসা সুফিদের উদ্যোগেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার এবং সেই সূত্রে আরবি শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। এই সুফিদের কয়েকজন হলেন: শায়খ আহমদ ইবনে হামজা নিশাপুরী, বাবা

আদম শহীদ, শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমী, শাহ সুলতান মাহিসওয়ার এবং মখদুম শাহ দৌলা শহীদ। এঁরা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, খানকাহ ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার পর ধর্মপ্রচারে আত্মনিবেদিত সুফি-সাধকদের দ্বারাও এ দেশে বহু শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মওলানা তকীউদ্দীন আল-আরবি (মৃত্যু ১২৯১ খ্রি.) রাজশাহীর মাহীসুনের মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এটিকে এ দেশের প্রথম মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করা হয়। এ মাদ্রাসায় আরবি ও ইসলামি বিষয়াদি শিক্ষা দেওয়া হতো। শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা সম্ভবত ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার সোনারগাঁয় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতবিদ ম্যাক্স মুলারের বিবরণ থেকে জানা যায়, ইংরেজ শাসনের আগে বাংলায় প্রায় ৮০ হাজার মাদ্রাসা চালু ছিল, যাতে আরবি ভাষা শেখানো হতো। ইংরেজ আমলে প্রথমে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে হুগলিতে একটি এবং তারপর ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আরও তিনটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামি শিক্ষার প্রচলিত ধারাটিকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে 'নিউ স্কিম মাদ্রাসা' নামে মাদ্রাসা-শিক্ষার আরেকটি ধারা চালু করা হয়। ১৯৪৭ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। কওমি মাদ্রাসা নামে মাদ্রাসা-শিক্ষার আরও একটি ধারা বহুকাল আগে থেকেই বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। এগুলোতে আরবিশিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং আরবি ব্যাকরণ শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়।

মুসলমানরা আরবিকে পবিত্র ভাষা মনে করেন। কারণ, এই ভাষাতেই 'আল্লাহ কথা বলেছেন', এই অর্থে যে এই ভাষায়ই পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে। অবশ্য সব ভাষাই আল্লাহর, আর পবিত্র কোরআনের আগে তিনি অন্য ভাষায়ও ঐশী বাণী পাঠিয়েছেন। যেমন, পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত বেশির ভাগ নবী হিব্রুতে কথা বলতেন। ঈসা (আ.) হিব্রুর শাখা-ভাষা আরামাইকে কিতাব পেয়েছেন। আরবি ভাষা শেখা বা আরবিতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব অন্যখানে। প্রথমত, এই ভাষা পবিত্র কোরআনের সঠিক বুৎপত্তিগত অর্থ সংরক্ষণ করছে। ভাষান্তর বা অনুবাদে যার পার্থক্য সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, যখন নামাজে আরবি উচ্চারণ করা হয়, তখন ভাষার ঐক্য পৃথিবীর শত কোটি মুসলিমকে এক কাতারে দাঁড় করায়।

**আর্ক** বাইবেল অনুযায়ী নোয়াহ বা নুহ (আ.) নবীর তৈরি কাঠের নৌকা। মহাপ্লাবনের সময় তিনি আপন পরিবারবর্গ ও সঙ্গীসাথিদের নিয়ে এই নৌকায় আশ্রয় নেন। কথিত আছে যে, নৌকায় আরোহণের সময় তিনি প্রত্যেক প্রাণীর এক জোড়া করে তাঁর নৌকায় তুলে নিয়েছিলেন। ফলে ওই প্রাণীগুলো বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায়।

**আর্ক অব দ্য কভেন্যান্ট** প্রাচীন ইহুদিদের পবিত্র নিদর্শন, স্বর্ণখচিত কাঠের সিন্দুক। এটিকে ঈশ্বরের প্রতীক গণ্য করা হতো। ছুঁলে এটি অপবিত্র হতো, তাই স্পর্শকারীর জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। যুদ্ধের সময় এটি সঙ্গে বহন করা সৌভাগ্যজনক মনে করা হতো। হজরত দাউদ (আ.) এটি জেরুজালেমে নিয়ে যান এবং হজরত সুলায়মান (আ.) তা উপাসনালয়ে স্থাপন করেন। পরে এটি অন্তর্হিত হয়।

**আর্ক অ্যানজেল** প্রধান স্বর্গদূত। ওল্ড টেস্টামেন্টের তওরাত পুস্তকে সাতজন আর্ক অ্যানজেলের উল্লেখ আছে। আর্ক অ্যানজেলদের মধ্যে মিকাইল, জিবরাইল ও রেফায়েল সর্বাধিক পরিচিত।

**আর্টিমিস** গ্রিক অরণ্যদেবী। তাঁকে শিকারের দেবীও বলা হয়। দেবরাজ জিউস ও লেটোর কন্যা এবং অ্যাপোলোর যমজ বোন। চিরকুমারী। ট্রয়ের যুদ্ধে তিনি অ্যাপোলোর সঙ্গে ট্রোজান-পক্ষে অংশ নেন। রোমান পুরাণে আর্টিমিসেরই নাম ডায়ানা।

**আর্য** শব্দটির অর্থ ভদ্র, পরিমার্জিত, মহান। ভারত উপমহাদেশ ও ইউরোপের প্রধান জাতিগুলোর পূর্বপুরুষ, যারা খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০-১৫০০-এর মধ্যে মধ্য এশিয়ার তৃণভূমিতে বসবাস করত তারা আর্য নামে পরিচিত। যদিও বর্তমানে জনগোষ্ঠীর চেয়ে ভাষাগোষ্ঠী হিসেবেই আর্য শব্দটি বেশি ব্যবহৃত

হয়। মধ্য-এশিয়ার আর্যরা ছিল আমুদরিয়ার উৎস অঞ্চলে পশুচারণকারী যাযাবর জনগোষ্ঠী। কালক্রমে তারা দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করে। একটি শাখা ভারতের উত্তর সীমানা দিয়ে উপমহাদেশে প্রবেশ করে। পশ্চিম দিকে অগ্রসরমাণ অপর শাখাটি ইরানীয় আর্য নামে অভিহিত হয়। এই শাখার অন্তর্গত জাতিগুলো: ১. গ্রিক-লাতিন, ২. সেল্ট এবং ৩. শ্লাভ ও জার্মান। ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষার শব্দাবলির ধাতুমূলের লক্ষণীয় সাদৃশ্য এসব ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর অভিন্ন উৎস প্রমাণ করে। ইরানে বসবাসকারী আর্যরা পরে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ভারতে প্রবেশের পর আর্যরা স্থানীয় লোকদের পরাজিত করে। সিন্ধু উপত্যকার সমৃদ্ধ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা আর্যদের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অনার্য দ্রাবিড়রাও অবশ্য ভারতবর্ষে বসবাসকারী আর্যদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে।

**আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প** বৌদ্ধ ঐতিহাসিক কাহিনিমূলক গ্রন্থ। এতে রাজনৈতিক ঘটনা ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বিবৃত হয়েছে। যথার্থ ইতিহাস নয় এবং সে কারণে নির্ভরযোগ্য না হলেও বৌদ্ধ জগতে মধ্যযুগের কিংবদন্তিমূলক রচনার সংকলন হিসেবে এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। এতে নৃপতিদের পুরো নাম না দিয়ে কেবল আদ্যক্ষর বা সমার্থক শব্দ দেওয়া হয়েছে। রাজা শশাঙ্কের সঙ্গে কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধনের সংঘর্ষের বিবরণ এই গ্রন্থ থেকেই পাওয়া।

**আর্যসমাজ** হিন্দু সংস্কার বা পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন। বেদের ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম ও সমাজসংস্কারই ছিল এর লক্ষ্য। প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৭-১৮৮৩)। একদিকে হিন্দুসমাজে প্রচলিত অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও নারী জাগরণের লক্ষ্যে এবং অন্যদিকে গো-রক্ষা ও অন্যান্য বৈদিক প্রথার পক্ষে আন্দোলন করে আর্যসমাজীরা।

**আল আকসা** জেরুজালেমে অবস্থিত সুপ্রাচীন মসজিদ। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি খলিফা হজরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশে এটি নির্মিত হয়। যেখানে এটি নির্মিত হয় সেখানে আগে হজরত সুলাইমান (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত একটি উপাসনালয় ছিল। কাবা ঘরের আগে এই স্থানটিকে কিবলা করেই মুসলমানরা নামাজ পড়ত। রাসুল (সা.) মিরাজে আরোহণ করেনও এই স্থান থেকে। উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে মসজিদটি দুবার পুনর্নির্মিত হয়।

**আল আকাবা** অর্থ সুউচ্চ বা সমুন্নত। মদিনার পথে মক্কার উত্তরের এক গিরিপথ। এখানে দুই বছর মোহাম্মদ (সা.) গোপনে মদিনার নবদীক্ষিত মুসলমানদের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ দান করেন। এখানেই মদিনার আনসাররা রাসুল (সা.)-কে মদিনায় হিজরতের জন্য অনুরোধ এবং সেখানে রাসুল (সা.) ও তাঁর সাথিদের রক্ষার ব্যাপারে অঙ্গীকার করেন। ইসলামের ইতিহাসে যা 'আকাবার শপথ' নামে পরিচিত।

**আল-আদফুয়ি** মিসরীয় ঐতিহাসিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ। উত্তর মিসরের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবনচরিত এবং সংগীতের বৈধতা বিষয়ে পুস্তকপ্রণেতা।

**আল-আমিন** অর্থ বিশ্বাসী। প্রাক-ইসলাম যুগেই মোহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা প্রভৃতি গুণ, মোট কথা তাঁর চারিত্রিক নির্মলতা ও পবিত্রতার জন্য মক্কাবাসী 'আল-আমিন' বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করে।

**আল-কায়েদা** আরবি শব্দটির অর্থ ভিত্তি বা পন্থা। এটি একটি চরমপন্থী বা জেহাদে বিশ্বাসী ইসলামি সংগঠনের নাম। আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারির আমলে ১৯৮৮-৮৯-এর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে ওসামা বিন লাদেন এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি বর্তমানে একটি বহুজাতিক বেসরকারি সেনাবাহিনী হিসেবে কাজ করে। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এটি একটি মৌলবাদী সুন্নি আন্দোলন, যা ইসলামি শাসন ও শরিয়া আইনের কঠোর প্রয়োগে বিশ্বাসী। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জেহাদ করাই এর লক্ষ্য। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক, সুদানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আল-কায়েদার ঘাঁটি ও তৎপরতা রয়েছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন টুইন টাওয়ারে বিমান হামলার ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্র জঙ্গিবিরোধী যুদ্ধ ঘোষণা করলে আল-কায়েদা বিশ্বব্যাপী তাদের এক প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ, ন্যাটো,

ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেকগুলো দেশ আল-কায়েদাকে একটি জঙ্গিবাদী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ২০১১ সালের ২ মে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে মার্কিন সেনাদের ঝটিকা আক্রমণে আল-কায়েদা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান লাদেন নিহত হন। তার আগে-পরে পাকিস্তানে ও অন্যত্র আল-কায়েদার বিভিন্ন গোপন ঘাঁটিতে আমেরিকানদের ড্রোন বিমান হামলায় সংগঠনটির বহু নেতা ও কর্মীর মৃত্যু ঘটে। এসবের পরিণতিতে বর্তমানে এই আন্দোলনের শক্তি ও তৎপরতা অনেকটাই খর্ব হয়েছে। তার পরও কঠোর রকম শরিয়তপন্থী ও জঙ্গিবাদী ইসলামি আন্দোলনের ধারা হিসেবে আল-কায়েদার কর্মী, সমর্থক ও অনুসারীরা এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তৎপর। অন্যান্য দেশের অনেক স্থানীয় জঙ্গি সংগঠনও আল-কায়েদার কর্মী ও সমর্থকদের সাহায্য পেয়ে থাকে।

**আল কিন্দি** মুসলিম দার্শনিক (৮০১-৮৭৩ খ্রি.)। তিনি বলতেন, 'পণ্ডিতদের কাজ হচ্ছে, তাঁদের পূর্বপুরুষেরা যা প্রকাশ করতে পারেননি তা নিজেদের ভাষায় এবং যুগোপযোগীভাবে প্রকাশ করা।' তিনি বলতেন, 'কিতাবে সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য যেসব কথা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা ভুল হবে।' জান্নাতের হুর ও অন্য আকর্ষণীয় বিষয়গুলোকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করেন তিনি। তাঁর মতে, পবিত্র কোরআনে যেখানে বলা হয়েছে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পর্বতমালা, বৃক্ষ, পশুপাখি সবাই আল্লাহকে সিজদা করে, সেখানে সিজদার অর্থ ধরতে হবে মান্য করা, সত্যি সত্যি আনত হয়ে প্রণাম করা নয়। কিন্দি আরও বলেছেন, বিশ্বে এমন আইন রয়েছে, যা প্রাণবান ও প্রাণহীন সবাইকে মেনে চলতে হবে। এই দার্শনিককে তাঁর প্রথাবিরোধী মতামতের জন্য ৬০ বছর বয়সে জনসমক্ষে পঞ্চাশ ঘা দোররা মারা হয়।

**আলকেমি** বা **আলকিমিয়া** এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিণত করার রাসায়নিক বিদ্যা। সাধারণত অন্য ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার প্রসঙ্গেই কথাটা ব্যবহৃত হয়। সম্ভবত মিসরেই এই বিদ্যা বা গবেষণার সূত্রপাত। সেখান থেকে তা গ্রিস, রোম ও আরবে সম্প্রসারিত হয়। পরে আরবরা এই বিদ্যা স্পেনে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তা পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। আরব আলকিমিয়াবিদদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাত ছিলেন জাবির ইবনে হাইয়ান। রসায়নশাস্ত্রের সূচনাপর্বে আলকেমির ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে একশ্রেণীর লোকের দ্বারা এই বিদ্যা জাদু ও লোক ঠকানোর কাজে ব্যবহৃত হয়, যা এর গুরুত্ব ও সুনাম খর্ব করে।

**আল-খাজির** বা **আল-খিজর** মূল আরবি 'খিদর' শব্দের অর্থ সবুজ রংধারী। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন মহাপুরুষ। একটি সবুজ পোশাক পরে সর্বত্র ঘুরে বেড়ান বলে তাঁর এই নামকরণ। মুসলমানদের বিশ্বাসমতে, তিনি নবীদের একজন। এমনিতে আরব সংস্কৃতিতে উপকথার নায়ক হিসেবে তিনি বহুল পরিচিত এবং নানারূপে চিত্রিত হয়েছেন। বাংলাদেশে তিনি 'খাজা খিজির' বা 'খোয়াজ খিজির' নামে পরিচিত। মাঝিমাল্লারা তাঁকে 'পীর বদর' বলে সম্বোধন এবং নদীপথে বিপদোদ্ধারে তাঁকে স্মরণ ও তাঁর নামে মানত করে থাকে।

**আলপনা** 'আলিম্পন' শব্দের অপভ্রংশ। পানিতে গোলা চালের গুঁড়ো দিয়ে গৃহ, দেবমণ্ডপ বা হিন্দু ব্রতের অনুষ্ঠানে অঙ্কিত মঙ্গলচিত্র। চালের ঘন পিটুলি তৈরি করার পর মধ্যমা, অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে পুরোনো কাপড়ের টুকরো কিংবা পাটের টুকরো সেই পিটুলিতে ভিজিয়ে নিয়ে অনামিকা দিয়ে আলপনা আঁকা হয়। আলপনার চিরাচরিত মোটিফগুলো হলো পদ্ম, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, ধানের গুচ্ছ, ষষ্ঠীর পুতলি, সর্পিল রেখা, বৃত্তায়িত রেখা, পেঁচা, কলাগাছ, ফুলগাছ, নৌকা, রথ, কল্কা, উদীয়মান সূর্য, গয়না, গোলাবাড়ি, তৈজসপত্র প্রভৃতি। ব্রতভেদে আলপনার মোটিফেরও রূপভেদ হয়। এ ছাড়া তন্ত্রের নানা রকম চিহ্নের সূক্ষ্ম ও জটিল রূপায়ণও আলপনায় দেখা যায়। বিয়ে ও অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত পিঁড়ি, কুলা, মঙ্গলঘট, লক্ষ্মীর

সরা, শখের হাঁড়ি, কলসি প্রভৃতির গায়ে এবং ঘরের সিঁড়ি ও মেঝেতে আলপনা আঁকা হয়।

**আলপান** আপানু নামেও পরিচিত। ইরিত্রিয়া অঞ্চলের প্রেম ও চিত্রকলার দেবী। পাতালপুরীর মৃতের আত্মার নগরের শাসনকর্ত্রী হিসেবেও তাঁকে কল্পনা করা হয়। ডানাযুক্ত নারীরূপেই সাধারণত তাঁকে চিত্রিত করা হয়।

**আলফিন** নাইজেরিয়ার একটি উপজাতি গোষ্ঠীর নাম ওইয়ো। এই ওইয়ো উপজাতির প্রধান ধর্মগুরুকে বলা হয় আলফিন।

**আল-রাজি** যুক্তিবাদী মুসলিম দার্শনিক (৮৬৫-৯২৫ খ্রি.)। তাঁর মতে, আল্লাহ মানুষকে তৈরি করে তার মধ্যে তাঁর যুক্তিজ্ঞানের একটা অংশ প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে সে-যুক্তি প্রয়োগ করে মানুষ বাস্তব জগৎকে বিচার ও উপলব্ধি করতে পারে। আল-রাজিকে তাঁর বক্তব্যের জন্য নানা কষ্ট ভোগ করতে হয়। তিনি একসময় অন্ধ হয়ে যান। এক চিকিৎসক তাঁকে অস্ত্রোপচার করে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, 'আমি পৃথিবীর যথেষ্ট দেখেছি, আর দেখতে চাই না।'

**আলসিওয়ান** গ্রিক দেবী। বায়ুরাজ ইওলাসের কন্যা ও সেইক্সের স্ত্রী। কিংবদন্তি অনুযায়ী, স্বামীকে সমুদ্রতীরে মৃত অবস্থায় পেয়ে আলসিওয়ান বিলাপ করতে থাকলে দেবতারা দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে মাছরাঙায় পরিণত করেন। বিশ্বাস এই যে শীতকালে তিনি প্রায় দুসপ্তাহ সমুদ্রের জলরাশি শান্ত রাখেন, যাতে মাছরাঙাসহ জলচর পাখিরা সমুদ্রের ওপর বাসা বাঁধতে এবং ডিম পাড়া পর্যন্ত বসে থাকতে পারে।

**আলা** উর্বরতার নাইজেরীয় দেবী। পাতালপুরীর শাসনকর্ত্রী, যেখানে মৃতের আত্মারা বাস করে। বিশ্বাস করা হয়, মৃতের আত্মা এই দেবীর পবিত্র জরায়ুর মধ্যে অবস্থান করে। তাঁর প্রতীক হচ্ছে অর্ধচন্দ্র। চিত্রকর্মে এই দেবীকে সাধারণত তাঁর বাহুতে ছোট্ট শিশুবেষ্টিত অবস্থায় দেখা যায়। প্রতিবছর তাঁর অনুসারীরা ইয়াম বা সবজি উৎসব করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

**আলিয়া** রেডইন্ডিয়ান মোহেভদের মধ্যে যে পুরুষ নারীর মতো পোশাক পরে কিংবা পুরুষ স্বামীর সঙ্গে ঘরসংসার করে তাকে আলিয়া বলে। এ ধরনের পুরুষ-বধূরা সাধারণত কর্মঠ হয়ে থাকে। তাদের বিয়ে ও কাল্পনিক গর্ভাবস্থা উপলক্ষে অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। মোহেভদের মধ্যে সমকামী নারীও আছে।

**আলী (রা.)** ইসলামের চতুর্থ খলিফা। সম্পর্কে তিনি মোহাম্মদ (সা.)-এর চাচা আবু তালিবের পুত্র অর্থাৎ মোহাম্মদ (সা.)-এর চাচাতো ভাই। আবার একই সঙ্গে তিনি রাসুল (সা.)-এর মেয়ে ফাতিমা (রা.)-এর স্বামী। হাসান ও হুসেনের পিতা। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.)-এর জীবৎকালে তাঁর সঙ্গে সব কটি ধর্মযুদ্ধে অংশ নেন এবং উপসেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। বীরত্বের জন্য তাঁকে আসাদুল্লাহ বা 'আল্লাহর সিংহ' বলা হতো। রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পর আলী (র.)-ই প্রথম খলিফা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তিনি পরপর আবুবকর (রা.), ওমর (রা.) ও উসমান (রা.)-এর নেতৃত্ব বিনা দ্বিধায় মেনে নেন। আয়েশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে উটের যুদ্ধ এবং মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে সিফফিনের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সমর্থকেরা পরে শিয়া হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তারা মোহাম্মদ (সা.)-এর বংশধরদের বাইরে অন্য কারও খেলাফতের দাবিকে ন্যায্য মনে করে না। হজরত আলী (রা.) কুফার মসজিদে নামাজ আদায়কালে নিহত হন। আক্রমণকারীকে চিনতে পারলেও তিনি তাকে ক্ষমা করে দিতে বলেন।

**আল্লাহ** আরবি ভাষায় স্রষ্টাকে আল্লাহ বলা হয়। আরবি ভাষায় এর কোনো যথার্থ প্রতিশব্দ নেই। ইসলামের আবির্ভাবের আগেও আল্লাহ শব্দটির সঙ্গে আরব সমাজের পরিচয় ছিল। 'আবদুল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহর দাস' কথাটা থেকে যার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তারা দেব-দেবীদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করত, কারণ তারা মনে করত, ওই দেব-দেবীরা তাদের আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে সাহায্য করবে। বাংলা ভাষায় অবশ্য আল্লাহ অর্থে ফারসি 'খোদা' বা 'খুদা' শব্দটিও বহুল প্রচলিত। 'আল্লাহ' শব্দটি নামবাচক বিশেষ্য, আর এর কোনো দ্বিবচন বা বহুবচন নেই। পবিত্র

কোরআনে আল্লাহ নিজের সম্পর্কে পুরুষবাচক ক্রিয়া, বিশেষণ এবং সর্বনাম ব্যবহার করেছেন। ইসলামে আল্লাহই একমাত্র উপাস্য। তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর কোনো জন্মদাতা নেই, তিনিও কারও জনক নন। তিনি নিরাকার, অনাদি, অনন্ত, মহাশক্তিধর এক সত্তা। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। শেষ বিচারের দিনের মালিক। তিনি সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটে না।

**আল্লাহই যথেষ্ট** পবিত্র কোরআনের বনি ইসরাইল সুরার ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমার প্রতিপালকই তাঁর দাসদের পাপকর্মের খবর রাখা ও দেখাশোনার জন্য যথেষ্ট।' সুরা জুমার-এর ৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে, 'বলো, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। যারা নির্ভর করতে চায় তারা আল্লাহরই ওপর নির্ভর করুক।' সুরা আনফাল-এর ৬২ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর যদি তারা তোমাকে ঠকাতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট...।' ৪ সুরা নিসা-এর ৭০ আয়াতে বলা হয়েছে, 'জ্ঞানে আল্লাহই যথেষ্ট।' একই সুরার ৮১, ১৩২ ও ১৭১ আয়াতে বলা হয়েছে, 'কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।'

**আল্লাহর গুণাবলি** পবিত্র কোরআনের সুরা লুকমান-এর ২৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'পৃথিবীর সব গাছ যদি কলম হয়, আর এই যে সমুদ্র, এর সঙ্গে যদি সাত সমুদ্র যোগ দিয়ে কালি হয়, তবু আল্লাহর গুণাবলি লিখে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ তো শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী।' সুরা কাহাফ-এর ১০৯ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমার প্রতিপালকের কথা (লেখার জন্য) সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, এর সাহায্যার্থে এর মতো (আরেকটি সমুদ্র) আনলেও।'

**আল্লাহর বন্ধু** পবিত্র কোরআনের সুরা ইউনুস-এর ৬২ আয়াতে বলা হয়েছে, 'জেনে রাখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।'

**আল্লাহর বাণী** পবিত্র কোরআনের সুরা ইউনুস-এর ৮২ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তাঁর বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, অপরাধীরা তা অপছন্দ করলেও।' পবিত্র কোরআনের সুরা আনআম-এর ৩৪ আয়াতে বলা হয়েছে, '...আর আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। রাসুলদের কিছু খবর তো তোমার কাছে পৌঁছেছে।' একই সুরার ১১৫ আয়াতে বলা হয়েছে, '...আর সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ। এবং তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই। তিনি সব শোনেন, সব জানেন।' সুরা কাহাফ-এর ২৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমার কাছে তোমার প্রতিপালক যে কিতাব পাঠিয়েছেন তার থেকে তুমি আবৃত্তি করো। তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাঁকে ছাড়া তুমি কখনোই অন্য কোনো আশ্রয় পাবে না।'

**আল্লাহর শরণ** পবিত্র কোরআনের ১১৩ সুরা ফালাক্-এর ১-৫ আয়াতে বলা হয়েছে, 'বলো, আমি শরণ নিচ্ছি উষার স্রষ্টার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অমঙ্গল হতে; অমঙ্গল হতে রাত্রির, যখন তা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, অমঙ্গল হতে সেসব নারীর যারা গিঁটে ফুঁ দিয়ে জাদু করে এবং অমঙ্গল হতে হিংসুকের যখন সে হিংসা করে।' সুরা নাস-এর ১-৬ আয়াতে বলা হয়েছে, 'বলো, আমি শরণ নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধীশ্বরের, মানুষের উপাস্যের, তার কুমন্ত্রণার অমঙ্গল হতে, যে সুযোগ মতো আসে ও সুযোগমতো সরে পড়ে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিন বা মানুষের মধ্য থেকে।' সুরা আ'রাফ-এর ২০০ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে তুমি আল্লাহর শরণ নেবে; নিশ্চয় তিনি সব শোনেন, সব জানেন।' একইভাবে সুরা হা মিম সিজদা-র ৩৬ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে উসকানি দেয় তবে তুমি আল্লাহর শরণ নেবে; তিনি সব শোনেন সব জানেন।' সুরা মুমিনুন-এর ৯৭-৯৮ আয়াতে বলা হয়েছে, 'বলো, হে আমার প্রতিপালক! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। বলো, হে আমার প্রতিপালক! আমি ওদের উপস্থিতি থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।'

**আশারাতুল মুবাশশারা** অর্থাৎ সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন। হজরত মোহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় ১০ জন সাহাবিকে তাঁদের পৃথিবীতে থাকা অবস্থায়ই জান্নাতের সুসংবাদ দেন। তাঁদের মধ্যে নয়জনের নাম সব তালিকায়ই পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন: আবুবকর (রা.), ওমর (রা.), উসমান (রা.), আলী (রা.), তালহা (রা.), জুবায়ের (রা.), আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) এবং সাইদ ইবনে জায়েদ (রা.)। কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) ওই তালিকার প্রথম জন। কোথাও বলা আছে, তিনি নিজের নাম উল্লেখ করেননি। তালিকায় দশম জন হিসেবে আবু উবাইদা ইবনে আল জাররাহ (রা.)-এর নাম পাওয়া যায়।

**আশারি** আল-আশারি নামেও পরিচিত। পুরো নাম আবুল হাসান আল ইবনে ইসমাইল আল-আশারি। আরব ধর্মতত্ত্ববিদ। আশারিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম বসরায় ৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু বাগদাদে ৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে। আল-আশারি প্রথমে মুতাজিলাপন্থী ছিলেন। পরে তিনি ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানে মানবিক যুক্তির সামর্থ্যের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং গোঁড়া সুন্নি ও শাফি মজহাবের অনুসারী হয়ে পড়েন। আল-আশারি এই পর্যায়ে মুতাজিলাদের যুক্তিতর্ক নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, যদিও তিনি নিজে তাঁদের পদ্ধতি কিছুটা অনুসরণ করেছেন। যদি আল্লাহ সবকিছু নির্ধারণ করেন, তাহলে মানুষকে কীভাবে তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী করা যায়, মুতাজিলাপন্থী বা যুক্তিবাদীদের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি কাসব বা অর্জনের মতবাদ গড়ে তোলেন। এই মতবাদের মূল বক্তব্য: 'আল্লাহ মানুষের জন্য সব সম্ভাবনা সৃষ্টি করেন, কিন্তু মানুষ তার কর্মের মাধ্যমে একটি বিশেষ ফল অর্জন করে। আল্লাহর পক্ষে পাপজাতীয় কিছু করা সম্ভব নয়। কোনো কিছু পাপময় হয়ে ওঠে কারণ আমরা নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করি। সৃষ্টিকর্তা যেহেতু কারও অধীন নন, কারও আদেশ পালনে বাধ্য নন, তাঁর পক্ষে কোনো পাপ ঘটতে পারে না।' আশারিয়া মতবাদ প্রচার করার জন্য ১০৬৫-৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী হাসান ইবনে আলী নিজাম-উল মুলক কর্তৃক বাগদাদে তাঁর স্মৃতিবাহী বিখ্যাত নিজামিয়াহ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

**আশুরা** মহররম মাসের একটি বিশেষ দিন। ১০ মহররম। এই দিনটি মুসলিম বিশ্বে শোকের দিন হিসেবে পালিত হয়। মহানবী (সা.)-এর দৌহিত্র এবং হজরত আলী (রা.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইমাম হাসানের সঙ্গে মুয়াবিয়ার এই মর্মে সন্ধি হয়েছিল যে, মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর ছোট ভাই ইমাম হুসেন খলিফা হবেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি। ৬০ হিজরির ৯ মহররম ফোরাত নদীর তীরে কারবালা প্রান্তরে ইমাম হুসেন সপরিবারে ইয়াজিদ বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ হন। শেষে দুই দলের মধ্যে যুদ্ধে ইমাম হুসেন-পরিবারের প্রায় সকল পুরুষ শাহাদাত বরণ করেন। হুসেনকে হত্যা করে তাঁর কর্তিত শির সিমার দামেস্কে ইয়াজিদের দরবারে উপহার দিতে নিয়ে যায়। এই মর্মন্তুদ ঘটনার স্মরণে ১০ মহররম দিনটি মুসলিম বিশ্বে প্রতিবছর শোক ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়। কারবালার এই বিয়োগান্ত ঘটনার আগে অবশ্য ১০ মহররম দিনটি আনন্দের দিন হিসেবে বিবেচিত হতো। কারণ, বেশ কয়েকটি শুভ ঘটনার স্মৃতি এই দিনটির সঙ্গে জড়িত। মুসলমানদের বিশ্বাস, আল্লাহ ১০ মহররম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি আরম্ভ করেন। আবার ওই একই দিনে সূর্য থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়, আদমকে সৃষ্টি করা হয়, নুহের নৌকা মহাবন্যার পর মাটি স্পর্শ করে, ইবরাহিম নমরুদের অগ্নিকুণ্ড থেকে মুক্ত হন, লুত নবীর শহর ধ্বংস হয়, ইয়াকুব নবী ইউসুফ নবীর সঙ্গে মিলিত হন, ইউনুস নবী মাছের পেট থেকে তিন দিন ও তিন রাত পর মুক্তি লাভ করেন। মুসলমান নর-নারীরা অনেকেই আশুরা উপলক্ষে রোজা রাখেন। কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনা অবলম্বনে বাংলা ভাষায় মীর মশাররফ হোসেন তিন খণ্ডে তাঁর *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসটি রচনা করেছেন।

**আশ্রম** বলতে সাধারণত সংসারত্যাগীদের আবাসস্থল কিংবা সাধনা বা শাস্ত্রচর্চা কেন্দ্রকে বোঝায়। মূলগত অর্থে আশ্রম হলো সংসারত্যাগী ব্রাহ্মণদের জীবনযাত্রার বিশেষ ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণদের জীবনযাত্রার চারটি অবস্থা হলো যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য,

গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং যতি বা সন্ন্যাস। গুরুগৃহবাস, গুরুসেবা, বেদাধ্যয়ন ও শিক্ষা—এই চারটি অবস্থা ব্রহ্মচর্যের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষা শেষে গুরুর অনুমতি নিয়ে বিয়ে করে সংসারধর্ম পালন করার নাম গার্হস্থ্য। ৫০ বছর বয়স অতিক্রমের পর সংসারের মোহ ত্যাগ করে বনে গমন ও বাস বানপ্রস্থের অন্তর্ভুক্ত। এ অবস্থায় শারীরিক দুঃখকষ্ট ভুলে ফলাহার ও ভগবৎ চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করাই হলো ধর্ম। আর সন্ন্যাস হচ্ছে ভিক্ষান্নে কালাতিপাত ও দেশভ্রমণ এবং সর্বপ্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করা। এই শেষোক্ত অবস্থায় আশ্রমই হয় সন্ন্যাসীর আবাসস্থল।

**আষাঢ়ী পূর্ণিমা** বুদ্ধের জীবনের যত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সব পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে। হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নগরে সাড়ম্বরে আষাঢ়ী পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত হতো। সেবার রাজা শুদ্ধোধনের স্ত্রী রানি মহামায়া আষাঢ়ী পূর্ণিমায় উপোমথ ব্রত অনুষ্ঠান করলেন। সে রাত্রে মহামায়া স্বপ্নে দেখলেন, চারদিক থেকে দেবতারা এসে তাঁকে পালঙ্কসহ উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁরা মহামায়াকে হিমালয়ের ওপর সমতল ভূমিতে এক মহাশাল বৃক্ষের নিচে এনে রাখলেন। তারপর দেবপত্নীরা এসে মায়াদেবীকে হিমালয়ের মানস-সরোবরে স্নান করালেন এবং তাঁকে উজ্জ্বল বসন-ভূষণ ও মাল্যগন্ধে সালংকৃত করলেন। অনতিদূরে শোভা পাচ্ছিল এক রজতপর্বত। আর সেই পর্বতের ওপর এক সুবর্ণপ্রাসাদ। চারদিক থেকে এবার দেবতারা এসে পালঙ্কসহ রানি মহামায়াকে সেই প্রাসাদে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে দিব্যশয্যায় শয়ন করালেন। তখন অদূরবর্তী সুবর্ণপর্বত থেকে এক শ্বেতহস্তী নেমে এল এবং উত্তর দিক থেকে অগ্রসর হয়ে রজতপর্বতে আরোহণ করল। শ্বেতহস্তীটি তার রজতশুভ্র শুঁড়ে একটি শ্বেতপদ্ম ধারণ করে মহাক্রোঞ্চনাদে সুবর্ণপ্রাসাদে প্রবেশ করল। তারপর তিনবার শয্যা প্রদক্ষিণ করে তাঁর দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করে জঠরে প্রবেশ করল। পরদিন প্রত্যূষে রানি রাজাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানালে রাজা ৬৪ জন জ্যোতির্বিদ ডেকে এনে তাঁদের কাছে স্বপ্নফল জানতে চাইলেন। জ্যোতিষীরা বললেন, 'আপনার মহিষী সন্তানসম্ভবা। তিনি এমন এক পুত্ররত্ন প্রসব করবেন, যার গৌরবে বসুন্ধরা ধন্য হবে।' এই পুত্রসন্তানটিই সিদ্ধার্থ। এক আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে শুদ্ধোধন-পত্নী মহামায়া যাঁর আবির্ভাবের স্বপ্ন দেখেন। পরবর্তীকলে সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য ভাব দেখে রাজা শুদ্ধোধন সুন্দরী যশোধরার সঙ্গে পুত্রের বিয়ে দেন। কিন্তু এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেই সিদ্ধার্থ পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র, রাজকীয় সুখ ও ভোগবিলাস সব তুচ্ছ করে মহাভিনিষ্ক্রমণ করলেন। তারপর গয়ার বোধিবৃক্ষতলে ছয় বছর কঠোর সাধনার পর তিনি মহাবোধি লাভ করেন। আবার এক আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিনেই বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের প্রথম ধর্মদেশনা 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' প্রদান করেন। এতসব উপলক্ষের যোগ ঘটাতেই আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিনটি বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের কাছে পরম পবিত্র ও মহিমান্বিত গণ্য হয়। বুদ্ধ যেমন সুকঠোর ধ্যান ও সাধনায় মহাবোধি লাভ করেছিলেন, বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, অনুরূপভাবে নিজের জীবনকে পূর্ণচন্দ্রের মতো ঋদ্ধ-সমৃদ্ধ করাই প্রতিটি বৌদ্ধের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত বলে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রবিদেরা মনে করেন।

**আস সাবউল মাসানি** পবিত্র পবিত্র কোরআনের প্রথম সুরা, সুরা ফাতিহার অন্যতম নাম। এই সুরায় সাতটি আয়াত আছে। বারবার পাঠ করা হয় বলে একে সাবাউল মাসানি বা 'বারবার আগমনকারী সাত আয়াত' বলা হয়।

**আসহাবে কাহাফ** অর্থ গুহাবাসী লোকেরা। প্রাচীনকালে স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাসী এমন কয়েকজন যুবক শাসকদের নির্যাতন এড়াতে এক গুহার ভেতরে একটানা লুকিয়ে কাটান। আসহাবে কাহাফ বলতে এঁদেরই বোঝানো হয়ে থাকে। এ সময় আল্লাহ তাঁদের ও তাঁদের কুকুর আল রাকিমকে ঘুমন্ত অবস্থায় রাখেন। পবিত্র কোরআনে সুরা কাহাফ-এর ৯-২৫ আয়াতে ঘটনাটির উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে তাঁরা ৩০৯ বছর এভাবে ঘুমিয়ে কাটিয়েছিলেন। এ নিয়ে আরব সমাজের অন্য, যেমন খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও নানা লোককথা প্রচলিত আছে।

**আসাবা** দূরসম্পর্কের আত্মীয়স্বজন। ইসলামি নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সেই সব আত্মীয় যাঁরা আসহাবে ফারায়িজ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দের মধ্যে নির্ধারিত হারে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার বণ্টনের পর বাকি অংশের ভাগ পাওয়ার অধিকারী। আসহাবে ফারায়িজের অনুপস্থিতিতে আসাবারা সমস্ত সম্পত্তিরই বৈধ উত্তরাধিকারী হতে পারেন।

**আহল আল-কিতাব** সেই সব জাতি বা ধর্মাবলম্বী যাঁদের কাছে ঐশীবাণী বা কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। সাধারণত ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বোঝানো হয়। তাদের কাছে যথাক্রমে তওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে তারা মু'আহহিদিন, অর্থাৎ মুশরিকের মতো জিম্মি নয়, কিছু বেশি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। মুসলিম শাসনের প্রতি আনুগত্যের শর্তে তারা নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী। মুসলমান বাহিনীর অভিযানের আগে এদের সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হতো, বিশেষ করে যাতে তাদের উপাসনার কোনো বিঘ্ন না ঘটানো হয়।

**আহল আল বায়েত** হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর পরিবারবর্গ ও বংশধর।

**আহল আল সাফফাহ** হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবিদের মধ্যে যাঁদের অবস্থা সচ্ছল ছিল না, তাঁরা মদিনায় মসজিদে নববি অর্থাৎ নবীর মসজিদের বারান্দায় বাস করতেন। বিবি ফাতিমা ও উম্মে আরমান তাঁদের দেখভাল করতেন।

**আহল-ই-সুন্নাহ** সংক্ষেপে সুন্নি হিসেবে পরিচিত। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা বা যে সম্প্রদায়টি পবিত্র কোরআন ও হাদিসকে ইসলামের মূল ধরে কেবল তা-ই অনুসরণের পক্ষপাতী। মহানবী (সা.) বিদায় হজে সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশে বলেছিলেন: 'আমি তোমাদের কাছে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যত দিন তোমরা এদের অনুসরণ করবে, তত দিন পথভ্রষ্ট হবে না। জিনিস দুটো হলো, পবিত্র কোরআন ও আমার সুন্নাত।' আহল-ই-সুন্নাহ বা সুন্নি মুসলমানরা রাসুল (সা.)-এর এই বাণীকে সর্বতো মান্য জ্ঞানে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে নেই, এমন কোনো কিছু অনুসরণ করার নামে বিদ'আত সৃষ্টির বিরোধী।

**আহল-ই-হাদিস** অর্থাৎ হাদিসের অনুসারী। চার মজহাবের কোনো ইমামের অনুসরণ না করে যাঁরা হাদিসের ওপর নির্ভর করেন। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের মতো এঁরা প্রতিটি হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারের পরিবর্তে বরং প্রচলিত সব হাদিসই গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন। কোনো হাদিস বিখ্যাত না হলেও কিংবা তার বর্ণনাকারীর ইসনাদ অর্থাৎ নাম-পরম্পরাসংক্রান্ত সব শর্ত পূরণ না হলেও তাঁরা সে হাদিসকে শুদ্ধ বলে গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে তাঁরা শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও মোহাম্মদ-ইবনে আল-ওয়াহাবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। তাঁরা সুদের সমালোচনা করেন, স্বতন্ত্র ধরনের দাড়ি রাখেন এবং তাঁদের নামাজ আদায়ের ধরনও কিছুটা স্বতন্ত্র। আহলে বা আহলুল হাদিস ও আসহাবুল হাদিস একই সম্প্রদায়ের ভিন্ন নাম।

**আহলান ওয়া সাহলান** আরবি স্বাগতবচন। কাউকে সাদরে অভ্যর্থনা বা সংবর্ধনা জানানোর জন্য আরবিভাষী দেশে এই বাক্যটি ব্যবহৃত হয়। আগমনকারীকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয়: 'এটা আপনারই বাড়ি, নিজের বাড়ি মনে করে এখানে স্বচ্ছন্দে থাকুন।'

**আহলুর রায়** যাঁরা পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানের ও একই সঙ্গে মৌলিক চিন্তাশক্তির অধিকারী, তাঁদের আহলুর রায় বলা হয়। সময়ের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এঁরা ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষা ও বিধিবিধানের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দিতে পারেন। নিজের জীবনেও তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মের নিয়মরীতি মেনে চলেন।

**আহলুল ইজমা** ইজমা দ্র.

**আহলুল কিয়াস** পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহে যদি কোনো সমস্যা বা বিষয়ের মীমাংসা না পাওয়া যায় তখন অন্য কোনো মীমাংসার ওপর ইজতিহাদ করে (ইজতিহাদ দ্র.) যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে বলে 'কিয়াস'। যাঁরা কিয়াস করেন তাঁদের বলা হয় আহলুল কিয়াস। আহলুল কিয়াসদেরও পবিত্র কোরআন ও হাদিস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হয়।

**আহলুল বিদ্‌আ** ধর্মের কোনো নতুন অনুষ্ঠান, যার সম্পর্কে নির্দেশ পবিত্র কোরআন বা সুন্নাহে নেই

এবং রাসুল (সা.) ও তাঁর সাহাবিদের আমলে যা পালিতও হয়নি কিংবা স্বীকৃতি পায়নি, তা পালন করাকে বলা হয় বিদ'আত। আর যাঁরা এ ধরনের অনুষ্ঠান প্রবর্তন বা পালন করেন তাঁদের আহলুল বিদ্আ বলে।

**আহলে বিলায়েত** বিলায়েত বা বিলাত শব্দের অর্থ শাসনকর্তাদের দেশ বা জন্মভূমি। ভারতে মুসলমান শাসনামলে ইরান ও মধ্য এশিয়ার লোকদের আহলে বিলায়েত বলা হতো। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ আমলে ব্রিটেনকে বিলাত বলা শুরু হয়। সেদিক থেকে ব্রিটিশরাও তখন ছিল আহলে বিলায়েত।

## ই

**ইউথ্যানাসিয়া** শব্দটির অর্থ সুখমৃত্যু। দীর্ঘ ও কষ্টদায়ক রোগভোগ থেকে মুক্তি পেতে স্বেচ্ছামৃত্যু। ইসলাম এ ধরনের মৃত্যু অনুমোদন করে না। ইসলাম বরং মৃত্যুপথযাত্রীরও শেষ অবধি বাঁচার অধিকার এবং যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টার পক্ষে। যন্ত্রণা অবসানের জন্য মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করা ইসলাম সমর্থন করে না। আইনবহির্ভূতভাবে কোনো মুসলমানের অন্য কারও প্রাণ হরণের অধিকার নেই।

**ইউরিডিসি** গ্রিক পুরাণের গায়ক-কবি অর্ফিয়ুসের (অর্ফিয়ুস দ্র.) স্ত্রী। বনদেবী। সর্পাঘাতে মৃতা স্ত্রীকে ফিরে পেতে অর্ফিয়ুস পাতালপুরীতে যান। সেখানে তাঁর বীণার সুরে পাতালরাজ হেডিস ও রানি পার্সিফোনকে মুগ্ধ করে তিনি ইউরিডিসকে মর্তলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পান। তবে শর্ত থাকে যে পাতালপুরী না পেরোনো পর্যন্ত অর্ফিয়ুস পেছনে ফিরে তাকাতে অর্থাৎ স্ত্রীকে দেখতে পারবেন না। কিন্তু তাঁরা যখন পাতালপুরীর প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন তখন অর্ফিয়ুস আর তাঁর ঔৎসুক্য চেপে রাখতে পারলেন না, পেছনে ফিরে স্ত্রীকে দেখতে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইউরিডিসি অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। তাঁর আর অর্ফিয়ুসের সঙ্গে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া হলো না।

**ইউরেনাস** গ্রিক শব্দটির অর্থ আকাশ, স্বর্গ। গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী স্বর্গ বা আকাশের দেবতা। আদি দেবতা। গ্রিক দেবতাদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে প্রাচীন অর্থাৎ আদিদেবতা। তিনি ধরিত্রীদেবী গেইয়ার (রোমান পুরাণে যার নাম টেলুস) স্বামী। ইউরেনাসের ঔরসে গেইয়ার গর্ভে টাইটান, সাইক্লোপস ও হেকাটনচেরি—এই তিন শ্রেণীর জীব জন্ম নেয়।

**ইউসুফ** মিসরীয় পুরাণকথার নায়ক। বাইবেলে তিনি জেকব বা ইয়াকুবের প্রিয় পুত্র জোসেফ বা জোযেব। পবিত্র কোরআনে তিনি উল্লেখিত হয়েছেন কেনাননিবাসী ইয়াকুব (আ.)-এর ১২ পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ইউসুফ (আ.) হিসেবে। সুদর্শন এবং পিতার অত্যধিক স্নেহের পাত্র ছিলেন তিনি। ফলে তাঁর ভাইয়েরা তাঁর প্রতি ঈর্ষাকাতর ছিল। একদিন তারা মেষ চরাবার কথা বলে পিতাকে রাজি করিয়ে ইউসুফকে এক নির্জন প্রান্তরে নিয়ে যায়। সেখানে তারা তাঁকে এক কূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরে যায় এবং পিতাকে জানায়, ইউসুফ বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। প্রিয়পুত্র ইউসুফের শোকে ইয়াকুব (আ.) কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যান। একদিন একদল বণিক পথ চলার সময় তৃষ্ণার্ত হয়ে পানির খোঁজে ওই কুয়োর ধারে আসেন। কুয়োর মধ্যে ইউসুফকে দেখতে পেয়ে তাঁরা তাঁকে উদ্ধার করে মিসরে নিয়ে যান এবং সেখানে এক ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের কাছে তাঁকে বিক্রি করে দেন। প্রভুপত্নী জোলেখা ইউসুফের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রেম নিবেদন করেন। ইউসুফ তাঁর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে জোলেখা স্বামীর কাছে ইউসুফের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ করেন। বিচারে তাঁর কারাদণ্ড হয়। ইউসুফ (আ.) ছিলেন বিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মিসরের তৎকালীন রাজা ফেরাউনের দেখা এক অদ্ভুত স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা করে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। এরপর নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতাবলে তিনি মিসরের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর জন্মস্থান কেনানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে পিতা ইয়াকুব (আ.) ও বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা খাদ্যের সন্ধানে মিসরে আগমন করলে ইউসুফের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে। উদার-হৃদয় ইউসুফ

(আ.) ভাইদের পূর্বাপরাধ ক্ষমা করে তাঁদের সাদরে গ্রহণ করেন।

**ইকবাল, মোহাম্মদ** জন্ম ১৮৭৩ সালে পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে। তিনি লাহোর, কেমব্রিজ ও মিউনিখে শিক্ষা লাভ করেন। মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। লন্ডনের লিংকনস ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করার পর দেশে ফিরে তিনি লাহোর হাইকোর্টে আইন ব্যবসা ও পাশাপাশি লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি উর্দু ভাষার একজন প্রধান কবি। যদিও তাঁর বিখ্যাত কাব্যগুলোর বেশ কটিই ফারসিতে লেখা। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলো হলো : *শিকওয়া, জওয়াবে শিকওয়া, আসরারে খুদি, রমুজে বেখুদি, পায়াম-ই-মাশরিক, বাংগ-ই-দারা* প্রভৃতি। ইসলাম বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত বই *দ্য রিকন্স্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম*। এতে তিনি আধুনিক জীবনসমস্যার সমাধানে ইসলামের যুগান্তকারী ভূমিকার কথা বলেছেন, তবে এর জন্য তিনি ইজতিহাদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। মুসলমানদের তিনি মর্দ-এ-মুমিন হতে বলেছেন। তাঁর মতে, ধর্ম ছাড়া পশ্চিমি সভ্যতার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তিনি পশ্চিমা জাতীয়তাবাদকে এই যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে তার মধ্যে নাস্তিকতার বীজ নিহিত রয়েছে। ১৯২২ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯২৬ সালে তিনি তৎকালীন পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে ইকবাল উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বস্তুত তাঁর সে স্বপ্নই এক রকম বাস্তব রূপ লাভ করে। তাই তাঁকে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা বলা হয়। ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকেও তিনি যোগ দেন। ১৯৩৮ সালের ২১ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন। লাহোরের শাহি মসজিদের পাশে তাঁর সমাধিসৌধ অবস্থিত।

**ইকামত** আরবি শব্দটির অর্থ দাঁড়ানো। ফরজ নামাজ মসজিদে বা অন্যত্র আদায় করার আগে ইকামত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইমাম সাহেবের পেছনে মুসুল্লিরা দাঁড়িয়ে পড়েন এবং নামাজের জন্য নিয়ত করেন। এভাবে কাতারবদ্ধ হয়ে আজানের মতো করে চারবার 'আল্লাহু আকবার', দুবার 'আশহাদুআল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', দু'বার 'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্', দুবার 'হাইআলাস সালাহ', দুবার 'হাই আলাল ফালাহ', দুবার 'কাদকা মাতিস সালাহ', দুবার 'আল্লাহু আকবার' এবং পরিশেষে একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে ইকামত সম্পন্ন করা হয়। এর সঙ্গে সঙ্গেই ইমাম সাহেব ফরজ নামাজ শুরু করেন। ইকামতে 'কাদকা মাতিস সালাহের অর্থ সালাত বা নামাজ প্রতিষ্ঠিত হলো। একা নামাজ পড়ার সময় ইকামত নিম্ন স্বরে বলা যায়। নামাজে ইকামত বলা সুন্নত।

**ইকো** গ্রিক পুরাণে বর্ণিত এক সুন্দরী পরি। অন্যের কথার প্রতিধ্বনি করা ছাড়া যার নিজের কথা বলার কোনো ক্ষমতা ছিল না। একদিন বনের মধ্যে একাকী ভ্রমণকালে নার্সিসাসকে (নার্সিসাস দ্র.) দেখে ইকো তাঁর প্রেমে পড়েন। কিন্তু নার্সিসাস অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করায় অপমানিত ও হতাশ ইকো অতঃপর এক গুহার মধ্যে আত্মগোপন করেন। সেখানে নার্সিসাসের কথা ভাবতে ভাবতেই তাঁর দেহাবসান ঘটে। থেকে যায় ইকোর দেহহীন কণ্ঠ।

**ইখতিলাফ** আরবি শব্দ, এর অর্থ মতভেদ। ইসলাম ধর্মের অমৌলিক বা খুঁটিনাটি বিষয়ে মতপার্থক্য অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ইসলামের কোনো বিধিবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মজহাব বা একই মজহাবের বিভিন্ন ইমামের মধ্যে এই মতভেদ দেখা যায়। ধর্মের ব্যাপারে এ ধরনের ছোটখাটো মতপার্থক্যকে খুব স্বাভাবিক গণ্য করে বলা হয়েছে, এর মাধ্যমে সত্য ও অসত্যের যাচাই হয় এবং ভুলভ্রান্তি শুদ্ধ হয়। এ প্রসঙ্গে একটি হাদিসও পাওয়া যায়, যাতে বলা হয়েছে, 'ধর্মীয় আলেমদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে ইখতিলাফ আল্লাহর রহমতস্বরূপ।'

**ইগলযোদ্ধা** প্রাচীন আজটেক সভ্যতায় আচরিত একধরনের ধর্মবিশ্বাস। স্প্যানিশ অধিকারের আগে মধ্য মেক্সিকোর আজটেক অঞ্চলে এর উদ্ভব।

সেখান থেকে তা পেরু ও আলাস্কা অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে। এই সম্প্রদায়ের পুরুষেরা উৎসব-অনুষ্ঠানে ইগলসদৃশ পোশাক পরে নৃত্য করত।

**ইজমা** শব্দটির অর্থ ঐকমত্য। রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পর ধর্মীয় কোনো ব্যাপারে মুজতাহিদ বা ধর্মবেত্তাদের একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অর্থে কথাটা ব্যবহৃত হয়। ইসলাম ধর্মে পবিত্র কোরআন, হাদিসসহ যে চারটি উসুল বা উপায়ের ওপর ভিত্তি করে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, ইজমা তার মধ্যে একটি। অপরটি কিয়াস (কিয়াস দ্র.)। রাসুল (সা.)-এর একটি হাদিসে ইজমার পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়, যেখানে তিনি বলেছেন, 'আমার অনুসারীরা ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিলে কখনো ভুল করবে না।' সাহাবারা এই পদ্ধতিতে অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে যেখানে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না, সেখানে ইজমা দ্বারা ঐকমত্যে পৌছানো হয়, যা ফিকাহ শাস্ত্র দ্বারা অনুমোদিত। যেসব ফকিহ ও আলেম ইজমা দ্বারা সম্মিলিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করেন তাঁদেরকে আহ্‌লুল ইজমা বলা হয়। ইজমা গ্রহণকালে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

**ইজাজ** এ মতবাদ অনুযায়ী মূল আরবি ভাষার পবিত্র কোরআনকে অলংকৃত কিংবা চলিত ভাষারীতিতে পরিবর্তন করা যাবে না। যেহেতু পবিত্র কোরআন আল্লাহর কালাম বা বাণী, সুতরাং এর অক্ষর-শব্দ-অলংকার সবকিছুই খোদ আল্লাহর, এবং তাঁর অনুরূপ আর কেউ করতে পারবে না।

**ইঞ্জিল** নিউ টেস্টামেন্টকে আরবি ভাষায় ইঞ্জিল বলে। পবিত্র কোরআনে মোট ১২ বার ইঞ্জিল শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলমানদের কাছেও ইঞ্জিল শরিফ অন্যতম পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। যদিও বাইবেলই যে পবিত্র কোরআনোক্ত সেই ইঞ্জিল, মুসলমানরা তা মনে করেন না। ইঞ্জিল শব্দটির দ্বারা মোহাম্মদ (সা.)-এর সমকালীন খ্রিষ্টীয় সাধকদের দ্বারা রক্ষিত ও পঠিত শাস্ত্রগ্রন্থকেও বোঝায়। বিশেষত মথি, মার্ক, লুক ও যোহন রচিত মঙ্গলসমাচার চারটিকে ইঞ্জিল মনে করা হয়। আধুনিক কালে খ্রিষ্টানরাও অনেক ক্ষেত্রে বাইবেল অর্থে ইঞ্জিল শব্দটি ব্যবহার করেন।

**ইডিপাস** শব্দটির সঠিক উচ্চারণ অয়দিপাউস। গ্রিক পুরাণে উল্লেখিত থিবস নগর-রাজ্যের রাজা। এই চরিত্রটি নিয়ে বিখ্যাত গ্রিক নাট্যকার সফোক্লিস (আনু. খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯৫-৪০৬) তাঁর কালজয়ী নাটক রচনা করেন। যুবা বয়সে ইডিপাস স্ফিংসের রহস্য ভেদ করেছিলেন। দৈববাণীকে সত্যতা দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ না জেনে প্রথমে পিতা লেয়াসকে হত্যা এবং পরে মা জোকাস্টাকে বিয়ে করেন। এর দ্বারা তিনি তাঁর রজ্যবাসীর জন্য অভিশাপ ডেকে আনেন। তাঁর নিজেরই আগ্রহে পরে সত্য উদ্‌ঘাটিত হলে জোকাস্টা আত্মহত্যা এবং ইডিপাস আপন চোখ দুটি উপড়ে অন্ধত্ব বরণ করেন। ইডিপাসের জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি নিয়ে লেখা সফোক্লিসের নাটক *রাজা ইডিপাস শ্রেষ্ঠ* ট্র্যাজেডির দৃষ্টান্ত হিসেবে কালজয়ী হয়েছে। ইডিপাসের কাহিনিতে মায়ের প্রতি সন্তানের আকর্ষণের ওপর ভিত্তি করে মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর বিখ্যাত 'ইডিপাস কমপ্লেক্স' তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন।

**ইড়া** হিন্দু পুরাণবর্ণিত মনুর অনৌরসজাত কন্যা। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, একদা বৈবস্বত মনু প্রজা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এক পাকযন্ত্র তৈরি করে তাতে ঘি, মাখন ও আমিক্ষা জলে নিক্ষেপ করলে সেই জল থেকে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মিত্রাবরুণ তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি মনুদুহিতা। মিত্রবরুণ তখন তাঁকে বলেন, তুমি আমার। ইড়া কোনো উত্তর না দিয়ে মনুর কাছে গিয়ে বলেন, আমি আপনার কন্যা, আমাকে যজ্ঞে অর্পণ করুন। মনু তখন ইড়াকে দিয়ে কঠোর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন।

**ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না** তন্ত্রমতে মেরুদণ্ডের বাঁ দিকের নাড়িটিকে 'ইড়া' ও ডান দিকে অবস্থিত নাড়িটিকে 'পিঙ্গলা' বলা হয়। ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যস্থিত অপর একটি সূক্ষ্ম নাড়ির নাম 'সুষুম্না'। এই তিনটি নাড়ির মিলনকে বলে 'ত্রিবেণি'। নাড়ি তিনটি যথাক্রমে চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির গুণবিশিষ্ট। সাধকদের কাছে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না যথাক্রমে গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতী স্বরূপ।

**ইৎসিং** চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি ৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব ভারতের তাম্রলিপ্তে পৌছান এবং সেখান থেকে পদব্রজে নালন্দা, রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, বৈশালী, কুশীনগর, সারনাথ প্রভৃতি উত্তর ভারতের বিখ্যাত সব বৌদ্ধতীর্থ পরিদর্শন করেন। ভারতীয় ভিক্ষুদের সাহায্য নিয়ে তিনি মোট ৫৬টি বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়। সমস্ত বিনয়পিটক তিনি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। এ ছাড়া তিনি সাতটি মৌলিক গ্রন্থও রচনা করেন। যার মধ্যে দুটি গ্রন্থ ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে খুব মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। গ্রন্থ দুটির একটিতে ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তৎকালীন বৌদ্ধধর্মের অবস্থা ও রীতিনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি ইংরেজিতে ও শেষেরটি ফরাসিতে অনূদিত হয়েছে। ৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে ৭৮ বছর বয়সে ইৎসিংয়ের মৃত্যু হয়।

**ইদরিস** অন্যতম নবী। পবিত্র কোরআনের সুরা মরিয়ম-এর ৫৬-৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনি ছিলেন সত্যবাদী নবী। আর আল্লাহ তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন।' সুরা আম্বিয়া-র ৮৫ ও ৮৬ আয়াতেও ইদরিস নবীর ধৈর্যশীলতার উল্লেখ করে তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে। কথিত আছে যে তিনিই প্রথম পৃথিবীতে লেখার প্রচলন করেন। কাপড় বোনার কাজও তাঁর সময়ই শুরু হয়। তিনি সৌর ও ভেষজবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মৃত্যু কীভাবে ঘটে তা নিয়ে বিতর্ক আছে।

**ইদ্দত** অর্থ অপেক্ষার কাল। বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্ত নারীদের পুনর্বার বিয়ে করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ইসলামি বিধান। এ ক্ষেত্রে যদি সে নারী গর্ভবতী থাকে, তবে তাঁর সন্তান না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে ইদ্দত পালন করতে হয়। এতে আসা সন্তানের পিতৃত্ব নিরূপণ সম্ভব হয়। তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দত পালন এ জন্য যে, যদি স্বামী সঠিক নিয়মে তিনবার তালাক উচ্চারণ না করে থাকে, তবে এই সময়ের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর সমঝোতা হয়ে যেতে পারে। তালাকের ক্ষেত্রে এই ইদ্দতের মেয়াদ তিন মাস বা তিন ঋতুকাল। আর যদি স্বামীর মৃত্যুর পর গর্ভে সন্তান না থাকে, তাহলে স্ত্রীকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। ইদ্দতকালে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতে স্বামী নৈতিকভাবে বাধ্য।

**ইন-ইয়াং** চৈনিক ধর্ম, দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে পৌরুষ, আলোক, উষ্ণতা ও ক্রিয়াশীলতার ধারকশক্তি হিসেবে ইনের এবং তার বিপরীতে যথাক্রমে নারীত্ব, অন্ধকার, শীতলতা ও নিষ্ক্রিয়তার ধারকশক্তি হিসেবে ইয়াংয়ের কল্পনা করা হয়। ইন ও ইয়াংয়ের পারস্পরিক মিলনেই যাবতীয় সত্তা সৃষ্টি হয়। ইয়াং আদি সৃষ্টিতত্ত্বের গতিময়তার নীতি এবং ইন স্থিরতার নীতি। ইন ও ইয়াং-এর মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমেই জাগতিক সবকিছুর জন্ম। ইনকে বলা হয় নারী, ধাতু ও জল। ইয়াংকে বলা হয় পুরুষ, কাঠ ও আগুন। অনেকের মতে, ইয়াং ও ইন তাওবাদের শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

**ইনশা আল্লাহ** আরবি কথাটার অর্থ আল্লাহ যদি চান বা ইচ্ছা করেন। পবিত্র কোরআনের সুরা কাহাফ-এর ২৩-২৪ আয়াতে বলা হয়েছে, 'কখনোই তুমি কোনো ব্যাপারে বোলো না, আমি ওটা আগামীকাল করব, ইনশা আল্লাহ [আল্লাহ চাইলে] না বলে। যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো ও বলো, সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে গুহাবাসীর কাহিনির চেয়েও নিকটতর সত্যের পথের নির্দেশ দেবেন।' একই প্রসঙ্গে সুরা কলম-এর ১৭-২০ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি ওদের পরীক্ষা করব, যেভাবে আমি পরীক্ষা করেছিলাম সেই বাগানের মালিকদের, যখন ওরা শপথ করে বলেছিল যে, ওরা সকালে বাগানের ফল পেড়ে আনবেই কোনো ব্যতিক্রম না করে (ইনশা আল্লাহ না বলে)। তাই যখন ওরা ঘুমিয়েছিল তখন তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এক বিপর্যয় সেই বাগানে হানা দিল, ফলে তা পুড়ে গিয়ে রাতের আঁধারের মতো কালো হয়ে গেল।'

**ইনানা** সুমেরীয় মাতৃদেবী। নিনা নামেও পরিচিত। তিনি স্বর্গের রানি, ঋতুচক্র ও উর্বরতারও দেবী।

**ইনিয়েস** রোমান পুরাণ অনুযায়ী রোমান জাতির প্রতিষ্ঠাতা। ট্রোজান যোদ্ধা। তিনি দেবী ভেনাস বা আফ্রোদিতির পুত্র এবং ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের

ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা। ট্রয় নগর ধ্বংস হওয়ার সময় দেবী ভেনাসের নির্দেশে ইনিয়েস বৃদ্ধ পিতা অ্যাংকাইসিজ, স্ত্রী ক্রেউসা, পুত্র অ্যাসকানিয়াস এবং কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরসহ ট্রয় ত্যাগ করেন। ট্রয় পার হওয়ার আগেই অবশ্য তাঁর স্ত্রী ইনিয়েস আত্মহত্যা করেন। অতঃপর ডেলোস, ক্রিট, সিসিলি, কার্থেজ প্রভৃতি অঞ্চলে দীর্ঘ পরিভ্রমণ শেষে ইনিয়েস ইতালিতে ফিরে দৈবনির্দেশে সেখানে একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন। রোমকদের ধারণা ছিল, সেখান থেকেই তাদের উৎপত্তি।

**ইনুইট** মেরু অঞ্চলের এস্কিমো নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী। নিজেদের তারা এস্কিমো না বলে বরং ইনুইট নামে সম্বোধন করে। ইনুইটদের জীবন হলো শীত আর ক্ষুধার সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের কাহিনি। তারা বিশ্বাস করে, সব মানুষ আর প্রাণীর মধ্যেই আনুয়ার (আত্মা) অস্তিত্ব বিদ্যমান। জীবনধারণের জন্য তারা শিকারের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। ফলে প্রাণীদের সব সময় শিকারির ধরাছোঁয়ার মধ্যে রাখতে তারা ব্যক্তি, পরিবার ও গোষ্ঠীপর্যায়ে নানান বিধিনিষেধ মেনে চলে। শিকার-অভিযানের আগে ও পরে তারা অনেক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। যেমন তাদের বিশ্বাস, সেডনা অথবা টাকান্ডালুক নামে পাতালপুরীর দেবী জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দায়িত্বে নিয়োজিত। আর তিনি অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক মাছ। ইনুইটরা শিকারসংক্রান্ত বিধিনিষেধ কতটুকু মানছে দেবী তা লক্ষ করেন এবং সেই অনুযায়ী প্রাণীদের শিকার হতে দেন। ইনুইটরা এ-ও বিশ্বাস করে, প্রত্যেক প্রজাতির স্তন্যপায়ীর একজন করে দেব/দেবী আছেন যিনি তাদের মালিক, রক্ষক বা প্রতিপালক। প্রত্যেক গোত্রের ধর্মীয় নেতাকে 'শামান' নামে অভিহিত করা হয়। তার কাজ রোগের কারণ নির্ণয় এবং শিকার-অভিযান ব্যর্থ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা। এ ব্যাপারে কেউ দায়ী বলে চিহ্নিত হলে তাকে একঘরে করে দেওয়া হয়।

**ইন্দ্র** দেবরাজ। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী অদিতির গর্ভে ও মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ইন্দ্রের জন্ম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই তিনজন ছাড়া বাকি দেবতাদের ওপর তিনি কর্তৃত্ব করেন। তাঁর জন্মকালে আকাশ ও পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল। তাঁর কেশ, শ্মশ্রু, অশ্ব ও রথ পিঙ্গলবর্ণ। তিনি সহস্রাক্ষ। তাঁর হাত দুটি দীর্ঘ। তাঁর অস্ত্র বজ্র। সোমরস তাঁর প্রিয় পানীয়। তিনি বায়ুমণ্ডলের দেবতা, আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাতের ওপর কর্তৃত্ব করেন। বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের দ্বারা তিনি অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি ঘটাতে পারেন। তিনি চিরযুবা, আজন্ম যোদ্ধা, শত্রুদমনকারী ও অজেয়। ঋগ্বেদের চতুর্থাংশজুড়ে তাঁর বর্ণনা আছে। রাক্ষস, অসুর, দৈত্য, অহি, বৃত্র, উরণ, বিশ্বরূপ, অর্বুদ, বল প্রভৃতি দানব ইন্দ্রের শত্রু। তিনি সূর্যালোকে উষাকে প্রকাশ করেন। শত অশ্বমেধযজ্ঞে ইন্দ্রত্ব লাভ হয়। ইন্দ্র তাই নৃপতিদের শত অশ্বমেধযজ্ঞে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন। মুনি-ঋষিদেরও তাঁর ভয়, অপ্সরাদের দ্বারা তিনি তাঁদের তপোভঙ্গ করান। দৈত্য-দানবদের তিনি যেমন দমন করেন, তেমনি অনেক সময় তাদের দ্বারা পরাভূতও হন। একবার বৃত্রাসুর কর্তৃক পরাভূত হয়ে ইন্দ্র স্বর্গচ্যুত হন। পরে দধীচির অস্থিনির্মিত বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে হত্যা করে তিনি স্বর্গ পুনরুদ্ধার করেন। গৌতম মুনি, দুর্বাসা মুনি ও কৃষ্ণের সঙ্গে বিরোধ, মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় প্রভৃতি নানা কাহিনি তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত আছে।

**ইন্দ্রজাল** অনিষ্টকর জাদুবিদ্যা। ইংরেজি Witchcraft এবং Sorcery-র সমার্থক। এই ধরনের জাদুবিদ্যা সাধারণত অসামাজিক এবং অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি Magic শব্দের অর্থও জাদুবিদ্যা। কিন্তু Witchcraft অর্থে যে জাদুবিদ্যা বোঝায় তা ঈর্ষা-জিঘাংসা প্রণোদিত এবং সামাজিকভাবে অস্বীকৃত। হীন স্বার্থে তা প্রয়োগ করা হয়। ম্যাজিক অর্থে যে জাদুবিদ্যা তা-ও কখনো কখনো অপরের ক্ষতিসাধনার্থে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু রোগ নিরাময়, চোর বা অপরাধীদের পাকড়াও ও শায়েস্তা, বৃষ্টি নামানো, খেতের ফসল রক্ষার মতো কল্যাণকর কাজে তার ব্যবহারের কথা জানা যায়। Witchcraft বা Sorcery অর্থে যে ইন্দ্রজাল বা জাদুবিদ্যা তা মানুষ হত্যার মতো জঘন্য কাজেও প্রয়োগ হয়।

**ইন্দ্রজিৎ** বা মেঘনাদ। রামায়ণের চরিত্র। রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র। মাতা মন্দোদরী রাবণের প্রধান

মহিষী। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন মেঘ গর্জনের মতো শব্দ করায় তাঁর এক নাম মেঘনাদ। মহামায়ার পূজা করে তিনি মায়াবল লাভ করেন। দিগ্বিজয় করতে একদা রাবণের সঙ্গে স্বর্গে গিয়ে তিনি ইন্দ্র ও তৎপুত্র জয়ন্তকে পরাভূত করেন এবং ইন্দ্রজিৎ আখ্যা পান। ইন্দ্রের বন্দিদশা মোচন করার বিনিময়ে তিনি ব্রহ্মার কাছে অমরত্বের প্রার্থনা করেন, কিন্তু ব্রহ্মা তাতে অস্বীকৃত হওয়ায় ইন্দ্রজিৎ অতঃপর পূজার জপ ও হোম সমাপনান্তে অগ্নিরথে থেকে যুদ্ধরত অবস্থায় অমরত্বের দাবি করেন। ব্রহ্মা এতে স্বীকৃত হন। রাম-রাবণের যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ প্রথমে রাম-লক্ষ্মণকে পরাজিত ও অজ্ঞান করেন। কিন্তু হনুমান ওষুধ এনে তাঁদের সঞ্জীবিত করেন। তখন নিকুম্ভিলা যজ্ঞের মাধ্যমে ইন্দ্রজিৎ অজেয় হওয়ার সংকল্প করেন। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগেই লক্ষ্মণ নিরস্ত্র অবস্থায় পেছন থেকে আক্রমণ করে ইন্দ্রজিৎকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেন।

**ইন্দ্রদ্যুম্ন** সূর্যবংশীয় রাজা। তিনি অবন্তি বা উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করতেন। একদিন তিনি বিষ্ণুপূজা করতে মনস্থ করেও পূজার জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে তিনি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে এসে পূজা করেন। পূজা ও যজ্ঞাদি শেষে ইন্দ্রদ্যুম্ন সেখানে একটি বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেন; কিন্তু মন্দিরে তিনি কী মূর্তি স্থাপন করবেন তা স্থির করতে পারছিলেন না। চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে বিষ্ণু তাঁকে তাঁর সনাতনী মূর্তিই প্রতিষ্ঠা করতে বলেন। বিষ্ণু তাঁকে বলেন, ভোরে সমুদ্রতীরে গিয়ে তিনি একখণ্ড কাষ্ঠ ভেসে যেতে দেখবেন। ওই কাঠ দিয়েই যেন তিনি তাঁর মূর্তি নির্মাণ করেন। পরদিন সকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন সমুদ্রতীরে যান এবং এক ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড পেয়ে নিজ হাতে কুঠার দিয়ে তা কাটতে থাকেন। এমন সময় বিষ্ণু ও বিশ্বকর্মা ছদ্মবেশে সেখানে এসে উপস্থিত হন এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে কাঠ কাটার কারণ জিজ্ঞেস করেন। রাজার জবাব শুনে ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণু বলেন, এই কাজ রাজাকে দিয়ে হবে কি না সন্দেহ। তাঁর সঙ্গে একজন শিল্পী আছেন, যিনি বিষ্ণুর প্রতিমূর্তি তৈরি করে দিতে পারবেন। বিষ্ণুর এ প্রস্তাবে ইন্দ্রদ্যুম্ন সম্মত হন এবং ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বকর্মাকে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি তৈরি করে দিতে বলেন। বিশ্বকর্মা তখন শঙ্খচক্র ও গদাধারী কৃষ্ণমূর্তি, গৌরবর্ণ লাঙ্গলাস্ত্রধারী বলদেব মূর্তি এবং সুভদ্রার মূর্তি নির্মাণ করে দেন।

**ইন্দ্রধ্বজ** অসুরবিনাশী ধ্বজ। দেবাসুরের যুদ্ধে উৎপীড়িত দেবতারা ব্রহ্মার উপদেশে নারায়ণের স্তব করেন। ব্রহ্মা তাঁদের বলেন যে, ক্ষীরোদসাগরে গিয়ে নারায়ণের স্তব করলে দেবতারা একটা ধ্বজ পাবেন, যা তাঁদের অসুর বিনাশে সাহায্য করবে। দেবতারা ক্ষীরোদসাগরে গিয়ে নারায়ণের স্তব করলে নারায়ণ তুষ্ট হয়ে তাঁদের সেই ধ্বজ দান করেন। সেই ইন্দ্রধ্বজের সাহায্যে দেবতারা অসুরদের পরাজিত করেন। নারায়ণ আরও বলেছিলেন, যে রাজা ইন্দ্রধ্বজের পূজা করবেন, তাঁর রাজ্য শস্যপূর্ণ হবে; সে রাজ্যের প্রজা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রজারা নীরোগ থাকবে। রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় পূর্বকালে তাই রাজারা ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে এই ধ্বজা বিধিমতো পূজা করে মাটিতে প্রোথিত করতেন। পরে ওই ধ্বজা বিসর্জন দেওয়া হতো।

**ইন্দ্রপ্রস্থ** পাণ্ডবদের রাজধানী। মহাভারতে বর্ণিত আছে, পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে লাভ করে হস্তিনাপুরে এলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের অর্ধেক রাজ্য দান করেন। তাঁর কথামতো পাণ্ডবরা অতঃপর রাজধানী হস্তিনাপুর থেকে কিছু দূরে যমুনাতীরবর্তী খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। নবনির্মিত এই নগরটির নাম হয় ইন্দ্রপ্রস্থ। যুধিষ্ঠিরই ছিলেন ইন্দ্রপ্রস্থের প্রথম রাজা। পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে, ত্রিদশাধীশ ইন্দ্র এখানে অনেক যাগযজ্ঞ করেন এবং সেসব যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের বহু রত্ন দান করা হতো। ধারণা করা হয়, বর্তমান দিল্লির উপকণ্ঠেই ছিল ইন্দ্রপ্রস্থের অবস্থান। এখন পুরোনো সেই নগরের সামান্য ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

**ইন্দ্রবর্মা** মালবের রাজা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি পাণ্ডবদের পক্ষ নেন। 'অশ্বত্থামা' হাতিটি ছিল তাঁর। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম এই হাতি বধ করে দ্রোণকে হীনবল ও যুদ্ধত্যাগ করানোর উদ্দেশ্যে 'অশ্বত্থামা হত' বলে ঘোষণা দেন। কারণ দ্রোণের পুত্রের নামও ছিল অশ্বত্থামা, যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে

অংশগ্রহণ করেছিল। নিজের পুত্রের নিহত হওয়ার খবর শুনে তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হন। এই বিশ্বাস থেকে যে, সত্যবাদী বলে পরিচিত যুধিষ্ঠির মিথ্যা বলবেন না। কিন্তু কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে 'অশ্বত্থামা হত' এবং মৃদুস্বরে 'ইতি গজ' উচ্চারণ করেন।

**ইন্দ্রভূতি** উড্ডীয়ানের রাজা। সময়কাল খ্রিষ্টীয় সপ্তম/অষ্টম শতক। তিনি বঙ্গভূমে 'বজ্রযোগিনী সাধন' প্রবর্তন করেন। তাঁর রচিত ২৩টি গ্রন্থের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মূল পুঁথি *কুরুকুল্লা-সাধন* ও *জ্ঞানসিদ্ধি* আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছে। ইন্দ্রভূতির গুরু ছিলেন আচার্য অনঙ্গবজ্র। অনুমান করা হয়, তিব্বতের বিখ্যাত বৌদ্ধগুরু পদ্মসম্ভব ছিলেন ইন্দ্রভূতির পুত্র।

**ইন্দ্রাণী** ইন্দ্রের স্ত্রী। জয়ন্ত ও জয়ন্তীর মাতা। তাঁর অন্য নাম শচী। তাঁকে ঐন্দ্রীও বলা হয়। ঋগ্‌বেদের ভাষ্য অনুযায়ী স্ত্রীকুলে তিনি বিশেষ ভাগ্যবতী, যেহেতু স্বামী তাঁর চিরযুবা। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, তাঁর যৌন আবেদন বেশি থাকায় কয়েকজন রাজকুমারীর মধ্যে ইন্দ্র তাঁকেই স্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেন। রামায়ণ ও পুরাণমতে তিনি দৈত্য পুলোমার কন্যা। একদা ইন্দ্র ইন্দ্রাণীর সতীত্ব নাশ ও তাঁর শাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পুলোমাকে হত্যা করেন। মহাভারত-মতে, রাজা নহুষও একদা ইন্দ্রাণীর রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

**ইবনে ইসহাক** হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রাচীনতম জীবনীকার। তাঁর জন্ম আনুমানিক ৭০৪ ও মৃত্যু ৭৬৭ খ্রি.। তিনি হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনসংক্রান্ত প্রচুর তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করেন, যা পরবর্তীকালে (নবম শতাব্দী) ইবনে হিশাম সম্পাদনা করে রাসুল (সা.)-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় জীবনীগ্রন্থের রূপ দেন। ইবনে ইসহাকের *কিতাব সিরাত রাসুলুল্লাহ* বা *আল্লাহর রাসুলের জীবনচরিতের বই* মহানবী (সা.)-এর জীবনী হিসেবে একটা প্রাথমিক বড় কাজ। তিনি ইতিহাস রচনার ইতিপূর্বে প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন করে একটি নতুন পদ্ধতির সূত্রপাত করেন। রাসুল (সা.)-এর জীবনীসাহিত্যের ক্ষেত্রে পরবর্তী বহুকাল ধরে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

**ইবনে খালদুন** সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাস-দার্শনিক। জন্ম তিউনিসে ১৩৩২ ও মৃত্যু কায়রোতে ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দে। দক্ষিণ আরবের কিন্‌দা উপজাতির মানুষ। জীবনের বেশির ভাগ সময় তাঁর আফ্রিকায় কাটে। শিক্ষাজীবন শেষ করে ২০ বছর বয়সে তিনি রাজকীয় সচিব পদে যোগ দেন এবং এরপর সুদীর্ঘ ২২ বছর ভূমধ্যসাগরের উভয় পাড়ের বিভিন্ন রাজদরবারে অনুরূপ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। রাজদরবারের উপদেষ্টা, কাতবি বা কাজি হিসেবে তিনি বিভিন্ন সময় উচ্চপদমর্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ করেন। মঙ্গোলদের কাছে দামেস্ক নগর সমর্পণকালে সন্ধির শর্তাবলি নির্ধারণের জন্য মিসরীয় পক্ষে তিনিই ছিলেন পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজদূত। আবার রাজরোষ বা অন্যদের ঈর্ষার পাত্র হয়ে কখনো কখনো লাঞ্ছনা ও কারা নিগ্রহেরও শিকার হতে হয় তাঁকে। পণ্ডিত হিসেবে ইবনে খালদুনের খ্যাতি মূলত তাঁর তিন খণ্ডে রচিত *কিতাবুল ইবার*-এর ভূমিকাংশ 'আল-মুকাদ্দামা'র জন্য। এটি তাঁর অমর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। ইবনে খালদুনের মতে, প্রজন্মের মধ্যকার পার্থক্য তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনচর্চার অভিব্যক্তি। শ্রমতত্ত্বের ব্যাখ্যাও তিনিই প্রথম করেন। তিনি আরবদের সম্পর্কে অনেক কঠোর উক্তি করেছেন, যেমন: 'আরবরা যে দেশই জয় করে তা শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়'; 'মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ পণ্ডিত লোকই বিদেশি (অর্থাৎ অনারব) বংশজাত'; 'সকল জাতির মধ্যে আরবরাই সবচেয়ে কম শাসনযোগ্যতা-সম্পন্ন'; 'চারুকলার প্রতি আরবদের প্রবণতা সকল জাতির মধ্যে সবচেয়ে কম'; 'তারা লুঠেরা ও ডাকাতের জাত'; 'তাদের অধিকাংশ অট্টালিকাই ভেঙে পড়ে' ইত্যাদি। এসব কথার জন্য ১৯৩৩ সালে ইরাকের শিক্ষা মহাপরিচালক সামি শওকাত বলেছিলেন, ইবনে খালদুনের কবর ধ্বংস এবং সমগ্র আরবজগৎ ঢুঁড়ে তাঁর সব কিতাব পুড়িয়ে ফেলা দরকার।

**ইবনে তাইমিয়া** মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ ও আইন বিশেষজ্ঞ। হাম্বলি মতের প্রবক্তা। জন্ম ১২৬৩ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ায়। জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁর

দামেস্ক, আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোর কারাগারে কেটেছে। দামেস্কের কারাগারে বন্দী অবস্থায়ই ১৩২৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। পবিত্র কোরআন ও হাদিসকেই তিনি ইসলাম ধর্মের একমাত্র উৎস হিসেবে গণ্য করতেন। এর বাইরে ধর্মের আর সব আচারপ্রথা ও মতবাদের তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর সমালোচক। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে ওয়াহাবি মতবাদ গড়ে উঠেছে। ধারণা করা হয়, তাঁর রচিত মোট গ্রন্থসংখ্যা ৫০০-এর মতো, যদিও তার মধ্যে ১৫০টির সন্ধান পাওয়া গেছে। কারাগারে বসেও তিনি তাঁর ধর্মসংক্রান্ত লেখালেখি চালিয়ে গেছেন।

**ইবনে তুফাইল** স্পেনীয়-আরব দার্শনিক ও চিকিৎসক। পশ্চিমে তিনি আবু বাকের নামে পরিচিত। বিভিন্ন সময় তিনি অনেক দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইবনে রুশদ ছিলেন তাঁর বন্ধু। ইবনে তুফাইল বৃদ্ধ হওয়ার পর ইবনে রুশদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ইবনে তুফাইলের *হাই ইবনে ক্বাজাম*কে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক রচনা হিসেবে গণ্য করা হয়। ধারণা করা হয়, ডানিয়েল ডিফোর বিখ্যাত *রবিনসন ক্রুসো* বইটি এর ওপর ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে।

**ইবনে তুলুন** পুরো নাম আহমদ ইবনে তুলুন। মিসরীয় রাজবংশ তুলুনীয়দের প্রতিষ্ঠাতা। কায়রোর বড় মসজিদটি তিনিই তৈরি করেছিলেন। মসজিদটির সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে। তাঁর জন্ম ৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ও মৃত্যু ৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর শাসনকালে মিসরের অনেক উন্নতি হয়। তিনি আব্বাসীয়দের সহযোগী হিসেবে জীবন শুরু করে পরে নিজ ক্ষমতা বিস্তার করেন। আব্বাসীয় খলিফারা অবশ্য শেষ পর্যন্ত সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে ৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে তুলুনীয়দের ক্ষমতাচ্যুত করেন।

**ইবনে মাজাহ** পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ আল রাবাই আল কাজিনি ইবনে মাজাহ। জন্ম ৮২৪ ও মৃত্যু ৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে। ছয়জন সুন্নি দিকপালের অন্যতম। হাদিস ও জ্ঞানের খোঁজে তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন।

**ইবনে রুশদ** মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। পুরো নাম আবুল ওলিদ মোহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে রুশদ। পাশ্চাত্যে তিনি অ্যাবেরুস বা অ্যাভেরোইস নামে পরিচিত। ১১২৬ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন মুসলিম-শাসিত স্পেনের করদোভায় তাঁর জন্ম। দর্শন ছাড়াও আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত ও ধর্মতত্ত্বে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। অ্যারিস্টটলের দর্শনের তাঁর মতো এত বিশদ ভাষ্যকার সেকালে আর কেউ ছিলেন না। তিনি আত্মার অমরত্ব ও পরকালসংক্রান্ত ধর্মীয় ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। গাজ্জালির ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদেরও তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর প্রথাবিরোধী মতবাদের কারণে তিনি সমকালীন গোঁড়াপন্থী মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এই বিরোধিতার ধারা পরবর্তীকালেও অব্যাহত থাকে। কর্ডোবা ও সেভিলে কাজির দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি খলিফার ব্যক্তিগত চিকিৎসকও ছিলেন। পরে খলিফা আল-মনসুরই তাঁকে নির্বাসনে পাঠান এবং তাঁর অনেক বই পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়। নির্বাসন থেকে মুক্তির কিছুকাল পর ১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অনেক বই লাতিন, ইংরেজি, ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

**ইবনে সিনা** মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। পুরো নাম আবু আলী আল-হুসেন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা। পাশ্চাত্যে তিনি অ্যাভিসিনা বা অ্যাবেসেনা নামে সমধিক পরিচিত। জন্ম সমরখন্দের বুখারায় ৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। জীবাণুতত্ত্বের তিনিই প্রবক্তা। পরিপাকতন্ত্রের কাজও তিনিই প্রথম ব্যাখ্যা করেন। চিকিৎসাশাস্ত্র-বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ *কানুন ফিৎ তিব্ব* তাঁর অমর কীর্তি। প্রায় ১০ লাখ শব্দবিশিষ্ট এই কোষগ্রন্থ পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়াও তিনি দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মোট গ্রন্থসংখ্যা শতাধিক, যার বেশির ভাগই আরবি ভাষায় রচিত। এ ছাড়া ফারসি ভাষায়ও তিনি কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। *কিতাবুস সিফা* নামে দুই খণ্ডে রচিত তাঁর দার্শনিক

কোষগ্রন্থ মধ্যযুগে দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখে। তাঁর দর্শনচিন্তার ওপর অ্যারিস্টটল ও নব-প্লেটোবাদী দার্শনিকদের প্রভাব ছিল। বলা যায়, ইসলামের সত্যকে তিনি গ্রিক দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার আলোকে যাচাই করতে চেয়েছেন। মৃত্যুর পর মানুষের শারীরিক পুনরুত্থান এবং বেহেশত ও দোজখে মানুষের যথাক্রমে অনন্ত সুখ বা শাস্তি ভোগের বিষয়টিকে তিনি আক্ষরিক অর্থে নয়, রূপকভাবে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। এসব কারণে সমকালীন রক্ষণশীল সমাজ, ধর্মীয় নেতা ও শাসকদের দ্বারা তাঁকে নিগৃহীত হতে হয়। তাঁকে 'ধর্মদ্রোহী' বা নাস্তিক হিসেবে গণ্য করা হয়। ইবনে সিনার বন্ধুরা তাঁকে রয়েসয়ে চলতে পরামর্শ দেওয়ায় তিনি তাঁদের বলেছিলেন, 'দীর্ঘায়ু সংকীর্ণ জীবনের চেয়ে আমি বরং স্বল্পায়ু প্রশস্ত জীবন কামনা করব।' ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে হামাদানে তাঁর মৃত্যু হয়।

**ইবনে হাজম** মধ্যযুগের স্পেনের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত, ধর্মবেত্তা ও নীতিশাস্ত্রবিদ। পুরো নাম আবু মোহাম্মদ আলী ইবনে হজম। জন্ম স্পেনের করদোভায় ৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যায় প্রথম দিকে তিনি ইমাম শাফির মতানুসারী ছিলেন। পরে দাউদ জাহিরির অনুসারী এবং এই মতের একজন প্রধান প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত হন। আল-আশারি, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের তিনি সমালোচনা করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে নানা মজহাব বা সম্প্রদায় সৃষ্টির বিরোধিতা করেছেন। মতামতের জন্য তাঁকে কারাভোগ করতে হয়। কবি হিসেবেও তাঁর পরিচিতি ছিল। বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছে। ১০৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

**ইবনে হাম্বল** পুরো নাম আহমাদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে হাম্বল। বিশিষ্ট ইসলামি তাত্ত্বিক। হাম্বলি মজহাবের প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম ইরাকের বাগদাদে ৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে। সিরিয়া, ইয়েমেন, হেজাজ প্রভৃতি স্থানে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। পরে শাফি মতবাদের প্রবক্তা ইমাম শাফির কাছে ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হাদিস বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। মুতাজিলাপন্থীদের সঙ্গে মতান্তরের কারণে তাঁকে কারাভোগও করতে হয়। মুসলমানদের মধ্যে তাঁর মতানুসারীরা পরবর্তীকালে হাম্বলি মজহাব নামে পরিচিতি লাভ করে। ৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

**ইবরাহিম (আ.)** বিশিষ্ট নবীদের একজন, যিনি 'আল খলিল' বা 'খলিলুল্লাহ' (বন্ধু/আল্লাহর বন্ধু) উপাধিতে ভূষিত হন। পবিত্র কোরআনের ২৮টি সুরায় তাঁর উল্লেখ আছে। এতে তাঁর সম্বন্ধে তাঁর পিতা আজরের মূর্তিপূজার বিরোধিতা, এক আল্লাহর অস্তিত্বের কথা প্রচার এবং তাঁর নবী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইরাকের মেসোপটেমিয়ায় বসবাসকারী যে উর সম্প্রদায়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তারা মূর্তি ও গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা করত। 'আল্লাহই একমাত্র উপাস্য এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই' আপন সম্প্রদায়ের লোকজনের কাছে এ কথা প্রচার করলে তিনি তাঁর পিতা ও আত্মীয়স্বজনের তরফ থেকে প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখি হন। তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয় এবং একপর্যায়ে বাদশাহ নমরুদ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু আল্লাহর অসীম মহিমায় সেই অগ্নিকুণ্ড ফুলের বাগানে পরিণত হয়। স্ত্রী হাজেরার গর্ভে তাঁর প্রিয় পুত্র ছিলেন ইসমাইল। সে সময় পৌত্তলিকেরা তাদের ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য পশু এমনকি মানুষ বলি দিত। ইবরাহিম (আ.) মনে করলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁকেও তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটিকেই উৎসর্গ করতে হবে। ইবরাহিম (আ.)-এর আনুগত্য পরীক্ষার জন্য আল্লাহর তরফ থেকেও এ মর্মে প্রত্যাদেশ করা হয়। হজরত ইবরাহিম (আ.) পুত্র ইসমাইলকে সে কথা জানালে তিনি বিনা দ্বিধায় আল্লাহর উদ্দেশে কোরবানি হতে রাজি হয়ে যান। অতঃপর ইবরাহিম (আ.) পুত্রকে কোরবানি দিতে উদ্যত হলে আল্লাহ তাঁকে নিবৃত্ত করেন এবং বলেন, 'তুমি তো ঠিকই আল্লাহর আদেশ পালন করেছ।' ইসমাইলের পরিবর্তে তখন দুম্বা কোরবানি দেওয়া হয়। সেই ঘটনার স্মরণে এবং চরম উৎসর্গের মনোভাব ও আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে এখনো ঈদুল আজহার দিনে মুসলমানরা সারা পৃথিবীতে পশু কোরবানি করে। হজরত ইসমাইল (আ.) ও পরে ইবরাহিম (আ.)-এর অপর স্ত্রী সারার গর্ভে জন্ম নেওয়া

আরেক পুত্র হজরত ইসহাক (আ.) দুজনই নবীর মর্যাদা লাভ করেন। হজরত ইবরাহিম (আ.)-ই মক্কায় পবিত্র কাবা ঘর নির্মাণ করেন।

**ইবাদত** বা এবাদত শব্দটি আরবি 'আব্‌দ্' থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ উপাসনা বা প্রার্থনা। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী ও ব্যাপক অর্থে আল্লাহ তায়ালাকে প্রভু বা উপাস্য গণ্য করে তাঁর উপাসনা করা এবং মোহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ পবিত্র কোরআন এবং রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী তাঁর আদেশ-নির্দেশ পালন করা। পবিত্র কোরআনের প্রথম সুরা ফাতিহা-র ৪ আয়াতে এই মর্মে অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে, 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।' ইসলামে প্রতিটি কাজ আল্লাহকে স্মরণ করে ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা হলে তা ইবাদত বলে গণ্য হয়। এ ব্যাপারে সৎকাজে আদেশ ও মন্দকাজে নিষেধ মেনে চলতে হবে। ইসলামে ইবাদত দুই প্রকার : 'হককুল্লাহ' আল্লাহর হক বা স্রষ্টা-সম্পর্কিত ইবাদত এবং 'হককুল ইবাদ' অর্থাৎ মানুষ ও সৃষ্টি-সম্পর্কিত ইবাদত। আল্লাহর একত্বের ওপর বিশ্বাস রেখে এবং রিসালাতকে মান্য করে আনুগত্য, সততা, কর্তব্যপরায়ণতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ হলো 'হককুল্লাহ'। আর ইসলামের আহকাম বা বিধিনিষেধ মান্য করে মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালন হলো 'হককুল ইবাদ'। এ দুই ধরনের ইবাদত সম্পন্ন করেই একজন মুসলমান পরকালে ক্ষমাপ্রাপ্ত ও মুক্তিলাভ করতে পারে। আল্লাহ বলেছেন, তিনি তাঁর নিজের প্রাপ্য হক ক্ষমা করতে পারেন কিন্তু মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি বান্দার কর্তব্য যে হক, তা ক্ষমা করবেন না।

**ইবাদি** খারিজিদের একটি শাখা। প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ ইবনে ইবাদ। মধ্য বা অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী এই মতের অনুসারীরা আছেন ওমান, পূর্ব আফ্রিকা ও উত্তর আফ্রিকায়। তাঁরা শরিয়তের বিধিবিধানগুলো অত্যন্ত কঠোরভাবে মেনে চলার পক্ষপাতী। তবে যাঁরা তাঁদের মতানুসারী নন, তাঁদের তাঁরা কাফির বা মুশরিক বলে গণ্য করেন না।

**ইভ** বাইবেলে বর্ণিত মানবজাতির আদি জননী। প্রথম মানব আদমের স্ত্রী। মুসলমানদের কাছে তিনি বিবি হাওয়া নামে পরিচিতা। প্রথম নারী সৃষ্টি সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও বাইবেলের বর্ণনা প্রায় একই রকম। আদমের নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর বাঁ পাঁজরের হাড় থেকে আল্লাহ হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। আদম নিজ স্ত্রীর নাম রাখেন 'হবা'। হিব্রু ভাষায় এ শব্দটির অর্থ জীবিতা বা জীবনদায়িনী। ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুসারে সর্পবেশী শয়তানের প্ররোচনায় ইভ নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে আদমকেও তা ভক্ষণে প্ররোচিত করেন। খ্রিষ্টীয় মতে, এই আদি পাপের কারণেই নারীদের রজঃস্রাব, গর্ভধারণ, প্রসববেদনা ইত্যাদি শাস্তি ভোগ করতে হয়। পবিত্র কোরআন ও হাদিসের বর্ণনামতে, আল্লাহর নিষেধ লঙ্ঘন করার শাস্তি হিসেবে আদম ও হওয়াকে স্বর্গচ্যুত ও পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হতে হয়। দীর্ঘকাল পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকার পর মক্কার অদূরে আরাফাত ময়দানে তাঁদের পুনর্মিলন ঘটে। তাঁদের ১০০টি সন্তান হয়, যাদের মাধ্যমে পরবর্তীকালে পৃথিবীতে মানবজাতির বিস্তার ঘটে।

**ইভ্যানজেলিকালিজম** একটি খ্রিষ্টীয় মতবাদ। রিফর্মেশন-পরবর্তী কালের প্রটেস্ট্যান্ট গির্জার ক্ষেত্রে কথাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 'ইভ্যানজেলিকাল' মতবাদ অনুযায়ী ধর্মশিক্ষার প্রধান উৎস হচ্ছে গসপেল, অর্থাৎ ম্যাথিউ, মার্ক, লিউক এবং জন-বর্ণিত যিশুখ্রিষ্টের জীবনকথা ও উপদেশাবলি। ইভ্যানজেলিস্টরা ব্যক্তিগত ধর্মান্তরণে বিশ্বাসী। গির্জার বিধিবদ্ধ উপাসনার পরিবর্তে তাঁরা ধর্মপ্রচারের ওপর বেশি জোর দেন। তাঁদের মতে, ধর্মীয় ব্যাপারে গির্জা নয়, বাইবেলই কর্তৃত্বের একমাত্র উৎস। তাঁরা ইউক্যারিস্টিক স্যাক্রিফাইসের (যিশুর তিরোধান উপলক্ষে পবিত্র উৎসব, যাতে প্রসাদ হিসেবে পবিত্র রুটি ও মদ বিতরণ ও সেবন করা হয়) বিরোধী। তাঁরা মিলেনেরিয়ানের (স্বর্ণযুগের পুনরাবির্ভাব) ধারণায় বিশ্বাস করেন। সাধারণভাবে তাঁরা রোমান ক্যাথলিক গির্জার বিরোধী।

**ইমান** অর্থ বিশ্বাস। ইসলামি পরিভাষায় এর অর্থ সত্য বলে বিশ্বাস করা ও তার স্বীকৃতি দেওয়া। যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে ইমান এনে বিশ্বাসের সকল

দিক পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে ও সৎকর্ম করে তাকে মোমিন বলে। সাধারণত চারটি অঙ্গীকারের মাধ্যমে একজন মুসলমান তার এই আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতিকে প্রকাশ করে। প্রথম : কলেমা তৈয়ব—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ', যার অর্থ 'আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ (উপাস্য) নেই এবং মোহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রাসুল।' দ্বিতীয় হলো কলেমা শাহাদাত বা সাক্ষ্যবাক্য—'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লা-শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।' যার অর্থ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই; এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।' তৃতীয় হলো ইমানে মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত ইমান-বাক্য—'আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস ও মৌখিকভাবে স্বীকার করে আল্লাহর নাম ও গুণাবলিসহ তাঁর ওপর ইমান আনলাম এবং তাঁর সকল আদেশ মেনে নিলাম।' চতুর্থ হলো ইমানে মুফাসসাল বা বিশদ ইমান-বাক্য—'আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ, রোজ ক্বিয়ামত, আল্লাহর নির্ধারিত তকদিরের ভালোমন্দ এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর ইমান আনলাম।' এই সাতটি বিষয়ে ইমান রাখার ওপর ইসলাম ধর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এগুলোই ইমামের ভিত্তি।

**ইমাম** আরবি শব্দটির অর্থ নেতা। এ ছাড়া আরও নানা অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কোরআন শরিফেও বহু অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন : নেতা (২ :১২৪), আদর্শ (১১ :১৭), কিতাব (৩৬ :১২) প্রভৃতি। চিহ্ন বা নিদর্শন অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাস্তব জীবনে তিনটি ক্ষেত্রে ইমাম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় : (১) জামাতে অনুষ্ঠিত নামাজে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিকে ইমাম বলা হয়। পাঞ্জেগানা নামাজের ইমামকে পেশ ইমাম এবং জুমার নামাজের ইমামকে খতিব বলা হয়। নামাজ-কালাম সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন যেকোনো মুসলিম ইমাম হতে পারেন। (২) সুন্নিরা সমাজের নেতা অর্থে খলিফাদের এবং সম্মান প্রদর্শনার্থে বিখ্যাত আলেমদের প্রতিও ইমাম শব্দটি প্রয়োগ করে থাকেন। যেমন : ইমাম আবু হানিফা, ইমাম গাজ্জালি প্রমুখ। (৩) শিয়ারা ইমাম শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। তাঁদের ধারণা অনুযায়ী কেবল হজরত আলী (রা.)-এর বংশধররাই ইসলাম জগতের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা হওয়ার অধিকারী। আর তাঁদের বেলায় ইমাম শব্দটি প্রযোজ্য। সিকান্দার শাহ (১৩৫৮-১৩৮৭)-এর সময় থেকে বাংলার কোনো কোনো সুলতানও খলিফা ও ইমাম উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

**ইমামবাড়া** আক্ষরিক অর্থে ইমামের বাসভবন। দক্ষিণ এশিয়ায় ইমামবাড়া শব্দটি দ্বারা মহররমের উদ্‌যাপনের জন্য শিয়াদের নির্মিত ভবন বা সম্মেলনকক্ষকে বোঝানো হয়। মহররম মাস ছাড়াও শিয়াদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ অন্য অনুষ্ঠানাদি ইমামবাড়াতে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে ইমামবাড়ার সূচনা অষ্টাদশ শতকে। যখন সফদার জং (১৭০৮-৫৪) 'আশুরা' পালনের জন্য দিল্লিতে একটি ভবন নির্মাণ করেন। যদিও তখন এ ভবনকে ইমামবাড়া বলা হতো না। পরবর্তীকালে সফদার জংয়ের পৌত্র আসাফুদ্দৌলা লক্ষ্ণৌতে অনুরূপ একটি ভবন নির্মাণ করেন। এটি ইমামবাড়া-ই-আসাফি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উত্তর ভারতে ইমামবাড়া আশুরা নামেও পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি প্রাসাদের ইমামবাড়া এবং হাজি মুহম্মদ মুহসীন ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হুগলির ইমামবাড়া উল্লেখযোগ্য। একসময় ঢাকাতেও ১৫টি ইমামবাড়া ছিল। এর মধ্যে সৈয়দ মীর মুরাদ কর্তৃক নির্মিত বর্তমান হোসেনি দালান হলো সবচেয়ে বিখ্যাত।

**ইয়লাস** গ্রিক পুরাণে বর্ণিত বাতাসের দেবতা। উষাদেবী ইওসের পুত্র। সিসিলি ও ইতালির মধ্যবর্তী দ্বীপপুঞ্জ তাঁর আবাসস্থল। তাঁর স্ত্রীর নাম এনারেতি। ইয়লাস ছিলেন অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ এবং দেবতাদের প্রিয়পাত্র। একবার সামুদ্রিক ঝড়ে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে অডিসিউস বায়ুরাজ ইয়লাসের শরণাপন্ন হলে বায়ুরাজ সব প্রতিকূল বায়ু একটি

থলেতে ভরে তা অডিসিউসের হাতে দেন। নির্দেশ ছিল, ইথাকার মাটিতে পা দেওয়ার আগে যেন থলের মুখ খোলা না হয়। কিন্তু অডিসিউসের সঙ্গীরা কৌতূহলবশত পথিমধ্যে থলেটি খুলে ফেললে থলে থেকে বেরিয়ে আসা প্রতিকূল বায়ুর আঘাতে অডিসিউসের জাহাজটি আবার ইয়লাসের রাজ্যে ফিরে আসে। অডিসিউস সঙ্গীদের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইলেও ইয়লাস তাঁকে ক্ষমা করেননি।

**ইয়াওমুল কিয়ামত** কিয়ামত ও শেষ বিচারের দিন। ভাষান্তরে ইয়াওমুল আখির বা ইয়াওমুল হিসাবও বলা হয়। পবিত্র কোরআনে এই দিনটির উল্লেখ বহুবার আছে। এই দিন আল্লাহ মানুষের পার্থিব জীবনের কৃতকর্মের হিসাব করে তাকে পুরস্কৃত কিংবা শাস্তিদান করবেন। একজন মুসলমান বিশ্বাস করে, পৃথিবীতে মানুষ যা কিছুই করুক না কেন তার আমলনামায় সবই লিপিবদ্ধ হচ্ছে। শেষ বিচারের দিন তা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে। অণু পরিমাণ ভালো কাজের জন্যও মানুষকে যেমন তার প্রতিদান দেওয়া হবে, তেমনি অণু পরিমাণ মন্দ কাজের জন্যও তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। একজন মুসলমানের পক্ষে এই কিয়ামত বা শেষ বিচারের দিনের ওপর বিশ্বাস ইমানের অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

**ইয়াং ইন**—ইয়াং দ্র.।

**ইয়াকাস** জিউসপুত্র। তাঁর মাতার নাম ইজিনা। পুরাণ অনুযায়ী তিনি বীর অ্যাকিলিসের পিতামহ। ইয়কাস তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও সদাশয়তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। একবার গ্রিসে খরা দেখা দিলে ইয়াকাস দেবতাদের কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেন। দেবতারা তাঁর প্রার্থনা শুনে দেশটিকে খরামুক্ত করেন। আরেকবার তাঁর প্রার্থনা শুনে দেবতারা প্লেগের অভিশাপে জনশূন্য ইজিনা দ্বীপের পিঁপড়েগুলোকে মানুষে পরিণত করেন।

**ইয়াকুব (আ.), হজরত** অন্যতম নবী। বাইবেলে তাঁকে জেকব বলা হয়েছে। তিনি হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর প্রপৌত্র ছিলেন। ইবরাহিম (আ.)-এর পুত্র হজরত ইসমাইল (আ.), ইসমাইল (আ.)-এর পুত্র হজরত ইসহাক (আ.) এবং ইসহাক (আ.)-এর পুত্র হজরত ইয়াকুব (আ.)। কথিত আছে ইয়াকুবের ১২ জন পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ ইউসুফ তাঁর অত্যধিক প্রিয় ছিলেন। ইউসুফের অন্য ভাইয়েরা এতে তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে এক নির্জন প্রান্তরে নিয়ে যায় ও সেখানে একটি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে। ঘরে ফিরে এসে তারা ইয়াকুব (আ.)-কে জানায় যে ইউসুফকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। পুত্রশোকে পিতা কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যান। পরে ইউসুফের জামা তাঁর চোখে স্পর্শ করা মাত্র তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। ওদিকে একদল বণিক ইউসুফকে কূপ থেকে উদ্ধার করে তাঁদের সঙ্গে মিসরে নিয়ে যান এবং এক ধনী ব্যক্তির কাছে তাঁকে বিক্রি করেন। অতঃপর আপন প্রতিভাবলে ইউসুফ একসময় সে দেশের উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে ইয়াকুব ও তাঁর পুত্রেরা খাদ্যের সন্ধানে মিসরে গেলে সেখানে ৮০ বছর পর পিতা ও পুত্রের পুনর্মিলন ঘটে।

**ইয়ারমুলকা** ইহুদি পুরুষেরা উপাসনার সময় মাথায় আঁট করে বসা যে টুপি পরে।

**ইলিয়াস (আ.), হজরত** ইসলাম ও খ্রিষ্টীয় মতে, একজন প্রেরিত পুরুষ। অন্যতম বিশিষ্ট পয়গম্বর। তিনি সিরিয়ায় প্রেরিত হন। সেখানকার বালবাক শহরের রাজা তাঁর ভক্ত ছিলেন। কিন্তু রানি ও অন্যরা ছিল তাঁর বিরোধী। তাঁদের কোনোভাবেই সঠিক পথে পরিচালিত করতে না পেরে তিনি তাঁদের অভিশাপ দেন। ফলে দেশে তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত না হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন ইলিয়াস (আ.) পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে তাঁদের আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার আহ্বান জানান এবং বলেন, তাঁর উপদেশ অনুযায়ী চললে তিনি বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। কিন্তু লোকজন তাঁর উপদেশ মানতে অস্বীকার করলে তিনি আবারও তাদের অভিশাপ দেন। এবার বন্যায় শহরটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। কেবল ইলিয়াস (আ.) রক্ষা পান। বাইবেলে ইলিয়াসকে 'ইলাইজা' বা 'ইলাইয়াস' বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সুরা আনআম-এর ৮৫ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর আমি জাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা আর ইলিয়াসকেও

সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। এরা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত।' একই প্রসঙ্গে সুরা সাফফাত-এর ১২৩-১৩২ আয়াতে বলা হয়েছে, 'ইলিয়াসও ছিল রাসুলদের একজন। স্মরণ করো, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা কি সাবধান হবে না? তোমরা কি বা'আলকে ডাকবে আর পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা আল্লাহকে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের? কিন্তু ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, কাজেই ওদের তো শাস্তি ভোগ করতেই হবে। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ দাসদের কথা আলাদা। আমি তাঁকে তার পরবর্তীদের কাছে (স্মরণীয় করে) রেখেছি। ইলিয়াসের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার দিয়ে থাকি। সে ছিল আমার বিশ্বাসী দাসদের অন্যতম।'

**ইলিশিয়াম** অনন্ত সুখস্থান। গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী মৃত্যুর পর সৎ মানুষেরা এখানে বাস করবে।

**ইল্বল** হিন্দু পুরাণোক্ত ও প্রহ্লাদ-বংশজাত ধনাঢ্য অসুর। ইল্বলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাতাপি এক তপস্বী ব্রাহ্মণের কাছে একটি ইন্দ্রতুল্য পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করে। ব্রাহ্মণ তার প্রার্থিত বর প্রদান না করায় দুই ভাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণবিনাশে কৃতসংকল্প হয়। ইল্বল ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরে ও সংস্কৃত বাক্য আওড়ে ব্রাহ্মণদের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করত। বাতাপি এ সময় মেষরূপ ধারণ করত এবং ইল্বল ব্রাহ্মণদের সম্মুখে তাকে কেটে তাঁদের তার মাংস রেঁধে খাওয়াত। আহারপর্ব শেষে ইল্বল বাতাপির নাম ধরে আহ্বান করামাত্র সে ব্রাহ্মণদের উদর ভেদ করে বেরিয়ে আসত। এভাবে দুই ভাই বহু ব্রাহ্মণ হত্যা করে। মহর্ষি অগস্ত্য বিদর্ভ-রাজকন্যা লোপামুদ্রাকে বিয়ে করার পর একদিন তাঁর সঙ্গম প্রার্থনা করলে লোপামুদ্রা স্বামীর কাছে অলংকার ও মূল্যবান আভরণাদি দাবি করেন। স্ত্রীর দাবি পূরণ করার মতো অর্থ অগস্ত্যের ছিল না। তাই তিনি স্ত্রীর দাবি পূরণের জন্য অর্থের খোঁজে ধনাঢ্য ইল্বলের কাছে যান। ইল্বল পূর্ববৎ বাতাপিকে মেষে রূপান্তরিত করে তার মাংস অগস্ত্যকে আহার করতে দেয়। অগস্ত্য সমস্ত মাংস একাই ভক্ষণ করে সঙ্গে সঙ্গে তা জীর্ণ করে ফেলেন। ইল্বল আগের মতো বাতাপির নাম ধরে আহ্বান করলে অগস্ত্য বায়ু নিঃসরণ করে সহাস্যে বলেন যে, বাতাপি তাঁর উদরে জীর্ণ হয়ে গেছে। ইল্বল ভীত হয়ে অগস্ত্যের মনোভাব জানতে চাইলে অগস্ত্য তাঁর বাঞ্ছিত অর্থ কামনা করেন। ইল্বল অগস্ত্যকে তাঁর বাঞ্ছিত অর্থ প্রদান করে বিদায় দেন। মতান্তরে ইল্বল অগস্ত্যকে আক্রমণ করতে গিয়ে তাঁর কোপানলে ভস্মীভূত হন।

**ইলেকট্রা** গ্রিক পুরাণের অ্যাটলাসের কন্যা। জিউসের অন্যতমা প্রণয়িণী। জিউস ও ইলেকট্রার মিলনের ফলে ট্রোজানদের পূর্বপুরুষ দার্দানাসের জন্ম হয়। অন্য গ্রিক পুরাকাহিনি অনুযায়ী ইলেকট্রা আগামেমননের কন্যা। আগামেমনন যখন ট্রয়যুদ্ধে নিয়োজিত তখন তাঁর স্ত্রী ক্লাইটেমনেস্ট্রা আগামেমননেরই চাচাতো ভাই এজিস্থাসের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হন। যুদ্ধ শেষে আগামেমনন দেশে ফিরে এলে উভয়ে চক্রান্ত করে আগামেমননকে হত্যা করেন। এরপর এজিস্থাস ইলেকট্রার ভাই ওরেস্টেসকে হত্যার চক্রান্ত করলে ইলেকট্রা কৌশলে ভাইয়ের প্রাণরক্ষা করেন। ইলেকট্রার প্ররোচনায় ওরেস্টেস অতঃপর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে মাতা ক্লাইটেমনেস্ট্রা ও এজিস্থাসকে হত্যা করেন। ওরেস্টেসের বন্ধু পাইলেডিস এ কাজে তাঁকে সহায়তা করেন। পাইলেডিসের সঙ্গে পরে ইলেকট্রার বিয়ে হয়। নাট্যকার সফোক্লিস ও ইউরিপিডিস দুজনই ইলেকট্রার কাহিনি নিয়ে দুটি নাটক লিখেছেন।

**ইশতার** মাতৃদেবী। প্রাচীন এশিরীয় ও ব্যাবিলনীয় পুরাণ অনুযায়ী দেবীদের মধ্যে প্রধানতমা। তাঁকে আকাশদেবতা আনু ও চন্দ্রদেবতা সিনের কন্যা হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি ফসল, যৌনতা ও যুদ্ধেরও দেবী। ফিনিসীয় পুরাণে তাঁর নাম অ্যাসতার্তে। প্রাচীন ব্যাবিলনীয় মহাকাব্য *গিলগামেশ*-এ রাজা গিলগামেশের প্রতি দেবী ইশতারের প্রেমাকাঙ্ক্ষার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

**ই-শিং** বা রূপান্তরের গ্রন্থ। এটি কনফুসিয়াসের পাঁচটি ধ্রুপদ গ্রন্থের অন্যতম। এর গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো কনফুসিয়াস বা তাঁর অনুসারীদের দ্বারা লিখিত। বিশ্বের প্রাচীনতম এই গ্রন্থ চীনা সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণার মূল উৎস, প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা ও

দর্শনের ধারক ও বাহক। চীনা ধ্রুপদ সাহিত্যের মধ্যে এটি সর্বাধিক পঠিত। বিশ্বাসী মানুষকে *ই-শিং* পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক পন্থা অনুসরণের নির্দেশনা দেয়। ঐতিহাসিকদের মতে, আনুমানিক ৫ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দে চীনের ঐতিহ্যবাহী ভবিষ্যদ্বাণী কৌশল থেকেই এ বই উৎসারিত। ১১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রাজা ওয়েন এবং চাও-এর পরিষদ এ বইয়ে তাদের মতামত সংযোজন করে। কনফুসিয়াসের আগে বইটি কেবল ভাগ্য গণনা বা ভবিষ্যদ্বাণী করার কাজে ব্যবহৃত হতো। কনফুসিয়াস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫১-৪৪৯) *ই-শিং*কে তাঁর বিখ্যাত টেন উইংস বা ১০টি পরিশিষ্ট-এর সঙ্গে যুক্ত করার পরই গ্রন্থটির নিজস্ব অর্থ ও তাৎপর্য উন্মোচিত হয়। চীনা রাজকর্মচারীদের জন্য *ই-শিং* অবশ্যপাঠ্য ছিল।

*ই-শিং*-এর পঠনরীতি একই সঙ্গে জটিল ও বৈচিত্র্যময়। এর জটিলতা বা রহস্যময়তাই হয়তো বইটিকে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। বইটির পঠনপদ্ধতির সঙ্গে আটটি ট্রিগ্রামের একটি মূলগত সম্পর্ক রয়েছে। ট্রিগ্রাম হলো তিনটি রেখাবিশিষ্ট সুবিন্যস্ত একটি নকশা, যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আটটি মৌলিক উপাদান-আকাশ, জলাভূমি, অগ্নি, বজ্র, বায়ু, কাঠ, পর্বত ও ভূমি এবং তাদের সঙ্গে জড়িত মানবজীবন ও সমাজের বিভিন্ন বিমূর্ত বিষয়কে প্রতীকায়িত করে। এসব ট্রিগ্রামের একটিকে অপরটির সঙ্গে যোগ করে মোট ৬৪টি ষড়ভুজ পাওয়া যায়, যার প্রতিটি জাগতিকতার নিরিখে, এক বা একাধিক মানবিক বা প্রাকৃতিক ঘটনাকে প্রতীকের মাধ্যমে তুলে ধরে। সব ষড়ভুজ একত্রে রাখলে, পৃথিবীজুড়ে যা কিছু হচ্ছে, *ই-শিং* যেন তার সবটাই মূর্ত করে তোলে।

**ইসকিউলেপাস** চিকিৎসার দেবতা। গ্রিক পুরাণে উল্লেখিত এসক্লেপিয়াসের রোমান নাম। অ্যাপোলো ও করোনিসের পুত্র। মেডুসার রক্ত দিয়ে তিনি অনেককে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচান। খ্রিষ্টপূর্ব ২৯৩ অব্দে রোমানরা ইসকিউলেপাসের নামে একটি মন্দির নির্মাণ করে।

**ইসমাইল (আ.), হজরত** নবী ইবরাহিম (আ.)-এর পুত্র। বিবি হাজেরার গর্ভজাত। ইবরাহিম (আ.) তাঁর অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে এই সন্তান লাভ করেন। আবার আল্লাহর আদেশেই তিনি তাঁর এই শিশুপুত্রসহ স্ত্রী হাজেরাকে মক্কার উষর ও কঙ্করময় উপত্যকায় নির্বাসন দেন। একদিন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর শিশু ইসমাইলের কান্নায় অস্থির হয়ে বিবি হাজেরা একটু পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে ছোটাছুটি করছিলেন। কোথাও পানি না পেয়ে হতাশ হাজেরা পুত্রের কাছে ফিরে এসে দেখতে পান, শিশু ইসমাইলের পায়ের আঘাতে মরুভূমির এক জায়গায় মাটি ফুঁড়ে পানি বের হচ্ছে। পরবর্তীকালে সেটিই জমজম কূপ নামে খ্যাতি লাভ করে। স্বপ্নে আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে ইবরাহিম (আ.) একবার তাঁর প্রিয়পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি করতে উদ্যত হলে আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং সেখানে ইসমাইলের পরিবর্তে একটি দুম্বা কোরবানি হয়ে যায়। সেই থেকে চালু হয় আল্লাহর নামে কোরবানি বা হালাল পশু উৎসর্গ করার রীতি, যা জিলহজ মাসে মুসলমানরা পালন করে থাকে। ইসমাইল (আ.) পিতা হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর সঙ্গে মক্কায় কাবা পুনর্নির্মাণের কাজেও অংশ নেন। তিনি দীর্ঘ ১৩৬ বছর বেঁচেছিলেন। তাঁর ১২ পুত্র ও এক কন্যা ছিল। তাঁরা সিরিয়া, ইরাক, জেরুজালেম ও মিসরে বাস করতেন। তওরাত কিতাবে তাঁদের বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

**ইসরাইল** বাইবেলে তাঁকে জেকব এবং পবিত্র কোরআনে ইয়াকুব নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ইহুদিদের পূর্বপুরুষ হিসেবে গণ্য হন এবং তাঁর নামানুসারেই ইসরাইল দেশটির নামকরণ করা হয়েছে। তাঁর ১০ পুত্র এবং দুই পৌত্রের (যাঁরা ছিলেন জোসেফের অর্থাৎ ইউসুফের পুত্র) নামানুসারে ইসরাইলের ১২টি উপজাতির নামকরণ হয়। যথা: রুবেন, সিমিয়ন, জুডা, জেবুলান, ইসাকার, ড্যান, গ্যান, অ্যাশার, ন্যাফতালায়, বেনজামিন, ইফরাইয়াম ও মান্যাসে। সম্রাট রিহোবোয়ামের রাজত্বকালে ইহুদি রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং এর উত্তরাংশ ইসরাইল ও দক্ষিণাংশ জুডা নামে পরিচিতি লাভ করে। পবিত্র কোরআনে ইসরাইল নামটি একবার এবং 'বনু ইসরাইল' নামটি বহুবার উল্লেখিত হয়েছে।

**ইসরাফিল** প্রধান চার ফেরেশতার অন্যতম। ইসলাম ধর্মানুসারে আল্লাহর আদেশে যেদিন তিনি শিঙা ফুঁকবেন সেদিন কেয়ামত বা মহাপ্রলয় হবে। মনে করা হয়, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই তিনি এ উদ্দেশ্যে শিঙা হাতে অপেক্ষায় আছেন। আল্লাহর আদেশে তিনি দ্বিতীয়বার শিঙা ফুঁকলে সমস্ত প্রাণী পুনর্জীবিত ও বিচারের জন্য হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। বর্ণনা অনুসারে তাঁর দুই পা পৃথিবীর নিম্নভাগ ও মাথা আল্লাহর আরশের শীর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর দেহে চারটি ডানা আছে; একটি ডানা পশ্চিমে, আরেকটি পূর্বে বিস্তৃত। তৃতীয় ডানা দিয়ে তিনি নিজের দেহ আবৃত রাখেন ও চতুর্থ ডানা দিয়ে আল্লাহর অসীম শান-শওকত থেকে নিজেকে রক্ষা করেন। তাঁর সারা দেহ লোমে আবৃত এবং তাঁর অনেকগুলো মুখ ও জিহ্বা আছে। তিনি প্রথম তিন বছর হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর সহচর ছিলেন এবং তাঁকে নবুয়তের কাজে দীক্ষাদান করেন। পরে জিবরাইল (আ.) এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

**ইসলাম** বিশ্বের প্রধানতম ধর্মগুলোর একটি। মুসলমানদের মতে, এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আরবি 'ইসলাম' শব্দটির উদ্ভব 'সিলম' ধাতু থেকে। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শান্তি, আপস, বিরোধ-পরিহার। প্রায় কাছাকাছি অর্থে 'সিলম' ধাতু হতে নিষ্পন্ন কয়েকটি শব্দের ব্যবহার পবিত্র কোরআনে দেখা যায়। একই ধাতু হতে ইসলাম ধর্মানুসারী অর্থে 'মুসলিম' এবং বহুবচনে 'মুসলিমুন' ও 'মুসলিমিন' শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। ইসলামের পরিভাষাগত অর্থ হলো: (এক) আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ (সুরা বাকারা ১১২ আয়াত), (দুই) শান্তিস্থাপন তথা বিরোধ পরিহার করা (সুরা আনফাল ৯০-৯১ আয়াত)। পবিত্র কোরআনের ভাষায়, ইসলাম একটি 'দীন' এবং একজন মুসলমানের কাছে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম ধর্মের উৎস দুটি: (১) পবিত্র কোরআন: যাতে ইসলামের মৌলিক নীতি ও বিধানগুলো আল্লাহর ঐশীবাণীরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং (২) হাদিস: পবিত্র কোরআনের আলোকে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণীয় বিধিবিধান ও নিয়মরীতিগুলো, যা রাসুল (সা.) উপদেশ আকারে সাহাবাদেরকে দিয়েছেন তার সংকলন।

ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তিগুলো হলো: (ক) এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহতে বিশ্বাস, (খ) ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস, (ঠ) আসমানি কিতাবগুলোর প্রতি বিশ্বাস, (ঘ) সব নবী ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস, (ঙ) পরকালের প্রতি বিশ্বাস, (চ) আল্লাহর সর্বময় নিয়ন্ত্রণ বা তকদিরে বিশ্বাস, (ছ) মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও বিচারান্তে অনন্ত পরজীবনে বিশ্বাস এবং (জ) সৎকর্মে আত্মনিয়োগ।

ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি: (১) ইমান অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ (সা.) তাঁর রাসুল এই মর্মে সাক্ষ্য দান; (২) সালাত অর্থাৎ নামাজ কায়েম করা; (৩) জাকাত প্রদান; (৪) রমজান মাসে সাওম অর্থাৎ রোজা পালন এবং (৫) হজ পালন।

ইসলামি বিধানের উৎস চারটি: (১) পবিত্র কোরআন শরিফ: যা রাসুল (সা.)-এর ২৩ বছরের নবুয়তকালে অবতীর্ণ হয়। (২) হাদিস: মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবি ও তাবেয়িদের কথা, কাজ এবং অনুমোদন-সম্পর্কীয় বর্ণনা। (৩) ইজমা: পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে শরিয়তের বিধানের কোনো বিষয়ে সঠিক যোগ্যতাসম্পন্ন ও ন্যায়নিষ্ঠ আলেমদের ঐকমত্য ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। (৪) কিয়াস: যে বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে কোনো স্পষ্ট বিধান নেই সে ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহে প্রাপ্ত অনুরূপ প্রশ্নের মীমাংসাকে ভিত্তি করে যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ইজমা ও কিয়াস পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সুযোগ ইসলামকে গতিশীলতা দিয়েছে।

**ইসলাম প্রচারক** মাসিক পত্রিকা। মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে (সেপ্টেম্বর ১৮৯১) প্রকাশিত হয়। পত্রিকার আখ্যাপত্রে শিরোনামের নিচে 'ইসলাম ধর্মনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্যবিষয়ক মাসিক পত্রিকা' লেখা থাকত। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়কে ধর্মীয়ভাবে জাগ্রত ও ঐতিহ্যগতভাবে অনুপ্রাণিত করাই ছিল পত্রিকাটির

উদ্দেশ্য। মাঝখানে প্রকাশনায় ছেদ পড়লেও পত্রিকাটি মোট ১৩ বছর টিকে ছিল। পত্রিকাটি ব্রিটিশ শাসনকে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য করত এবং মুসলমানদের কংগ্রেস বা স্বদেশি আন্দোলনে যোগদানের বিরোধিতা করত। নওয়াব ফয়জুননেসা চৌধুরানী ও রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী *ইসলাম প্রচারককে* আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

**ইসলামি ব্যাংক** শরিয়তের বিধান অনুসরণ করে পরিচালিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যাতে সুদ এবং সুদের বিনিময়ে ঋণ লেনদেন নিষিদ্ধ। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় উদ্যোক্তা এবং পুঁজিমালিকের মধ্যে শিল্প অথবা বাণিজ্যিক ঝুঁকি সমানভাবে বণ্টন এবং বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আনুপাতিক মূলধনের ভিত্তিতে ভাগ করার কথা বলা হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর মুদারাবা চর্চার সূত্র ধরেই ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার উৎপত্তি। নবী ছিলেন তাঁর স্ত্রীর জন্য মুদারিব প্রতিনিধি। স্ত্রী তাঁকে নিজের মূলধন এবং ব্যবসায়ের পণ্যাদি বিক্রয়ের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিত ছিলেন এবং নবীও শেয়ার অনুযায়ী তাঁকে লভ্যাংশ প্রদান করতেন। পক্ষান্তরে মুশারাকা ধরনের অংশীদারি পদ্ধতিতে মূলধনে মুশারিক বা প্রতিনিধির অবদান থাকে এবং তিনি উচ্চহারে লভ্যাংশ দাবি করতে পারেন। সপ্তম শতাব্দীতে ইরাক থেকে মরুভূমির মধ্য দিয়ে মুদারাবা পদ্ধতিতে মদিনায় কর-রাজস্ব প্রেরণ করা হতো। খলিফা ওমর (রা.) মদিনা ও ইরাকের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে অনাথদের অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন। গইতেইন লিখেছেন, একাদশ শতাব্দীতে মিসর ও জেদ্দার মধ্যে উত্তর-দক্ষিণ বাণিজ্যে মুশারাকার চর্চা ছিল। আর মুদারাবার চর্চা করা হতো তিউনিসিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আরব উপদ্বীপ ও ভারতে। ১৯৫০-এর শেষ দিকে পল্লি এলাকায় একটি স্থানীয় ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাকিস্তানে প্রথম একটি ইসলামিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হয়। মিসর ও মালয়েশিয়ায় ১৯৬৩ সালে এবং দুবাইতে ১৯৭৫ সালে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের সূচনা হয়। ১৯৭৫ সালে মুসলিম দেশগুলো একটি বহুজাতিক উন্নয়ন করপোরেশন হিসেবে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশ ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্য। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের যাত্রা শুরু হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এটিই এ ধরনের প্রথম ব্যাংক। কোম্পানি আইন ১৯১৩-এর অধীনে ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ একটি পাবলিক কোম্পানি হিসেবে এটি নিবন্ধিত হয়।

**ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ** ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রচার এবং বাংলাদেশে ইসলামি কর্মকাণ্ড পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৯ সালে ঢাকায় একটি বৃহৎ মসজিদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'বায়তুল মোকাররম সোসাইটি' নামে একটি সমিতি গঠন করা হয়। একই বছর ঢাকার কয়েকজন ইসলামি চিন্তাবিদ দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বছর 'ইসলামিক একাডেমি' নামে এর নতুন নামকরণ করে একে করাচিতে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের শাখারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ বায়তুল মোকাররম সোসাইটি এবং ইসলামিক একাডেমি একীভূত করে এক অধ্যাদেশবলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ ইসলামিক ফাউন্ডেশন অ্যাক্ট প্রণীত হয়। বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শাখা রয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে নিয়মিত বই, সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। কয়েক খণ্ডে *ইসলামী বিশ্বকোষ* প্রকাশ ফাউন্ডেশনের এক বড় কীর্তি।

**ইসলামী ঐক্যজোট (আইওজে)** বাংলাদেশের ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর জোট। ১৯৯০ সাল খেলাফত মজলিশ, নেজাম-ই-ইসলাম, ফারায়জি জামাত, ইসলামী মোর্চা, উলেমা কমিটি, ন্যাপের (ভাসানী) একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন—এই সাতটি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত হয়। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে খেলাফতের আদর্শে বাংলাদেশে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা।

জোটভুক্ত প্রতিটি দল থেকে পাঁচজন করে সদস্য নিয়ে জোটের মজলিশ-ই-শূরা গঠিত। ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইসলামী ঐক্যজোট সংসদে একটিমাত্র আসন লাভ করে।

**ইহরাম** হজ ও ওমরা প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো নিজের ওপর নিষেধারোপ করা, হজ পালনের জন্য সংকল্প করা। ইসলামি পরিভাষায় ইহরামের অর্থ হজ বা ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানে নখ কেটে, মাথা কামিয়ে, গোসল করে, দেহ ও মনের পরিশুদ্ধিসহ পুরুষেরা মাথা না ঢেকে সেলাইবিহীন সাদা দুটি চাদর ওপরে ও নিচে পরিধান করবে এবং মহিলারা শুধু মুখ খোলা রেখে সমস্ত শরীর আবৃত করবে। ইহরাম পরিধানের পেছনে চেতনাগত উদ্দেশ্য হলো, সমস্ত পার্থিব কামনা-বাসনা ত্যাগ করে শুধু আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। ইহরাম পরিধানকারীকে মুহরিম বলা হয়। ইহরাম পরা অবস্থায় নির্দিষ্ট জায়গায় ও সময়ে দোয়া তালবিয়া ('লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লা শারিকা লাকা লাব্বাইকা') পড়তে হয়। ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছোট-বড় কোনো প্রাণী হত্যা, স্ত্রী-মিলন, ঝগড়া-বিবাদ, সুগন্ধি ব্যবহার, নখ ও চুল কাটা নিষিদ্ধ। এ অবস্থায় কেউ কোনো চুক্তি করতে পারবে না। কোনো নিয়মভঙ্গের ব্যাপার ঘটলে তার জন্য কাফফারা দিতে হয়। জিলহজ মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত হাজিদের ইহরাম পরে থাকতে হয়। কোরবানির পর মাথার চুল ছোট করে কিংবা মাথা মুণ্ডন করে তাঁরা ইহরাম খোলেন।

**ইহুদি জাতি** ইসরাইল বা হজরত ইয়াকুবের বংশধর এবং জুদাহ বা ইহুদি ধর্মমতের অনুসারী। কৃষকরূপে মিসরে বসতি স্থাপনের সময় থেকেই তাদের ইতিহাস শুরু হয়। সেখানে তারা বনু ইসরাইল বা আল-ইয়াহুদ নামে পরিচিত ছিল। ফেরাউন বাদশারা তাদের ওপর চরম নির্যাতন শুরু করলে মোজেস বা হজরত মুসা (আ.)-এর নেতৃত্বে তারা মিসর ত্যাগ করে কেনানে চলে যায়। সেখানে তারা রাজা সলের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং প্রথম ইহুদি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। রাজা সল ফিলিস্তিনিদের হাতে পরাজিত হন। ইহুদিদের পরবর্তী রাজা ডেভিড (হজরত দাউদ) ফিলিস্তিনিদের পরাজিত করেন। তাঁর পুত্র রাজা সলোমন (হজরত সুলায়মান) প্রথম ইহুদি ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ইহুদি রাজ্য শিগগিরই ইসরাইল ও জুডা—এই দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। খ্রিষ্টপূর্ব ৭২২ অব্দে ইসরাইলিরা কেনান থেকে নির্বাসিত হয়। ম্যাকাবীয়দের নেতৃত্বে পরে ইহুদিরা তাদের হৃত স্বাধীনতা ফিরে পায়। কিন্তু ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমান শক্তি জেরুজালেম ধ্বংস করে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইহুদিরা পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রুসেডের সময় থেকে খ্রিষ্টীয় উনবিংশ শতক পর্যন্ত তারা বিভিন্ন জাতি কর্তৃক নির্যাতিত এবং বিভিন্ন দেশ থেকে বিতাড়িত হয়। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়া থেকে শুরু করে পশ্চিমে ফ্রান্স পর্যন্ত সব ইউরোপীয় দেশে ইহুদি খেদাও আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানিতে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি দল ক্ষমতাসীন হলে সেখানে ইহুদি নির্যাতন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ব্যাপক গণহত্যার মুখে ইহুদিরা ইউরোপ ত্যাগ করে প্যালেস্টাইনে এসে বসতি স্থাপন এবং ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সেখানে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

**ইহুদি ধর্ম** সবচেয়ে প্রাচীন একত্ববাদী ধর্ম। তওরাত গ্রন্থ, পুরাকাহিনি, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং তালমুদ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট বিধিবিধান এই ধর্মের ভিত্তি। ইহুদি ধর্মের মূলকথা হলো, একজন সর্বশক্তিমান স্রষ্টা, যার নাম ইয়োভা/জেহোভা, তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস ও তাঁর উপাসনা এবং ইসরাইলি জাতির নেতা মোজেসের (হজরত মুসা) কাছে প্রেরিত তাঁর বাণী ও নির্দেশাবলি অনুসরণ। প্রাচীন কালে ইহুদিরা এসেন, স্যাড্যুসি ও ফ্যারিসি—এই তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে ইহুদিদের মধ্যে ক্যাবালিস্ট ও হাসিদিম নামে দুটি প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে ইহুদি ধর্মে এক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সংস্কারপন্থীরা তওরাতের বহু বিধিনিষেধ বর্জন, ধর্মীয় উপাসনায় মাতৃভাষার ব্যবহার এবং আচার-অনুষ্ঠান হ্রাস করার পক্ষপাতী।

## ঈ

**ঈদুল আজহা** মুসলমানদের প্রধান দুটি ধর্মীয় উৎসবের একটি। বাংলাদেশে এটি কোরবানির ঈদ ও বকরা ঈদ নামেও পরিচিত। 'ঈদ' ও 'আজহা' দুটিই আরবি শব্দ। ঈদ অর্থ উৎসব বা আনন্দ। আর আজহার অর্থ কোরবানি বা উৎসর্গ করা। হজরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রাণপ্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত ইসমাইল (আ.)-কে তাঁর (হজরত ইসমাইলের) পূর্ণ সম্মতিতেই কোরবানি করতে উদ্যত হন (সুরা আফফাত ১০২ ও ১০৭ আয়াত)। মক্কার নিকটবর্তী মিনা নামক স্থানে ৩৮০০ (সৌর) বছর আগে এই ঘটনাটি ঘটে। হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর খোদাভক্তি ও নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ অতঃপর তাঁকে পুত্রের পরিবর্তে একটি পশু কোরবানির আদেশ দেন। আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্যের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণে আজও মিনায় এবং মুসলিম জগতের সর্বত্র ত্যাগের প্রতীক হিসেবে পশু কোরবানির রীতি প্রচলিত রয়েছে। কেবল হাজিদের জন্য নয়, বরং সব সক্ষম মুসলমানের জন্য হালাল পশু কোরবানি করা ওয়াজিব (মতান্তরে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা)। জিলহজ মাসের যে দিনটিতে হজব্রত পালনের অংশ হিসেবে হাজিরা মিনা প্রান্তরে কোরবানি করেন, সেদিন এবং পরবর্তী দুই (মতান্তরে তিন) দিন কোরবানি করা যায়।

কোরবানির পশুকে অবশ্যই নির্দিষ্ট বয়সের হতে হবে এবং তার কতগুলো দৈহিক ত্রুটি (যেমন কানা, খোঁড়া, কানকাটা, শিংভাঙা ইত্যাদি) না থাকা বাঞ্ছনীয়। ঈদুল আজহার নামাজের পর থেকেই কোরবানির সময় আরম্ভ হয় এবং পরবর্তী দ্বিতীয় (মতান্তরে তৃতীয়) শেষ দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। একটি উট, গরু বা মহিষ অনধিক সাতজন কোরবানি দিতে পারে। যার নামে কোরবানি দেওয়া হয় তাঁর পক্ষে অন্য কেউ পশু জবেহ করতে পারে। জবেহ করার সময় সাধারণত পবিত্র কোরআনের দুটি (সুরা আনআম-এর ৭৯ ও ১৬২) আয়াত পড়া হয়। প্রথমটির অর্থ হলো : 'নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।' দ্বিতীয়টির অর্থ হলো: 'অবশ্যই আমার সালাত, আমার কোরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ, সবই আল্লাহর উদ্দেশে, যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক।' তারপর সাধারণত বলা হয়, 'হে আল্লাহ, তুমি এ পশুকে কবুল করো' ইত্যাদি। শেষে 'বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার' বলে পশুটিকে জবেহ করা হয়। পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, 'এর রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, এর গোশতও না, বরং তাঁর কাছে যা পৌঁছায় তা হলো তোমাদের তাকওয়া অর্থাৎ ধর্মনিষ্ঠা' (সুরা হজ ৩৭ আয়াত)। আরবে জাহিলিয়ার অর্থাৎ প্রাক-ইসলাম অন্ধকার যুগে প্রতিমার গায়ে বলির রক্ত মাখানো হতো এবং মাংস দেবীর প্রসাদরূপে বিতরণ করা হতো। ক্ষেত্রবিশেষে নরবলি দেওয়ারও প্রথা চালু ছিল। কোরবানির মাধ্যমে এসব বীভৎস প্রথা রদ করা হয়। সেই সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, তাকওয়ার চূড়ান্ত অর্থ হলো, প্রয়োজন হলে একজন মুমিন তাঁর সবকিছু, এমনকি নিজের জীবনটিও, আল্লাহর নামে কোরবানি করতে সদা প্রস্তুত থাকবে। কারণ 'আল্লাহ মুমিনের জানমাল ক্রয় করেছেন জান্নাতের বদলে' (সুরা তওবা ১১১ আয়াত)। পবিত্র কোরআনে আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: 'তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশে নামাজ পড়ো এবং কোরবানি দাও।' (সুরা কাওসার ২ আয়াত) হাদিসেও কোরবানি বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ ও বিধান দেওয়া আছে।

কোরবানি করা পশুর মাংসের তিন ভাগের এক ভাগ কোরবানিদানকারী পাবে, এক ভাগ আত্মীয়স্বজন ও বাকি এক ভাগ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। কোরবানির পশুর চামড়া নিজে ব্যবহার করার বা অন্যকে দান করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু চামড়া, মাংস, হাড্ডি, চর্বি অর্থাৎ নিজ কোরবানির কোনো কিছুই বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভোগ করা জায়েজ নয়। কোরবানির পশুর চামড়া বা তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্রদের কিংবা মাদ্রাসা বা এতিমখানার ছাত্রদের দান করা হয়।

**ঈদুল ফিতর** মুসলমানদের প্রধান দুটি ধর্মীয় উৎসবের অন্যতম। ঈদ ও ফিতর দুটিই আরবি শব্দ। 'ঈদ' অর্থ উৎসব বা আনন্দ। 'ফিতর' অর্থ বিদীর্ণ করা, উপবাস ভঙ্গ করা, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া। পবিত্র রমজানে মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা ও সংযম পালনের পর শাওয়াল মাসের ১ তারিখে মুসলমানদের স্বাভাবিক কর্মজীবনে ফিরে যাওয়ার দিনটি ঈদুল ফিতর নামে অভিহিত। রমজান মাসের নতুন চাঁদ দেখে যেমন সিয়াম সাধনা বা রোজা রাখা শুরু হয় তেমনি শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ দেখে রোজা ভঙ্গ করা হয়। পবিত্র রমজানের এই এক মাস মুসলমানরা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—এই রিপু বা দুষ্প্রবৃত্তির চর্চা থেকে নিজেদের বিরত রাখে।

হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের পরই ঈদুল ফিতর উৎসব পালন শুরু হয়। হজরত আনাস (রা.) বর্ণিত একটি হাদিস থেকে জানা যায়, নবী করিম (সা.) মদিনায় এসে জানলেন, মদিনাবাসী বছরের দুটি দিনে আনন্দ-উল্লাস করে থাকে। জিজ্ঞাসা করে তিনি আরও জানলেন, জাহেলি অর্থাৎ ইসলাম-পূর্ব যুগ থেকেই এই দুটি দিনকে তারা উৎসবের দিন হিসেবে পালন করে। তখন রাসুল (সা.) তাঁদের বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের উক্ত দিবসদ্বয়ের পরিবর্তে উত্তম দুটি দিন দান করেছেন। দিন দুটি হলো ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতর।

পবিত্র রমজানের পুরো এক মাস রোজা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ইবাদত ও বিধিনিষেধ পালনের পর শাওয়াল মাসের পয়লা তারিখে ঈদ উৎসব পালিত হয়। এ দিনের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে জামাতে ঈদের নামাজ আদায়, গরিব-দুঃখীদের মধ্যে ফিতরা বিতরণ এবং ভালো খাওয়াদাওয়ার আয়োজন। তবে ঈদুল ফিতর উৎসবের একটি তাৎপর্যময় অঙ্গ হলো ফিতরা বিতরণ। রোজার সময় সংযম সাধনায় কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে থাকলে তা সংশোধন এবং সমাজের সর্বস্তরের লোক যাতে উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারে, সে জন্য গরিব-দুঃখীদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট হারে সদকায়ে ফিতরা বিতরণ করতে হয়। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য ফিতরা প্রদান করা ওয়াজিব। মাথাপিছু কত টাকা ফিতরা দিতে হবে তা আগেই রাষ্ট্র কিংবা সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে দেয়। নিয়ম হলো, ঈদের নামাজ পড়তে যাওয়ার আগেই এই ফিতরা পরিশোধ করতে হবে। তারপর ঈদগাহ কিংবা তার অভাবে বড় মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করতে হয়। ঈদুল ফিতরের নামাজে অতিরিক্ত ছয় তকবিরসহ দু'রাকাত ওয়াজিব নামাজ পড়তে হয়। নামাজের শেষে ইমাম সাহেব পর পর দুটি খুতবা পাঠ করেন।

নামাজ শেষে মুসলমানরা পদমর্যাদা ও বয়সনির্বিশেষে পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি, সালাম ও কুশল বিনিময় করে। এ ছাড়া এদিন আত্মীয়স্বজন ও পুণ্যবানদের কবরও জিয়ারত করা হয়। বর্তমানে ঈদকার্ড বিনিময়ও একটি জনপ্রিয় প্রথায় পরিণত হয়েছে। এদিন মাথাপিছু নির্দিষ্ট হারে ফিতরা প্রদানও বাধ্যতামূলক। তা ছাড়া গরিবদের সাধ্যমতো খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদিও দান করা হয়।



ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা উভয় ঈদ উপলক্ষেই সাধারণত তিন দিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। দেশের সর্ববৃহৎ ঈদের জামাতটি অনুষ্ঠিত হয় কিশোরগঞ্জ জেলার শোলাকিয়া ময়দানে। লক্ষাধিক মুসল্লি এখানে একসঙ্গে ঈদের নামাজ আদায় করে।

**ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)** বা **ফাতিহা-ই-দুয়াজদাহম** হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জন্মদিন। হিজরি সালের ১২ রবিউল আউয়াল। মুসলমানরা এই দিনটিকে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) হিসেবে পালন করে। ৫৭০ সালের ১২ রবিউল আউয়াল হজরত মোহাম্মদ (সা.) আরবের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। আবার ৬৩ বছর বয়সে ৬৩২ সালের ১২ রবিউল আউয়াল তারিখেই তিনি ইন্তেকাল করেন। ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)-কে সংক্ষেপে শুধু মিলাদুন্নবী কিংবা ভাষান্তরে সিরাতুন্নবীও বলা হয়। নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে মুসলমানরা দিনটি উদ্‌যাপন করে। এ উপলক্ষে রাসুল (সা.)-এর জীবন ও শিক্ষা নিয়ে আলোচনা এবং তাঁর উদ্দেশে দরুদ ও সালাম পাঠ করা হয়।

উপমহাদেশের দেশগুলোতে এ উপলক্ষে মিলাদ মাহফিলেরও আয়োজন করা হয়। ৬০৪ হিজরি/১২০৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মালিক মুজফরুদ্দিন কোকপুরীর উদ্যোগে উৎসব হিসেবে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)-এর প্রচলন হয়।

**ঈশান** একাদশ রুদ্রের অন্যতম। শিবের অষ্টমূর্তির মধ্যে সূর্যমূর্তিকে ঈশান বলা হয়। অন্য মতে, সুরভির গর্ভে ধর্মের ঔরসে ঈশানের জন্ম। দক্ষযজ্ঞে শিবের অনুচর বীরভদ্র শূলাঘাতে তাঁকে হত্যা করেন। পরে শিবের দয়ায় তিনি পুনর্জীবিত হন। পূর্ব ও উত্তর দিকের মধ্যবর্তী কোণকে ঈশান কোণ বলা হয়। পুরাণমতে, এই কোণের অধিপতি হচ্ছেন শিব। শিবের যেমন রুদ্রমূর্তি তেমনি ঈশান কোণের মেঘও ঝড়ের আকারে রুদ্রমূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়।

**ঈশ্বর** সৃষ্টিকর্তা, জগৎ-প্রভু। আরবি ও হিব্রু ভাষার তিনি আল্লাহ, ইলাহা বা জিহোভা, ফারসি ভাষায় খোদা এবং ইংরেজিতে গড। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে বিশ্বস্রষ্টার নাম YHW এই সাংকেতিক অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হতো। স্রষ্টার নাম একসময় উচ্চারণ করা হতো না। হিব্রুভাষীরা তাঁকে আমার বন্ধু Adonai বা Elohim বলে উল্লেখ বা সম্বোধন করত।

হিন্দুধর্মমতে তিনি ব্রহ্মা, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকর্তা। তিনি সর্বশক্তিমান, ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী ও সর্বশ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর স্বয়ম্ভূ ও অবিনশ্বর। তিনি এক ও অদ্বিতীয়; সর্বভূতে, সর্ব অণুতে-পরমাণুতে বিদ্যমান। তিনি অনন্ত, শুদ্ধ, পবিত্র, নিত্য, মুক্ত, জ্ঞানময়, গুণময়, রসময়, কল্যাণময়, করুণাময়, আনন্দময়, জ্যোতির্ময়, পরম পবিত্র ও পরম গুরু। তিনি পরমাত্মা ও অন্তর্যামী। তাঁর থেকেই জীব ও নিখিল জগতের সৃষ্টি, তাঁতে জগৎ অবস্থিত, তাঁতেই জগৎ লীন। জীবের আত্মারূপে ঈশ্বর জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তিনি নিজের আলোতে নিজে প্রকাশিত হন, একই সঙ্গে অপরকে প্রকাশ করেন। ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু তিনি যেকোনো রূপ ধারণ করতে পারেন। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্মরক্ষার জন্য তিনি যুগে যুগে নানা রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন বলে তাঁকে অবতার বলা হয়। কৃষ্ণ, বামন, নরসিংহ, রাম প্রমুখ ঈশ্বরের অবতার। দেবতারা ঈশ্বরের সাকার রূপ। ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ঘটে মহামায়া বা প্রকৃতির মধ্যে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে পণ্ডিতেরা আদি কারণের কথা বলতেন। উদ্দেশ্যবাদী বা Teleolog-এর যুক্তিতে বলা হয়, সমস্ত বিশ্ব একটি পরিকল্পনা এবং সুতরাং তার পরিকল্পনাকারীর অস্তিত্বকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তত্ত্ববিদ্যা বা Ontology-তে বলা হয়, মন যা ধারণ করতে পারে, এমন সবকিছুরই অস্তিত্ব রয়েছে। পক্ষান্তরে এই যুক্তি অস্বীকার করে ইমানুয়েল কান্ট বলেছেন, ধারণার অন্তর্গত হলেই সবকিছু অস্তিত্ব হতে পারে না। আধুনিক দার্শনিকেরা, বিশেষ করে অস্তিত্ববাদীরা এই মত সমর্থন করেন। ধর্মতত্ত্ববিদদের মতে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ভক্তের বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। সুফি বা অতীন্দ্রিয়বাদীদের মতে, বিশ্বাসযোগ্য এত লোক ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার দাবি করেছেন যে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই।

**ঈশ্বরের মৃত্যু** এই তত্ত্বের উদ্ভব ১৯৬০-এর দশকে। এর প্রবক্তাদের মতে, অতঃপর ঈশ্বর সম্পর্কে আর যথার্থ তাৎপর্যপূর্ণ কোনো আলোচনা সম্ভব নয়। কারণ, এক. আধুনিক মানুষ অভিজ্ঞানলব্ধ প্রমাণ চায় এবং দুই. সমসাময়িক কালের নিষ্ঠুরতার জন্য ঈশ্বরের করুণার ব্যাপারে তাঁরা সন্দিহান।

## উ

**উচ্চৈঃশ্রবা** হিন্দু পুরাণোক্ত অশ্ববিশেষ। ইন্দ্রের বাহন। দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনকালে সমুদ্র থেকে এই শ্বেতবর্ণ অশ্বটির উৎপত্তি। অশ্বটি অমৃতপানে অভ্যস্ত ছিল এবং পুরাণমতে, সকল অশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতো।

**উট** ইসলামের জন্মভূমি আরবে উট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী। যাতায়াত, পরিবহন এবং দুধ ও মাংসের উৎস হিসেবে মরুভূমির জনজীবনে এই প্রাণীটির যেমন গুরুত্ব, তেমনি ইসলামেও এই প্রাণীটির উল্লেখ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে করা

হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সুরা গা'শিয়া-এর ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তবে কি ওরা লক্ষ করে না, উট কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?' পবিত্র কোরআনের সুরা হজ-এর ৩৬ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর উটকে তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম করেছি। তোমাদের জন্য ওতে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে ওদের জবাই করার সময় তোমরা আল্লাহর নাম নাও। যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায়, তখন তোমরা তার থেকে খাও ও খাওয়াও তাকে যে চায় না, আর যে চায় তাকেও। এভাবে আমি ওদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।'

**উতঙ্ক** মহাভারতোক্ত মহর্ষি বেদের শিষ্য। গুরুভক্তির জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল। একদা গুরুদেব উতঙ্কের ওপর গৃহের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করে কার্যোপলক্ষে অন্যত্র যান। এ সময় আশ্রমের উপাধ্যায়-পত্নীরা উতঙ্কের চরিত্র পরীক্ষার্থে তাঁর কাছে এসে বলেন যে গুরুপত্নী ঋতুমতী হয়েছেন; অথচ গুরু অনুপস্থিত। কাজেই গুরুপত্নীর ঋতু যাতে বিফলে না যায়, সে ব্যবস্থা তাঁকেই করতে হবে। কিন্তু উতঙ্ক তাঁদের বলেন, যেহেতু গুরু তাঁকে এ ধরনের কোনো কাজ করার নির্দেশ দিয়ে যাননি, তাই তিনি তা করতে পারবেন না। গুরু আশ্রমে ফিরে এসে এ ঘটনা শুনে উতঙ্কের প্রতি প্রীত হন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করে স্বগৃহে ফিরে গিয়ে সংসারী হতে বলেন। গুরুগৃহ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তিনি উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলে গুরুপত্নী তাঁকে রাজা পৌষ্যের ক্ষত্রিয়া-পত্নীর কুণ্ডলদ্বয় চেয়ে আনতে আদেশ দেন। কারণ ওই কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করে গুরুপত্নী চার দিন পর এক ব্রত উপলক্ষে ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতে চান। কুণ্ডল আনতে গিয়ে যাত্রাপথে উতঙ্ককে বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে কুণ্ডলদ্বয় সংগ্রহ করে উতঙ্ক যখন আশ্রমে ফিরছিলেন, তখন ছদ্মবেশী তক্ষক কৌশলে তা অপহরণ করে। ইন্দ্রের সহায়তায় নাগলোকে গিয়ে উতঙ্ক কুণ্ডলদ্বয় উদ্ধার করে এনে গুরুপত্নীর হাতে অর্পণ করেন। গুরুপত্নী সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উতঙ্ক হস্তিনাপুরের রাজা জনমেজয়ের কাছে যান। তিনি জনমেজয়কে তাঁর পিতৃহন্তা তক্ষকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন এবং সর্পযজ্ঞ অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন।

**উতথ্য** প্রাচীন ঋষি। ধীশক্তির জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর পিতার নাম ছিল অঙ্গিরা, মাতার নাম শ্রদ্ধা ও স্ত্রীর নাম মমতা। তিনি বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। মমতার গর্ভে উতথ্যের এক পুত্র জন্মে। বৃহস্পতির শাপে জন্মান্ধ হন এবং দীর্ঘতমা ঋষি নামে খ্যাতি লাভ করেন।

**উত্তর আমেরিকার আদিম ধর্ম** উত্তর আমেরিকায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ইরোকোয়েজ গোষ্ঠী অনেক উন্নত ছিল। সভ্যতার ইতিহাসে তাই মায়া, ইনকা বা আজটেক সভ্যতার পরপরই তাদের নাম উচ্চারিত হয়। বর্তমান নিউ ইয়র্ক শহর তাদের আদি বাসস্থান হলেও একসময় সুদূর কানাডা পর্যন্ত তারা তাদের রাজত্ব ও প্রভাব বিস্তার করেছিল। জীবনযাপনের সহজ রীতির কারণে বেশ সুশৃঙ্খল একটি ধর্মীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এ সভ্যতায়, যা পরবর্তী সময়ে চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করে। তারা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিল। 'গ্রেট স্পিরিট' বা মহা-আত্মাকে (তাদের ভাষায়, হা-ওয়েন-নে-য়্যু) তারা সমস্ত ক্ষমতার উৎস হিসেবে বিশ্বাস করত। তারা মনে করত, সেই মহা-আত্মা পৃথিবীকে শাসন ও পরিচালনা করেন এবং তিনি রেড-রেস বা লাল-গোষ্ঠীরও রক্ষাকর্তা। তবে ইরোকোয়েজরা তাদের ঈশ্বরের ধারণাকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেনি। তারা হয়তো মনে করেছিল এই 'ব্রহ্মজ্ঞান' তাদের জানা ও বোঝার ক্ষমতার বাইরে। তবে তারা এ-ও মনে করত, পৃথিবীতে মহা-আত্মার আদেশ পালন ও বস্তুজগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রক্ষার জন্য তাঁর চেয়ে নিচু স্তরের একদল স্পিরিট বা 'অদৃশ্য প্রতিনিধি' (হো-নো-চে-নো-কেহ) তাঁকে ঘিরে আছে। এসব প্রতিনিধির বেশ কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। যেমন, তারা মহা-আত্মার অসীম ক্ষমতার উৎস থেকে নানা রকম প্রাকৃতিক শক্তির অধিকারী। মনে করা হতো,

যোদ্ধার পোশাকে সজ্জিত এমন একজন প্রতিনিধি হে-নো বজ্রপাত ঘটায় ও আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ইরোকোয়েজরা শয়তানকে মহা-আত্মার ভাই (হা-নে-গো-এট-গেহ) বা 'মন্দ আত্মা' হিসেবে দেখত। রেড-রেসদের কাছে ভালো ও মন্দ এই দুটো মাত্র পথই খোলা ছিল। তবে রেড-রেসরা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী ছিল। তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পর মহা-আত্মাই ভালো-মন্দের বিচার করবেন। কাজেই মৃত্যু-পরবর্তী শাস্তির ভয়েই তারা মহা-আত্মার প্রতি অনুগত থাকত।

**উত্তরা** হিন্দু পুরাণমতে, মৎস্যরাজ বিরাটের কন্যা। মাতার নাম সুদেষ্ণা। বিরাট-রাজার প্রাসাদে বৃহন্নলা নামে অবস্থানকারী ক্লীববেশী অর্জুন উত্তরাকে নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দেন। অর্জুনের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারার পর রাজা বিরাট তাঁর হাতে কন্যা সম্প্রদান করতে চান। কিন্তু কন্যাস্থানীয়া শিষ্যার পাণিগ্রহণে অসম্মত অর্জুন নিজ পুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সপ্তরথী কর্তৃক অন্যায়ভাবে যখন অভিমন্যু নিহত হন তখন পরীক্ষিত উত্তরার গর্ভে ছিলেন। অশ্বত্থামা ঐশী প্রয়োগ করে গর্ভস্থ পরীক্ষিকে হত্যা করেন। কিন্তু কৃষ্ণ যোগবলে তাঁকে পুনর্জীবিত করেন।

**উৎসর্গ** দেবতা বা ঈশ্বরের উদ্দেশে বা তাঁর নাম করে কোনো কিছু দান বা অর্পণ করা। যেমন খাদ্য, পানীয়, ফুল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরো প্রাণীই দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করতে দেখা যায়। পৃথিবীর প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত নবীন প্রায় সব ধর্মাচারেই উৎসর্গ প্রথাটির প্রচলন লক্ষ করা যায়।

**উদান** গৌতম বুদ্ধের বাণীর সংকলন। বৌদ্ধ সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের তৃতীয় গ্রন্থ। গ্রন্থটি আট বগগে (বর্গ) বিভক্ত এবং এর প্রতিটি বগগে ১০টি করে সুত্ত (সূত্র) আছে। সুত্তগুলোর গোড়ায় সাধারণত গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক কালের কোনো একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং শেষে বুদ্ধের একটি উক্তি রয়েছে। এই উক্তিকেই 'উদান' বলা হয়। উদানগুলো সাধারণত ত্রিষ্টুভ বা জগতি ছন্দে রচিত। এগুলোতে বৌদ্ধদের জীবনাদর্শ, অর্হতের মানসিক শান্তি, নির্বাণ প্রভৃতির মহিমা ও গৌরবের কথা বর্ণিত হয়েছে।

**উদ্দালক** হিন্দু পুরাণের ঋষি। প্রকৃত নাম আরুণি। অরুণ ঋষির পুত্র বলে তাঁর এই নামকরণ। গুরুভক্তির জন্য তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গুরু আয়োদ ধৌম্যের বরে তিনি উদ্দালক নামে খ্যাত হন এবং বেদ ও ধর্মশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। রাজর্ষি অশ্বপতির কাছে তিনি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। তাঁর পুত্র শ্বেতকেতু স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা রক্ষামূলক নিয়ম স্থাপন করেন। বিবাহিত নারীর ভিন্ন পুরুষে এবং বিবাহিত পুরুষের পরস্ত্রীতে আসক্তির শাস্তিবিধানের নিয়ম স্থাপন করেন। রাজা জনমেজয় তাঁর সর্পসত্রে উদ্দালককে সদস্যরূপে বরণ করেন। যোগাবশিষ্ট রামায়ণের উপশম-প্রকরণে উদ্দালক মুনির তপস্যা ও সিদ্ধিলাভের বর্ণনা আছে।

**উদ্ধব** যদুবংশীয় রাজা সত্যকের পুত্র। তিনি বৃহস্পতির শিষ্য এবং শ্রীকৃষ্ণের সখা ও পরম ভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে গভীর তত্ত্বজ্ঞান, সাধুসঙ্গের মহিমা, কর্মানুষ্ঠান ও কর্মত্যাগ, ভক্তিযোগ, বদ্ধ ও মুক্তজীব প্রভৃতি সম্পর্কে উপদেশ দান করেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বদরিকাশ্রমে (কৃষ্ণধামে) গিয়ে বল্কল পরিধান ও ফলমূল আহার করে জীবন ধারণ এবং অলকানন্দা দর্শনে পাপমুক্ত হতে বলেন। উদ্ধব সেই আদেশ পালনার্থে কৃষ্ণধ্যান করতে করতে বদরিকাশ্রমে যান এবং যোগ শেষে দেহত্যাগ করে বৈকুণ্ঠ লাভ করেন।

**উপকীচক** মহাভারতে উল্লেখিত মৎস্যরাজ বিরাটের শ্যালক ও সেনাপতি কীচকের ভ্রাতা। উপকীচকদের মোট সংখ্যা ছিল ১০৫। দ্রৌপদীর সঙ্গে অসদাচরণের দায়ে ভীম কীচককে হত্যা করার পর উপকীচকেরা কীচকের মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় দ্রৌপদীকে দেখতে পেয়ে তাঁকেও কীচকের সঙ্গে দাহ করার জন্য শ্মশানে নিয়ে যায়। দ্রৌপদীর আর্তনাদ শুনে ভীম শ্মশানে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন এবং একটি বৃক্ষ উৎপাটন করে উপকীচকদের সবাইকে হত্যা করেন।

**উপচার** পূজার সামগ্রী বা উপকরণ। হিন্দুদের পূজায় পাঁচ, দশ, ষোলো, আঠারো কিংবা চৌষট্টি উপচারে পূজার বিধান আছে। অপ্রধান দেবতার পূজা পঞ্চোপচারে, সাধারণ পূজা দশোপচারে এবং বিশেষ পূজা ষোড়শোপচারে করা হয়ে থাকে। আঠারো কিংবা চৌষট্টি উপচারের প্রচলন তেমন দেখা যায় না। পঞ্চোপচারে গন্ধ (চন্দন বাটা), পুষ্প (ফুল, বেলপাতা ও তুলসী), ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যের প্রয়োজন হয়। দশোপচারে পাদ্য (পা ধোয়ার জল), অর্ঘ্য (দূর্বা, ভেজা আতপ চাল, ফুল, চন্দন ও জল), আচমনীয় (আচমনের জল), গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানীয় ও তাম্বুলের প্রয়োজন হয়। ষোড়শোপচারের বস্তু হচ্ছে আসন (সাধারণত রুপোর পাতের টুকরো), স্বাগত প্রশ্ন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক (কাঁসার পাত্রে রাখা দই, মধু ও ঘি), স্নানের জল, বস্ত্র, আভরণ (সাধারণত রুপোর আংটি), গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানীয় ও তাম্বুল। গন্ধপুষ্পাদির ক্ষেত্রে দেবতাবিশেষে কিছু কিছু পালনীয় আছে। যেমন বৈষ্ণব দেবতার পূজায় রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প ও বেলপাতার ব্যবহার নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে শক্তিপূজায় এগুলোর ব্যবহার বিধেয়। শিবপূজায় ধুতুরা ফুল, আকন্দ ফুল ও বেলপাতার ব্যবহার অতি প্রশস্ত।

**উপনিষদ** বৈদিক সাহিত্যের অন্তিম পর্যায়ে রচিত দার্শনিক গ্রন্থাবলি। সংস্কৃত ভাষায় রচিত। উপনিষদ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো, যে বিদ্যা বা গুহ্যজ্ঞান নির্জনে গুরুর সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে গ্রহণ করতে হয়। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাবলি মূল চারটি ভাগে বিভক্ত: সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে আরণ্যকগুলো ব্রাহ্মণের এবং উপনিষদগুলো আরণ্যকের অন্তর্গত। প্রতিটি ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক একেকটি সংহিতার সঙ্গে সংযুক্ত বলে ধরা হয়। উপনিষদের সংখ্যা অনির্দিষ্ট। তবে এর মধ্যে ১৩টি উপনিষদ প্রধান ও প্রাচীন বলে স্বীকৃত। (ঋগ্‌বেদের) ঐতরেয় ও কৌশীতকী, (সামবেদের) ছান্দোগ্য ও কেন, (কৃষ্ণ যজুর্বেদের) তৈত্তিরীয়, কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রায়ণীয়, (শুক্ল যজুর্বেদের) বৃহদারণ্যক ও ঈশ, (অথর্ববেদের) মুণ্ডক, প্রশ্ন ও মাণ্ডুক্য। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি শুধু পদ্যে এবং অবশিষ্টগুলো গদ্যে-পদ্যে রচিত। রচনাকাল সাধারণভাবে প্রাগ্‌বুদ্ধ যুগ। পরবর্তীকালে শঙ্করাচার্য ১২টি উপনিষদের ভাষ্য লেখেন। হিন্দুদের কাছে বেদ, গীতা, রামায়ণ ও মহাভারতের মতো উপনিষদও ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। অনেকেই গীতার মতো নিয়মিত উপনিষদও পাঠ করেন। উপনিষদে দেবতার কোনো স্থান নেই। জগতের মূলে আছেন এক ব্রহ্ম; তিনি সত্য, চৈতন্যময় ও জ্ঞেয়; আর সব অসত্য, জড় ও জ্ঞাতা। জীব ও ব্রহ্ম এক, এদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভেই জীবের মুক্তি। ব্রহ্মপ্রাপ্তিই জীবের একমাত্র লক্ষ্য। বেদের যজ্ঞীয় জটিলতা, কর্মকাণ্ডসংক্রান্ত চুলচেরা বিচার ইত্যাদি থেকে মুক্তির উপায় এবং চিন্তার জগতে এক নতুন পরিমণ্ডলের সন্ধান পাওয়া যায় কোনো কোনো উপনিষদে। ভারতীয় দর্শনচিন্তার শ্রেষ্ঠ ফসল হিসেবে গণ্য করা হয় উপনিষদকে। বিজ্ঞানচেতনার প্রথম উন্মেষের পরিচয়ও উপনিষদে লক্ষ করা যায়। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ এই উপনিষদের ভিত্তিতেই ব্রাহ্মধর্মের প্রচার করেছিলেন।

**উপপুরাণ** পুরাণ সাহিত্য দু'ভাগে বিভক্ত : মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। অষ্টাদশ মহাপুরাণের অতিরিক্ত পুরাণগ্রন্থাদি উপপুরাণ নামে পরিচিত। এর বিষয়বস্তু অনেকটা মহাপুরাণেরই মতো। দেবী পুরাণ ও কালিকা পুরাণের মতো কোনো কোনো উপপুরাণ মহাপুরাণের সমান কিংবা তদপেক্ষা অধিক মর্যাদার অধিকারী। অধিকাংশ উপপুরাণ অর্বাচীন হলেও কোনো কোনো উপপুরাণ বেশ প্রাচীন। যেমন—শাম্ব উপপুরাণ ও বিষ্ণু ধর্মোত্তর উপপুরাণ। বিভিন্ন গ্রন্থে উপপুরাণের বিভিন্ন তালিকা পাওয়া যায়। যেমন কূর্ম পরিমাণের তালিকা অনুযায়ী উপপুরাণের সংখ্যা আঠারোটি। যদিও বিভিন্ন উপপুরাণে উল্লেখিত তালিকা মিলিয়ে দেখলে এই সংখ্যা আরও বেশি বলে মনে হয়।

**উপবাস উৎস** (Atamalqualiztli) প্রাচীন আজটেকবাসীদের একটি উপবাস প্রথা। প্রতি আট বছর অন্তর অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে এটি পালন করা হতো। বিশ্বাস করা হতো, যারা এই

উপবাস পালন করবে না তারা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হবে। উপবাসভঙ্গের দিনটিকে আনন্দোৎসব হিসেবে পালন করা হতো।

**উপবেদ** সব বেদেরই উপবেদ আছে। যেমন, ঋগ্‌বেদের আয়ুর্বেদ, যজুর্বেদের ধনুর্বেদ, সামবেদের গন্ধর্ববেদ এবং অথর্ববেদের স্থাপত্যবেদ। এগুলোর স্থান বেদের নিচে। এগুলো সাধারণত বিজ্ঞান বা প্রায়োগিক বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত।

**উপমন্যু** মহর্ষি আয়োদধৌম্যের শিষ্য। গুরুভক্তির জন্য বিখ্যাত। হিন্দু পুরাণে বর্ণিত রয়েছে আয়োদধৌম্যের এই প্রিয় শিষ্য আশ্রমে গরু চড়াতেন। তাঁর সুস্বাস্থ্য লক্ষ করে গুরু তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কী খেয়ে এমন হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠছেন। উপমন্যু বলেন, 'আমি ভিক্ষা করে খাই।' গুরু তাঁর জন্য ভিক্ষা নিষেধ করে দিলে তিনি গরুর দুধ পান করতে থাকেন। গুরু তা-ও নিষেধ করলে তিনি বাছুরের মুখের ফেনা পান করতে থাকেন। এরপর গুরু যখন তা-ও নিষেধ করে দেন তখন একদিন ক্ষুধায় কাতর হয়ে উপমন্যু আকন্দপাতা খেয়ে দৃষ্টিশক্তি হারান এবং কুয়োর মধ্যে পড়ে যান। ওই অবস্থায় গুরুর আদেশে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করে তাঁদের বরে উপমন্যু দৃষ্টি ফিরে পান এবং শ্রেয় লাভ করেন। গুরু ধৌম্য তখন তুষ্ট হয়ে উপমন্যুকে সব বেদ ও ধর্মবিদ্যা দান করে নিজের ঘরে ফিরে যেতে আদেশ করেন।

মহাভারতে মহর্ষি ব্যাঘ্রপাদের পুত্র এক উপমন্যুর উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি কঠিন তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করে তাঁর বর লাভ করেন এবং অজর, অমর, সুদর্শন ও সর্বজ্ঞ হয়ে ওঠেন। শ্রীকৃষ্ণ এই উপমন্যুর কাছে দীক্ষা নেন।

**উপসুন্দ, সুন্দ** হিন্দু পুরাণমতে দৈত্য নিকুম্ভের দুই পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ। এর মধ্যে সুন্দ জ্যেষ্ঠ, উপসুন্দ কনিষ্ঠ। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বংশজাত নিকুম্ভের এই পুত্রদ্বয় বিন্ধ্যপর্বতে কঠোর তপস্যায় রত হন। তাঁদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁদের এই মর্মে বর দেন যে, তাঁরা কেবল পরস্পরের দ্বারাই বধ হতে পারেন। এ ছাড়া ত্রিলোকে কেউ তাঁদের ক্ষতি করতে পারবে না। ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ হয়ে ত্রিলোক জয় করে তাঁরা তখন দেবতা ও তপস্বীদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। পরিত্রাণের জন্য দেবতা ও ঋষিরা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলে ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা এক পরমাসুন্দরী নারী তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেন। তিলোত্তমা অতঃপর সুন্দ-উপসুন্দ দুই ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হলে তাঁকে পেতে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বেধে যায় এবং তারা দুজনেই সে-যুদ্ধে নিহত হয়। ত্রিভুবনে শান্তি ফিরে আসে।

**উবাই ইবনে কা'ব** মহানবী (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবি। হজরত আবুবকর (রা.)-এর সময় যাঁদের ওপর পবিত্র কোরআন লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব অর্পিত হয়, উবাই ইবনে কা'ব (রা.) ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান। তাঁর জন্ম মদিনার লাজ্জাব গোত্রে। আনসারদের মধ্যে তিনি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁকে 'সাইয়িদুল আনসার' (আনসারদের সরদার) খেতাব দান করেন। বদর থেকে তাইফ পর্যন্ত সব যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন পবিত্র কোরআনে হাফেজ। হজরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে তিনি খলিফার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে পবিত্র কোরআনের কেরাতের ব্যাপারে যে মতভেদ দেখা দেয়, হজরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে তার নিরসন হয়। তিনি উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর কেরাতের আদর্শে পবিত্র কোরআনের কেরাত নির্দিষ্ট করে সর্বত্র তা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। অদ্যাবধি পবিত্র কোরআন পাঠের সেই রীতিই মুসলিম বিশ্বে অনুসৃত হচ্ছে।

**উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ** মুসলিম সেনাপতি। খলিফা মুয়াবিয়ার আমলের গভর্নর জিয়াদ ইবনে আবিহির পুত্র। তরুণ বয়সেই পারস্যের খুরাসান প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে তিনি শাসন পরিচালনায় বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন। পরে ইরাকের গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়ে অত্যন্ত কঠোর হাতে সেখানকার খারিজি বিদ্রোহ দমন করেন। কুফায় হজরত আলী (রা.)-এর সমর্থকসংখ্যা বেশি থাকায় সেখানে উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিলে ইয়াজিদ

উবাইদুল্লাহকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইমাম হুসেন (রা.)-এর চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনে আকিল (রা.)-এর নেতৃত্বে সেখানে বিদ্রোহ দেখা দিলে উবাইদুল্লাহ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তা দমন এবং মুসলিমকে হত্যা করেন। ইতিপূর্বে কুফাবাসীর আমন্ত্রণে ইমাম হুসেন (রা.) একদল অনুচর সঙ্গে নিয়ে সপরিবারে মদিনা থেকে কুফা যাত্রা করেন; কিন্তু পথিমধ্যে মুসলিম হত্যার এবং উবাইদুল্লাহর কার্যকলাপের খবর পেয়ে তিনি কুফা প্রবেশের আশা পরিত্যাগ করেন। অতঃপর সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে তিনি কুফা থেকে পঁচিশ মাইল দূরবর্তী কারবালা প্রান্তরে গিয়ে উপনীত হন। সেখানে ফোরাত নদীর তীরে উবাইদুল্লাহর সেনাবাহিনী তাঁকে বাধা দেয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর অবস্থায় অধিকাংশ পুরুষ আত্মীয়স্বজন, অনুচরসহ তিনি বীরের মতো যুদ্ধ করেন এবং নিজে ও তাঁর সঙ্গীদের অনেকে নিহত হন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা উবাইদুল্লাহর বাহিনীর হাতে বন্দী হন। উবাইদুল্লাহ পরবর্তী সময়ে ইমাম হুসেন (রা.)-এর সমর্থক সেনাদলের সঙ্গে এক যুদ্ধে নিহত হন। ইমাম হুসেন (রা.)-এর হত্যাকারী হিসেবে ইয়াজিদের সঙ্গে উবাইদুল্লাহর নামটিও বিশেষ করে শিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

**উমরাই কাজা** মহানবী (সা.) ষষ্ঠ হিজরিতে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হন। কিন্তু সেখানে পৌঁছার আগেই হুদায়বিয়া নামক স্থানে কুরাইশরা তাঁকে বাঁধা দেয়। অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি বা নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্তানুসারে মহানবী (সা.) ও তাঁর অনুগামীরা ওই বছর ওমরা পালন না করেই মদিনায় ফেরত যান। পরের বছর তিনি মক্কায় এসে ওমরা পালন করেন। এই ওমরাকেই 'উমরাই কাজা' বলা হয়। হিজরতের পর মক্কায় তাঁর প্রথম আগমন হিসেবে ঘটনাটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। মক্কাবাসী ওই সময়ের জন্য শহর থেকে বাইরে চলে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবিদের কাবা শরিফ তওয়াফকালে প্রথম তিনটি চক্কর দ্রুতবেগে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন, যাতে দৈহিক শক্তির প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ কুরাইশরা যাতে মনে না করে যে মদিনায় গিয়ে মুসলমানরা হতবল হয়ে পড়েছে। এটিকে 'রমল' বলা হয়। এখন পর্যন্ত কাবা ঘর তওয়াফে এই রীতিটি চালু আছে।

**উমা** মহাদেবের পত্নী এবং হিমালয় ও সুমেরুদুহিতা মেনকার কন্যা। পূর্বজন্মে তিনি দক্ষের কন্যা ছিলেন। দক্ষের যজ্ঞানুষ্ঠানে পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনে তিনি আত্মাহুতি দেন এবং হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। শিবকে পতিরূপে পাওয়ার মানসে অপর্ণা সেজে তিনি কঠোর তপস্যা শুরু করেন। তখন মেনকা 'উ' (হে পার্বতী) 'মা' (না, অর্থাৎ তপস্যা কোরো না) বললে তা থেকে তাঁর নাম হয় উমা। পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা হিসেবে উমার অপর নাম পার্বতী। দক্ষের কন্যারূপে মহামায়া সতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। শিবকে তুষ্ট করে গৌরবর্ণ লাভ করায় তার অপর নাম গৌরী।

**উমামাহ বিনতে আবুল আস** মোহাম্মদ (সা.)-এর দৌহিত্রী। তাঁর কন্যা জয়নবের গর্ভে জন্ম। পিতার নাম আবুল আস ইবনে রাবি ইবনে আবদুল উজজা। ফাতিমা (রা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী হজরত আলী (রা.) উমামাহকে বিয়ে করেন। মৃত্যুর পর তারই অসিয়ত অনুযায়ী মুগিরাহ ইবনে নওফলের সঙ্গে উমামাহর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। মহানবী উমামাহকে এত স্নেহ করতেন যে, তিনি নামাজে দাঁড়ালে রুকু ও সিজদার সময় এই নাতনিটি তাঁর পিঠ ও কাঁধে চড়ে বসতেন। রাসুল (সা.) একবার কোথাও থেকে একটি হার উপঢৌকন পেয়ে বলেন যে, তাঁর কাছে যে সবচেয়ে প্রিয়, তাকেই তিনি হারটা উপহার দেবেন। সবার ধারণা ছিল, ওই হার হজরত আয়েশা (রা.)-এর গলায়ই শোভা পাবে। কিন্তু মহানবী (সা.) তা উমামাহকে দান করেন। মুগিরাহ ইবনে নওফলের ঔরসে উমামার গর্ভে ইয়াহিয়া নামে এক পুত্রসন্তান জন্ম লাভ করে।

**উর্বশী** স্বর্গের অপ্সরা। পরমাসুন্দরী। তাঁর জন্ম সম্পর্কে পুরাণে নানা মত পাওয়া যায়। কোনো একটি মতে, নারায়ণের উরু থেকে তাঁর সৃষ্টি।

অন্য মতে, সমুদ্র মন্থনের ফলে তাঁর জন্ম। আবার সপ্ত মনু কর্তৃক তাঁর সৃষ্টি—এরূপ অভিমতও প্রচলিত আছে। মোট কথা উর্বশী সম্পর্কে হিন্দু পুরাণে অনেকগুলো কাহিনি আছে। যেমন ইন্দ্রসভায় আহূত রাজা পুরুরবাকে দেখে উর্বশীর নৃত্যের তাল ভঙ্গ হয়, ফলে ইন্দ্রের শাপে উর্বশী মর্তে এসে তাঁর নিজের প্রার্থনা অনুযায়ী পুরুরবার পত্নী হন। এদিকে স্বর্গলোকে গন্ধর্বরা উর্বশীর অভাববোধ করতে থাকেন। তাঁদের কৌশলে উর্বশী শাপমুক্ত হন। শোকগ্রস্ত পুরুরবা অতঃপর দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন এবং একপর্যায়ে কুরুক্ষেত্রের কাছে হংসীদেহধারী অপর চার অপ্সরার সঙ্গে স্নানরতা উর্বশীকে দেখতে পান। পুরুরবার অনেক কাকুতি-মিনতির পর উর্বশী তাঁর সঙ্গে ফিরে যেতে রাজি হন। উর্বশীর গর্ভে পুরুরবার পাঁচটি মতান্তরে সাতটি সন্তান হয়। বেদে বলা হয়েছে, আদিত্য যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে যাওয়ার পর সেখানে উর্বশীর রূপে মুগ্ধ মিত্রাবরুণের রেতঃপাত হয়, সেই রেতঃ থেকে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম। আর একটি কাহিনিতে ইন্দ্রালোকে উর্বশী অর্জুনের সঙ্গ কামনা করলে অর্জুন মাতৃজ্ঞানে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ক্রুদ্ধ উর্বশীর শাপে অর্জুন নপুংসক নর্তকের বেশে বৃহন্নলা নামে বিরাট-রাজার গৃহে অজ্ঞাতবাস করেন। পদ্মপুরাণ মতে, গন্ধমাদন পর্বতে কঠোর তপস্যারত বিষ্ণুর তপোভঙ্গ করাতে পারায় ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে উর্বশীকে গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে মিত্র ও বরুণ উর্বশীকে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে উর্বশী তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তাঁদের অভিশাপে উর্বশীকে মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে আসতে ও পুরুরবার স্ত্রী হতে হয়।

**উলুধ্বনি** হর্ষ বা বিষাদ প্রকাশে জিহ্বা নেড়ে উচ্চারিত বিশেষ ধ্বনি। এটি উচ্চকণ্ঠ ধ্বনি। জিহ্বা ও আলজিহ্বা বাঁ থেকে ডান দিকে নেড়ে এ ধ্বনি সৃষ্টি করা হয়। 'উলু' শব্দটি ধনাত্মক। বাংলা ভাষায় এটি উলু, তামিলে কুলা ভাই, মালয়ালামে কুড়াভা, উড়িয়ায় উলি, অহমিয়া ভাষায় উরলি এবং আরবি ভাষায় জাগরুতা নামে পরিচিত। বহুকাল আগে থেকেই মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে এবং রোমানদের মধ্যে উলু দেওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত। এ দেশের হিন্দু মহিলারাও ধর্মীয় উপলক্ষে ও উৎসব-অনুষ্ঠানে উলু দিয়ে থাকে। আরব দেশে, দক্ষিণ ইউরোপে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় সাধারণত বিয়ের উৎসব ও অন্যান্য আনন্দানুষ্ঠানে এবং শুভসংবাদ পেলে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়। প্রাচীন মিসরের পিরামিডগাত্রের লেখ্যমালায়, গ্রিক সাহিত্য ও ইতিহাসে উলুধ্বনির উল্লেখ পাওয়া যায়।

**উলূপী** নাগরাজ ঐরাবতের বংশজাত কৌরব্যের বিধবা কন্যা। তাঁর স্বামী গরুড় কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর একাসনে থাকার দৃশ্য দৈবাৎ একদিন অর্জুনের দৃষ্টিগোচর হয়। এই অপরাধে যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুনকে ১২ বছরের জন্য বনবাসে যেতে হয়। এই নির্বাসনের দিনগুলোতে অর্জুন গঙ্গাতীরে অবস্থান করতে থাকেন। একদিন অর্জুন গঙ্গায় স্নান করতে নামলে উলূপী তাঁকে দেখে কামাসক্ত হয়ে পড়েন ও অর্জুনকে নাগলোকে নিয়ে যান। সেখানে উলূপী অর্জুনের কাছে আত্মনিবেদন করলে অর্জুন তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁর ঔরসে ও উলূপীর গর্ভে ইরাবানের জন্ম হয়। বনবাসের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে অর্জুন উলূপীকে নাগলোকে রেখেই স্বগৃহে ফিরে যান। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলে অর্জুন তাতে যজ্ঞাশ্বের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পান। অর্জুন মণিপুর রাজ্যে উপস্থিত হওয়ার পর সেখানে রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত তাঁর পুত্র বভ্রুবাহন উলূপীর প্ররোচনায় অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধে অর্জুন পুত্রহস্তে পরাজিত ও অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তখন উলূপীই আবার নাগলোক থেকে সঞ্জীবনী মণি এনে অর্জুনের চৈতন্য ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পর উলূপী জাহ্নবী জলে প্রবেশ করেন।

**উশর ও খিরাজ** 'উশর' আরবি শব্দটির অর্থ এক-দশমাংশ। যে দেশের সব অধিবাসী মুসলমান, সে দেশে জমির ওপর উশর (উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ) কর ধার্য করা হয়। উশরকে অন্য কথায় জাকাতুল আর্দ বা ভূমির জাকাতও বলা হয়। এই

করের বোঝা তেমন ভারী নয়। আর সব মুসলমানের ওপর এই কর আরোপ করাকে ন্যায়সংগত বলে মনে করা হয়। মুসলমানরা যে দেশ জয় করেছে কিংবা যে দেশ মুসলমানদের অধীনতা মেনে নিয়েছে, তার সব অধিবাসী খিরাজ নামক আরেকটি করের আওতায় আসত। খিরাজের হার ছিল উৎপন্ন ফসলের সর্বনিম্ন এক-ষষ্ঠাংশ থেকে সর্বোচ্চ অর্ধাংশ পর্যন্ত।

**উশাবটিন** মমির মতো ক্ষুদ্রাকৃতির প্রস্তরমূর্তি। প্রচীনকালে মিসরে মরদেহের সঙ্গে এ ধরনের মূর্তি কবর দেওয়া হতো।

**উসলুল ফিকাহ্** ফিকাহ অর্থাৎ মুসলিম আইনশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলো। ইসলামি বিদ্যার চারটি শাখার মধ্যে যে শাখাটি সরাসরি ফিকাহ বিষয়ে আলোচনা করে, তাকে উসলুল ফিকাহ বলে। আইন বা তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উৎস এবং উৎসগুলোর প্রতিপাদ্য বিষয়ে আলোচনা করাই এর কাজ। এই আলোচনার মধ্যে চারটি প্রধান বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত হাকিম বা আইনদাতা বা আইন, হুকুম, মাহকুম বিহি বা আইনের বিষয়বস্তু অর্থাৎ কর্ম, অধিকার ও দায়িত্ব এবং মাহকুম আলায়হি বা যাঁদের জন্য আইন তাঁরা।

**উষ্ট্রযুদ্ধ বা উটের যুদ্ধ** ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বসরার কাছে সংঘটিত যুদ্ধ। এই যুদ্ধের এক পক্ষ ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রা.) এবং অপর পক্ষে হজরত আয়েশা (রা.), জুবায়ের ইবনে আওয়াম ও তালহা ইবনে আবদুল্লাহর সম্মিলিত বাহিনী। হজরত আয়েশা (রা.) উটে চড়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন বলে এই যুদ্ধকে 'উষ্ট্রযুদ্ধ' বা উটের যুদ্ধ বলা হয়। যুদ্ধের ফলাফল হজরত আয়েশা (রা.)-এর বিপক্ষে যায়। জুবায়ের ও তালহা দুজনই এই যুদ্ধে নিহত হন। যুদ্ধের পর হজরত আলী (রা.) পূর্ণ সম্মানের সঙ্গে হজরত আয়েশা (রা.)-কে মদিনায় পাঠিয়ে দেন এবং সেখানে তাঁর বসবাসের জন্য সুব্যবস্থা করে দেন।

## উ

**উষা** বৈদিক দেবতাবিশেষ; প্রাতঃকালের দেবতা। তিনি জ্যোতিবসনা, চিরযৌবনা ও সব সৌন্দর্যের আধার। ঋগ্‌বেদের ২০টি সূক্তে তাঁর স্তুতি করা হয়েছে। প্রাচীন ঋষি-কবিরা উষাকে প্রণয়িনী তরুণীরূপে কল্পনা করেছেন। উষা ও রাত্রি দুই বোন, এর মধ্যে উষাদেবীর প্রণয়ীরূপে সূর্যদেবকে কল্পনা করা হয়েছে। কোথাও কোথাও আবার অগ্নিই তাঁর প্রণয়ীরূপে কীর্তিত। বেদে যে উষার কথা বলা হয়েছে তিনি প্রজাপতির কন্যা। প্রজাপতি রাজা সোমের (চন্দ্রের) সঙ্গে কন্যার বিয়ে দেওয়ার সংকল্প করেছেন—এই সংবাদ পেয়ে অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র ও অশ্বিনীদ্বয় উষার পাণিপ্রার্থী হন। প্রজাপতি ঘোষণা করেন, অনন্ত আকাশপথ অনুধাবনে যিনি সক্ষম হবেন এবং সেই সঙ্গে যিনি বেশিসংখ্যক স্বরচিত বেদসূক্ত উচ্চারণ করতে পারবেন, তাঁর হাতেই উষাকে সমর্পণ করা হবে। এ কথা শুনে অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য আকাশপথে অগ্রসর হন, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন অশ্বিনীদ্বয় ইন্দ্রের কাছ থেকে বেদসূক্ত লাভ করে সফলতার পরিচয় দেন এবং উষাকে লাভ করেন।

## ঋ

**ঋক্** বেদের শ্লোক। গায়ত্রী মন্ত্র। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো যার দ্বারা দেবতাদের স্তুতি করা যায়। আর্যরা ঋক্ বা মন্ত্রের সমষ্টি আদি বেদ নিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। বেদের ত্রিবিধ মন্ত্রের মধ্যে ঋক্ই হলো আদি। এক-একটি ঋক্ উচ্চারণ করে আর্যরা বিভিন্ন দেবতার স্তুতি দ্বারা ঈপ্সিত বস্তু প্রার্থনা করত।

**ঋগ্‌বেদ** প্রাচীনতম বেদ এবং সম্ভবত পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। এর অন্য নাম শ্রুতি। প্রাচীনকালে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শ্রুত হয়ে প্রচারিত হতো বলে এর এক নাম শ্রুতি। ঋগ্‌বেদে ১০ হাজার ৫৮০টি ঋক্ বা মন্ত্র রয়েছে। ঋগ্‌বেদের পাঁচটি শাখা যথা: শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, শাঙ্খায়ন ও মাণ্ডুক এবং অনেকগুলো উপশাখা যেমন: শৈশিরী, পৈঙ্গী, ঐতরেয়ী, কৌশীতকী প্রভৃতি আছে। এর মন্ত্রগুলো সূর্য, বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র, উষা মরুৎ, রুদ্র, যস, সোম, পৃথিবী ও অশ্বিনীদ্বয়-এর স্তুতিতে পূর্ণ। ইন্দ্রের জন্য প্রায় ২৫০টি এবং অগ্নির জন্য প্রায় ২০০টি

ঋক্-এর উল্লেখ দেখা যায়। ঋগ্বেদের ঋক বা মন্ত্রগুলো খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যে সংগৃহীত বলে ধারণা করা হয়।

## এ

**এক্সট্রিম আংশান** রোমান ক্যাথলিক ও অর্থোডক্স খ্রিষ্টীয় ধর্মসংঘের অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর অব্যবহিত আগে পুরোহিত কর্তৃক সম্পাদিত শেষকৃত্যাচার। দ্বাদশ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এটা চালু রয়েছে।

**এঙ্গাকক** এস্কিমোদের পুরোহিত। এ পুরোহিতদের যেকোনো রমণীর সঙ্গে সহবাস করার অধিকার আছে। সাধারণ এস্কিমোদের ভয় দেখিয়ে বা বিভ্রান্ত করে পুরোহিতেরা এ সুবিধা ভোগ করে থাকে।

**এজ্ঞ** নাইজিরীয়দের আরাধ্য সম্পদের দেবী। কিংবদন্তি অনুযায়ী সৃষ্টিকর্ত্রী দেবী অদুদুয়ার সঙ্গে তাঁকেও পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর অনুসারীদের বিশ্বাস, তিনি এক রকম পাখির রূপ ধরে মানুষের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

**এটি** গ্রিক পুরাণে ধ্বংস ও প্রতিহিংসার দেবী। দেবরাজ জিউসের কন্যা। তিনি পুরুষ ও দেবতাদের বিভ্রান্ত করেন।

**এতিমখানা** এতিম শব্দটি এসেছে আরবি 'ইয়াতিম' থেকে, যার অর্থ অনাথ। আর 'খানা' ফারসি শব্দ, যার অর্থ আশ্রয় বা আশ্রম। উভয় শব্দ মিলে হয়েছে এতিমখানা অর্থাৎ অনাথ আশ্রম। অসহায় বা নিরাশ্রয় বালক-বালিকারাই এই আশ্রমে লালিত-পালিত হয়। সমাজের দানশীল ব্যক্তি, সরকার কিংবা বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অর্থসাহায্যে সাধারণত এতিমখানাগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। পিতৃমাতৃহীন বা অনাথ শিশু-কিশোরদের ভরণপোষণ ও ধর্মীয় শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাদের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার ব্যবস্থাও করা হয় এতিমখানায়। বাংলাদেশে যেমন ব্যক্তি-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত তেমনি আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন সেবাধর্মী সংগঠন ও সরকারের সমাজসেবা বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত ছোট-বড় অনেক এতিমখানা রয়েছে।

**এনডিমিয়ন** গ্রিক পুরাণে বর্ণিত সুদর্শন মেষপালক। চন্দ্রদেবী সেলিনি (রোমান পুরাণে যার নাম ডায়ানা) তাঁর প্রেমে পড়েন। এনডিমিয়ন যাতে অন্য কারও প্রতি আসক্ত হতে না পারেন, তার জন্য সেলিনির অনুরোধে জিউস তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন। সেলিনি স্বর্গলোক থেকে নেমে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন।

**এনসেল্যাডাস** পুরাণে বর্ণিত গ্রিক দৈত্য। দৈত্যদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর। তিনি জিউসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন এবং স্বর্গের দিকে হাত বাড়ান। এ জন্য জিউস তাঁকে শাস্তি দেন।

**এয়িয়্যাকাস** রোমান দেবতা জুপিটারের পুত্র। তিনি তাঁর ন্যায়বিচারের জন্য বিখ্যাত।

**এশিয়া** গ্রিক দেবী। ওসেনাস ও থেটিসের কন্যা। তাঁর নাম থেকেই এশিয়া মহাদেশের নামের উৎপত্তি। আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলেও ধরিত্রীর দেবীরূপে এশিয়া পূজিত হতেন।

**এসকাটলজি** খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের শাখাবিশেষ। এতে পৃথিবীর ধ্বংস বা বিলয়, মৃতদের পুনরুত্থান ও বিচার, খ্রিষ্টের পুনরাবির্ভাব ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধ্যানধারণা বিন্যস্ত রয়েছে।

## ও

**ওঙ্কার, ওম, ওঁ** হিন্দুধর্মের একটি আধ্যাত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। এটি বেদের বীজমন্ত্ররূপে বিবেচিত হয়। বৈদিক অক্ষর প্রণব-এর এটি সমার্থক। শব্দটি একই সঙ্গে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু নামে সৃষ্টির ভগবান, সংহারের ভগবান ও রক্ষার ভগবানের রূপকে প্রকাশ করে। এখানে অ হচ্ছে বিষ্ণু, উ শিব এবং ম ব্রহ্মা। তিনে মিলে অউম বা ওম। স্রষ্টা প্রজাপতির সংকল্প থেকে এই তিনটি ধ্বনির উৎপত্তি। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে 'ওম'—এই একটিমাত্র ধ্বনি বা শব্দ উচ্চারণে বেদ পাঠের ফল লাভ হয়। পরম পবিত্র বলে প্রার্থনা বা আশীর্বাদে শব্দটি কখনো নিঃশব্দে আবার কখনো সরবে উচ্চারণ করা হয়। এ ছাড়া রচনা, পুস্তক বা চিঠির শুরুতেও ওঁ লেখার নিয়ম চালু রয়েছে। বৌদ্ধধর্মে এটি পার্থিব বা পারলৌকিক বা উভয়ের মিলনের ভাবদ্যোতক হতে পারে।

**ওজু, অজু** পরিচ্ছন্নতা। মুসলমানদের মধ্যে শারীরিক পবিত্রতা লাভের জন্য গোসলের পরে ওজুর স্থান।

পবিত্র কোরআনে বিশেষভাবে নামাজ ও পবিত্র কোরআন পড়ার আগে ওজু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের সুরা মায়িদা-র ৬ আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াও তখন তোমাদের মুখ ও হাত কনুই পর্যন্ত ধোবে এবং তোমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে নেবে, আর পা গিট পর্যন্ত ধোবে। যদি তোমরা অপবিত্র থাকো তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে।' শরীর অপবিত্র হওয়ার কারণ হলো পায়খানা-প্রস্রাব করা, বায়ু নিঃসরণ, স্ত্রী সংসর্গ, অচেতন হওয়া বা ঘুমিয়ে পড়া, রক্তক্ষরণ ইত্যাদি। এই অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র অবস্থায় ফিরে আসার জন্য ওজুর প্রয়োজন। ওজু তিন প্রকার : ফরজ, ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব। নামাজের জন্য ওজু ফরজ। কাবা শরিফ তওয়াফের জন্য ওজু করা ওয়াজিব। গোসল ও ঘুমানোর আগে ওজু করা মুস্তাহাব। ওজু করার নিয়ম হলো, বিসমিল্লাহর সঙ্গে প্রথমে নিয়ত করতে হয়। তারপর ডান হাতের ওপর তিনবার ও বাঁ হাতের ওপর তিনবার পানি ঢেলে ধুতে হবে। আঙুলের ফাঁকে এমনকি আংটির মাঝেও পানি প্রবেশ করাতে হবে। হাতের তালুতে পানি নিয়ে তিনবার গড়গড়ার সঙ্গে কুলি করতে হবে। তারপর ডান হাতে পানি দিয়ে নাকের ছিদ্রে পানি প্রবেশ করিয়ে বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে চেপে তিনবার নাক পরিষ্কার করে নিতে হবে। অতঃপর পুনরায় দুই হাতে পানি ছিটিয়ে তিনবার মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলতে হবে। পরে বাঁ হাতে পানি নিয়ে ডান বাহু কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুতে হবে এবং একইভাবে ডান হাতে পানি নিয়ে বাঁ বাহু কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুতে হবে। এরপর ভেজা হাত মাথার ওপরে নিয়ে সামনে থেকে পেছনে এবং পেছন থেকে সামনে মাসেহ বা মোছার কাজ করতে হবে। এ সময় মনে মনে কলেমা শাহাদাত পড়া যেতে পারে। অতঃপর দুই কানে তর্জনী প্রবেশ করিয়ে এবং কানের পেছনে বৃদ্ধাঙ্গুলি নিয়ে ও তা আগেপিছে করিয়ে কানের ছিদ্র ও বাইরের অংশ মুছে পরিষ্কার করতে হবে। শেষে বাঁ হাতের তালু দিয়ে ডান পায়ের ওপর, নিচ ও আঙুলের ফাঁক ধুতে হবে এবং একইভাবে ডান হাতের তালু দিয়ে বাঁ পায়ের ওপর, নিচ ও আঙুলের ফাঁক ধুতে হবে। কোথাও ওজুর পানি না পাওয়া গেলে বা অসুস্থতার কারণে কেউ পানি ব্যবহারে অসমর্থ হলে সে ক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে শুকনো মাটি বা বালি ব্যবহার করে পরিচ্ছন্ন হওয়ার বিধান শরিয়তে দেওয়া হয়েছে। (তায়াম্মুম দ্র.)

**ও-বন** উৎসববিশেষ। জাপানের এলাকাভেদে ১৫ জুলাই বা ১৫ আগস্ট এই ও-বন বা বন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বৌদ্ধধর্মমতে, এই উৎসবে পূর্বপুরুষের আত্মারা তাঁদের পরিবারে ফিরে আসেন। এ দিনটিতে আত্মীয়স্বজনের উদ্যোগে মন্দিরে, বাড়ির পূজাবেদিতে এবং পারিবারিক সমাধিস্থলে প্রার্থনা ও ফুল প্রদান করা হয়।

**ওম মণি পদ্মে হুম** বৌদ্ধধর্মে, বিশেষ করে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মে প্রচলিত একটি মন্ত্র। 'মণি পদ্মে হুম' কথাটার আক্ষরিক অর্থ, মণি (অর্থাৎ বুদ্ধ) পদ্মে অবস্থিত। পদ্মকে আবাহন করে অবলোকিতেশ্বরের উদ্দেশে এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়। সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বতে এর প্রচলন হয়। যোগ-প্রক্রিয়ায় মন্ত্রটির প্রতিটি শব্দ এবং লিপির প্রতিটি অক্ষর ধ্যানের বিষয়। অবলোকিতেশ্বর থেকে উৎসারিত সব তত্ত্ব মণি, বৌদ্ধধর্মের সব আচার-পদ্ধতি পদ্ম এবং উভয়ের সমন্বয় হুম হিসেবে বিবেচিত হয়।

**ওমর (রা.), হজরত** ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। ফারুক তাঁর উপাধি। ৫৮৩ সালে তিনি মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব, মাতার নাম হানতাম। কুস্তিগির, যোদ্ধা, কবি ও সুবক্তা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মোহাম্মদ (সা.) মক্কায় ইসলাম প্রচার শুরু করলে ওমর (রা.) ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর ভগ্নি ও ভগ্নিপতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ওমর (রা.) তাঁদেরকে প্রহার করতে গিয়ে বোনের কণ্ঠে পবিত্র কোরআন পাঠ শুনে মুগ্ধ হন। এতে তাঁর ভাবান্তর ঘটে এবং তিনি রাসুল (সা.)-এর কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন। তাঁর এই

ইসলাম গ্রহণে মক্কায় মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। বদর থেকে শুরু করে সব কটি ধর্মযুদ্ধে তিনি অংশ নেন। খলিফা আবুবকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর তিনি মুসলিম জগতের দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন (৬৩৪-৬৪৪)। তাঁর শাসনামলে মুসলমান সাম্রাজ্যের সীমা আরব থেকে মিসর, সিরিয়া ও তুর্কিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। একজন ন্যায়পরায়ণ, প্রজাহিতৈষী, নির্ভীক, দূরদর্শী, লোকপ্রিয় শাসক হিসেবে উমরের খ্যাতি ছিল। মসজিদে ফজরের নামাজরত অবস্থায় ৬৪৪ সালে তিনি আবু লুলু নামক একজন অগ্নি-উপাসকের হাতে নিহত হন।

**ওয়াকফ** ওয়াকফ আরবি শব্দ, এর অর্থ ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে মুক্ত কোনো সম্পত্তির হেফাজত করা। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে 'ভারতের মুসলমান ওয়াকফ বৈধকরণ আইন'-এ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী ওয়াকফ অর্থ কোনো মুসলমান কর্তৃক তাঁর সম্পত্তির কোনো অংশ এমন কাজের জন্য স্থায়ীভাবে দান করা, যা মুসলিম আইনে 'ধর্মীয়, পবিত্র বা সেবামূলক' হিসেবে স্বীকৃত। ওয়াকফ-এর সঙ্গে রোমান আইনের 'সম্পত্তি অর্পণ' এবং হিন্দু আইনের 'দান'-এর তুলনা করা যায়। ধর্মীয়, শিক্ষাসংক্রান্ত বা অন্য কোনো জনহিতকর কাজের উদ্দেশ্যে কতিপয় শর্তসাপেক্ষ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ওয়াকফরূপে দান করা যায়। ওয়াকফের বৈশিষ্ট্য হলো: ১. এটি একটি স্থায়ী ব্যবস্থা, অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য করা যায় না; ২. এটি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়, এবং কোনো অবস্থায়ই এটিকে স্থগিত বা মুলতবি করা যায় না; ৩. এটি একটি অপ্রত্যাহারযোগ্য আইনি চুক্তি এবং ৪. ওয়াকফ সম্পত্তি কখনো বাজেয়াপ্ত করা যায় না।

ওয়াকফ তিন প্রকার: ওয়াকফ ফি লিল্লাহ, ওয়াকফ আলাল আওলাদ (অর্থাৎ ব্যক্তিগত ওয়াকফ) এবং মিশ্র ওয়াকফ। কেবল ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে সৃষ্ট ওয়াকফকে বলা হয় ওয়াকফ ফি লিল্লাহ। উৎসর্গকারীর নিজের কিংবা পরিবার বা বংশধরদের ভরণপোষণ বা উপকারার্থে ওয়াকফ করা হলে তাকে বলা হজ ওয়াকফ আলাল আওলাদ। আর মিশ্র ওয়াকফে ধর্মীয় ও দাতব্য প্রকৃতির সর্বজনীন উদ্দেশ্য এবং উৎসর্গকারীর পরিবার বা বংশধরদের উপকার দুটি বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ওয়াকফের আইনগত বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ওয়াকফকারীর পরিবারের এক সদস্য প্রিভি কাউন্সিলে মামলা করলে আদালত পরলোকগত দানকারীর পক্ষে রায় দেন।

পরিবার ও সন্তানসন্ততির কল্যাণার্থে ব্যক্তিগত ওয়াকফ-ব্যবস্থা ইসলামে গোড়া থেকেই স্বীকৃত ছিল। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে আবুল ফাতা মোহাম্মদ বনাম রসময় মামলার রায়ে প্রিভি কাউন্সিল ওয়াকফ-আলাল-আওলাদকে অবৈধ ঘোষণা করে। তখন এই রায়কে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের লঙ্ঘন বলে ভারত সরকারের কাছে অভিযোগ করা হয়। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমান ওয়াকফ বৈধকরণ আইন পাস হয়, যার ফলে প্রিভি কাউন্সিলের ওই রায়টি অকার্যকর গণ্য হয়। পরে বেঙ্গল ওয়াকফ অ্যাক্ট ১৯৩৪ দ্বারা ওয়াকফ ভূসম্পত্তির ব্যবস্থাপনা কাঠামোর ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়। ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান ওয়াকফ অধ্যাদেশের অধীনে ওয়াকফ সম্পত্তিগুলো পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত আইনের আরও কিছু সংশোধন করা হয়। ১৯৮৮ সালের ওয়াকফ অধ্যাদেশ ও ১৯৯৮ সালের ওয়াকফ অধ্যাদেশ দ্বারাও ওই আইনে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। বর্তমানে একটি ওয়াকফ ডাইরেক্টরেটের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে।

১৯১৩ সালের ওয়াকফ বৈধকরণ আইনের ২ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো মুসলমান যখন তার কোনো সম্পত্তি ধর্মীয় বা দাতব্য কাজ বলে মুসলমান আইনে স্বীকৃত কোনো উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করেন, তখন সেই উৎসর্গকে ওয়াকফ বলা হয়। ওয়াকফ অবশ্যই স্থায়ী হবে। ওয়াকফ আইন অনুসারে স্থাবর ও অবস্থাবর যেকোনো ধরনের সম্পত্তি ওয়াকফ করা যেতে পারে। যেকোনো সুস্থ মনের সাবালক মুসলমান ওয়াকফ করতে পারেন। ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপনাকে মুতওয়াল্লি বলা হয়। তিনি

আল্লাহর অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে ওয়াকফ সম্পত্তির দেখভাল করেন। তাঁকে মৌখিকভাবে কিংবা যে চুক্তি বা দলিল অনুযায়ী ওয়াকফ করা হয়েছে তার দ্বারা নিয়োগ দেওয়া হয়। ওয়াকিফ অর্থাৎ ওয়াকফকারী নিজেকেও মুতওয়াল্লি হিসেবে নিযুক্ত করতে পারেন। ওয়াকফ দলিলে তিনি মুতওয়াল্লি-পরম্পরার রীতি-নিয়মও করে যেতে পারেন। ওয়াকফের মাধ্যমে সম্পত্তি পুরোপুরি আল্লাহর মালিকানায় স্থানান্তরিত হওয়ায় মালিকানায় ওয়াকিফ কিংবা ট্রাস্ট সম্পত্তির ব্যবস্থাপক আর সম্পত্তির মালিকানা দাবি করতে পারেন না। ওয়াকফ দলিলে অনুরূপ বিধান থাকলে সে ক্ষেত্রে মুতয়াল্লি নিজেও উত্তরাধিকারী নিয়োগ করতে পারেন।

**ওয়ারিশ, উত্তরাধিকারী** কেউ যদি কোনো ইচ্ছাপত্র না রেখে মারা যান তবে প্রচলিত বিধান অনুযায়ী তাঁর স্ত্রী, সন্তানসন্ততি কিংবা নিকট-আত্মীয়ের মধ্যে যাঁরা তাঁর সম্পত্তির মালিক হন। সাধারণত ইচ্ছাপত্র রেখে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে ইচ্ছাপত্রের নির্দেশ অনুযায়ী যেকোনো ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মালিক হতে পারেন। যদিও মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ ধরনের ইচ্ছাপত্র খুব বেশি কার্যকর হয় না। কারণ, একজন মুসলমান তাঁর সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি ইচ্ছাপত্রমূলে কাউকে দিতে পারেন না এবং সেভাবে কাউকে সম্পত্তি দিলেও ইচ্ছাপত্রকারীর মৃত্যুর পর কোনো ওয়ারিশ তাতে আপত্তি করলে তা কার্যকর হয় না।

**ওয়াহাবি** মুসলমানদের একটি ধর্মীয় আন্দোলন। ওই আন্দোলন বা মতবাদের অনুসারী। মোহাম্মদ ইবনে আবদ আল-ওয়াহাব (১৭০৩-৮৭) এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইবনে তায়মিয়্যার চিন্তা ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ইসলামকে পুনরায় তার 'মূলে' ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। যেখানে স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বা আধ্যাত্মিকতাবাদ-উদ্ভূত বাড়তি কোনো কিছু থাকবে না। পীর-আউলিয়ার 'মধ্যস্থতাকারী' বা সুপারিশকারী ভূমিকায় বিশ্বাস, মাজার জিয়ারত, মোহাম্মদ (সা.)-কে অর্ধ-ঐশ্বরিক মর্যাদা প্রদান এসবের ওয়াহাবিরা বিরোধী। তাঁদের মতে, এগুলো বিদ'আত কাজ। ১ হাজার ৪০০ বছর ধরে ইসলামি ধর্মতত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক চিন্তার বিকাশ বা পরিবর্তন ঘটেছে, ওয়াহাবিরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। যেমন তারা সুফিবাদের ঘোর বিরোধী। ওয়াহাবিরা হাম্বলি আইনের অনুসারী। শিয়াদের তারা ইসলামের শত্রু গণ্য করেন। দারইয়া অঞ্চলে উপজাতীয় নেতা মোহাম্মদ ইবনে সাউদ ও তাঁর পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় উনবিংশ শতকে ওয়াহাবিদের প্রভাব বাড়ে। তাঁরা ওসমানি সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ান। উনবিংশ শতকের গোড়ায় ভারতবর্ষে বেরিলির সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে ওয়াহাবি মতবাদ প্রসার লাভ করে। পাটনায় কেন্দ্র স্থাপন করে তাঁরা সারা ভারতে তাঁদের আন্দোলন বা কর্মতৎপরতার বিস্তার ঘটান। পেশোয়ার সীমান্তে শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁরা জয় লাভ করেন। যদিও পরে শিখদের হাতে সৈয়দ আহমদ নিহত হন। বাংলায় উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি গড়ে ওঠা ফরায়েজি আন্দোলনের ওপরও ওয়াহাবি মতবাদের প্রভাব ছিল। ফরায়েজিদের মতে, দুনিয়ার সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক একমাত্র আল্লাহ। এই নীতি থেকে ও কৃষকদের ওপর জমিদারি অত্যাচার রুখতে তারা তীব্র জমিদারবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত অঞ্চলে তিতুমীর এবং বাংলাদেশের ফরিদপুরে হাজি শরীয়তুল্লাহ ও পরে তাঁর পুত্র দুদু মিয়া এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এই আন্দোলন অনেকটা শ্রেণীসংগ্রামের রূপ নেয়। তবে ফরায়েজিদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা এবং ভিন্নধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার অভাবের কারণে হিন্দু চাষিরা শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন সমর্থন করেনি। ব্রিটিশরা কঠোর দমননীতি চালিয়ে এই আন্দোলন দমন করে। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহেও ওয়াহাবিরা ব্যাপকভাবে অংশ নেয়। বর্তমানেও বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতে জামায়াতে ইসলামী, সমধর্মী সংগঠনগুলোসহ সারা পৃথিবীতে ইসলামি রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর ওয়াহাবি মতবাদের কমবেশি প্রভাব রয়েছে।

**ওয়াহাবি আন্দোলন** তরিকায়ে মোহাম্মদী দ্র.

**ওরাওঁ** দ্রাবিড়ভাষী আদিবাসী জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়ায় এরা বাস

করে। এদের ভাষার নাম কুরুখ। এদের সৃষ্টিকর্তার নাম ধরমেশ, তিনি সর্বশক্তিমান এবং সূর্যে অবস্থান করেন। ওরাওঁদের বেশির ভাগ ধর্মীয় অনুষ্ঠান তাই সূর্যকে ঘিরে অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া তারা অরণ্য, কৃষি ও মহামারির দেবতা এবং গ্রামের অবস্থানভেদে আরও নানা দেব-দেবীর পূজা করে। তাদের ব্রতপূজার মধ্যে রয়েছে বৈশাখ মাসে বসুন্ধরা ব্রত, ভাদ্রে ভাদু বা ভাদরি, অঘ্রাণে সেঁজুতি, ফাল্গুনে ইতি এবং চৈত্রে সরহুল বা বসন্ত উৎসব। তাদের সামাজিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ধুমকুরিয়া যেখানে যুবক-যুবতীরা পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার ও জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার সুযোগ পায়। ওরাওঁদের বিয়েতে পাত্রপাত্রীর মতামত প্রাধান্য পায়। ওরাওঁ-সমাজ অপ্রাপ্তবয়স্ক বিয়ে সমর্থন করে না। বিধবাবিবাহ, পুনর্বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ তাদের সমাজে স্বীকৃত। কোনো পুরুষ সেখানে একাধিক স্ত্রী রাখতে পারে না।

**ওলাদেবী** ওলাউঠা, বিসূচিকা বা কলেরা রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি ওলাইচণ্ডী, ওলাবিবি, বিবিমা ইত্যাদি নামেও পরিচিত। একসময় ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে এঁর পূজা করা হতো। যদিও সম্প্রদায়ভেদে দেবীর মূর্তি ও পূজাপদ্ধতিতে কিছুটা পার্থক্য ছিল। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে এঁর আকৃতি হতো লক্ষ্মী-সরস্বতীর মতো, গায়ের রং গাঢ় হলুদ, হাত দুটি প্রসারিত, কখনো দণ্ডায়মানা, কখনো বা শিশুসন্তান ক্রোড়ে আসনে উপবিষ্টা, পরনে সাধারণত নীল শাড়ি এবং সর্বাঙ্গে নানা প্রকার অলংকার। অন্যদিকে মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে ওলাদেবীর মূর্তি অভিজাত ঘরের কোনো কিশোরীর মতো, পরনে পিরান, পায়জামা, টুপি ও ওড়না এবং গায়ে নানা প্রকার অলংকার। এ ছাড়া পায়ে নাগরা জুতা এবং কখনো মোজাও। এঁর এক হাতে থাকে আসাদণ্ড, যা দিয়ে দেবী ভক্তের মুশকিল আসান করেন। ওলাদেবীর পূজা এককভাবে বা ঝোলাবিবি, আজগৈবিবি, চাঁদবিবি, আসানবিবি প্রভৃতির সঙ্গে একত্রেও হয়। প্রাচীন মহেঞ্জোদারো নগরের খননকার্য থেকে পাওয়া একটি মৃৎফলকে সাতটি নারীমূর্তি পাশাপাশি দণ্ডায়মান দেখা যায়। সাত বিবির মধ্যে ওলাদেবীর স্থান পঞ্চম। ভক্তরা তাঁর উদ্দেশেই পূজা দেয়, তবে অন্য ছয় দেবীও সে পূজার ভাগ পায়। ওলাদেবীর পূজা হয় বৃক্ষতলে, পর্ণকুটিরে। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে শনি কিংবা মঙ্গলবারে এই পূজা হয়। পূজায় নিরামিষ ভোগ দেওয়া হয়। যেকোনো বর্ণ বা সম্প্রদায়ের লোকের, এমনকি নারীরও এই পূজায় পৌরোহিত্যের অধিকার আছে। হাড়ি বা ডোম-প্রধান অঞ্চলে তারাই পূজায় পৌরোহিত্য করে। ওলাদেবীর পূজা তিন রকম। শনি ও মঙ্গলবার যে অনাড়ম্বর পূজার আয়োজন হয় তা বারের পূজা নামে পরিচিত। কোথাও মহামারি আকারে কলেরা দেখা দিলে সেখানকার লোকজন গ্রামপ্রধানের নেতৃত্বে সমষ্টিগতভাবে ওলাদেবীর পূজা দেয়।

ওলাদেবীর পূজায় কোনো সম্প্রদায়ভেদ নেই। হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে একই পুরোহিতের হাতে পূজার নৈবেদ্য ও হাজত প্রদান করে। ওলাদেবীর নৈবেদ্যও অতি সাধারণ—সন্দেশ, বাতাসা ও পান-সুপারি। কোথাও কোথাও আতপ চাল ও পাটালিও দেওয়া হয়। এ পূজার বিশেষ কোনো মন্ত্র নেই; তবে কোনো কোনো হিন্দু পুরোহিত পূজার সময় 'এসো মা ওলাদেবী, বেহুল রাঢ়ির ঝি' এরূপ আবেদন করে থাকেন। মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে ওলাবিবি বা বিবিমা নামে হাজত দেওয়া হয়। সমাজে শিক্ষা ও সচেতনতার বিস্তার, কুসংস্কারের মাত্রা হ্রাস প্রভৃতির ফলে এ ধরনের পূজা-আচারগুলো উঠে যাচ্ছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এমনকি গ্রামাঞ্চলেও আগের মতো মহামারি আকারে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না।

**ওস্যানাস** সমুদ্রের দেবতা। অন্যতম টাইটান। সবচেয়ে প্রাচীন গ্রিক দেবতা তেরার পুত্র। জলদেবী টেথিসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় আর এই বিবাহের ফলে সব জলদেবতা ও জলপরির জন্ম হয়। হোমার তাঁর ইলিয়ড মহাকাব্যে ওস্যানাসকে সব দেবতার পিতা বলে উল্লেখ করেছেন।

**ওহোদের যুদ্ধ** তৃতীয় হিজরিতে সংঘটিত ইসলামের প্রাথমিক যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। মদিনার তিন মাইল উত্তর-পূর্বে ওহোদ নামক একটি পাহাড়ের কাছে কঙ্করময় প্রান্তরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতিপূর্বে সংঘটিত বদরের যুদ্ধে

মুসলমান বাহিনীর কাছে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে এবং সর্বোপরি ইসলামকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে মক্কা থেকে তিন হাজার যোদ্ধা মদিনায় অভিযান চালায়। যুদ্ধে প্রথমাবস্থায় মুসলিম বাহিনীর বিজয় লাভের সম্ভাবনা দেখা গেলেও সামান্য ভুলের জন্য শেষ পর্যন্ত তাদের বিপর্যয় ঘটে। রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ ভুলে গিয়ে মুসলমান তিরন্দাজরা নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করায় শত্রুবাহিনী পেছন দিক থেকে তাদের আক্রমণের সুযোগ পায়। ফলে মুসলিম বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে হজরত হামজা (রা.)-সহ প্রায় ৭০ জন মুসলমান বীর শহীদ হন। খোদ হজরত মোহাম্মদ (সা.) আহত হন, তাঁর একটি দাঁত ভেঙে যায়। হজরত আবুবকর ও হজরত ওমর (রা.)-এর আহত হন। মুসলমান বাহিনী বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে কোনোরকমে আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়। তবে জয়ী না হলেও তারা শত্রুপক্ষকে মক্কায় ফিরে যেতে বাধ্য করে।

## ক

**কঠিন চীবর দান** 'চীবর' শব্দের অর্থ ভিক্ষুদের পরিধেয় বস্ত্র। এই বস্ত্র ছয় প্রকারের হয়ে থাকে। গাছের শেকড়, গুঁড়ি, ছাল, শুকনো পাতা, ফুল ও ফলের রং অনুসারে এগুলোর রং নির্দিষ্ট হয়। ভিক্ষু সংঘ সাধারণত লাল ফুলের রঙের বস্ত্র ব্যবহার করে, সাধারণ গৃহীদের পরিধেয় বস্ত্র থেকে যা আলাদা ও দেখতেও বৈচিত্র্যহীন। বৌদ্ধমতে, সমস্ত দানের মধ্যে চীবর দানই শ্রেষ্ঠ। আগে ভিক্ষুরা পাংসুকুলিক চীবর অর্থাৎ শ্মশানে বা অন্য কোথাও পড়ে থাকা ময়লা ছিন্নবস্ত্র পরিধান করতেন। এতে ভিক্ষুদের রোগাক্রান্ত হওয়া এবং স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকত। এই ঝুঁকির কথা চিন্তা করেই রাজগৃহে বর্ষাবাসকালে গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষুদের চীবর অর্থাৎ পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করার অনুমতি দেন। গৃহীরা তাঁদের এ বস্ত্র দান করে। অবশ্য ভিক্ষুমাত্রই চীবর পরিধান করতে পারেন না। যাঁরা ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস সমাপ্ত করেছেন, কেবল তাঁরাই চীবর ব্যবহার করার অধিকারী। প্রবারণা পূর্ণিমার পরদিন থেকে কার্তিকী পূর্ণিমার আগের দিন পর্যন্ত মাসব্যাপী চীবর দান অনুষ্ঠান পালিত হয়। বৌদ্ধ বিশ্বাসমতে, শতবর্ষের কিংবা পৃথিবীর সব ধরনের দান একত্র করলে তার যে ফল তা একখানি চীবর দানের ফলের এক-আনি অর্থাৎ ষোলো ভাগের এক ভাগও নয়। সেদিক থেকে এ দানের গুরুত্ব অপরিসীম। মনে করা হয়, এ দান জন্মজন্মান্তরে সুফলপ্রদায়ী। প্রতিটি বৌদ্ধবিহারে বছরে মাত্র একবার চীবর দান অনুষ্ঠান হয়। ভিক্ষু সংঘ তাঁদের বিনয়-বিধানের সব নিয়ম অক্ষুণ্ন রেখে পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে এই চীবর গ্রহণ ও ব্যবহার করেন। কঠিন চীবর দানের এই মহাফলের কথা স্মরণে রেখে প্রত্যেক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জীবনে অন্তত একবার চীবর দান করার সুযোগ নিতে চায়।

'চীবর দান' কথাটির সঙ্গে 'কঠিন' শব্দটি যুক্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে *মহাবংশ* গ্রন্থে বলা হয়েছে: যেদিন চীবর দান করা হবে সেদিনের সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সুতাকাটা, কাপড় বোনা, কাপড় কাটা, সেলাই ও রং করা, ধোয়া ও শুকানো সব কাজ সম্পন্ন করে ওই সময়ের মধ্যেই এই চীবর ভিক্ষু সংঘকে দান করতে হয়। এ ছাড়া আর যেসব নিয়মকানুন আছে, তা দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের জন্যই পালন করা বেশ কঠিন। ১৯২১ সালে সংঘরাজ অভয়তিষ্য মহাস্থবিরের সভাপতিত্বে সাতবাড়িয়া শান্তিবিহারে প্রথম কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হয়।

**কঠোপনিষদ** উপনিষদবিশেষ। ঈশ্বর সম্বন্ধে তর্কবিতর্কপূর্ণ এই উপনিষদ দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে নচিকেতা ও তাঁর পিতা বিশ্বজিৎ-সংবাদ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে যম ও নচিকেতা-সংবাদ। এই উপনিষদে পিতৃসত্য রক্ষার জন্য নচিকেতার যমালয়ে গমন, যমের কাছে আত্মজ্ঞান শ্রবণ প্রার্থনা, যমের আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা, চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, আত্মার একত্ব, পরমাত্মার সর্বব্যাপকতা, যোগবিধি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

**কণাদ** প্রাচীন মুনি, বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা। তণ্ডুলকণা খেয়ে জীবন ধারণ করতেন বলে তাঁর নাম কণাদ। তিনি 'বিশেষ' নামে এক অতিরিক্ত

কদম রাসুল রয়েছে। বাংলাদেশে কদম রসুল রয়েছে নবীগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ জেলা) ও চট্টগ্রামে। বাংলার প্রাচীনতম বিখ্যাত কদম রসুল সৌধটি গৌড়ে অবস্থিত। সুলতান নুসরত শাহ ১৫৩০-৩১ খ্রিষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। জনশ্রুতিমতে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সাধক জালালউদ্দীন তাবরিজির পাণ্ডুয়ার ইবাদতখানায় রাসুল (সা.)-এর পদচিহ্ন-সংবলিত একটি প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়। নুসরাত শাহের পিতা সুলতান হোসেন শাহ (১৪৯৪-১৫৯১) পাথরটি গৌড়ে নিয়ে এসেছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় (১৭৫৬-৫৭) গৌড় থেকে পাথরটি রাজধানী মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়। গৌড়ের কদম রসুল সৌধটি বাংলার আঞ্চলিক স্থাপত্যরীতির বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়। কুঁড়েঘর আকৃতির এ সৌধের মাঝে রয়েছে বর্গাকৃতির একটি কক্ষ, যার তিন দিকে বারান্দা। কেন্দ্রীয় গম্বুজ-কক্ষটিতে খোদাই করা বেদির ওপর কালো পাথরটি রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশে সুপরিচিত কদম রসুলটি নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব পাড়ে নবীগঞ্জে অবস্থিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মির্জা নাথান প্রণীত *বাহারিস্তান-ই-গায়েবি* বর্ণনা থেকে জানা যায়, সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী আফগান নেতা মাসুম খান কাবুলি পদচিহ্ন-সংবলিত এ পাথর একজন আরব বণিকের কাছ থেকে ক্রয় করেছিলেন। এ সময় এখানে ছিল একটি দুর্গ। ঢাকার জমিদার গোলাম নবী ১১৯১ হিজরিতে (১৭৭৭-৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) এখানকার পবিত্র সৌধটি নির্মাণ করেন। এক গম্বুজবিশিষ্ট সৌধটির সামনে রয়েছে বারান্দা, মধ্যের প্রকোষ্ঠে রয়েছে পবিত্র পাথরটি। সাধারণত এটি একটি ধাতব পাত্রে গোলাপজলের মধ্যে ডোবানো থাকে। পাথরের গায়ে ২৪×১০ সেন্টিমিটার জায়গাজুড়ে অগভীর পায়ের ছাপ লক্ষ করা যায়। ওপরের দিকের ছাপগুলো স্পষ্ট। দর্শনার্থীরা এই সৌধ পরিদর্শনে এসে এখানে আগরবাতি, ফুল, টাকা ইত্যাদি উৎসর্গ করে। সৌধের প্রধান ফটকটি ১২২০ হিজরিতে (১৮০৫-০৬ খ্রি.) গোলাম নবীর পুত্র গোলাম মুহম্মদের উদ্যোগে নির্মিত হয়। ১৭১৯ সালে মোগল প্রশাসক ইয়াসিন খান চট্টগ্রামে আরেকটি কদম রসুল নির্মাণ করেন। এর কেন্দ্রে একটি মসজিদ এবং দুদিকে দুটি কক্ষ রয়েছে। কক্ষ দুটির একটিতে হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর এবং অন্যটিতে সাধক আবদুল কাদের জিলানির পদচিহ্ন রয়েছে। চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থানার বাগিচাহাটেও আরেকটি কদম রসুল রয়েছে।

**কদম শরিফ** মুর্শিদাবাদ রেলস্টেশনের প্রায় অর্ধকিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত একটি কদম রসুল সৌধ। এ কমপ্লেক্সের সর্বপ্রাচীন নিদর্শনটি হলো ১৭৮০-৮১ সালে বসন্ত আলী খান কর্তৃক নির্মিত একটি মসজিদ। বসন্ত আলী প্রথমে মীরজাফর এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর স্ত্রী মুন্নি বেগমের প্রধান খোজা ছিলেন। এ কমপ্লেক্সের অন্য গুরুত্বপূর্ণ ভবনটি হলো একটি কক্ষ, যেটি মসজিদ নির্মাণের আট বছর পর ১৭৮৮ সালে নির্মিত হয়। এখানে মহানবী (সা.)-এর পদচিহ্ন যুক্ত একটি পাথর রাখা আছে। পাথরটি নবাব সিরাজউদ্দৌলা গৌড়ের কদম রসুল থেকে এখানে নিয়ে আসেন। পরে মীরজাফর এটিকে আগের স্থানে ফিরিয়ে দেন। দেয়ালঘেরা এ কমপ্লেক্স এলাকায় নবাবদের কিছুসংখ্যক পারিবারিক কবর, একটি অতিথিশালা ও অন্য কিছু স্থাপত্য নিদর্শন রয়েছে। মুর্শিদাবাদের অন্যান্য মসজিদের মতো কদম শরিফ মসজিদটিরও তিনটি গম্বুজ, যেগুলো দেখতে শিরালো এবং বাল্ব-আকৃতির। গম্বুজগুলোর নিম্নাংশ পদ্মপাপড়ির নকশা দ্বারা অলংকৃত। ১৭৪৯-৫০ সালে নির্মিত মুর্শিদাবাদের 'মতিঝিল মসজিদ'-এর সঙ্গে এই কদম শরিফের সম্মুখভাগের সাদৃশ্য রয়েছে। এর তোরণদ্বারে স্থাপিত শিলালিপি অনুযায়ী মসজিদটির নির্মাণকাল ১১৯৪ হি./১৮৮০-৮১ খ্রি.।

**কদল খান গাজি** সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের (১৩৩৬-৫২) সেনাপতি বলে কথিত। চট্টগ্রাম বিজয়কালে হাজি খলিল ও বদর আলম তাঁর সঙ্গী ছিলেন। তাঁরা চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। চট্টগ্রাম শহরের উত্তর দিকে কদল খান গাজির মাজার আছে। স্থানীয় জনগণের কাছে তিনি 'কাত্তাল' বা 'কাত্তাল পীর' নামেও

পরিচিত। এ থেকে স্থানটির নাম হয়েছে কাতালগঞ্জ। সম্ভবত মগদের সঙ্গে যুদ্ধে বহু শত্রুর শিরশ্ছেদ করে কদল খান 'কতল' (অর্থাৎ শিরশ্ছেদ) উপাধি পান। 'কতল' শব্দটিই আঞ্চলিক উচ্চারণে হয়েছে 'কাতাল'।

**কনফুসিয়াস** চীনা ধর্মগুরু ও দার্শনিক। জন্ম খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫১ সালে, বর্তমান চীনের অন্তর্গত তৎকালীন লু রাজ্যে। তাঁর জীবন কেটেছে কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে। তরুণ বয়সেই পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। একসময় লু রাজ্যের রাজার উপদেষ্টাও নিযুক্ত হন। কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ততটা নয়, যতটা তিনি পরিচিতি লাভ করেন চীনা সমাজের সংরক্ষণকারী দার্শনিক হিসেবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার সময়ে তিনি সমন্বয় ও শৃঙ্খলার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মানুষ তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সংস্থায় এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিরূপ জীবনযাপন বা আচরণ করবে সে বিষয়ে কনফুসিয়াস তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, ঈশ্বর যাকে যে অবস্থানে রেখেছেন সেখানে থেকেই আপন কর্তব্য পালন করে যাওয়া উচিত। প্রজার কর্তব্য রাজাকে, গরিবের কর্তব্য ধনীকে, বয়ঃকনিষ্ঠের কর্তব্য জ্যেষ্ঠকে মেনে চলা। কনফুসিয়াসের মতে, শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো নীতিজ্ঞান। অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত চীনে কনফুসিয়াসের মতবাদকে রাজধর্ম হিসেবে গণ্য করা হতো। একপর্যায়ে চীনে এই মতবাদকে রাষ্ট্রীয় গোঁড়ামির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়, প্রায় ১৯১১ সাল পর্যন্ত যা অপরিবর্তিত ছিল। শুধু চীনে নয়; কোরিয়া, জাপান, ভিয়েতনাম, হংকং, সিঙ্গাপুর এবং বর্তমান তাইওয়ানেও কনফুসীয় মতবাদের প্রভাব এখনো কমবেশি অনুভূত হয়।

**কনস্ট্যানস পরিষদ** (১৪১৪-১৮) রোমান ক্যাথলিক চার্চের পরিষদ। দ্বাদশ গ্রেগরি, ত্রয়োবিংশ জন এবং ত্রয়োদশ বেনেডিক্ট—এই তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বী পোপের সৃষ্ট 'মহাবিচ্ছেদ' (Great Schism) দূর করার জন্য এই পরিষদ আহূত হয়। প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতার অবসান ঘটানো এবং গির্জার সংস্কারও এই পরিষদের লক্ষ্য ছিল। পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রেগরি পদত্যাগ করেন, জন ও বেনেডিক্ট ক্ষমতাচ্যুত হন এবং পঞ্চম মারটিনকে পোপ বলে ঘোষণা করা হয়। সম্রাট সিগিসমানডের লিখিত অভয়পত্র নিয়ে জন হাস পরিষদের সামনে হাজির হলেও তাঁকে (১৪১৫) এবং প্রাগের জেরোমকে (১৪১৬) প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী সাব্যস্ত করে খুঁটিতে বেঁধে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা হয়।

**কন্দর্প** হিন্দু পুরাণানুযায়ী কামদেবতা। নর-নারীর হৃদয়ে পুষ্পশর নিক্ষেপ করে কাম বা প্রেমভাব উদ্রেক করাই তাঁর কাজ। তাঁর জন্ম সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। এক মতে, তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং জল থেকে তাঁর উদ্ভব। রতি তাঁর স্ত্রী। একবার দেবতাদের অনুরোধে কঠোর তপস্যারত মহাদেবের গায়ে পুষ্পশর নিক্ষেপ করতে গেলে ক্রুদ্ধ মহাদেব তাঁর তৃতীয় নয়নের অগ্নিবর্ষণ করে কন্দর্পকে ভস্মীভূত করেন। পরে রতির বিলাপক্রমে দেবতাদের অনুরোধে মহাদেব বর দেন, কন্দর্প অদৃশ্য থেকেও মানবমনে শর নিক্ষেপ করতে পারবেন। অন্য মতানুযায়ী, স্বামীর মৃত্যুর পর শোকাতুরা রতি মহাদেবের শরণাপন্ন হলে মহাদেব বর দেন, বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করলে তাঁর ঔরসে কন্দর্পের পুনর্জন্ম হবে। সে অনুযায়ী কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে কন্দর্প পুনর্জন্ম লাভ করেন ও তাঁর নাম হয় প্রদ্যুম্ন। তিনি স্বর্গের অপ্সরাদের অধিপতি এবং তাঁর হাতে পুষ্পের তির-ধনুক থাকে। পুষ্পরচিত পঞ্চশর হাতে কন্দর্পের চিত্র সুপরিচিত। কন্দর্পের অন্য নাম মদন।

**কপিল** হিন্দু পুরাণোক্ত ঋষি। সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা। দেবহুতির গর্ভে, কর্দমের ঔরসে জন্ম। তিনি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাত্মক সাংখ্যশাস্ত্র প্রণয়ন এবং নিরীশ্বরবাদ প্রচার করেন। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাবের কথা স্পষ্টভাবে লেখা আছে। কপিলের মতে, জগৎ জড়-প্রকৃতি হতে উদ্ভূত। সাংখ্যমতে, প্রকৃতি অনাদি আর প্রকৃতির মতো পুরুষও অনাদি। আত্মা সৃষ্টি করে না, সে দ্রষ্টা মাত্র। মানুষের কর্ম অনুসারে আত্মা দেহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। যখন কর্মক্ষয় হয়, তখন আত্মা আর দেহান্তরে প্রবেশ করে না। এই দর্শনমতে,

বস্তু মাত্রই সৎ। পুরাণমতে, কপিল একাগ্রচিত্তে তপস্যার জন্য পাতালে আশ্রম স্থাপন করেন। একবার সগর-রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে ইন্দ্র রাক্ষসের বেশে যজ্ঞাশ্ব হরণ করে তা পাতালে কপিলের আশ্রমে রেখে যান। তখন সগরের ৬০ হাজার সন্তান পাতালে এসে কপিল মুনির কাছে অশ্ব দেখে তাঁকেই অপহরণকারী সন্দেহ করে আক্রমণ করে বসে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে কপিল মুনি সগরের ৬০ হাজার সন্তানকে ভস্মীভূত করেন। পরবর্তী কালে সগর-রাজার পৌত্র অংশুমান পাতালে গিয়ে মুনিকে সন্তুষ্ট করে অশ্ব উদ্ধার করেন। কপিল এ সময় অংশুমানকে বলেন যে জাহ্নবীর জলস্পর্শে সগর-সন্তানেরা উদ্ধার পাবে। পরে সগরবংশের ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে এনে পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করেন।

**কপ্ট** মিসরের স্থানীয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করেও এরা বহু শতাব্দী ধরে টিকে রয়েছে। প্রথম খ্রিষ্টীয় যুগে মিসরীয়রা যে ভাষায় কথা বলত তাকে কপ্ট বলে। কপ্ট বর্তমানে একটি অপ্রচলিত ভাষা। রোমান ক্যাথলিক ও অন্য খ্রিষ্টানরা কপ্ট মতবাদকে খ্রিষ্টধর্মবিরোধী বলে মনে করে। ইথিওপীয় চার্চের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। এই সম্প্রদায়ের প্রধান আলেকজান্দ্রিয়ার পেট্রিয়ার্ক ইথিওপীয় চার্চের প্রধানকে নিয়োগ দেন। কিছু কিছু ক্যাথলিক খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী অবশ্য কপ্ট পোপের প্রাধান্য স্বীকার করে।

**কবন্ধ** হিন্দু পুরাণোক্ত রাক্ষস। শ্রী নামক দানবের পুত্র। বর্ণনামতে, সে মুণ্ডগ্রীবাহীন কবন্ধ, তার উদরে মুখ ও তাতে অগ্নিশিখার মতো একটি চক্ষু আছে। তার হাত যোজন পরিমাণ দীর্ঘ। ঋষি স্থূলশিরার সংগৃহীত ফলমূল চুরি করে খাওয়ায় ঋষির অভিশাপে তাঁর এই অবস্থা হয়। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে তার দুই উরু ও মস্তক দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। রাম-লক্ষ্মণের খড়্গাঘাতে কবন্ধের দুই বাহু ছিন্ন হয় এবং তার দেহ অগ্নিসৎকার করা হলে কবন্ধ তার পূর্বরূপ ফিরে পায় ও পুণ্যলোকে প্রস্থান করে।

**কবর** মুসলমানের মরদেহ যেখানে দাফন করা হয়। কবর গহ্বরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মৃতের দৈহিক পরিমাপ অনুসারে রাখা হয়। কবর খননের পর মৃত ব্যক্তিকে উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শোয়ানো হয়। তারপর বাঁশ, চাটাই বা তক্তা দিয়ে গহ্বরটি ঢেকে মাটি বা পাথর দিয়ে কবর বন্ধ করা হয়। এরপর মৃত ব্যক্তির মুক্তির জন্য দোয়া করা হয়। মহানবী (সা.)-এর হাদিস অনুসারে, মুনকার ও নকির নামক ফেরেশতাদ্বয় মৃত ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত তিনটি প্রশ্ন করেন : (১) 'তোমার প্রভু কে?' (২) 'তোমার ধর্ম কী?' এবং (৩) মহানবী (সা.)-এর দিকে ইঙ্গিত করে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয়। আল্লাহ ও রাসুলে বিশ্বাসী সৎলোক যাঁরা তাঁরা সহজেই প্রশ্নের জবাব দান করেন এবং জান্নাতের সুগন্ধ লাভ করেন। কবরে তাঁদের কোনো কষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী ও পাপী লোকেরা ওই প্রশ্ন তিনটির জবাব দিতে ব্যর্থ হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের শাস্তি বা আজাব শুরু হয়। কবরে মৃত ব্যক্তির এরূপ অবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। মুসলমানরা যে স্থানকে কবরের জন্য নির্দিষ্ট করে, তাকে কবরস্থান বা গোরস্থান বলা হয়। সাধারণত এ স্থানটি ওয়াকফ করতে হয়। ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী কবরের ওপর স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ অনুচিত। কবরস্থানকে সর্বদা পরিষ্কার এবং পবিত্র রাখতে হয়। কবরের ওপর দিয়ে চলাচল কিংবা অন্য কোনো উপায়ে কবরের অবমাননা করা নিষিদ্ধ। কবরস্থানে প্রবেশ করে প্রথম 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর' বলতে হয়। দরুদ শরিফ, সুরা ফাতিহা ও পবিত্র কোরআনের যেকোনো আয়াত তেলাওয়াত করে মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করতে হয়। দোয়া শুধু একজনের জন্য নয়, সকল মুর্দার জন্য করারই নিয়ম। শবে বরাত ও দুই ঈদের দিনে দলবদ্ধভাবে কবর জিয়ারত করার প্রথা প্রচলিত আছে।

**কবির** (আনু. ১৪৪০-১৫১৮) মধ্যযুগের সাধক। জন্মস্থান কাশী। কথিত আছে যে, বিধবা ব্রাহ্মণ মাতার পরিত্যক্ত শিশু হিসেবে তিনি নিরু নামক এক মুসলমান জোলার ঘরে প্রতিপালিত হন। বস্ত্রবয়নই ছিল তাঁর পেশা। বাল্যকাল থেকেই তিনি ঈশ্বরচিন্তা ও ভজনে মগ্ন থাকতেন। তিনি সাধক রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সৎসঙ্গ লাভের

উদ্দেশ্যে ভারতের বহু স্থান ভ্রমণ করেন। সুফি, যোগী, বৈদান্তিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকের সাহচর্যে কবিরের জ্ঞানভান্ডার পূর্ণ হয়। তাঁর জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্ঠা, সদাচার ও রামনাম কীর্তনের কথা প্রচারিত হলে সমাজের নিম্নস্তরের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর শিষ্যসংখ্যা বাড়তে থাকে। হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মচিন্তা ও সাধনার মধ্যে তিনি সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কারের বিরোধিতা করে তিনি গোঁড়া ব্যক্তিদের অপ্রীতিভাজন হন। কবির অনেক দোঁহা রচনা করেন। যাতে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদহীন এক সহজ সাধনার কথা বলা হয়েছে। কবিরের মতে, 'হিন্দু ও তুর্ক (অর্থাৎ মুসলিম) একই কাদা দিয়ে তৈরি পাত্র : আল্লাহ ও রাম শুধু নামের পার্থক্য।' কবির আরও বলেছেন, 'উপবাস ও ঘনঘন প্রার্থনা দ্বারা কিংবা বিশ্বাসের বুলি আওড়িয়ে কেউ স্বর্গে যাবে না; সত্য জানলে মক্কার পবিত্র গৃহের পর্দাটা মানুষের অন্তরের মধ্যেই থাকে। তোমার মনকে তোমার কাবারূপে গঠন করো, তোমার দেহকে তার আবরণকারী মন্দির করো, বিবেককে প্রধান শিক্ষক করো, দ্বেষ, সংশয় ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করো। ধৈর্যকে তোমার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মতো মনে করো। হিন্দু ও মুসলমানের একই পরম প্রভু।' কবিরের অনুসারীরা 'কবিরপন্থী'রূপে পরিচিত। কালক্রমে কবিরপন্থীদের মধ্যে নানা দলের উদ্ভব হয়।

**কবিরা গুনাহ** মহাপাপ। যেসব কাজকে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে গুরুতর অপরাধ বা পাপকর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন : 'যদি তোমরা কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকো, তবে আমি তোমাদের ছোট পাপগুলো দূরীভূত করব।' কবিরা গুনাহর মধ্যে পড়ে আল্লাহর সঙ্গে অংশী স্থাপন, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, নিকট-আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, জুয়া, সুরাপান, সুদ, ঘুষ, অস্বাভাবিক যৌনসম্ভোগ, মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, অপবাদ দেওয়া, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আমানতের খেয়ানত, পরের কুৎসা রটনা, জোরজুলুম দ্বারা কারও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল করা, এতিমের ধনসম্পদ হরণ করা প্রভৃতি। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে এরকম শতাধিক অপকর্মকে কবিরা গুনাহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও কবিরা গুনাহর রকমফের নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

**কবীন্দ্র পরমেশ্বর** মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদক। গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহর অন্যতম সেনাপতি ও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁ এবং তাঁর পুত্র ছুটি খাঁর নির্দেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ পরাগলী মহাভারত নামে পরিচিতি লাভ করে। সুলতান হোসেন শাহর রাজত্বের (১৪৯৩-১৫১৯) শেষ দিকে এই অনুবাদের কাজ শুরু হয়। এটি মহাভারতের হুবহু অনুবাদ নয়। তার কাহিনি অনুসরণ করে লেখা। কবির পরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। ধারণা করা হয়, তাঁর নাম ছিল পরমেশ্বর এবং উপাধি কবীন্দ্র।

**কমলা** দেবীবিশেষ। সমুদ্র মন্থনকালে অপ্সরাদের উদ্ভবের পরে দেবী কমলা চতুর্দিক আলোকিত করে সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত হন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। পৃথিবী-প্রদত্ত ঔষধি দ্বারা ঋষিরা তাকে দেবীরূপে অভিষেক করেন। দেবী কমলা আর কাউকে না পেয়ে দেবশ্রেষ্ঠ মুকুন্দকে পতিরূপে বরণ করেন।

**কমলাপুর ধর্মরাজিক বৌদ্ধবিহার** ঢাকার প্রথম বৌদ্ধবিহার। বাংলাদেশের বৌদ্ধদের ধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চার প্রধান কেন্দ্র। ১৯৬০ সালে বৌদ্ধ ধর্মগুরু বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালে থাইল্যান্ডের রাজা ভূমিবল সস্ত্রীক বিহারটি পরিদর্শন করেন। তাঁদের সম্মানে বিহারে 'অতীশ দীপংকর প্রার্থনা হল' নামে একটি আন্তর্জাতিক মানের মিলনায়তন নির্মাণ করা হয়। এই বিহারে অনেকগুলো প্রাচীন ও মূল্যবান বুদ্ধমূর্তি আছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৮৪ সালে থাইল্যান্ডের ফরা ধর্মাধিরাজ মহামুনি কর্তৃক উপহৃত ১০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট কালো রঙের বিশাল ব্রোঞ্জমূর্তি এবং জাপানের ধর্মগুরু ন্যাকায়সা কর্তৃক উপহৃত

২ ফুট/৮ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট সোনালি রঙের বুদ্ধমূর্তি। বিহারে একটি পালি কলেজ ছাড়াও আছে বিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চিকিৎসালয় প্রভৃতি। ১৯৯৬ সালে এখানে 'ধর্মরাজিক আন্তর্জাতিক উপাসনা হল' নামে একটি আন্তর্জাতিক মানের উপাসনাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

**করপাস ক্রিসটি** রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মোৎসব। ট্রিনিটি সানডের পরবর্তী বৃহস্পতিবার কিংবা রোববারে এই উৎসব পালিত হয়। বহু দেশে এ দিবসে শোভাযাত্রা ও পুষ্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

**কর্ণ** মহাভারতের চরিত্র, সূর্য দেবতার পুত্র। পাণ্ডব-জননী কুন্তির কুমারী অবস্থায় তাঁর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়। কৌরবদের প্রতি সমর্থনের বিনিময়ে তিনি দুর্যোধনের কাছ থেকে অঙ্গ নামক রাজ্য লাভ করেন এবং মগধের সম্রাট জরাসন্ধের মৃত্যুর পর কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, ও বঙ্গদেশকেও তাঁর শাসনাধীনে আনেন। ফলে আর্যাবর্তে অঙ্গ-বঙ্গ-মগধের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অভিমন্যু ও ঘটোৎকচকে হত্যা করেন। পরে নিজেই অর্জুনের হাতে নিহত হন। কর্ণের পরিচিতি ছিল দাতা-কর্ণ হিসেবে। তাঁর দানশীলতা পরীক্ষা করার জন্য কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কর্ণের পুত্র বৃষকেতুর মাংস ভক্ষণ করতে চান। কর্ণ কৃষ্ণের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করলে কৃষ্ণ পুনরায় ওই পুত্রের জীবন দান করেন।

**কর্জে হাসানা** কথাটার অর্থ হলো 'উত্তম ঋণ'। পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে এই কর্জে হাসানার উল্লেখ আছে। যেমন সুরা বাকারা-র ২৪৫ আয়াতে বলা হয়েছে, 'কে সে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? আল্লাহ তার জন্য একে বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন। আর আল্লাহই (জীবিকা) কমান বা বাড়ান। আর তোমাদের তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।' সুরা মুজ্জাম্মিল-এর ২০ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও আর আল্লাহকে দাও কর্জে হাসানা। তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য তোমরা যা কিছু ভালো আগে পাঠাবে, পরিবর্তে তোমরা তার চেয়ে আরও ভালো ও বড় পুরস্কার পাবে আল্লাহর কাছ থেকে। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো আল্লাহর কাছে। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সুরা হামিদ-এর ১১ আয়াতে বলা হয়েছে, 'কে আছে যে আল্লাহকে দেবে উত্তম ঋণ? তাহলে তিনি বহু গুণে একে তার জন্য বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।' একই আয়াতের ১৮ আয়াতে বলা হয়েছে, 'দানশীল পুরুষ ও নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাদের দেওয়া হবে বহুগুণ বেশি আর তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।' আর সুরা তাগাবুন-এর ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন, আর তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তো গুণগ্রাহী, সহিষ্ণু।'

**কর্তাভজা** বৈষ্ণব মতবাদের অন্তর্ভুক্ত একটি ক্ষুদ্র ধর্মীয় সম্প্রদায়। এ মতবাদের প্রবর্তক বা মূল গুরু ছিলেন আউলচাঁদ (আনু. ১৬৯৪-১৭৭০)। তাঁর প্রথম জীবন কিংবা ধর্ম-পরিচয় সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছুই জানা যায় না। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা গ্রামের পানখেতে একটি নবজাত শিশু পড়ে থাকতে দেখে খেতের মালিক মহাদেব বারুই শিশুটিকে লালন-পালন করার জন্য নিজ বাড়িতে নিয়ে যান। মহাদেবের স্ত্রী ফুটফুটে শিশুটির নামকরণ করেন পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্র পরে ফুলিয়া গ্রামের বৈষ্ণব সাধক বলরাম দাসের কাছে দীক্ষা নেন। এ সময় তাঁর নাম হয় আউলচাঁদ। আউল জগৎপ্রভুকে বলতেন কর্তা; ঈশ্বর বা খোদা নয়। তিনি তাঁর অনুসারীদের সেই কর্তার উপাসনা করতে বলতেন। তা থেকেই তাঁর অনুসারী সম্প্রদায়টির নাম হয় কর্তাভজা। আউলচাঁদের প্রধান শিষ্য ছিলেন ২২ জন। শিষ্যদের আউলচাঁদ ১০টি নিষেধ ও কতগুলো উপদেশ মেনে চলতে বলতেন। তাঁর সাধনার প্রধান মাধ্যম ছিল সংগীত। তাঁর অনুসারীরা তাঁকে চৈতন্যদেবের অবতার বলে মনে করত। আউলচাঁদের মৃত্যু হয় বোয়ালিয়া গ্রামে। বিংশ শতকের শুরুতে বাংলা দেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে কর্তাভজা সম্প্রদায় দুর্বল হয়ে পড়ে।

**কর্দম** ঋষিবিশেষ। প্রজাপতিদের অন্যতম। স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহূতি তাঁর স্ত্রী। দেবহূতির গর্ভে

তাঁর কপিলমুনি নামে পুত্র এবং অরুন্ধতী, শান্তি, কলা প্রমুখ নয় কন্যা জন্মে।

**কর্ম** হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের একটি অংশ। যেমন কর্ম তেমন ফল। মানুষ তার কাজের ফল ইহজীবনে কিংবা পরজন্মে ভোগ করে। ব্যক্তির জীবন তার পূর্বজন্মের কর্মের ফলাফল। হিন্দু পুরাণমতে, ব্যক্তি ও তার কর্ম একই।

**কলকাতা মাদ্রাসা** বর্তমানে যার নাম কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা। ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। শুরুতে দিল্লির দরস-ই-নিজামিয়ার পাঠক্রম অনুসরণ করে এতে পাঠদান করা হতো। এই মাদ্রাসা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের সরকারি চাকরিতে নিযুক্তির জন্য হেস্টিংস সুপারিশ করেন। ১৭৯১ সালে মাদ্রাসার পাঠক্রমে পরিবর্তন আনা হয়। ১৮২৬-এ এখানে ইংরেজি কোর্স চালু করা হয় এবং শাখাটি স্বতন্ত্র অ্যাংলো-অ্যারাবিক বিভাগ হিসেবে ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত থাকে। এ বিভাগে এন্ট্রান্স মান পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হতো। ১৮২৭-এ ওয়েলেসলি স্ট্রিটের নবনির্মিত সুপরিসর ভবনে মাদ্রাসাটি স্থানান্তরিত হয়। ১৯০৮ সালে এখানে হাদিস ও তফসিরের টাইটেল ক্লাস চালু হয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর এ মাদ্রাসার আরবি বিভাগ অর্থাৎ মাদ্রাসা-ই-আলিয়া অংশের পাঠাগার, আসবাবপত্র ও অফিস ঢাকায় স্থানান্তর করা হয় এবং তার নতুন নাম হয় মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা। পরে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মওলানা আবুল কালাম আজাদের প্রচেষ্টায় কলকাতা মাদ্রাসায়ও আরবি বিভাগ পুনরায় চালু করা হয়।

**কলন্দরিয়া** সুফি তরিকা। এর উদ্ভব ইরানে। যদিও এর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কারও মতে, স্পেনের জনৈক ইউসুফ কলন্দরিয়া এ তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। আবার কারও মতে, পারস্যের শায়খ জামালউদ্দীন আস-সাবি এর প্রতিষ্ঠাতা। কলন্দরিয়া তরিকার ওপর বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব আছে। 'কলন্দর' শব্দটির উদ্ভবও ভারতে বলে মনে করা হয়। এর অর্থ ভ্রাম্যমাণ ফকির। পানিপথের হজরত শরফুদ্দিন-বু-আলি শাহ্ কলন্দর এ সম্প্রদায়ের আদি ভারতীয় প্রতিষ্ঠাতা। হুগলি জেলার পাণ্ডুয়ার শাহ শফিউদ্দিনকে প্রাচীনতম কলন্দার সুফি বলে মনে করা হয়। এই সুফিদের বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা কোনো স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন না। তাঁদের প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো প্রাণী পালন করেন এবং সেগুলো সঙ্গে নিয়ে দেশভ্রমণ করেন।

**কলি** হিন্দু দেবতা। তাঁরই নামানুসারে বর্তমানকালের নামকরণ হয়েছে কলিযুগ। দ্বাপর যুগের অবসানে ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ থেকে অধর্মের জন্ম আর অধর্মের ঔরসে ও মিথ্যার গর্ভে দম্ভ নামে তার এক পুত্র জন্মলাভ করে। এই দম্ভ নিজের বোন মায়ার পাণিগ্রহণ করলে তাদের লোভ নামে এক পুত্র হয়। লোভ নিজের বোন নিবৃতিকে বিয়ে করেন এবং তাঁদের ক্রোধ নামে এক পুত্র ও হিংসা নামে এক কন্যা জন্মে। ক্রোধ নিজের বোনকে বিয়ে করলে তাদের এক পুত্র জন্মে। এই পুত্রের নামই কলি। কলি কৃষ্ণবর্ণ, বিকটবদন, লোলজিহ্বা। কলি নিজের বোন দ্বিরুক্তির পাণিগ্রহণ করলে তাঁদের ভয় নামে এক পুত্র, মৃত্যু নামে এক কন্যার জন্ম হয়। কলির নিষাদরাজ নল স্ত্রী দয়মন্তীসহ রাজ্যভ্রষ্ট হন ও অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করেন।

**কলিঙ্গ** হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে বলিরাজ পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে জাত পাঁচটি পুত্রের (অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গ) অন্যতম। তাঁর রাজ্যের নামও কলিঙ্গ। কোনো কোনো প্রাচীন (ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ) সূত্রে পাওয়া যায় যে, একসময় কলিঙ্গ ভারতের পূর্ব উপকূলে ওড়িশার বৈতরণী নদী থেকে গোদাবরী নদীর নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নন্দবংশের প্রথম রাজা কলিঙ্গে নিজ প্রভাব বিস্তার করেন বলে অনুমিত হয়। বিন্দুসারের সময় স্বাধীন কলিঙ্গ রাজ্য পুরী, গঞ্জাম ও সন্নিহিত অঞ্চলের অধিকাংশ নিয়ে গঠিত ছিল। অশোকের কলিঙ্গ বর্তমান ওড়িশার দক্ষিণ অংশ। অশোক অতি কষ্টে এ রাজ্য জয় করেন এবং এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ভুবনেশ্বরের কাছে তোসলি ছিল অশোকীয় কলিঙ্গের রাজধানী। এখানে তাঁর দুটি শিলালিপি আছে। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর জৈন রাজা খারবেল (খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) স্বাধীন

কলিঙ্গ রাজ্য স্থাপন করেন; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হিউয়েন সাং (সপ্তম শতক)-এর ভ্রমণকাহিনিতে কলিঙ্গ নগরের উল্লেখ আছে। ৭৫০ সালে চালুক্যরা তা জয় করে রাজমহেন্দ্রীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে গোদাবরী ও গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রাচ্য গঙ্গাবংশের (Gangas) কলিঙ্গ ও ওড়িশা সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

**কলিযুগ** হিন্দু পুরাণ কথিত একটি যুগপর্ব। ১২০০ দিব্য বছর অর্থাৎ ১২০০ × ৩৬০ = ৪,৩২,০০০ বছর এর পরিমাণ। ৩১০১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এই যুগের আরম্ভ। কলিযুগ অধর্মের যুগ। ধর্ম মাত্র এক-চতুর্থাংশ থাকবে। এই যুগে ত্রিপাদ পাপ ও একপাদ পুণ্য। কলিযুগের অবসানে দেবতা বিষ্ণু কল্কিরূপে আবির্ভূত হয়ে দুষ্কৃতির বিনাশ ও ধর্মযুগ সংস্থাপন করবেন।

**কলেমা** ইসলামের মূলমন্ত্র বা বীজ। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে কলেমাই প্রথম। বাকি চারটি স্তম্ভ হলো নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ। কলেমা হলো মুসলমানের ইমান বা বিশ্বাসের ভিত্তি। যে ব্যক্তি কলেমা উচ্চারণ করেন ও তাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন তাঁকে মুমিন বা বিশ্বাসী বলা হয়। কলেমায় বিশ্বাস ও তা পাঠের সামর্থ্যই একজনের মুসলমানত্বের প্রমাণ। আবার কলেমা পাঠ করেই একজনকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে হয়। অবশ্য বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের আদেশ-নিষেধগুলো সঠিকভাবে পালন না করা পর্যন্ত কেউ প্রকৃত মুমিন পদবাচ্য হতে পারেন না। অপরের অন্তর কেউ দেখতে পায় না। কাজেই কেউ বিশ্বাসের সঙ্গে কলেমা পড়েছে বলে দাবি করলেই তাঁকে মুমিন বলে স্বীকার করতে হয়।

**কলেমা তওহিদ** একত্ববাদের কলেমা। এটি তৃতীয় কলেমা। এই কলেমাটির অর্থ : '(হে আল্লাহ) তুমি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই; তুমি এক, তুমি অদ্বিতীয়; আল্লাহর নবী মোহাম্মদ (সা.) ধার্মিকদের মধ্যে অগ্রণী এবং বিশ্বের পালনকর্তার প্রেরিত রাসুল।'

**কলেমা তমজিদ** গৌরব ঘোষণার কলেমা। এটি চতুর্থ কলেমা। এর অর্থ : '(হে আল্লাহ) তুমি ছাড়া কেউ উপাস্য নাই, তুমি জ্যোতি; আল্লাহ যাকে চান নিজের জ্যোতির প্রতি তাকে পথ প্রদর্শন করেন। মোহম্মদ (সা.) পয়গম্বরদের ইমাম ও শেষ নবী।'

**কলেমা তৈয়েবা** আল-কলেমাতুত-তৈয়েবা, সংক্ষেপে কলেমা তৈয়ব (পুণ্য-বাক্য) এটি প্রথম কলেমা। আরবিতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ভিন্ন কেহ উপাস্য নাই, মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।' একে ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র বা ভিত্তি বলা হয়।

**কলেমা শাহাদাত** সাক্ষ্যদানের কলেমা। এটি দ্বিতীয় কলেমা। এই কলেমাটির অর্থ হলো : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক; তাঁর কোনো শরিক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসুল।' হাদিসে বলা হয়েছে: যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' (প্রথম কলেমা) বলেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

**কল্কি** বিষ্ণুর দশম অবতার। কলিযুগের শেষে পৃথিবী যখন পাপে পূর্ণ হয়ে যাবে তখন বিষ্ণু সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশার পত্নী সুমতির গর্ভে কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ করবেন এবং দুই পক্ষযুক্ত শ্বেত অশ্বে আরোহণপূর্বক জ্বলন্ত অসি ও চক্র দ্বারা দুষ্কৃতের দমন করে ধর্মরাজ্য স্থাপন করবেন। তখন আবার সত্যযুগের শুরু হবে।

**কল্প** হিন্দু পুরাণ অনুসারে আমাদের ৪৩২ কোটি বছরে ব্রহ্মার এক আহোরাত্র। দিনে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় এবং রাত্রিতে তা লয়প্রাপ্ত হয়। এই সৃষ্টি ও লয় কল্প হিসেবে অভিহিত।

**কল্পতরু** পুরাণে উল্লেখিত বৃক্ষবিশেষ। সমুদ্রমন্থনের ফলে উত্থিত এই বৃক্ষ কল্পান্ত হলে পুনরায় সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়। এ জন্য এর নাম কল্পতরু। কল্পতরুর কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করলে তাতে অভীষ্ট লাভ হয়।

**কল্পসূত্র** বেদ ও বেদান্ত সম্পর্কে ঋষিদের মতামত এই গ্রন্থে সূত্রাকারে সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি সূত্র অল্প কথায় এমনভাবে রচিত, যেন শিক্ষার্থীরা তা সহজে মুখস্থ করে মনে রাখতে পারে। কল্পসূত্র তিন ভাগে বিভক্ত: শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র। শ্রৌতসূত্রে উৎসর্গভূমি ও পীঠস্থানের মাপজোক ও নির্মাণ সম্পর্কে যে বিধান সংকলিত ছিল তাকে

ভারতীয় জ্যামিতি ও ধর্মীয় স্থাপত্যের উপক্রমণিকা বলা যেতে পারে। গৃহ্যসূত্রে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের প্রায় ৪০টি কর্তব্য বা সংস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্মসূত্রে সামাজিক ও ধর্মানুষ্ঠানিক বিষয়ের কথা রয়েছে। ধর্মসূত্রে হিন্দুদের দৈনন্দিন জীবনে ব্রাহ্মণদের কর্তব্যাদির নির্দেশনা আছে। ধর্মসূত্রের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে মানবধর্মসূত্র, যা মনুর স্মৃতি বা মনুর বিধান নামে পরিচিত। দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ও প্রথম খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এটি সংকলিত হয়।

**কাওয়ালি** মুসলমান সুফি সাধকদের আধ্যাত্মিক প্রেমধর্মী গান। এর উৎপত্তি আরবি 'কওল' শব্দ থেকে। সংগীতে শব্দটির ব্যবহার দ্ব্যর্থবোধক। এক অর্থে কাওয়ালি কথাটার দ্বারা তালকে বোঝায়। অন্য অর্থে এর দ্বারা উর্দু ও ফারসি ভাষায় বিশেষ করে খোদা, রাসুল বা কোনো ওলিআল্লার উদ্দেশে রচিত গীতকে বোঝায়। এই গীতপদ্ধতিটি একক অথবা সমবেতভাবে গাওয়া হয়। তালের ঝোঁকে ঝোঁকে হাততালি দেওয়া এই প্রকার গানের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ত্রয়োদশ শতকে ওস্তাদ আমির খসরুর দুজন শিষ্য সামাদ ও নিয়াজ এই গীতধারা প্রবর্তন করেন।

**কাকুস** রোমক পুরাণে বর্ণিত এক চোখবিশিষ্ট ও অগ্নি-উদ্‌গিরণকারী দৈত্য। তার ছিল তিন মাথা। ষাঁড় চুরির দায়ে হারকিউলিস তাকে হত্যা করেন। ভার্জিলের *ইনীদ* মহাকাব্যে কাকুসের উল্লেখ আছে।

**কাজি** আরবি শব্দটির অর্থ বিচারক, মীমাংসাকারী, বিচার-বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তা। খলিফাদের আমলে দেশের বিচার বিভাগের দায়িত্ব ছিল কাজিদের ওপর। কথিত আছে, খলিফা হজরত ওমর (রা.) প্রথম দুজন কাজি নিযুক্ত করেন। একজন দামেস্ক ও জর্দানের জন্য, অপরজন হিমস ও কিন্নাসারিনের জন্য। হি. ২৩ সনে তিনি মিসরেও একজন কাজি নিযুক্ত করেন। বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে আলাদা থাকার কারণে সে সময় এমনকি খলিফাদেরও কাজির ডাকে আদালতে উপস্থিত হতে হতো। কাজি শুরাইহ, কাজি আবু ইউসুফ ও কাজি ইয়াহিয়া ইবনে আকসম ইসলামের ইতিহাসের কজন বিখ্যাত কাজি। কাজিরা পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ অনুসারে বিচার করতেন। ইসলামি মতে, বিচার করা ধর্মীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত আর তাই আব্বাসি খিলাফতের আমলে শুধু ফকিহ বা ধর্মতত্ত্বজ্ঞদেরই কাজি নিযুক্ত করা হতো। ভিন্ন ভিন্ন মজহাবের জন্য নিজ নিজ মজহাবি ফকিহদের কাজি নিযুক্ত করার রেওয়াজ ছিল। বাগদাদ ও স্পেনের করডোভার কাজির উপাধি ছিল কাজি-উল-কুজাহ (প্রধান বিচারক)। ওয়াকফ পরিচালনা এবং এতিম ও অন্যান্য কোনো কোনো শ্রেণীর লোকের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভারও কাজিদের ওপর ন্যস্ত ছিল।

**কাণ্ডর্ষি** বেদের কাণ্ড বিশেষের মীমাংসক ঋষি। যেমন কর্মকাণ্ডের মীমাংসক জৈমিনি, ব্রহ্মকাণ্ডের মীমাংসক বেদব্যাস, ভক্তিকাণ্ডের মীমাংসক শাণ্ডিল্য।

**কাদিশ** ইহুদিদের প্রার্থনা। ইহুদিদের উপাসনালয় সিনাগগে যা প্রতিদিন কিংবা কোনো আত্মীয়র মৃত্যুর পর করা হয়।

**কাননুশি** শিন্টো মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। যিনি দেবতার উদ্দেশে সকালে ও সন্ধ্যায় পূজা-অর্চনা করেন।

**কান্তমন্দির** দিনাজপুরের কান্তনগরে নির্মিত অষ্টাদশ শতকের মন্দির। এ সুন্দর কারুকার্যময় নবরত্ন বিষ্ণুমন্দিরটি বিংশ শতকের প্রথম দিকে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে মন্দিরটি সংস্কার করা হয়। প্রবাদ অনুযায়ী কান্তনগরে মহাভারতে উক্ত মৎস্যরাজ বিরাটের দুর্গ ছিল। একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজও সেখানে দেখা যায়।

**কাপালিক** তান্ত্রিকবিশেষ বা তাঁদের সম্প্রদায়। যাঁরা কটি পরিধান করেন। কাপালিকেরা শিবের ভৈরব মূর্তির সাধক। তাঁরা তন্ত্রমতে পঞ্চ মকার—মদ, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন-এর অনুসারী। প্রথম চারটি 'ম' দেবতার প্রতীক এবং মদ ও মাংসের মিশ্রণ মহাজাগতিক বৈপরীত্যের সমন্বয় পরিচায়ক। কাপালিকেরা পশু ও মানুষ বলি দেন। মানুষের মধ্যে বলি হিসেবে ব্রাহ্মণ বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের ব্যক্তিই তাঁদের বেশি পছন্দ। মানুষ বলির পর ওই ব্যক্তির করোটি সঙ্গে রেখে কাপালিক ১২ বছর সাধুর জীবন যাপন করেন।

এদেশীয় কাপালিকেরা কেউ কেউ নিজেদের কাশ্মীরি বৌদ্ধদের বংশধর বলে দাবি করেন। অন্য মতে, তাঁরা দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকের এক শিব-পূজারিণীর বংশধর।

**কাফফারা** পাপ বা অপরাধ থেকে মাফ পাওয়ার জন্য শরিয়ত-নির্দিষ্ট দণ্ড। ইসলামি পরিভাষায় কতিপয় অপরাধজনক কাজের পর তওবা কবুলের উদ্দেশ্যে আর্থিক বা শারীরিক ক্ষতিপূরণ আদায়ের নাম কাফফারা। চারটি ক্ষেত্রে এই কাফফারা দিয়ে গুনাহ অর্থাৎ পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ক্ষেত্র চারটি হলো: শপথভঙ্গ, রমজান মাসের রোজা, খুন ও জিহাদ। আল্লাহর নামে শপথ করে তা ভঙ্গ করলে ১০ জন মিসকিনকে দুই বেলা খাওয়াতে হয়, কিংবা ১০ জন মিসকিনকে এক জোড়া করে কাপড় দান করতে হয় কিংবা একজন দাসকে মুক্ত করতে হয়। যদি এসব কোনোটিই করার সামর্থ্য না থাকে, তবে পর পর তিনটি রোজা রাখতে হয় (ওই সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোজা রাখলে কাফফারা আদায় হবে না)। অবশ্য মিসকিনদের আহার করানোর বদলে তাদের প্রত্যেককে পৌনে দুই সের করে গম প্রদান করলেও কাফফারা আদায় হবে। শিকার বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অস্ত্র ব্যবহারের সময় দৈবক্রমে কোনো লোক নিহত হলে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনের 'দিয়ত' (রক্তমূল্য) পরিশোধ করার পরিবর্তে একটি দাস মুক্ত করতে হয় বা একাধারে ৬০ দিন রোজা রাখতে হয়। জিহারের (স্ত্রীকে কোনো অংশে মাতা বা বোনের মতো বলে ঘোষণা) কাফফারা দিতে হয়। এভাবে কোনো ন্যায্য কারণ ছাড়া রমজান মাসের রোজা ভঙ্গ করলে, এর কাজা করার পরও কাফফারা আদায় করতে হয়। এই কাফফারা হলো একটি দাস মুক্ত করা, আর অক্ষম হলে ৬০ দিন রোজা রাখা এবং তা-ও না পারলে ৬০ জন মিসকিনকে দুই বেলা আহার করানো।

**কাব ইবনে উজরাহ আবু মোহাম্মদ** সাহাবি। হিজরতের পর ইসলাম গ্রহণ করে সব ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কোনো ধর্মযুদ্ধে তাঁর একটি হাত কাটা যায়। *সংকলন*গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত প্রায় ৫০টি হাদিস পাওয়া যায়। তিনি ৫১ হিজরিতে মারা যান।

**কাব ইবনে জমাজ** ইসলামের প্রথম যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। হিজরতের আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বদর ও তাবুক ছাড়া সব জিহাদে অংশ নেন। ইসলামের প্রশংসায় কাব্য রচনা করতেন। তিনি হজরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের সমর্থক ছিলেন এবং তাঁর শাহাদাতের পর মর্মস্পর্শী মরশিয়া রচনা করেন। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে যান। মৃত্যু ৬৭৩ সালে। তাঁর কাব্যের বিষয় ছিল ইসলামের সৌন্দর্য ও জিহাদের প্রেরণা। মহানবী (সা.)-এর ইঙ্গিতানুযায়ী তিনি কাব্য রচনা করতেন। ওহোদের যুদ্ধে রাসুল (সা.)-এর দাঁত বিনষ্ট হয়েছে জেনে তিনি স্বীয় মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেন।

**কাব ইবনে মুহাইর** সাহাবি ও কবি। তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মহানবী (সা.)-এর সামনে তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'বানাত সুআদ' পাঠ করেন। খুশি হয়ে মহানবী (সা.) তাঁকে নিজের গায়ের চাদর খুলে উপহার দেন।

**কাবা** মক্কা নগরে অবস্থিত ইসলামের প্রধান উপাসনাগৃহ। হজরত ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ.) এটি প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানরা একে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর বিশিষ্ট উপাসনাগৃহ বলে জ্ঞান করেন। এর অন্য নাম বায়তুল হারাম বা পবিত্র গৃহ। হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের আগেও এটি পৌত্তলিক আরবদের একটি পবিত্র ধর্ম-মন্দিরের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাবায় তারা ৩৬০টি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পর মোহাম্মদ (সা.) কাবাকে পৌত্তলিকতামুক্ত করতে এসব মূর্তি অপসারণ করেন। পৃথিবীর সব স্থানের মুসলমানরা বর্তমানে কিবলা বা কাবামুখী হয়ে নামাজ পড়ে। সংগতিসম্পন্ন মুসলমানদের জন্য কাবা জিয়ারত বা হজব্রত পালনকে অন্যতম ফরজ বা অবশ্যকর্তব্য বলে পবিত্র কোরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হজের সময় হাজিদের কাবা ঘর তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করতে হয়। প্রতিবছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসলমান কাবায় হজব্রত পালনে সমবেত হন। কাবা গৃহের দেয়ালগাত্রে হাজরে আসওয়াদ

বা কৃষ্ণপ্রস্তর স্থাপিত আছে। কথিত আছে, অতি প্রাচীনকালে এ প্রস্তরটি বেহেশত হতে পতিত হয়েছিল। হজের সময় হাজিরা এই প্রস্তরটিকে সম্মানের সঙ্গে চুম্বন করেন। কাবা গৃহের কাছেই রয়েছে মাকামে ইবরাহিম বা ইবরাহিমের দাঁড়ানোর স্থান ও বিখ্যাত জমজম কূপ।

**কাবালা** ইহুদি আধ্যাত্মিকতার তত্ত্ব। এতে স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টি অর্থাৎ মহাবিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

**কাবিল** কেইন দ্র.।

**কাম** কামনা, সুখ, যৌনপ্রেম। ভারতীয় চিন্তাধারায় কাম এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণ অর্থে কামকে দৈহিক কামনা-বাসনা ভেবে নিন্দা করা হয়। মনে করা হয়, কামের কারণে মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয়ে থাকে এবং জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পায় না। কামের আরেক অর্থ সুখ, বিশেষ করে যৌন প্রেমে যে সুখের উপলব্ধি। হিন্দুধর্মে কামকে জীবনের চতুর্লক্ষ্যের অন্যতম গণ্য করা হয়। কাম সেই হিন্দু দেবতার নাম, যিনি তাঁর পুষ্পধনুর পুষ্পশরের আঘাতে দেবতা ও মানুষের মনে কামনার উদ্রেক ঘটান। তাঁর আরেক নাম অনঙ্গ। তাঁর স্ত্রীর নাম রতি। হিন্দু পুরাণে শিবের পুত্র স্কন্দের জন্মকাহিনি কামদেবের বড় কৃতিত্ব। তাড়কা রাক্ষসীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেবতাদের ধারণা হয় যে একমাত্র শিবের ঔরসজাত পুত্রই তাঁদের উদ্ধার করতে পারে। দেবতারা তখন গভীর তপস্যায় মগ্ন শিবের ধ্যানভঙ্গ ও তাঁর মনে কামনা উদ্রেক করার জন্য কামদেবের শরণাপন্ন হন। পরে শিব যখন জানতে পারেন যে কামদেবই তাঁর ধ্যানভঙ্গের কারণ তখন তিনি তাঁর দৃষ্টির অগ্নিবাণ দিয়ে কামদেবকে ভস্মীভূত করেন। পরে মহাদেবের কৃপায় কামদেব তাঁর দেহ ফিরে পান।

**কামগীতা** ভীষ্মের উদ্দেশে তর্পণের পর যুধিষ্ঠির যখন মনস্তাপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পণ্ডিতদের কথিত যেসব উপদেশবাণী শুনিয়েছিলেন, তা-ই কামগীতা নামে অভিহিত।

**কামশাস্ত্র** নারী-পুরুষের দৈহিক মিলন বা কামক্রিয়া-সংক্রান্ত উপদেশ-সংবলিত একটি মহাগ্রন্থ। মহাদেবের অনুচর নন্দী প্রথম সহস্র অধ্যায়ে *কামসূত্র* রচনা করেন। পরে উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু একে ৫০০ অধ্যায়ে এবং ১৫০ অধ্যায়ে সংক্ষেপ করেন। বাৎসায়নের জন্ম খ্রিষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে উত্তর ভারতে। তিনি প্রাচীন কামশাস্ত্রগুলোর প্রকৃত উদ্ধৃতিসহ সেগুলোর সারাংশ নিয়ে *কামসূত্র* রচনা করেন। উপরন্তু, তিনি এতে নানা ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করেন। হিন্দি, বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন ভাষায় বাৎসায়নের *কামশাস্ত্র*-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। *কামসূত্রে* নারীর চৌষট্টি কলা, নারীদের সঙ্গসুখে চরিতার্থে সক্ষম ২৪ ধরনের পুরুষ, প্রেমিকের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার নারীর ২৮ ধরনের ছলাকলা, ১৬ রকমের চুম্বন এবং যৌনসঙ্গমের বিভিন্ন আসন-পদ্ধতি, প্রণয়কলহ, দংশন এবং সঙ্গীর দেহে নখরাঘাত, স্ত্রী নির্বাচন, প্রলোভন, কুট্টিনীদের ব্যবহার, নাগরালি, বশীকরণ, কামোদ্দীপক ও রতিবর্ধক ভেষজের ব্যবহার এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নারীদের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞাতব্য ও প্রাসঙ্গিক উপদেশ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

**কামার** লোককাহিনি অনুসারে কোনো এক শূদ্র মহিলার সঙ্গে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার প্রণয়ের ফলে কর্মকার বা কামারের জন্ম। অল্পসংখ্যক শাক্ত ও বৌদ্ধ ছাড়া বাংলাদেশের কর্মকাররা ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের প্রিয় দেবতা বিশ্বকর্মা, ভাদ্র মাসের শেষ দিনে যার পূজা হয়।

**কামি** শিন্টো ধর্মে আরাধ্য শক্তির নাম। জাপানি ভাষায় শব্দটি ঈশ্বর, দেব, দেবী বা আত্মা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অসাধারণ এবং ভয় বা সম্ভ্রম উদ্রেক করে, এমন সব প্রাকৃতিক বিষয় যেমন বজ্র, বিদ্যুৎ, প্রস্তর, পর্বত, গাছগাছালি, মাছ, জন্তু-জানোয়ার এবং সেই সঙ্গে পরিবারের পূর্বপুরুষ, মহাযোদ্ধা বা সম্রাট কামি হিসেবে পূজিত হন। ইজানাজি নো মিকোটো-নামীয় পুরুষ কামি ও ইজানামি নো মিকোটো-নামীয় নারী কামির মিলনে জাপানি দ্বীপপুঞ্জের জন্ম হয় এবং তাঁদের কন্যা আমেতারাসুর বদৌলতে জাপানের সম্রাট বংশের ধারা আজও প্রবহমান। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে

চৈনিক সভ্যতার অনুপ্রবেশের পর জাপানের দেশীয় ধর্মীয় ঐতিহ্য 'শিন্টো' বা 'কামি'র পথ হিসেবে অভিহিত হতে থাকে। কামিকে বুদ্ধ ও বোধিসত্তার রক্ষক হিসেবে গণ্য করা হয়।

**কারবালা** ইরাকের রাজধানী বাগদাদের ৯৫ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত শিয়া সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান। এখানে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর মোহাম্মদ (সা.)-এর কনিষ্ঠ দৌহিত্র আল-হুসেন, তাঁর সঙ্গী, পরিবার ও আত্মীয়বর্গের অনেকে এজিদের সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন। এই বিয়োগান্ত ঘটনার বছর চারেকের মধ্যে স্থানটি পুণ্যার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। শিয়াদের ষষ্ঠ ইমাম জাফর আল-সাদিক এই তীর্থস্থানের মরতবা বা বিশেষ মাহাত্ম্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সুন্নি খলিফারা অবশ্য স্থানটির উত্তরোত্তর গুরুত্ব বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন হন। ৮৫০ সালে আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল হুসেনের সমাধি ধ্বংস করে সেখানে জিয়ারত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তীর্থযাত্রীদের অনেকে কারবালা থেকে একটা বৃত্তাকার মাটির ফলক নিয়ে যায় এবং তার ওপর মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকে।

**কারাম** ওরাওঁদের উৎসববিশেষ। কারাম এক ধরনের গাছ। এর পূজা উপলক্ষেই ভাদ্রসংক্রান্তিতে উৎসবটি পালিত হয়। অঞ্চলভেদে একে ভাদইপর্ব, বর্ষাপর্ব ইত্যাদিও বলা হয়। এ উৎসবকে কেন্দ্র করে ওরাওঁ-সমাজের তরুণ-তরুণীরা নৃত্য-গীত ও পানাহারে মেতে ওঠে। উৎসবটি কেবল কারাম বৃক্ষের আবাহন নয়, ওরাওঁ তরুণ-তরুণীদের মন দেওয়া-নেওয়াও উপলক্ষ। ভাদ্র-সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হলেও তার প্রস্তুতি চলে পূর্বরাত্রির শেষ প্রহর থেকে। তরুণ-তরুণীরা তখন থেকেই উপবাস শুরু করে। সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যাবেলা ওরাওঁ নরনারীরা কারাম বৃক্ষের পাদমূলে পূজা দেয়। মেয়েরা সমবেত কণ্ঠে গান গায় এবং নারী-পুরুষ দলবদ্ধভাবে নৃত্য-গীত করে। এভাবে তিন পর্যায়ে কারাম বৃক্ষের পূজার মাধ্যমে তারা স্রষ্টার প্রতি তাদের ভক্তি নিবেদন করে। এ উপলক্ষে মহিলারা কুলা সাজিয়ে বাড়ি বাড়ি যায় এবং বৃষ্টিকে আবাহন করে গান গায়।

**কারামাত, কেরামত** আরবি শব্দটির অর্থ অনুগ্রহ, আল্লাহর অলিদের অলৌকিক ক্ষমতা বা ঘটনা। পার্থিব জীবনের মোহ-মায়া ত্যাগ করে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আজীবন কঠোর তপস্যা করে তাঁরা যে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করেন, তার প্রকাশ কখনো কখনো বা কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে এমন কাজ বা ঘটনার মধ্য দিয়ে ঘটে, যার বাস্তব বা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এককথায় যাকে বলা যেতে পারে অলৌকিক। মুসলিম সুফিদের জীবনে এমন অসংখ্য ঘটনা পরিলক্ষিত হয়, যা বিস্ময়কর। মানুষ আশরাফুল মখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা; এ জন্য সমগ্র সৃষ্টির ওপরই তাঁর বিরাট প্রভাব, বিশেষ করে তিনি যদি আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করেন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হন, তবে যেকোনো বিস্ময়কর কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব, এই বিশ্বাসই কারামত বা কেরামতের মূলে কাজ করে। যদি একই ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা কোনো নবীর দ্বারা প্রদর্শিত হয়, তবে ইসলামিক পরিভাষায় তাকে মুজিজা বলা হয়।

**কালিকাপুরাণ** হিন্দুদের ১৮টি উপপুরাণের অন্যতম। দেবীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি যেমন গিরিজা, ভদ্রকালী, কালী, মহামায়া প্রভৃতির পূজা-প্রকরণ এ পুরাণে লিখিত আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে *পদ্মপুরাণ*-এর কবি নারায়ণদেবের রচিত একটি *কালিকাপুরাণ* পুঁথি পাওয়া যায়। সম্ভবত এটি তাঁর *মনসামঙ্গল* কাব্যেরই পূর্বাংশ। আনুমানিক সপ্তদশ কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীতে দ্বিজ দুর্গারাম ক্ষুদ্র আকারে *কালিকাপুরাণ* অনুবাদ করেন। দাস হরিদত্তও *কালিকাপুরাণ*-এর একজন অনুবাদক। ভাটপাড়া নিবাসী পরানচন্দ্র দাসের অনূদিত একটি *কালিকাপুরাণ*ও পাওয়া যায়। এর মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৯৪ সালে।

**কালীঘাট চিত্রকলা** বাংলার লোকশিল্পের একটি লুপ্তপ্রায় ধারা। কালীঘাটের পট নামে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলকাতায় কালীমন্দির স্থাপিত হয়। মন্দিরকে কেন্দ্র করে একটা বাজারও গড়ে উঠেছিল। এ সময় বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে পটুয়ারা কালীঘাটে এসে বসতি স্থাপন করেন। প্রথম দিকে শিল্পীরা

তাঁদের খণ্ডকালীন কাজ হিসেবে কাগজের ওপর হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি আঁকতেন। পরে তাঁদের হাতেই একধরনের চিত্রকলার সূচনা ঘটে। বাবু-সংস্কৃতি, স্ত্রী-স্বাধীনতা, সামাজিক অনাচার, লাম্পট্য, ধর্মীয় ভণ্ডামি, মিথ্যাচার প্রভৃতি সমকালীন জীবনচিত্র এসব পটের বিষয় হয়। এক টাকায় ১৬ থেকে ৬৪টি পর্যন্ত চিত্রকর্ম পাওয়া যেত এবং সেগুলো মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের মধ্যে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। মুসলমান ক্রেতাদের জন্য পরবর্তী সময়ে দুলদুল ঘোড়া ইত্যাদি নিয়েও শিল্পীরা পট আঁকেন। রুডিয়ার্ড কিপলিং এ শিল্পকলার লাগসই সৌন্দর্য দেখে আকৃষ্ট হন এবং অনেকগুলো চিত্রকর্ম সংগ্রহ করে ১৯১৭ সালে তিনি সেগুলো লন্ডনের ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে দান করেন। এই দুই জায়গায় এবং প্রাগ মিউজিয়ামে কালীঘাট চিত্রকলার সর্বোত্তম সংগ্রহ রয়েছে। পাশ্চাত্যের শিল্পসমালোচকদের মধ্যেও বাংলার লোকশিল্পীদের আঁকা এই শিল্পের ব্যাপারে প্রচুর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

**কালীনৃত্য** কালীর কৃষ্ণবর্ণ মুখমণ্ডল ও রক্তবর্ণ প্রসারিত জিহ্বার মুখোশ পরে এবং এক হাতে খড়্গ ও অন্য হাতে নরমুণ্ড নিয়ে নৃত্য। এতে প্রধান বাদ্যযন্ত্র থাকে ঢাক। এ নাচে বীররস ও বীভৎসরসের প্রাধান্য থাকে।

**কালীপূজা** হিন্দুধর্মাবলম্বীদের একটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব। বিশেষ করে শাক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা গুরুত্বের সঙ্গে এই পূজা করে থাকে। শাক্তরা কালীকে আদ্যাশক্তিরূপে উপাসনা করে। দেবী কালী সম্বন্ধে পুরাণ ও তন্ত্রে নানা কথা বলা আছে। যেমন, বলা হয়েছে, তিনি দশ মহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা। এসব শাস্ত্রে কালীর বিভিন্ন রূপের কথাও বলা হয়েছে, যার মধ্যে দক্ষিণকালিকা সর্বাধিক জনপ্রিয় ও ব্যাপকভাবে পূজিত। তাঁর এই রূপের বর্ণনা মোটামুটি এরকম: চতুর্ভুজা, করালবদনা, মেঘকৃষ্ণবর্ণা, মুণ্ডমালিনী, মুণ্ডগুলো থেকে নিঃসৃত রক্তধারায় রঞ্জিতা, ত্রিনয়না, বক্ষোপরি শিবদণ্ডায়মান এবং শিবাকুলবেষ্টিতা। তাঁর পরিধানে থাকে ব্যাঘ্রচর্ম। আদ্যাশক্তি ভগবতীর দেহকোষ থেকে দেবী আবির্ভূত হন। তখন ভগবতীদেবী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন বলে তাঁর নাম কালী বা কালিকা। তিনি শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে দুই দানবকে বধ করেন। তাদেরই দুই চেলা চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করায় দেবীর এক নাম চামুণ্ডা। এক রূপে তিনি মৃত্যু ও ধ্বংসের প্রতীক, অন্য রূপে তিনি আবার অন্নদায়িনী, তাই তাঁর আরেক নাম অন্নদা। রক্তবীজ দৈত্যের রক্ত পান করে তিনি তাকে বিনাশ করেন। কালী দুর্গার অংশরূপিণী ও শিবের পত্নী। শিব ও কালী উভয়েই অনার্য দেবতা ও দেবী।

বঙ্গদেশে কালীপূজা কবে থেকে শুরু হয় তা নিয়ে নানা মত চালু আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের (১৭১০-৮৩) সময় থেকে এই পূজা অনুষ্ঠানের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। কলকাতার কালীঘাটের কালী এবং দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী অতি প্রসিদ্ধ। গৃহে ও মন্দিরে নিত্য কালীর পূজা হয়। এ ছাড়া দীপান্বিতা (কার্তিকী অমাবস্যা), মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দশী, জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্দশী প্রভৃতি তিথিতে বিশেষ পূজার বিধান রয়েছে। বিশেষ কোনো কামনা পূরণের জন্যও কালীপূজা করা হয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলে মহামারি দেখা দিলে অনেকে মিলিতভাবে দেবীর কৃপা কামনায় কালীপূজা করেন। দীপান্বিতা কালীপূজা সাড়ম্বরে আলোকসজ্জাসহ ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কালীপূজায় সাধারণত পাঁঠা, ভেড়া কিংবা মহিষ বলি দেওয়া হয়। ডাকাতদের কালীপূজায় নরবলি দেওয়ার কথাও ইতিহাস-কিংবদন্তি ও নানা গল্প-উপন্যাসে পাওয়া যায়। অধিকাংশ দেব-দেবীর পূজা হয় দিনে, কিন্তু দেবী কালীর পূজা হয় রাতে।

**কাশ্যপ** মুনি। রাজা দশরথের মন্ত্রী। তাঁর পুত্রের নাম বিভাণ্ডক ও পৌত্রের নাম ঋষ্যশৃঙ্গ। তিনি রাজা দশরথের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বিষবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

**কাশ্যপ-মাতঙ্গ** চীনা ভাষায় শি-মতেঙ্গ বা মতেঙ্গ, চীনপ্রবাসী বৌদ্ধ পণ্ডিত। ৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তদানীন্তন চীন সম্রাট মিংতি তাঁকে বৌদ্ধধর্ম-সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য বিদেশে পাঠান। চীনে ফিরে আসার পর তিনি তাঁর স্বদেশবাসী গোভরণসহ ৪২ খণ্ডে বুদ্ধের উপদেশাবলির (সূত্র) চীনা অনুবাদ শুরু করেন।

**কাসাসুল আম্বিয়া** নবীদের কাহিনি। মিশ্র পুঁথিসাহিত্য ও কাব্যকাহিনি। রচয়িতা রেজাউল্লা, আমিরুদ্দিন ও আশরাফ আলী। এর মধ্যে রেজাউল্লা হজরত আদম (আ.) থেকে হজরত নুহ (আ.) পর্যন্ত, আমিরুদ্দিন হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে বিবি খাদিজার বিয়ের আগে পর্যন্ত এবং আশরাফ আলী হজরতের বিয়ের বর্ণনা থেকে হজরত আলী (রা.)-এর শেষ জীবন পর্যন্ত কাহিনি রচনা করেন। গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয় ১৮৬০ সালে। কাহিনির বর্ণনায়, ঘটনার চমৎকারিত্বে, আরবি-ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগে, উপমার সহজতা ও স্পষ্টতায় পুঁথিটি সমকালে বঙ্গদেশের মুসলমান-সমাজে জনপ্রিয় হয়েছিল।

**কিউপিড** প্রেমের রোমান দেবতা। গ্রিক পুরাণে তাঁর নাম এরস। দেবতা মার্স ও ভেনাসের পুত্র। তাঁর মূর্তি ডানাযুক্ত, নগ্ন। কিউপিড ও সাইকির প্রেমকাহিনি প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাহিত্য এবং রেনেসাঁস যুগের চিত্রকলায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে।

**কিউয়ান ইন** চীনা দেবী। ক্ষমার দেবী ও নারীদের রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে গণ্য হন। তাঁকে সন্তান আনয়নকারী নারী হিসেবেও অভিহিত করা হয়। চীনা দেব-দেবীর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সর্বজনীনভাবে শ্রদ্ধেয়া।

**কিং জেমসের বাইবেল** বাইবেলের ইংরেজি অনুবাদ। ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত। রাজা প্রথম জেমসের আদেশে এই অনুবাদ করা হয়।

**কিতাব** আরবি শব্দ। এর অর্থ লিখন, গ্রন্থ, হুকুমনামা, নির্দেশপত্র। সাধারণত আরবি ভাষায় যেকোনো লিখিত পুস্তককে কিতাব বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালার নির্দেশপত্রকে কিতাব বলা হয়। মানুষ যখন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে অন্যায়-অসংগত কাজে লিপ্ত হয় এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন আল্লাহ মানুষের মধ্য থেকে কোনো সদাচারী ব্যক্তিকে মনোনীত করে তাঁকে নবুয়ত দান করেন। নবীরা আল্লাহর পথে মানুষকে হিদায়েতের দায়িত্ব পালন করেন। নবীদের অনেককে তিনি আসমানি গ্রন্থ দান করেন। এসব আসমানি গ্রন্থই কিতাব নামে অভিহিত। ফেরেশতা হজরত জিবরাইল (আ.)-এর মারফতে এসব কিতাব কখনো বড় গ্রন্থের আকারে আবার কখনো ছোট ছোট সহিফা বা পুস্তিকার আকারে নাজিল অর্থাৎ অবতীর্ণ হতো। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই আল্লাহর নির্দেশবাহক নবী বা রাসুল এসেছেন। তাঁরা এসব কিতাবের সাহায্যে মানুষের নানা সমস্যার সমাধান করতেন, তাদের সৎ পথে চলার নির্দেশনা দিয়েছেন এবং আল্লাহর ইবাদত ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজের প্রণালি শিক্ষা দিয়ে তাদের তা অনুসরণ এবং সৎ ও মহৎ জীবনযাপনের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। মোট ১০৪টি আসমানি কিতাবের মধ্যে প্রধান চারটি হলো তওরাত, জবুর, ইঞ্জিল ও পবিত্র কোরআন। হজরত মুসা (আ.)-কে তওরাত, হজরত দাউদ (আ.)-কে জবুর, হজরত ঈসা (আ.)-কে ইঞ্জিল ও শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-কে পবিত্র কোরআন দান করা হয়। অবশিষ্ট সহিফাগুলো হজরত আদম (আ.), হজরত শিস (আ.), হজরত ইদ্রিস (আ.) ও হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর ওপর নাজিল হয়। যে নবীরা কোনো কিতাব বা সহিফা পাননি তাঁরা পূর্ববর্তী কিতাব বা সহিফার সাহায্যে তাঁদের উম্মতদের হিদায়েত করেছেন।

**কিতাবুল খারাজ** ইমাম আবু হানিফার শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ রচিত ফিকাহশাস্ত্র। ৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ। রাজস্ব-সম্বন্ধীয় সমস্যাবলি ও তার সমাধানই এই শাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়। সেকালে এটিই ছিল এ বিষয়ে একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর শিক্ষক ইমাম আবু হানিফার শিক্ষাকেই মূলত এতে লিপিবদ্ধ করেন। জমির স্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে খাজনার হারে পরিবর্তন ঘটতে পারে, ইসলামি শরিয়ত অনুসারে তার বিস্তারিত বিবরণ এই শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

**কিথিটো** তাবিজ। ওয়াকামবা আদিবাসীরা তাদের শপথ অনুষ্ঠানে এই কিথিটো ব্যবহার করে। তাদের বিশ্বাস, এ তাবিজ ব্যবহারের ফলে তাদের ভবিষ্যৎ দিনগুলো সুন্দর কাটবে।

**কিবলা** মুসলমানরা যেদিকে মুখ করে নামাজ পড়েন। মদিনায় প্রথম দুই বছর মুসলমানরা জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তেন।

পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারা-র ১৪২-৪৫ আয়াতে আল্লাহর কাবা ঘরের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার নির্দেশ আসে। কোরবানির জন্তুকে এবং দাফন করার সময় মৃত ব্যক্তিকে কিবলামুখী করা হয়। কিবলার মর্যাদা রক্ষা করতে সেদিকে প্রস্রাব-পায়খানা করা এবং শয়নকালে পা লম্বা করাও নিষিদ্ধ। প্রতিবার নামাজের সময় কিবলা ঠিক করা বিধেয়। প্রত্যেক মসজিদে মিহরাবের অবস্থান কিবলামুখী। কাবা শরিফের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার নির্দেশ আসে মদিনার যে মসজিদে সেই মসজিদটি মসজিদুল কিবলাতায়েন অর্থাৎ দুই কিবলার মসজিদ বলে খ্যাত।

**কিম্যারা** লিসিয়ার (প্রাচীন এশিয়া মাইনর) অতিকায় দানব। তাঁর মাথা ছিল সিংহের, দেহ ছাগলের এবং লেজ সাপের। তাঁর মুখ থেকে সব সময় আগুন বেরোত। তিনি গ্রিক বীর বেলেরোফোনদের দ্বারা নিহত হন।

**কিয়ামত,** ইসলামি মতে মহাপ্রলয়ের দিন। পৃথিবীর অন্তিম দিন। পুনরুত্থান দিবস। বাইবেলের সেন্ট মার্ক ১৩ : ৩২-এ বলা হয়েছে পিতা ছাড়া সেই দিন এবং সেই সময়ের কথা কেউ জানে না, যাঁরা স্বর্গে আছেন সেই ফেরেশতারাও না, ঈশ্বরপুত্রও না। দিনটি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সুরা নজম-এর ৪৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'পুনরুত্থান ঘটানোর দায়িত্ব তাঁরই।' সুরা কিয়ামা-র ৬-৯ আয়াতে বলা হয়েছে, 'মানুষ প্রশ্ন করে, কবে কিয়ামতের দিন আসবে? যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে।' সুরা আ'রাফ-এর ১৮৭ আয়াতে বলা হয়েছে; 'তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, সেই সময় কখন আসবে? বলো, এ সম্বন্ধে কেবল আমার প্রতিপালকই জ্ঞাত আছেন। কেবল তিনিই যথাসময়ে তা প্রকাশ করবেন। সে হবে আকাশ ও পৃথিবীতে এক ভয়ংকর ঘটনা। হঠাৎ তা এসে পড়বে তোমাদের ওপর। তুমি এ বিষয়ে ভালোভাবে জানো এই ভেবে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বলো, এ সম্বন্ধে কেবল আমার প্রতিপালকই জানেন।' সুরা তাহা-র ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে, 'সময় ঠিকই আসবে। আমি এর কথা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করে।' সুরা আহজাব-এর ৬৩ আয়াতে বলা হয়েছে, 'লোকে তোমাকে সময় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলো, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। তুমি তা কী করে জানবে! হয়তো শীঘ্রই সময়টা এসে যেতে পারে।'

**কিরাত** পুরাণে উল্লেখিত আরণ্যক বা চণ্ডাল জাতি। শিকারই যাদের জীবনধারণের উপায়। মহাভারত, রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে এদের উল্লেখ আছে। রামায়ণে কিরাতদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, এরা দ্বীপবাসী, অদগ্ধ মাংস ভক্ষণ করে। মনুস্মৃতিমতে, তারা ছিল প্রথমে ক্ষত্রিয়; কিন্তু ব্রাহ্মণদের সংস্পর্শে না আসায় এবং ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি ও ক্রিয়াকাণ্ড পরিত্যাগ করায় পরিণামে শূদ্র শ্রেণীতে পতিত হয়। পৌণ্ডরকদের ভাগ্যেও একই দুর্গতি ঘটে।

**কিরা'আত, কেরাত** অর্থ পাঠ। পবিত্র কোরআন পাঠকে কিরা'আত বলা হয়। পবিত্র কোরআন ও কিরা'আত একই ধাতু থেকে উৎপন্ন। নামাজের সময় দণ্ডায়মান অবস্থায় যে সুরা ফাতিহা ও পবিত্র কোরআনের অংশবিশেষ পাঠ করা হয় তাকে কিরা'আত বলে। বিশুদ্ধভাবে ও সুমিষ্ট স্বরে পবিত্র কোরআন পাঠকেও কিরা'আত বা কেরাত বলা হয়। কিরা'আতের সাতটি রীতি। পবিত্র কোরআন কণ্ঠস্থ করার মতো সুললিত কণ্ঠে তা পাঠকেও মুসলমানরা প্রশংসনীয় কাজ বলে গণ্য করেন। হস্তলিপির উৎকর্ষের অনুরূপ পবিত্র কোরআন পাঠেও মুসলমানরা উৎকর্ষ অর্জন করেন। বিশুদ্ধ উচ্চারণে ও সঠিকভাবে যিনি পবিত্র কোরআন পাঠ করেন তাঁকে 'কারি' বলা হয়।

**কিরামুন-কাতিবুন** অর্থ মহান লেখকগণ। দুই ফেরেশতা, যাঁরা প্রতিটি মানুষের বাক্য ও আচরণ লিপিবদ্ধ করে রাখেন। পবিত্র কোরআনে 'কিরামান কাতিবিন' বলে এঁদের উল্লেখ আছে। প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলমান জানেন যে তাঁর দুই কাঁধে সব সময় দুই ফেরেশতা বসে আছেন। যাঁদের মধ্যে ডান কাঁধেরটি অনবরত পুণ্যের আর বাঁ কাঁধের ফেরেশতা হিসাব লিখে চলেছেন। তাঁদের লিখিত বিবরণীকে 'আমলনামা' বলা হয়, যা শেষ বিচারের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রদান করা

হবে। সৎ লোকের ডান হাতে এবং অসৎ লোকের বাঁ হাতে ওই আমলনামা থাকবে।

**কিশোরীভজন** সিলেট জেলার একটি বৈষ্ণব লোকসম্প্রদায়। তাঁরা শুদ্ধ বৈষ্ণব মতের বিরোধী এবং সহজিয়া মতের অনুসারী। তাঁরা আখড়ায় কিশোরীদের সান্নিধ্যে রামকৃষ্ণ জ্ঞানে নাচ-গান করেন। তাঁদের গানগুলো রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাবিষয়ক। সম্প্রদায়ের পুরুষদের প্রত্যেকেরই সাধনসঙ্গিনী থাকেন এবং তিনিই তার প্রেমশিক্ষার গুরু। নাম, মন্ত্র, ভাব, প্রেম ও রস—এই পঞ্চরসের মধ্যে প্রেম ও রসই তাঁদের কাছে প্রাধান্য পায়।

**কিসসা** আরবি 'কিসসা' শব্দের অর্থ কাহিনি বা গল্প। আরবি, ফারসি ও উর্দু-মিশ্রিত ভাষায় রচিত লোককাহিনি। কিসসা-সাহিত্য পদ্যে বা গদ্যে লিখিত। পুঁথিসাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু ছিল এসব কিসসা। এর বিষয়বস্তু প্রেম, যুদ্ধ, বীরত্ব ও ধর্ম। অষ্টাদশ শতকের শেষাংশে বাংলা দেশে কিসসা-কাহিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিংশ শতকের প্রথম ভাগে এসে এর চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তার পরও অনেক দিন কলকাতার বটতলা প্রকাশনা শিল্পের একটি প্রধান অবলম্বন ছিল কিসসা-সাহিত্য। দোভাষী বা মিশ্র ভাষার জনপ্রিয় কিসসা-কাহিনিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: *মধুমালতী, ইউসুফ-জুলেখা, শিরি-ফরহাদ, লায়লী-মজনু, গুলে বকাওলি, তুতিনামা, সখি সোনা, হাতেমতাই, গুলে তরমুজ, আমির হামজা, জঙ্গনামা* এবং *আলেফলায়লা ওয়া লায়লা*। আর এগুলোর প্রধান লেখক ছিলেন দৌলত কাজী, সৈয়দ হামজা, শাহ গরীবুল্লাহ, রওশন আলী, নাসের আলী প্রমুখ। মীর মশাররফ হোসেন পদ্যে রচিত কিসসা-সাহিত্য অবলম্বনেই তাঁর বিখ্যাত *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসটি রচনা করেন।

**কিসাস** আরবি শব্দ, যার অর্থ প্রতিবিধান। হত্যার শাস্তি হিসেবে প্রাণদণ্ড অর্থাৎ প্রাণের বদলে প্রাণ, ইসলামি শরিয়তের এই বিধান। মানবজীবন আল্লাহর এক বিশেষ দান। এর সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রতিটি মানুষের। এই দায়িত্ব পালন না করে যদি কেউ মানুষ হত্যা করে, তবে ঘাতককেও তার জন্য মৃত্যুর শাস্তি ভোগ করতে হবে। শরিয়তের ভাষায় এরই নাম কিসাস। পবিত্র কোরআনে সুরা বাকারা-র ১৭৯ আয়াতে বলা হয়েছে: 'হে বোধসম্পন্ন মানুষগণ! তোমাদের জন্য কিসাসে প্রকৃত জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো।' অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডের ভয়েই অনেকে হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে। একজন স্বাধীন পুরুষকে হত্যার জন্য একজন স্বাধীন পুরুষকে কিসাস অর্থাৎ প্রাণদণ্ড ভোগ করতে হয়, একইভাবে নারীর বদলে নারী এবং দাসের স্থলে দাসকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হয়। নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশকে (উত্তরাধিকারী) যদি কিসাসের পরিবর্তে আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণে সম্মত করা যায়, তবে তার বিনিময়ে ঘাতকের প্রাণ রক্ষা পেতে পারে, এমন বিধানও ইসলামে আছে। ইসলামি পরিভাষায় একে 'দিয়া' বলা হয়। ঘাতক নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরই আদালত কিসাসের আদেশ দান করেন। যদি কিসাস (মৃত্যুদণ্ড) বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই ঘাতকের মৃত্যু হয়, তবে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের মতে, ঘাতকের ওপর সমস্ত দাবি রহিত হয়ে যাবে; কিন্তু ইমাম শাফি এবং ইমাম আহমদ ইবনে হামবলের মতে, নিহত ব্যক্তির তরফ থেকে তার পরও মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ দাবির অধিকার থাকবে।

**কীচক** মহাভারত অনুসারে কেকয়রাজের পুত্র, মৎস্যরাজ বিরাটের সেনাপতি ও বিরাটপত্নী সুদেষ্ণার ভাই। ছদ্মবেশী পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে সৈরিন্ধ্রী ছদ্মনামে পরিচিতা দ্রৌপদীকে রূপমুগ্ধ কীচক বিয়ে করতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। এতে তিনি সর্বসমক্ষে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে তাঁকে পদাঘাত করেন। ভীমের পরামর্শে দ্রৌপদী কীচককে রাতে নাট্যশালায় যেতে সংকেত দেন। সেখানে স্ত্রীবেশধারী ভীম কীচককে বধ করেন। হত্যার পর ভীম কীচকের হাত-পা-মাথা সব দেহের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁকে একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত করেন।

**কীর্তন** রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গান। বাংলা সংগীতের আদি ধারায় ঈশ্বরসাধনার একটি সহজ উপায় হিসেবে এর উদ্ভব। কীর্তন দুই প্রকার—নামকীর্তন বা নামসংকীর্তন এবং লীলাকীর্তন বা

রসকীর্তন। হরি বা বিষ্ণুকে উদ্দেশ করে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'—এই ষোড়শ পদবিশিষ্ট কীর্তন হলো নামকীর্তন। এই বোল ছাড়া নামকীর্তনের অন্য বোলও আছে। রাধাকৃষ্ণ এবং গোপী-শ্রীকৃষ্ণের কাহিনিভিত্তিক যে পালাগান, তাকে বলা হয় লীলাকীর্তন। জয়দেবের *গীতগোবিন্দই* কীর্তন গানের আদি উৎস। তবে বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* থেকেই বাংলায় কীর্তন সংগীতধারার বিকাশ ঘটে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতিও ব্রজবুলিতে কীর্তনাঙ্গের বৈষ্ণবপদ রচনা করেন। পঞ্চদশ শতকে শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরসাধনার সহজতম পন্থা হিসেবে কীর্তনকে বেছে নেন।

চৈতন্য-পরবর্তীকালে লীলাকীর্তন পাঁচটি ধারা বা ঘরানায় বিকশিত হয়। উৎপত্তিস্থানের নামানুসারে এসব ধারার নামকরণ করা হয়। কীর্তনে ৬৩ প্রকার রসের উল্লেখ আছে। সাধারণত দাঁড়িয়ে অথবা নৃত্য-সহযোগে কীর্তন পরিবেশিত হয়, তবে বৈঠকি রীতিতে কীর্তন পরিবেশনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে এই গানে শ্রীখোল ও করতালের ব্যবহারই সর্বাধিক। আধুনিক বাংলা গানে কীর্তনের মৌলিক সুর ও ভাব সংযোজনের প্রবণতা লক্ষণীয়।

**কুকসু পূজা** উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত পূজাবিশেষ। এই পূজার শুরুতে তরুণরা কুকসু কিংবা অন্যান্য দেবতা এবং ভূতের বেশ ধারণ করে।

**কুকুলক্যান** আমেরিকার মায়া আদিবাসীদের একজন দেবতার নাম। অর্থ 'সুশোভিত শয়তান'। স্বভাবে দুষ্টু দেবতা। আজটেকদের Quetzalcoatl দেবতার সমতুল্য।

**কুক্কুরপাদ** বা **কুক্কুরিপাদ** প্রধান বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম; আবি. আনু. দশম-দ্বাদশ শতাব্দী। তিব্বতীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী তিনি বাংলার, মতান্তরে কপিলাবস্তুর ব্রাহ্মণ। তিনি 'ডাকিনী দেশ' থেকে মন্ত্রযান (হেরুকসাধন) ও অন্যান্য তন্ত্রমন্ত্র এনে তিব্বতে তা প্রচার করেন। তাঁর রচিত ছয়টি তান্ত্রিক গ্রন্থের মধ্যে তিনটি মহামায়া সমাজসংক্রান্ত। *চর্যাচর্য বিনিশ্চয়* (চর্যাপদ) গ্রন্থে তাঁর দুটি বাংলা দোহা আছে।

**কুতুব** সুফি দরবেশদের প্রধান।

**কুতুবশাহি মসজিদ** বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার আদিনায় অবস্থিত মসজিদ। স্থাপত্যকীর্তির জন্য বিখ্যাত। সুফি সাধক নুর-কুতুব আলমের জনৈক বংশধর ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। জনৈক দরবেশের কবর এবং একলাখি সমাধিসৌধের মাঝখানে এটি নির্মিত। মসজিদের উপকরণ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ অংশে ইট এবং বাইরের দিকে সাধারণ পাথরখণ্ড। আকার-আকৃতির দিক থেকে এটি গৌড়-লক্ষ্মণাবতীর বড় সোনা মসজিদের প্রায় অনুরূপ। প্রধান মিহরাবের উত্তর পাশে একটি উঁচু গম্বুজ আছে যা আদিনা মসজিদের হুবহু অনুরূপ। গৌড়-লক্ষ্মণাবতীর বড় ও ছোট সোনা মসজিদের মতো এর গম্বুজগুলো গিলটি করা ছিল।

**কুন্তি** মহাভারতে উল্লেখিত পাণ্ডবজননী। রাজা শূরের কন্যা বসুদেবের বোন। আসল নাম পৃথা। তাঁর পালক পিতা কুন্তিভোজ-এর নামানুসারে তাঁর নাম কুন্তি। পাণ্ডু-রাজা তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এই পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম। সূর্যের বরে তাঁর কানীনপুত্র কর্ণের জন্ম হয়। তিনি মনস্বিনী নারী; দৃঢ়চরিত্রা, তেজস্বিনী ও আদর্শ জননী।

**কুফর** এক আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাস, তাঁর অসংখ্য নিয়ামত অস্বীকার এবং তাঁর নবী-রাসুল, ফেরেশতা ও আসমানি কিতাবগুলোকে অমান্য করার নাম কুফর। ইসলামে কুফরকে সবচেয়ে বড় পাপ বলে গণ্য করা হয়। পবিত্র কোরআনে কাফিরদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

**কুব্বাতুল শাখরাস** জেরুজালেমের মোরিয়া পাহাড়ের ওপর অবস্থিত প্রাচীন মসজিদ। Dome of the Rock বা গিরিগম্বুজ নামে খ্যাত। ৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক এটি নির্মাণ করেন। মসজিদটির দক্ষিণে রয়েছে খলিফা আবদুল মালেক নির্মিত আল-আকসাহ মসজিদ।

**কুবা** মসজিদ। মদিনা শরিফ থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত মসজিদটির নির্মাণকার্যে সবার সঙ্গে

মহানবী (সা.) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন। হজরত কুলসুম (রা.)-এর নিজস্ব এক খণ্ড জমিতে মসজিদটি নির্মিত হয়। পবিত্র কোরআনের সুরা তওবায় এই মসজিদের উল্লেখ আছে।

**কুমারজীব** ভারতীয় পণ্ডিত। জন্ম মধ্য-এশিয়ার কুচা নগরে। তরুণ বয়সে কাশ্মীরে এসে তিনি ভারতীয় শাস্ত্রগুলো অধ্যয়ন করেন। প্রথমে তিনি হীনযান ও পরে মহাযান-মতাবলম্বী হন। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে চীন সম্রাটের আক্রমণে কুচা নগরের পতন ঘটলে কুমারজীব বন্দী হিসেবে চীনে নীত হন। সেখানে একজন অনুবাদক হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। পরে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে তাঁকে চীনের শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে নিয়োগ করা হয়। তিনি *বিনয়, ব্রহ্মজালসূত্র, বজ্রচ্ছেদিকা, প্রজ্ঞাপারমিতা* প্রভৃতি প্রায় ৫০টি ভারতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর কয়েক হাজার চীনা ছাত্র ছিল। ৪০৫ খ্রিষ্টাব্দে চীন সম্রাটের আদেশে ও প্রায় ৮০০ বৌদ্ধ ভিক্ষুর সহায়তায় তিনি সংস্কৃত থেকে *প্রজ্ঞাপারমিতা* ও *দশভূমীশ্বর* চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।

**কুমারী পূজা** কুমারী মেয়ের পূজা। অনধিক ১৬ বছরের অরজঃস্বলা কুমারীকে দেবীর প্রতীক জ্ঞানে পূজা করা হয়। দুর্গাপূজার অঙ্গরূপে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কালীপূজা জগদ্ধাত্রীপূজা ও অন্নপূর্ণাপূজা উপলক্ষেও কুমারী পূজার প্রচলন আছে। শাস্ত্রমতে, কোলাসুরকে বধ করার পর থেকে কুমারী পূজার উদ্ভব হয়। কোলাসুর একসময় স্বর্গ-মর্ত অধিকার করলে বিপন্ন দেবতারা উদ্ধার-কামনায় মহাকালীর শরণাপন্ন হন। তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে দেবী পুনর্জন্মে কুমারীরূপে কোলাসুরকে বধ করেন। সে থেকেই মর্তে কুমারী পূজার প্রচলন হয়। ১ থেকে ১৬ বছর বয়সী যেকোনো কুমারীকেই পূজা করা যায়। তবে ব্রাহ্মণ কুমারীর পূজাই অধিক প্রচলিত। কুমারী মেয়েকে মনে করা হয় সর্ববিদ্যাস্বরূপিণী। কুমারী পূজার পেছনে যে দার্শনিক তত্ত্বটি কাজ করে, তা হলো নারীতে পরমার্থ দর্শন ও পরমার্থ লাভ। কুমারী এখানে প্রকৃতি বা নারী জাতির প্রতীক বা বীজাবস্থা। বয়সের ক্রমানুসারে পূজাকালে কুমারীদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন এক বছরের কন্যা সন্ধ্যা, দুই বছরের সরস্বতী, তিন বছরের ত্রিধামূর্তি, চার বছরের কালিকা, পাঁচ বছরের সুভগা, ছয় বছরের উমা, সাত বছরের মালিনী, আট বছরের কুব্জিকা, নয় বছরের কালসন্দর্ভা, দশ বছরের অপরাজিতা, এগারো বছরের রুদ্রাণী, বারো বছরের ভৈরবী, তেরো বছরের মহালক্ষ্মী, চৌদ্দ বছরের পীঠনায়িকা, পনেরো বছরের ক্ষেত্রজ্ঞা এবং ষোলো বছরের অন্নদা বা অম্বিকা। এ পূজায় পূজারি বা সাধকের কাছে কুমারী বিশ্বজননীর রূপ নিয়ে প্রতিভাত হন। তাঁর কাছে নারী ভোগ্যা নয়, পূজ্য।

**কুরু** মহাভারত অনুসারে চন্দ্রবংশীয় রাজা। সূর্যকন্যা তপতী ও মহারাজ সংবরণের পুত্র। কুরুজাঙ্গল নামক স্থানে দীর্ঘদিন তপস্যা করায় তিনি কুরু ও তপস্যাক্ষেত্রটি কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর নামানুসারে তাঁর বংশের নামকরণ হয় কৌরব। তাঁর পাঁচ পুত্র : অবিষ্যন্ত বা অবিষ্যৎ, অবিক্ষিত, চৈত্ররথ, জন্মেজয় ও মনু। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই তাঁর বংশধর। যদিও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পটভূমিতে দুর্যোধন-দুঃশাসন প্রমুখই কৌরব এবং তাঁদের পক্ষই কৌরবপক্ষ নামে পরিচিতি লাভ করে।

**কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ** ভারতীয় পুরাণোক্ত মহাযুদ্ধ। এ যুদ্ধের কাহিনি নিয়েই বিখ্যাত মহাকাব্য মহাভারত রচিত হয়। ঐতিহাসিকেরা ভারতের বর্তমান হরিয়ানা রাজ্যের করনাল জিলার থানেশ্বরের নিকটবর্তী স্থানকে কুরুক্ষেত্র বলে স্থির করেছেন। হস্তিনাপুরের সিংহাসন নিয়ে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন প্রমুখ পাঁচ পাণ্ডবপুত্র এবং দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রমুখ কৌরব-পুত্রদের মধ্যে বিরোধ থেকে এ যুদ্ধের সূত্রপাত। দুর্যোধনের 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' উক্তি থেকেই এ মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। পুরাণমতে, তৎকালীন ভারতবর্ষের সব রাজাই এ যুদ্ধে কোনো-না-কোনো পক্ষে যোগদান করেন। এই যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের প্রধান যোদ্ধারা ছিলেন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল এবং তাঁদের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। অন্যদিকে কৌরবপক্ষে ছিলেন কর্ণ, দ্রোণাচার্য,

ভীষ্ম, কৃপাচার্য, দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রমুখ। ১৮ দিনব্যাপী এ মহাযুদ্ধে প্রতিদিন লাখ লাখ যোদ্ধা নিহত হয়। যুদ্ধ শেষে মাত্র ১০ জন যোদ্ধা জীবিত ছিলেন। পাণ্ডবপক্ষে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও শ্রীকৃষ্ণ। কৌরবপক্ষে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা এবং অশ্বত্থামা।

**কুলখানি** মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক মঙ্গল কামনায় দোয়া অনুষ্ঠান। এটি বিধিবদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, তবে উপমহাদেশে বহুকাল থেকেই এই অনুষ্ঠানটির প্রচলন রয়েছে। সাধারণত মৃত ব্যক্তির দাফনের চতুর্থ দিনে এই অনুষ্ঠান হয়। এতে মৃতের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সমবেত হয়ে দোয়া-দরুদ পাঠ করেন। সাধারণত স্থানীয় মসজিদের ইমাম অথবা মৃতের কোনো প্রিয় ব্যক্তির পরিচালনায় মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমাম পারলৌকিক জীবনের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে বক্তব্য দেন। কোনো কোনো ইমাম আজরাইলের (আ.) আগমন ও কবরের আজাব (শাস্তি) সম্বন্ধেও বর্ণনা দেন। মৃত ব্যক্তির সৎকর্ম সম্বন্ধেও বক্তব্য দেওয়া হয়। দরুদ পাঠ শেষে জীবিত ও মৃতদের কল্যাণ কামনা করে দোয়া করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে তবররক বিতরণ করা হয়। সচরাচর মৃত ব্যক্তির বাড়িতেই কুলখানি অনুষ্ঠিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় মসজিদ, যেখানে মৃত ব্যক্তি জুমার নামাজ আদায় করতেন কিংবা তাঁর পরিবার যে মসজিদটিতে ইচ্ছা করেন, সেখানেও কুলখানি অনুষ্ঠিত হয়।

**কুলজি** কুল বা বংশের ইতিহাস। শব্দটির উদ্ভব সংস্কৃত 'কুলপঞ্জি' থেকে। এতে হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি বর্ণের ইতিহাস, তাদের শাখা-প্রশাখা ও পরিবারগুলোর বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত থাকে। কুলজির বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ, ভোজ্যান্নতা প্রভৃতি নির্ধারিত হয়। তাই একে কুলশাস্ত্রও বলা হয়। তৎকালীন বাংলা দেশের ধর্মীয়-সামাজিক পটভূমিতে ষোড়শ শতকে কুলজি-সাহিত্যের উদ্ভব। যদিও অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকেই অধিকাংশ কুলজিগ্রন্থ রচিত হয়। এ সময়ই, বিশেষ করে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে কুলজিগ্রন্থ-নির্ভর কৌলীন্যপ্রথা দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। বিয়ের সম্বন্ধ করার ক্ষেত্রে ঘটকদের জন্য কুলজিগ্রন্থ অপরিহার্য ছিল। বাংলায় বিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কুলজিগ্রন্থের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

**কুশলকর্ম** বৌদ্ধমতে জীবনযাপনের মহৎ পথ বা উপায়। কুশলকর্ম ১০ প্রকার। এর মধ্যে কিছু হলো কায়িক, কিছু বাচনিক ও কিছু মানসিক। কায়িক কুশলকর্ম তিনটি: প্রাণীহত্যা, চুরি বা ব্যভিচার না করা। বাচনিক কুশলকর্ম চারটি: মিথ্যা কথা, কর্কশ বাক্য, ভেদবাক্য ও বৃথাবাক্য না বলা। মানসিক কুশল তিনটি: অলাভ, অদ্বেষ ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া। ইহকাল-পরকাল, কর্ম-কর্মফল ও চতুরার্থ সত্য বিশ্বাস করে কুশলকর্ম করাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে কুশলকর্ম সম্পাদন করা বোঝায়। সংক্ষেপে কুশলকর্ম হচ্ছে শীল-শ্রদ্ধা-বীর্য-স্মৃতি-সমাধি।

**কুশিক** মহাভারতে বর্ণিত মহর্ষি বিশ্বামিত্র এবং রাজা গাধির পিতা। মহর্ষি চ্যবন একদা জানতে পারেন যে কুশিক বংশ থেকে ক্ষত্রিয়ত্ব তাঁর বংশে সঞ্চারিত হবে, যা কোনোমতেই তাঁর কাছে কাম্য নয়। চ্যবন তাই কুশিকের বংশ বিলোপের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা শেষাবধি ব্যর্থ হয়। অতঃপর কুশিক-বংশীয় গাধিরাজের কন্যা সত্যবতীর সঙ্গে চ্যবন-বংশীয় ঋচিক মুনির বিয়ে হয়। ঋচিকের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে মহর্ষি জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন। এই জমদগ্নিরই পুত্র পরশুরাম।

**কূর্ম** বিষ্ণুর দ্বিতীয় মতান্তরে একাদশ অবতার। প্লাবনে নিমজ্জিত পৃথিবীর সবকিছু উদ্ধারের জন্য সত্যযুগে বিষ্ণু কূর্ম অর্থাৎ কচ্ছপরূপে অবতীর্ণ হন। তিনি নিজেকে ক্ষীরসাগরের নিচে স্থাপন করে মন্দার পর্বতকে পৃষ্ঠদেশে ধারণ করেন। অনন্তনাগ বাসুকীকে রজ্জু করে দেবতা ও দানবরা মন্দার পর্বতের সাহায্যে সমুদ্রকে মন্থন করলে অমৃতসহ অনেক ধনসম্পদ উঠে আসে। এভাবে বিষ্ণু কূর্মরূপ ধারণ করে পৃথিবীকে রক্ষা করেন।

**কূর্মপুরাণ** কূর্মাবতার-বিষয়ক পুরাণ।

**কৃতবর্মা** মহাভারতে বর্ণিত কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধা। পাণ্ডব বীরদের যখন অশ্বত্থামা হত্যা করেন,

কৃতবর্মা তখন কৃপাচার্যের সঙ্গে শিবিরের দ্বার রক্ষা করছিলেন। অভিমন্যু বধের সপ্তরথীর তিনি একজন। পরে যদুবংশ ধ্বংসের সময় সাত্যকি কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ করেন।

**কৃতবীর্য** মহাভারতে উল্লেখিত চন্দ্রবংশীয় রাজা কনকের পুত্র। কনকের অপর তিন পুত্র ছিলেন যথাক্রমে কৃতমৌজা, কৃতবর্ম ও কৃতাগ্নি। এর মধ্যে কৃতবীর্য ছিলেন অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল। তিনি মহর্ষি জমদগ্নিকে বধ করেন। এর প্রতিশোধ নিতে জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম কৃতবীর্যের পুত্র কার্তবীর্যার্জুনসহ তাঁর বংশের অনেককে বধ করেন।

**কৃত্তিকা** হিন্দু পুরাণমতে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী ছাড়া বাকি ছয়জন ঋষির পত্নীরা কৃত্তিকা নামে পরিচিত। একদা গঙ্গাস্নানের পর তাঁরা অগ্নি পান করেন এবং তাতেই গর্ভবতী হন। পরে তাঁরা অগ্নির তেজ হিমালয় পর্বতে পরিত্যাগ করেন। সেই পুঞ্জীভূত তেজ থেকে কুমার কার্তিকেয়র জন্ম হয়। দক্ষের ৬০ জন কন্যার মধ্যে কৃত্তিকাসহ ৩৭ জন চন্দ্রের স্ত্রী ছিলেন বলে কালিকাপুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মার ঔরসে সাবিত্রীর গর্ভে কৃত্তিকাসহ ছয়জনের জন্ম।

**কৃত্তিবাস ওঝা (উপাধ্যায়)** রামায়ণের অনুবাদক। মধ্যযুগের জনপ্রিয় রামায়ণ পাঁচালিকার। জন্ম নদীয়ার ফুলিয়া গ্রামে। তাঁর পিতামহের নাম মুরারি ওঝা, পিতার নাম বনমালী ও মায়ের নাম মালিনী। ১২ বছর বয়সে কবি 'বড় গঙ্গা' বা পদ্মা নদী পার হয়ে বরেন্দ্রভূমিতে বিদ্যার্জন করতে যান এবং বিদ্যা লাভ শেষে গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হন। তিনি সম্ভবত দনুজমর্দনদেবের সভাকবির মর্যাদা লাভ করেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণের স্বচ্ছন্দ বঙ্গানুবাদ করেন। লোকপ্রিয়তা কবিপ্রতিভা বিচারের মানদণ্ড হলে কৃত্তিবাস বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি।

**কৃত্যতত্ত্ব** পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ শতকের বিখ্যাত স্মৃতিকার রঘুনন্দন রচিত একটি স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এতে বৈশাখ থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত সমস্ত কৃত্যের আলোচনা আছে। সেই সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি ব্রতও আলোচিত হয়েছে।

**কৃপাদিবস বা রোগেশন ডেজ** রোমান ক্যাথলিক ধর্মে প্রভুর করুণা ভিক্ষার জন্য চারটি দিন নির্দিষ্ট আছে। এই দিনগুলোতে বিশেষ শোভাযাত্রা বের করা হয়। প্রধান কৃপাদিবস বা রোগেশনের জন্য ২৫ এপ্রিল, অপ্রধান কৃপাদিবস বা মাইনর রোগেশনের জন্য 'অ্যাসেনশন ডে'-এর আগের তিন দিন। এ উপলক্ষে যে শোভাযাত্রা হয় তা রোমীয় পৌত্তলিক প্রথার খ্রিষ্টীয় সংস্করণ।

**কৃষ্ণ** বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। তাঁকে স্বয়ং ভগবান এবং বিষ্ণুর পূর্ণাবতারও মনে করা হয়। গীতায় বলা হয়েছে যে, অধর্ম ও দুর্জনের বিনাশ এবং ধর্ম ও সজ্জনের রক্ষার জন্য যুগে যুগে পৃথিবীতে তাঁর আগমন ঘটে। পৃথিবীর ভারমোচন তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব হলেও একজন মর্তজীবী মানুষ হিসেবে রাজনীতি, সমাজ, সংসার ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তাঁকে কর্তব্য পালন করতে দেখা যায়।

কৃষ্ণের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে। ঋগ্‌বেদে একাধিকবার কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। সেখানে তিনি ইন্দ্রবিরোধী একজন অনার্য যোদ্ধা হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন। কোথাও তাঁকে ঋষি এমনকি অসুরও বলা হয়েছে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ এবং কৌষিতকীব্রাহ্মণে কৃষ্ণকে দেবকীপুত্র বলা হয়েছে। তাঁর গুরু ছিলেন ঘোর-আঙ্গিরস। কারও কারও মতে, এই কৃষ্ণই পৌরাণিক যুগে বাসুদেব কৃষ্ণে পরিণত হয়েছেন। মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং বৈষ্ণবকাব্যে যে কৃষ্ণের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে তাঁর আবির্ভাব দ্বাপর যুগে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে মামা কংসের কারাগারে ভাদ্র মাসের অষ্টমী তিথিতে কৃষ্ণের জন্ম। এই দিনটি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের দ্বারা জন্মাষ্টমী নামে পালিত হয়। কৃষ্ণকে কেউ কেউ অনার্য দেবতা বলেও মনে করেন। তাঁদের মতে, আদিম জনগোষ্ঠীর উপাস্য এই দেবতা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। আবার তাঁকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মমত প্রবর্তিত হয়। কৃষ্ণ কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র কি না, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন তাঁর বাস্তব বা মানবীয় অস্তিত্ব ছিল না। আবার কারও কারও

মতে, তিনি একজন আদর্শচরিত্র ঐতিহাসিক পুরুষ, ধর্মপ্রবক্তা ও সংস্কারক ছিলেন। কালক্রমে ভক্তরা তাঁকে দেবতা, এমনকি ভগবানের পর্যায়ে উন্নীত করে। তাঁকে 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ' বলেও সম্বোধন করা হয়।

কৃষ্ণ চরিত্রটি একই সঙ্গে চমকপ্রদ ও বৈচিত্র্যময়। বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনি থেকে তাঁর তিনটি প্রধান রূপ লক্ষ করা যায়: পরোপকারী, প্রেমিক ও রাজনীতিজ্ঞ। শিশুবয়সেই কৃষ্ণের পরোপকারী ভূমিকাটির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম জীবনেই কৃষ্ণ যে কাজগুলো করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কংসবধ। অত্যাচারী কংস ছিলেন মথুরার রাজা। তিনি নিজের পিতা উগ্রসেনকে কারাগারে আটক রেখে সিংহাসন অধিকার করেন। এমনকি ভবিষ্যদ্বাণীতে কৃষ্ণ তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে জেনে তিনি নিজের বোন-ভগ্নিপতি অর্থাৎ কৃষ্ণের মাতা-পিতা দেবকী ও বসুদেবকেও কারাগারে আটক এবং তাঁদের সন্তানদের হত্যা করেন। কংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য জন্মের পরই পিতা বসুদেব তাঁকে গোকুলে নন্দ-যশোদার ঘরে রেখে আসেন। কংস সে কথা জানতে পেরে গোকুলের সব শিশুকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। কংসের নির্দেশে পূতনা রাক্ষসী তার বিষাক্ত স্তন্য পান করিয়ে একের পর এক শিশুদের হত্যা করতে থাকে। কিন্তু কৃষ্ণকে হত্যা করতে গেলে তাঁর হাতে পূতনা রাক্ষসী নিজেই নিহত হয়। এভাবে শিশু কৃষ্ণ গোকুলের শিশুদের রক্ষা করেন। এরপর একে একে তিনি বৎসাসুর, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি অপশক্তিকে বিনাশ করেন। এ ছাড়া কালীয়দহে কালীয় নাগ দমন, বৃন্দাবনকে রক্ষার জন্য দাবাগ্নি পান, ইন্দ্রের আক্রোশ থেকে গোপদের রক্ষার জন্য আঙুলে গোবর্ধনগিরি ধারণ ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি বালক বয়সেই মর্তবাসীর উপকার করেন। কৃষ্ণ মথুরায় এসে কংসকে হত্যা করে কৃষ্ণ তাঁর মাতামহ এবং পিতা-মাতাকে কারাগার থেকে উদ্ধার এবং মথুরায় শান্তি স্থাপন করেন। এভাবে অশুভ শক্তির হাত থেকে শুভ শক্তিকে রক্ষার জন্য কৃষ্ণ পরবর্তীকালে আরও অনেক দুরাচারীকে হত্যা করেন বা করান।

*হরিবংশপুরাণ,* শ্রীমদ্‌ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ একজন প্রেমিক, সখা এবং গোপীজনবল্লভরূপে চিত্রিত হয়েছেন। গোপনারীদের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক তার মধ্য দিয়ে ভারতীয় বেদান্তদর্শনের জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনতত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনই জীবের প্রধান লক্ষ্য বা চূড়ান্ত কাঙ্ক্ষিত বিষয়, যাকে মোক্ষ বলা হয়। আর কৃষ্ণই হলেন সেই পরমাত্মা। কৃষ্ণের সখাদের মধ্যে প্রধান হলেন অর্জুন, তিনি তাঁর আত্মীয়ও। এ ছাড়া তাঁর সখাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীদাম, সুদামা, উদ্ধব প্রমুখ। এঁদের সঙ্গে কৃষ্ণের আচরণ যেকোনো মর্তবাসী মানুষের মতোই।

মহাভারতে কৃষ্ণ একজন রাজনীতিক, যোদ্ধা, কূটনীতিক এবং দার্শনিকরূপে চিত্রিত হয়েছেন। পাণ্ডবদের পক্ষে তিনি দৌত্যক্রিয়া ও তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সুপারিশ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদের পরামর্শ দান ও শেষ পর্যন্ত তাঁদের বিজয়ী করা, দুর্যোধন প্রমুখ দুর্জনদের বিনাশ করে ধর্মকে প্রতিস্থাপন ইত্যাদি কাজ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি নিজে অস্ত্র ধারণ করেননি বটে, তবে পাণ্ডবদের পক্ষে মূলত তিনিই যুদ্ধ পরিচালনা করেন। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে কৃষ্ণ অর্জুনকে ক্ষাত্রধর্ম এবং আত্মা সম্পর্কে যেসব উপদেশ দিয়েছেন তা ভগবদ্‌গীতা নামে খ্যাত। দুষ্টের দমন ও অধর্মের বিনাশ করে তিনি জগদ্বাসীর কাছে শিষ্টের পালন ও ধর্ম প্রতিষ্ঠার নজির স্থাপন করেছেন। আপন যদুবংশে অনাচার দেখা দিলে তা-ও তিনি কঠোর হাতে দমন করেন। কৌশলে যদুবংশ ধ্বংস করেন। শেষে অবশ্য এক ব্যাধের শরাঘাতে তাঁকে ইহলীলা সংবরণ করতে হয়।

বাংলা সাহিত্য কৃষ্ণকাহিনির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। 'কানু বিনে গীত নাই' কথাটার প্রচলন তা থেকেই। জয়দেবের *গীতগোবিন্দম,* বড়ুচণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* এবং মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিদের রচিত পদাবলি সাহিত্যের এক বিরাট অংশ কৃষ্ণকাহিনি নিয়েই রচিত। পদাবলি কীর্তন, পালাগান, বিচ্ছেদি গান প্রভৃতিসহ বাংলা

লোকসংগীতের এক বড় অংশ রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-কাহিনিকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে।

**কৃষ্ণলীলা** শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সমস্ত ক্রিয়াকর্মই কৃষ্ণলীলা বলে পরিচিত। তাঁর প্রেম মাহাত্ম্যই বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের ভিত্তি। এই তত্ত্ব অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা ও শ্রীরাধিকা তাঁর হ্লাদিনী অংশ অর্থাৎ জীবাত্মার প্রতীক; যদিও অপেক্ষাকৃত হাল আমলের *সপ্তশতী* ভিন্ন কোনো প্রচীন গ্রন্থে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য পাহাড়পুরে প্রাপ্ত পাথরে খোদিত কৃষ্ণমূর্তির পার্শ্বস্থ নারীমূর্তিটি (ষষ্ঠ শতক) যদি রাধার হয়ে থাকে, তবে সেটাই বাংলায় রাধা আখ্যানের প্রাচীনতম নিদর্শন। কিন্তু ওই নারীমূর্তি রুক্মিণী বা সত্যভামার বলেও অনেকে অনুমান করেন। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব (দ্বাদশ শতক) রচিত *গীতগোবিন্দ* কাব্যে বর্ণিত রাধা-কৃষ্ণের আখ্যানই সম্ভবত প্রথম রাধাকৃষ্ণলীলা, যা বাংলা থেকে পরে সমগ্র ভারতে প্রচার লাভ করে।

**কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম আন্দোলন** কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমানদের ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলন। শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান ও খ্রিষ্টধর্মের ওপর কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমান এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারই এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। আন্দোলনকারীরা ইসলামি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। ১৯৩১ সালে ওয়ালেস ডি ফার্ড কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে এ আন্দোলনের সূত্রপাত। পরবর্তীকালে এলিজা মোহাম্মদ, ম্যালকম এক্স প্রমুখের নেতৃত্বে যা ব্যাপক প্রভাব এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ১৯৬০-এর দশকে এ আন্দোলন খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে নানা দল-উপদলে বিভক্ত হওয়ার পরও লুই ফারাখার নেতৃত্বে একটি শাখা বর্তমানে মূল নামটি বজায় রেখেছে।

**কেইন বা কাবিল** আদি মানব-মানবী আদম ও হাওয়ার পুত্র। অপর ভাই এবেল বা হাবিলকে হত্যা করে পৃথিবীর প্রথম নরহত্যাকারীরূপে নিন্দিত।

**কেতু** হিন্দু পুরাণের এক দানব। দানব বিপ্রচিত্তির ঔরসে ও সিংহিকার গর্ভে তার জন্ম। সমুদ্রমন্থনের সময় দেববেশ ধারণ করে দেবতাদের সঙ্গে অমৃত পান করতে গেলে চন্দ্র ও সূর্য তাকে চিনে ফেলে এবং বিষ্ণু তাঁর চক্র দ্বারা কেতুর দুই বাহু ও মস্তক ছেদন করেন। ছেদনের পর দানব কেতুর মস্তকের নাম হয় রাহু এবং দেহের নাম হয় কেতু। চন্দ্র-সূর্যের প্রতি আক্রোশবশত গ্রহণের সময় রাহু তাদের গ্রাস করে। হিন্দু শাস্ত্রমতে রাহু ও কেতু উভয়ই অশুভ গ্রহ।

**কেদারনাথ** শিবের অন্য নাম। এই নামের সঙ্গে জড়িত হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র। ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। হিমালয়ের তুষারাবৃত কেদারশৃঙ্গের নিচে উপত্যকায় অবস্থিত পাথরের মন্দির। আর্য ও দ্রাবিড় স্থাপত্যের অনুসরণে নির্মিত এই মন্দিরের ভেতরে রয়েছে কেদারনাথ বা শিবের মহিষরূপী বিগ্রহ। বলা হয়, মন্দিরটি পাণ্ডবদের তৈরি। কেদারনাথের কাছেই রয়েছে শঙ্করাচার্যের সমাধি। বলা হয়, মন্দিরটি পাণ্ডবদের নির্মিত এবং শঙ্করাচার্য এটি উদ্ধার করেন।

**কেনডোল** কোনো প্রতিজ্ঞাপূরণের মানসে বুদ্ধ বা দেবতার সম্মানে জ্বালানো লণ্ঠন।

**কেনান** ১. কেনানদের পূর্বপুরুষ। হামের (হাম দ্র.) বিপথগামী পুত্র। ২. প্যালেস্টাইন অধিকারের আগে ইসরাইলিরা দেশটিকে কেনান বলত। এটা তাদের প্রতিশ্রুত স্বদেশভূমি এবং মিসর পরিত্যাগ করার পর তাদের ভ্রাম্যমাণ জীবনের শেষ গন্তব্যস্থল।

**কেরামত** কারামত দ্র.

**কেরি, উইলিয়াম** (১৭৬১-১৮৩৪) খ্রিষ্টান মিশনারি। বাংলা গদ্যরীতির প্রবর্তনে তাঁর ভূমিকা ছিল পথিকৃতের। জন্ম ১৭৬১ সালের ১৭ আগস্ট ইংল্যান্ডের নর্দাম্পটনশায়ারে এক দরিদ্র পরিবারে। তাঁর কর্মজীবনের শুরু একজন চর্মকার হিসেবে। নিজের চেষ্টায় নানা ভাষাশিক্ষা ও নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। ১৭৯৩ সালে ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁকে ভারতে পাঠানো হয়। বাংলা দেশে এসে তিনি রামরাম বসুর কাছে বাংলা ভাষা শেখেন ও বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করেন। ১৮০০-এর জানুয়ারিতে তিনি শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রণ কাজের সূচনা করেন। কেরির নেতৃত্বে বিভিন্ন

ভারতীয় ভাষায় খ্রিষ্টীয় ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮০১ সালের ৪ মে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ও সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি হিন্দি, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু, মারাঠি ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ ছিলেন। কেরি ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ *আ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ, ইতিহাসমালা, বাংলা-ইংরেজি অভিধান,* চার খণ্ডে ওল্ড টেস্টামেন্ট বা *ধর্মপুস্তক, কথোপকথন* এবং *অ্যান ইউনিভার্সাল ডিকশনারি অব দি ওরিয়েন্টাল ল্যাংগুয়েজেস* নামক ভারতীয় ১৩টি ভাষার সমন্বিত শব্দকোষ রচনা করেন। এ ছাড়া তিনি মারাঠি, পাঞ্জাবি, কানাড়ি প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ এবং জোশুয়া মার্শম্যানের সঙ্গে মিলে মূল বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড পর্যন্ত ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮১৮ সালে তাঁর উদ্যোগে *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া* নামে একটি ইংরেজি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি শ্রীরামপুর মিশনের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। শ্রীরামপুরেই ১৮৩৪ সালের ৯ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**কেশবচন্দ্র সেন** ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও ঊনবিংশ শতকের বাংলার বিখ্যাত ধর্ম ও সমাজসংস্কারক। জন্ম কলকাতার এক বৈষ্ণব-পরিবারে ১৮৩৮ সালে। হিন্দু কলেজ এবং মেট্রোপলিটন কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটলে তিনি পুরোনো ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। কোচবিহারের হিন্দু মহারাজার সঙ্গে নিজ কন্যা সুনীতি দেবীর বিয়ে দেওয়ায় শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতারা তাঁকে পরিত্যাগ করে আলাদাভাবে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করেন। ১৮৭৯ সাল থেকে কেশবচন্দ্র 'নববিধান' নামে 'সর্বধর্ম সমন্বয়'বাদী এক নতুন ধর্মমত প্রচার করতে থাকেন। এরই পাশাপাশি তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহের পক্ষে এবং বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে ব্রতী হন। সুবক্তা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। 'ভারত সংস্কার সভা' ও 'ভারত আশ্রম' তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। মহিলাদের জন্য কলকাতার ভিক্টোরিয়া কলেজের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর লিখিত জীবনদর্শন ও ধর্মীয় প্রবন্ধগুলো বাংলা গদ্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। মৃত্যু ১৮৮৪ সালে।

**কৈবর্ত** কথাটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কিম্বর্তদেশীয় রাজন্য বা কৃষিজীবী সম্প্রদায়। কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হিন্দু-সম্প্রদায় বিশেষ। স্মৃতি ও পুরাণমতে, কৈবর্ত ও মাহিষ্যরা ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান। বর্ণ বিচারে অন্ত্যজ বলে বিবেচিত হলেও একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কৈবর্তরা প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। কৈবর্ত বীর দিব্যোক বা দিব্যপাল ছিলেন পালবংশীয় রাজা দ্বিতীয় মহীপালের সচিব। পরে প্রজাপীড়ক রাজার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেন ও তাঁকে হটিয়ে সিংহাসন অধিকার করেন। ঘটনাটি ইতিহাসে কৈবর্ত বিদ্রোহ নামে পরিচিত। রাজা দিব্যোকের পুত্র রুদ্র পরে সিংহাসনে তাঁর উত্তরাধিকারী হন।

**কৈবল্য** মোক্ষলাভ। আত্মার পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যাওয়া। পুনঃপুন জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি। জৈনধর্মে মুক্তি লাভপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কেবলীন বলা হয়। আর 'কেবলীন' কথাটা এসেছে এই কৈবল্য থেকে। জৈনমতে, প্রত্যেক ব্যক্তির লক্ষ্য হচ্ছে আত্মার সঙ্গে বস্তুর বিচ্ছিন্নতা অনুধাবন করা। কৈবল্য হলো সেই বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা।

**কৈলাস** হিমালয়ের মানস সরোবরের উত্তরে অবস্থিত একটি পর্বতশৃঙ্গ। পুরাণমতে, শিব ও তাঁর পত্নী হিমালয়কন্যা পার্বতীর বাসস্থান। বেদের কাল থেকে শিবের বাসস্থান অরণ্যানী পরিবেষ্টিত ও বিপৎসংকুল বলে বিবেচিত। শিব বা মহাদেব এখানে আত্মগোপন করে ধ্যানে নিমজ্জিত হন। তাঁর অন্য স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী কালী এখানে তাঁর সঙ্গে বাস করেন না।

**কোজাগরী পূর্ণিমা** লক্ষ্মীপূজা দ্র.।

**কোরআন** মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ফেরেশতা জিবরাইল (আ.)-এর মারফত ২৩ বছর ধরে এই গ্রন্থ হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়। মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল—তাঁর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের পথনির্দেশ,

বিশ্বাসীর জন্য অনুসরণীয় বিধিবিধান দেওয়া আছে এই গ্রন্থে। ইসলাম ধর্মবিশ্বাসীরা একে একটি সার্বিক জীবনবিধান হিসেবে গণ্য করেন। ৬১০ সালের রমজান মাসে মক্কার হেরা গিরিগুহায় ধ্যানমগ্ন মহানবী (সা.)-এর ওপর এটি অবতীর্ণ হতে শুরু করে। জীবন ও জগৎ, সৃষ্টি ও তার রহস্যসংক্রান্ত মানুষের সব কৌতূহল বা জিজ্ঞাসার (যেমন মানুষ কোথা থেকে আসে, মৃত্যুর পর কোথায় যায়, কেন এই আসা-যাওয়া, মৃত্যুর পর কী, সৃষ্টিকর্তা কেন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এসব মৌলিক প্রশ্নের জবাব বা ইঙ্গিত) রয়েছে পবিত্র কোরআনে। দুনিয়ার কোটি কোটি মুসলমান প্রতিদিন পবিত্র কোরআন পাঠ করে থাকেন। অবিকৃতভাবে সংরক্ষণের জন্য মুসলিম জগতে অসংখ্য হাফেজ প্রথম থেকেই আগাগোড়া পবিত্র কোরআন মুখস্থ করে রাখতেন। তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানের সময় প্রথম পবিত্র কোরআন লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা হয়। পবিত্র কোরআনে মোট ১১৪টি সুরা, ৬ হাজার ৬৬৬টি আয়াত, ৮৬ হাজার ৪৩০টি বাক্য ও ৩ লাখ ২২ হাজার ৬৭১টি অক্ষর আছে। এতে রুকুর সংখ্যা ৪৫০। সুরাগুলোর মধ্যে মহানবী (সা.)-এর মক্কায় অবস্থানকালে ৯৩টি এবং ২১টি তাঁর মদিনায় হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়, যেগুলোকে যথাক্রমে 'মক্কি' ও 'মাদানি' সুরা বলা হয়। পবিত্র কোরআনের দীর্ঘতম সুরা 'বাকারা' এবং ক্ষুদ্রতম সুরা 'কউসর'। প্রথম নাজিল হয় সুরা 'আলাক'-এর প্রথম পাঁচ আয়াত এবং সুরা বাকারা-র ২৮১-সংখ্যক আয়াতটি সর্বশেষে অবতীর্ণ হয়েছে। মানবজাতিকে পবিত্র কোরআন এক নতুন দিকদর্শন দিয়েছে। মানবিক সাম্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পবিত্র কোরআনের বাণী বা শিক্ষা জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছে। বিশ্বসভ্যতায় পবিত্র কোরআনের দান অপরিসীম। বিগত ১৪০০ বছর যাবৎ পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যায় যে অসাধারণ প্রচেষ্টা হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে তার দৃষ্টান্ত বিরল। বহু মনীষী আজীবন পবিত্র কোরআন নিয়ে গবেষণা করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর কেবল সুরা বাকারা অধ্যয়নেই আট বছর অতিবাহিত করেন। পবিত্র কোরআনের তফসির প্রথম লেখেন সাঈদ ইবনে জুবাইর। রাসুল (সা.)-পত্নী বিবি আয়েশা (রা.)-কে একবার মহানবী (সা.)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন: 'তাঁর চরিত্র ছিল পবিত্র কোরআন', অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের সকল শিক্ষা মহানবীর জীবনে বাস্তব রূপ লাভ করে। একত্ববাদ অর্থাৎ স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাসই হলো পবিত্র কোরআনের প্রথম ও মৌলিক শিক্ষা। মানবিক সাম্য, নারীর মর্যাদা, এতিম ও বিধবাদের প্রতি সুবিচার, দাসদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার, পরোপকার, শত্রুদের প্রতি ঔদার্য, এ বিষয়গুলোর ওপরও পবিত্র কোরআনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।

**কোরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা** পবিত্র কোরআনের সুরা কিয়ামা-র ১৭-১৯ আয়াতে বলা হয়েছে, 'এর সংরক্ষণ ও আবৃত্তি করানোর (ভার) আমারই। সুতরাং যখন আমি পড়ি তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ করো। তারপর এর বিশদ ব্যাখ্যার (দায়িত্ব) আমারই।' সুরা আল-ই-ইমরান-এর ৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনিই একমাত্র তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার মধ্যে মজবুত আয়াতগুলো উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল অংশ), অন্যগুলো রূপক। যাদের মনে বিকৃতি তারা ফিৎনা (বিরোধ) সৃষ্টি ও কদর্থের উদ্দেশ্যে যা রূপক তা অনুসরণ করে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানী তারা বলে, আমরাও এতে বিশ্বাস করি। সবই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে।' আর বোদ্ধাজন ছাড়া আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।

**কোলাসকিন** ধর্মান্দোলন ও সম্প্রদায়। দিব্য প্রেরণামূলক একটি ধর্মীয় আন্দোলন ও তার অনুসারী ক্ষুদ্র সম্প্রদায়বিশেষ। আমেরিকায় প্লাটিউ এলাকায় ইন্ডিয়ানদের মাঝে ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে এই আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটে।

**কোষ্ঠী** জন্মপত্রিকা, ঠিকুজি। এতে নবজাতকের জন্মসময়ে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও গতিবিধি অনুযায়ী তার সমগ্র জীবনের শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়। জন্মকালটি সঠিকভাবে নির্ণীত না হলে কোষ্ঠী গণনাও সঠিক হয় না। প্রাচীনকালে বিশেষ পদ্ধতিতে এই জন্মসময় সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা

হতো। মনে করা হয়, আলেকজান্ডারের পর শাকদ্বীপ (পারস্য-কান্দাহার-সাইথিয়া-কাশ্মীরের উত্তরের দেশ) থেকে আসা জনগোষ্ঠী দক্ষিণ এশিয়ায় কোষ্ঠী গণনা পদ্ধতি প্রবর্তন করে। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ভারতীয় জ্যোতিষী বরাহমিহিরের গ্রন্থে কোষ্ঠী গণনা পদ্ধতির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। অনুমান করা হয়, এর দু-তিন শ বছর আগে থেকে ভারতবর্ষে কোষ্ঠী গণনা শুরু হয়। পাশ্চাত্যের অনেক দেশেও প্রাচীনকাল থেকে কোষ্ঠী গণনা প্রচলিত।

কোষ্ঠী গণনায় প্রধান তিনটি বিষয়—রাশি, গ্রহ ও লগ্ন। রাশি ১২টি : মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। গ্রহ নয়টি : রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু। একটি চক্র বা ছকে ১২টি প্রকোষ্ঠে এই রাশিগুলো দেখানো হয়। তারপর পঞ্জিকা অনুযায়ী জাতকের জন্মকালে গ্রহগুলোর রাশিভিত্তিক অবস্থান নির্ণয় করে ওই চক্র বা ছকে রাশি অনুযায়ী গ্রহগুলোর নামের আদ্যক্ষর লেখা হয়। এরপর লগ্ন নির্ণয় করে লগ্নবোধক রাশিটিকে 'লং' শব্দ দ্বারা নির্দেশ করলেই জন্মপত্রিকা তৈরি হয়ে যায়। অবশ্য কোষ্ঠী গণনার এই চক্র বা ছকের অঙ্কনপদ্ধতি সর্বত্র এক রকম নয়। ভারতবর্ষেই তিন রকম পদ্ধতি প্রচলিত। দক্ষিণ ভারত ছাড়া অন্য সব স্থানের চক্রের গতি বামাবর্তী। বঙ্গদেশ ও দক্ষিণ ভারতের রাশিচক্র স্থির; মেষ রাশি থাকে সর্বদা শীর্ষদেশে এবং লগ্ন পরিবর্তনশীল। উত্তর ভারত ও পাশ্চাত্যে রাশিচক্র স্থির নয়, যেকোনো স্থানে রাশি অবস্থান করতে পারে, তবে লগ্ন সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। উত্তর ভারতের ছকে লগ্ন থাকে শীর্ষদেশে এবং পাশ্চাত্যে থাকে বাঁ পাশে।

প্রতিটি রাশির নির্দিষ্ট অধিপতি গ্রহ থাকে, যেমন মকর ও কুম্ভ রাশির অধিপতি শনি, মীন ও ধনু রাশির বৃহস্পতি, মেষ ও বৃশ্চিক রাশির মঙ্গল, বৃষ ও তুলা রাশির শুক্র, মিথুন ও কন্যা রাশির বুধ, কর্কট রাশির চন্দ্র এবং সিংহ রাশির রবি। লগ্ন হচ্ছে সূর্য দ্বারা মেষাদি রাশি সংক্রমণের মুহূর্ত, অর্থাৎ সূর্য যখন যে রাশিতে অবস্থান করে তখন লগ্নও হয় সেই রাশির নামানুসারে। যেমন সূর্যের মেষ রাশিতে অবস্থানকালে যদি কারও জন্ম হয় তাহলে তার লগ্ন হবে মেষ লগ্ন। লগ্নের মেয়াদ হলো দুই ঘণ্টা, অর্থাৎ দুই ঘণ্টা পরপর লগ্ন পরিবর্তিত হয়।

কোষ্ঠী অনুযায়ী কারও ভবিষ্যৎ গণনার সময় তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ১২টি ভাগে ভাগ করা হয়, যার নাম 'ভাব'। ১২টি ভাব হচ্ছে: তনু (শরীর), ধন, সহজ (সহোদর), বন্ধু (এবং মাতা), পুত্র (এবং বিদ্যা), রিপু (এবং রোগ), জায়া (বা স্বামী), নিধন (মৃত্যু), ধর্ম (এবং ভাগ্য), কর্ম (এবং পিতা), আয় ও ব্যয়। এর মধ্যে তনুর বিচার শুরু হয় যে রাশিতে লগ্ন অবস্থিত সেখান থেকে, অতঃপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ভাব গণনা করা হয়। কোষ্ঠীবিচারের এসব মূলসূত্র প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সর্বত্রই প্রায় এক রকম। তবে ভারতীয় জ্যোতিষে একটি বিশেষ বিষয় হলো দশা গণনাপদ্ধতি। জাতকের ভবিষ্যৎ জীবনে কখন কী ঘটবে তা এই পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়। জাতকের জন্মনক্ষত্র অনুযায়ী দশা নির্ণীত হয়। দশা গণনার মোট ৪২ রকম পদ্ধতি থাকলেও অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী পদ্ধতি দুটিই বেশি ব্যবহৃত হয়। হিন্দু পরিবারে কোষ্ঠী বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিয়ের সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়। পাত্র ও পাত্রী উভয়ের কোষ্ঠী বিচার করে কোনো বিষয়ে কোনো অশুভযোগ দেখা না গেলে তবেই তাদের মধ্যে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

**কো-হুং** চীনা তাওবাদী দার্শনিক, আলকেমিস্ট ও চিকিৎসক। চিহ্-চুয়ান নামে পরিচিত। জন্ম খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষ দিকে। চিকিৎসাবিষয়ক দুটি গ্রন্থের প্রণেতা। এ ছাড়াও তাওপন্থী আলকেমি, পথ্যশাস্ত্র ও জাদুবিদ্যা বিষয়েও তাঁর কয়েকটি পুস্তক আছে। তিনি মানুষের অমরত্ব লাভের উপায় নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। তাও মতবাদের বিকাশে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল।

**কৌলীন্য প্রথা** হিন্দুসমাজের একটি প্রাচীন প্রথা। 'কুল' থেকেই 'কুলীন' কথাটির উদ্ভব। কুলীন অর্থ হলো অভিজাত পরিবার বা সম্ভ্রান্ত বংশ থেকে উদ্ভূত। শাস্ত্রকার বাচস্পতি মিশ্রের মতে, কৌলীন্য চিহ্নিত হয় আচার, বিদ্যা, বিনয়, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, তপস্যা, দান—এসব গুণাবলির দ্বারা। যদিও যেকোনো জাতি, গোষ্ঠী, বর্ণ, সম্প্রদায় বা

বংশ যাঁরা সামাজিক প্রাধান্য বা সম্মান ভোগ করে তাঁরা সেই সামাজিক অবস্থানটিকে পুরুষানুক্রমে ধরে রাখতে চায়। বস্তুতপক্ষে, এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই কৌলীন্য প্রথার উদ্ভব। পরবর্তীকালে বর্ণহিন্দুদের মধ্যে এটি একটি অনড় ও অনতিক্রম্য শৃঙ্খল হিসেবে কায়েম হয়ে যায়। ভারতবর্ষে রামায়ণের কাল থেকেই কৌলীন্য প্রথার অস্তিত্বের ধারণা পাওয়া যায়। বাংলায় রাঢ় ও বরেন্দ্রর ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা অধিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই ব্রাহ্মণদের কান্যকুব্জের পাঁচ ব্রাহ্মণের (ক্ষিতীশ, মেধতিথী, বিতরগ, সুধনিধি ও সম্ভরি) বংশধর বলে মনে করা হয়। অনুমান করা হয়, রাজা আদিশূর তাঁর রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে এই ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। যদিও আদিশূরের ঐতিহাসিকতা নিয়ে বিতর্ক আছে। গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক এবং বর্মণ রাজা হরিবর্মণ যথাক্রমে শকদ্বীপী ও বৈদিক ব্রাহ্মণদের নিয়ে এসেছিলেন বলে জানা যায়। এ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টির ফলেই বাংলায় কৌলীন্য প্রথার উদ্ভব হয়েছে। সেন রাজা বল্লাল সেনকেও কৌলীন্য প্রথার স্রষ্টা মনে করা হয়। ধীরে ধীরে এই কৌলীন্য প্রথা বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। বৈদ্যরা রাঢ়ীয় বৈদ্য, বারেন্দ্র বৈদ্য ও সিলেটি বৈদ্য—এ তিন ভাগে এবং কায়স্থরা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ, উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ, বারেন্দ্র কায়স্থ, সিলেটি কায়স্থ এবং গোলাম (দাস) কায়স্থ—এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা আবার কুলীন, সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়, সদ্ধ-শ্রোত্রিয় এবং কায়স্থ-শ্রোত্রিয়তে ভাগ হয়ে যায়। বিবাহবিধি আনুযায়ী একজন কুলীন পুরুষ তার শ্রেণীর কোনো নারীকে কিংবা তার শ্রেণীর উচ্চ দুই শ্রোত্রিয় শ্রেণীর নারীকে বিয়ে করতে পারত।

কৌলীন্য প্রথা কালক্রমে বহুবিবাহের প্রচলন ঘটায়। কুলীন হিসেবে মর্যাদা লাভ এবং সামাজিক অবস্থান টিকিয়ে রাখার স্বার্থে কুলীন পুরুষদের সঙ্গে অকুলীন নারীর বিয়ে দেওয়া হতো। এভাবে বিয়ে ব্যাপারটি কুলীনদের জন্য একটি লাভজনক ব্যাপারে পরিণত হয়। কৌলীন্য বজায় রাখতে যেমন একজন বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে অল্পবয়সী নারীকে বিয়ে দেয়া হতো, তেমনি অল্পবয়স্ক পুরুষের সঙ্গেও বয়স্কা নারীর বিয়ে হতো। তার পরও উপযুক্ত পাত্রের অভাবে অনেক কুলীন নারী সারা জীবন অবিবাহিতই থেকে যেত। বর্তমানে কৌলীন্য প্রথা তার আগের প্রাধান্য হারিয়ে ফেলেছে।

**কৌশিক** মহাভারতের বনপর্বে উল্লেখিত গৃহত্যাগী তপস্বী ব্রাহ্মণ। একজন পতিব্রতা রমণীর পরামর্শ অনুযায়ী মিথিলাবাসী ধর্মব্যাধের উপদেশ শুনে তিনি গৃহে ফিরে আসেন এবং প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা-মাতার সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। মহাভারতে কৌশিক নামে আরও একজন তপস্বী ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে, যিনি সদা সত্য বলার প্রতিজ্ঞা রাখতে গিয়ে তপোবনে আশ্রয়গ্রহণকারী কয়েকজনকে দস্যুর হাতে ধরিয়ে দেন। এ অপরাধে পরে তাঁর নরকবাস হয়। এ দুজন ছাড়াও মহারাজ কুশের বংশধর বলে ঋষি বিশ্বামিত্রকেও কৌশিক বলা হয়।

**কৌশিকী** হিন্দু পুরাণোক্ত দেবী। শুম্ভ-নিশুম্ভের শক্তি বিনাশের জন্য স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাদের স্তবে তুষ্ট কালীর দেহকোষ থেকে তাঁর জন্ম। কোষ থেকে উৎপন্ন হওয়ায় তাঁর নাম কৌশিকী। তিনি দশভুজা, সিংহ তাঁর বাহন। যুগে যুগে বহু রূপে অসুর বিনাশ করে তিনি দেবতা ও মানবগণকে রক্ষা করেন। অন্য মতে, তিনি উমার দেহসম্ভূতা এবং শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যশোদার গর্ভে তাঁর জন্ম। তিনি বসুদেব কর্তৃক অপহৃত হন কিন্তু কংসের হাতে নিহত হওয়ার আগেই আকাশমার্গে উঠে যান। তিনি কংসের হত্যাকারী জন্ম নিয়েছে মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

**ক্যাথলিক অ্যাপসটলিক চার্চ** খ্রিষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায়। আনু. ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে এডওয়ার্ড আর্ভিং ইংল্যান্ডে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাতা আর্ভিংয়ের নামানুসারে অনুসারীগণকে আর্ভিংপন্থীও (Irvingites) বলা হয়। এই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসে প্রতীকবাদ ও যিশুর পুনরাবির্ভাবের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

**ক্যাথলিক ক্রুসেড** (১৩৯৪) ইউরোপে তুর্কিদের প্রাধান্য বিস্তার বিশেষত তাদের কাছে হাঙ্গেরির রাজা সিগিসমান্ডের পরাজয়ে (১৩৯২) বিচলিত হয়ে পোপ নবম বনিফেস তুর্কিদের বিরুদ্ধে এক

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যেমন—ফ্রান্স, জার্মানি, বুলগেরিয়া, শ্লাভিয়া, রোডস ও স্টাইরিয়ার ক্যাথলিকেরা অংশ নেয়। প্রথম দিকে কয়েকটি যুদ্ধে জয় লাভ করলেও সুলতান বাইয়াজিদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে নিকোপোলিসের যুদ্ধে ক্যাথলিক বাহিনী পর্যুদস্ত হয়। এই ক্রুসেডে দুই পক্ষেই বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঘটে, হাজার হাজার সৈন্য মারা যায়। যুদ্ধে তুর্কিদের বিজয়ের ফলে দানিউব নদীর তীর পর্যন্ত সুলতান বাইয়াজিদের রাজ্য বিস্তৃত হয়। এই বিজয়ের ধারায় পরে গ্রিসও তুর্কিদের দখলে আসে।

**ক্যাথলিক চার্চ বা ক্যাথলিক ধর্ম-সম্প্রদায়** সনাতন খ্রিষ্টীয় ধর্মমত ও তার অনুসারী সম্প্রদায়। ইংল্যান্ডের রিফর্মেশন-পূর্ব যুগ সম্পর্কে প্রযুক্ত হলে তখন এর দ্বারা নিষ্ঠাবান (অর্থোডক্স) খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে বোঝায়। তবে রিফর্মেশন-পরবর্তী যুগের ক্ষেত্রে এর দ্বারা সাধারণত রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতকে বোঝায়। কখনো কখনো নিষ্ঠাবান প্রাচ্যদেশীয় খ্রিষ্টধর্মমত (অর্থোডক্স) ইস্টার্ন চার্চ অর্থেও কথাটি ব্যবহৃত হয়।

**ক্যাথলিক ধর্মসংস্কার** ষোড়শ শতকে সংঘটিত রোমান ক্যাথলিক ধর্ম-সম্প্রদায়ের (চার্চের) আভ্যন্তরিক সংস্কার। প্রটেস্ট্যান্টরা সাধারণত একে প্রতিসংস্কার (Counter Reformation) বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। যদিও ক্যাথলিকদের বক্তব্য এ সম্পর্কে ভিন্ন। তাদের দাবি, রিফর্মেশনের সূচনা হওয়ার আগেই খ্রিষ্টীয় সমাজের অভ্যন্তরে সংস্কারের এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর এর উদ্দেশ্য চার্চ সংগঠনের অভ্যন্তর থেকে দুর্নীতি দূর করা। আর তাদের মতে, রিফর্মেশনের উদ্দেশ্য চার্চ সংগঠনের উচ্ছেদ ঘটানো। চার্চের দুর্নীতির মধ্যে ছিল প্রধানত অর্থের বিনিময়ে যাজকের পদ ক্রয়-বিক্রয়, উর্ধ্বতন যাজকদের মধ্যে দুর্নীতি, নিম্নতন যাজকদের অজ্ঞতা এবং মূলনীতিগত বিষয়ে ও বিশ্বাসীদের কল্যাণের প্রতি উপেক্ষা। চতুর্দশ শতকে সিএনার সেন্ট ক্যাথারিনসহ কেউ কেউ চার্চের এসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। কিন্তু চার্চের অভ্যন্তরীণ বিরোধ, রাজা ও রাজপরিবারের প্রাধান্য এবং প্রতাপশালী বিশপদের তৎপরতায় তাদের সংস্কার-উদ্যোগ ব্যাহত হয়। পরবর্তীকালে পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে রোমে কার্ডিনাল করাফা ও কার্ডিনাল ক্যাজিট্যানের নেতৃত্বে আবার এই সংস্কার-প্রচেষ্টা শুরু হয়। যদিও পঞ্চম ল্যাটারান কাউন্সিলের ব্যর্থতার ফলে সে সংস্কার-প্রচেষ্টাও থেমে যায়। এরপর হয়তো রিফর্মেশনের পরোক্ষ অভিঘাতেই ক্যাথলিক সংঘের অভ্যন্তরে এই সংস্কার-প্রয়াস আবার নতুন গতি লাভ করে। সম্রাট পঞ্চম চার্লস কেবল সংস্কারে উৎসাহই দান করেননি, আপন সেনাবাহিনী পাঠিয়ে রোম নগর লুণ্ঠনের (১৫২৭) মাধ্যমে সে সংস্কারে সাহায্য করেন। তাঁর এই ভূমিকা কার্ডিনালদের বিচলিত করে। ১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় পল পোপ নির্বাচিত হন। এ পর্যায়ে সেন্ট ইগনেশাস অব লায়ালা ও সোসাইটি অব জিসাস তাঁদের কাজ শুরু করেন। ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে আহূত ট্রেন্ট কাউন্সিলে তৃতীয় পল, তৃতীয় জুলিয়াস ও চতুর্থ পাইয়াস সংস্কারকাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। চতুর্থ পল পোপতন্ত্রেই সংস্কার আনেন এবং তাঁকে একটি অর্ধ-সন্ন্যাসাশ্রমে পরিণত করেন। বর্তমানকাল অবধি ভ্যাটিকানে এই পদ্ধতিই চালু রয়েছে। এর ফলে যাজকের পদ ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হয়, আদর্শ উপাসনা-পদ্ধতি নির্ধারিত হয়, ধর্ম-সমাজের পরিচালনব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয়, পাদরিদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত হয় এবং বিশপদের নৈতিক জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু হয়। ক্যাথলিক চার্চের এই সংস্কারকাজে যাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন: স্পেনের সেন্ট চার্লস বরোমি ও সেন্ট ফিলিপ নেরি, সেন্ট টেরিসা অব আভিলা ও সেন্ট জন অব দ্য ক্রস, ফ্রান্সের সেন্ট ফ্রান্সিস অব সেলস ও সেন্ট ভিনসেন্ট দ্য পল এবং ইংল্যান্ডে জেসুইট মিশনারিরা (এডমান্ড ক্যামপিঅন, রবার্ট পাসনস প্রমুখ)।

**ক্যাপানিউস** গ্রিক পুরাণোক্ত থিবসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাত বীরের অন্যতম। তাঁর দম্ভোক্তির শাস্তি দিতে জিউস বজ্রাঘাতে তাঁর মৃত্যু ঘটান। ক্যাপানিউসের শোকার্ত স্ত্রী ইভাদনে স্বামীর চিতায় আত্মহুতি দেন।

**ক্যারল** খ্রিষ্টীয় প্রার্থনা-সংগীত। সাধারণত ইস্টার বা বড়দিন উপলক্ষে গাওয়া হয়। প্রাচীন ইংরেজি

ক্যারল গানগুলোর উদ্ভব সাধারণত পঞ্চদশ শতকে; কোনো কোনোটির উৎস হয়তো পৌত্তলিক যুগেও। ক্যারলগুলো সাধারণত লোকগীতি ধরনের ও আনন্দব্যঞ্জক জনপ্রিয় গান হলেও খ্রিষ্টের জন্মদিবস উপলক্ষে ঊনবিংশ শতকে রচিত বহু ধর্মসংগীতও ক্যারল নামে পরিচিতি লাভ করে।

**ক্যালকাটা মিশনারি কনফারেন্স** (সিএমসি) প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারিদের সংস্থা। ১৮৩১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর লক্ষ্য ছিল ভারতীয় ও ব্রিটিশ জনমত তথা সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করা। সিএমসির পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তী সময়ে ১৮৪৫, ১৮৪৮, ১৮৫৮ ও ১৮৮৭ সালে যথাক্রমে বোম্বাই, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর ও লক্ষ্ণৌতে একই ধরনের সংস্থা গঠিত হয়। তবে এগুলোর মধ্যে সিএমসিই ছিল সবচেয়ে সক্রিয়। ১৮৩২ সালে সিএমসি তার মুখপত্র হিসেবে *দ্য ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজারভার* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পাশাপাশি খ্রিষ্টীয় ধর্মের বাণী প্রচার। লিঙ্গীয় ও জাতিবৈষম্য দূর, রায়তের স্বার্থ সংরক্ষণ, নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নীলচাষিদের নির্ভয়ে সাক্ষ্য প্রদানে উৎসাহ এবং গণশিক্ষার প্রসার ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টায় সিএমসির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। মিশনারি কাজে নিয়োজিত মহিলারা 'পুরুষদের সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে' এ সংস্থার পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে।

**ক্যালভিন, জন** (১৫০৯-৬৪) রিফর্মেশন বা খ্রিষ্টধর্মের সংস্কার যুগের প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মশাস্ত্রবিদ। ১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুলাই ফ্রান্সের পিকার্ডিতে তাঁর জন্ম। ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ক্যাথলিক ধর্মমত পরিত্যাগ করে প্রটেস্ট্যান্ট মত গ্রহণ করেন। এই মতবাদ প্রচারের অপরাধে তাঁকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্বদেশ থেকেও নির্বাসিত হন। ১৫৪১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জেনেভায় উপস্থিত হন। তাঁর আগ পর্যন্ত তিনি বাজেল ও স্ট্রাসবার্গে তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। ১৫৬৪ সালের ২৭ মে জেনেভায় ক্যালভিনের মৃত্যু হয়। তাঁর মতে, ঐশ্বরিক বিধানের একমাত্র উৎস বাইবেল, আর মানুষের কর্তব্য হলো এই বিধানগুলোর যথাযথ ব্যাখ্যা এবং পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। তাঁর প্রচারিত এই মত থেকেই খ্রিষ্টানজগতে অন্যতম বিশিষ্ট ধর্মমত হিসেবে ক্যালভিনিজম বা ক্যালভিনবাদের সৃষ্টি। ক্যালভিনবাদ হলো প্রটেস্ট্যান্টদের সংস্কারকৃত ধর্ম-সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে লুথারীয় মতবাদ থেকে পৃথক একটি মতবাদ। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিয়তি সম্পর্কে ব্যাখ্যায় তাদের পার্থক্য আছে। ক্যালভিনবাদে পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা, সংযম, দায়িত্বজ্ঞান প্রভৃতি 'খ্রিষ্টানোচিত' গুণাবলির ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। ক্যালভিনের মতে, এই গুণাবলি অর্জনের দ্বারা মানুষ পৃথিবীতেই ঈশ্বরের রাজত্ব কায়েম করতে পারে। স্কটল্যান্ডের কভেন্যান্টপন্থীরা, ইংল্যান্ড ও নিউ ইংল্যান্ডের পিউরিটানরা এবং ফ্রান্সের হিউগানটরা ক্যালভিনবাদের অনুসারী।

**ক্যালিয়পি** অর্ফিয়াসের মাতা এবং নয় মিউজের প্রধান। গ্রিক পুরাণে 'মিউজ' হলেন চিত্রকরদের অনুপ্রেরণা। কাব্যধর্মী রচনার পৌরোহিত্যের আসনটিও তাঁর।

**ক্যালিস্টো** গ্রিক পুরাণে উল্লেখিত আর্টিমিসের সহচরী। ঈর্ষাপরায়ণ ক্যালিস্টোর গর্ভে জিউসপুত্র আর্কাসের জন্ম হলে ঈর্ষান্বিত হয়ে হেরা ক্যালিস্টোকে একটি ভালুকে পরিণত করেন। জিউস আবার তারকাপুঞ্জের মধ্যে তাঁকে 'উবসা মেজার' বা গ্রেট বিয়ার হিসেবে ঠাঁই দেন।

**ক্যাসানড্রা** গ্রিক উপকথায় বর্ণিত ট্রয়ের রাজকন্যা, রাজা প্রাইয়াম ও রানি হেকুবার কন্যা। প্যারিস ও হেক্টরের বোন। তার অন্য নাম আলেকজান্দ্রা। অ্যাপোলোর কাছ থেকে তিনি ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতা লাভ করেন। কিন্তু অ্যাপোলোকে প্রণয়ীরূপে গ্রহণ না করায় অ্যাপোলো ক্যাসানড্রার এই গুণকে অভিশাপে রূপান্তর করেন। ফলে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী কেউ বিশ্বাস করত না। ট্রয় যুদ্ধের পর আগামেমননের দাসী থাকাকালে আগামেমননের পত্নী ক্লাইটেমনেস্ট্রা, নিজের স্বামী ও ক্যাসানড্রাকে একত্রে হত্যা করেন। উপেক্ষিত ভবিষ্যদ্বক্তা অর্থে ক্যাসানড্রা কথাটি ব্যবহৃত হয়।

**ক্রিয়ন** গ্রিক পুরাণোক্ত থিবসের রাজা। তিনি এ মর্মে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, স্ফিংক্সের ধাঁধার উত্তর যিনি দিতে পারবেন তাঁর সঙ্গেই তিনি তাঁর বোন জোকাস্টার বিয়ে দেবেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে তিনি ইডিপাসের (আসলে যে জোকাস্টার পুত্র) সঙ্গে জোকাস্টার বিয়ে হয়। ইডিপাস-জোকাস্টার বিয়োগান্ত পরিণতির পর তিনি থিবসের রাজা হন।

**ক্রিশ্চিয়ান মিশন হাসপাতাল** রাজশাহীতে অবস্থিত মিশনারি হাসপাতাল। ১৮৮৭ সালে ইংল্যান্ডের প্রেসবাইটেরিয়ান চার্চের চিকিৎসাবিষয়ক মিশনারিদের উদ্যোগে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র হিসেবে এটি স্থাপিত হয়। শুরুতে এর শয্যাসংখ্যা ছিল পাঁচ। ১৯৫৭ সালে একে ১০০ শয্যার হাসপাতালে উন্নীত করা হয়। ১৯৭৪ সালে শিশুদের জন্য ২০ শয্যার একটি অতিরিক্ত ওয়ার্ড সংযোজন করা হয়। জনসাধারণকে সেবা দেওয়ার জন্য হাসপাতালের বহির্বিভাগ সপ্তাহের ছয় দিন খোলা থাকে।

**ক্রিস নৃত্য** নৃত্যবিশেষ। বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে প্রচলিত এই নাচকে কতকাংশে ধর্মীয় ব্যাপার হিসেবে গণ্য করা হয়। এই নাচে শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। 'বারং' শুভ বা কল্যাণের এবং 'রাংদা' অশুভ বা অকল্যাণের দেবী। রাংদার আক্রোশ থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং বারংয়ের অনুগ্রহ লাভের আশায় এই নৃত্যানুষ্ঠান করা হয়। নৃত্যশিল্পীরা মুখোশ পরে এই নৃত্য করে। বালি দ্বীপের অন্যান্য নৃত্যের মতো এই নৃত্যেও কলানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

**ক্রিসমাস/বড়দিন** যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব-অনুষ্ঠান। ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হলেও বর্তমানে এটি বিশ্বব্যাপী প্রায় ধর্মনিরপেক্ষ একটি উৎসবে পরিণত হয়েছে। ফাদার ক্রিসমাস বা সান্তা ক্লজ, ক্রিসমাস কার্ড, ক্রিসমাস ট্রি এসবও ক্রিসমাস বা বড়দিন উৎসবের অঙ্গ। ক্রিসমাসে যিনি শিশুদের জন্য উপহার বয়ে নিয়ে আসেন, পৃথিবীর নানা দেশে তাঁকে নানা নামে ডাকা হয়। যেমন ফাদার ক্রিসমাস, সান্তা ক্লজ, সেন্ট নিকোলাস প্রভৃতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংল্যান্ডে সাধারণত ক্রিসমাসের আগের দিন সন্ধ্যায় শিশুরা মোজা ঝুলিয়ে রাখে, যাতে সান্তা ক্লজ রাতের বেলায় এগুলো উপহার দিয়ে ভরে দিতে পারেন। ক্রিসমাস ট্রির তলায়ও উপহার রেখে দেওয়া হয়। ফ্রান্স, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলে শিশুরা উপহার পায় তাদের জুতার ভেতর থেকে। এ জুতাগুলো তারা আগের দিন সন্ধ্যায় ঘরের দরজার বাইরে রেখে দেয়। ক্রিসমাস কার্ডের প্রচলন শুরু হয় উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি। আর ক্রিসমাস বৃক্ষ হলো সাধারণত মোচাকৃতির বৃক্ষ, যাকে ছোট ছোট বৈদ্যুতিক বাল্ব এবং বিভিন্ন উপহারসামগ্রী দিয়ে সাজানো হয়। কখনো গাছের ওপর স্থাপন করা হয় একজন দেবদূত ও একটি তারা। এর মাধ্যমে যিশুর শিশুকালের দৃশ্য দেখায়, যেমন গোয়ালঘরে পশুকে খড় খাওয়ানোর গামলায় শিশু যিশু এবং তাঁর পাশে মা মেরি ও যোসেফকে দণ্ডায়মান দেখানো হয়।

**ক্রুসেড** ধর্মযুদ্ধ। ক্রুসেড কথাটার উদ্ভব লাতিন Crux, যার অর্থ ক্রুশ, থেকে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের এই যুদ্ধ ১০৯৫ থেকে ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মোট নয়বার সংঘটিত হয়। মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধারই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.)-এর সময় থেকেই (৬৩৮ খ্রি.) এই স্থান মুসলমানদের দখলে ছিল। সেলজুক তুর্কদের উত্থানের ফলে বাইজানটাইন রাজ্যে খ্রিষ্টানদের তীর্থযাত্রা ব্যাহত হলে যাজক পিটার দ্য হারমিট ১০৯৫ সালে প্রথম ক্রুসেডের নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধে তাঁর বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। ১০৯৯ সালে খ্রিষ্টানদের এক বিরাট বাহিনী জেরুজালেম দখল করে। এ সময় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ১১০০ সালে বল্ডউইন জেরুজালেমের রাজা হন। ১১৪৫ সালে মোসুলের জঙ্গি ওডেসা দখল করলে ফ্রান্সের রাজা সপ্তম লুইয়ের নেতৃত্বে দ্বিতীয় ক্রুসেড শুরু হয়। জঙ্গির পুত্র নুরুদ্দিন জেরুজালেম পুনর্দখল করেন। তাঁর সহকারী সালাহউদ্দিন প্রথমে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ শর্ত ভঙ্গ করলে হাতিনের যুদ্ধে জেরুজালেম দখল করেন। ১১৮৯ সালে তৃতীয় ক্রুসেডে নেতৃত্ব দেন জার্মান সম্রাট ফ্রেডেরিক বারবারোসা। ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড দ্য

লায়ন-হার্ট এতে যোগ দেন। রিচার্ড পরে সালাহউদ্দিনের সঙ্গে সন্ধি করেন ও তাঁর বোনকে বিয়ে করেন। পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের নেতৃত্বে খ্রিষ্টানদের চতুর্থ ক্রুসেডও ব্যর্থ হয়। বয়স্ক সৈন্যরা যেখানে ব্যর্থ, সেখানে শিশুরা সফল হতে পারে—এই আশায় অতঃপর শিশুদের দিয়ে একটি ক্রুসেড পরিচালনা করা হয়। সে যুদ্ধে অজস্র শিশুর মৃত্যু ঘটে এবং বাকিরা বন্দী হয়। ১২১৯ সালে ঘটে পঞ্চম ক্রুসেড। এই যুদ্ধে মিসরের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি হয়। ১২২৯ সালে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক ১০ বছরের জন্য জেরুজালেম ইউরোপীয়দের হাতে ফিরিয়ে দেন। ১২৪৮ সালে ফরাসি রাজা নবম লুই সপ্তম ক্রুসেড পরিচালনা করেন। ১২৭০ সালে অষ্টম ক্রুসেডও তাঁর নেতৃত্বেই হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর ফলে শুরুতেই এর সমাপ্তি ঘটে। প্রিন্স এডওয়ার্ড পরিচালিত নবম ক্রুসেডও (১২৯১ খ্রি.) ব্যর্থ হয়।

পোপ কর্তৃক অনুমোদিত অপর কোনো কোনো সামরিক অভিযানও ক্রুসেড নামে অভিহিত হয়েছে, যেমন—ওয়েগু ও অ্যালবিজিনসিজ-নামীয় ধর্মভ্রষ্ট বা প্রকৃতিপূজারিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে তুর্কিদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অভিযানগুলো। ক্রুসেডের ফলে খ্রিষ্টানদের মধ্যে খুব শক্তিশালী দুটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়—নাইট হসপিটালার (যাঁরা পুণ্যার্থীদের আশ্রয় দেন) এবং নাইট টেম্পলার (যাঁরা পুণ্যার্থীদের জন্য পথে পথে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন)। নাইট টেম্পলারদের অবশ্য পরে ছদ্মবেশী মুসলমান সন্দেহে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

**ক্লাইটেমনেস্ট্রা** আগামেমননের অবিশ্বস্ত স্ত্রী। স্পার্টার রাজা টিন্ডারিউসের কন্যা। সুন্দরী হেলেনের বোন। ইলেকট্রা তাঁর কন্যা। ক্লাইটেমনেস্ট্রা তাঁর গোপন প্রেমিক এজিসথাসের সহায়তায় ট্রয়ের যুদ্ধ প্রত্যাগত তাঁর স্বামীকে হত্যা করেন। এই অপরাধে পুত্র অরেস্টেসের হাতে তিনি নিহত হন।

## খ

**খগম** হিন্দু পুরাণে বর্ণিত সত্যনিষ্ঠ সাধক। একবার সহস্রপাদ নামক তাঁর এক বন্ধু তাঁকে তৃণনির্মিত কৃত্রিম সর্প দ্বারা ভয় দেখান। তাতে খগম মূর্ছা যান। মূর্ছা ভঙ্গের পর তিনি সহস্রপাদকে ঢোঁড়া সাপ হওয়ার অভিশাপ দেন। সহস্রপাদ অনেক অনুনয়-বিনয় করলে খগমের ক্রোধ প্রশমিত হয় এবং রুরু মুনির দর্শনে সহস্রপাদ শাপমুক্ত হবেন বলে তিনি বর দান করেন।

**খতম** আরবি শব্দ, অর্থ শেষ। পবিত্র কোরআনের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করাকে খতম বলা হয়। ধর্মপরায়ণ মুসলমানদের বিশ্বাস, পবিত্র কোরআন খতম করায় অত্যধিক সওয়াব হাসিল হয়। রমজান মাসে তারাবি নামাজে পবিত্র কোরআন খতম করা হয়। কয়েকজন হাফেজ এক রাতে তারাবি নামাজে পবিত্র কোরআন 'খতম' করলে তাকে শাবিনা খতম বলা হয়। এ ছাড়া বিশেষ দোয়া, যথা—দোয়া ইউনুস লক্ষাধিক বার পাঠ করে বিপদাপদ দূর করার জন্য আল্লাহর দরবারে আরজ করাকে খতমে ইউনুস বলা হয়। এভাবে বিশেষ নিয়মে কয়েকটি দোয়া পড়লে তাকে খতমে খবাজেগান বা খতমে শিফা বলা হয়।

**খতিব** অর্থ খুতবা বা ধর্মীয় উপদেশ দানকারী। শুক্রবারে জুমার নামাজের সময় মসজিদে যিনি আনুষ্ঠানিকভাবে খুতবা পাঠ করেন। ইসলামপূর্ব যুগে গোত্রবিশেষের মুখপাত্র ও শিক্ষাদীক্ষায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে 'খতিব' বলা হতো। ইসলামের প্রাথমিক যুগে খলিফারা রাজধানীতে এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সংশ্লিষ্ট প্রদেশের প্রধান শহরে উপস্থিত থাকলে তাঁরা জুমার নামাজে ইমামতি ও খতিবের দায়িত্ব পালন করতেন। খুতবার মাধ্যমে তাঁরা একদিকে শ্রোতাদের জনস্বার্থ বিষয়ে উপদেশ দিতেন ও অন্যদিকে রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের মতামত নিতেন। রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে নামাজের ইমামতির ও শুক্রবারে খুতবা পাঠের শাসনবিষয়ক তাৎপর্য অবলুপ্ত হয় এবং বিশেষভাবে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেমদের ওপর খুতবা পাঠের দায়িত্ব অর্পিত হয়। ইসলামি দুনিয়ায় মক্কা নগরের মসজিদের খতিব বরাবরই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। বর্তমানে খতিব ও ইমামের দায়িত্ব বিশেষভাবে মনোনীত একই ব্যক্তি পালন করে থাকেন।

**খনার বচন** খনার বলা কিংবা তাঁর নামে প্রচলিত অভিজ্ঞতাসঞ্জাত জ্ঞানগর্ভ উক্তি, কৃষকদের মৌখিক শাস্ত্র হিসেবে যা অনুসৃত হয়ে আসছে। খনার শ্বশুর বরাহ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং মিহির ছিলেন খনার স্বামী। উভয়েই তাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। খনাও তাঁদের মতো জ্যোতিষশাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। খনার বচনগুলো জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে রচিত। এমন অনেক বচন আছে, যা হয়তো খনার নয় কিন্তু তাঁর নামেই চালু আছে। খনার বচনের বিষয় আবহাওয়া, কৃষি, রোগ-ব্যাধি, শুভাশুভ, দিন-ক্ষণ-মাস প্রভৃতি। এ দেশের কৃষিজীবী মানুষ বহুকাল ধরেই এসব বচন অনুসরণ করে চাষাবাদ ও অন্যান্য দৈনন্দিন কাজকর্ম করে আসছে।

**খাজিমা ইবনে সাবিত আনসারি** সাহাবি। তিনি হিজরতের আগে মুসলমান হন এবং সব ধর্মযুদ্ধে অংশ নেন। তিনি 'জমল' অর্থাৎ উটের যুদ্ধে (৩৭ হি.) শহীদ হন। এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি উট কেনার সময় উপস্থিত না থেকেও তিনি নবী (সা.)-এর সব কথা বিশ্বাস করেন বলে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে এলে তাঁকে মুশহাদাতাইন বা 'দুই পক্ষের সাক্ষী' খেতাব দেওয়া হয়। তিনি ৩৮টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

**খাতাম** সিলমোহর। আরব দুনিয়ায়, বিশেষত যেসব অঞ্চলে অশিক্ষিতের হার অত্যন্ত বেশি সেখানে স্বাক্ষরবিহীন সিলমোহরের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। সস্তা ধরনের এ সিলমোহরগুলোর অধিকাংশই পিতলের তৈরি। ইসলামের প্রথম যুগের একটি মূল্যবান সিলমোহরে নিম্নোক্ত তিনটি শব্দ খোদাই করা ছিল : 'মোহাম্মদ রাসুল আল্লাহ' (মোহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ)। কথিত আছে যে মোহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর প্রথম তিনজন খলিফা (আবুবকর, ওমর ও উসমান) ওই সিলমোহর ব্যবহার করেন। দৈবক্রমে হজরত উসমান (রা.)-এর হাত থেকে সেটা কূপে পড়ে যায় এবং তারপর তা আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

**খাতামুন্নাবিয়্যিন** নবুয়ত সমাপ্তিকারী, নবীদের সমাপ্তিসূচক মোহর। পবিত্র কোরআনে এই কথাটি রয়েছে। শব্দটি স্বরচিহ্নভেদে 'খাতাম' ও 'খাতিম' দুরকমই উচ্চারিত হয়। 'খাতাম' অর্থ আংটি বা সিলমোহর এবং খাতিম অর্থ সমাপ্তিকারী। সুন্নি মুসলমানরা শেষোক্ত অর্থে হজরত মোহাম্মদ (সা.)-কে নবুয়তের সমাপ্তিকারী বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু কাদিয়ানি প্রভৃতি সম্প্রদায় পূর্বোক্ত মোহর অর্থে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে শ্রেষ্ঠ নবী বলে মনে করেন। আল্লামা ইকবাল এই বিতর্কে সুন্নি মতবাদের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন যে পবিত্র কোরআনের পর মানবীয় প্রজ্ঞা এমন স্তরে উন্নীত হয়েছে যে, পথ প্রদর্শনের জন্য তার আর স্বর্গীয় বাণীর প্রয়োজন নেই।

**খাদিজাতুল কুবরা (রা.)** হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রথম স্ত্রী। বিবি খাদিজা নামে সমধিক পরিচিত। যখন তাঁর বয়স ৪০ এবং মোহাম্মদ (সা.)-এর বয়স ২৫, তখন তাঁদের বিয়ে হয়। মহানবীর (সা.)-এর ওহি-প্রাপ্তির পর তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে বিবি খাদিজাই প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ২৫ বছর কাল তিনি মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন করেন। একজন ছাড়া মহানবী (সা.)-এর সব সন্তানসন্ততি তাঁরই গর্ভজাত। হজরত খাদিজা তাঁর চারিত্রিক গুণাবলির জন্য 'তাহিরা' (পবিত্র) নামে সুপরিচিত ছিলেন। বিয়ের আগে তিনি ছিলেন মক্কার এক ধনাঢ্য বিধবা, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে যাঁর বাণিজ্য চলত। মোহাম্মদ (সা.)-এর গুণাবলির কথা শুনে তিনি তাঁর ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করেন। রাসুল (সা.) হজরত খাদিজার মাল নিয়ে সিরিয়া সফর করেন এবং ব্যবসায় দ্বিগুণ লাভ করেন। মহানবীর সততা, বিশ্বস্ততা, ভদ্রতা, পরোপকার-প্রবৃত্তি ও অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে খাদিজা (রা.) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গৃহীত হয়। বিয়ের ১৫ বছর পর মক্কার অদূরে অবস্থিত হেরা গুহায় ধ্যানরত অবস্থায় মহানবী (সা.)-এর ওপর ওহি (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ হলে তিনি কিছুটা ভীত হয়ে পড়েন; তখন হজরত খাদিজাই তাঁকে সাহস দেন। রাসুল (সা.) মক্কায় ইসলাম প্রচার শুরু করলে সকলেই তাঁর সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করে এবং তিনি কুরাইশদের অমানুষিক অত্যাচারের

শিকার হন। নবুয়তের সপ্তম বছরে মক্কার কুরাইশরা মোহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে একঘরে করে। তিন বছর পর্যন্ত তাঁদের বর্ণনাতীত কষ্ট সহ্য করতে হয়। এ সময়টা হজরত খাদিজা (রা.)-ই তাঁর পাশে থেকে সাহস দেন ও সর্ব-উপায়ে তাঁকে সাহায্য করেন। হজরত খাদিজা তাঁর অগাধ ধনসম্পদ ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যয় করেন। নবুয়তের দশম বছরে তাঁর মৃত্যু হয়।

**খালসা** অর্থ খালিস বা নির্দোষ, অকৃত্রিম। উৎসর্গীকৃত-প্রাণ শিখদের খালসা বলে উল্লেখ করা হয়। শিখদের দশম এবং শেষ গুরু গোবিন্দ সিং ১৬৯৯ সালের হিন্দু নববর্ষে এক সামরিক সৌভ্রাতৃত্বের সূচনা করেন। পাঁচজন নির্বাচিত ব্যক্তি, যাঁরা গুরুর আদেশে জীবন উৎসর্গ করতে সম্মত তাঁদের 'খণ্ডে কে পাহুল' বা তরবারির অভিসিঞ্চন দ্বারা দীক্ষা দান করা হয়। তাঁদের পাঞ্জ পিয়ারে বলা হতো এবং তাঁরা বিভিন্ন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একই পাত্র থেকে শর্করামিশ্রিত পানীয় পান করিয়ে তাদের সিং নামকরণ করা হতো। খালসার সদস্যদের জন্য অকর্তিত কেশ, দাঁড়ি ও পাগড়ির নিচে একটি কাঁকই রাখা এবং হাতে ইস্পাতের বালা ও হাঁটু অবধি চোগা পরিধান অবশ্যপালনীয় ছিল। এই পাঁচটি বিষয়কে একত্রে 'পাঞ্জ কক্কর' বলা হয়। শিষ্যদের দীক্ষা দানের পর গোবিন্দ রায় নিজে দীক্ষিত হয়ে গোবিন্দ সিং নাম গ্রহণ করেন। খালসা সদস্যরা পরস্পরকে এই বলে অভিনন্দিত করত : 'ওয়াহি গুরুজি কা খালসা ওয়াহি গুরুজি কি ফাতেহ' (অর্থাৎ, ঈশ্বরের পছন্দ খালসা, আমাদের ঈশ্বর জয়যুক্ত হোন)। ফাইজুল্লাপুরের কাপুর সিং অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে যে শিখধর্মীয় সংস্থা গঠন করেন তা পরে দল খালসা নাম গ্রহণ করে। রণজিৎ সিং নিজেকে ও তাঁর সম্প্রদায়কে সমষ্টিগতভাবে খালসা বা গুরু গোবিন্দের অনুসারী বলতেন। শিখদের সেনাবাহিনীও খালসা বাহিনী নামে পরিচিত হয়। অমৃতসরে শিখদের সমাজ সংস্কার সংস্থা খালসা দিওয়ানের সদর দপ্তর এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন খালসা কলেজ অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে খালসা নামটি শিখদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত।

**খালিদ ইবনে আরফাতাহ** মহানবী (সা.)-এর সাহাবি। ইরানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি কয়েকটি হাদিসও বর্ণনা করেন। মৃ. ৬০ হি.।

**খালিদ ইবনে ওলিদ** মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়া বিজয়ী বিখ্যাত আরব সেনাপতি। শৌর্য ও বীরত্বের জন্য তিনি সাইফুল্লাহ অর্থাৎ 'আল্লাহর অসি' উপাধি লাভ করেন। কুরাইশ বংশে এবং মক্কার ধনী ও প্রভাবশালী মাখজুম গোত্রে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ওলিদ ইবনে মুগিরাহ মুসলমানদের চরম শত্রু ছিলেন। ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে ওহোদের যুদ্ধে তরুণ খালিদের নেতৃত্বে মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের পরাজিত করে। পরে খালিদ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন (৬২৯ খ্রি.)। প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর (সা.)-এর নির্দেশে ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ভণ্ড নবী মুসায়লিমাকে যুদ্ধে হত্যা ও তাঁর অনুসারীদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খালিদ মারজরাহিত নামক স্থানে একটি বাইজানটাইন সেনাদলকে পরাজিত করে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে তাঁর বিজয় অভিযানের সূত্রপাত করেন। একই সময়ে আমর ইবনে আল-আসের নেতৃত্বে অপর একটি মুসলিম বাহিনী প্যালেস্টাইনের মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হয়। এই মিলিত বাহিনীর সাহায্যে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে আজ নাদাইন নামক স্থানে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে বাইজানটাইন বাহিনীকে পরাভূত করেন। অতঃপর ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে খালিদ দামেস্ক দখল করেন। এরপর অন্যান্য সিরীয় শহরও দ্রুত তাঁর পদানত হয়। ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি বাইজানটাইন বাহিনীকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেন। খালিদকে বিজিত অঞ্চলের বৃহত্তর অংশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। ৬০ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

**খিরকা** দরবেশি পোশাক। দেখতে অনেকটা চোগার মতো। ঢোলা হাতা ও লম্বায় গোড়ালি পর্যন্ত হয়ে থাকে। রং প্রধানত কালো, তবে নীল রঙের খিরকাও দেখা যায়। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলেই পীর নিজের মুরিদকে এই পোশাক পরার অনুমতি

দেন। যদিও অনেক বিজ্ঞ সুফি-দরবেশ এরূপ পরিধেয় সমর্থন করেন না। বাংলাদেশে খিরকা পরিহিত ফকির-দরবেশের সাক্ষাৎ প্রায়ই ঘটে।

**খিলাফত** আরবি শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিনিধিত্ব বা প্রতিনিধির পদ। অন্য অর্থে: (১) ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি ও (২) ইসলামি শাসন সংস্থা। খিলাফত থেকেই খলিফা শব্দটির উদ্ভব, যার অর্থ খিলাফত-সংগঠনের সর্বোচ্চ পদাধিকারী, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নেতা বা আমিরুল মুমেনিন। খুলাফা-ই-রাশিদিন (হজরত আবুবকর, হজরত উমর, হজরত উসমান ও হজরত আলী—এই চার খলিফা) মোটামুটি এ নীতির ওপর নির্বাচিত ছিলেন। চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রা.)-এর মৃত্যুর পর মুসলমানদের মধ্যে খিলাফত নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। মুয়াবিয়া নিজের পুত্র ইয়াজিদকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করার মাধ্যমে কার্যত খিলাফতের অবসান ঘটান ও বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও পরবর্তী শাসকেরা নিজেদের খলিফা ও তাঁদের শাসনকে খিলাফত নামে অভিহিত করতেন। মুয়াবিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উমাইয়াবংশীয় খলিফারা দামেস্কে অধিষ্ঠিত ছিলেন। খারিজি ও শিয়ারা তাঁদের স্বীকৃতি দেননি। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসীয় বংশ খিলাফত অধিকার ও বাগদাদে তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু উমাইয়াবংশীয়দেরই একজন প্রথম আবদুর রহমান স্পেনে পালিয়ে গিয়ে ৭৮০ সালে কর্ডোভায় একটি আমিরাত স্থাপন করেন, যা পরে করডোভার খিলাফত বা পাশ্চাত্য খিলাফত নামে পরিচিতি লাভ করে। এটি ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মুসলমানদেরই আরেকটি দল (শিয়া) ফাতিমীয় বংশ উত্তর আফ্রিকায়, বিশেষত মিসরে, ৯০৯-১১৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত খিলাফত পরিচালনা করেন। হালাকু খানের নেতৃত্বে মঙ্গোলীয়রা বাগদাদে প্রবেশ করলে আব্বাসীয় শাসকেরা মিসরে পালিয়ে যান ও সেখানে নামেমাত্র খিলাফত টিকিয়ে রাখেন। পরে ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে উসমানীয়-তুর্কি বংশ মিসর দখল করে এবং ওই বংশের সুলতান প্রথম সলিম খলিফা পদবি গ্রহণ করেন। সর্বশেষ উসমানীয় সুলতান ষষ্ঠ মোহাম্মদ (১৯১৮-২২) পর্যন্ত এই বংশের শাসকেরাই খলিফা উপাধি ধারণ করতেন। ১৯২২ সালে কামাল আতাতুর্ক ষষ্ঠ মোহাম্মদকে ক্ষমতাচ্যুত, সুলতানের পদ বিলুপ্ত এবং তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেন। ষষ্ঠ মোহাম্মদ পালিয়ে যান ও নির্বাসনে তাঁর মৃত্যু হয়। দেশত্যাগের পর তাঁকে খলিফার পদ থেকে অপসারণ করা হয়। তাঁর জ্ঞাতি ভাই আবদুল মজিদ খলিফার পদবিতেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু ১৯২৪-এ কামাল আতাতুর্ক খলিফার পদও বিলুপ্ত করেন এবং উসমানীয় বংশের সব লোককেই নির্বাসনে পাঠান। এর এক বছর পর আরবে বাদশাহ হুসেন ইবনে আলী নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন, কিন্তু ইবনে সউদ তাঁকে ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। এভাবে মুসলিম বিশ্বে খিলাফতের অবসান ঘটে।

**খেমটা নাচ** বাংলার লোকনৃত্যের একটি ধারা। খেমটা তালে ও গান সহযোগে পরিবেশিত হয়। এর প্রধান বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। এই নাচের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ঢোল, কাঁসি ও করতাল ব্যবহৃত হয়। একসময় বিয়ের আসরে খেমটা নাচ বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল। হিন্দুদের পুজোৎসবেও এর প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। মূলত মেয়েরাই এ নাচের শিল্পী। তবে কোনো কোনো অঞ্চলে হিজড়া শ্রেণীর লোকেরাও দল গঠন করে এই নাচ দেখায়।

**খোজা** ভারত উপমহাদেশীয় একটি ধর্মসম্প্রদায়। মূল পারসি শব্দটির অবশ্য নানা ধরনের অর্থ আছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইসমাইলিয়া এক ধর্মপ্রচারকের হাতে হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানরাই পরবর্তীকালে খোজা নামে পরিচিতি লাভ করে। ভারতের মুসলমান শাসকেরা ইসমাইলিয়াদের নির্যাতন করত বলে অনেক খোজা নিজেদের সুন্নি বা ইমামিয়া বলে পরিচয় দিত। বর্তমানে তিন ধরনের খোজা রয়েছে। বেশির ভাগ খোজাই অবশ্য আগা খানের অনুসারী নিজারি ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যরা সুন্নি বা ইমামিয়া খোজা। বর্তমানে এরা প্রধানত পশ্চিম ভারত ও পূর্ব আফ্রিকায় বাস করে।

**খ্রিষ্টধর্ম** যিশুখ্রিষ্টের প্রচারিত শিক্ষা বা আদর্শের ওপর গড়ে ওঠা ধর্মীয় মতবাদ। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা খ্রিষ্টানরূপে পরিচিত। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়, অর্থোডক্স ইস্টার্ন চার্চ প্রভৃতি 'ঐতিহ্যবাদী' খ্রিষ্টীয় সমাজ সনাতন ধর্মমত এবং আচার-অনুষ্ঠানকে রীতিসম্মতভাবে সম্প্রসারিত ও উন্নত করে অনুসরণ করেন বলে দাবি করেন। অন্যদিকে 'সংস্কারকৃত' ধর্মসমাজগুলো দাবি করে যে তারা মূল ধর্মে যাবতীয় 'মিথ্যা' সংযোজন ও উদ্ভাবন বাদ দিয়ে আদি খ্রিষ্টীয় মতবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। গোড়ায় রোমান সম্রাটদের দ্বারা খ্রিষ্টানরা নানাভাবে উৎপীড়িত হয়। সম্রাট প্রথম কনস্টানটাইন-ঘোষিত সহনশীলতার নীতির ফলে অবশ্য এই উৎপীড়ন হ্রাস পায়। কিন্তু পরবর্তীকালে খ্রিষ্টানদের মধ্যেই নানা মতপার্থক্য ও তা থেকে বিরোধের সূত্রপাত হয়। প্রথম দিকে এই মতপার্থক্যগুলো কেন্দ্রীভূত ছিল খ্রিষ্টীয় ত্রিত্ববাদের অন্তর্ভুক্ত অপর সত্তাদ্বয়ের সঙ্গে খ্রিষ্টের সম্পর্কের প্রকৃতি বিষয়ে। আর এই বিরোধী মতগুলোর মধ্যে ছিল অ্যায়ারিয়ানবাদ, নেস্টোরীয়বাদ ও একক প্রকৃতিবাদ (Monophysitism)। এসব মতবিরোধ নিরসনের জন্য কয়েকটি কাউন্সিলও (পরিষদ) আহূত হয়। কাউন্সিলে গৃহীত উত্তরগুলো নিষ্ঠাবানদের অভিমত বলে বিবেচিত হতো। আদিপর্বের কাউন্সিলগুলোর মধ্যে নাইসিয়ার কাউন্সিলই (৩২৫ খ্রি.) সর্বাধিক খ্যাত। প্রাচ্যে বাইজেনটীয় সম্রাটেরা চার্চ বা খ্রিষ্টীয় ধর্মসমাজের ওপর রাজশক্তির প্রাধান্য বজায় রাখতেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্যে পোপের শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই কেন্দ্র থেকেই খ্রিষ্টধর্মের সম্প্রসারণ ঘটে। প্যাগান বা পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বীদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিতকরণের ক্ষেত্রে খ্রিষ্টীয় সন্ত বা সাধুরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে এশিয়া মাইনর ও উত্তর আফ্রিকাতে খ্রিষ্টধর্মই প্রধান ধর্ম ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টানদের মধ্যে পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্নতা গড়ে ওঠে এবং ১০৫৪ সালের পর তা স্থায়ী রূপ নেয়।

**খ্রিষ্টান মিশনারি শিক্ষা** ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে দিনেমার পাদরি সুয়ার্ৎজের উদ্যোগে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় খ্রিষ্টীয় মিশনারি শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুরের দিনেমার কুঠিকে কেন্দ্র করে উইলিয়াম কেরি, ওয়ার্ড ও মার্শম্যান প্রমুখ বাংলায় ইউরোপীয় ধাঁচের শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এঁরা সকলেই ছিলেন খ্রিষ্টান মিশনারি। বাংলাদেশে এ ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল লন্ডন মিশনারি সোসাইটি, চার্চ মিশনারি সোসাইটি, স্কটিশ মিশনারি সোসাইটি প্রভৃতি। এর মধ্যে লন্ডন মিশনারি সোসাইটি রেভারেন্ড মের নেতৃত্বে ১৮১৪ থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে চুঁচুড়ার চারপাশে ৩৬টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। চার্চ মিশনারি সোসাইটি বর্ধমানে ১০টির বেশি দেশি বিদ্যালয় স্থাপন করে। বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে নীতিশিক্ষামূলক কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকও প্রকাশ করে তারা। তাদের নীতিগত উগ্রতা ও ধর্মপ্রচারের বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও এ দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার, উদারনৈতিক ভাবধারার পৃষ্ঠপোষকতা, নারীশিক্ষার উদ্যোগ, উন্নত স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব অনেকটা তাদেরই।

## গ

**গওস, গাউস** দরবেশের স্তরবিশেষ। সুফি-দরবেশদের প্রধানকে বলা হয় কুতুব। আর সাধারণভাবে কুতুবের পরবর্তী ঊর্ধ্বতন পর্যায় হলো গওস। কুতুবকেও গওস বলা হয়, যখন লোকে ভাবে যে তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে পাওয়া যেতে পারে। কারও কারও মতে, গওস হলো কুতুবের নিকটতম পরবর্তী স্তর।

**গগ** বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লেখিত একজন অত্যাচারী নেতা। বাইবেলে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, এই ব্যক্তি ম্যাগগদের দেশে আবির্ভূত হয়ে ইসরাইল আক্রমণ করবে ও শেষে পরাজিত হবে। গগকে অনেক সময় সিথীয় বলেও ধারণা করা হয়। বাইবেলের এক স্থানে গগ ও ম্যাগগ উভয় পক্ষকে আক্রমণকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামি উপাখ্যানের ইয়াজুজ-মাজুজের সঙ্গে তুলনীয়।

**গঙ্গা** নদী। হিন্দু দেবী। পুরাণে উল্লেখিত রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে দেবতা ইন্দ্র সেই

যজ্ঞের অশ্ব হরণ করে তা পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে রেখে আসেন। অশ্বের খোঁজে সগরের ৬০ হাজার উচ্ছৃঙ্খল পুত্র পাতালে প্রবেশ করে কপিল মুনিকেই চোর ভ্রমে অত্যাচার করতে উদ্যত হলে কপিল তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকান। তাঁর সেই অগ্নিদৃষ্টিতে সগরের পুত্ররা ভস্ম হয়ে যায়। বহু সহস্র বছর পর সগরবংশীয় রাজা দিলীপের পুত্র ভগীরথ তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে স্বর্গ থেকে গঙ্গা আনার বর লাভ করেন। স্বর্গ থেকে প্রবল বেগে পতনের কালে মহাদেব গঙ্গাকে নিজ মস্তকে ধারণ করেন। তারপর গঙ্গা হলদিনী, পাবনী, নলিনী, সুচক্ষু, সিন্ধু ও ভাগীরথী—এই সাতটি ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। পথিমধ্যে গঙ্গাস্রোতে জহ্নু মুনির আশ্রম ভেসে গেলে ক্রুদ্ধ মুনি গঙ্গাকে পান করে ফেলেন। তখন ভগীরথ তপস্যা দ্বারা মুনিকে তুষ্ট করলে মুনি নিজ জানু ভেদ করে গঙ্গাধারাকে আবার প্রবাহিত করেন। সেই থেকে গঙ্গার আরও দুটি নাম হয় জহ্নুকন্যা ও জাহ্নবী। পরে গঙ্গা সমুদ্রে প্রবেশ করলে সেই পবিত্র জলরাশি পাতালে কপিল মুনির আশ্রমের ভস্মরাশি স্পর্শ করে। এতে সগরের পুত্ররা তাৎক্ষণিক পুনর্জীবন লাভ করে। এ ছাড়া গঙ্গাকে হিমালয়ের কন্যা এবং মহাদেবের স্ত্রীরূপেও কল্পনা করা হয়। ভগীরথ আনয়ন করেন বলে গঙ্গার একটি ধারার নাম ভাগীরথী। স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল—এই তিন পথে প্রবাহিত বলে গঙ্গার অপর নাম ত্রিপথগা।

**গঙ্গেশ উপাধ্যায়** মিথিলার পণ্ডিত ও নব্যন্যায়ের প্রবর্তক। আসল নাম গঙ্গেশ্বর। তাঁর সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে, প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন মূর্খ, পরে শ্মশানে কালীর উপাসনা করে আস্তিক্য-নাস্তিক্য উভয় শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অভিনব বিচারপ্রণালি এবং পরিভাষা উদ্ভাবন করে তিনি ন্যায়শাস্ত্র চর্চায় নতুন যুগের সূচনা করেন। ন্যায়সূত্র অনুযায়ী প্রমাণ চার ধরনের: প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই চারটি প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে তিনি চার খণ্ডে *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থটি রচনা করেন। সপ্তদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত এই *তত্ত্বচিন্তামণির* ব্যাখ্যাকারদের দ্বারাই নবদ্বীপে ন্যায়দর্শনের ব্যাপক চর্চা হয়।

**গজকচ্ছপ** হিন্দু পুরাণমতে, শাপগ্রস্ত দুই ঋষিভ্রাতা। বিভাবসু ও সুপ্রতীক নামে দুই ঋষিভ্রাতার মধ্যে বিভাবসু ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তিনি ছিলেন কোপনস্বভাব। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতীক সম্পত্তি ভাগের জন্য বারবার বিভাবসুকে অনুরোধ করলে তিনি রাগান্বিত হয়ে সুপ্রতীককে 'তুই হস্তী হ' বলে অভিশাপ দেন। সুপ্রতীকও পাল্টা বিভাবসুকে 'তুমি কচ্ছপ হও' বলে শাপ দেন। ফলে দুই ভাই গজ এবং কচ্ছপরূপে এক সরোবরে গিয়ে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। পরে ঋষি কশ্যপ ও বিনতার পুত্র গরুড় যখন অমৃত আনার জন্য স্বর্গযাত্রা করেন, তখন পথিমধ্যে তিনি গজকচ্ছপকে এক পর্বতশৃঙ্গে নিয়ে গিয়ে আহার করেন।

**গজব** আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে যে শাস্তি দেওয়া হয়। মানুষ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে মন্দ কাজ করতে থাকলে আল্লাহ পৃথিবীতেই তার ওপর গজব বা শাস্তি নাজিল করেন। পবিত্র কোরআনের সুরা আল-ই-ইমরান-এর ১১২ আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির বাইরে যেখানেই তাদের পাওয়া গেছে সেখানেই তারা অপদস্থ হয়েছে। তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়েছে। তা এ জন্য যে তারা আল্লাহর নিদর্শনগুলো অস্বীকার করত আর অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করত; এ জন্য যে তারা অবাধ্য হয়েছিল ও সীমা লঙ্ঘন করেছিল।'

**গজল** সংগীতের একটি ধারা। গজল গানকে প্রণয়সংগীতও বলা হয়। এই লঘু রাগসংগীতের উদ্ভব পারস্য বা বর্তমান ইরানে। নরনারীর বিচিত্র অনুভব যেমন: পূর্বরাগ, অনুরাগ, মনস্তাপ, বিরাগ, বিচ্ছেদ, আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি, বিরহ, মিলন ইত্যাদির পাশাপাশি এতে আল্লাহর প্রতি প্রেম, ভক্তি ও ভালোবাসাও প্রকাশ পায়। পারস্যের শ্রেষ্ঠ সাধক-কবিদের রচিত গজলে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা ভাষায় গজল রচনার পথিকৃৎ অতুলপ্রসাদ সেন। পরবর্তীকালে নজরুল বাংলা গানের এই ধারাটিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় করে তোলেন।

**গজাসুর** স্কন্দ পুরাণোক্ত মহাশক্তিধর অসুর। গজের আকৃতিবিশিষ্ট। মহেশ নামে জনৈক রাজা দেবর্ষি

নারদকে অসম্মান করায় নারদের অভিশাপে পরজন্মে তিনি দুর্ধর্ষ দানব হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। গজাসুর স্বর্গের দেবতাদের ওপর অত্যাচার আরম্ভ করলে অতিষ্ঠ হয়ে শিব তাকে বধ করেন এবং তার চামড়া দিয়ে নিজের বসন তৈরি করেন।

**গণ** হিন্দু পুরাণ অনুসারে শিবের অনুচরবৃন্দ। নন্দীই এঁদের প্রধান। শিব-পার্বতীর সেবাই তাঁদের প্রধান কর্তব্য। শিব বা গণেশের আদেশ অমান্য করলে শাস্তিস্বরূপ তাঁদের কৈলাস থেকে পৃথিবীতে নির্বাসন দেওয়া হতো।

**গণদেবতা** হিন্দুদের পূজিত অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর দেবতাসমষ্টি। তাঁরা নয় ভাগে বিভক্ত: আদিত্য ১২ জন, বিশ্বদেব ১০ জন, বসু ৮০ জন, তুষিত ৩৬ জন, আভাস্বর ৬৪ জন, বায়ু বা অনিল ৪৯ জন, মহারাজিক ২২০ জন, সাধ্য ১২ জন এবং রুদ্র ১১ জন।

**গণেশ** হিন্দুধর্মে শিব ও পার্বতীর পুত্র এবং সিদ্ধিদাতা হিসেবে পূজিত। তিনি খর্বাকৃতি, ত্রিনয়ন, চতুর্ভুজ এবং হস্তীমস্তক। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী গণেশের বাহন হচ্ছে ইঁদুর। বিষ্ণুর বরে পার্বতী পুত্র লাভ করলে নবজাত শিশুকে দেখার জন্য যখন দেবতারা উপস্থিত হন তখন শনিদেবের দৃষ্টিপাতে গণেশের মস্তক বিলুপ্ত হয়। পরে বিষ্ণুর কৃপায় হস্তীমুণ্ড পেয়ে গণেশ বেঁচে ওঠেন। হস্তীমুণ্ড গণেশ যাতে অবহেলিত না হন সে জন্য দেবতারা নিয়ম করেন যে মঙ্গল ও সিদ্ধির জনক হিসেবে গণেশের পূজা দিতে হবে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণমতে, শিব-পার্বতীর দ্বাররক্ষক ছিলেন গণেশ। সেখানে এক ভীষণ যুদ্ধে পরশুরামের কুঠারাঘাতে গণেশের একটি দাঁত উৎপাটিত হয়। এ জন্য গণেশ একদন্ত। গণেশ ছিলেন মহাভারতের লিপিকর। তাঁর অনেক নাম, যথা—গজানন, লম্বোদর, বিনায়ক, সিদ্ধিদাতা প্রভৃতি। বাংলায় গণেশপূজা সাধারণত আলাদাভাবে হয় না; দুর্গাপূজার সময় অন্যান্য দেবতার সঙ্গে তাঁরও পূজা হয়। দক্ষিণ ভারতে সাড়ম্বরে গণেশের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু ব্যবসায়ীরা বসতঘরে কিংবা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে গণেশের মূর্তি বা ছবি রাখেন এবং তাঁর পূজা করেন। ব্যবসায় লোকসান বোঝাতে বাংলা ভাষায় 'গণেশ ওল্টানো' বাগধারাটি চালু আছে।

**গদাধর ভট্টাচার্য** নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তাঁর পিতার নাম জীবাচার্য। মিথিলায় অধ্যয়ন করে তিনি স্মৃতিশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পরে নবদ্বীপে টোল খুলে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন এবং পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। *কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যা, তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি, ব্রহ্মনির্ণয়, মুক্তাবলি টীকা* ইত্যাদি গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। মৃত্যু ১৬৫০ সালে।

**গন্ধর্ব** স্বর্গের গায়ক, দেবযোনি। অত্যন্ত রূপবান। বাসস্থান গন্ধর্বলোকে, বিদ্যাধরলোকের নিম্নে ও গ্রহলোকের ঊর্ধ্বে। দেবতাদের বিশ্বস্ত অনুচর ও ঔষধি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। সোমরসের প্রস্তুতকারক ও রক্ষক। সোমরস পানে সব ধরনের নিরাময় হতো বলে গন্ধর্বদের স্বর্গবৈদ্যও বলা হতো। সুন্দরী নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা মাঝেমাধ্যে পৃথিবীতেও নেমে আসত। এ জন্য স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক পছন্দের ফলে যে বিয়ে হয় তা গান্ধর্ব বিয়ে নামে প্রচলিত। বিষ্ণু পুরাণের মতে, ব্রহ্মার কান্তি থেকে গন্ধর্বদের জন্ম। মতান্তরে কশ্যপ ও তাঁর স্ত্রী অরিষ্টা এঁদের পিতামাতা। চিত্ররথ, হাহা, হুহু, হংস, বিশ্ব-বায়ু, সোমায়ু, তুম্বুরু, নন্দী প্রভৃতি গন্ধর্বদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন মার্গ বা শাস্ত্রীয় সংগীতে পারদর্শী গায়ক-বাদক শ্রেণীকেও গন্ধর্ব বা গান্ধর্ব বলা হয়।

**গম্ভীরা** বাংলা লোকসংগীতের একটি ধারা। আদিতে শিবপূজাকে কেন্দ্র করে এই গান গাওয়া হতো। শিবের এক নাম 'গম্ভীর'। সম্ভবত তা থেকেই গম্ভীরা শব্দটির উৎপত্তি। আদিতে গম্ভীরা ছিল দুই প্রকার : আদ্যের গম্ভীরা ও পালা গম্ভীরা। মানুষের সুখ-দুঃখের কথাই ছিল আদ্যের গম্ভীরার বিষয়। দেব-দেবীকে উদ্দেশ করেই তা বলা হতো। কখনো কখনো সারা বছরের প্রধান প্রধান ঘটনা এই গানে বয়ান করা হতো। পক্ষান্তরে পালা গম্ভীরায় অভিনয়ের মাধ্যমে কোনো-না-কোনো সমস্যাকে তুলে ধরা হতো। আর চৈত্রসংক্রান্তিতে এ গান গাওয়া হতো। গম্ভীরা গানের উৎপত্তি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায়। তখন প্রধানত হিন্দুসমাজেই এই গানের

প্রচলন ছিল। মালদহের গম্ভীরা নাচে মুখোশের ব্যবহার আছে। দেশ বিভাগের পর রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ প্রভৃতি স্থানে এ গান বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে গম্ভীরা গানে সামাজিক বিষয়াদির উপস্থাপনই প্রাধান্য পেতে থাকে। বর্তমানে শিবের পরিবর্তে 'নানা-নাতি'র ভূমিকায় দুজন অভিনয় করেন। গানের ধুয়ায়ও এসেছে পরিবর্তন ('শিব হে'-র পরিবর্তে 'নানা হে')। দোহাররা যখন ধুয়া গায় তখন নানা-নাতি উভয়ে সরল ভঙ্গিতে হাত-পা নেড়ে ও কোমর দুলিয়ে নাচে। নাতির পায়ে থাকে ঘুঙুর। এই গানে হারমোনিয়াম, বাঁশি, ঢোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। নবাবগঞ্জের কুতুবুল আলম, রকিবউদ্দীন প্রমুখ গম্ভীরা গানের বিশিষ্ট শিল্পী।

**গরগন** গ্রিক পুরাণে উল্লেখিত ফোর্সিস ও কেটোর তিন দানবীকন্যা। সাগরদেব পন্টাস ও মর্তদেবী গেইয়ার তারা প্রপৌত্রী। এদের নাম হলো স্থেন্নো, ইউরেলি ও মেডুসা। এদের মধ্যে একমাত্র মেডুসাই ছিল মরণশীল। গরগন ভগ্নিরা তিনজনই ছিল ভীষণদর্শনা এবং দৃষ্টি দিয়ে তারা নিমেষেই মানুষকে পাথর বানাতে পারত।

**গরুড়** হিন্দু পুরাণে উল্লেখিত বিষ্ণুর বাহন। ঋষিরাজ কশ্যপ ও তাঁর স্ত্রী বিনতার পুত্র। দেহাকৃতিতে অর্ধমানব ও অর্ধপক্ষী। এর গাত্রবর্ণ স্বর্ণাভ, পক্ষ রক্তিম ও মুখ শ্বেতবর্ণ। নখ ও ঠোঁট পাখির মতো। গরুড় সর্পকুলের প্রধান শত্রু। তাঁর পুত্রের নাম সম্পাতি। রাম ও লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক নাগপাশে বদ্ধ হলে গরুড় তাঁদের মুক্ত করেন। কাশ্যপী, বৈনতেয়, সুপর্ণ, কামায়ুধ, বিষ্ণুরথ, রক্তপক্ষ, খগরাজ, খগপতি, সুধাহর, সুরেন্দ্রজিৎ, বজ্রজিৎ ইত্যাদি বিভিন্ন নামেও গরুড় পরিচিত।

**গরুড় পুরাণ** হিন্দুদের অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে এটি সপ্তদশ। গরুড় কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে কৃষ্ণ এটি বর্ণনা করেন বলে এর এরূপ নামকরণ। পুরাণটি দুই খণ্ডে বিভক্ত : পূর্ব খণ্ড ও উত্তর খণ্ড। পূর্ব খণ্ডে বিষ্ণুর সহস্র নাম, গ্রহযোগ, অশৌচবিধি, আয়ুর্বেদ, রামায়ণ, হরিবংশ ইত্যাদি এবং উত্তর খণ্ডে সপ্তালোকের বর্ণনা এবং মৃত্যুর আগের ও পরের জীবনের বিবরণ রয়েছে।

**গরুড়বাহন** অর্থ গরুড়ধ্বজ যাঁর চিহ্ন। বিষ্ণু, নারায়ণ।

**গরুড়াস্ত্র** হিন্দু পুরাণোক্ত অস্ত্রবিশেষ। নাগপাশের প্রতি-অস্ত্র। নাগপাশে বদ্ধ ব্যক্তির প্রতি এই অস্ত্র প্রয়োগ করলে নাগপাশের নাগগণ ভয়ে পালিয়ে যায়। নাগপাশ মোচন হয়।

**গর্গ** পুরাণোক্ত ঋষি। বৃহস্পতির বংশে জাত ও যাদবদের কুলগুরু এই পণ্ডিত জ্যোতির্বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। বৈয়াকরণ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ গার্গ এবং বিদুষী গার্গী যথাক্রমে তাঁর পুত্র ও কন্যা।

**গর্ডিয়াস** গ্রিক পুরাণ কথিত একজন ফ্রিজিয়ান রাজা, যাঁকে তাঁর রথের ঘোড়ার সঙ্গে শক্তভাবে বাঁধা হয়েছিল। ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে এই বাঁধন যিনি খুলতে পারবেন তিনি সমগ্র এশিয়ার সম্রাট হবেন। গ্রিক বীর আলেকজান্ডার শত চেষ্টা করেও বাঁধনটা খুলতে পারেননি। শেষে তিনি অবশ্য তাঁর তরবারি দ্বারা রশিটি কেটে ফেলেন।

**গাঙ্গেয়** কুরুবংশের রাজা শান্তনুর প্রথমা স্ত্রী গঙ্গার গর্ভে ভীষ্ম জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁর এক নাম গাঙ্গেয়।

**গাজন** চৈত্রসংক্রান্তি থেকে শুরু করে আষাঢ়ী পূর্ণিমা পর্যন্ত পালিত লৌকিক অনুষ্ঠান। এ উৎসবের মূল লক্ষ্য সূর্য ও তাঁর পত্নীরূপে কল্পিত পৃথিবীর বিয়ে। গাজনের সঙ্গে নানা পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতার নাম সম্পৃক্ত। শিবের গাজন, নীলের গাজন, ধর্মের গাজন ইত্যাদি চৈত্রসংক্রান্তির গাজন সাধারণত তিন দিন ধরে চলে। মন্দির প্রাঙ্গণে নানা রকম কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে দেবতাকে তুষ্ট করার চেষ্টা হয়। এ উপলক্ষে শিব সম্পর্কে নানা ছড়াও বলা হয়।

**গাজ্জালি, ইমাম** ইসলামি পণ্ডিত ও দার্শনিক। পুরো নাম আবু হামিদ মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ আততুসি আল-শাফেয়ি। ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের তুস শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন গাজ্জাল অর্থাৎ সুতা ব্যবসায়ী। সেই থেকে তাঁর পারিবারিক উপাধি আল-গাজ্জালি। ইমাম গাজ্জালির মতে, শুধু দার্শনিক যুক্তিবাদ নয়, তার সঙ্গে আসমানি জ্ঞানের সমন্বয়ই মানুষকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করতে পারে। গাজ্জালি ৫৬টি পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। শেষ বয়সে তিনি তুসে ফিরে

আসেন ও নির্জনবাসে ১১১১ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর লেখা *কৌমিয়া সাহাদাত*-এর বাংলা অনুবাদ *সৌভাগ্য স্পর্শমণি* ও *এহিয়া উলুমুদ্দিন* বাংলাদেশে বহুলপঠিত দুটি পুস্তক।

**গাদির আল খুম** অর্থ 'খুমের চৌবাচ্চা'। মক্কা ও মদিনার মাঝামাঝি অবস্থিত এক মরূদ্যান। বিদায় হজের পর মক্কা থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পথে এ স্থানেই আলী (রা.)-এর হাত তুলে ধরে হজরত মোহাম্মদ (সা.) সহযাত্রীদের উদ্দেশে ঘোষণা করেছিলেন যে, তারা যেভাবে তাঁকে শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করেছে সেভাবেই যেন আলী (রা.)-কেও গণ্য করে। প্রকৃত ঘটনাটি হলো, মক্কায় প্রবেশের আগে মুসলমান-পক্ষের অনেকে ভালো পোশাক, যেমন—মালে গনিমত হিসেবে প্রাপ্ত কটি পরেন, যা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। সামরিক শৃঙ্খলার খাতিরে আলী (রা.) সৈনিকদের প্রতি তাদের আগের পোশাক পরার নির্দেশ দিলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এ পর্যায়ে কেউ কেউ হজরত আলী (রা.)-এর নেতৃত্ব মানতে অস্বীকৃতি জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে রাসুল (সা.) এভাবে আলী (রা.)-এর প্রতি তাঁর সমর্থন প্রকাশ করেন। শিয়ারা আলী (রা.)-এর প্রতি এই সমর্থনের ঘটনাটিকে মহানবীর (সা.) পর ইসলামি জগতে নেতৃত্বের ভার আলী (রা.)-এর ওপর অর্পণের ইঙ্গিতবহ বলে মনে করেন এবং সে অনুযায়ী আলী (রা.)-কেই প্রথম ইমাম গণ্য করেন।

**গান্ধার** জনপদবিশেষ। সিন্ধু নদের পশ্চিম তীর থেকে আফগানিস্তানের অধিকাংশ এলাকা পুরাকালে এই নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান কান্দাহারই সেই প্রাচীন গান্ধার নগর।

**গান্ধারী** কৌরবজননী। গান্ধারদেশের রাজা সুবলের কন্যা। গান্ধারদেশের কন্যা বলে তাঁর নাম গান্ধারী। সুন্দরী ও বিদুষী হওয়া সত্ত্বেও মাতা-পিতার ইচ্ছায় তিনি জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে পতিরূপে গ্রহণ করেন। স্বামীকে কোনোভাবে অতিক্রম করবেন না—এই প্রতিজ্ঞা থেকে তিনি সর্বদা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা নিজের চোখ বেঁধে রাখতেন। ব্যাসদেবের বরে তাঁর দুর্যোধন, দুঃশাসন ও দুঃসহ প্রভৃতি শতপুত্র ও দুঃশলা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনকে সৎপথে থাকার পরামর্শ দিয়েও তিনি তাঁকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে পারেননি। পরে যুদ্ধে শতপুত্র হারিয়ে পাণ্ডবদের অভিশাপ দিতে চাইলে পাণ্ডবরা শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে মার্জনা চাইতে আসেন। তখন গান্ধারীর দৃষ্টিপাতে যুধিষ্ঠিরের নখাগ্রগুলো কুৎসিত হয়ে যায়। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ১৫ বছর পাণ্ডবদের আশ্রয়ে ও অতঃপর বাণপ্রস্থ নিয়ে রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে থাকেন এবং সেখানে দাবানলে প্রাণ বিসর্জন দেন।

**গায়ত্রী** বৈদিক মন্ত্রবিশেষ। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এই মন্ত্র দ্বারা সূর্যের উপাসনা করতে হয়। মন্ত্রটি এই: ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। আর এর অর্থ: 'সর্বলোক-প্রকাশক সর্বব্যাপী সেই পূর্ণমণ্ডল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করছেন।' দেবীরূপে গায়ত্রী হলেন ব্রহ্মার স্ত্রী এবং চতুর্বেদের মাতা। গীতকারীদের ত্রাণ করেন বলে তাঁর নাম গায়ত্রী। গায়ত্রীর শক্তিতে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হয়েছিলেন।

**গায়েব বা গায়িব** শব্দের অর্থ অনুপস্থিত, লুক্কায়িত। বাংলা ভাষায় 'গায়িব' শব্দটি 'অদৃশ্য' বা 'গোপন' অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইসলামি অধ্যাত্মবাদ অনুযায়ী এর দ্বারা এমন এক অদৃশ্য জগতের কথা বোঝানো হয়, কেবল যুক্তি দিয়ে যা বোঝা বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। একসময় জাদুবিদ্যা ও মরমিয়াবাদ-সম্পর্কিত পুস্তকের শীর্ষদেশে প্রায়ই 'আল-গায়িব' কথাটা লেখা থাকত। সুফিরা এ প্রসঙ্গে 'আল-গায়িবাহ' শব্দটি ব্যবহার করেন। এর দ্বারা অহমের পূর্ণ বিলোপের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সমস্ত পার্থিব বিষয় থেকে দূরে মানসিক অবস্থানকে বোঝায়। পীর-দরবেশদের গায়িবি বাণী অনেকটা এই ধরনের। শিয়া সম্প্রদায়ের মতে, তাঁদের সর্বশেষ ইমাম, যিনি শেষ জমানায় 'মাহদি' হিসেবে আবির্ভূত হবেন তিনি বর্তমানে গায়েব হয়ে আছেন।

**গায়ের মুয়াক্কাদা** অথবা গায়ের রাওয়াতিব। এমন ইবাদত, যার জন্য হজরত মোহাম্মদ (সা.) তাঁর উম্মতদের জোর করেননি।

**গার্গ** বেদজ্ঞ ঋষি। মহর্ষি গর্গের পুত্র ও বিদুষী গার্গীর সহোদর। জ্যোতিষশাস্ত্রেও তিনি পণ্ডিত ছিলেন। 'গার্গসংহিতা' নামে জ্যোতিষগ্রন্থের প্রণেতা। গার্গের ঔরসে ও অপ্সরা গোপালীর গর্ভে যাদবদের শত্রু কালযবনের জন্ম।

**গার্গী** বৈদিক যুগের বিদুষী নারী। তিনি গর্গ ঋষির কন্যা এবং পণ্ডিত গার্গের সহোদরা। মিথিলার রাজা জনকের যজ্ঞসভায় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ ও বেদজ্ঞ নির্ণয় প্রতিযোগিতায় তিনি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে সূক্ষ্ম শাস্ত্রালোচনা করেন। প্রতিযোগিতায় যাজ্ঞবল্ক্য জয় লাভ করলেও গার্গী ব্রহ্মবাদ এবং বেদশাস্ত্রের বিস্ময়কর প্রতিভা বলে স্বীকৃতি পান।

**গিওগি** (৬৭০-৭৪৯ খ্রি.) গিওগি বসাতসু, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও ধর্মপ্রচারক। জন্ম কোরিয়ায়। তিনিই প্রথম শিন্টো মতবাদ ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা পরবর্তী শতাব্দীতে ফলপ্রসূ হয়। জাপানি সভ্যতার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গণ্য করা হয় তাঁকে। ধারণা করা হয় যে তিনিই কুম্ভচক্রের উদ্ভাবক। সেতু, সড়ক নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কাজেরও উৎসাহদাতা ছিলেন।

**গিলগামেশ** প্রাচীন ব্যাবিলীয়নের কাব্য। রচনাকাল আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সাল। ১২টি টালির ফলকে কিউনিফর্ম লিপিতে প্রায় ৩ হাজার চরণে লিখিত এই কাব্যটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় সম্রাট আসুরবানিপলের বিখ্যাত গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। এটি কাব্যের অ্যাসিরীয় সংস্করণ। কাব্যের নায়কের নাম গিলগামেশ। লোকশ্রুতি অনুসারে গিলগামেশ উরুক রাজ্যের রাজা ছিলেন। এই কাব্যে গিলগামেশের দুঃসাহসিক অভিযান, তাঁর হাতে দেবী ইশতারের লাঞ্ছনা, অর্ধষাঁড়-অর্ধমানব এনকিদুর সঙ্গে প্রথমে দ্বন্দ্ব ও পরে বন্ধুত্ব, তার সঙ্গে নানা দেশ পরিভ্রমণ শেষে স্বর্গলোকে পূর্বপুরুষ উৎনাপিশতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অমরত্বের উপায় প্রার্থনা এবং তা লাভে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে চিরযৌবন লাভের ওষুধ নিয়ে পৃথিবীর উদ্দেশে রওনা হওয়া ও পথিমধ্যে মন্ত্রপূত উদ্ভিদটি অপহৃত হওয়ার কাহিনি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

**গিলগুল** হিব্রু শব্দটির অর্থ তরঙ্গ। জন্মান্তরের পারিভাষিক পদ। ইহুদি ধর্মে জন্মান্তরবাদের কোনো স্থান না থাকলেও তার মরমি ঐতিহ্যে এটির গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। আত্মার উৎকর্ষ সাধন ও পূর্বজীবনের পাপ স্খলনের একটি বড় সুযোগ হিসেবে গণ্য করা হয় একে।

**গিলমান** জান্নাতের চিরকিশোর সেবক। পবিত্র কোরআনের সুরা তুর-এর ২৪ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে গিলমান (চিরকিশোরেরা), যারা সংরক্ষিত মুক্তার মতো।' সুরা ওয়াকিয়া-এর ১৭-১৯ আয়াতে বলা হয়েছে, 'জান্নাতে যারা থাকবে তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে গিলমান (চিরকিশোরেরা) পানপাত্র, কুঁজো ও ঝরনাঝরা সুরায় ভরা পেয়ালা নিয়ে। সেই সুরাপানে তাদের মাথা ধরবে না, তারা জ্ঞান হারাবে না।' সুরা দাহর-এর ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে গিলমান (চিরকিশোরেরা), যাদের দেখে মনে হবে, ওরা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তো।'

**গীতগোবিন্দ** সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত কাব্য। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব এটি রচনা করেন। কাব্যটির মূল উপজীব্য বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ও রাধার লীলা। শৃঙ্গাররসের পরিবেশে ভক্তিতত্ত্বের এক অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে এতে। কাব্যটি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

**গীতা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** হিন্দুদের অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষায় রচিত। মহাকবি বেদব্যাস এর রচয়িতা। দ্বাপর যুগের অবতার পরমপুরুষ কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয় নিধনে বিমুখ অর্জুনকে শত্রু নিধনে উৎসাহিত করতে যে উপদেশগুলো দান করেন, তা-ই এর বিষয়। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের সংলাপই মূলত গীতা হিসেবে সংকলিত হয়েছে। কাব্যটি ১৮টি অধ্যায়ে ও ছয়টি ষটকে বিভক্ত। প্রথম ষটকে কর্মযোগ, দ্বিতীয়টিতে জ্ঞানযোগ এবং তৃতীয়টিতে ভক্তিযোগ আলোচিত হয়েছে। গীতায় মোট ৭০০ শ্লোক রয়েছে, তাই এর অপর নাম সপ্তশতী। গুরু ও সারথি কৃষ্ণ শিষ্য অর্জুনকে বেদ-উপনিষদ, সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত ও

ভাগবত চিন্তাধারায় উপদেশ দেন। গীতায় বেদান্তের সঙ্গে ভক্তিযোগের সমন্বয় ঘটেছে। গীতার আবেদন বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রকম। শঙ্করাচার্য ও তাঁর অনুসারীদের কাছে জ্ঞানযোগই হলো গীতার চরম লক্ষ্য। অরবিন্দ ও তাঁর ভক্তদের কাছে ভক্তিযোগই মূল কথা। অন্যদিকে গান্ধী ও তাঁর অনুসারীদের কাছে গীতার সার্থকতা তার কর্মযোগে।

**গীত-সংহিতা,** খ্রিষ্টান সামস (Psals) বা সল্টার (Psalter)। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ১৫০টি উত্তম ধর্মসংগীতের সংকলন। এর অনেকগুলো ডেভিডের রচিত বলে মনে করা হয়।

**গুণ** আক্ষরিক অর্থ সূত্র। সাংখ্য ও যোগদর্শনে কথাটি প্রকৃতির অপ্রধান উপাদান বা মাত্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনিতেও ভারতীয় দর্শনে গুণ কথাটি সত্ত্বগুণ বা উপাদান অর্থে বিবেচিত হয়। সেই অর্থে গুণ কথাটার মানে প্রকৃতির কোনো গুণ নয়, বরং প্রকৃতির আসল রূপ। প্রকৃতি এখানে প্রাথমিক বা প্রধান, গুণ হচ্ছে অপ্রধান। যেমন বস্ত্র প্রাথমিকভাবে বস্ত্র, কিন্তু অপ্রধান বা দ্বিতীয়ার্থে সুতার বুনট। সমগ্র বিশ্ব বিভিন্ন অনুপাতে তিনটি গুণের সমন্বিত রূপ। অনেকটা তিনটি সুতায় পাকানো দড়ির মতো। গুণগুলো হলো সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এর মধ্যে সত্ত্ব গুণটির দ্বারা জ্ঞান, আনন্দ, জয় ও ঔজ্জ্বল্যকে বোঝানো হয় । রজঃ হচ্ছে কামনা, উচ্চাশা, আবেগ, ক্রিয়া ও ক্রোধ। তমঃ হচ্ছে অন্ধকার, আলস্য, অবিদ্যা ও বিমোহ। আত্মার কর্তব্য হচ্ছে এই তিন গুণ থেকেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা। সত্ত্বগুণ পবিত্র ও উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও তা বড় মনের পক্ষে একটা দৌর্বল্য হয়ে দেখা দিতে পারে এবং আত্মাকে প্রজ্ঞা ও আনন্দ দ্বারা আকৃষ্ট করতে পারে।

**গুপ্ত প্রেস ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা** বাংলা পঞ্জিকা। তবে বাংলা সন ছাড়াও এই পঞ্জিকায় শকাব্দ, সংবৎ এবং হিজরি সনেরও হিসাব থাকে। ১২৭৬ বঙ্গাব্দে এটি কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ পঞ্জিকাটিতে বারফল ও রাশিফল ছাড়াও ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের শুভাশুভ যোগের উল্লেখ থাকে। এ ছাড়া এতে সৌর মাস অনুযায়ী জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বয়ঃসন্ধি, অন্নপ্রাশন, নামকরণ, শিশুশিক্ষায় হাতেখড়ি, পালা-পার্বণ, কৃষি, গবাদিপশু, আবহাওয়া প্রভৃতি-সংক্রান্ত শুভাশুভ তারিখ ও লগ্ন দেওয়া থাকে। আরও থাকে হিন্দুধর্মের আচার ও কৃত্যাদির নিয়মাবলি, হিন্দু মেয়েদের ব্রতাদির নিয়মকানুন, খনার বচন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ, ওরস ও মেলা-সম্পর্কিত তথ্যাদি।

**গুপ্তবিদ্যা** (Occultism) অলৌকিক কিংবা ওই ধরনের ক্ষমতা আবাহন বা জাগ্রত করতে সক্ষম, এমন বিদ্যা বা আচারপদ্ধতি। গূঢ় রহস্যবাদে বিশ্বাস ও তার অনুশীলন। গুপ্তবিদ্যার ভিত্তি হলো অতিপ্রাকৃত বিদ্যা বা শক্তি এবং তাতে বিশ্বাস, আর এই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে জাদুবিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা, ইলমে কিমিয়া, থিয়োসোফি বা প্রেতবাদের চর্চায়। এর উদ্দেশ্য হলো এমন ক্ষমতা আয়ত্ত করা যার সাহায্যে দুষ্ট শক্তির প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা ও দিব্যচক্ষে ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা যায়। প্রথম দিকে সমস্ত প্রকৃতিবিজ্ঞানকেই অংশত গুপ্তবিদ্যা হিসেবে দেখা হতো। তখন বিজ্ঞানীরা তাঁদের কাজ বা গবেষণার গোপনীয়তা রক্ষার কারণে সাধারণের চোখে সন্দেহভাজন বিবেচিত হতেন। আধুনিককালে গুপ্তবিদ্যায় বিশ্বাস বা এই বিদ্যার চর্চা কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। গুপ্তবিদ্যার চর্চাকারীরা দাবি করেন, তাঁরা তাঁদের গুরু বা প্রাচীন গুণীদের কাছ থেকে এই জ্ঞান লাভ করেছেন।

**গুরু** অর্থ শিক্ষক। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে যথাক্রমে গুরু ও শিষ্য বলা হতো। ভারতবর্ষের দেশীয় শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিল গুরুকুল। শিক্ষার্থীরা গুরুকুলে এসে বসবাস করত এবং সেখানে গুরু মহাশয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করত। গুরু তাঁর অবসর সময়ে শিষ্যদের পড়াতেন, নিজের সন্তানের মতো খাওয়াতেন, রোগ-শোকে তাদের সেবা করতেন। আবার প্রয়োজনবোধে তাদের শাস্তিও দিতেন। শিষ্যকে গুরুর আদেশ-নিষেধ কঠিনভাবে মেনে চলতে হতো। ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত যাঁরা যুদ্ধ ও শিকারে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতেন

তাঁদের গুরু বলা হতো। সংগীত ও নৃত্য বিশারদরাও যেমন সেকালে তেমনি বর্তমানেও গুরু হিসেবে পরিচিত হন। গভীর অধ্যাত্মসাধনার দ্বারা পুরুষ বা নারী, যিনি দেবতা বা ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করেছেন বলে মনে করা হয়, তাঁরাও কখনো কখনো গুরু বা একধরনের অবতার হিসেবে পূজিত হন।

**গুরুগৃহ** বৈদিক যুগে ভারতে গুরুর আবাসই ছিল শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়। শুধু তপোবনে কিংবা অরণ্যে নয়, লোকালয়েও গুরুগৃহের অস্তিত্ব ছিল। গুরুগৃহে শিক্ষার্থীরা গুরুর সান্নিধ্যে থেকে বিদ্যা লাভ করত। এ ধরনের শিক্ষার মূল বিষয় ছিল বেদোক্ত শ্লোক, স্তোত্র বা মন্ত্র। বেদ ছাড়াও ভাষা, গণিত, ইতিহাস, ভূবিদ্যা ইত্যাদিও ক্রমান্বয়ে শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসেবে স্বীকৃতি পায়। গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীরা নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করত। ভারতবর্ষে আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় গড়ে ওঠার আগ পর্যন্ত গুরুগৃহই ছিল বিদ্যার্জনের একমাত্র কেন্দ্র। গুরুগৃহগুলোকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে এ দেশে টোল ও মক্তব গড়ে ওঠে। নিম্নমাধ্যমিক ও উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে পরবর্তীকালে শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গুরুগৃহের প্রভাব হ্রাস পায়।

**গুরুদক্ষিণা** আজকের দিনের বিদ্যালয়-শিক্ষকদের মতো গুরুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুদের নির্দিষ্ট কোনো বেতন বা মজুরির ব্যবস্থা ছিল না। গুরুগৃহে অবস্থান করে বিদ্যাশিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষার্থীরা গুরুসেবা এবং গুরুর সংসারের কাজকর্ম করত। শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থী তার সৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ দিয়ে গুরুকে যে উপহার দিত তাকেই গুরুদক্ষিণা বলা হতো। শিক্ষার্থীদের দিক থেকে এই গুরুদক্ষিণা গুরুর ঋণ শোধ নয়, বরং গুরুর কাছে শিষ্যের অপরিশোধ্য ঋণের স্বীকৃতি ও গুরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হতো। বৈদিক আমল থেকেই ভারতবর্ষে এই গুরুদক্ষিণার প্রথা প্রচলিত। বিশেষ করে সংগীত-নৃত্য প্রভৃতি গুরুমুখী বিদ্যার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালেও গুরুদক্ষিণা কথাটার প্রচলন ছিল।

**গৃৎসমদ** মহাভারতে হৈহয়দের রাজা বীতহব্যের শত পুত্রের একজন। দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে মহর্ষির চেহারার মিল থাকায় অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্র একবার বিপদ থেকে রক্ষা পান। ইন্দ্রভ্রমে সে-বার অসুররা গৃৎসমদকে বন্দী করে। পরে তাঁর পরিচয় পেয়ে অসুররা গৃৎসমেদকে মুক্তি দেয়। তিনি ঋগ্‌বেদ দ্বিতীয় মণ্ডলের সমগ্র সূক্তের রচয়িতা।

**গৃহস্থ** শব্দগত অর্থ: গৃহে অবস্থিত। হিন্দুধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী চতুরাশ্রমের দ্বিতীয় আশ্রম। বিয়ের পর একজন পুরুষ গৃহস্থ হয়। গৃহস্থের কর্তব্য পবিত্র অগ্নি প্রজ্বলিত রাখা, পূর্বপুরুষদের উপাসনা, বংশরক্ষার জন্য সন্তান উৎপাদন এবং পরিবার ও সমাজের মঙ্গল সাধন করা।

**গৃহ্যসূত্র** স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লেখিত সামাজিক ও সাংসারিক কর্তব্য। স্মৃতির অন্যতম প্রধান অংশ হলো কল্পসূত্র। আর কল্পসূত্রের তিনটি ভাগ: শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মশাস্ত্র। গৃহ্যসূত্রে নানা লৌকিক প্রথা ছাড়াও প্রায় ৪০টি সাংসারিক কর্তব্যের বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু ও শ্রাদ্ধে পালনীয় কর্তব্যগুলো উল্লেখযোগ্য।

**গেয়া বা গেইয়া** গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী গেয়া হলেন পৃথিবীদেবী। আকাশ দেব ইউরেনাসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ইউরেন্যাসের ঔরসে তাঁর গর্ভে তিন শ্রেণীর জীব জন্মগ্রহণ করে: টাইটান, সাইক্লোপস ও হেকাটনচেরি।

**গোংগুইজি** জাপানের শিন্টো মন্দিরের উপপ্রধান পুরোহিত।

**গোকুল** পুরাণপ্রসিদ্ধ নগর। হিন্দু তীর্থক্ষেত্র। ভারতের উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলায় যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। অন্য নাম নন্দীশ্বর। কৃষ্ণলীলার কেন্দ্র বলে বৈষ্ণবদের কাছে পবিত্র। বলা হয়, এখানেই কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের বাল্যকাল অতিবাহিত করেন।

**গোতম** ঋগ্‌বেদের মন্ত্রপ্রণেতা মহর্ষি। অপর নাম শতানন্দ। *ধর্মশাস্ত্র* নামক আইনগ্রন্থের প্রণেতা।

**গোতমী** গৌতম বুদ্ধের আত্মীয়া। তাঁর গান শুনে মুগ্ধ রাজকুমার শাক্যসিংহ তাঁকে নিজের রত্নহার উপহার দেন। শাক্যসিংহের বুদ্ধত্ব লাভের পর গোতমী তাঁর কাছে মৃত পুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন

জানান। কিন্তু বুদ্ধদেব দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে দেন, জগতে কেউ মৃত্যুশোকের উর্ধ্বে নয়।

**গোপা যশোধরা** বা **বিম্বা** গৌতমবুদ্ধের পত্নী। বৌদ্ধ কাহিনিমতে, দেবদহের সামন্ত নৃপতি দণ্ডপাণির কন্যা। গোপার রূপ-গুণে মুগ্ধ হয়ে শাক্যরাজ শুদ্ধোধন পুত্র সিদ্ধার্থের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। পুত্র রাহুলের জন্মের পর সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন। গোপা যেদিন শুনলেন, তাঁর স্বামী কেশ ছেদন ও গৈরিক বসন পরিধান করে একাহারী হয়েছেন, সেদিন থেকে গোপাও একাহারী হন। শ্বশুর দণ্ডপাণির নিমন্ত্রণক্রমে বুদ্ধ রাজপ্রাসাদে এলে গোপা স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, 'যদি জীবনে আমি কোনো সৎকর্ম করে থাকি এবং সাত বছর ধরে আমি যে ব্রত পালন করছি তার কোনো সুফল থাকে, তবে আমার স্বামী স্বয়ং আমার কক্ষে আসবেন।' বুদ্ধ গোপার তাঁর সঙ্গে দেখা না করার কারণ জানতে চাইলে রাজা দণ্ডপাণি বুদ্ধকে গোপার প্রতিজ্ঞার কথা জানান। বুদ্ধ তখনই ভদন্ত সারিপুত্ত ও ভদন্ত মোগগাল্ল্যায়ন এবং রাজা শুদ্ধোধনসহ গোপার কক্ষের দিকে যাত্রা করেন। গোপার কক্ষে প্রবেশ করলে বুদ্ধের পদস্পর্শ করে প্রণাম করার সময় তাঁর অজান্তে গোপার দুফোঁটা অশ্রু বুদ্ধের চরণে ঝরে পড়ে। বুদ্ধের মহানির্বাণের আগেই আপন সাধনাবলে গোপা অর্হত্ব লাভ করেন। বুদ্ধ বলেন, গোপার আত্মত্যাগ ছাড়া বোধিসত্ত্ব লাভ সুদূরপরাহত হতো।

**গোপূজা** মাতা-জ্ঞানে গোরুর উপাসনা। দক্ষিণ এশিয়ার হিন্দুদের কাছে গোমাতা স্বর্গীয় বদান্যতার প্রতীক। তাই তারা ভক্তিভরে গরুর উপাসনা করে ও তার জীবনরক্ষায় সর্ববিধ ব্যবস্থা নেয়। আপাতদৃষ্টিতে গরুর এই পবিত্র বলে বিবেচিত হওয়ার কারণ পাঁচটি: যাগযজ্ঞে এর প্রাধান্য, বৈদিক সাহিত্যে এর যেসব আলংকারিক উল্লেখ রয়েছে তাকে আক্ষরিকভাবে বিশ্বাস করা, ব্রাহ্মণের ওপর গোহত্যার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা, অহিংসার নীতি এবং মাতৃদেবীর সঙ্গে গরুর সংসর্গ। মানুষের লালনপালনে গরুর ভূমিকা এবং মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় সংহতিও এ গোপূজার এক বিশেষ অভিব্যক্তি। সিন্ধু সভ্যতার প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে দেখা যায়, সেখানে ষাঁড়কে ভক্তি করা হতো, যদিও গরুর মতো সেখানে তা সংরক্ষিত হতো না। বেদে ষাঁড় ও গাভি দুইকেই বলা হতো অঘ্ন। এই বিশেষণ ধেনুর বিপরীতে ব্যবহৃত হতো। গোদুগ্ধ লাভ ও গোপ্রজননের কথা স্মরণ রেখে অর্থনৈতিক কারণে গোহত্যা নিষিদ্ধ ছিল। ঋগ্‌বেদেও গরুকে সম্পদ হিসেবে গণ্য করে বলা হয় দেবতাদের কাছে তা যাজ্ঞার বিষয়। যদিও গরু ও তা থেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদি উৎসর্গের কাজে ব্যবহৃত হতো। একসময় গোমাংস নিয়মিতভাবে খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতো, বিশেষ করে অতিথি আপ্যায়নে। গৃহে অতিথির আগমনে গোবধ বিহিত ছিল। এ জন্য অতিথির এক প্রতিশব্দ 'গোঘ্ন' অর্থাৎ যার জন্য গোরু হত্যা করা হয়। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, 'আমি গোমাংস খাই, যদি তা নরম হয়।' বৃহদারণ্যক উপনিষদে সুস্থ শিশুর জন্য গোমাংসের পথ্য দেওয়ার বিধান আছে, যদিও তখন গোহত্যার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল।

গরুর প্রতি ভক্তির কারণ সহজেই বোধগম্য। দেবমাতা অদিতির এক নাম 'গাভি'। তা থেকে দেবতাদের বলা হতো গোজাত। পৃথিবী, স্বর্গ ও বাক্যের প্রতীক হিসেবে গরু বিবেচিত হতো। মনুর ধর্মশাস্ত্র ও অথর্ববেদে গোরক্ষা ও গোমাংস উভয়েরই উল্লেখ রয়েছে। ব্রাহ্মণের সম্পদ, বিশেষ করে তাঁর গোসম্পদ রক্ষার বিষয়টি নিয়ে গানও রয়েছে অথর্ববেদে। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণের গরুকে আঘাত করা ব্রাহ্মণকে আঘাত করার সমান বলে গণ্য হতো। মহাভারতে বলা হয়েছে, একটা গরুর গায়ে যত লোম আছে তত বছর ধরে গোঘাতক নরকে জন্ম নেবে। চতুর্থ শতাব্দী থেকে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রভাবে অহিংসনীতি ভারতীয় তথা এশীয় মানসে প্রভাব বিস্তার করে। তবে এর পরও সাহিত্যে গো-ঘাতকের উল্লেখ দেখা যায়। ভগবৎপুরাণে বলা হয় যে, কলিযুগের একটা লক্ষণ গোরুর প্রতি অভক্তি। অনেকের ধারণা, গোমাংস গ্রহণের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা কলিকালেই আরোপ করা হয়। গান্ধী মনে করতেন, গরু মানবসভ্যতার জন্য একটা বড় দান।

**গোরক্ষনাথ** বিখ্যাত সিদ্ধা। নাথযোগী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। দশম থেকে একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো এক সময় পাঞ্জাবের জলন্ধরে তাঁর জন্ম। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় তাঁর যোগসিদ্ধের কাহিনি ও ধর্মতত্ত্ববিষয়ক বহু গ্রন্থ আছে। বাংলা ভাষায় এমন দুটি গ্রন্থ *ময়নামতীর গান* ও *গোরক্ষ-বিজয়*। তিনি একজন মোহমুক্ত পুরুষ ছিলেন। তাঁর গুরুর নাম মীননাথ। কথিত আছে, দেবী গৌরীর মোহিনীরূপ দেখে মীননাথসহ অন্য যোগীদের মনে কামভাব জাগলেও একমাত্র গোরক্ষনাথই তাঁর সাধনায় অটল ছিলেন। মোহগ্রস্ত ও আত্মজ্ঞানবিস্মৃত গুরু মীননাথকে তিনি কদলী দেশের নারীরাজ্য থেকে কৌশলে উদ্ধার করেছিলেন। নাথ সম্প্রদায়ের অন্য শাখার রচনা গোপীচাঁদের গানেও তাঁর উল্লেখ আছে।

**গো-শিনতাই** জাপানে শিন্টো মন্দিরের মূল কক্ষে স্থাপিত পূজার উপকরণ। শিন্টো মন্দিরে পুজোর জন্য সাধারণত কোনো মূর্তি থাকে না। তার পরিবর্তে দেবতার সাংকেতিক উপস্থাপন হিসেবে আয়না, পাথর, তলোয়ার ইত্যাদি থাকে। তবে এ উপকরণগুলো কখনো জনসমক্ষে রাখা হয় না।

**গ্যানিমিড** গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী ট্রয় নগরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রসের পুত্র। তিনি অনিন্দ্য রূপ-লাবণ্যের অধিকারী ছিলেন। ইগলের রূপ ধারণ করে জিউস তাঁকে আইডা পর্বত থেকে অপহরণ করে স্বর্গে নিয়ে যান। সেখানে জিউস-কন্যা হিবের পরিবর্তে তাঁকে দেবতাদের সুরা পরিবেশনকারী নিযুক্ত করা হয়। অন্য কাহিনিতে গ্যানিমিডের সঙ্গে জিউসের প্রণয় বা সমকামী সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।

**গ্যালাটিয়া** গ্রিক পুরাণের একজন সমুদ্র-অপ্সরা। পলিফেমাস নামক একজন এক-চোখা দানব তাকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু গ্যালাটিয়া ভালোবাসত একিস নামক এক যুবককে। প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে পলিফেমাস একদিন একিসকে হত্যা করে। শোকাহত পলিফেমাস অতঃপর একিসকে একটি নদীতে পরিণত করে।

অন্য এক আখ্যান অনুযায়ী গ্যালাটিয়া ছিল সাইপ্রাসের বিখ্যাত ভাস্কর পিগম্যলিয়নের সৃষ্ট নারীমূর্তি, দেবী আফ্রোদিতি যাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন।

**গ্যালিকান মতবাদ** ফ্রান্সের রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ওপর ফরাসি সম্রাটের বিশেষ কর্তৃত্ব আরোপকারী মতবাদ। পোপ একিউমেনিক্যাল কাউন্সিলের অধীন, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাত এই তত্ত্বের সঙ্গে ওই মতবাদ প্রচারিত হয় এবং রাজা সপ্তম চার্লস তা সমর্থন করেন। পোপ একাদশ ইনোসেন্টের সঙ্গে চতুর্দশ লুইয়ের বিবাদ বাধলে সম্রাট ১৬৮২ খ্রিষ্টাব্দে বিশপদের এক সম্মেলনে চারটি গ্যালিকান বিধি অনুমোদন করেন। ১৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দে পোপ দ্বাদশ ইনোসেন্ট গির্জা ও রাজার মধ্যে এই বিবাদের অবসান ঘটাতে সমর্থ হন এবং চতুর্দশ লুইও গ্যালিকান মতবাদ ত্যাগ করেন।

**গ্রন্থসাহেব** শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। অপর নাম আদিগ্রন্থ। দশম গুরু গোবিন্দ সিং (১৬৬৬-১৭০৮) রচিত *দশম পাদশাহি* গ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্রীকরণের জন্য এটিকে আদিগ্রন্থ নামে অভিহিত করা হয়। ভাই গুরুদাস প্রথম গুরুমুখী লিপিতে এ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। এতে 'জয়জয়ন্তী' রাগ সংযোজন করেন তেগ বাহাদুর সিং। গ্রন্থটি আদ্যন্ত প্রাকৃত মাত্রা ছন্দে ও মিত্রাক্ষরে রচিত। পঞ্চম গুরু অর্জুন সিং (১৫৬৩-১৬০৬) ১৬০১-৪ সালে *গ্রন্থসাহেব* সংকলন ও সম্পাদন করেন।

শিখরা ১০ জন গুরুর আদর্শ ও শিক্ষাকে অনুসরণ করে। নানক তাঁদের মধ্যে প্রথম গুরু। প্রথম পঞ্চগুরুর ধর্মীয় মতাদর্শ, চিন্তা-চেতনা ও শিক্ষা নিয়ে *গ্রন্থসাহেব* রচিত হয়। গোবিন্দ সিং তাঁর পিতা নবম গুরু তেগ বাহাদুর সিংয়ের (১৬২১-৭৫) রচনাও এর সঙ্গে যুক্ত করেন। শিখ গুরুদের বাণী, নির্দেশ ও স্তোত্রগীত ছাড়াও এতে পাঁচটি বাণী সন্নিবেশিত হয়েছে : জপুনীসাণু, সো-দরু, সুণিবড়া, সো-পুরখু এবং সোহিলা। ৩১টি ভিন্ন ভিন্ন রাগ অনুসারে বাণীগুলো সজ্জিত। অপর একটি বিন্যাসে জপজি, রহিরাস ও সোহিলা নামগুলো অধিকতর পরিচিত। শিখরা প্রভাতে জপজি, সন্ধ্যায় রহিরাস এবং শয্যাগ্রহণকালে সোহিলা পাঠ করেন। হারানচন্দ্র চাকলাদারকৃত *গ্রন্থসাহেব*-এর আংশিক বাংলা অনুবাদ *শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থসাহেবজি* নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (১৯৫৭ ও ১৯৬২)। ঢাকার গুরুদুয়ারা নানকশাহিতে তুলট কাগজে গুরুমুখী

লিপিতে হাতে লেখা একটি *গ্রন্থসাহেব* রয়েছে। ১৯৮৫ সালে পুরান ঢাকার টোলা মহল্লার শিখ ধর্মশালা থেকে এটি এখানে আনা হয়।

**গ্রিক ধর্ম** গ্রিসের প্রাচীন অধিবাসীদের আচরিত ধর্ম। এই ধর্মে সর্বপ্রাণবাদ বা অধ্যাত্মবাদের প্রভাব ছিল। প্রাচীন গ্রিসের বীরপুরুষ ও দেবতারা লোকগাথায় প্রায় একই রূপে প্রতিভাত হন। গ্রিক উপদ্বীপের বাইরে অন্যান্য স্থানে পূজিত দেব-দেবীর কাহিনি এবং মিনোয়ান, মাইসিনীয় সভ্যতা, এশিয়া ও প্রাচীন মিসরের পুরাণ ও লোককাহিনি গ্রিকদের ধর্মবিশ্বাসকে প্রভাবিত করে। অনেক দেব-দেবী এই ধর্মে আরাধ্য। তন্মধ্যে প্রধান দেবতা হলেন জিউস। তাঁকে বলা হতো দেবরাজ। বজ্রদণ্ডের সাহায্যে জিউস মর্তমানবের শান্তি বিধান করেন। পঞ্চম শতকে দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস শিথিল হয়ে পড়ে। শিক্ষিত মন তখন তাঁদের প্রতীক হিসেবে দেখতে শুরু করে। ফলে গ্রিসেও এই প্রাচীন ধর্মের প্রভাব হ্রাস পায়।

**গ্রেস** গ্রিক পুরাণ বর্ণিত জিউস ও ইউরিনোমির তিন কন্যা—অ্যানলেইয়া, থ্যালাইয়া ও ইউফ্রসিনি। এঁরা ছিলেন সৌন্দর্য ও মাধুর্যের প্রতিমূর্তি। গ্রিকদের কাছে এঁরা চ্যারিটিজ এবং রোমানদের কাছে গ্রাসিয়া নামে পরিচিত।

## ঘ

**ঘটক** অর্থাৎ যে ঘটায়। বিয়ের ব্যাপারে বরপক্ষ ও কনেপক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি। বর-কনের স্বেচ্ছায় বিয়ে এককালে সামাজিক দৃষ্টিতে অনুমোদিত ছিল না। ফলে তখন ঘটকের মাধ্যমে বিয়ে ঠিক হতো। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঘটকের পেশা গ্রহণ করতেন। তাঁরা 'কুলাচার্য' নামে পরিচিত ছিলেন এবং সমাজে এঁদের বেশ প্রভাব ছিল। আধুনিক শিক্ষা ও বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাবে ঘটকের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েও আজকাল পাত্র-পাত্রীর সন্ধান করা হয়। এ উদ্দেশ্যে ছেলে-মেয়েদের ছবি, পূর্ণ পরিচয়সহ ওয়েবসাইটেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। তবে গ্রামাঞ্চলে এখনো ঘটকের ভূমিকা রয়েছে।

**ঘটস্থাপন নৃত্য** লৌকিক নৃত্যানুষ্ঠান। যশোর জেলার ভৈরব নদের তীরে রাজঘাট নামক স্থানে এটি অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরে আসল পূজার পাঁচ-সাত দিন আগেই এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। একটি মেয়ে মাথায় পিতলের কলসি ও বেতের থালা নিয়ে অন্য মেয়েদের বিপদ-মুক্তি এবং তাদের ও তাদের প্রিয়জনদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করে। ঘটধারী মেয়েটি গ্রামের সব মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে শীতলা দেবীর মন্দিরে এবং সেখান থেকে নিকটবর্তী স্নানের ঘাটে যায়। সেখানে সে মাথায় কলসি ও থালা নিয়ে জলে ডুব দেয়। তারপর সে সঙ্গী নারীদের নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে এবং রাত জেগে আবাহন সংগীত গায়। পরবর্তী দিনগুলোতে গ্রামের মেয়েরা কলসি ও থালা নিয়ে বাড়ি বাড়ি যায়। সেখানে তারা কলসি ও থালাটি রেখে তা ঘিরে নাচ-গান এবং মূল পূজা অনুষ্ঠানটির জন্য দান গ্রহণ করে।

**ঘটোৎকচ** পুরাণোক্ত রাক্ষস। মহাভারত অনুসারে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম ও রাক্ষসী হিড়িম্বার পুত্র। ঘট অর্থাৎ হাতির মাথা এবং উৎকচ অর্থ কেশশূন্য। তার মাথা হাতির মতো কেশশূন্য ছিল বলেই তার এই নামকরণ। জন্মের পরপরই সে যৌবনপ্রাপ্ত ও সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহারে পারদর্শী হয়ে ওঠে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অগণিত শত্রু বধ করে সে কৌরবদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে। তখন কৌরবদের অনুরোধে কর্ণ অর্জুন-বধের জন্য রক্ষিত তার ইন্দ্রপ্রদত্ত একাঘ্নী বাণ নিক্ষেপ করে তাকে বধ করে। মৃত্যুকালে ঘটোৎকচ তার দেহ বিশালতর করে কৌরব-বাহিনীর ওপর পতিত হয়। এতে অনেক কৌরবসৈন্য মারা যায়।

## চ

**চক্র** হিন্দু পুরাণে বর্ণিত ক্ষেপণাস্ত্র। তীক্ষ্ণ চক্রাকৃতি বলে এর নাম চক্র। বিষ্ণুর প্রধান অস্ত্র ছিল সুদর্শন চক্র। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে চক্রাকার এই মারণাস্ত্রটি আঙুলে স্থাপন করে সজোরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করলে তার দেহ খণ্ডিত হতো এবং চক্রটি আবার বিষ্ণুর আঙুলেই ফিরে আসত।

**চক্রব্যূহ** মহাভারতে উল্লেখিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষের সেনাপতি দ্রোণাচার্য চক্রাকারে যে ব্যূহ রচনা বা সেনা সন্নিবেশ করেন তা চক্রব্যূহ নামে অভিহিত। অর্জুনের বীর পুত্র অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করে শত্রুসেনাদের মধ্যে প্রবেশ করলে কৌরব পক্ষের সপ্তরথী মিলে একযোগে অন্যায় যুদ্ধে তাঁকে বধ করেন।

**চড়কপূজা** হিন্দুদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লোকোৎসব। চৈত্রের শেষ থেকে বৈশাখের প্রথম দু-তিন দিন ধরে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। *লিঙ্গপুরাণ*, *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* এবং *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে* শিবারাধনা প্রসঙ্গে চৈত্র মাসে নৃত্যগীতাদি উৎসবের কথা বলা হলেও চড়কপূজার উল্লেখ নেই। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা গোবিন্দানন্দের *বর্ষক্রিয়াকৌমুদী* ও রঘুনন্দনের *তিথিতত্ত্বে* এ উৎসবের উল্লেখ নেই। সমাজের উচ্চস্তরে এ অনুষ্ঠানের প্রচলন খুব প্রাচীন নয়। শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীনকালে এ উৎসব প্রচলিত ছিল।

চৈত্রসংক্রান্তিতে পালিত চড়কপূজার আরেক নাম নীল পূজা। গম্ভীরাপূজা বা শিবের গাজন এই চড়কপূজারই রকমফের। এতে জলভরা একটি পাত্রে শিবের প্রতীক হিসেবে শিবলিঙ্গ রাখা হয়, যা পূজারিদের কাছে 'বুড়োশিব' নামে পরিচিত। পতিত ব্রাহ্মণ এ পূজার পুরোহিত। পূজার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ হলো কুমিরের পূজা, জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর হাঁটা, কাঁটা ও ছুরির ওপর লাফানো, বাণফোঁড়া, শিবের বিয়ে, অগ্নিনৃত্য, চড়কগাছে দোলা ইত্যাদি। এ পূজার মূলে রয়েছে ভূতপ্রেত ও পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস। এর অনেক আনুষ্ঠানিকতা প্রাচীন কৌমসমাজে প্রচলিত নরবলির অনুরূপ। পূজার উৎসবে বিভিন্ন ধরনের দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ ধর্মের অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। চড়কগাছে ভক্ত বা সন্ন্যাসীকে লোহার হুক দিয়ে চাকার সঙ্গে বেঁধে দ্রুতবেগে ঘোরানো হয়। তার পিঠে, হাতে, পায়ে, জিহ্বায় এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গে বাণ বা শলাকা বিদ্ধ করা হয়। কখনো কখনো জ্বলন্ত লোহার শলাকা তার গায়ে ফুঁড়ে দেওয়া হয়। ১৮৬৫ সালে ইংরেজ সরকার আইন করে এ নিয়ম বন্ধ করলেও গ্রামের সাধারণ লোকের মধ্যে এখনো তা প্রচলিত আছে।

বর্তমানে গ্রামবাংলায় চড়কপূজার যে অনুষ্ঠান হয় তাতে উদ্যোক্তারা কয়েক জনের একটি দল নিয়ে সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। দলে থাকে একজন শিব ও দুজন সখী। একজনকে সাজানো হয় লম্বা লেজ দিয়ে, তার মাথায় থাকে উজ্জ্বল লাল রঙের ফুল। সখীদের পায়ে থাকে ঘুঙুর। তাদের সঙ্গে থাকে ঢোল-কাঁসরসহ বাদক দল। সখীরা গান ও বাজনার তালে তালে নাচে। এদের নীল পাগলের দলও বলা হয়। এরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে গাজনের গান গায় ও নৃত্য পরিবেশন করে। এভাবে ঘুরে ঘুরে সবার কাছ থেকে দান হিসেবে যে দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তা দিয়ে হয় পূজা। উৎসব উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে।

**চণ্ড** হিন্দু পুরাণে উল্লেখিত দৈত্যবিশেষ। চণ্ড ও তাঁর ভাই মুণ্ড দৈত্যরাজ শুম্ভের সেনাপতি ছিলেন। যুদ্ধে এই দুই ভাই ভগবতী বা দুর্গার হাতে নিহত হন। সেই থেকে দুর্গার অপর নাম চণ্ডী বা চণ্ডিকা।

**চণ্ডাল** স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে হিন্দুসমাজের সর্বনিম্ন স্তরের অস্পৃশ্য জাতি বা জনগোষ্ঠী। বর্তমান বাংলার 'চাঁড়াল' শব্দটি চণ্ডাল শব্দের অপভ্রংশ। *মনুসংহিতায়* বর্ণিত আছে যে শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে এই জাতির উদ্ভব। আর বৌদ্ধজাতকের গল্প থেকে জানা যায়, চণ্ডাল শুধু অস্পৃশ্যই ছিল না, তার ছায়া পড়লেও উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দুর দেহ অশুদ্ধ হতো। স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে এই স্পর্শদোষ স্খালনের জন্য ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের হিন্দুদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। প্রথা ছিল, চণ্ডাল পুরুষ বা মহিলা কোনো জনসমাবেশে বা গৃহে প্রবেশ করার বা উপস্থিত হওয়ার আগে দুটি কাঠির সাহায্যে একধরনের সাংকেতিক শব্দ করবে। যাতে অন্যরা সতর্ক হতে এবং অস্পৃশ্যদের থেকে তাদের দূরত্ব বজায় রাখতে পারে। চণ্ডালদের একটা উপসম্প্রদায় হচ্ছে ডোম। মৃতদেহ সৎকার বা ব্যবচ্ছেদ করা ডোমদের কাজ। একসময় চণ্ডালদের জন্য কতক পেশা নির্দিষ্ট ছিল। আজকাল তাদের কোনো কাজে অংশগ্রহণে সামাজিক বাধা নেই। ধর্মমতের দিক থেকে চণ্ডালরা অধিকাংশই বৈষ্ণব। অনেকে মাটির দেবতার পূজা, মনসা পূজা, নদীর দেবতা বা সর্পদেবতারও উপাসনা করে থাকে।

চণ্ডালদের ব্রাহ্মণকে বর্ণসমাজে নিম্নমানের ব্রাহ্মণ বলে গণ্য করা হয়।

**চণ্ডী** হিন্দু পুরাণমতে দেবী দুর্গার অপর নাম। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্ভুক্ত দেবীমাহাত্ম্য কথাকেও চণ্ডী বলা হয়। এতে মোট ৭০০ শ্লোক আছে। দেবী চণ্ডী যখন ভক্তের দুর্গতি বিনাশ করেন তখন তাঁকে বলা হয় দুর্গা। দুর্গারূপে তিনি মহিষাসুরকে বধ করেন। বহু নামে চণ্ডী পূজিত হন, যেমন: দেবীচণ্ডী, জয়চণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, কুলুইচণ্ডী, চেলাইচণ্ডী প্রভৃতি। জয়চণ্ডীরূপে তিনি দ্বিভুজা, ত্রিনয়না, গৌরবর্ণা, বরাভয়হস্তা এবং পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে দুর্গা অর্থাৎ অরণ্যানী চণ্ডীর মাহাত্ম্য গীত হয়েছে। এতে তিনি অভয়া মঙ্গলচণ্ডী নামে বর্ণিত। তার বাহন গাধা বা গো-সাপ। বাংলার নারীসমাজ মঙ্গলচণ্ডীকে গৃহকল্যাণের প্রধান দেবতা-জ্ঞানে পূজা করেন। সধবা নারী জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে ফলাহার করেন এবং দেবীর ব্রতকথা শোনেন। হিন্দু পরিবারে প্রত্যেক নববধূর একটি করে মঙ্গলচণ্ডীর 'ঝাঁপি' থাকে। চণ্ডীকে বিভিন্ন রূপে কল্পনা ও বিশ্বাস করা হয়, যেমন: শেওড়াগাছে অধিষ্ঠিত দেবীকে বলা হয় বনদুর্গা, পাকুড়গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ষষ্ঠী, বসন্ত রোগের উপশমকারিণী দেবী বসন্তচণ্ডী বা বসনচণ্ডী ইত্যাদি। যখন মানত হিসেবে দেবীর অধিষ্ঠানক্ষেত্ররূপে কল্পিত গাছের কোনোটিতে একখণ্ড বস্ত্র বেঁধে দেওয়া হয় তখন দেবী নেকড়াই চণ্ডী নামে অভিহিত হন। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে চণ্ডী-অধিষ্ঠিত বৃক্ষের তলায় ঢিল বা ইটের টুকরা দিলেই দেবী ইটাল চণ্ডী বা হেঁটাল চণ্ডী নামে পরিচিত হন।

**চণ্ডীদাস** মধ্যযুগের বাঙালি কবি। বৈষ্ণব পদের আলোচনায় চণ্ডীদাসের নাম অগ্রগণ্য। যদিও ধারণা করা হয়, পদাবলির চণ্ডীদাস এক নয়, একাধিক। প্রতিটি পদাবলি-সংকলনে চণ্ডীদাসের পদ থাকত, কারণ বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে চণ্ডীদাসই ছিলেন সর্বাধিক পরিচিত। তবে চণ্ডীদাস নামে নানা ভণিতা পাওয়া যায়। কোনো চণ্ডীদাস 'দ্বিজ', কোনো চণ্ডীদাস 'দীন', কোনো চণ্ডীদাস 'আদি'। পরে সহজিয়া চণ্ডীদাস নামেও আরেক চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'চণ্ডীদাস-সমস্যা' আরও জটিল হয় ১৯০৯ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* পুঁথি আবিষ্কারের ফলে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস প্রকৃতপক্ষে কতজন এবং এঁরা কে কোন সময়ের কবি তা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিতেরা দীর্ঘ বিতর্ক করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নানা যুক্তি ও তথ্য-প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন, চণ্ডীদাস তিনজন—বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস। বড়ু চণ্ডীদাস *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর রচয়িতা এবং তিনি শ্রীচৈতন্যের আগের মানুষ। পক্ষান্তরে দ্বিজ ও দীন পদাবলির কবি। এর মধ্যে দ্বিজ চণ্ডীদাস চৈতন্যের সমসাময়িক আর দীন চণ্ডীদাস চৈতন্যের পরবর্তী। চৈতন্যের জীবনীপাঠে জানা যায়, চৈতন্যদেব একজন চণ্ডীদাসের পদ পরম আগ্রহ নিয়ে শুনতেন। কিন্তু এই চণ্ডীদাসের নামের সঙ্গে বড়ু-দ্বিজ-দীন ইত্যাদি কোনো ভণিতা নেই। তিনি সাধারণভাবে শুধু চণ্ডীদাস নামেই পরিচিত। এঁকে পদাবলির চণ্ডীদাস বলা যায়। এই শেষোক্ত চণ্ডীদাস সম্পর্কে নানা কাহিনি প্রচলিত আছে। বলা হয়, তিনি চতুর্দশ শতকের বা পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকের কবি। তাঁর জন্ম বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার নান্নুর গ্রামে, এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। চণ্ডীদাসের পিতা সেখানে বাসলী বা সরস্বতী দেবীর মন্দিরের পূজারি ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। লোকশ্রুতি অনুযায়ী পদাবলির আরেক বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের আলাপ-পরিচয় ছিল। যদিও কবি হিসেবে তাঁরা দুজন স্বতন্ত্র মেজাজের অধিকারী ছিলেন। বিদ্যাপতির মতো চণ্ডীদাসের রচনা অলংকারবহুল নয়; বরং তা সরল, কোমল ও মনোগ্রাহী। চণ্ডীদাসের রচনা বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ।

**চণ্ডীমঙ্গল** দেবী চণ্ডীকে নিয়ে রচিত মঙ্গলকাব্য। পার্বতীর রূপভেদ হলো চণ্ডী। তাঁর আরেক নাম দুর্গা। চণ্ডীকে ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দা অনার্যদের দেবী বলে মনে করা হয়। যদিও পরবর্তীকালে এই দেবীর মধ্যে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের নানা প্রভাব লক্ষ করা যায়। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের সবচেয়ে বড় বা

খ্যাতিমান কবি হলেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তাঁর কবিকৃতির জন্য তিনি 'কবিকঙ্কন' উপাধি পান। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলাধীন দামুন্যা গ্রামে তাঁর জন্ম। যদিও *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যটি রচনার সময় তিনি ছিলেন মেদিনীপুরের বাসিন্দা। মান সিংহের সময় তিনি জীবিত ছিলেন বলে মনে করা হয়। মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে দুটি পৃথক কাহিনি পাওয়া যায়। প্রথম কাহিনিটি ব্যাধদম্পতি কালকেতু ও ফুল্লরায়। দ্বিতীয় কাহিনিটি খুল্লনা ও লহনাকে নিয়ে। উভয় কাহিনিতেই বর্ণিত ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে শেষাবধি চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মধ্যযুগের বাঙালি জীবনের সাংসারিক চিত্র, খাওয়াদাওয়া ও ব্যবসা-বাণিজ্যের চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় মুকুন্দরামের রচনায়। মুকুন্দরাম ছাড়া *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের অন্য দুই বিখ্যাত কবি হলেন মানিক দত্ত ও দ্বিজ মাধব। এঁদের মধ্যে দ্বিজ মাধব ছিলেন পূর্ব বাংলার কবি।

**চতুরাশ্রম** মনুস্মৃতিতে মানবজীবনের যে চারটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে তা চতুরাশ্রম নামে পরিচিত। পর্যায় চারটি হলো : (১) ব্রহ্মচর্য বা আত্মসংযমের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ কাল, (২) গার্হস্থ্য বা সংসারজীবন যাপনের মাধ্যমে সৃষ্টি রক্ষা, (৩) বানপ্রস্থ অর্থাৎ মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে সংসারের মায়া ত্যাগ করে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা এবং (৪) সন্ন্যাস অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে সংসার ত্যাগ এবং ষড়রিপু অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য দমন করে মোক্ষলাভের চেষ্টা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে জীবনের এই চারটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। মানুষ এর মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে এবং পরম ব্রহ্ম ও নিজের স্বরূপ বুঝতে পারে। ব্রহ্মচারী যখন সংসারজীবনে প্রবেশ করে তখন তাকে একাধিক লোকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়, যেমন তার পরিবারের সদস্যবর্গ, বন্ধু, প্রতিবেশী প্রমুখ। এভাবেই তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। বৈষয়িক পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে সে যখন বনে যায় তখন তার সম্পর্ক হয় প্রকৃতি তথা গাছপালা, লতাপাতা, নদনদী প্রভৃতির সঙ্গে। চূড়ান্ত পর্যায়ে সে যখন একজন সন্ন্যাসী হিসেবে সব ধরনের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে তখন তার অহংবোধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।

ধর্মমতে মানুষ কেবল মৃত্যুর পরেই স্বর্গ লাভ করে না, পৃথিবীতে থেকেও একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে (সর্বোদয় সমাজ) বাস করে এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখে সে স্বর্গসুখ লাভ করতে পারে। মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে, যা ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে মোক্ষ লাভ করায় তা-ই ধর্ম। কারও কারও মতে, চতুর্বর্গের মধ্যে ধর্ম ও অর্থ শ্রেষ্ঠ, কেউ কেউ বলেন, কাম ও অর্থ প্রধান; কারও মতে, শুধু ধর্ম এবং কারও মতে, শুধু অর্থ প্রধান। অভ্যুদয় এককভাবে ধর্ম, অর্থ বা কাম কোনোটির ওপরই নির্ভরশীল নয়। ওই তিনের সমন্বয়ে তা অর্জন করা সম্ভব। সর্বোচ্চ শান্তি, যাকে হিন্দুধর্মে নিঃশ্রেয়স, নির্বাণ, মোক্ষ, মুক্তি ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়, তা অর্জিত হয় পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার একীভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে।

**চতুর্বর্গ** মানবজীবনের চারটি শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। হিন্দুধর্ম অনুযায়ী জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য দুটি : বিবর্তন বা উন্নয়ন এবং চূড়ান্ত মঙ্গল লাভ। আর চূড়ান্ত মঙ্গল বলতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গকে বোঝানো হয়েছে। এখানে ধর্ম অর্থ হলো মানুষের ঐশ্বরিক গুণাবলির সমষ্টি, অর্থ হলো তার বৈষয়িক অবস্থা, কাম ইন্দ্রিয়সন্তুষ্টি আর মোক্ষ হচ্ছে সকল দুঃখ, সংশয় ও ভয় এবং জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তি। এ পর্যায়ে মানুষ সর্বপ্রকার অহংবোধ ও বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হয়। মোক্ষ লাভ করলে মানুষ জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ বুঝতে পারে।

**চতুর্যুগ** হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী যুগ চারটি : সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। সত্যযুগের মেয়াদ ছিল ১৭ লাখ ২৮ হাজার বছর। সত্যযুগ ছিল পাপশূন্য, পুণ্যময়; ওই সময়ের মানবদেহ হতো ২১ হাত দীর্ঘ ও আয়ু ছিল ১ লাখ বছর। দ্বিতীয় যুগ ত্রেতার মেয়াদ ছিল ১২ লাখ ৯৬ হাজার বছর। ত্রেতা যুগে ছিল তিন ভাগ পুণ্য ও এক ভাগ পাপ; তখনকার মানুষের দেহ হতো ১৪ হাত দীর্ঘ ও পরমায়ু ছিল ১০ হাজার বছর। দ্বাপর যুগে ছিল অর্ধেক পুণ্য ও অর্ধেক

পাপ। মানুষের দেহ হতো সাত হাত দীর্ঘ, আয়ু এক হাজার বছর। বর্তমান যুগ কলি। এ যুগের মেয়াদ ৪ লাখ ৩২ হাজার বছর। খ্রিষ্টপূর্ব ৩১০১ অব্দে এই যুগ শুরু হয়। কলিযুগে তিন ভাগ পাপ ও একভাগ পুণ্য। কলি যুগের শেষে বিষ্ণু কল্কিরূপে শেষ বা দশম অবতার হিসেবে জন্মগ্রহণ করবেন।

**চন্দ্র** হিন্দু পুরাণমতে, চন্দ্র ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি অত্রির পুত্র। তিনি দক্ষের ২৭ জন কন্যাকে বিয়ে করেন। এক স্ত্রী রোহিণীর প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করার অপরাধে অন্য বোনেরা চন্দ্রের বিরুদ্ধে পিতা দক্ষের কাছে অভিযোগ করেন। দক্ষ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে চন্দ্রকে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ দেন। পরে কন্যাদের কাতর অনুনয়ে দক্ষ তাঁর শাপ পরিবর্তন করে বলেন যে যক্ষ্মারোগে মাসের এক পক্ষে চন্দ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হবেন এবং পরবর্তী পক্ষে পুনরায় পূর্ণদেহ লাভ করবেন। এই দুই পক্ষই হলো যথাক্রমে কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ। অন্য একটি পুরাণের মতে, সমুদ্র মন্থনের কালে সমুদ্রতল থেকে চন্দ্রের জন্ম। মন্থনের পর দেবতারা যখন অমৃত পান করছিলেন তখন রাহু নামক জনৈক অসুর দেবতার ছদ্মবেশে সেই অমৃত পান করছিল। চন্দ্র রাহুকে চিনতে পেরে দেবতাদের কাছে তার পরিচয় প্রকাশ করলে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা রাহুর মস্তক ছেদন করেন। কিন্তু রাহুর কণ্ঠ পর্যন্ত অমৃত প্রবেশ করায় তার আকণ্ঠ মাথা অমর হয়। সেদিন থেকে ক্রুদ্ধ রাহু আকাশে অবস্থান করে এবং বছরে একবার করে চন্দ্রকে গিলে ফেলে। কিন্তু রাহুর কণ্ঠ ছিন্ন বলে কিছুক্ষণ পরই চন্দ্র সেই ছিন্নপথে আবার বের হয়ে যান। অন্য এক কাহিনি অনুসারে দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে হরণ করার কারণে চন্দ্র দেবতাদের বিরাগভাজন ও বৃহস্পতির শাপে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হন। তাঁর গর্ভে চন্দ্রের বুধ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। তিনি আকাশে চন্দ্রের বিপরীতে অবস্থান করেন।

**চন্দ্রকীর্তি** প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত ও লেখক। তিব্বতীয় ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি আচার্য দিঙ্নাগের পরবর্তী এবং চন্দ্রীগোমি ও ধর্মকীর্তির পূর্বকালের মানুষ। সম্ভবত খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বাংলায় তাঁর জন্ম। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য ছিলেন। তিনি নাগার্জুনের 'মাধ্যমিক শূন্যবাদ' তত্ত্বের ওপর *প্রসন্নপদা* নামে একটি ব্যাখ্যামূলক টীকাগ্রন্থ রচনা করে বিখ্যাত হন। তিব্বতি ভাষায় লেখা তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে 'শূন্যতা সপ্ততি টীকা', 'যুক্তিষষ্টিকারিকা-টীকা' 'মধ্যমকাবতার', 'প্রদীপদ্যোতনা' ইত্যাদি।

**চাও শেং** প্রথম শতকের চীনা সাধু। তাও ধর্মমতের অন্যতম গুরু। কথিত আছে, তাঁর গুরু চাং তাও-লিং তাঁকে তাঁর ঘরের সামনে ৪০ দিন অপেক্ষমাণ রেখে এবং বিভিন্ন ধরনের সাতটি কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর সাধুতা, ধর্মনিষ্ঠা, সহনশীলতা, সাহসিকতা ও চরিত্রবলের পরিচয় পাওয়ার পর চাও শেংকে দীক্ষা দেন।

**চাং কুও** নবম শতকের চীনা সন্ন্যাসী। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত অজ্ঞাত। তিনি একটি শ্বেতকায় গর্দভের পিঠে চড়ে বেড়াতেন এবং এক দিনে বহু পথ অতিক্রম করতে পারতেন। কথিত আছে, বিশ্রামকালে তিনি সেই গাধাটিকে একটা কাগজের মতো ভাঁজ করে ছোট একটা পেটরায় পুরে রাখতেন। তাং সম্রাটেরা তাঁকে বহুবার রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তিনি একবার মাত্র সম্রাট মিং হুয়াংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সম্রাট কর্তৃক দ্বিতীয়বার আমন্ত্রিত হলে তিনি তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। লোকশ্রুতি অনুযায়ী, শিষ্যরা তাঁকে যথারীতি সমাহিত করে, কিন্তু পরে শবাধার খুলে তাঁর লাশ পাওয়া যায়নি।

**চাং জুং** খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বেকার চীনা সন্ন্যাসী। একপ্রকার বন্য গুল্মের মূল খেয়ে তিনি জীবনধারণ করতেন এবং দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করে বেড়াতেন। কথিত আছে, ২০০ বছরের বেশি তিনি বেঁচে ছিলেন এবং বহুকাল পরপর লোকের দৃষ্টিগোচর হতেন। তিনি গাছগাছড়ার রস থেকে বেগুনি রং তৈরি করে বিক্রয় করতেন এবং সে বিক্রয়লব্ধ অর্থ অনাথ ও বিধবাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। তাঁর নামে ১০ হাজার মঠ নির্মিত হয়।

**চাং তাও-লিং** প্রথম শতকের বিখ্যাত চীনা ধর্মগুরু। বর্তমান কিয়াংসু ও আনহুয়ির অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত প্রাচীন রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন তিনি। তিনি তাও মতবাদকে রীতিমতো একটি ধর্ম হিসেবে

প্রতিষ্ঠিত করেন এবং হাজার হাজার লোককে এই ধর্মে দীক্ষিত করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি বহু বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। তাও ধর্মমত সম্পর্কে তাঁর রচিত গ্রন্থটি ২৪ খণ্ডে সমাপ্ত। জীবনীশক্তিবর্ধক ওষুধ প্রস্তুত করতে গিয়ে তিনি একবার নিঃস্ব হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হয়ে তিনি স্থানান্তরে গিয়ে বহু শিষ্য সংগ্রহ করেন এবং তাদের দ্বারা বহু জনহিতকর কাজ করান। কথিত আছে, প্রতিষ্ঠা লাভের পর তিনি জীবনীশক্তিবর্ধক ওষুধ প্রস্তুত করতে সমর্থ হন এবং এর অর্ধমাত্রা পান করেন। ১২৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলে তাঁর অনুসারীরা বিশ্বাস করতেন। বিভিন্ন প্রাচীন চীনা গ্রন্থে তাঁর জীবনী সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। কেউ কেউ তাঁকে তাওবাদের প্রবক্তারূপে গণ্য করেন।

**চার্বাক** প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদী দার্শনিক। তিনি বৃহস্পতির শিষ্য বলে কথিত আছে। চার্বাক পারলৌকিক জীবনের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক ছিলেন। চার্বাক দর্শনমতে, সচেতন দেহ ছাড়া আত্মা বলে কিছু নেই। প্রত্যক্ষই প্রমাণ। সুখই পরম পুরুষার্থ। ঈশ্বর, পরলোক, বেদ, স্বর্গ, মুক্তি—সবই মিথ্যা। ব্রহ্মচর্য, শ্রাদ্ধাদি কর্ম সমস্তই নিষ্ফল। মৃত্যুতেই জীবনের শেষ। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে প্রায় সব সম্প্রদায়ই তাঁদের গ্রন্থে চার্বাকের মতকে পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপন করেছেন। ঋগ্‌বেদ (১০.৭২), ছান্দোগ্যোপনিষৎ (৮.৭-৮), মহাভারত (শান্তিপর্ব, শল্যপর্ব), মাধবাচার্যের *সর্বদর্শন সংগ্রহ* (প্রথম অধ্যায়), *বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্য*, শঙ্করের *শরীরকভাষ্য*, বাচস্পতির *ভামতী* প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্বপক্ষরূপে চার্বাকমতের উল্লেখ আছে। চরমপন্থী চার্বাকরা বলেন, প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। তাঁরা অনুমানের প্রামাণিকতা মানেন না। তাঁদের মতে, যা প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, তার অস্তিত্ব নেই। পরলোক, পাপ ও পুণ্য বলে কিছু নেই, যেহেতু এগুলো প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। চার্বাকপন্থীরা স্বভাববাদী, হেতুবাদী নন। তাঁদের মতে, উৎপত্তি হওয়াই কার্যের স্বভাব। যদিও চার্বাকপন্থীদের অপর একটি অংশের মতে, স্বভাব থেকে কার্য উৎপন্ন হয়। তাঁরা প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়েরই প্রামাণিকতা স্বীকার করেন। ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু—এই চার ধরনের মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে তাঁরা বলেন, শরীর, ইন্দ্রিয় ও বাহ্য বিষয়াদি এই চার ধরনের মৌলিক পদার্থের সমাহার মাত্র। তাঁরা ভূতচৈতন্যবাদ প্রবর্তন করেন। এই মতানুসারে চৈতন্যের স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নেই, চারটি ভূত পদার্থের সংমিশ্রণে দেহে চৈতন্য জন্মায়। চার্বাকমতে, ইন্দ্রিয়জ সুখই মানুষের জীবনে একমাত্র কাম্য। পার্থিব দুঃখই নরক। চার্বাকপন্থীদের মতে, মৃত্যুতেই সবকিছুর সমাপ্তি ঘটে। মৃত্যুর পর শরীর ও চৈতন্য কোনোটিরই অস্তিত্ব থাকে না। চার্বাক দর্শন মানুষের দৃষ্টিকে অসীম থেকে সসীমের দিকে, আধ্যাত্মিকতা থেকে বাস্তবের দিকে আকৃষ্ট করতে প্রয়াসী।

মহাভারতের এক রাক্ষসের নামও চার্বাক। সে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষ নিয়ে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। জয়লাভের পর যুধিষ্ঠির যখন হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরোহণ করতে যান তখন সমবেত ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে ছদ্মবেশধারী চার্বাক তাতে আপত্তি করে বলে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মমতে যুদ্ধে আত্মীয় এবং গুরুজন বধ করার অপরাধে যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু হওয়া উচিত। তখন অন্য ব্রাহ্মণরা দিব্যজ্ঞানের দ্বারা চার্বাককে চিনতে পারেন ও অবিলম্বে তাকে ভস্মীভূত করেন।

**চালচিত্র** দেব-দেবীর প্রতিমার মাথার পেছনে অর্ধগোলাকার সচিত্র আচ্ছাদন। প্রাচীন পাথরের মূর্তিতেও এর ব্যবহার দেখা যায়। বর্তমানে সাধারণত দুর্গাপ্রতিমার পেছনের চিত্রময় অর্ধবৃত্তাকার অংশই চালচিত্র নামে পরিচিত। এ দেশে বহুকাল ধরে পটে বা কাগজে চালচিত্র আঁকার রেওয়াজ চলে আসছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কাপড়ের ওপর কাগজ এঁটে তার ওপর মাটির প্রলেপ দিয়ে প্রথমে জমি তৈরি করা হয়। কখনো জমি তৈরি করতে মাটির সঙ্গে কঞ্চি এবং দরমাও ব্যবহার করা হয়। জমির ওপর খড়িমাটির সাহায্যে বা চুনকাম করে সাদা রং লাগানো হয়।

সাদা রঙের ওপর শিব, শিবের অনুচর, দেবাসুরের যুদ্ধের দৃশ্য, কালীমূর্তি, রাধাকৃষ্ণ, রামচন্দ্রের অভিষেক ইত্যাদি নানা ছবি আঁকা হয়। পুরোনো চালচিত্রের নিদর্শনের কেন্দ্র-শীর্ষে মহাদেবের ছবি দেখা যায়। দুর্গামূর্তি ছাড়াও জগদ্ধাত্রী ও বাসন্তী দুর্গার মূর্তির পেছনেও চালচিত্র দেখা যায়।

**চি লুং মিং** প্রাচীন চীনের এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। কথিত আছে, তিনি একটি ড্রাগন পালন করতেন। সেটা একদিন উধাও হয়ে যায়। ৫০ বছর পর সেই ড্রাগনের পিঠে চড়ে তিনি নিজ এলাকার লোকদের আসন্ন বিধ্বংসী এক প্লাবনের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। পরে যা সত্য প্রমাণিত হয়। চিৎকার করে মানুষকে সতর্ক করেছিলেন বলে তিনি চি-লুং-মিং (বা ড্রাগনারোহীর চিৎকার) নামে পরিচিতি পান।

**চিউ চ্যাং-চুন** চীনা পরিব্রাজক। জন্ম ১১৪৮ ও মৃত্যু ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে। সুং ও জিন রাজদরবারের বিখ্যাত তাওপন্থী সন্ন্যাসী। দেশভ্রমণে বেরিয়ে প্রথমে পিকিং (বর্তমান বেজিং) যান; তারপর মধ্য এশিয়া হয়ে পারস্যে আসেন এবং ভারত সীমান্তে পৌঁছে মঙ্গোল সম্রাট চেঙ্গিস খানের নির্দেশে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। চিউ চ্যাং-চুন-এর এই ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁর এক শিষ্য লি চি চ্যাং লিপিবদ্ধ করেন এবং তাঁর অন্য শিষ্য সুন-সি তা প্রকাশ করেন (১২২৮)।

**চিত্রগুপ্ত** ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনির চরিত্র। যমের কর্মচারী। যম বা ধর্মরাজের অধীনে তিনি মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাব রাখেন। ব্রহ্মার অঙ্গ থেকে তাঁর জন্ম। জগৎ সৃষ্টির পর ব্রহ্মার ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁর অঙ্গ থেকে নানা বর্ণে চিত্রিত এক পুরুষ দোয়াত ও কলম হাতে বেরিয়ে আসেন। জন্মের পর ব্রহ্মাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তাঁকে কী কাজ করতে হবে। ব্রহ্মা পুত্রকে বললেন, তুমি যমের কাছে যাও এবং সেখানে বসে মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাব রাখো। মানুষের পাপ-পুণ্যের চিত্রবিচিত্র হিসাব গুপ্ত রাখেন বলে তাঁর নাম চিত্রগুপ্ত। মানুষের ললাটে তিনি ভাবী শুভাশুভ ফলও লিখে রাখেন। কার্তিক মাসের দ্বিতীয়া শুক্লাতিথিতে চিত্রগুপ্তের পূজা হয়।

**চিয়াও সিয়েন** তৃতীয় শতকের অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন চীনা সন্ন্যাসী। তিনি চীনের হো-তুং (শানহসী)-এর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ও কার্যকলাপ সবকিছুই ছিল অদ্ভুত। কথিত আছে ১৭০ বছর বয়সে তিনি সাদা পাথর সেদ্ধ করে তা আলুর মতো নরম করে খেতেন। এ ছাড়া পাহাড় থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তিনি তা বিনা মূল্যে বিতরণ বা কখনো কখনো বিক্রয় করতেন। তিনি নারী সাহচর্য সম্পূর্ণ বর্জন করে চলতেন এবং কখনো কখনো দীর্ঘদিন না খেয়ে থাকতেন। একবার আগুনে তাঁর কুটির সম্পূর্ণ পুড়ে যায়, কিন্তু তাঁর দেহ ও পোশাক অক্ষত ছিল। আরেকবার তাঁর কুটির ঘন তুষারের নিচে ঢাকা পড়ে যায়, কিন্তু পরে লোকজন খনন করে দেখে তিনি তার নিচে আরামে ঘুমিয়ে আছেন। আরও কথিত আছে, পর্যায়ক্রমে কখনো যুবক কখনো বা বৃদ্ধ এভাবে তিনি ২০০ বছরের বেশি বেঁচে ছিলেন।

**চিহ্-ই** ষষ্ঠ শতকের চীনা বৌদ্ধ গুরু। আসল নাম চেন তি-অজ্ঞান। তবে চিহ্কাই নামেও তিনি পরিচিত। বৌদ্ধমতের তিয়েন-তাই সম্প্রদায়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁর গ্রন্থ *মো-হো-চিহ-কুয়ান*-এ তিয়েন-তাই দর্শনের ব্যাখ্যা দান করেন। এ ছাড়া তিনি *পদ্মসূত্রের* দুটি ভাষ্য রচনা করেন। *পদ্মসূত্র* হলো সংস্কৃত সূত্রগ্রন্থ *সদ্ধর্মপুণ্ডরীক*-এর অনুবাদ।

**চিহিল গাজি** 'চিহিল' শব্দের অর্থ চল্লিশ, আর 'গাজি' শব্দের অর্থ ধর্মযুদ্ধে বিজয়ী। চিহিল গাজি বলতে ধর্মযুদ্ধজয়ী ৪০ জন মুসলমান সাধককে বোঝায়। তবে ঠিক কোন ধর্মযুদ্ধে জয়লাভ করে এই ৪০ জন সাধক গাজি হন তা জানা যায় না। তাঁরা ছিলেন আসলে ইসলাম প্রচারক সুফিসাধক। স্থানীয় রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে 'গাজি' উপাধি পান। অত্যাচারিত জনসাধারণকে বাঁচাতে তাঁরা অস্ত্রধারণ করেছিলেন। দিনাজপুর জেলা সদর থেকে ছয় কিলোমিটার উত্তরে চিহিল গাজি ইউনিয়নে চিহিল গাজির মাজার অবস্থিত। চিহিল গাজিদের দলনেতা ছিলেন জয়নুদ্দীন বাগদাদি। ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে তিনি এ দেশে আগমন করেন। চিহিল গাজির মাজার-সংলগ্ন প্রাচীন

মসজিদে রুকনউদ্দীন বারবাক শাহর আমলে (১৪৫৯-৭৪) উৎকীর্ণ এক শিলালিপিতে চিহিল গাজির রওজা মেরামতের উল্লেখ আছে।

**চুয়াংসু** চীনা দার্শনিক; জন্ম আনুমানিক ৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে। প্রকৃত নাম চৌ, ডাক নাম চোয়াং, তা থেকে চোয়াং-চৌ বলেও অভিহিত হন। তাওবাদের শ্রেষ্ঠ সমর্থক ও অন্যতম মৌলিক চিন্তাশীল লেখক। বস্তুর আপেক্ষিকতা, পার্থিব জগতের অনিত্যতা ও আধ্যাত্মিক মুক্তির প্রয়োজনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে লাওৎসের মতবাদের সমর্থন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ *নানহুয়াংচিং* 'নানহুয়ার নীতি' নামে পরিচিত।

**চুরিঙ্গা** অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের কাছে পবিত্র এক ধরনের খোদাই করা পাথর। অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের জীবনে বিভিন্ন ধরনের মিথ বা কিংবদন্তির বিরাট প্রভাব রয়েছে। তারা বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকানোর মতো ঘটনাগুলোর মধ্যেও অলৌকিকতা খুঁজে পায়। পুরাণে উল্লেখিত বিভিন্ন ঘটনাবলি তারা শিলায়, গুহার দেয়াল কিংবা কাঠের গায়ে চিত্রিত বা খোদিত করে রাখত। এক ধরনের পাথরের ওপরও তা উৎকীর্ণ করা হয়। এই পাথরগুলোই চুরিঙ্গা নামে পরিচিত।

**চেন-লি** চীনা কনফুসিয়াসবাদী পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক। ছদ্মনাম শৌ-ওয়েং। ডাকনাম তিং-ইউ। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এই ব্যক্তি ইউয়ান রাজবংশের অধীনে কাজ করতে রাজি না হয়ে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। সুং রাজবংশের ইতিহাস নিয়ে লেখা *লি চাও তুং লিয়েহ* তাঁর প্রধান গ্রন্থ। এ ছাড়া তিনি দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ ও ইতিহাসের ভাষ্য এবং গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধাবলি সংকলন করেন।

**চৈতন্য** শ্রীচৈতন্য দ্র.

**চৈতন্য চরিতামৃত** কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব মতবাদের সংক্ষিপ্তসার। এতে রয়েছে চৈতন্যজীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা, বিশেষ করে তাঁর সন্ন্যাসজীবনের বৃত্তান্ত। ভাগবত, গীতা প্রভৃতি ৭৫টি সংস্কৃত উৎস থেকে এক হাজারের অধিক সংস্কৃত শ্লোক সংকলিত হয়েছে এ গ্রন্থে। চৈতন্য ভাগবতের মতো *চৈতন্য চরিতামৃত*ও তিনটি খণ্ডে বিভক্ত: আদি, মধ্য ও অন্ত্য এবং এগুলোর সর্গসংখ্যা যথাক্রমে ১৭, ২৫ ও ২০। *চৈতন্য ভাগবত*-এর কাহিনি যেখানে নবদ্বীপের গৃহে চৈতন্যের জীবনকাহিনিতেই কেন্দ্রীভূত, সেখানে *চৈতন্য চরিতামৃত*-এ পুরীতে সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যের জীবন ও তাঁর তীর্থ ভ্রমণের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

কৃষ্ণদাস চৈতন্যকে ঈশ্বরের অবতার নয়, বরং পূর্ণ ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর মতে, স্বয়ং কৃষ্ণই নিজের মধ্যে রাধাপ্রেম অনুভব করার জন্য চৈতন্যরূপ নিয়েছেন। একে বলা হয় দ্বৈতাদ্বৈত বা যুগলাবতার। অর্থাৎ রাধা ও কৃষ্ণ অভিন্ন সত্তা; চিরদিনই বিচ্ছিন্ন আবার চিরদিন মিলিত। অর্থাৎ গ্রন্থের গোড়ার সর্গগুলোয় গৃহত্যাগ করে চৈতন্যের সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ পর্যন্ত কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মধ্য পর্বে রয়েছে তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের বিশদ বিবরণ এবং জগন্নাথের রথযাত্রা ও অন্যান্য উৎসবের কালে চৈতন্য ও তাঁর ভক্তদের কর্মকাণ্ড। এই পর্বের শেষাংশে আছে রূপ ও সনাতনের সঙ্গে চৈতন্যের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের বিশদ বর্ণনা।

গ্রন্থের শেষ পর্বে ভক্তদের বিশেষত হরিদাস, রঘুনাথ দাস ও জগদানন্দের সঙ্গে ভাববিনিময়ের ঘটনা গল্পাকারে পরিবেশিত হয়েছে।

**চৈতন্য ভাগবত** বৃন্দাবন দাস রচিত বাংলা ভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ চৈতন্যজীবনী। গ্রন্থটিতে চৈতন্যের শৈশবলীলা এবং তাঁর জন্মের আগের বাংলার অবস্থা থেকে তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত সময়কালের ঘটনা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। বৃন্দাবন দাস জোর দিয়ে বলেছেন, চৈতন্য কেবল একজন অবতার নন, সাধারণ মানুষের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল।

**চৈতন্যমঙ্গল** লোচনদাস ঠাকুর রচিত বাংলা বৈষ্ণবগ্রন্থ। আনুমানিক ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে রচিত। পয়ার ছন্দে লিখিত এই গ্রন্থ চারটি খণ্ডে বিভক্ত: সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষ খণ্ড। গ্রন্থটিতে ভগবানের গৌরাঙ্গ বা চৈতন্যরূপে আবির্ভাবের পূর্বাভাস থেকে তাঁর অন্ত্যলীলা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। লোচনদাস তাঁর গুরু নরহরি সরকারের আজ্ঞায় এই গ্রন্থ রচনা করেন।

**চৈত্য** বৌদ্ধ ধর্মমন্দির, মঠ কিংবা স্মৃতিকেন্দ্র। স্তূপের মতো উপাসনাস্থল। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা অলৌকিক ক্রিয়াদির স্মারকচিহ্ন হিসেবে নির্মিত হয়।

**চৈত্রসংক্রান্তি** চৈত্র মাসের শেষ দিন। এই দিনে স্নান, দান, ব্রত, উপবাস, প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মকে পুণ্যজনক বলে মনে করা হয়। চৈত্রসংক্রান্তির প্রধান উৎসব হলো চড়ক। এর সঙ্গে চলে গাজনের মেলা। মাসজুড়ে উপবাস, ভিক্ষান্নভোজন প্রভৃতির পর সংক্রান্তির দিন সন্ন্যাসী ও সাধারণ বিশ্বাসী মানুষ শূলফোঁড়া, বাণফোঁড়া ও বড়শিগাঁথা অবস্থায় চড়কগাছে ঘোরা, আগুনের ওপর হাঁটা প্রভৃতি কষ্টসাধ্য দৈহিক কলাকৌশল দেখায়।

## ছ

**ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ** প্রাচীন সংস্কৃত প্রবচন। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই চারটি স্তরের প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা এবং অনুশীলন করা ছিল অপরিহার্য। ব্রহ্মচর্যের এই কালটিই ছিল ছাত্রাবস্থা। ছাত্র বা শিষ্যকে গুরুগৃহে গুরুর সান্নিধ্যে থেকে পাঠ গ্রহণ এবং গুরু-নির্দেশিত গৃহকর্ম সম্পন্ন করতে হতো। গুরুগৃহে একমাত্র অধ্যয়ন ছাড়া অন্য বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ ছিল না। গুরুগৃহে শাস্ত্র অধ্যয়নই ছিল ছাত্রের একমাত্র তপস্যা।

**ছুঁ মন্তর ছুঁ** রোগব্যাধি বা দৈবদুর্বিপাকের বিরুদ্ধে এক ধরনের অর্থহীন শব্দাবলির ব্যবহার। ইংরেজি 'অ্যাবরাক্যাডাবরা' বা বাংলা 'হিং টিং ছটে'র সঙ্গে তুলনীয়। উপকার বা উপশম আশা করে অরণ্যচারী আদিবাসীরা এ ধরনের দুর্বোধ্য শব্দাবলিকে মন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। জাদুর খেলায় জাদুকরেরা এখনো এই কথাগুলো ব্যবহার করেন।

**ছৌনাচ** বীরত্বব্যঞ্জক নাচ। ঢাল, তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে এ নাচ অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া-বাঁকুড়া অঞ্চলে এ নাচের প্রচলন রয়েছে। রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে ছৌ-নাচের পালা রচিত হয়। পালায় দেব, দানব, পশু প্রভৃতির চরিত্রানুযায়ী মুখোশ ও পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হয়। এতে মুখোশ ও অলংকার পরে পুরুষরাই নারীচরিত্রে নৃত্য করে। শিবের গাজন ছাড়াও অন্য যেকোনো উপলক্ষে এমনকি উপলক্ষ ছাড়াও যেকোনো স্থানে এ নাচ প্রদর্শিত হয়। বাগদি ও ভূঁইয়া সম্প্রদায়ের অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এ নৃত্যের প্রচলন বেশি। ছৌনাচ শুরু হয় গণেশের বন্দনা দিয়ে; তারপর চরিত্রের আগমন উপলক্ষে দুই চরণের সংক্ষিপ্ত গীত গাওয়া হয়। ছৌনাচে গান অপেক্ষা নাচ ও বাদ্যের অংশই বেশি।

## জ

**জগদীশ তর্কালঙ্কার** সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম নবদ্বীপ, পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে। সংস্কৃত *দীধিতি* গ্রন্থের টীকা রচনা তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ ছাড়া *তর্কামৃত, রহস্যপ্রকাশ* ইত্যাদি বহু গ্রন্থের তিনি ভাষ্য রচনা করেন।

**জগদ্দল বিহার** প্রাচীন বৌদ্ধবিহার। ধারণা করা হয়, রাজা রামপাল (১০৭৭-১১২০ খ্রি.) এটি নির্মাণ করেন। মদনপালের রাজত্বকালে রচিত সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিতম* গ্রন্থ অনুসারে এ বিহারের অবস্থান বরেন্দ্রীতে। এ বিহারের প্রধান বিগ্রহ ছিল অবলোকিতেশ্বরের। বিভূতিচন্দ্র, মোক্ষকর গুপ্ত ও শুভকর গুপ্তের মতো তিব্বতের কয়েকজন বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত এই বিহারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মহাযান ধর্মমতের বজ্রযান ও তন্ত্রযান দর্শনসংক্রান্ত বেশকিছু সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ জগদ্দল বিহারেই তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এই বিহারে বসেই পণ্ডিত শুভকর গুপ্ত ও অভয়কর গুপ্ত বৌদ্ধধর্মবিষয়ক বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া এঁরা ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষ করে কবিতার বিকাশেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। *সুভাষিত রত্নকোষ*-এর সংকলক বিদ্যাকরও ছিলেন জগদ্দল মহাবিহারের পণ্ডিত।

**জগদ্ধাত্রী** দেবী দুর্গার রূপভেদ। তিনি সিংহবাহিনী, চতুর্ভুজা, নানা আভরণভূষিতা,অরুণকিরণের ন্যায় বর্ণযুক্তা এবং সর্পরূপ যজ্ঞোপবীতধারিণী। তাঁর বাঁ দিকের দুহাতে থাকে শঙ্খ ও ধনু এবং ডান দিকের দুহাতে থাকে চক্র ও পঞ্চবাণ। পরিধানে রক্তবর্ণের বস্ত্র। জগদ্ধাত্রীর প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় *মায়াতন্ত্র*-এ, বৃহস্পতি রায়মুকুটের *স্মৃতিরত্নহার*-এ (পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক), কৃষ্ণানন্দের *তন্ত্রসারে*

(ষোড়শ শতক) এবং শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণির *কৃত্যতত্ত্বার্ণবে*। কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রীর পূজা হয়। দুর্গোৎসবের মতোই এতে চণ্ডীপাঠ ও বিসর্জন-পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। জগদ্ধাত্রীপূজা একই দিনে তিনবার অনুষ্ঠিত হয়। স্থানবিশেষে তিন দিন ধরেও এই পূজা চলে।

**জগন্নাথ** হিন্দু দেবতা। পুরীধামের অধিষ্ঠাতা। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা হিসেবে পূজিত হন। তাঁর সঙ্গে বলরাম ও সুভদ্রাও পূজিত হন। এই ত্রয়ীকে অনেকে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের প্রতীক বলে গণ্য করেন। প্রথম দিকে বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জগন্নাথ শূন্যজ্ঞানে পূজিত হতেন। ওড়িশা লোকগীতিতে জগন্নাথ ও বুদ্ধকে অভিন্ন মনে করা হয়। কোথাও কোথাও বিষ্ণুর নবম অবতাররূপেও জগন্নাথের অবস্থান দেখা যায়। অনেকে জগন্নাথকে বিষ্ণু বা কৃষ্ণজ্ঞানে এবং বলরাম ও সুভদ্রাকে তাঁর ভাই-বোন হিসেবেও কল্পনা করেন। এভাবে একসময় বলরাম শিবরূপে এবং সুভদ্রা ভুবনেশ্বরীরূপে জগন্নাথের সঙ্গে যুক্ত হলে একটি ত্রয়ী গঠিত হয়। এই ত্রয়ী থেকেই হিন্দু আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির তিনটি প্রধান ধারা যথাক্রমে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব মিলিত হয়ে একটি সাধারণ বৈষ্ণবীয় ধারায় পরিণত হয়। জগন্নাথ দারুব্রহ্ম নামেও অভিহিত হন। এ ক্ষেত্রে পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্মকে দারু বা কাষ্ঠে অধিষ্ঠিত মনে করা হয়। বেদান্তমতে, ব্রহ্মের মতোই তিনি রহস্যাবৃত। ভক্তরা তাঁকে চকদোলা বা চকনয়ন নামেও স্মরণ করে থাকে। চকদোলা অর্থ, যার চোখ গোলাকৃতি। জগন্নাথের চোখ বলরাম ও সুভদ্রার মতো লম্বা নয়। তাঁর চোখের আকৃতি সূর্য ও চন্দ্রের মতো, অর্থাৎ গোলাকার। পুরীতে জগন্নাথের মন্দির আছে। সে মন্দিরে নিমকাঠের তৈরি জগন্নাথের মূর্তি আছে। এ মূর্তি মাঝেমধ্যে সমাধিস্থ করে তার জায়গায় নতুন মূর্তি স্থাপিত হয়। একে নবকলেবর-উৎসব বলে। জগন্নাথদেবের স্মরণে পুরীসহ বাংলার সর্বত্র আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়। জগন্নাথের অনুগ্রহ লাভের আশায় রথের ওপর তাঁর মূর্তি স্থাপন করে শত শত মানুষ এই রথ টানায় অংশগ্রহণ করে।

**জগন্মোহিনী** ধর্মীয় মতবাদ। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকে জগমোহন নামক একজন সাধকের নামানুসারে এই মতবাদের উদ্ভব হয়। শ্রীহট্টের বাঘাপুরা গ্রামে কিংবা মতান্তরে চন্দ্রদ্বীপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মুরারি নন্দ নামে এক সাধুর কাছে জগমোহন দীক্ষা নেন। সিলেটের মান্দুলিয়া, জলসুখা এবং বিথঙ্গলে এই সম্প্রদায়ের মঠ আছে। জগন্মোহিনী সম্প্রদায় মূর্তিপূজা করে না। ধর্মচর্চায় তারা গুরুমুখী এবং ব্রহ্মচর্য পালন করে। মানবসেবাকেই তারা ধর্ম মনে করে। এই সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরু ছিলেন রামকৃষ্ণ (১৫৭৬-১৬৯২)। তিনি জগন্মোহিনী ধর্মের অনুসারী শান্ত গোঁসাইর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর চেষ্টায় শ্রীহট্ট জেলায় জগন্মোহিনী সম্প্রদায়ের অনেক শিষ্য গড়ে ওঠে। শ্রীহট্টের বিথঙ্গলে এদের প্রধান আখড়া অবস্থিত। আখড়ায় ধর্মালোচনার সঙ্গে সঙ্গে 'নির্বাণ সংগীত' পরিবেশিত হয়। কবীর দাস ও লবনী দাসের রচিত গানে তাদের সাধনতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

**জগবন্ধু** বৈষ্ণব সাধক ও লেখক। জন্ম ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে। তিনি অনেক তীর্থ পরিভ্রমণ করেন এবং বৃন্দাবনে গভীর সাধনায় মগ্ন হন। বৃন্দাবন থেকে ফিরে তিনি ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে 'শ্রীঅঙ্গন' নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কীর্তনবিষয়ে তাঁর আটটি গ্রন্থ আছে। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

**জটাধর** মহাভারতে বর্ণিত দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধে দেবপক্ষের প্রধান সেনাপতি কার্তিকেয়কে যে সৈন্যরা সাহায্য করেন তাঁদের একজন।

শিব বা মহাদেবেরও আরেক নাম জটাধর।

**জটিলা** রাধিকার স্বামী আয়ান ঘোষের মাতা। গোল ঘোষের পত্নী। দুর্মদ নামে তাঁর আরেক পুত্র ও কুটিলা নামে এক কন্যা ছিল। রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে মোহিত বলে জটিলা-কুটিলা তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করেন। জটিলা নিজ পুত্রের প্রতি রাধিকার মনে অনুরাগ জন্মাতে ব্যর্থ হন। ননদিনী কুটিলার কুটিল মনোভাবের ফলে রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে সবিশেষ উদ্বুদ্ধ হন।

মহাভারত আদিখণ্ডে জটিলানাম্নী এক ধর্মপরায়ণা নারীর উল্লেখ আছে। কথিত আছে,

সাতজন ঋষি এর স্বামী ছিলেন।

**জতুগৃহ** পাণ্ডবদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে দুর্যোধনের নির্মিত গৃহ। মহাভারতে দুর্যোধন বারণাবত নগরে লাক্ষা ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ দ্বারা এই গৃহ নির্মাণ করেন। অতঃপর পাণ্ডবদের সে গৃহে বাস করতে দেওয়া হয়। বিদুরের কাছ থেকে আগেই কৌরবদের এ অভিসন্ধি জানতে পেরে পাণ্ডবরা সে গৃহের তলদেশ দিয়ে নদী পর্যন্ত এক দীর্ঘ সুড়ঙ্গ খনন করেন। পরে দুর্যোধনের মন্ত্রী পুরোচন ও অন্যদের গৃহমধ্যে বন্ধ করে পাণ্ডবরা জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করেন এবং নিজেরা সুড়ঙ্গপথে নিরাপদে নদীতীরে পৌছান। সেখান থেকে বিদুরের পাঠানো নৌকায় চড়ে তাঁরা সরে পড়েন। ফলে দুর্যোধনের অভিসন্ধি ব্যর্থ হয়। যদিও গুজব রটে যে পাণ্ডবরা আগুনে পুড়ে মারা গেছেন।

**জন দ্য ব্যাপটিস্ট, সেন্ট** ইহুদিদের শেষ প্রেরিত পুরুষ। আবি. আনু. ২৯ খ্রিষ্টপূর্ব। খ্রিষ্টানরা তাঁকে তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা যিশুখ্রিষ্টের পূর্বসূরি বলে শ্রদ্ধা করেন। সেন্ট জাকারি ও সেন্ট এলিজাবেথের পুত্র। গসপেল মতে, তাঁর জন্ম সম্পর্কে অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। তিনি যিশুর আবির্ভাব ঘোষণা করেন। শিষ্যদের তিনি ব্যাপটাইজ অর্থাৎ জর্ডন নদীর পানি ছিটিয়ে দীক্ষাদান করতেন। যিশুকেও তিনি অনুরূপভাবে ব্যাপটাইজ করেন। তাঁর ধর্মপ্রচার ও জনপ্রিয়তা তাঁর প্রতি সমাজের উঁচু মহলের বিরূপতার কারণ হয়। তিনি প্রকাশ্যে রাজা হেরডের পত্নী হিরোডিয়াসকে তিরস্কার করলে হিরোডিয়াস ও তাঁর কন্যা সালোমির প্ররোচনায় জনের শিরশ্ছেদ করা হয়। কুমারী মেরি ছাড়া তিনি একমাত্র সন্ত, যাঁর জন্মতিথি (২৪ জুন) পালন করা হয়ে থাকে। ২৯ আগস্ট তাঁর মৃত্যুর দিনটিও শোকদিবস হিসেবে পালিত হয়।

**জনক** শব্দটির আভিধানিক অর্থ পিতা। পুরাণে উল্লেখিত মিথিলার রাজা। ঋষিতুল্য আচরণের জন্য জনক ঋষি ও রাজর্ষি নামে পরিচিত ছিলেন। সীতার পালক পিতা। তাঁর প্রকৃত নাম সীরধ্বজ। হালচাষ করার সময় তাঁর লাঙলের অগ্রভাগে যে অপূর্ব সুন্দরী কন্যাটি উঠে আসে তিনি তাঁকে সীতা নামকরণ করে কন্যাসম প্রতিপালন করেন। অযোধ্যার রাজপুত্র রাম জনকের রাজসভায় হরধনু ভঙ্গ করে আপন যোগ্যতার প্রমাণ দিলে জনক সীতাকে রামের হস্তে সমর্পণ করেন এবং নিজ ঔরসজাত কন্যা উর্মিলাকে লক্ষ্মণের সঙ্গে বিয়ে দেন।

**জন্মান্তরবাদ** মৃত্যুর পর পুনর্জন্মে বিশ্বাস। হিন্দুধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কর্মফলে বিশ্বাস। এই বিশ্বাস অনুযায়ী প্রাণীজীবনের প্রতিটি ঘটনা বা ফলই বর্তমান বা পূর্বজন্মের কর্মের ফল। মৃত্যুতে জীবনের শেষ নয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হয় মাত্র। মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে আত্মা এ পৃথিবীতে এক দেহ থেকে অন্য দেহে গমনাগমন করে। এভাবেই দৈহিক রূপান্তরের মাধ্যমে পাপ ক্ষয় করে আত্মা মুক্তির দিকে এগিয়ে যায়। আর এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো পুনর্জন্ম থেকে নিষ্কৃতি। জীবাত্মার পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়া। পুনর্জন্মে বিশ্বাস এবং পূর্ববর্তী জন্মের কর্মানুসারে পরবর্তী জীবনে আত্মার দেহ ধারণ একাধিক জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করে। পুনর্জন্মের বিষয়টি এ ধারণাকে সমর্থন করে যে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যেমন এই বিশ্বের অস্তিত্ব অনুভব করি, তেমনি অন্য ইন্দ্রিয় ও চেতনা দ্বারা ভিন্ন বিশ্বের অস্তিত্বও অনুভব করা যেতে পারে।

**জন্মাষ্টমী** কৃষ্ণের জন্মতিথি। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টম তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব। এ উপলক্ষে উপবাস, কৃষ্ণের পূজা, চন্দ্রকে অর্ঘ্যদান ও রাত্রি জাগরণ সেরে রোহিণীব্রত পালন করলে সাত জন্মের পাপমুক্তি ঘটে। শাস্ত্রে আরও কথিত আছে, কোনো সক্ষম পুরুষ বা নারী এ দিন উপবাস না করলে পরজন্মে রাক্ষস বা সর্প হয়ে তাকে বনবাস করতে হবে।

**জপচক্র** তিব্বতি মন্ত্রচক্র। তিব্বতি ভাষায় একে 'মণি ছোস অখর' বলা হয়। এই চক্রে 'মণিপদ্মে হুম' মন্ত্র ছাড়াও কোনো কোনো সময় অন্যান্য শাস্ত্রের সার বা সম্পূর্ণ অংশ অন্তর্ভুক্ত থাকে। চক্র চললে ধরা হয় শাস্ত্র পাঠ করা হচ্ছে। জপচক্র সাধারণত হস্ত, জল বা বায়ুচালিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো কোনো তিব্বতি শরণার্থী বিদ্যুতে চালিত চক্র ব্যবহার করে। চক্র ঘড়ির নিয়মে ঘোরানো হয়। অবশ্য

যারা বন-পেট বা বন-সম্প্রদায়ভুক্ত তারা উল্টো দিকে এই চক্র ঘোরান। চক্রের প্রতি এতই শ্রদ্ধা ছিল যে কয়েক দশক আগে তিব্বতে কোনো চাকাওয়ালা যানবাহন ব্যবহার করা হতো না।

**জবুর** ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ। পবিত্র কোরআনের সুরা নিসা-এর ১৬৩ আয়াতে বলা হয়েছে, '...আমি দাউদকে দিয়েছিলাম জবুর।' সুরা আম্বিয়া-র ১০৫ আয়াতে বলা হয়েছে, 'জবুর কিতাবে উপদেশ উল্লেখের পর আমি লিখে দিয়েছি যে আমার যোগ্যতাসম্পন্ন দাসেরা পৃথিবীর অধিকারী হবে। এতে সে সম্প্রদায়ের জন্য বাণী রয়েছে যারা উপাসনা করে।'

**জমজম** মক্কায় অবস্থিত একটি কূপ। মুসলমানদের কাছে এই কূপের পানি পবিত্র বলে গণ্য হয়। হজের পর দেশে ফেরার সময় হাজিরা এই কূপের পানি সঙ্গে নিয়ে আসেন। কূপটি কাবা শরিফের প্রাচীর থেকে ৩৩ গজ দূরে অবস্থিত। এর প্রস্থ ৪ গজ ও গভীরতা প্রায় ৭০ গজ। হজরত ইবরাহিম (আ.) তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী হাজেরাকে মক্কার জনহীন প্রান্তরে নির্বাসন দেওয়ার পর হাজেরা বিবি যখন পানীয় জলের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে এদিকে-ওদিকে ছোটাছুটি করছিলেন তখন দেখতে পান ক্রন্দনরত শিশু ইসমাইলের গোড়ালির আঘাতে তাঁর পায়ের নিচের মাটি ভেদ করে পানির ধারা বেরিয়ে আসছে। হাজেরা বিবি পাথর কুড়িয়ে এনে সেই প্রস্রবণটি ঘিরে রাখেন। এটিই সেই ঐতিহাসিক জমজম কূপ। এই কূপকে কেন্দ্রই করেই পরে মক্কা নগর গড়ে ওঠে।

**জমদগ্নি** হিন্দু শাস্ত্রমতে বেদজ্ঞ ঋষি। ভৃগুপুত্র ঋচিকের ঔরসে ও কান্যকুব্জরাজ গাধির কন্যা সত্যবতীর গর্ভে তাঁর জন্ম। চতুর্বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি রাজা প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকাকে বিয়ে করলে সেই গর্ভে বিষ্ণুর অবতাররূপে পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। একবার স্ত্রী রেণুকাকে অকালে কামার্তা দেখে সন্দিহান জমদগ্নি ক্রোধবশে পুত্রদের আদেশ করেন মাতার শিরশ্ছেদ করতে। অন্যান্য পুত্র পিতৃ-আজ্ঞা পালনে অস্বীকৃত হলে তাঁদের জড়ত্বপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু পরশুরাম কুঠারাঘাতে মাতার শিরশ্ছেদ করেন। পরে সন্তুষ্ট পিতার কাছ থেকে বর লাভ করে পরশুরাম মাতা ও ভ্রাতাদের পুনরুজ্জীবিত করেন। হৈহয়রাজ কার্তবীর্যার্জুন একবার সসৈন্যে এসে জমদগ্নির আশ্রম লুণ্ঠন করলে পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা কার্তবীর্যার্জুনকে বধ করেন। প্রতিশোধ নিতে কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা পরশুরামের অনুপস্থিতিতে জমদগ্নিকে হত্যা করেন। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পরশুরাম পরে কুঠার দ্বারা একুশবার বিশ্বকে ক্ষত্রিয়হীন করেন।

**জমবি** একাধিক আফ্রিকি ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশের ধর্মবিশ্বাস। মরদেহে প্রাণসঞ্চারে সমর্থ অলৌকিক শক্তি বা ডাকিনীবিদ্যায় পুনরুজ্জীবিত শবদেহ বা মৃতব্যক্তি।

**জম্বু দ্বীপ** হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী পৃথিবীর সপ্তদ্বীপের অন্যতম। লবণসমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত এই দ্বীপ পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত বলে কথিত এবং ভদ্রাশ্ব, রম্যক, হিরণ্ময়, কেতুমাল, কুরু, কিম্পুরুষ, ভারত, হরিবর্ষ ও ইলাবৃত—এ নয়টি ভাগে বিভক্ত। কারও কারও ধারণা অনুযায়ী জম্বুদ্বীপ বলতে আসলে এশিয়া মহাদেশকেই বোঝানো হয়েছে।

**জয় ও বিজয়** স্বর্গে বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক দুই ভ্রাতা। হিন্দু পুরাণমতে একবার কতিপয় ঋষি বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করতে চাইলে জয়-বিজয় তাঁদের বাধা দেন। এতে রুষ্ট হয়ে ঋষিরা তাঁদের মর্তে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দেন। পরে জয় ও বিজয়ের অনুনয়ে তাঁরা উভয় ভ্রাতাকে শাপমুক্তির উপায় বলে দেন। ঋষিরা তাঁদের বলেন: 'তোমরা মর্তে জন্মগ্রহণ করবে ঠিকই, তবে বৈরীভাবে ঈশ্বরকে ভজনা করলে তিন জন্মে ও মিত্রভাবে ভজনা করলে সাত জন্মে তোমাদের পুনঃস্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে।' অভিশাপ অনুযায়ী দুই ভ্রাতা তিন যুগে তিনবার মর্তে জন্মান ও বৈরীভাবে ঈশ্বর ভজনা করেন। জয় সত্যযুগে হিরন্যাক্ষ, ত্রেতায় রাবণ ও দ্বাপরযুগে শিশুপাল রূপে এবং বিজয় সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু, ত্রেতায় কুম্ভকর্ণ, দ্বাপরে দন্তবক্ররূপে জন্ম নেন । শেষে এঁরা বিষ্ণুর হাতে নিহত হয়ে স্বর্গে গমন করেন।

**জয়দেব** সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত কবি। *গীতগোবিন্দ*র রচয়িতা। ধারণা করা হয়, তিনি রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। বীরভূমের

কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি গ্রামে অজয় নদীর তীরে তাঁর জন্ম। এখনো প্রতিবছর তাঁর নামে কেঁদুলিতে জয়দেবের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মতান্তরে তাঁর জন্ম উড়িষ্যায়। জয়দেবের পিতার নাম ছিল ভোজদেব ও মাতার নাম পদ্মাবতী। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমই তাঁর *গীতগোবিন্দ* কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু। গ্রন্থটি এযাবৎ পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কিংবদন্তি অনুযায়ী *গীতগোবিন্দ*র 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' চরণটি খোদ শ্রীকৃষ্ণের রচনা।

**জয়নুল আবেদিন** কাশ্মীরের অষ্টম সুলতান। তাঁর রাজত্বকালকে কাশ্মীরের স্বর্ণযুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। সব সম্প্রদায়ের প্রজাদের কাছে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি পরধর্মসহিষ্ণু ও উদার ছিলেন। তিনি জিজিয়া কর রহিত করেন এবং হিন্দুদের নতুন নতুন মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেন। তিনি তাঁর রাজ্যে গোহত্যা নিষিদ্ধ করেন এবং নিজেও মাংস বর্জন করেন। শিক্ষা, চিত্রাঙ্কন ও সংগীতচর্চায় তিনি উৎসাহ দান করেন এবং সংস্কৃত, আরবি ও অন্যান্য ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থের অনুবাদ করান।

**জরথুস্ত্র** প্রাচীন ইরানের পারসিক ধর্মের প্রবর্তক। জন্ম পশ্চিম ইরানে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো এক সময়। প্রায় কিশোর বয়সে গৃহত্যাগ করে তিনি উশিদারায়ন পর্বতে গমন করেন ও সেখানে ধ্যানমগ্ন হন। চল্লিশোর্ধ্ব বয়সে তিনি ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মমত অনুযায়ী অহুর মাজদা হলেন পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। বিশ্বাসের দিক থেকে একেশ্বরবাদী হলেও এই ধর্মে দ্বৈতবাদী চেতনা প্রাধান্য পেয়েছে। জরথুস্ত্রের মতে, অহুর মাজদা হলেন পুণ্যের দেবতাদের নেতা আর অহরিমন পাপের দেবতাদের নেতা। এই দুই শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বই হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চালিকা শক্তি। এই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত পুণ্যেরই জয় হয়। মানুষের দায়িত্ব হলো সব সময় সততা বা পুণ্যের পথ অনুসরণ করা। চিন্তা, কথা ও কাজে সৎ থাকা। পারসিকদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আবেস্তায় জরথুস্ত্রের ধর্মমত বিধৃত রয়েছে। ধারণা করা হয়, জরথুস্ত্রই এই গ্রন্থের সংগীতাংশের রচয়িতা। অ্যাকিমেনিডি রাজবংশের আমলে এই ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। আলেকজান্ডারের পারস্য বিজয়ের পর এর অবনতি ঘটলেও সাসানীয়দের আমলে তা পুনরুজ্জীবিত হয়।

**জাকাত** আরবি শব্দটির অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। ইসলামে বাধ্যতামূলক ধর্মীয় দান অর্থেই জাকাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কোনো মুসলমানের ধনসম্পদ থেকে তার নিজের ও পরিবারের সারা বছরের প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটানোর পর নির্ধারিত পরিমাণে অবশিষ্ট থাকলে এবং ওই ধনসম্পদ তার মালিকানায় এক বছর মেয়াদে স্থায়ী থাকলে বছর পূর্ণ হওয়ার পর সেই সম্পদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ শরিয়া-নির্ধারিত খাতগুলোয় প্রদান করাকে জাকাত বলা হয়। যে পরিমাণ ধনসম্পদ থাকলে জাকাত দান ফরজ হয় ইসলামি পরিভাষায় তাকে নিসাব বলা হয়। সামর্থ্যবান মুসলমানের পক্ষে জাকাত দেওয়া ফরজ অর্থাৎ অবশ্যকর্তব্য। ইসলামে ইমান এবং সালাত বা নামাজের পরই জাকাতের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনের বহু স্থানে সালাতের পাশাপাশি জাকাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে। বস্তুত, জাকাত প্রদান দাতার মনকে ধনসম্পদের প্রতি লোভ থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে। উপরন্তু, ধনীদের ধনসম্পদে গরিব-মিসকিনদের অধিকার রয়েছে—এই সত্যকেও তা প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন, পবিত্র কোরআনের সুরা জারিয়াত-এর ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর তাদের (সম্পদশালীদের) ধনসম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে।' এভাবে জাকাতের মাধ্যমে সামর্থ্যবানদের ধনসম্পদের কিছু অংশ ব্যয়ের ফলে তাদের অবশিষ্ট ধনসম্পদ পবিত্র হয়। সুরা তওবার ১০৩ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তুমি ওদের ধনসম্পদ থেকে সদকা আদায় করো, এর দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করে দেবে।' জাকাত শব্দের অপর অর্থ বৃদ্ধি। বস্তুত, জাকাত প্রদান করলে ধনসম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পবিত্র কোরআনের সুরা রুম-এর ৩৯ আয়াতে বলা হয়েছে, 'ধনসম্পদ বৃদ্ধির জন্য তোমরা যা সুদে দিয়ে থাকো তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য জাকাত দাও, তাদের ধনসম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।'

**জাকারিয়া** একজন নবী, ঈসা (আ.)-এর মা মরিয়ম বাল্যকালে যাঁর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। বাইবেলেও

তাঁকে নবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করায় তাঁকে হত্যা করা হয়।

**জাজেন** জাপানি শব্দের অর্থ পা দুটি আড়াআড়িভাবে রেখে ধ্যান। জেন-এর প্রাথমিক অনুশীলনে যখন পদ্মাসনে দেহ অনড়, নিঃশ্বাস নিয়মিত এবং গভীর মনোনিবেশের ফলে মন একত্ব লাভ করে।

**জাত ও সিফাত** ইসলামি দর্শন বা 'ইলমে কালামের' এক বিশিষ্ট পারিভাষিক শব্দযুগল যা দ্বারা আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি বোঝায়। সংজ্ঞা নির্দেশের জন্য 'জাত' দ্বারা আল্লাহর সর্বশক্তিময় অনন্ত সত্তা ও 'সিফাত' দ্বারা তাঁর প্রচলিত ১০১ নামের বিভিন্ন গুণাবলি বোঝানো হয়।

**জাতক** ত্রিপিটকের অন্তর্গত কথকতা। বুদ্ধত্ব লাভের পর সিদ্ধার্থ গৌতম তার অতীত জীবনের কথা স্মরণ করার ক্ষমতা অর্জন করেন। শিষ্যদের সঙ্গে ধর্মালোচনাকালে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হিসেবে তিনি তাঁর অতীত জীবনের বহু ঘটনার কথা উল্লেখ করতেন। সেসব ঘটনার সংকলনই জাতক সাহিত্য। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে বুদ্ধ ঘোষ রচিত *জাতকথবণ্ননা* নামক গ্রন্থে ৫৪৭টি জাতক অন্তর্ভুক্ত ছিল। ত্রিপিটকের সূত্রপিটকমতে, বুদ্ধদেব ৫৫০ বার জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং সে অনুযায়ী জাতকের সংখ্যা হওয়া উচিত ৫৫০টি। প্রতিটি জাতকের তিনটি অংশ। প্রথম অংশ 'প্রত্যুৎপন্নবস্তু' হচ্ছে জাতকের উপক্রমণিকা। এতে বুদ্ধ কখন কোথায় কাকে উপলক্ষ করে এবং কোন প্রসঙ্গে এই জাতককাহিনি বিবৃত করেছিলেন তার বিবরণ আছে। 'অতীতবস্তু' হচ্ছে জাতকের মূল অংশ, যেখানে বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনিগুলো বর্ণিত হয়েছে। শেষ অংশ 'সমাধানে' প্রত্যুৎপন্নবস্তুর সঙ্গে অতীতবস্তুর চরিত্রগুলোর যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। বর্ণিত চরিত্রগুলোর কে কোন জন্মে কী ছিলেন সে পরিচয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলায় জাতক অনুবাদ করেন ঈশানচন্দ্র ঘোষ।

**জাতিস্মর** অর্থ, যে মানুষ পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে। মানুষ মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম লাভ করে—এই বিশ্বাস বা ধারণাই জাতিস্মর-চেতনার মূলে কাজ করে। অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ায় জাতিস্মর-সংক্রান্ত বিশ্বাস প্রচলিত। সাহিত্যেও এর গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। মহাভারতের কয়েকটি জায়গায় জাতিস্মরের উল্লেখ রয়েছে। জাতকে এর প্রবল রূপ পাওয়া যায়। গৌতম বুদ্ধ দিব্যজ্ঞান লাভের পর প্রথমে জাতিস্মরজ্ঞান লাভ করেন। জাতকের কাহিনিগুলো গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের ঘটনা। তিনি পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করে এই কাহিনিগুলো বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালে *কথাসরিৎসাগর* ইত্যাদি গ্রন্থে জাতিস্মর মানুষ ও পশুপাখির নানা কাহিনি পাওয়া যায়। জৈন ধর্মগুরুরা জাতিস্মর-ক্ষমতার অধিকারী। ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম জন্মান্তরবাদ স্বীকার করে না।

**জাদুমন্ত্র** এমন শব্দ, শব্দগুচ্ছ, বাক্য বা বাক্যসমষ্টি, যার সাহায্যে বিস্ময়কর কিছু ঘটানো কিংবা কোনো ব্যক্তিকে সম্মোহিত বা অলৌকিকভাবে প্রভাবিত করা যায়। মন্ত্রের এই ধারণাটি মূলত মানুষের বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। আগে ভালো বা মন্দ যেকোনো উদ্দেশ্যেই জাদুমন্ত্র প্রয়োগ করা হতো। অনেক সময় ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য মন্ত্রের সাহায্যে পরলোকগত মহাপুরুষদের আত্মাকে আহ্বান করা হতো। এ ধরনের বিশ্বাস মূলত বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। পাশ্চাত্যে খ্রিষ্টধর্মের প্রসারের পর প্যাগান ধর্মের সঙ্গে সেখানে জাদুবিদ্যাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তার পরও, এমনকি যাজক সম্প্রদায়েরও অনেকের মধ্যে এই বিশ্বাস অটুট থাকে। চতুর্দশ শতকে ইউরোপে জাদুকর বলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়। ১৪৫০ থেকে ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এভাবে কয়েক হাজার জাদুকর ও ডাইনিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

**জান্নাত** আরবি শব্দটির অর্থ উদ্যান। ইসলাম ধর্মে যাঁরা বিশ্বাসী এবং ইহকালে সৎকর্ম করবেন, পরকালে পুরস্কার হিসেবে তাঁরা জান্নাতের অধিবাসী হবেন। পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে বহুবার জান্নাতের উল্লেখ এবং সে প্রসঙ্গে জান্নাতের কমবেশি বর্ণনাও আছে। এ প্রসঙ্গে হুর, গিলমান, সুউচ্চ আসন, সুরম্য অট্টালিকা, স্রোতস্বিনী ইত্যাদির যে উল্লেখ ও বর্ণনা পবিত্র কোরআনে

রয়েছে তাকে কেউ কেউ আক্ষরিকভাবে নয়, রূপক অর্থে বিবেচনার পক্ষপাতী। জান্নাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো জান্নাতুল ফেরদাউস। এ ছাড়া রয়েছে জান্নাতুল আদন, জান্নাতুল খুলদ, জান্নাতুল নাইম ও জান্নাতুল মাওয়া।

**জান্নাতুল বাকি** মদিনার বিখ্যাত কবরস্থান, যেখানে মহানবী (সা.)-এর আত্মীয়স্বজন ও বিশিষ্ট সাহাবিদের সমাহিত করা হয়েছে।

**জাবালি** হিন্দু পুরাণমতে ব্রহ্মর্ষি। ব্যবহারবুদ্ধি-সম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ। অযোধ্যার রাজা দশরথের সভায় ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। দশরথের মৃত্যুর পর তাঁর মধ্যম পুত্র ভরত যখন বনবাস থেকে রামকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনতে যান তখন জাবালি ভরতের সঙ্গী হন। রাম ভরতের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে জাবালি তাঁকে ধর্মবিরুদ্ধ কিন্তু ব্যবহারবুদ্ধি-সম্পন্ন উপদেশ দ্বারা প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেন। উত্তরে রাম তাঁকে বেদবিরোধী নাস্তিক বলে ভর্ৎসনা করেন এবং তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। জাবালি জানান, তিনি নাস্তিক বা আস্তিক কোনোটাই নন। তবে সময়ে দুটোই হতে পারেন। এ সময় বশিষ্ট জাবালির সমর্থনে রামকে বলেন, তিনি (জাবালি) সবই জানেন। ২. ছান্দোগ্য উপনিষদ-এ কথিত ব্রাহ্মণ ঋষি। বাল্যনাম সত্যকাম। যৌবনে বহুচারিণী জবালানাম্নী নারীর গর্ভে তিনি অবৈধ সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন। গৌতম মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে গুরু তাঁকে জাবালি নাম প্রদান করেন।

**জাবির ইবনে জায়দ** কুফার বিখ্যাত আলেম। হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। বহু হাদিস তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। কুফা ও বসরায় তিনি ধর্মশাস্ত্রবিদরূপে খ্যাতি লাভ করেন। খাজা হাসান বসরির অনুপস্থিতিতে তাঁর ওপর ফতোয়া দানের দায়িত্ব অর্পিত হতো। কুফার গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ অন্যান্য সাহাবা ও তাবেইনদের সঙ্গে তাঁকেও বন্দী করেন। ১০৩ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

**জাবিহা** ইসলামি ফিকাহ শাস্ত্রমতে জবেহকৃত প্রাণী। 'বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার' উচ্চারণে জবেহ করা প্রাণীর গোশত মুসলমানদের জন্য হালাল। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে জবেহ করা প্রাণী মুসলমানদের জন্য হারাম বা অবৈধ।

**জামাইষষ্ঠী** হিন্দুদের জামাইবরণের লৌকিক অনুষ্ঠান। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথি অর্থাৎ অরণ্যষষ্ঠীর দিনে হিন্দুরা ষষ্ঠীদেবীর পূজা করে। এ দিন ছয় প্রকার ফল ষষ্ঠীদেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করে তা পুত্র-জামাতা প্রভৃতিকে দিতে হয়। ব্রতফলে সন্তানসন্ততির দীর্ঘায়ু ও ঐশ্বর্য লাভ হয় বলে বিশ্বাস।

**জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশ** ইসলামি রাজনৈতিক দল। বিংশ শতকের ত্রিশের দশকের গোড়ায় অবিভক্ত ভারতে ইসলামি আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদির নেতৃত্বে একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। মাসিক পত্রিকা *তারজুমান আল-কোরআন*-এর মাধ্যমে ১৯৩২ সাল থেকেই এ লক্ষ্যে প্রচারকার্য শুরু হয়। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠার পথ' শীর্ষক এক বক্তৃতায় মওলানা মওদুদি মুসলিম লীগের সঙ্গে তার মতপার্থক্যের কথা প্রকাশ করেন। ১৯৪১ সালের ২৫ আগস্ট লাহোরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। মওলানা মওদুদি এ দলের আমির নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর জামায়াতে ইসলামী দুভাগে বিভক্ত হয়ে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ দিল্লিতে এবং জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান লাহোরে দলের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে। নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-আমির মওলানা মওদুদি।

১৯৫৩ সালে কাদিয়ানিবিরোধী দাঙ্গায় জড়িত থাকার অভিযোগে পাকিস্তান সরকার জামাতকে নিষিদ্ধ করে। সামরিক টাইব্যুনালের বিচারে জামাতের আমির মওদুদিকে সে সময় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরে ওই দণ্ডাদেশ কমিয়ে তাঁকে প্রথমে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান ও পরে মুক্তি দেওয়া হয়। তবে দল হিসেবে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত জামায়াত পাকিস্তানে নিষিদ্ধ ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী হিসেবে কাজ করে। দলের উদ্যোগে গঠিত আলবদর বাহিনীর হাতে এ সময়

বহু মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে দেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা অভিযানও জামায়াত ও তার এই সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারাই পরিচালিত হয়। তাদের এই মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকার কারণে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি দলের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীকেও নিষিদ্ধ করা হয়। এ ছাড়া দেশের নতুন সংবিধান অনুযায়ী ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলকেও নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৭৬ সালে রাজনৈতিক দল বিধির আওতায় সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের আমির মওলানা আবদুর রহীমের নেতৃত্বে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) রাজনৈতিক দল হিসেবে কর্মকাণ্ড পরিচালনার অনুমতি পায় এবং জামায়াতের কয়েকজন নেতা এই দলের মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মোট ছয়টি আসনে জয়লাভ করে। ১৯৭৯ সালে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নামে দলটি ভারপ্রাপ্ত মওলানা আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে পুনর্গঠিত হয়। ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ১০টি আসনে জয় লাভ করে। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী প্রার্থীরা ৩৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৮টি আসনে বিজয়ী হয় এবং সরকার গঠনের জন্য সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে সমর্থন দেয়। ১৯৯১ সালে আদালত কর্তৃক অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বৈধ ঘোষিত হওয়ার পর তাঁকে জামায়াতে ইসলামীর আমির নির্বাচন করা হয়। ২০০১ সালের নির্বাচনে জামায়াত চারদলীয় জোটের শরিক হিসেবে জয় লাভ করে ও বিএনপির নেতৃত্বে সরকারে যোগ দেয়। তাদের দুটি মন্ত্রী পদ দেওয়া হয়। ২০১৩ সালে গোলাম আযমসহ জামায়াতের কয়েকজন নেতাকে তাঁদের মুক্তিযুদ্ধকালীন মানবতাবিরোধী ভূমিকার জন্য বিশেষ আদালতে বিচার ও দণ্ড দেওয়া হয়।

**জামালুদ্দিন আফগানি** ইসলামি আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রবক্তা। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ইসলামি মতবাদের প্রবর্তক। জন্ম ১৮৩৯ সালে আফগানিস্তানের আসাদাবাদে। হজরত আলী (রা.)-এর পুত্র ইমাম হুসেনের বংশধর। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মক্কায় হজ করতে যান এবং সেখান থেকে ফিরে আফগানিস্তানে আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। আমিরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে গৃহবিবাদ দেখা দিলে তিনি রাজপুত্রদের একজন আজমের পক্ষ নেন ও তাঁর মন্ত্রী হন। আজম পরাজিত হলে তিনি ব্রিটিশ ভারতে চলে আসেন। একপর্যায়ে ইংরেজ সরকার তাঁকে দেশত্যাগে বাধ্য করে। এরপর তিনি মিসরের কায়রোতে যান এবং সেখানে তাঁর বক্তৃতা তরুণদের তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে। ১৮৭০ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে গেলে সেখানেও তিনি বিপুলভাবে সমাদৃত হন। কিন্তু আলেমদের একাংশ তাঁর বিরোধিতা করতে থাকলে তিনি তুরস্ক ছেড়ে আবার মিসরে চলে আসেন। ইংরেজদের চক্রান্তের ফলে ১৮৭৯ সালে তিনি মিসর পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরে তিনি ভারতের হায়দরাবাদ ও কলকাতায় আসেন। ডারউইনের বিবর্তনবাদকে আক্রমণ করে তিনি প্রচার করেন যে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং সুগভীর ধর্মীয় মনোভাবই মানবসমাজের কল্যাণের স্থায়ী ও বাস্তব পথ। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লন্ডন ও প্যারিস গমন করেন। সেখানকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইসলামের বৈজ্ঞানিকতা ও পুনর্জাগরণবাদ বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া মুসলিম দেশগুলোর ওপর ব্রিটিশ শক্তির শাসননীতির বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন গড়ে তোলেন। কায়রোর মোহাম্মদ আবদুহু-র সঙ্গে যুগ্মভাবে তিনি আরবিতে *আলউর-ওয়া আল-উসকা* অর্থাৎ *অবিনশ্বর বন্ধন* নামে ইসলামি আন্তর্জাতিকতা ভিত্তিক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৮৬ সালে ইরানের শাহের আহ্বানে তিনি তেহরান যান এবং সেখানে উচ্চপদে নিযুক্ত হন। কিন্তু সেখানেও তিনি অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ঈর্ষার শিকার হন। ফলে অচিরেই তাঁকে ইরান ত্যাগ করতে হয়। অতঃপর তিনি রাশিয়ায় যান এবং জারের অনুমতি নিয়ে রুশ মুসলমানদের জন্য পবিত্র কোরআন ও অন্যান্য

ইসলামি গ্রন্থ প্রকাশ করতে থাকেন। শাহের আমন্ত্রণে আবার তিনি ইরানে ফিরে যান, কিন্তু কিছুকাল পরই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে শাহ তাঁকে ইরান ত্যাগ করতে বলেন (১৮৯১)। তাঁর শেষ জীবনটা ইস্তাম্বুলে কাটে এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে তাঁকে কাবুল শহরের কাছাকাছি সমাহিত করা হয়। জামালুদ্দিন আফগানি *তাতিমমাত-আল-বায়্যান* নামক আফগানিস্তানের ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন। আরবি ও ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় তাঁর বহু প্রবন্ধ রয়েছে। তাঁর বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য ও পুনর্জাগরণবাদী ভাবধারা একসময় ভারতীয় উপমহাদেশসহ সমগ্র মুসলিম জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাংলা ভাষায়ও ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী নজরুল ইসলামসহ অনেকেই জামালুদ্দিন আফগানির মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

**জামিয়া-ই-মিল্লিয়া-ই-ইসলামিয়া** দিল্লিতে অবস্থিত ভারতের একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে কংগ্রেস ও খিলাফত নেতৃবৃন্দ সরকারি প্রভাবমুক্ত এক জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে গোলাম তৈরির কারখানা হিসেবে অভিহিত করে তাঁরা শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান এসব প্রতিষ্ঠান বর্জন করার জন্য। তাঁদের সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশে এ সময় অজস্র জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। নতুন জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকেও সরকারি নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব থেকে মুক্ত করা ছিল নেতৃবৃন্দের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে মওলানা মোহাম্মদ আলী জাওহার আলিগড়ে যান এবং আলিগড় কলেজকে সরকারি কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় তিনি পরে আলিগড়েই জামিয়া-ই-মিল্লিয়া-ই-ইসলামিয়া নামক একটি স্বতন্ত্র ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন। শাইখুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান এর উদ্বোধন করেন (১৯২০)। কয়েক বছর পর প্রতিষ্ঠানটি দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয় (১৯২৫)। হাকিম আজমল খান ও ডক্টর আনসারির সহায়তায় এবং ডক্টর জাকির হুসেনের যোগ্য পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত উন্নতি লাভ করে।

**জারিগান** বাংলা লোকগানের একটি বিশেষ ধারা। 'জারি' কথাটা এসেছে 'জার' শব্দ থেকে, যার অর্থ শোক বা বিলাপ। কারবালার করুণ স্মৃতিকে স্মরণ করে মুসলমানরা মহররম মাসের ১০ তারিখে শোক পালন করেন। সেই সময় কারবালার করুণ কাহিনি নিয়ে যে গান করা হয় আদিতে তাই জারিগান নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে কারবালার কাহিনি ছাড়াও অন্যান্য নানাকিছু জারিগানের বিষয় হয়েছে। জারিগান অনেক সময় জারিনাচের সঙ্গে পরিবেশিত হয়। জারিনাচেরও মৌলিক আবেদন করুণ রস এবং এটি দলবদ্ধ নৃত্য। গ্রামের আট-দশ জন যুবক মিলে এই দল গঠন করেন। দলের প্রধানকে বলা হয় ওস্তাদ এবং অন্যরা দোহার নামে পরিচিত। জারিনাচে শিল্পীরা সাধারণত নিত্যব্যবহার্য পোশাক পরেন এবং হাতে ও মাথায় লাল রুমাল বাঁধেন। কোনো কোনো অঞ্চলের জারিয়ালরা পায়ে নূপুরও পরেন। নাচের সময় ওস্তাদ চটি বাজান। কোনো কোনো অঞ্চলে দোহাররা বাঁশের তৈরি কার্নিও বাজান। এগুলো আসলে তালবাদ্যের কাজ করে। কখনো কখনো হাততালি দিয়েও তাল রক্ষা করা হয়। জারিনাচ বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হয়। মূল গায়েন বা ওস্তাদ বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গান করেন, আর দোহাররা নেচে নেচে ধুয়া গান। গানের ভাবের সঙ্গে নাচের অনেক সময় কোনো সম্পর্ক থাকে না, কেবল গানের ছন্দে হাত-পা নেড়ে ও মাথা দুলিয়ে শোক প্রকাশ করা হয়। যে জারি গান কেবল মহররম উপলক্ষেই গাওয়া হয় তাকে বলা হয় 'মাতম জারি'। মহররমের চাঁদ দেখার রাত থেকে এই জারিগান ও নাচ শুরু হয়। জারির দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান-নাচ করে এবং তার জন্য গৃহস্থরা তাদের টাকাপয়সা ও চিড়ামুড়ি উপহার দেয়। ঝিনাইদহের পাগলা কানাই ছিলেন জারিগানের সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্পী। পরবর্তীকালে আবদুল মালেক দেওয়ান, আবদুল খালেক দেওয়ান, দারোগ আলী বয়াতি প্রমুখ অনেকেই

লোকগানের এই ধারাটিকে এগিয়ে নিয়েছেন।

**জার্মানিক ধর্ম** জার্মানির প্রাচীন ধর্ম। খ্রিষ্টধর্ম প্রবর্তনের আগে জার্মানি ও স্ক্যানডিনেভিয়া অঞ্চলে এই ধর্ম প্রচলিত ছিল। বহু দেব-দেবী-বিশ্বাসভিত্তিক এই ধর্মের প্রধান প্রধান দেব-দেবী ছিলেন ওডেন, টিউ, ফ্রেই ও ফ্রেইয়া এবং ধরিত্রীদেবী। উৎসর্গ, দৈববাণী (oracles), উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি ছিল এই ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ধর্মানুসারীদের মৃত্যু ও পরকালের ধারণা অনেকাংশে গ্রিকদের ধারণার অনুরূপ। এই ধর্মে উন্নত ধরনের পৌরাণিক কাহিনি গড়ে না উঠলেও এর অনুসারীদের মধ্যে কাহিনিকারদের প্রচলন ছিল।

**জাহান্নাম** আরবি 'জাহান্নাম' ও ফারসি 'দোজখ' শব্দ দুটি সমার্থক। বাংলায় এর অর্থ নরক। আসলে হিব্রু Gehinnom শব্দটিরই সামান্য পরিবর্তিত আরবি রূপ হলো 'জাহান্নাম'। এর অর্থ অগ্নিকুণ্ড। দুনিয়ায় যারা তাদের স্রষ্টা বা প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং তাঁর নির্দেশিত পথে চলে না, আখেরাতে বা পরলোকে তারাই জাহান্নামবাসী হবে। সেখানে যন্ত্রণাময় জীবন যাপন করবে। জাহান্নাম বা নরকের ধারণা প্রায় সব ধর্মেই বিদ্যমান। পারলৌকিক শাস্তির ভীতি অতি প্রাচীন অসভ্য জাতিগুলোর মধ্যেও বর্তমান ছিল। পবিত্র কোরআনে জান্নাত বা বেহেশতের যেমন বিশদ বর্ণনা আছে, জাহান্নাম বা দোজখের তেমন নেই। তবে পবিত্র কোরআনের অনেক স্থানেই জাহান্নামের উল্লেখ আছে। তাতে স্থানটিকে অগ্নিময় গহ্বররূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এর ইন্ধন হবে মানুষ। জাহান্নাম তার অধিবাসীদের জন্য খাদ্যরূপে উপস্থিত করবে কণ্টক এবং পানীয় রূপে ফুটন্ত গরম পানি ও পুঁজ। মরণান্তিক কষ্টের পরও সেখানে মৃত্যু হবে না। বিশ্বাসী পাপাচারীদের জন্য জাহান্নাম সংশোধনাগারস্বরূপ হবে, কিন্তু অবিশ্বাসীদের সেখানে চিরকাল অবস্থান করতে হবে। পবিত্র কোরআনে জাহান্নাম বোঝাতে সাতটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তা থেকে অনুমান করা হয় জাহান্নামের সংখ্যা সাত। হাবিয়া তার মধ্যে ভয়ংকরতম।

**জাহিলিয়া** আরবি শব্দ জহল-এর অর্থ মূর্খতা, অজ্ঞতা, বর্বরতা। প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে ইসলাম প্রচারের পূর্বকাল পর্যন্ত সময়কে সাধারণত জাহিলিয়া বলা হয়। মতান্তরে হজরত ঈসা (আ.)-এর পর থেকে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত যে সময়ে কোনো নবী ছিলেন না সেই সময়ের নাম জাহিলিয়া। অতি প্রাচীনকালে হজরত ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর পুত্র হজরত ইসমাইল (আ.) আরব দেশে তওহিদের বাণী প্রচার করেছিলেন, কিন্তু কালক্রমে ইবরাহিম (আ.)-এর প্রচারিত একত্ববাদ ভুলে গিয়ে আরবরা বহু দেব-দেবী ও প্রতিমার পূজা আরম্ভ করে। ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টাও আরব দেশে ফলবতী হয়নি। আরবের মানুষ যে এ সময় পৌত্তলিকতা, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, ব্যভিচার, জুয়াখেলা, মদ্যপান, কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দান, রক্তের প্রতিশোধ, লুটতরাজ ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি অনাচারের লীলাভূমি হয়ে উঠেছিল, ইতিহাস ও কাব্য-কাহিনিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন আরবি কবিতা, প্রবাদ, কিংবদন্তি ও বীরগাথায় দেখা যায়, তখনকার কবিরা মদ্যপানের গৌরব, অশ্ব ও উষ্ট্রের বর্ণনা, প্রেমিকার বিয়োগব্যথা, মৃতের জন্য শোক, নিজ গোত্রের প্রশংসা ও শত্রুদলের নিন্দাবাদ প্রচার করতেন। উকাজ নামক প্রসিদ্ধ মেলায় কখনো কখনো কবিতার প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হতো। জাহিলিয়া যুগে আরব দেশে কাব্যচর্চার চরম বিকাশ ঘটে। সাব'আ মু'আল্লাকাত (কবিতা-সপ্তক) বা মুজাহহাবাত (সোনালি কাব্য) এই যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক অবদান। ইবরাহিম (আ.)-এর শিক্ষাগুলোর মধ্যে হজপালন, অতিথিপরায়ণতা, সাহসিকতা, বিপন্নের সহায়তা ও অঙ্গীকার পালনের রীতি জাহিলিয়া যুগ পেরিয়ে ইসলামি আমলেও প্রচলিত থাকে।

**জামে মসজিদ** যে মসজিদের বেশিসংখ্যক মুসলমান একত্রে নামাজ পড়েন। শহরের কেন্দ্রস্থলে সাধারণত এ ধরনের মসজিদ নির্মাণ করা হয়। শুক্রবার দিন জুমার নামাজের জন্য দূরদূরান্ত থেকে মুসলমানরা এতে সমবেত হয়। দুই ঈদের সময়ও উপযুক্ত ময়দানের অভাবে কিংবা আবহাওয়াজনিত

বা অন্য কোনো কারণে খোলা মাঠে নামাজের অসুবিধা হলে জামে মসজিদেই ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। উপমহাদেশের কয়েকটি বিখ্যাত জামে মসজিদ হলো ভারতে দিল্লির জামে মসজিদ, লহোরের শাহি জামে মসজিদ, ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রভৃতি।

**জিউস** দেবরাজ। জিউস শব্দের অর্থ আকাশ। আকাশের দেবতা অর্থে তাঁকে জিউস বলা হয়। তবে তিনি শুধু আকাশেরই দেবতা নন; স্বর্গ-মর্ত ও বায়ুমণ্ডলেরও একচ্ছত্র অধীশ্বর। প্রাচীন গ্রিকদের তিনি প্রধান দেবতা। কুঞ্চিত কেশ ও শ্মশ্রুমণ্ডিত জিউসের মাথায় ওক পাতার মুকুট শোভা পায়। তাঁর বাহন ইগল। আবহাওয়ার দেবতা হিসেবে তিনি বজ্র, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টির দ্বারা পৃথিবীর উর্বরতা সংরক্ষণ করেন। তিনি শক্তি ও শৃঙ্খলার প্রতীক এবং নৈতিক বিধানের সংরক্ষক। হস্তধৃত বজ্রদণ্ডের সাহায্যে তিনি মর্তের মানুষের অধর্ম্যাচরণের শাস্তি বিধান করেন। আল্পস পর্বতশৃঙ্গ থেকে তিনি তাঁর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ক্রনাস ও রিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র জিউস তাঁর আপন বোন হেরাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। তবে হেরা ছাড়াও আরও বহু দেবী, মানবী ও পরির গর্ভে তাঁর সন্তান জন্মে। রোমান পুরাণে জিউসই জুপিটার নামে পরিচিত।

**জিকর** আল্লাহর নাম উচ্চারণ বা জপ করা। অন্তরে শুধু এক আল্লাহর চিন্তা আর মুখে তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণই হলো জিকর। হজরত মোহাম্মদ (সা.) সর্বক্ষণ আল্লাহর জিকর করতেন। ইসলামে এটাই জিকর প্রথার ভিত্তি। সুফিদের মতে, জিকরই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের একমাত্র পথ। জিকর দ্বারা বুকের বাঁ দিকে অবস্থিত কালব বা অন্তরে আঘাত করা হয়। বিশ্বাস করা হয়, এটাই মানব অন্তরকে ধীরে ধীরে পবিত্র করে তোলে। সর্বদা 'আল্লাহ' শব্দেই জিকর হয় না, অনেক সময় আল্লাহর গুণবাচক অন্য নাম এবং কলেমা তৈয়ব 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' বলেও জিকর করা হয়।

**জিগুরাট** প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার মন্দিরের চূড়ার অংশ। জিগুরাট একটি প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে। এর উচ্চতা ৭০ ফুট এবং ভিত্তি ভূমি ১৫০-২০০ ফুট হয়ে থাকে।

**জিজিয়া** শব্দগত অর্থ সামরিক কর্তব্য থেকে অব্যাহতিজনিত কর। খিলাফতের আমলে এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যে স্বীকৃত অমুসলিম একেশ্বরবাদীদের (জিম্মি) ওপর এই কর ধার্য করা হতো। মূলত আরবের কতিপয় খ্রিষ্টান ও ইহুদি গোত্র মহানবীকে এই কর প্রদান করত। প্রাথমিক যুগের খলিফাদের আমলে বিজিত এলাকাগুলোর সব জিম্মি সম্প্রদায়কে এই শর্তে জিজিয়া প্রদান করতে হতো যে, তার বিনিময়ে রাষ্ট্র তাদের সব ধরনের নিরাপত্তা দেবে। অষ্টম শতকের শেষ ভাগে শাসনতান্ত্রিক ও আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জিজিয়ার সংজ্ঞা ও প্রকৃতিতেও কিছু পরিবর্তন ঘটে। এ পর্যায়ে জিজিয়া বলতে সুনির্দিষ্টভাবে ভূমি-রাজস্ব খারাজ হতে সম্পূর্ণ আলাদা 'মাথাপিছু কর' বোঝাত এবং করদাতাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী এর হার নির্ধারিত হতো। মহিলা, শিশু, যাজক বা সন্ন্যাসী এবং দৈহিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু ব্যক্তিরা এই কর থেকে অব্যাহতি পেত। উসমানীয় তুরস্কে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জিজিয়া বলবৎ ছিল। মধ্যযুগে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিমশাসিত দেশেও অমুসলমানদের ওপর জিজিয়া কর ধার্য করা হয়। মুসলমানদের বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বিভাগে যোগদান করতে হতো বলে তার পরিবর্তে অমুসলমানদের ওপর এই কর ধার্য করা হতো। সব ধর্মের নাগরিকদের সামরিক বাহিনীতে যোগদান করা বাধ্যতামূলক হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই এই করেরও বিলুপ্তি ঘটে। ভারতে সম্রাট আকবর এই কর রহিত করেন, কিন্তু আওরঙ্গজেবের আমলে তা পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

পবিত্র কোরআনের সুরা তওবা-র ২৯ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যাদের ওপর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহয় বিশ্বাস করে না ও পরকালেও না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করেছেন তা যারা হারাম করে না ও সত্যধর্ম অনুসরণ করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা বশ্যতা স্বীকার করে আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ স্বেচ্ছায় জিজিয়া দেয়।'

**জিন** মূল আরবি শব্দ 'জিন্ন' থেকে জিন কথাটি এসেছে। ইসলামি ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী জিন হলো অগ্নিদেহী, বুদ্ধিমান অদৃশ্য জীব। আল্লাহর আদেশ পালনের জন্যই তাদের সৃষ্টি। তারা প্রয়োজনে নানা আকার ধারণ করতে পারে। পবিত্র কোরআনের অনেক সুরায় জিনের উল্লেখ আছে। যেমন সুরা জারিয়াত-এর ৫৬ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'আমার সেবার জন্যই আমি মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করেছি।' সুরা হিজর-এর ২৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'খুব গরম বাতাসের ভাপ থেকে আমি জিন সৃষ্টি করেছি।' আর সুরা রহমানের ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনি জিনকে সৃষ্টি করছেন ধূমহীন অগ্নিশিখা থেকে।' প্রাক-ইসলাম আরবেও জিন সম্পর্কে এক রকম ধারণা প্রচলিত ছিল। তবে তা পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত জিন থেকে আলাদা। ইসলামের আবির্ভাবের আগে আরবের মানুষ জিন বলতে বুঝত মরুবাসী পরি বা বনদেবতাকে। তাদের মানুষের শত্রু গণ্য করা হতো। কিন্তু পবিত্র কোরআনের জিন সে রকম অপদেবতাবিশেষ নয়। তারা মানুষের মতোই আল্লাহর সৃষ্ট এক ধরনের জীব এবং তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ উভয়ই আছে। মানুষ ও জিন উভয়েরই হেদায়তের জন্য আল্লাহ কিতাব ও নবীদের পাঠিয়েছেন। আর মন্দ কাজের জন্য মানুষের মতোই তাদের শাস্তি পেতে হবে। পবিত্র কোরআনের সুরা আননাম-এর ১৩০ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি বলব, হে জিন ও মানুষ সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য থেকে কি রাসুলরা তোমাদের কাছে আসেনি যারা আমার নিদর্শন তোমাদের কাছে বয়ান করত এবং তোমাদের এদিনের মোকাবিলা করার জন্য সতর্ক করত?' সুরা হুদ-এর ১১৯ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।'

**জিনদিক** অবিশ্বাসী অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুসলমানরা ইরান জয়ের পর জরথুস্ত্রীয় বা পারসি ধর্মগ্রন্থ জেনদ আবেসতার অনুসারীদের তুচ্ছার্থে জিনদিক বলে অভিহিত করত। ইরানিদের মধ্যে যারা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও গোপনে তাদের পৈতৃক ধর্ম অনুসরণ করত তাদেরও জিনদিক বলা হতো।

**জিনা** বা **জেনা** স্ত্রী ও পুরুষের অবৈধ মিলন বা ব্যভিচার। ইসলামে ব্যভিচার জঘন্য অপরাধ বলে বিবেচিত।

**জিবরাইল** প্রধান চার ফেরেশতার অন্যতম। ফেরেশতাদের মধ্যে মর্যাদায় তিনিই শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীতে নবীদের কাছে তিনিই সব সময় আল্লাহর বাণী বয়ে এনেছেন। সুরা বাকারা-র ৯৭-৯৮ আয়াতে বলা হয়েছে: 'বলো, যে জিবরাইলের শত্রু সে জেনে রাখুক সে তো আল্লাহর নির্দেশে তোমার হৃদয়ে এ পৌঁছে দেয় যা এর পূর্ববর্তী (কিতাবের) সমর্থক আর বিশ্বাসীদের জন্য যা পথপ্রদর্শক ও শুভসংবাদ।' এবং 'যারা আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, রাসুলের, জিবরাইল ও মিকাইলের শত্রু, (তারা জেনে রাখুক) নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের শত্রু।' হাদিসে উল্লেখ আছে যে কোনো কোনো সময় জিবরাইল (আ.) মানুষের বেশেও রাসুল (সা.)-এর দরবারে হাজির হতেন।

**জিম্মা** ও **জিম্মি** দায়িত্ব। ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের সম্পর্কে ব্যবহৃত পরিভাষা। ইসলামি রাষ্ট্র তার যেসব অমুসলিম নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদের 'জিম্মি' বলা হয়। আর জিম্মিদের এই দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টিই হলো জিম্মা। জিম্মিদের সম্পর্কে রাসুল (সা.) বলেছেন, তাদের শত্রুদের প্রতিরোধ করতে হবে। ধর্ম পরিবর্তনের জন্য তাদের ওপর জবরদস্তি করা যাবে না, তাদের জানমাল সুরক্ষিত থাকবে। হজরত ওমর (রা.)-এর আমলে কুফায় মসজিদ নির্মাণের জন্য জনৈক জিম্মির জমির কিয়দংশ প্রয়োজন হলে ন্যায্যমূল্য পরিশোধ করে তার কাছ থেকে তা নেওয়া হয়।

**জিয়ারত** ইসলামি পরিভাষায় জিয়ারত বলতে সাধারণত কোনো পবিত্র স্থান পরিদর্শনকে বোঝায়। কোনো সুফি-সাধকের মাজার কিংবা মহানবী (সা.)-এর রওজায় গিয়ে ফাতিহা পাঠ করা এর অন্তর্ভুক্ত। প্রায় মাজারেই বছরের নির্দিষ্ট সময়ে যে ওরস অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বহু নারী-পুরুষ সমবেত হয় এবং কেউ কেউ ফাতিহা পাঠের অতিরিক্ত ভক্তিস্বরূপ বুজুর্গের কবরকে সিজদাও করে, যা ইসলামি শরিয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

**জিহার** ইসলামি ফিকাহ শাস্ত্রের একটি নীতি। স্বামী যদি তাঁর মা বা বোনের কোনো অঙ্গের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর কোনো অঙ্গের তুলনা করে (যেমন বলে যে, 'তোমার পিঠ আমার মায়ের পিঠের মতো') তবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায় কাফফারা আদায়ের আগে স্বামী-স্ত্রীর মিলন অবৈধ। জিহারের কাফফারা হলো একটি দাস মুক্ত করা বা একাধারে ৬০ দিন রোজা রাখা।

**জুকেট্টো** মাথায় আঁটো করে বসানো একধরনের টুপি। রোমান ক্যাথলিক যাজকরা যা পরে থাকেন। যাজকতন্ত্রে পদমর্যাদা অনুসারে এই টুপির রং নির্দিষ্ট করা থাকে। যেমন পোপের টুপির রং সাদা, কার্ডিনালদের লাল, বিশপদের রক্তবর্ণ বা নীল-বেগুনি এবং সাধারণ পুরোহিতদের কালো।

**জুডা** বাইবেলোক্ত জেকব বা ইয়াকুব নবীর পুত্র, ইসরাইলের ১২টি গোত্রের একটির পূর্বপুরুষ। মিসরে জোসেফ বা ইউসুফের কাছে তিনি তাঁর ভাইদের পক্ষে মুখপাত্রের কাজ করেন। জুডার বংশধরেরা দক্ষিণ প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করেন। জুডা বংশের নাম থেকেই ডেভিড বা দাউদ নবী ও তা থেকে উদ্ভূত রাজবংশের উৎপত্তি।

**জুডিয়া** দক্ষিণ প্যালেস্টাইনের গ্রিকো-রোমান নাম। বিভিন্ন যুগে এর আয়তন বিভিন্ন রকম ছিল। যিশুখ্রিষ্টের সময় এটা একাধারে সিরিয়া প্রদেশের অংশ এবং হেরড বংশের রাজাদের শাসিত রাজ্য ছিল। প্যালেস্টাইনের রোমক বিভাগগুলোর মধ্যে এটির অবস্থান ছিল একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে। অপর বিভাগগুলোর নাম ছিল গ্যালিলি, স্যামারিয়া ও পেরিয়া। জুডিয়ার দক্ষিণে ছিল ইডুমিয়া। জুডিয়া ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে ছিল স্যামারিয়ার একটা সংকীর্ণ অংশ।

**জুনো** রোমক ধর্মে দেবতাদের রানি। একই সঙ্গে তিনি জুপিটারের ভগ্নি ও পত্নী। তাঁর বাহন রাজহংসী। গ্রিক দেবী হেরার মতো জুনোও স্ত্রীজাতির রক্ষক। রোমান নারীদের বিয়ে, সন্তান জন্মদান ইত্যাদি সব ব্যাপারেই জুনোর আশীর্বাদ দরকার হতো। দেবী জুনোর নামেই জুন মাসের নামকরণ করা হয়েছে। আর রোমানদের কাছে এই মাসটি বিয়ের জন্য সর্বোত্তম মাস হিসেবে গণ্য হতো।

**জুপিটার** রোমক ধর্মের শ্রেষ্ঠ দেবতা, অন্য নাম জোভ। তিনি স্যাটার্ন ও অপস-এর পুত্র। দেবী জুনোর ভাই ও স্বামী। গ্রিক দেবতা জিউস ও জুপিটার একই।

**জুবিলি** দাসদের মুক্তি ও ঋণ মওকুফ করার বছরকে বাইবেলে জুবিলি বর্ষ নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রতি ৫০ বছর অন্তর একবার জুবিলি বর্ষ পালন করা হতো। তারই অনুসরণে বর্তমানে ৫০ বছর পূর্তিতে জুবিলি বা জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ে জুবিলি বর্ষ বলতে যে বছর (সাধারণত ২৫ বছরে একবার) রোমে তীর্থযাত্রার জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দান করা হয় সেই বছরটিকেও বোঝায়।

**জুমায়াতুল বিদা** রমজান মাসের শেষ শুক্রবার। মুসলমানদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র দিন। রমজান মাসের ২৭ তারিখ অর্থাৎ লাইলাতুল কদরে পবিত্র কোরআন প্রথম নাজিল হয়। ওই রাত হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে। আর রমজান মাসের শেষ শুক্রবারে রোজাদাররা জুমার জামাতে সমবেত হয়ে আনুষ্ঠানিভাবে এই পুণ্যময় মাসকে বিদায় জানান। এই দিনের জুমার খুতবায় পবিত্র মাসের ফজিলত অর্থাৎ মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়। এই দিনটি বাংলাদেশে সরকারি ছুটির তালিকাভুক্ত।

**জুলফিকার** মহানবী (সা.)-এর বিখ্যাত তরবারি। বদরের যুদ্ধে নিহত আল আসের এই তরবারিটি যুদ্ধের পর মহানবী (সা.)-এর হস্তগত হয়। খন্দকের যুদ্ধে আরবের বিখ্যাত বীর আমর ইবনে আবদুদ যখন মুসলমানদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে আছে কি কোনো বীর যে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও?' জবাবে হজরত আলী (রা.) দাঁড়ালে মহানবী (সা.) তাঁর ঐতিহাসিক জুলফিকার আলী (রা.)-কে দান করেন। মহানবী (সা.)-এর বিশেষ দান হিসেবে হজরত আলী (রা.) তরবারিটি যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করেন এবং পরবর্তী সময়ে সব যুদ্ধে তা নিজের সঙ্গে রাখতেন।

**জুলিয়াস পঞ্জিকা** খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬ অব্দে জুলিয়াস সিজার কর্তৃক প্রবর্তিত পঞ্জিকা, যা পরবর্তীকালে বর্তমানে প্রচলিত গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকায় রূপান্তরিত হয়।

**জেকব** বাইবেল অনুযায়ী ১. আইজাকের পুত্র, ইস-এর ভ্রাতা। ইসরাইল নামে তিনি ইহুদি হিব্রু জাতির পূর্বপুরুষ। জেকব শব্দের অর্থ কাউকে স্থানচ্যুত করে তার স্থান দখলকারী। জেকবের জীবন ছিল দারুণ নৈরাশ্যে পূর্ণ। রেচেলকে পাওয়ার জন্য বহু বছরের সাধনার পর তিনি আবিষ্কার করেন যে রেচেলের বড় বোন লিয়া তাঁর প্রথমা পত্নী। তাঁর বড় ছেলেদের আচরণ তাঁর জন্য বড় কষ্টের ছিল। তিনি বহু ধর্মীয় প্রত্যাদেশ পান। মুসলমানদের কাছে তিনি হজরত ইয়াকুব (আ.) নামে পরিচিত। ২. সেন্ট জোসেফের পিতার নামও ছিল জেকব।

**জেন** জাপানি শব্দটির অর্থ ধ্যান। জাপানি ভাষায় 'জেন' সংস্কৃত 'ধ্যান' শব্দের পরিবর্তিত রূপ। চীনা শব্দ চান বা চান্ন, যা সংস্কৃত ধ্যান শব্দ থেকে উদ্ভূত, জাপানি উচ্চারণে জেন-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

**জেন-বৌদ্ধধর্ম** জাপানে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের অন্যতম শাখা। জেন অনুসারে পরম সত্য, কথা বা শব্দের চেয়েও মহৎ। জেন অনুসারীরা বিশেষ ধরনের ধ্যান অভ্যাস করেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে জাপানে এটি জেন নাম গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে চান ধর্ম নামে এটি চীনে প্রচলিত হয়।

**জেনি** বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বের একটি বিশেষ জাপানি ধারা। এই ধারায় ধর্মগ্রন্থ পাঠ তথা ধর্মতত্ত্বচর্চায় সময় ব্যয় না করে ধ্যানের মধ্য দিয়া মনকে অন্য চিন্তামুক্ত করা ও একটিমাত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ মনঃসংযোগের ওপর জোর দেওয়া হয়।

**জেন্ডার জিহাদ** ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা একটি সাম্প্রতিক আন্দোলন। জেন্ডার জিহাদিদের মতে, ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের সময় নারীদের যে অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে মানুষের সৃষ্ট আইন এবং উপজাতীয় ঐতিহ্য দ্বারা লঙ্ঘিত হয়। ইসলামি চিন্তার মূল নীতিকে পরবর্তীকালে শরিয়ার মাধ্যমে রক্ষণশীল পুরুষেরা যেভাবে বিকৃত করেছে, জেন্ডার জিহাদিরা তাকে চ্যালেঞ্জ করেন। অনেকের ধারণা, ইসলাম ধর্ম নারী অবদমনে বিশ্বাসী। তাঁরা ধরে নেন, এই ধর্মের আওতায় নারীর অবস্থার উন্নতি বা তাদের সমানাধিকার অর্জন আদৌ সম্ভব নয়। তাঁদের মতে, নারীমুক্তি শুধু পশ্চিমায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। জেন্ডার জিহাদিরা এই অবস্থানের বিরোধিতা করেন। তাঁরা মনে করেন, পশ্চিমা নারীবাদ মুসলিম-সমাজের ঐতিহ্যকে আক্রমণ করে, সেহেতু তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের মতে, ইসলামের পরিকাঠামোর ভেতরেই নারীমুক্তি সম্ভব। এই আন্দোলনের দৃষ্টিতে, ইসলামের আইনি ঐতিহ্যের পরবর্তীকালে অবক্ষয় ঘটেছে, শাস্ত্রীয় বিধিবিধানেরও বিকৃতি ঘটেছে। এ কারণে বহু মুসলিম বা ইসলামি দেশে পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামো ও নারী অবদমনমূলক আইনি ব্যবস্থা একটি জবরদস্ত চেহারা নিয়ে বিদ্যমান।

**জেরিমাইয়া বা জেরিমাইয়াস** বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের একটি পুস্তক। বাংলা বাইবেলের জিরমীয়। এই পুস্তকে অন্যতম প্রধান প্রেরিত পুরুষ জেরিমাইয়ার (আনু. খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০) কাহিনি বিবৃত হয়েছে। তিনি জেরুজালেমে ধর্ম প্রচার করেন। জুডা রাজ্যের অনুসৃত বৈদেশিক নীতি পরিণামে দেশের ধ্বংস ডেকে আনবে, এটা বুঝতে পেরে তিনি জুডার অধিবাসীদের ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা না করে দেশের অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাপারে মনোযোগী হতে বলেন। এই উপদেশ দেওয়ার জন্য তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে জেরুজালেমের পতনের পর তিনি মুক্তি পান।

**জেরুজালেম** ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলমান—এই তিন ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র শহর। রাজা দাউদ জেবুসাইটদের কাছ থেকে অধিকার করে এটিকে তাঁর রাজধানী বানান। ৬৩৭ সালে জেরুজালেম মুসলমানদের অধিকারে আসে। ১০৯৯ সালে খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা শহরটি দখল করে। ১১৮৭ সালে সুলতান সালাউদ্দিন ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা শহরটি দখল করে। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর বর্তমানে শহরটির কর্তৃত্ব নিয়ে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে বিরোধ চলছে। শহরের প্রাচীরের মধ্যে চারটি মহল রয়েছে। পূর্ব দিকে অবস্থিত বায়তুল মুকাদ্দাস ও মসজিদুল আকসা। খ্রিষ্টান মহলে রয়েছে যিশুখ্রিষ্টের সমাধি।

**জেরোম, সেন্ট** খ্রিষ্টান পণ্ডিত ও ধর্মশাস্ত্রবিদ। খ্রিষ্টধর্ম সাহিত্যের অন্যতম প্রামাণিক লেখক। জন্ম আনু. ৩৪৭ ও মৃত্যু ৪১৯ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি পৌত্তলিকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রভূত পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ৩৭৫ সালে তিনি জ্ঞানচর্চা থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে এক নির্জন মরুভূমিতে গিয়ে কিছুকাল ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে যাজক পদে বৃত হওয়ার পর তিনি কনস্ট্যানটিনোপলে সেন্ট গ্রেগরি নাজিয়ানজেনের কাছে শাস্ত্রাধ্যায়ন করেন। রোমে তিনি প্রথম পোপ ড্যামাসাসের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। পোপের অনুরোধক্রমে তিনি বাইবেলের একখানি নতুন সংস্করণ সংকলন তৈরিতে হাত দেন। ৩৮৬ সাল থেকে মৃত্যুকাল অবধি তিনি বেথেলহেমের সন্ন্যাসীদের একটি মঠে বসবাস করেন।

**জেলাট** পৌত্তলিকতাবিরোধী ইহুদিদের একটি দল। আনু. খ্রিষ্টপূর্ব ৩৭ থেকে ৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল এদের তৎপরতার কাল। ৭০ খ্রিষ্টাব্দে একটি বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর এদের নাম ইতিহাস থেকে মুছে যায়। একই বিদ্রোহে জেরুজালেম নগরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

**জেহাদ/জিহাদ** আরবি জেহাদ শব্দটির দ্বারা কঠোর পরিশ্রম, চেষ্টা, সাধনা, সংগ্রাম ইত্যাদি বোঝায়। যদিও বর্তমানে শব্দটি সাধারণভাবে ধর্মযুদ্ধ এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে জেহাদ কথাটির উৎপত্তির সঙ্গে অস্ত্রযুদ্ধের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়। মক্কায় হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রচারজীবনে অবতীর্ণ আয়াতে যে জেহাদের নির্দেশ রয়েছে, তা কিন্তু অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। আর তখন মুসলমান-সমাজও অস্ত্রধারণ করার মতো শক্তি সঞ্চয় করেনি। বস্তুত 'আত্মার মঙ্গলের জন্য পরিশ্রম' বা সৎকাজ করার অর্থেই তখন জেহাদ কথাটি ব্যবহৃত হয়। মানুষের ভেতরের পশুপ্রবৃত্তি তাকে ধর্ম পালন ও সৎকাজ করতে বাধা দেয়। ফলে মানুষকে সেসব কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। জেহাদ শব্দটির মূলগত তাৎপর্য এটিই। পবিত্র কোরআনের আল-ই-ইমরান-এর ১৪২ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা কি মনে করো যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে ও কে ধৈর্য ধরেছে!' সুরা আনকাবুত-এর ৬৯ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা আমার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে আমি তাদের অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন।' এ কথাগুলোর মধ্য দিয়ে জেহাদের মূলগত তাৎপর্যই প্রকাশ পেয়েছে।

জেহাদ দুই প্রকার: বড় জেহাদ এবং ছোট জেহাদ। বড় জেহাদ বা 'জেহাদে আকবার' হচ্ছে কুপ্রবৃত্তি বা মনের কুপ্ররোচনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ হচ্ছে এই প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ। এ যুদ্ধে অস্ত্রের ব্যবহার নেই। আত্মার কুপ্ররোচনা সব সময় মানুষকে ভুল পথে চালিত করে। শয়তানের প্ররোচনা বা এই কুপ্রবৃত্তিকে দমন করাই হচ্ছে জেহাদে আকবার বা বড় জেহাদের কাজ। আর ইসলাম ধর্মের প্রকাশ্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধকে বলা হয় 'জেহাদে আসগর'। এটা হলো ছোট জেহাদ। অত্যাচারের মুখে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যধারণ অর্থেও জেহাদ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। হজরত মোহাম্মদ (সা.) বলেছেন, অত্যাচারী শাসকের মুখের ওপর সত্য বা হক কথা বলাই হচ্ছে কঠিনতম জেহাদ। তিনি এক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বলেছিলেন, 'আমরা ছোট জেহাদ (অস্ত্রের যুদ্ধ) থেকে বড় জেহাদে (জেহাদে আকবার বা প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধে) ফিরে এসেছি।'

যাঁরা জেহাদ করেন তাঁদের মুজাহিদ বলে। যাঁরা জেহাদে জয় লাভ করেন তাঁরা গাজি এবং যাঁরা জেহাদে মারা যান, তাঁরা হন শহীদ। জেহাদে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে প্রচুর প্রশংসা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যাঁরা জেহাদে শহীদ হন, তাঁরা মৃত নন, তাঁরা জীবিত, জান্নাতের দরজা তাঁদের জন্য খোলা। মোট কথা, সমাজে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং অত্যাচারীর হাত থেকে অত্যাচারিতকে মুক্ত করার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ হয়ে যুদ্ধ করাকে জেহাদ বলে। জেহাদ ইসলামি কর্মসৌধের অন্যতম প্রধান ভিত্তি ।

**জৈগুনের পুঁথি** সৈয়দ হামজা রচিত পুঁথি। সৈয়দ হামজা ছিলেন হুগলি জেলার উদনা গ্রামের

অধিবাসী। তিনি ১৭৯৭ সালে কাব্যটি রচনা করেন। জৈগুনের যুদ্ধ ও পরিণয় এই কাব্যের বিষয়বস্তু। কাব্যটি শাহ বিরিদ খানের হানিফার দিগ্বিজয় এবং মোহাম্মদ খানের হানিফার লড়াই কাব্যের ধারায় রচিত। এই কাব্যে এরেম রাজ্যের বাদশাহজাদি জৈগুন বীর্যবতী রমণীরূপে চিত্রিত। তাঁর সঙ্গে দ্বৈতযুদ্ধে হানিফা প্রথমে পরাজিত হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরই জয় হয় এবং জৈগুন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে উভয়ের মধ্যে বাগ্‌দান সম্পন্ন হয়। অতঃপর জৈগুন ও হানিফা একের পর এক রাজ্য জয় করেন এবং অমুসলমান রাজাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। হানিফা পিতৃরাজ্য আক্রমণ করে পিতা-পিতৃব্যকেও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। হানিফা-জৈগুনের পরিণয়ের মধ্য দিয়ে কাহিনি শেষ হয়।

**জৈনধর্ম** দক্ষিণ এশিয়ায় প্রধান ধর্মগুলোর অন্যতম। বাংলায় জৈনধর্মের উদ্ভব ঘটলেও এ দেশে এর অনুসারীদের কমই দেখতে পাওয়া যায়। ২৪ জন তীর্থঙ্কর এ ধর্মের মতবাদ প্রচার করেন। ২৩তম প্রচারক পার্শ্বনাথ ও ২৪তম মহাবীর ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। পার্শ্বনাথের আবির্ভাব ঘটে প্রায় ২৫০ বছর আগে। আর মহাবীর (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪০-৪৬৮) ছিলেন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। পার্শ্বনাথের ধর্মোপদেশকে বলা হয় 'চতুর্যাম'। এতে মানবজাতির পরিত্রাণের চারটি উপায়ের কথা বলা হয়েছে, যথা : সর্বজীবে দয়া, মিথ্যাকথন থেকে বিরত থাকা, চৌর্যবৃত্তিতে অংশ না নেওয়া এবং পার্থিব সম্পদ থেকে দূরে থাকা। মহাবীর তার সঙ্গে আরও একটি উপায় সংযোজন করেন। সেটি হলো কোনো পোশাক পরিধান না করা। পার্শ্বনাথের অনুসারীদের 'শ্বেতাম্বর' অর্থাৎ সাদা বস্ত্র পরিহিত আর মহাবীরের অনুসারীদের 'দিগম্বর' বলা হয়। দিগম্বরের আক্ষরিক অর্থ নগ্ন। আকাশই আচ্ছাদন এই অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হয়।

মহাবীর তাঁর মতবাদ প্রচারের জন্য রাঢ়ে অর্থাৎ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশে এসেছিলেন। ধারণা করা হয়, ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২২ জন পরেশনাথ পার্বত্য অঞ্চলে ধ্যানসাধনার মাধ্যমে তাঁদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা অর্জন করেন। 'বোধিসত্ত্বভবদানকল্পলতা'র ভাষ্যমতে, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে (উত্তরবঙ্গ) জৈনধর্ম অনুসৃত হতো। পুণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসী ভদ্রবাহু ছিলেন জৈন মন্দিরের প্রধান। তিনি 'কল্পসূত্র' নামে বেশ কিছু জৈন অনুশাসনের একটি সংকলন প্রকাশ করেন। তারপর গোডাস নামে তাঁর এক শিষ্য পুণ্ড্রবর্ধনের জৈন মন্দিরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর অনুসারীদের বলা হয় গোডাসগণ। পরবর্তী পর্যায়ে গোডাসগণ সম্প্রদায় 'তাম্রলিপ্তিকীয়', 'কোটিবর্ষীয়', পুণ্ড্রবর্ধনিয়া' ও 'ধসিখরবতিকা' নামে আরও চারটি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র বাংলায় জৈন মতবাদ প্রবল ছিল। ১৮৭৯ সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম মহাস্থানগড়ে একটি জৈন মূর্তি আবিষ্কার করেন। মূর্তিটি ১৯১২ সালে রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে স্থানান্তরিত করা হয়। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত গুপ্ত তাম্রশাসনে (আনু. পঞ্চম শতক) বাতাগোহালি গ্রামে একটি জৈন আশ্রমের উল্লেখ আছে। এখানে ১৯৮০-৮১ সালে খননকালে অষ্টম-নবম শতাব্দীর আগেকার নির্মাণকাঠামোর নিদর্শন পাওয়া গেছে। বাংলার জৈনরা ছিল 'দিগম্বর' মতাদর্শের অনুসারী।

**জৈনুদ্দিন** মধ্যযুগের (পঞ্চদশ শতক) কবি। *রসুলবিজয়* তাঁর বিখ্যাত কাব্য। তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গৌড়ের যুবরাজ ইউসুফ খান, যিনি পরে শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-৮২) নামে গৌড়ের সুলতান হন। *রসুলবিজয়* যুদ্ধবিষয়ক একটি কাহিনিকাব্য। এতে হজরত মোহাম্মদ (সা.) ও ইরাকাধিপতি জয়কুমের মধ্যেকার দীর্ঘ যুদ্ধের বর্ণনা আছে। যুদ্ধে ইসলামের বিজয় দেখানো হয়েছে। কাব্যের উপাদান ফারসি সাহিত্য থেকে নেওয়া হলেও কবি কোন কাব্য অনুসরণ করেছেন তা জানা যায় না।

**জৈমিনি** হিন্দু ঋষি ও দার্শনিক। পুরাণমতে তিনি বজ্রধারকদের অন্যতম। মহর্ষি ব্যাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি তাঁর কাছে সাম ও যজুর্বেদ শিক্ষা করেন। *জৈমিনিভারত* নামে বিখ্যাত সংহিতারও তিনি রচয়িতা। বেদশাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে এটি একটি অপরিহার্য গ্রন্থ। তিনি পূর্বমীমাংসা ষড়্‌দর্শনেরও অন্যতম প্রবক্তা। *জৈমিনিভারত* বা *সংহিতার* অশ্বমেধপর্ব ও দণ্ডীপর্ব অবলম্বনে প্রাচীন

বাংলা লেখকদের কেউ কেউ মহাভারতের অংশবিশেষ লেখেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী এবং বাংলার পরবর্তী মহাভারতের লেখক বা অনুবাদকেরা প্রায় সকলেই *জৈমিনিভারত* অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরা মহাভারতের আদিকবি ব্যাসের কাব্য অনুসরণ করতে চাননি। জৈমিনি হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনকারীদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন।

**জোনস, স্যার উইলিয়াম** বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ। জন্ম ২৮ সেপ্টেম্বর ১৭৪৬, মৃত্যু ২৭ এপ্রিল ৯৫ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ১৭৮৩-তে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ভারতে আসার পর থেকে আমৃত্যু তিনি প্রাচ্য সাহিত্য অধ্যয়ন ও চর্চায় জীবন কাটান। ১৭৮৪ সালে কিছুসংখ্যক উৎসাহী বিদ্যানুরাগীকে নিয়ে তিনি এশিয়ার পুরাতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এ সমিতি থেকে এ পর্যন্ত বহু মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উইলিয়াম জোনস তাঁর অবদানের জন্য নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। হিন্দু-মুসলিম আইনের সারসংক্ষেপ করে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া ১৭৯৪-এ তিনি *মনুসংহিতা* অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে তিনি *শকুন্তলা* ও *হিতোপদেশ*-এরও ভাষান্তর করেছিলেন।

**জোনা** অর্থ প্রেরিত পুরুষ। পবিত্র কোরআনে যিনি ইউনুস নামে উল্লেখিত হয়েছেন। বাইবেলেও তাঁকে প্রেরিত পুরুষ বলে অভিহিত করা হয়েছে। বাইবেলে বলা হয়েছে, তিনি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে জাহাজে করে দেশ ত্যাগ করার সময় সমুদ্রে ভীষণ ঝড় ওঠে। আল্লাহর কাছে নিজের অপরাধ উপলব্ধি করে তিনি জাহাজের আরোহীদের কাছে স্বীকার করেন যে তাঁর উপস্থিতির কারণেই জাহাজটি বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। এ কথা শুনে আরোহীরা তাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করে এবং একটি বিশাল সামুদ্রিক মাছ তাঁকে গিলে ফেলে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার পর তিনি এ বিপদ থেকে রক্ষা পান এবং স্বদেশে ফিরে আল্লাহর বাণী প্রচার করতে থাকেন।

**জোসেফ, সেন্ট** খ্রিষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী কুমারী মেরির স্বামী, পেশায় সূত্রধর। মেরির সংযমী স্বামী এবং যিশুর পালক-পিতা হিসেবে জোসেফকে গোঁড়া মতাবলম্বী (Orthodox) এবং রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরা প্রগাঢ় ভক্তির চোখে দেখে থাকেন। ক্যাথলিকরা তাঁকে নিজেদের ধর্মের পৃষ্ঠপোষক বলে গণ্য করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, তাঁকে স্মরণ করে মরতে পারলে মৃত্যু সুখের হয়। যিশুর মৃত্যুর বহু আগেই জোসেফের মৃত্যু হয়।

**জোহন বা জন** যিশুর অন্যতম প্রধান শিষ্য। জোহন বা জন লিখিত সুসমাচার নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত। এটি নিবন্ধ আকারে লিখিত যিশুর জীবনী। এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য হলো যিশু যে জীবন্ত শক্তিরূপে পৃথিবীতে বর্তমান আছেন ও ভবিষ্যতে থাকবেন তা দেখানো।

**জ্যোতিশ্চক্র** (Nimbus) দেবতা বা সিদ্ধপুরুষের মস্তকের চারধারের জ্যোতি। বৌদ্ধ ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশীয় চিত্রশিল্পে এটা দেখা যায়। প্রাচীন গ্রিক ও রোমানরাও দেবতা ও বীরপুরুষদের ক্ষেত্রে এ ধরনের জ্যোতিশ্চক্র অঙ্কন করতেন। জ্যোতিশ্চক্র অঙ্কনরীতির সূত্রপাত পঞ্চম শতকে খ্রিষ্টান শিল্পকলার মধ্য দিয়ে। সাধারণত থালা বা চক্রাকারে আঁকা হলেও জ্যোতিশ্চক্রের বিভিন্ন রূপভেদ আছে। যেমন ভগবান (God the father)-এর ক্ষেত্রে তা হয় ত্রিকোণাকার, যিশুখ্রিষ্টের ক্ষেত্রে ক্রুশযুক্ত চক্র, জীবন্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বর্গাকার সিদ্ধপুরুষের ক্ষেত্রে থালার মতো বা চক্রাকার, এবং কুমারী মেরির ক্ষেত্রে কতিপয় ক্ষুদ্রাকৃতি তারকাচিহ্ন। বর্গাকার চিত্র বৈষয়িক জগৎ, বৃত্তাকার চক্র আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, ত্রিকোণাকার চিত্র অনন্ত ও খ্রিষ্টীয় মতে, ঈশ্বরের ত্রিত্বকে (ঈশ্বরের মধ্যে পিতা, পুত্র ও পরমাত্মার মিলন) প্রতীকায়িত করে। মাথার চারদিকে মুকুট বা উজ্জ্বলতার চিত্রের নাম 'অরিওল'; এটা সমগ্র দেহের জন্য ডিম্বাকার পটভূমিও হতে পারে। নিমবাস ও অরিওল উভয়ই কোনো ছবিতে অঙ্কিত হলে তা একত্রে 'গ্লোরি' বা 'মহিমা' নামে পরিচিত হয়। জ্যোতিশ্চক্রের যেকোনো ধরনকে সোজা কথায় ইংরেজিতে 'হেলো' বলা হয়।

**জ্যাকোবাইট ধর্মসম্প্রদায়** খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের একটি শাখা। ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিরিয়া, ইরাক ও ভারতে

এই ধর্মসম্প্রদায়টির প্রসার ঘটে। অ্যানটিয়কের পেট্রিয়ার্ক এই সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মযাজক। সম্প্রদায়ের উপাসনা অনুষ্ঠানাদিতে সিরীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়। সপ্তদশ শতকে ভারতের মালাবারের অধিকাংশ খ্রিষ্টান রোমের পোপের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে নিজেদের 'মালাবান জ্যাকোবাইট' নামে পরিচিত করে।

## ঝ

**ঝুলন** বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি উৎসব। রাধাকৃষ্ণের ঝুলন উৎসব নামেও পরিচিত। এটি প্রায় হোলি বা দোলযাত্রার অনুরূপ। দোল ও ঝুলনের উদ্দেশ্যও প্রায় এক। শ্রাবণ মাসের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচ দিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলে। ঝুলন উৎসবে প্রধানত রাধাকৃষ্ণের প্রতীক বা অন্য কোনো বৈষ্ণব বিগ্রহকে দোলনায় চড়িয়ে দোল দেওয়া হয়। দ্র. **দোলযাত্রা**।

## ট

**টমাস আ বেকেট, সেন্ট** ক্যান্টারবারির আর্চবিশপ। জন্ম ১১১৭ খ্রিষ্টাব্দে এক অভিজাত ইংরেজ পরিবারে। সুশিক্ষিত বলে তিনি সহজেই রাজা দ্বিতীয় হেনরির নজরে পড়েন এবং তাঁর চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন (১১৫৫)। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ১১৬২ সালে তাঁকে আর্চবিশপ নিযুক্ত করা হয়। 'অপরাধী যাজকদের' ওপর রাজার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিয়ে তখন রাজা ও আর্চবিশপের মধ্যে বিরোধ চলছিল। টমাস ক্রমবর্ধমান রাজকীয় ক্ষমতার বিরোধিতা করেন এবং ১১৬৪ সালে দেশ ত্যাগ করেন। ১১৭০ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে হেনরির পুত্রের অভিষেকোৎসব নিয়ে রাজা ও আর্চবিশপের মধ্যে মতান্তর চরমে ওঠে এবং হেনরির সশস্ত্র লোকজনের হাতে টমাস ১৫ ডিসেম্বর ১১৭০ সালে ক্যান্টারবারি ক্যাথিড্রালের মধ্যে নিহত হন। রাজা পরে ক্যান্টারবারিতে সেন্ট টমাসের সমাধিতে অনুতাপ করতে বাধ্য হন। এভাবে সেন্ট টমাস বেকেটের সমাধি ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানে পরিণত হয়।

**টমাস আকুইনাস, সেন্ট** ইতালীয় দার্শনিক, স্বর্গীয় ডাক্তার (Angelic Doctor) বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর জন্ম দক্ষিণ ইতালির শাসক-পরিবারে। প্যারিসে আল বার্টাস ম্যাগনাসের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ১২৪৮ সালে আলবার্টাসের সঙ্গে তিনি কোলোন-এ যান। সেখান থেকে ফিরে এসে প্যারিসে ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপনা শুরু করেন। সিজার দ্য ব্র্যাব্যান্টের অনুসৃত ইবনে রুশদের তত্ত্বজ্ঞানের তিনি বিরোধিতা করেন। জীবনের শেষ দিনগুলো কাটে তাঁর নেপলসে। তিনি একটু শ্লথ গতির ও ভারী প্রকৃতির ছিলেন, তাই তাঁকে 'বোবা ষাঁড়' বলে ঠাট্টা করা হতো। কিন্তু সূক্ষ্মতত্ত্ববাদী দার্শনিকদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর প্রধান গ্রন্থ *Summa Theologica* (১২৬৭-৭৩)। টমাসের মত ছিল এই যে, ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞান পরস্পরবিরোধী নয়, যেহেতু সত্য অবিভাজ্য। তিনি অ্যারিস্টটলের দর্শনের সঙ্গে খ্রিষ্টীয় প্রত্যয়ের সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। যুক্তির ওপর গুরুত্ব দিলেও ধর্মকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। রাষ্ট্রশাসনে মানুষের তৈরি বিধানের প্রয়োজন স্বীকার করেও তিনি বলেছেন, প্রাকৃতিক বা ঐশ্বরিক বিধানের স্থান এ ব্যাপারে সর্বোচ্চে। টমাসের কাছে পাপের অর্থ হচ্ছে শুভের অনুপস্থিতি। গির্জা কর্তৃপক্ষ দীর্ঘকাল তাঁকে ভুল বুঝেছে। যদিও শেষাবধি তাঁর দর্শনকে টমবাদ নামে গ্রহণ করা হয় এবং ১৮৭৯ সালে ত্রয়োদশ লিও একে সরকারি দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেন। ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসীরা টমবাদকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

**টাইটান** গ্রিক পুরাণমতে, দেববংশ ও মানবজাতির পূর্বপুরুষ। শনির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। টাইটানস নামের একশ্রেণীর দৈত্যের জনক। স্বর্গের সার্বভৌমত্ব নিয়ে তিনি শনির সঙ্গে আঁতাত করলে জিউস বজ্রপাতে তাঁকে নরকে নিক্ষেপ করেন। টাইটান নামটি অবশ্য টাইটানের দৌহিত্র হিসেবে প্রমিথিউসকেও দেওয়া হয়।

**টাইফন** গ্রিন পুরাণের প্রসিদ্ধ দৈত্য। জিউসের বজ্রাঘাতে নিহত হলে তাঁকে একটি পর্বতের নিচে সমাহিত করা হয়।

**টিকি** পলিনেশিয়ান ভাষায় টিকি শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়; যেমন দেবতা, প্রথম ব্যক্তি কিংবা ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্তি।

**টিটিয়াস** গ্রিক পুরাণে উল্লেখিত জিউসের পুত্র। নৈতিক কারণে যৌনতা থেকে দূরে থাকা ল্যাটোনার প্রতি নজর দেওয়ার দায়ে অ্যাপোলো তাঁকে হত্যা করেন। আকৃতিতে তিনি এতই বিশাল ছিলেন যে তাঁর বসতে এক একর জমি লাগত।

**টিপরা** বা **ত্রিপুরা** উপজাতি বিশেষ। ভারতের পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলের ভূমিপুত্র। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোর সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে এরা বসবাস করে। টিপরা উপজাতি দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত : পুরোনো বা খাস টিপরা ও জমাতিয়া। এ ছাড়া তাদের মধ্যে নানা গোত্রভাগ আছে, যেমন : আচলোঙ-ফাডঙ, নাইটোঙ, হুসোই, নাওটিয়্যা, জাকলার, কিওয়ার, টোঘি, ডাইককা, গারবিং, রিয়াং প্রভৃতি। রিয়াংরা সংখ্যায় সর্বাধিক এবং এরা কুকি উপজাতি থেকে উদ্ভূত। টিপরাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছা করলে অবশ্য গোত্রের বাইরেও বিয়ে করতে পারে। তাদের মধ্যে তালাক প্রথা প্রচলিত। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে টিপরারা হিন্দু। মেয়েরা রুপার গয়না পরে। কেউ মারা গেলে সাত দিন পর্যন্ত রোজ একটি করে মুরগি রান্না করে তা মৃতের আত্মার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। টিপারারা প্রেতাত্মা ও মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী।

**টিলেম্যাকাস** গ্রিক পুরাণ কথিত অডিসিউস ও পেনিলোপের একমাত্র পুত্র। ট্রয় অবরোধের পর তিনি তাঁর পিতার সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। হোমারের *অডিসি* কাব্যগ্রন্থে তাঁকে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে।

**টিসিফোন** গ্রিক পুরাণের ইউমেনেডিসদের একজন। গ্রিক কিংবদন্তিতে তিন বোনকে বলা হয় ইউমেনেডিস। তাঁরা প্রতিশোধপরায়ণতার দেবী হিসেবে পরিচিত। গোড়াতে তাঁরা অবশ্য উর্বরতার দেবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এথিনির পরামর্শে ওমরস্টেস টিসিফোনসহ ইউমেনেডিসদের সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁদের নামে একটি মন্দির স্থাপন করেন এবং তাঁদের ইউমেনেডিস বা দয়ার দেবী নাম দেন।

**টেন কমান্ডমেন্টস** দশ অনুজ্ঞা দ্র.।

**টেলুস** রোমান পুরাণের ধরিত্রীদেবী। কৃষিবিষয়ক নানা উৎসবে তাঁর পূজা দেওয়া হতো।

**টোটেম** টোটেম বলতে বোঝায় একধরনের বিশ্বাস কিংবা প্রথা বা আচার-অনুষ্ঠান, যার মাধ্যমে কোনো গোত্র কোনো বিশেষ প্রাণী বা গাছপালার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে। এটা এক রকম প্রতীকচিহ্ন। আদিম সমাজে একধরনের ধর্ম ও সংস্কৃতি হলো এই টোটেমবাদ। এ ক্ষেত্রে কোনো গাছ বা প্রাণীর নাম গোত্রের পরিচয় হিসেবে কিংবা অন্য কথায় গোত্রভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি নিজ নিজ গোত্রের টোটেম প্রাণী বা টোটেম বৃক্ষের নামে পরিচিত হয়। আদিম সমাজে মানুষ টোটেম প্রাণীর মুখোশ পরে এবং টোটেম প্রাণী বা তার প্রতিকৃতি ঘিরে নানা উৎসব-আয়োজন করত। টোটেম গোত্র ও গোত্রভুক্ত ব্যক্তির যেমন, তেমনই টোটেম আবার গোত্র সংহতিরও প্রতীক। একেক গোত্রের একেক টোটেম।

**টোটেম স্তম্ভ** আদিবাসী গ্রাম বা বসতির কেন্দ্রে বা তার অন্তর্গত কোনো বাড়ির সামনে স্থাপিত সুউচ্চ কাষ্ঠনির্মিত ধ্বজদণ্ড, যার ঊর্ধ্বে বা গাত্রে কুল বা জাতিবিশেষের আদিদেবতা বিবেচিত পশু-পাখি বা উদ্ভিজ্জ বা তার সম্পর্কে প্রচলিত উপাখ্যান বা পুরাণকথার ঘটনাবলি চিত্রিত বা খোদিত থাকে। উক্ত দণ্ড সরাসরি পূজিত কিংবা তাকে ঘিরে ব্রত-আচারাদি উদ্‌যাপিত হয়। আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে ইন্ডিয়ানদের বাড়ির সামনে প্রাণী কিংবা পাখির প্রতীক খোদাই করা অথবা অঙ্কন করা কোনো খুঁটি অথবা স্তম্ভকে টোটেম স্তম্ভ বলা হয়। হাইডা, কাওয়কাইউৎল, টিলিনগিট ও টসিমশিয়ান ইন্ডিয়ানরা সাধারণত এ ধরনের টোটেম স্তম্ভ ব্যবহার করে।

**টোটেমিক** কোনো বিশেষ পশু, পাখি, উদ্ভিদ ইত্যাদিকে কুল বা জাতিবিশেষের আদি পিতা বা আদি দেবতা ধরে তার মূর্তি তৈরি করে পূজা করা কিংবা তাকে ঘিরে আচারানুষ্ঠান।

**ট্যান্টলস** গ্রিক পুরাণে উল্লেখিত লিডিয়ার রাজা। তাঁর উদ্ধত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে জিউস তাঁকে টারটারাস নরক ভোগের দণ্ড প্রদান করেন। তাঁর সামনে ফলে ভরা একটা ডাল ঝুলবে এবং চিবুক পর্যন্ত জলে তিনি দাঁড়িয়ে থাকবেন। যখন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে জল বা ফল খেতে যাবেন তখন তা তাঁর কাছ থেকে সরে যাবে।

**ট্যাবারনাকুল ভোজ** হিব্রু ভাষায় সুকোথ বলা হয়। পৌরাণিক প্যালেস্টাইনে ফসলের উৎসববিশেষ। ইহুদি বছরের সপ্তম মাস তিশরির ১৫ তারিখে শুরু হয়ে নয় দিন পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি।

**ট্রাপিস্ট সাধু** রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। ফ্রান্সের লা-ট্রাপ-এ আনুমানিক ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে মঠ সংস্কার আন্দোলনের ভেতর দিয়ে এই সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। এই সম্প্রদায়ের সাধুরা নিভৃতে প্রার্থনা, কাজকর্ম ও অধ্যয়নে সময় কাটান। কোনো অসাধারণ কারণ ছাড়া তাঁরা সাধারণত নীরবতা ভঙ্গ করেন না এবং আমোদ-প্রমোদ ও ভোজন পরিহার করে চলেন।

**ট্রিনিটি সানডে** পেনটিকস্টের পরবর্তী রবিবার পবিত্র ট্রিনিটি বা ঈশ্বরের ত্রিত্বের সম্মানে আয়োজিত ভোজসভা। দশম শতাব্দীতে ফ্রান্সে এর সূচনা হলেও ১৩৩৪ সাল থেকে সারা পৃথিবীতে উৎসবটি গ্রহণযোগ্যতা পায়।

## ঠ

**ঠগী** মধ্যযুগের ভারতে ডাকাত ও নরহত্যাকারীদের একটি ভ্রাতৃসংঘ। এরা শাক্ত, শিব ও কালীর ভক্ত ছিল। বছরের অন্য সময় এরা সাধারণ সাংসারিক কাজকর্মে নিযুক্ত থাকত। কিন্তু শরৎকালে দল বেঁধে সওদাগর বা সন্ন্যাসীর বেশে নরহত্যা ও রাহাজানির উদ্দেশ্যে বের হতো। রুমালে ফসকা গিরো দিয়ে তারা এ রকম ফাঁস তৈরি করত এবং পথিকের অসতর্ক মুহূর্তে তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করত। অতঃপর নিহতদের কালীর নামে উৎসর্গ করা হতো। নারী এবং মেথর, ধোপা, বাদ্যকর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদের তারা সাধারণত আক্রমণ করত না। লর্ড বেন্টিংক তাঁর শাসনামলে এই ঠগীদের দমন করেন।

## ড

**ডমিনিক, সেন্ট** ডোমিনিক্যাল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ১২১৬ সালে তুলুজে পোপ তৃতীয় হনোরিয়াস তাঁকে একটি সম্প্রদায় গঠনের অনুমতি দেন।

**ডাইওনিসিয়া** প্রাচীন গ্রিসে ডাইওনিসাস নামক দেবতার সম্মানে অনুষ্ঠিত ধর্মোৎসব। এতে উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হতো। এই উৎসব থেকেই গীতিকবিতা, সমবেত কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে শোভাযাত্রা ও গ্রিক নাটকের উদ্ভব হয়।

**ডাইওমিড** গ্রিক পুরাণে উল্লেখিত থেরেসের রাজা। তিনি তাঁর ঘোড়াগুলোকে নরমাংস খাওয়াতেন। হারকিউলিস রাজাকে শাস্তি দিতে তাকেই তার ঘোড়াদের দিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন।

**ডাইনি** লোকবিশ্বাস ও কল্পকাহিনিমতে, অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারিণী একশ্রেণীর নারী। এরা মানুষকে বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ও বড় ধরনের বিপদে ফেলতে পারে বলে মনে করা হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক গাথা-কাব্যে এদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাবলে এরা ভবিষ্যৎ দেখতে পায় এবং অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে। ডাইনির হাতে প্রায়শই একটা জাদুর কাঠি থাকে।

**ডাকিনী** 'ডাক' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। পিশাচী অর্থেও এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পুরাণমতে, কালিকা দেবী বা হর-পার্বতীর অনুচরী। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রশাস্ত্রে ডাকিনী শক্তিদেবীর এক বিশিষ্ট যোগিনী সহচরী। হাকিনী, শাকিনী, রাকিনী ও লাকিনী নামেও উল্লেখিত হয়। ডাকিনী রূপান্তরিত হয়ে যেমন ডাইনি, তেমনি শাঁকিনি হয়েছে শাঁকচুন্নি।

**ডাকিনীবিদ্যা** নারী ডাইনির চর্চার বিষয় বা কাজ। এর মাধ্যমে ডাকিনীরা মানুষের দুর্বলতার সুযোগে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং তাদের দিয়ে যা খুশি করিয়ে নিতে পারে। যারা ডাকিনীবিদ্যা চর্চা করে তারা কখনো কখনো কোনো কোনো সমাজে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এমনকি জনপ্রিয়তারও অধিকারী হয়। কখনো আবার তারা ব্যাপক মানুষের অপছন্দ বা ঘৃণার পাত্রী হয়। সব কালেই ডাকিনী বা ডাইনি সন্দেহে কিংবা ডাকিনীবিদ্যা চর্চার অপরাধে নারীদের পুড়িয়ে মারার কথা জানা যায়। অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বা চক্রান্তমূলকভাবেও তা করা হয়। ফ্রান্সে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জোয়ান অব আর্কের মতো মহিয়সী নারীকেও ডাকিনী সন্দেহে বিচার ও শাস্তি হিসেবে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। সাম্প্রতিক কালেও

ভারতের কোনো কোনো রাজ্যে ডাকিনী সন্দেহে একাধিক নারীকে হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

**ডাকের বচন** আনুমানিক দশম শতকে রচিত জ্যোতিষ, ক্ষেত্রতত্ত্ব ও গৃহস্থালি-বিষয়ক ছড়া বা প্রবাদ। ধারণা করা হয়, ডাক নামক একজন গোয়ালা এসবের রচয়িতা। যে বংশে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, সেই একই বংশে বাঙালি ডাকেরও জন্ম বলে মনে করা হয়। তাঁর বচনগুলোর সঙ্গে চার্বাক মতেরও মিল লক্ষ করা যায়। একটি ডাকের বচনের নমুনা: 'ভালো দ্রব্য যখন পাব, কালিকারে তুলিয়া না থোব। দধি-দুগ্ধ করিয়া ভোগ, ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ। বলে ডাক এ সংসার, আপনা মইলে কিসের আর।'

**ডাকোটা** শিকারি যাযাবর জাত। কানাডার প্রেইরি অঞ্চলের বাসিন্দা। আধুনিক উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটাকে ঘিরে ছিল তাদের আদি নিবাস। আর তাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায় ছিল মোষ শিকার। মোষদের পাল তাড়া করে ফিরতে হতো তাদের। ফলে নির্দিষ্ট কোনো স্থানে বসতি স্থাপন করে থিতু হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ধর্মীয় ব্যাপারে ডাকোটানরা ওয়াকানটানকা নামক ঐক্যচেতনায় বিশ্বাসী। সহজ করে বলতে গেলে এই ঐক্য হচ্ছে মহা আত্মা আর তার প্রতিনিধিদের ঐক্য। ওয়াকান কথাটির অর্থ আত্মা, যা সকল অস্তিত্বে বিদ্যমান। তাদের কাছে প্রাকৃতিক আর অতিপ্রাকৃত জগতের কোনো পার্থক্য ছিল না। নানা রকম আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'প্রাকৃতিক ঐক্যের' প্রতি আনুগত্য প্রকাশই ছিল তাদের ধর্মসাধনার একমাত্র লক্ষ্য। তাদের কাছে বস্তুজগৎ ছিল এক মহান শক্তির প্রকাশিত রূপ। তাদের ধর্মচিন্তার সঙ্গে উপনিষদের চিন্তার সাদৃশ্য স্পষ্ট। তারাও বিশ্বাস করত যে চারপাশের বস্তুজগৎ বাস্তব নয়, প্রচ্ছায়া মাত্র। উপনিষদের ভাষায় যাকে বলা হয় মায়া।

**ডানু** আইরিশ কিংবদন্তি অনুযায়ী রূপকথার দেবী। যদিও কিছু উপকথায় তাকে ডাগাডা বা সৌরস্রষ্টার কন্যা হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে।

**ডাফ নীতি** রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ (১৮০৬-১৮৭৮) বাংলায় মিশনারি শিক্ষাক্ষেত্রে যে নীতি প্রয়োগ করেন। তাতে বলা হয়, পূর্ণাঙ্গ পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং বাইবেলের প্রতি অনুরাগই ভারতীয়দের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র পথ। ডাফ নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো : শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির ব্যবহার, নারীদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারিদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষায় সরকারি উদ্যোগের পরিবর্তে কেবল অনুদান প্রদানেই তা সীমিত রাখা। স্কটল্যান্ডের অধিবাসী ডাফ ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে 'জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন' (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর নীতি এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

**ডিমিটার** গ্রিক পুরাণে উল্লেখিত শস্যদেবী। প্রকৃতি ও উর্বরতার দেবীও বটে। গাছপালার ক্ষয় ও পুনর্জীবন এবং আত্মার অমরতার প্রতীক। রোমক দেবী সিরিশের সমতুল্য। প্রকৃতির দেবী হিসেবে ডিমিটার অবশ্য নারী, বিয়ে, সম্প্রীতি ও স্বাস্থ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ঋতু নিয়ন্ত্রণ করেন। শীতকালে ধরিত্রীকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে তিনি বসন্তে আবার পুনর্জন্ম দেন।

**ডিরোজিও** ঊনবিংশ শতকের 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের পথিকৃৎ হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন শিক্ষক, কবি, সাংবাদিক ও সমাজসংস্কারক। তিনি যুক্তিবাদী, উদারনৈতিক, সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৮০৯ সালে এবং ১৮২৬ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শিষ্যরা ডিরোজিয়ান বা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেসব কৃতী মানুষ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চিন্তাচর্চার ক্ষেত্রে বাঙালিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সবাই, তাঁর প্রত্যক্ষ বা ভাবশিষ্য ছিলেন। তাঁকে সভাপতি করে তাঁর শিষ্যরা একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন ও 'পার্থেনন' নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা বের করেন। ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যরা ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেন।

**ডুখবর সম্প্রদায়** সপ্তদশ শতাব্দীতে রুশ চাষিদের এক ধর্মীয় সম্প্রদায়, যারা মানুষের সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাসী এবং রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় সব কাজের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

**ডেভিড** দাউদ দ্র.

**ডেলফি** প্রাচীন গ্রিক মন্দির। প্রাচীন গ্রিস ও রোমে কোনো একটি মন্দির নির্দিষ্ট একজন দেবতার নামে উৎসর্গিত হতো। কোনো বড় সামাজিক সমস্যা বা দুর্যোগ দেখা দিলে রাজ্যের মানুষ নির্দেশনার জন্য সেই মন্দিরের পুরোহিতদের শরণাপন্ন হতো। এ রকম একটি মন্দির হলো ডেলফির মন্দির, যা প্যারানেসাস পর্বতে অবস্থিত ফোসিস নগরে অবস্থিত ছিল। আগে এটি ছিল ধরিত্রী দেবী গেইয়ার মন্দির। পাইথন নামে এক ড্রাগন এটি পাহারা দিত। অ্যাপোলো দেবতা পাইথনকে হত্যা করে মন্দিরটির দখল নেন এবং গেইয়ার মূর্তি সরিয়ে সেখানে নিজের মূর্তি স্থাপন করেন। তারপর থেকে মন্দিরটি অ্যাপোলোর দৈববাণীর মন্দির হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কিংবদন্তি অনুযায়ী এই মন্দির থেকেই ইডিপাস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে তিনি তাঁর পিতা লিয়াসকে হত্যা ও তারপর মা জোকাস্টাকে বিয়ে করবেন।

**ডোম** চণ্ডাল সম্প্রদায়ভুক্ত একটি অস্পৃশ্য উপসম্প্রদায়। ডোমদের বেশির ভাগই বৈষ্ণব মতের অনুসারী। ধর্মরাজ তাদের উপাস্য। তাদের প্রধান ধর্মানুষ্ঠান শ্রাবণী পূজা যা শ্রাবণ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। শূকরছানা বলি দিয়ে তার এক বাটি রক্ত এক বাটি দুধের সঙ্গে দেবতা নারায়ণের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। আবার ভাদ্র মাসে অন্ধকার রাতে এক কৌটা দুধ, একটি টাটকা নারকেল, এক ছিলিম তামাক ও অল্প শণ দেবতা হারিরামের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। ডোমরা মৃত জীবজন্তুর মাংস খায়। তারা আদিতে দ্রাবিড় ছিল, তবে কবে তারা বাংলাদেশে আসে তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।

**ডোমিনিক্যান সম্প্রদায়** ডমিনক, সেন্ট দ্র.

## ঢ

**ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা** ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার (কলকাতা মাদ্রাসা দ্র.) লাইব্রেরি, আসবাবপত্র ও নথিপত্র সব ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কের কাছে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমানে কাজী নজরুল ইসলাম কলেজ) মাদ্রাসাটির ক্লাস চালু করা হয়। তদবধি এটি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা হিসেবে পরিচিত। ১৯৬১ সালে বকশীবাজার এলাকায় নবনির্মিত ভবনে মাদ্রাসার ক্লাস, গ্রন্থাগার এবং ছাত্র হোস্টেল স্থানান্তর করা হয়।

**ঢাকেশ্বরী মন্দির** ঢাকার প্রধান হিন্দুমন্দির। এটি ঢাকেশ্বরী রোডের উত্তর পাশে অবস্থিত। অঙ্গনে প্রবেশের জন্য সিংহদ্বারটি নহবতখানা তোরণ নামে অভিহিত। জনশ্রুতিমতে, মন্দিরটির নির্মাতা বল্লাল সেন। যদিও এই বল্লাল সেন সেন-বংশের রাজা বল্লাল সেন কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অন্তত মন্দিরটির স্থাপত্যরীতি সে দাবি সমর্থন করে না। মন্দিরটি আগাগোড়াই চুন-বালির গাঁথুনিতে তৈরি, যা বাংলার মুসলিম আমলের স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্য। আরাকানি বৌদ্ধমন্দিরের মতো এই মন্দিরও সবার জন্য উন্মুক্ত। শহরের পৃষ্ঠপোষক ঈশ্বরী হিসেবে মন্দিরের আরাধ্য দেবীর নাম ঢাকেশ্বরী। ব্র্যাডলি বার্ট লিখেছেন, মন্দিরটি ২০০ বছরের বেশি পুরোনো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন হিন্দু এজেন্ট এটি নির্মাণ করেছিলেন।

## ত

**তওবা** আরবি শব্দটির অর্থ পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন। পবিত্র কোরআনে তওবা বিষয়টির ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিগত পাপের জন্য অন্তরে অনুশোচনা ও সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে সৎ জীবন যাপনের সংকল্পকেই ইসলামি পরিভাষায় তওবা বলা হয়। যে আন্তরিকভাবে তওবা করে তাকে ইসলাম নিষ্পাপ শিশুর সঙ্গে তুলনা করেছে। পবিত্র কোরআনে সুরা তাহরিম-এর ৮ আয়াতে বলা হয়েছে 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো— বিশুদ্ধ তওবা; হয়তো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলো মুছে দেবেন আর তোমাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী বইবে।' সত্যকার তওবা দিয়েই প্রকৃত ধর্মজীবনের সূচনা করা যায়। তাই পীরের হাতে 'তওবা পাঠ' করে মুরিদ হওয়া একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা

দরকার, কোনো বিশেষ বাক্য উচ্চারণকে ইসলাম তওবা বলে মনে করে না। তওবা একটি মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন, যার ফলে গোটা নৈতিক জীবনই নতুন খাতে বইতে শুরু করে।

**তওয়াফ** আভিধানিক অর্থ প্রদক্ষিণ। ইসলামি পরিভাষায় কাবা গৃহের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করাকে তওয়াফ বলা হয়। এটি হজের একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। তওয়াফ হাজরে আসওয়াদ বা 'কৃষ্ণপ্রস্তর' থেকে শুরু করতে হয়। প্রথম তিনবারের প্রদক্ষিণ দ্রুত এবং পরে তা ধীরে ধীরে করতে হয়। প্রত্যেক প্রদক্ষিণের শুরুতে 'কৃষ্ণপ্রস্তর' চুম্বন করতে হয়। ভিড়ের মধ্যে চুম্বন করার অসুবিধাজনক হলে হস্তদ্বারা প্রস্তরটি স্পর্শ করে সেই হাত চুম্বন করে নিলেও চলে। নারী-পুরুষ উভয়কেই তওয়াফ করতে হয়। প্রদক্ষিণের সময় কাবা গৃহের প্রাচীরের যতটা সম্ভব নিকটবর্তী হওয়া বাঞ্ছনীয়। মক্কায় পৌঁছে প্রথম যে প্রদক্ষিণ করা হয় তাকে তাওয়াফুল কুদুস বা আগমনী প্রদক্ষিণ ও মক্কা ত্যাগের আগে শেষ প্রদক্ষিণকে তাওয়াফুল বিদা অর্থাৎ বিদায়ী প্রদক্ষিণ বলা হয়। কবি আল্লামা ইকবাল তাওয়াফকে রূপকার্থে রূপপিয়াসী পতঙ্গের অগ্নিশিখা প্রদক্ষিণের সঙ্গে তুলনা এবং কাবাকে বিশ্ব মুসলিমের কেন্দ্র বলে অভিহিত করেছেন।

**তওরাত** হজরত মুসা (আ.)-এর কাছে অবতীর্ণ ঐশীগ্রন্থ। বনি ইসরাইলিদের সৎপথে পরিচালিত করার জন্য এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়। গ্রন্থটি হিব্রু ভাষায় লিখিত। পবিত্র কোরআন শরিফে তওরাতের উল্লেখ রয়েছে।

**তওহিদ** আরবি শব্দটির অর্থ এক করা। ইসলামি পরিভাষায় একত্ববাদ। ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক বা অংশী নেই এবং একমাত্র তিনিই উপাস্য—এ বিষয়ে বিশ্বাস। পবিত্র কোরআনে তওহিদের চেতনা, ব্যাখ্যাসহ বহু আয়াত রয়েছে।

**তকদির** অর্থ ভাগ্য বা অদৃষ্ট। মানুষ তার আপন কর্মের জন্য দায়ী নয়, তার নির্বাচনক্ষমতাও আল্লাহর ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তকদির বলতে এটাকেই বোঝানো হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সুরা তওবার ৫১ আয়াতে বলা হয়েছে, 'বলো, আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ছাড়া আমাদের আর কিছু হবে না। তিনি আমাদের কর্মবিধায়ক।' তবে তকদির বিষয়টি আল্লাহর অসীম ক্ষমতার পরিচায়ক হলেও তা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির পরিপন্থী নয়। মানুষের ইচ্ছাশক্তি আল্লাহর ইচ্ছাশক্তির অধীন, কিন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তির সীমার মধ্যে সে স্বাধীন এবং তার ভালো-মন্দের জন্য সেই দায়ী। আপন প্রচেষ্টায় মানুষের উন্নতি হয় ও আপন কর্মফলেই তার সর্বনাশ হয়, এটা রাসুলের মত। আল্লাহর ইচ্ছায় করেছি বলে কেউ নিজ অন্যায় কর্মের পক্ষ সমর্থন করলে হজরত ওমর (রা.) তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দিতেন। হজরত আলী (রা.)-এর মতে, আল্লাহ মানুষের সকল কর্ম নির্ধারণ করেন, এটা অবিশ্বাসীসুলভ কথা। তাহলে পুণ্যের জন্য পুরস্কার আর পাপের জন্য শাস্তির বিধান থাকত না এবং আল্লাহর নবী প্রেরণও অনর্থক হতো। পবিত্র কোরআনের সুরা দাহর-এর ২ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য তাকে শ্রবণ ও দর্শনশক্তি দিয়েছি, তাকে পথও দেখিয়েছি, সে কৃতজ্ঞও হতে পারে, অকৃতজ্ঞও হতে পারে। অতএব ইসলামে আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে মানুষই তার ভাগ্যের নিয়ন্তা।

**তকলিদ** অর্থ আইনি মতামত গ্রহণ। ইসলামি শাস্ত্রে তকলিদ বলতে আইনবিদের মতের অনুসরণ বোঝায়। পবিত্র কোরআন, হাদিস ও ইজমায় যার সমাধান আছে সে-সম্পর্কে অন্য কোনো অভিমতের অবকাশ নেই; অর্থাৎ সকলেই তা মানতে বাধ্য। কিন্তু পবিত্র কোরআন, হাদিস বা ইজমাতে যার কোনো ফয়সালা নাই, সে সম্পর্কে আইনবিদ যে অভিমত প্রদান করেন তা গ্রহণ করবার নাম তকলিদ। যাঁরা আইনবিদ নন, তাঁদের জন্যই তকলিদের আবশ্যকতা হয়।

**তক্ষশীলা** প্রাচীন গান্ধারের রাজধানী। প্রাচীন ভারতের একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। অর্জুনের প্রপৌত্র ও রাজা পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ স্থানে রাজা ভরত কর্তৃক এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। হিউয়েন সাং তাঁর ভারত ভ্রমণের বিবরণে লিখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে তক্ষশীলা একক

কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। এখানে অনেক পণ্ডিতের এবং সারা বিশ্ব থেকে অসংখ্য জ্ঞানপিপাসুর সমাবেশ ঘটেছিল। শিক্ষকেরা নিজেরাই শিক্ষাক্রম নির্ধারণ, গ্রহণ ও বর্জনের অধিকার রাখতেন। বস্তুত, শিক্ষকদের জন্যই তক্ষশীলা বিখ্যাত ছিল। প্রসেনজিৎ, পাণিনি ও কৌটিল্যের মতো বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতেরা তক্ষশীলারই অবদান। ১৬ বছর বয়সে শিক্ষার্থীরা এখানে পাঠ নিতে আসত। সাধারণত গুরুর বাড়িতেই তারা বাস করত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন তারা নিজেদের ভরণপোষণের ব্যয় নিজেরা বহন করত কিংবা নিজ বাড়িতে থাকত। এ ছাড়া অনুমোদিত ছাত্রাবাসের ব্যবস্থাও ছিল। অনেক সময় স্থানীয় ধনীদের বাড়িতেও শিক্ষার্থী রাখার জন্য রেওয়াজ ছিল। একমাত্র চণ্ডাল ছাড়া অন্য সবার ক্ষেত্রে শ্রেণী, বর্ণ বা সম্পদের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য করা হতো না। জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, বাণিজ্য, কৃষি, হিসাবরক্ষণ, সর্পবিদ্যা, ইন্দ্রজাল বিদ্যা, মৃগয়াবিদ্যা, বৈদ্যবিদ্যা, চিকিৎসা, নৃত্য, অঙ্কনবিদ্যা চর্চার জন্য তক্ষশীলা বিখ্যাত ছিল।

**তত্ত্ববোধিনী সভা** রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সভা স্থাপন করেন। প্রথমে এর নাম ছিল 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। ব্রাহ্মধর্মের প্রচার এর মূল উদ্দেশ্য হলেও বাঙালির শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ইত্যাদির আধুনিকায়নও ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য। এ সভা থেকেই বিখ্যাত *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* প্রকাশিত হয়। স্থাপিত হয় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে এ পত্রিকায় আলোচনা প্রকাশিত হতো। পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলায় বিজ্ঞান-পুস্তক রচনা ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলন করেন।

**তথাগত** বুদ্ধ দ্র.

**তন্ত্র** শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি অর্থ হলো ত্রাণ বা মুক্তি। যে শাস্ত্রানুযায়ী সাধন করলে জীব উন্নততর স্তরে পৌঁছতে পারে এবং তার মোক্ষ বা মুক্তি লাভ হয়, সাধারণভাবে তাকে তন্ত্র বলা হয়। তন্ত্র শ্রুতিনির্ভর বলে একে 'পঞ্চম বেদ'ও বলা হয়। কলিযুগে মানুষের আয়ুষ্কাল হ্রাস পাওয়ায় বিশাল বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী সাধনা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই বিকল্প হিসেবে তন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। তন্ত্রোক্ত মন্ত্র আশুফলপ্রদ এবং জপ, তপ, যজ্ঞ প্রভৃতি সব কর্মেই প্রশস্ত। পঞ্চদশ শতকের বিখ্যাত স্মার্তপণ্ডিত ও *নব্যস্মৃতি* গ্রন্থের রচয়িতা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তন্ত্রশাস্ত্রকে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করেন। *অষ্টবিংশতিতত্ত্ব* নামে তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ আছে।

তন্ত্র প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত: হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্র। হিন্দুতন্ত্রগুলো শিবোক্ত এবং বৌদ্ধতন্ত্রগুলো বজ্রসত্ত্ব কর্তৃক বর্ণিত বলে ধারণা করা হয়। সপ্তম শতকের আগে হিন্দুতন্ত্র রচিত হয় এবং এর প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় অথর্ববেদীয় নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদে। হিন্দুতন্ত্রের অনুকরণে পরে রচিত হয় বৌদ্ধতন্ত্র। খ্রিষ্টীয় নবম-একাদশ শতকের মধ্যে বহু বৌদ্ধতন্ত্র তিব্বতি ভাষায় অনূদিত হয়। ভাস্কর রায় অষ্টাদশ শতকে রচিত বামকেশ্বরতন্ত্রের অনেক টীকা রচনা করেন। তন্ত্রের বিকাশ ঘটে বঙ্গদেশে এবং এখান থেকেই তা ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (৯৮০-১০৫৩) তিব্বতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-৮৬), বামাক্ষ্যাপা (১৮৩৭-১৯১১) প্রমুখ সিদ্ধপুরুষ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তান্ত্রিকদের ইষ্ট দেবী হলেন কালী, তারা বা ভৈরবী।

তান্ত্রিক মতের অনুসারীদের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ তন্ত্র অনুযায়ী সম্পন্ন হয়।

তান্ত্রিক মতে, দীক্ষাগ্রহণ অপরিহার্য। অদীক্ষিত ব্যক্তির জপ-পূজাদি নিষ্ফল এবং মৃত্যুর পর তার নরকে গতি হয়। কোনো কোনো মন্দির ও রক্ষণশীল পরিবারে তান্ত্রিক মতে, কুমারীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বশীকরণ, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, অভিচার ইত্যাদি গুহ্য কর্মকাণ্ড তন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হিন্দুতন্ত্র শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবভেদে ত্রিবিধ। তন্ত্রশাস্ত্রে সাত প্রকার আচারের কথা বলা হয়। তার মধ্যে দক্ষিণাচার ও বামাচার প্রধান। দক্ষিণাচারীরা বেদোক্ত বিধি মেনে চলেন। তাঁরা মাছ, মাংস, মদ্য ইত্যাদি পরিহার করেন। বামাচারীরা অনেক বেদবিরোধী আচরণ করে। বৈদিক দীক্ষার প্রচলন এখন আর নেই। বাংলা

অক্ষরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সবচেয়ে প্রাচীন তন্ত্রের পুঁথি, ১৪৩৯ খ্রিষ্টাব্দে গাছের বাকলে লিখিত 'সারদাতিলক'।

**তন্ত্রধারক** হিন্দুধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে যে ব্রাহ্মণ পুঁথি দেখে পুরোহিতকে মন্ত্রপাঠে সাহায্য করেন তাঁকে তন্ত্রধারক বা তন্ত্রধারী বলে।

**তপোবন** অরণ্য-আশ্রম বা তপস্যাকেন্দ্র। প্রাচীন ভারতে অরণ্যবেষ্টিত মুনি-ঋষিদের আশ্রম বোঝাতে তপোবন কথাটি ব্যবহৃত হয়। তপোবনে মুনি-ঋষিদের কাছে শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করতে আসত। এ সময় তারা গুরুর পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে থাকত এবং গৃহকর্মে গুরু বা গুরুপত্নীকে সাহায্য করত। অধ্যয়ন সমাপ্ত হলে তারা গৃহে প্রত্যাবর্তন ও গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করত। গার্হস্থ্য জীবন সম্পর্কেও অনেক জ্ঞান তারা গুরুগৃহ থেকে লাভ করত। মেনকা-তনয়া শকুন্তলা তপোবনের আশ্রমে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। এখানেই রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং উভয়ে গান্ধর্ব বিয়েতে আবদ্ধ হন। রাম সীতাকে তপোবনে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে পাঠিয়েছিলেন। সীতার দুই পুত্র লব ও কুশ এই মুনির কাছেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।

রামায়ণ, মহাভারত ও কালিদাসের একাধিক নাটকে তপোবনের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য: 'তপোবনের উল্লেখ আছে পুরাণে, কিন্তু এত অসম্ভব অলৌকিক অতিপ্রাকৃত কাহিনীর সঙ্গে সে জড়িত থাকে যে তাকে ঐতিহাসিক সত্য বলে বিশ্বাস করতে কাউকে অনুরোধ করিনে।'

**তফসির** ব্যাখ্যা বা ভাষ্য। ইসলামে এই শব্দটি বিশেষভাবে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা এবং ভাষ্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তফসির গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে পবিত্র কোরআনের অর্থ অনুধাবন ও তা বর্ণনা করা সহজ হয় এবং শরিয়তের আদেশ ও নির্দেশ সম্পর্কে জানা যায়। তফসির গ্রন্থে পবিত্র কোরআনের গঠনপদ্ধতি, শাব্দিক ব্যাখ্যা, ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ, আয়াতের অর্থ, আয়াত নাজিলের কারণ, সংশ্লিষ্ট ঘটনা, নাসিখ-মানসুখ বা রহিতকারী ও রহিতকৃত ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়। হাদিস গ্রন্থগুলোর, বিশেষত ইমাম বুখারি ও ইমাম তিরমিজির *আল-জামি*গ্রন্থের তফসির অংশে আয়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাদিসও বর্ণনা করা হয়েছে। অতীতে 'তফসির' ও 'তাফিল' শব্দদ্বয় সমার্থক ছিল। তফসির শব্দটি আয়াতের শব্দগত ও তাত্ত্বিক টীকাসহ ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং তাফিল শব্দটি আয়াতের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন মর্মের মধ্য থেকে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া অর্থে প্রচলিত।

তফসিরের সূচনা করেন খোদ মহানবী (সা.)। কোনো আয়াত বোধগম্য না হলে তিনি সে আয়াতের তফসির করে দিতেন। সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত তফসিরকারী ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)। যদিও তাঁর সময়ে পূর্ণ তফসির আত্মপ্রকাশ করেনি। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে তফসির শাস্ত্রের বিকাশ ঘটে। আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে সনদভিত্তিক তফসিরের পাশাপাশি সনদবিহীন তফসির সংকলনও শুরু হয়। সনদভিত্তিক তফসিরের মধ্যে ইবনে জারির তাবারির (মৃত্যু ৩১০ হি) *জামি'উল-রয়ান ফি তফসিরি'ল কোরআন*, আবুল-লায়স সমরকান্দির (মৃ. ৩৭২ হি.) *বাহরুল-উলুম*, হুসেন ইবনে মাসউদ বাগাভির (মৃ. ৫১০ হি.) *মা'আলিমুত-তানজিল* এবং ইবনে কাছিরের (মৃ. ৭৭৪ হি.) *তফসিরুল-কুরআনি'ল-আজিম* উল্লেখযোগ্য। সনদবিহীন তফসিরের মধ্যে ইমাম রাজির (মৃ. ৬০৬ হি.) *মাফাতিহ'ল-গায়ব*, কাজী নাসিরুদ্দিন বায়দাভির (মৃ. ৬৯১ হি.) *আনওয়ারু'ত-তানজি'ল*, ইমাম নাসাফির (মৃ. ৭১০ হি.) মাদরিকু'ত-তানজিল উল্লেখযোগ্য। সুফি, শিয়া ও মুতাজিলা সম্প্রদায়ের একাধিক পণ্ডিত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পবিত্র কোরআনের তফসির রচনা করেছেন।

**তফসিলি সম্প্রদায়** সংরক্ষণের সুবিধাপ্রাপ্ত হিন্দু অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়। মর্লি-মিন্টো সংস্কারের (১৯০৯) ফলে বাংলার মুসলমানরা তাদের রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণে স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার লাভ করলে হিন্দু অনুন্নত শ্রেণীর সংগঠনগুলোও সরকারের কাছে অনুরূপ সুবিধালাভের দাবি করে। যদিও ভারতীয় জাতীয়

কংগ্রেস তখন তাদের এ দাবি সমর্থন করেনি। বাংলার অনুন্নত সম্প্রদায়গুলো বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিভিন্ন বর্ণভিত্তিক সংগঠন ও সমিতির অধীনে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে থাকে। সাইমন কমিশন ও গোলটেবিল বৈঠক অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করে। কংগ্রেসও পুনা প্যাক্টে (১৯৩২) অনুন্নত শ্রেণীর এই অধিকার মেনে নেয়। 'অনুন্নত শ্রেণী' বা 'অস্পৃশ্য' কথার মধ্যে যে অসম্মানের দিকটি রয়েছে তা অপনোদনের জন্য বঙ্গীয় সরকার ১৯৩২ সালে ৭৬টি হিন্দু নিম্নবর্ণের লোকদের 'তফসিলি সম্প্রদায়' বলে ঘোষণা করে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রথম তফসিলে এদের উল্লেখ রয়েছে। এভাবে যেসব বর্ণ, সম্প্রদায়, জাতিগোষ্ঠী ও উপজাতি ইতিপূর্বে 'অনুন্নত শ্রেণী' হিসেবে পরিচিত ছিল, তারা 'তফসিলি সম্প্রদায়'রূপে আখ্যায়িত হলো। বঙ্গীয় আইনসভার ২০ শতাংশ আসন তফসিলি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত হয়। মুসলমানদের মতো তারা সংরক্ষিত আসনের বাইরেও সাধারণ আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলা ও পাকিস্তানে যেসব মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তা আইন পরিষদে তফসিলি সম্প্রদায়ের সদস্যদের সমর্থনের ভিত্তিতে ও তাদের অংশগ্রহণে গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে পৃথক নির্বাচন-পদ্ধতি রহিত করা হয়। ফলে আইন পরিষদে তফসিলি সম্প্রদায়ের আসন সংরক্ষণ-ব্যবস্থারও অবসান ঘটে।

**তবকাত ইবনে সাদ** বা **কিতাব আল-তবকাত আল-কবির** মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবিদের জীবন নিয়ে লিখিত গ্রন্থ। এর রচয়িতা ছিলেন ইরাকি বংশোদ্ভূত পণ্ডিত মোহাম্মদ ইবনে সাদ (৭৮৪-৮৪৫ খ্রি.)। বইটি ইউরোপের বহু ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে।

**তবাতবাই** হজরত ইমাম হাসান (রা.)-এর এক পৌত্র, যিনি 'ক'-এর বদলে 'ত' উচ্চারণ করতেন। একবার ঈদের দিনে পিতার কাছে কাবা (একপ্রকার পোশাক) চাইতে গিয়ে 'তাবা' বললে সেই থেকে তাঁর নাম হয় 'তবাতবা'। তাঁর আসল নাম ইসমাইল হলেও তিনি এই নামেই পরিচিতি পান। শিয়াদের যে সম্প্রদায়টি তাঁর অনুসারী, তাদের এ জন্য তবাতবাই বলা হয়।

**তমসা** বাল্মীকি দ্র.

**তরিকত** কথাটা এসেছে 'তরিকা' শব্দ থেকে, যার আভিধানিক অর্থ পন্থা বা পদ্ধতি। আল্লাহকে লাভ করার জন্য প্রবৃত্তির যে সংশোধন প্রয়োজন, সাধনার দ্বারা তা আয়ত্ত করার নামই তরিকত। শরিয়ত বা আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণকে নিষ্কলুষ করার জন্য তরিকত বা আধ্যাত্মিক মার্গ প্রয়োজন, এ মতবাদ দীর্ঘকাল ধরে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত। আর তা থেকেই নানা আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। তন্মধ্যে 'কাদিরিয়া', 'নকশবন্দীয়া', 'চিশতিয়া' ও 'সুহরাওর্দীয়া' তরিকা (পন্থা) বিশেষ পরিচিত। তরিকতকে শরিয়তের গূঢ়ার্থ উপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের উপায় বলে বর্ণনা করা হয়। শরিয়তপন্থীরা রাসুলুল্লাহর (সা.) আদর্শ চরিত্রের অনুসরণকেই তরিকতের সর্বোত্তম পন্থা বলে বিবেচনা করেন এবং বিয়ে ও সংসার-যাপনকে ধর্মজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন।

**তরিকা-ই-মুহম্মদিয়া** মৌলবাদী ধর্মীয় আন্দোলন। হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রদর্শিত পথ কঠোরভাবে অনুসরণ করাই ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য। ভারতবর্ষে এই আন্দোলন 'ওয়াহাবি আন্দোলন' নামে পরিচিতি লাভ করে। আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন শাহ ইসমাইল (১৭৮২-১৮৩১ খ্রি.) এবং শাহ সৈয়দ আহমদ (১৭৮০-১৮৩১ খ্রি.)। আরবের মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের (১৭০৩-১৭৮৭ খ্রি.) শিক্ষা অনুসরণ করে খাঁটি শরিয়তপন্থী জীবনযাপন ও ইসলামি সমাজ কায়েমই ছিল এঁদের উদ্দেশ্য। শাহ সৈয়দ আহমদ ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' হিসেবে ঘোষণা করে বিধর্মী শাসকদের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের ডাক দেন। তিনি ও তাঁর অনুসারীরা বিধর্মীদের ভাষা হিসেবে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষারও বিরোধিতা করেন। শাহ সৈয়দ আহমদ প্রথমে যুদ্ধ করেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শিখদের বিরুদ্ধে। সে সময় বাংলা দেশ থেকেও

এই 'জেহাদে' সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে পাঠানো হয়। পরে ইংরেজদের সঙ্গেও তাঁদের যুদ্ধ হয়। ১৮২১ সালে চব্বিশ পরগনা জেলার কৃষক ও ধর্মীয় নেতা সায়িদ নিছার আলী ওরফে তিতুমীর হজ পালন করতে মক্কায় গেলে সেখানে সৈয়দ আহমদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিতুমীর তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দেশে ফেরার পর তিতুমীর তরিকা-ই-মুহম্মদিয়ার আদর্শে ধর্মসংস্কার আন্দোলন পরিচালনার পাশাপাশি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে গ্রামাঞ্চলে জমিদার ও নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন। পরে জমিদার ও নীলকরদের সাহায্যে ইংরেজ বাহিনী এগিয়ে এলে তাদের সঙ্গেও তিতুমীর ও তার অনুসারীদের লড়াই হয়। প্রথম দিকে অনেকগুলো লড়াইয়ে তিতুমীরের বাহিনী সাফল্য লাভ করলেও ১৮৩১ সালে নারিকেলবাড়িয়ায় ইংরেজ বাহিনী তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায় আক্রমণ চালালে ইংরেজদের সঙ্গে অসম যুদ্ধে তিতুমীর ও তাঁর সঙ্গীদের অনেকে শহীদ হন। তরিকা-ই-মুহম্মদিয়া বা ওয়াহাবি মতের অনুসারীরা পীরপ্রথা, কবর-পূজা ইত্যাদিকে 'শিরক' হিসেবে গণ্য করেন।

**তসনিম** বেহেশতের ঝরনা। পবিত্র কোরআনের সুরা মুতাফফিফিন-এর ২৭-২৮ আয়াতে এই ঝরনার উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে, আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা এই ঝরনার পানি পান করবেন।

**তসবিহখানা** শাহি মাজারের নিকটস্থ দোয়া-দরুদ পাঠের জন্য নির্দিষ্ট স্থান। পুরোনো শাহিমহল যথা দিল্লি, লাহোর এবং আগ্রায় এ ধরনের তসবিহখানা দেখা যায়। সম্রাট আকবরের ধর্মমত পরিবর্তনের পর তসবিহখানার নাম পরিবর্তন করে 'ইবাদতখানা' রাখা হয়। শেখ সলিম চিশতির মাজারের অদূরে এমনি এক উপাসনাগৃহ নির্মিত হয়।

**তাইশান** চীনের মধ্য শ্যানচুং প্রদেশের একটি পবিত্র শৃঙ্গ। প্রাচীনকালে চীনারা মনে করত তাইশান মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। বৌদ্ধ ও তাওপন্থীদের কাছে এই শৃঙ্গটি পবিত্র বলে গণ্য হতো। বহু মন্দির বা উপাসনালয়ের অবস্থানের কারণে এটি একটি জনপ্রিয় তীর্থস্থান।

**তাওবাদ** চীনা দার্শনিক মতবাদ। লাওৎ-শের লিখিত বলে কথিত গ্রন্থ *তাও-তেহ্-কিং* থেকে এর উৎপত্তি। পরে চুয়াংসার বিশদ ব্যাখ্যা করেন। ঘটনার স্বাভাবিক গতি, নিয়মিত বিবর্তন ও স্বতঃস্ফূর্ত পরিণতি তাওবাদের মূলনীতি। আধ্যাত্মিক ধ্যানের মাধ্যমে বাসনার প্রলোভন এড়িয়ে যাওয়াই তাওবাদীদের উদ্দেশ্য। পঞ্চম শতকের মধ্যে তাওবাদ একটি সুগঠিত ধর্মমতে পরিণত হয়। তাওবাদীরা বহু দেব-দেবী স্বীকার করে এবং এই মতবাদের ভিত্তিতে অনেকগুলো সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। তাওবাদীরা পরে আলকেমি ও এলিক্সির বা অমরত্ব লাভের মহৌষধ অনুসন্ধানের ওপর জোর দেন। এ ব্যাপারে তারা কনফিউশিয়াসবাদের চেয়ে বেশি ভাবাবেগের পরিচয় দেন। তাওবাদ বরাবরই গোপন সংঘ-সমিতির সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে চীনদেশে ১ হাজার ৫০০-এর বেশি তাও মন্দির রয়েছে।

**তাও-শু আন** চীনা পণ্ডিত। তাঁর জন্ম ৫৯৫ ও মৃত্যু ৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি লু সুং নামে চীনা বৌদ্ধধর্মের একটি নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। অতিমাত্রিক মরমিবাদের বিরুদ্ধে এটি ছিল একটি নতুন প্রতিক্রিয়া। ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর *হিউ কাও সেং চুয়ান* গ্রন্থে তিনি ৫১৯ থেকে ৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জীবনালেখ্য লিপিবদ্ধ করেন।

**তাও-শেং** কুমারজীবের সবচেয়ে বিখ্যাত শিষ্য। জীবনকাল খ্রিষ্টাব্দ ৩৬০-৪৩৪। চীনের লুসান নগরে তিনি প্রজ্ঞাসূত্র ও নির্বাণসূত্রের অধ্যাপনা করতেন। বৌদ্ধতত্ত্বের বিপ্লবী ব্যাখ্যা তাঁকে একই সঙ্গে বিখ্যাত ও বিতর্কিত করে তোলে। তাঁকে নির্বাসিতও হতে হয়। তাঁর মতে, শূন্যতা ও বুদ্ধপ্রকৃতির মধ্যে কোনো তফাত নেই। দিব্যজ্ঞান অকস্মাৎ সম্পূর্ণতা লাভ করে। আর তার জন্য কোনো পবিত্রভূমির প্রয়োজন হয় না। তাও-শেংয়ের মতে, সব প্রাণেই বুদ্ধ-প্রকৃতি নিহিত রয়েছে। তাঁর সাহসী চিন্তাধারা পরবর্তীকালে চান বা জেন মতবাদকে সমৃদ্ধ করে।

**তাকওয়া** ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং পরকালের শাস্তির ভয়ে

যাবতীয় অসদাচরণ থেকে বিরত থাকা বা এ ব্যাপারে আত্মসংযম পালনেরই নাম তাকওয়া। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন। ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রকার ইচ্ছাই সে করতে পারে। তবে যদি অন্যায় করার সময় তার বিবেক তাকে বাধা দেয় এবং তাকে ন্যায়পথে পরিচালিত করে, তবে সেটাই হলো তার তাকওয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে একজন লোক যদি অবৈধভাবে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির সকল সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর বিধিবহির্ভূত কাজ মনে করে তা থেকে বিরত থাকে, তবে তাকে তাকওয়া বলা হবে। পবিত্র কোরআনে এই তাকওয়া বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

**তাকিয়া** সতর্কতা বা গোপনীয়তা অবলম্বন। প্রয়োজনের সময় ইমান গোপন করা। বিধর্মীদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন এবং প্রাণরক্ষার জন্য নিষিদ্ধ খাদ্য আহারের অনুমতি প্রদানের মধ্যে এর প্রমাণ রয়েছে। যদি কেউ বাধ্য হয়ে ইমানের কথা অস্বীকার করে কিংবা শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য তার অন্তরে ইমান গোপন করে রাখে, তবে তা দোষের হবে না। আল্লাহ তাঁর বান্দার অন্তরের বিশ্বাস অনুসারেই তাকে গ্রহণ করে থাকেন। আল্লাহর পৃথিবী বিস্তৃত, এখানে নারী, শিশু, আতুর এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থদের জন্য তাকিয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে অত্যাচার সহ্যসীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত কোনো স্বাধীন ও স্বাবলম্বী ব্যক্তির পক্ষে তাকিয়ার সুযোগ গ্রহণ কিংবা হিজরতে বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত হবে না। শিয়া সম্প্রদায়ের কাছে তাকিয়ার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। দ্বাদশ ইমামপন্থীরা তাদের ইমামদের দৃঢ়তার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা সত্ত্বেও প্রথম তিন খলিফার আমলে হজরত আলী (রা.)-এর আচরণ এবং ইমাম মাহদির আত্মগোপনকে তাকিয়ার বিশেষ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে ইসমাইলি সম্প্রদায়ের মতে, যিনি তাঁর অধীনে ৪০ জন লোক থাকা সত্ত্বেও আপন দাবি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন না, তিনি ইমাম নন।

ইমান হৃদয়, মুখ এবং হাত দ্বারা প্রকাশ করতে হয়। তবে কী ধরনের বা কতখানি বিপদে পড়লে কিংবা বিপদাশঙ্কার মুখে আল্লাহকে যা সন্তুষ্ট করে তা করার আদেশ এবং আল্লাহকে যা অসন্তুষ্ট করে তা না করার নিষেধাজ্ঞা বাতিল বা শিথিল হতে পারে এই বিষয়টির ওপর বহু যুক্তিতর্ক-সহকারে একটি সম্ভাব্য বিধি প্রণীত হয়েছে। যদি কেউ নিশ্চিত হয় কিংবা মনে করে যে, তাঁর নিজের ওপর কিংবা সম্পদ ও সহধর্মীদের ওপর বিপদ বা ক্ষতি নেমে আসবে, তবে তার হাত ও জিহ্বা দ্বারা ইমান প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থেকে সে মুক্ত হবে। অবশ্য বাধ্য হয়ে মিথ্যা বলা আসলে মিথ্যা কি না, বাধ্য হয়ে ইমান অস্বীকার করা আসলে ইমানের অস্বীকৃতি কি না—এ ধরনের প্রশ্ন আত্মগোপনকারীর তরফে উত্থাপন করার কথা নয়। কারণ তখন এই মিথ্যা বা অস্বীকৃতির ফলে কী নষ্ট বা ক্ষতি হতে পারে, সে সম্পর্কে খুব নিশ্চিত ধারণা তার থাকে না।

**তাজউদ্দিন কুরাইশি** বিশিষ্ট আলেম, সোহরাওয়ার্দি তরিকার সুফি সাধক। তাঁর জন্ম ইয়েমেনে। তাঁর পিতা কিয়ামউদ্দিন ছিলেন একজন সুফি দরবেশ। ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে হজরত শাহজালাল (র.)-এর সঙ্গী হিসেবে তিনি তরফের রাজা আচক নারায়ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সিলেট বিজয়ের পর তিনি প্রথমে কাজি এবং পরে দেওয়ান পদে নিয়োগ লাভ করেন। তাঁকে দিনারপুর সীমান্ত চৌকির প্রশাসনিক দায়িত্বে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি একটি খানকাহ প্রতিষ্ঠা এবং মসজিদ নির্মাণ ও পুকুর খনন করেন। একজন আলেম ও সোহরাওয়ার্দি তরিকার সুফি সাধক হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**তাজিয়া** আরবি শব্দটির সাধারণ অর্থ শোক প্রকাশ। শিয়া সম্প্রদায় মহররম মাসের প্রথম ১০ দিন কারবালার ঘটনা উপলক্ষে শোক পালন করে এবং আশুরা বা দশম দিনে যেদিন ইমাম হুসেন (রা.) শাহাদাত বরণ করেন, তাঁর কবরের প্রতিকৃতি নিয়ে মিছিল করে। ইমাম হুসেনের কবরের এই প্রতিকৃতির নামই হলো তাজিয়া। পবিত্র কোরআনের কোথাও এই শব্দটি পাওয়া যায় না। তবে মৃত ব্যক্তির বিয়োগবিধুর আত্মীয়বর্গের সঙ্গে

সমবেদনা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে এই শব্দটি পাওয়া যায়। শিয়াদের মধ্যে এই তাজিয়া শব্দ দ্বারা প্রথমত শাহাদাতপ্রাপ্ত ইমামদের জন্য শোক প্রকাশ বোঝায় আর বিশেষত ইমাম হুসেন (রা.)-এর জন্য শোক প্রকাশকে বোঝায়। শিয়া মতবাদের উদ্ভব ইরাকে ও ইরানে হলেও সেখানে মহররমের শোকমিছিল তাজিয়া বহন করা হয় না। বাংলাদেশে মোগল আমলে বিশেষত শাহ সুজা (১৬৩৯-৫৯) বাংলার সুবেদার থাকাকালে এই অঞ্চলে শিয়াদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ঢাকার নায়েব-নাজিমদের অধিকাংশই ছিলেন শিয়া। সে সময় হিজরি ১০৫২ সনে (১৬৪২ খ্রি.) সৈয়দ মীর মুরাদ ঢাকায় হোসেনি দালান নির্মাণ করেন। একই সময়ে দেশের অন্যান্য স্থানেও যেমন মানিকগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, অষ্টগ্রাম, সৈয়দপুর, সিলেট ইত্যাদি স্থানে ইমামবাড়া নির্মিত হয়। সাধারণ তাজিয়া মিছিলে বহন করা তাজিয়া কাঠ, কাগজ, সোনা, রুপা, মারবেল পাথর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয়। তবে ঢাকার হোসেনি দালানের তাজিয়াটি কাঠ ও রুপার আবরণ দিয়ে তৈরি করা হয়। তাজিয়া মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা বুক চাপড়ে ও জিঞ্জির দিয়ে পিঠের ওপর আঘাত করে নিজেদের রক্তাক্ত করে। কয়েকজন লোক লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে ও তরবারি চালাতে চালাতে অগ্রসর হয়। ওই সময় দুটি শিবিকাসহ অশ্বারোহী সৈন্যের সাজে কয়েকজন লোক মাতম করতে করতে অগ্রসর হয় এবং তার পেছনে একদল গায়ক মর্সিয়া গাইতে থাকে। তারপর থাকে হুসেন (রা.)-এর সমাধির প্রতিকৃতি। এভাবে মিছিলটি অগ্রসর হয় এবং পূর্বনির্ধারিত স্থানে গিয়ে তা শেষ হয়।

**তানাসুখ** আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি, পুনর্জন্ম। যেসব মুসলিম গ্রন্থকার এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা এই বিশ্বাসকে হিন্দুদের ওপর আরোপ করেন, যদিও প্রাচীন গ্রিসে পিথাগোরিয়ানরাও এমন ধারণা পোষণ করতেন। আল-বিরুনি তাঁর *কিতাব আল-হিন্দ*-এ বলেছেন, আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস যেমন ইসলাম ধর্মের মূলনীতি, সেরূপ পুনর্জন্মে বিশ্বাসও হিন্দুধর্মের মূলনীতি। তিনি বাসুদেব ও পতঞ্জলির রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্লেটো ও সুফিদের মতবাদের সঙ্গে তাঁদের মতবাদের তুলনা করেন এবং হিন্দু দার্শনিকদের এই মতবাদ লিপিবদ্ধ করেন যে, জগতের বহুবিধ বস্তুসম্ভার উপভোগ ও উপলব্ধির জন্য একটিমাত্র আয়ুষ্কাল যথেষ্ট নয়।

ফারসি ইতিহাসবিদ শাহরাস্তানির (১০৮৬-১১৫৩ খ্রি.) মতে, পুনর্জন্ম শব্দটির দ্বারা আসলে ক্রমিক জীবন ও জগতের পুনর্জন্ম বোঝায়। তিনি বলেছেন, সব জাতির মধ্যে হিন্দুরাই বিশেষভাবে পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। তবে অন্যরাও নানাভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও এই একই নিয়ম কার্যকর আছে। নির্দিষ্টসংখ্যক আবর্তনের পর জ্যোতিষ্করাজি একই স্থানে প্রত্যাবর্তন করে এবং বিশ্ব পুনর্জন্ম লাভ করে। কারও কারও মতে, এই আবর্তনকাল ৩০ হাজার বছর; আবার কারও কারও মতে, ৩ লাখ ৬০ হাজার বছর। গ্রিক জ্যোতির্বিদেরা একে 'মহাবছর' বলে অভিহিত করেছেন। অন্য মতে, 'তানাসুখ'-এর অর্থ এই নশ্বর জগতের সকল জীবে ঐশী আত্মার পরিব্যাপ্তি ও বিচরণ। শাহরাস্তানি বলেছেন, শিয়াদের মধ্যে যারা চরমপন্থী তারা তানাসুখে বিশ্বাস করে এবং কোনো কোনো মানবদেহে ঐশী আত্মা বা আত্মার অংশবিশেষ অবতরণ বা তার মানবদেহ গ্রহণের মতবাদ স্বীকার করে। বহু জাতির এই প্রকার তানাসুখ বিশ্বাস আছে। হুজুবনিরি এক শ্রেণীর সুফির কথা বলেছেন (তিনি এঁদের হুলুলি' নামে অভিহিত করেছেন), যাঁরা মনে করেন যে আত্মা একটিমাত্র, এবং তা শাশ্বত ও ঐশ্বরিক। আর এই আত্মাই বিভিন্ন দেহে পরিব্যাপ্ত হয়। সাধারণত ভারতীয় হিন্দু এবং তিব্বত ও চীনের অধিবাসীরা এই মত পোষণ করেন। কারমাতিয়া ও ইসমাইলি সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেউ কেউ এই মত পোষণ করেন। পুনর্জন্মের চারটি স্তর: নাসখ (নিশ্চিহ্ন হওয়া), মাসখ (পরিবর্তিত হওয়া), ফাসখ (পৃথক হওয়া) ও রাসখ (দৃঢ় হওয়া)। আহমাদ ইবনে হনাইত ও তাঁর শিষ্যদের প্রচারিত মতানুসারে, আল্লাহ প্রথমে বেহেশতে এক প্রকার জীব সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। পরে তাদের অবাধ্যতায় রুষ্ট হয়ে তিনি তাদের অপরাধের তারতম্যানুসারে কাউকে মানুষ আবার কাউকে পশুর আকারে এই পৃথিবীতে

পাঠান। পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা এক দেহ থেকে অন্য দেহে আবর্তিত হতে থাকে।

নুসায়রিরা বিশ্বাস করে যে, তাদের ধর্মের পাপীরা ইহুদি, সুন্নি মুসলমান ও খ্রিষ্টানরূপে জগতে প্রত্যাবর্তন করবে। যারা আলীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, এমন অবিশ্বাসীরা উট, খচ্চর, গাধা, কুকুর কিংবা এই প্রকার কোনো জীবরূপে পৃথিবীতে পুনর্জন্ম নেবে। নুসায়রিদের মতে, এই পুনর্জন্মের সাতটি সোপান রয়েছে। দুরুজরা তাদের কিছু জনপ্রিয় ধর্মবিশ্বাস নুসায়রিদের কাছ থেকে গ্রহণ করে । তারা বিশ্বাস করে যে আলীর শত্রুদের আত্মা কুকুর, বানর ও শূকরের দেহে জন্মগ্রহণ করবে। কুর্দ ও ইয়াজিদিরা মানব ও পশুর আকৃতিতে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে এবং তারা এ-ও বিশ্বাস করে যে ৭২ বছর অন্তর পুনর্জন্ম ঘটে। সায়্যিদ শারিফ জুরজানির মতে, এই দেহান্তর গ্রহণে কোনো বিরাম বা বিরতি থাকে না; বরং দেহের প্রতি প্রবল আকর্ষণের কারণেই আত্মা সেখানে প্রবেশ করে। সুন্নি মতে, তানাসুখ বা পূর্বজন্মে কিংবা পুনর্জন্মে বিশ্বাস ইসলামবহির্ভূত।

**তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম** বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিক শাখা। এতে মন্ত্র, যন্ত্র, মণ্ডল, মুদ্রা, ধারণি ইত্যাদির চর্চা করা হয়। এর সঙ্গে আরও থাকে মৈথুন, যোগ, দেবালয়, পূজা ও আচার-অনুষ্ঠান, জাদুবিদ্যা, সম্মোহন, প্রেতালাপ, জ্যোতিষ, প্রতীকীত্ব, ধাতুবিদ্যা, প্রকৃত অদ্বৈতের মধ্যে আপাত-দ্বৈতের ধারণা, নারীসঙ্গীর সহযোগিতা, নারী-পুরুষের মিলনে মহাসুখ ইত্যাদি বিষয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের দুটি প্রাচীন গ্রন্থ হচ্ছে *গুহ্যসমাজতন্ত্র* এবং *মঞ্জুশ্রীমূলকল্প*। প্রথমটিতে যোগ ও অনুত্তরযোগ (তন্ত্রমতে ধ্যান) এবং দ্বিতীয়টিতে মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। এর অতিরিক্ত *মঞ্জুশ্রীমূলকল্প*-এ আছে তান্ত্রিক দেবালয়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর চিত্রাঙ্কন-সম্পর্কিত নির্দেশ।

**তাবলিগ** আরবি অর্থ পৌছে দেওয়া, জ্ঞাত করানো বা প্রচার করা। ইসলামের বার্তা মানুষের কাছে পৌছে দেওয়াকে বলে তাবলিগ। নিজে সৎকর্ম করা ও অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং অন্যকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করাই তাবলিগের উদ্দেশ্য। পবিত্র কোরআনের সুরা আল-ই-ইমরানের ১০৪ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা লোককে ভালোর দিকে ডাকবে, সৎকর্মের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকর্মের ব্যাপারে নিষেধ করবে। আর এসব লোকই হবে সফলকাম।' তাবলিগের কাজে যখন একাধিক ব্যক্তি একত্র হয় তখন সেই সমাবেশকে বলা হয় তাবলিগ জামাত। মওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াসের (১৮৮৫-১৯৪৪) প্রচেষ্টায় ১৯২০ সালে দিল্লিতে তাবলিগ জামাতের সূচনা। বর্তমানে এটি একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন বা সংগঠন। ১৯৫০-এর দশকে মওলানা আবদুল আজিজের প্রচেষ্টায় ঢাকা শহর ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই জামাতের কাজ শুরু হয়। তাবলিগ জামাতের কার্যক্রম ছয়টি উসুল বা মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় : কলেমা (ইমান), সালাত (নামাজ), ইলম (জ্ঞানচর্চা), জিকর, ইকরামুল মুসলিমিন (মুসলমানদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য) ও ইখলাসে নিয়ত (সংকল্পের একনিষ্ঠতা)। তাবলিগ জামাতে অংশগ্রহণের ফলে একজন বিশ্বাসীর ধর্মের মহান কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা, পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব ও দায়িত্ব পালনের সাহস বাড়ে এবং সামষ্টিক জীবনযাপন-প্রণালি এবং ইসলামি জীবনধারা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়।

মসজিদকে কেন্দ্র করে তাবলিগ জামাতের কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং এই মসজিদকে বলা হয় মারকাজ। বাংলাদেশে তাবলিগ জামাতের প্রধান মারকাজ বা কেন্দ্র ঢাকার কাকরাইল মসজিদে অবস্থিত। দেশের সর্বত্র স্থানীয় একটি মসজিদকে কেন্দ্র করে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নারী-পুরুষনির্বিশেষে সকলে তাবলিগে অংশগ্রহণ করতে পারেন। মহিলাদের জন্য পৃথক কোনো জামাত নেই। তাবলিগের কোনো অঙ্গসংগঠনও নেই। তাবলিগিরা জিকর, বয়ান ও অন্যান্য কর্মতৎপরতা পরিচালনা-বিষয়ক পরামর্শের জন্য ইজতেমায় মিলিত হয়। প্রতিবছর ঢাকার টঙ্গীতে যে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরাসহ বাংলাদেশের লাখ লাখ মুসলমান অংশগ্রহণ করে। এটি 'বিশ্ব-ইজতেমা' নামে পরিচিত। ধারণা করা হয়, হজের

পর এই বিশ্ব ইজতেমায়ই পৃথিবীর সর্বাধিক-সংখ্যক মুসলমানের সমাবেশ ঘটে। এ ছাড়া স্থানীয়ভাবেও কোথাও কোথাও সাপ্তাহিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো অনুষ্ঠিত হয় সাধারণত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে। যেকোনো একটি অঞ্চলের কয়েকজন লোকের সমন্বয়ে স্থানীয়ভাবে তাবলিগের মোকামি জামাত গঠন করা যায়। সপ্তাহে অন্তত এক দিন তাবলিগিরা নিজ এলাকায় অথবা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গিয়ে তাবলিগে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানান। তাবলিগ জামাতে জিম্মাদারির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। জিম্মাদারকে ইসলাম-নির্দেশিত নেতৃত্বের গুণাবলিসহ বিশেষভাবে ধৈর্যশীল, বিনয়ী, মিষ্টভাষী, উচ্চ মনোবলসম্পন্ন ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী হতে হয়। তাবলিগ সংগঠনের সর্বস্তরে জিম্মাদারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য শুরা বা পরামর্শ সভা গঠিত হয়। জামাতের আমির বা প্রধান তাঁর শুরা-সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে তাবলিগের সব কাজ পরিচালনা করেন।

**তাবারি** আরব ঐতিহাসিক। আল-তাবারি নামে সুপরিচিত। পুরো নাম তাবারি আবু জাফার মোহাম্মাদ ইবনে জারির। তিনি আনুমানিক ৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তাবারিস্তানের আবুল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি সমগ্র পবিত্র কোরআন মুখস্থ করে ফেলেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি বাগদাদে ইমাম ইবনে হাম্বলের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে যান। সেখানে কিছু দিন থাকার পর মিসর যাত্রা করেন। প্রথম অবস্থায় আরব ও মুসলিম ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের কাজে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে তিনি অধ্যাপনা করেন। মিসর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর প্রায় ১০ বছর তিনি শাফি মজহাবের অনুসারী ছিলেন। পরে তিনি নিজেই একটি মজহাব প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও কিছুকালের মধ্যেই সে মজহাবের বিলুপ্তি ঘটে। তাবারি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.)-কে হাদিসবিদ হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও ফিকাহের ব্যাপারে তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করেননি। এ কারণে হাম্বলিদের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

**তাবেয়ি** যারা মহানবী (সা.)-এর সাহাবিদের পরবর্তী যুগের লোক অথবা যাঁরা তাঁর সমসাময়িক কিন্তু তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন না। যদিও তাঁর কোনো সাহাবির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। যাঁরা তাবেয়িদের কাকেও জানতেন তাঁদের বলা হয় তাবি তাবেইন বা দ্বিতীয় পর্যায়ের লোক। হাদিসে শব্দটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। কোনো হাদিসের মূল বর্ণনাকারী একজন প্রাথমিক যুগের সাহাবি বা একজন গণ্যমান্য প্রসিদ্ধ তাবেয়ির ওপর হাদিসটির গুরুত্ব নির্ভর করে।

**তায়াম্মুম** অজুর বিকল্প। পানির পরিবর্তে পরিষ্কার মাটি ব্যবহারে পবিত্রতা লাভ। কোনো কারণে যদি অজুর জন্য পানি না পাওয়া যায়, তখন পরিষ্কার মাটির সাহায্যে বিশেষ নিয়মে পবিত্রতা অর্জন করে অর্থাৎ বিকল্প অজু সমাধা করে নামাজ আদায় করা হয়। মাটির অভাবে বালি, পাথর, ইট প্রভৃতির সাহায্যেও তায়াম্মুম করা যেতে পারে।

**তারানাথ** লামা তারানাথ তিব্বতীয় ঐতিহাসিক। তাঁর জীবনকাল ১৫৭৩-১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দ। তিব্বতি ভাষায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনা করে তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

**তালাক** আরবি শব্দটির অর্থ বন্ধনমোচন। ইসলামি পরিভাষায় বিধিসম্মত বিয়ে দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন ছিন্ন হওয়ার নাম তালাক। অবস্থাভেদে স্বামী ও স্ত্রী উভয় পক্ষ থেকে তালাক দ্বারা বিবাহবন্ধন ছিন্ন হতে পারে। তালাক শরিয়তে অনুমোদিত হলেও এটি বৈধ কাজগুলোর মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত বলে হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে। তালাক প্রধানত তিন প্রকার : (১) আহসান বা সর্বোত্তম, (২) হাসান বা উত্তম; (৩) বিদ'ই বা শর'আর নিয়ম বিরুদ্ধ। যে তুহুরে (দুই ঋতুর মধ্যবর্তী পবিত্রতার কাল) সহবাস হয়নি এরূপ তুহুরে স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে তার ইদ্দতকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে আর স্পর্শ না করে ত্যাগ করলে যে তালাক হয় তাকে তালাকে আহসান বলে। এরূপ তালাকের পর তালাক দেওয়া স্ত্রীকে পুনর্বিবাহ করে গ্রহণ করা যায়। যে স্ত্রীর সঙ্গে আগে যৌনমিলন হয়েছে এরূপ স্ত্রীকে ক্রমান্বয়ে তিন তুহুরে বিনা সহবাসে তিন তালাক

দিয়ে ত্যাগ করাকে তালাকে হাসান বা তালাকে সুন্নত বলে। এভাবে পর পর তিন তুহুরে প্রতিবার একবার করে তালাক দিলে প্রত্যেক তালাকের পর প্রায় এক মাস সময়ের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের কারণ দূর হতে পারে এবং সে অবস্থায় স্ত্রীকে পুনর্গ্রহণ করা চলে। কিন্তু তিন তালাক দেওয়া হয়ে গেলে স্ত্রীকে আর গ্রহণ করা যায় না। সে পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। যে স্ত্রীর নাবালকত্ব, বার্ধক্য, গর্ভধারণ বা অন্য কোনো কারণবশত ঋতু হয় না, তাকে সুন্নত অনুযায়ী তালাক দিতে হলে এক মাস পর তালাক দিতে হয়। স্ত্রীকে একই তুহুরে দুই বা তিন তালাক দিলে তাকে বিদ'ই তালাক বলে। একসঙ্গে একাধিক তালাক দেওয়া শরিয়তসম্মত নয়। এতে তালাক সাব্যস্ত হবে, কিন্তু তালাক প্রদানকারী গুনাহগার হবে। বয়ঃপ্রাপ্ত ও সজ্ঞান স্বামী তার জাগ্রত অবস্থায়ই কেবল তালাক দেওয়ার অধিকারী। অপ্রাপ্তবয়স্ক, উন্মাদ, নিদ্রিত বা চেতনাহীন স্বামী তালাক দিলে তা তালাক বলে গণ্য হবে না। যে স্ত্রী বিয়ের সময় বা পরে স্বামীর কাছ থেকে তালাক দেওয়ার ভারপ্রাপ্ত হয়েছে, সে (স্ত্রী) নিজেই নিজেকে তালাক দিয়ে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করতে পারে। এ ধরনের তালাককে তালাকে তফবিজ বা ভারার্পিত তালাক বলা হয়।

**তালুত** বনি ইসরাইলি জাতির বাদশাহ, পবিত্র কোরআনে তাঁর উল্লেখ আছে। হজরত মুসার (আ.) পর বনি ইসরাইল তাঁদের নবীর কাছে এই আবেদন করেন যে তিনি যেন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, যাতে আল্লাহ তাঁদের জন্য একজন বাদশাহ পাঠান। উত্তরে নবী তাঁদের বলেন, 'তোমরা তো তাঁর অনুগত হবে না।' এর পরও তাদের পীড়াপীড়িতে মুসা (আ.) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ বনি ইসরাইলিদের জন্য তালুত নামক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক ব্যক্তিকে পাঠান। নবীর পবিত্র কোরআনে তাঁর দৈহিক শক্তি এবং জ্ঞানের প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তারা ঠিকই তাঁর অনুগত হতে অস্বীকৃতি জানায়। হজরত মুসা (আ.) তখন তাঁদের বলেন, "তালুতের বাদশাহি লাভের প্রমাণ এই যে 'তাবুতে সকিনা' অর্থাৎ পবিত্র বস্তুগুলো, যা কিনা বর্তমানে শত্রুর কাছে আছে, তা অচিরেই তালুতের দ্বারে উপস্থিত হবে।" এই প্রমাণ লাভের পর বনি ইসরাইলিরা তালুতের আনুগত্য স্বীকার করে। অতঃপর তাঁর নেতৃত্বে জালুতের (বাইবেলের গোলাইয়াথ) বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার সময় তালুত তাঁর লোকজনকে নদীর পানি এক চুমুকের বেশি পান না করার নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা সে আদেশ না মেনে বেশি পানি পান করলে তাদের পেট ফুলে যায়। রণাঙ্গনে তালুত ঘোষণা করেন : জালুতকে যে হত্যা করতে পারবে, সে রাজত্বের এক-তৃতীয়াংশ লাভ করবে এবং বাদশাহ হিসেবে তাঁর উত্তরাধিকারী হবে। হজরত দাউদ (আ.) জালুতকে হত্যা করে এই পুরস্কার লাভ করেন।

**তালেবান** আরবি ভাষায় এর অর্থ ছাত্র। ফারসি ভাষায় তালেব শব্দটির দ্বারা ধর্মবিষয়ক শিক্ষার্থীকে বোঝায়। বর্তমানে তালেবান শব্দটির দ্বারা বিশেষভাবে আফগানিস্তানে এবং পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলে সক্রিয় একটি জঙ্গিবাদী ইসলামি রাজনৈতিক শক্তি বা আন্দোলনকে বোঝানো হয়। ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে আফগানিস্তানে অবস্থানকারী সোভিয়েত বাহিনী ও সোভিয়েতের সমর্থিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদিনদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কট্টর ধর্মীয় গোষ্ঠীটি এই নামে পরিচিতি লাভ করে। কালক্রমে এটি একটি আন্তর্জাতিক জঙ্গিবাদী আন্দোলনের রূপ নেয়। আফগানিস্তানের অন্যান্য এলাকায় প্রভাব কায়েমের পর তালেবানরা ১৯৯৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কাবুল দখল করে এবং ২০০১ সাল পর্যন্ত সেখানকার শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। পাকিস্তান, সৌদি আরবসহ কয়েকটি দেশের কূটনৈতিক স্বীকৃতি লাভ করে তারা। তালেবানরা এ সময় দেশে শরিয়া আইন চালু করে, মেয়েদের লেখাপড়া ও গৃহের বাইরে কাজ নিষিদ্ধ করে দেয়। ২০০১ সালে তারা বামিয়ানের বিশাল বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করে বিশ্বব্যাপী নিন্দা-সমালোচনার সম্মুখীন হয়। আফগানিস্তানের দখল নিয়ে এ সময় মুজাহিদিনদের অন্যান্য অংশের সঙ্গে তালেবানদের লড়াই চলতে থাকে। যদিও তালেবানরাই তখন

দেশটির ৮০ ভাগ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছিল। ওসামা বিন লাদেন তালেবান আন্দোলনের প্রসারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে সোভিয়েত-সমর্থিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম দিকে তালেবানদের সহায়তা দেয়। তালেবানদের উদ্ভবের পেছনেও পাকিস্তান ও সৌদি আরব তো বটেই, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেরও পৃষ্ঠপোষকতা বা সহায়তা ছিল বলে ধারণা করা হয়। তবে আল-কায়েদা জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে তালেবানদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মার্কিন ও অন্যান্য পশ্চিমা স্থাপনায় ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠীর আক্রমণ, বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক টুইন টাওয়ারে বিমান হামলার ঘটনার পর তালেবানদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্রদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। এ অবস্থায় সৌদি আরব তালেবানদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে এবং আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পাকিস্তানও তাদের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে কাবুলে তালেবান সরকারের পতন ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা শক্তির প্রকাশ্য সমর্থন ও সহায়তায় হামিদ কারজাই আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন। অতঃপর ২০১১ সালের ২ মে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে মার্কিন কমান্ডো সেনাদের হামলায় লাদেন নিহত হলে এবং পাকিস্তানে অবস্থিত বিভিন্ন তালেবান ঘাঁটিতে মার্কিনিদের উপর্যুপরি ড্রোন বিমান হামলায় তালেবানরা হীনবল হয়ে পড়ে। তবে তালেবানদের গোঁড়া ইসলামপন্থী জেহাদি দর্শন বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামি জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করছে।

**তাহাজ্জুদ** রাতের শেষার্ধে যে নামাজ পড়া হয়। পবিত্র কোরআনের সুরা বনি ইসরাইল-এর ৭৯ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়বে। তোমার জন্য এ অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসনীয় স্থানে উন্নীত করবেন।'

**তাহারাত** আরবি শব্দটির অর্থ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা। ইসলামে এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, পবিত্রতা ইমানের অর্ধাংশ। পবিত্রতা বলতে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ পবিত্রতার কথাই বলা হয়েছে। শারীরিক পবিত্রতার ওপর ইসলাম ধর্মে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ক্রোধ, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা ইত্যাদি থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখাও মুসলমানদের কর্তব্য। নামাজের জন্য দেহ, পোশাক এবং স্থানের পবিত্রতা অপরিহার্য। নামাজের জন্য অজুর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। পবিত্রতা অর্জনের প্রধান উপাদান পানি, কিন্তু পানি দুষ্প্রাপ্য হলে অথবা পানি ব্যবহারে শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে বিশুদ্ধ মাটি দ্বারা নির্ধারিত নিয়মে তায়াম্মুম করতে হয়। স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক মিলন, স্বপ্নদোষ কিংবা নারীদের মাসিক ও সন্তান জন্মের পর রক্তস্রাব বন্ধ হলে নির্ধারিত নিয়মে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়।

**তির উৎসর্গ** দেবতার উদ্দেশে তীর উৎসর্গ করা। মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে এটা দেখা যায়। এতে একটি জ্বলন্ত তিরকে সূর্যের দিকে নিক্ষেপ করা হয় দেবতার জন্য উৎসর্গরূপে।

**তিরমিজি** বিখ্যাত হাদিসবেত্তা ও চরিতকার। আসল নাম আবু ঈসা মোহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন, কিন্তু অসাধারণ মেধাবলে ইমাম হাম্বল, ইমাম বুখারি ও ইমাম আবু দাউদের কাছে শিক্ষা লাভ করে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। হাদিস সংগ্রহের জন্য তিনি ইরাক, হেজাজ, খুরাসান প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় দুটি গ্রন্থ: *হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী* ও *হাদিসের সংকলন*। তাঁর লেখা রাসুল (সা.) জীবনীটিকে শ্রেষ্ঠ ও বিশুদ্ধ চরিতগ্রন্থরূপে গণ্য করা হয়। তাঁর সংকলিত হাদিসগুলো বিশুদ্ধ হাদিসের সমপর্যায়ের বলে গৃহীত হয়। হাদিস সম্পর্কে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে, তাঁর সূক্ষ্ম ও গভীর বিশ্লেষণ অনেক ক্ষেত্রে তা নিরসনে সহায়ক হয়। আরবে প্রচলিত বংশাবলি পরিচিতি ও চরিতাভিধান রচনায়ও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

**তিলক** ললাট, বাহু ইত্যাদি দেহের বিভিন্ন স্থানে অঙ্কিত ছাপ। সম্প্রদায়ভেদে চন্দন, খড়িমাটি, মাটি বা ভস্ম দিয়ে এই তিলক আঁকা হয়। বৈদিক যুগে, বিশেষ করে যজ্ঞানুষ্ঠানে ললাটে হোমভস্মের টিকা

ধারণ করার প্রথা ছিল। দশম-একাদশ শতকে রচিত বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণ থেকে জানা যায় যে, ওই সময় থেকে শৈবাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে তিলক ধারণ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। চর্যাপদেও 'বাণচিহ্ন' নামে তিলক ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিলক ধারণের প্রথম অনুপ্রেরণা কোথা থেকে এসেছিল তা বলা কঠিন। তবে এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে শৈবাদি বিভিন্ন সম্প্রদায় যেসব ভঙ্গিতে তিলক ধারণ করে তার অনুপ্রেরণা এসেছে নিজ নিজ ইষ্ট দেব-দেবীর মূর্তিতে অঙ্কিত চিহ্ন থেকে। যেমন, শৈবদের ললাটে অঙ্কিত ত্রিপুণ্ড্র চিহ্ন শিবলিঙ্গ বা শিবের কপালে অঙ্কিত চিহ্নের অনুরূপ। আবার দক্ষিণ ভারতের বিষ্ণুমূর্তির ললাটে অঙ্কিত তিনটি ঊর্ধ্বরেখার সমন্বয়ে অঙ্কিত তিরুনামম বা শ্রীনমম নামক চিহ্নটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত তিলক চিহ্নের অনুরূপ। শক্তিদেবীর ললাটের ত্রিনয়নের নিচে যে রক্তবর্ণ বিন্দুচিহ্ন দেখা যায়, তার অনুকরণে শাক্তরা কপালে লাল বিন্দুচিহ্ন ধারণ করে। তিলকের ব্যবহার অবশ্য সবার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর এবং গাণপত্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এটি একটি নিয়মিত আচার। স্নানের পর বৈষ্ণবরা বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম স্মরণ করে দেহের দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ করেন। কপালে কেশব, উদরে নারায়ণ, বুকে মাধব, কণ্ঠে গোবিন্দ, দক্ষিণ পাশে বিষ্ণু, ডান বাহুতে মধুসূদন, ডান কাঁধে ত্রিবিক্রম, বাঁ পাশে বামন, বাঁ বাহুতে শ্রীধর, বাঁ কাঁধে হৃষীকেশ, পিঠে পদ্মনাভ এবং কটিতে দামোদর। অবশ্য সম্প্রদায়ভেদে বৈষ্ণবদের মধ্যেও তিলকচিহ্ন ব্যবহারের রকমফের আছে। অন্যদিকে শৈবরা কপালে যে তিলকচিহ্ন ধারণ করে তার নাম ত্রিপুণ্ড্র। এটি তিনটি সমান্তরাল রেখার সাহায্যে আঁকা হয়; কখনো তা হয় বাঁকা আবার কখনো খণ্ডচন্দ্রের মতো। শৈব তিলকচিহ্নের অন্যান্য রূপ হচ্ছে সবিন্দু অর্ধচন্দ্রাকৃতি, বিল্বপত্রাকৃতি, প্রস্তরগুটিকাকৃতি ইত্যাদি। ত্রিপুণ্ড্রধারণ শৈবদের জন্য অবশ্যকরণীয়। শাক্ত তিলকচিহ্ন শৈবচিহ্নের প্রায় অনুরূপ। দক্ষিণাচারী, বামাচারী, মহাকালী, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি উপসম্প্রদায়ভেদে শাক্ত তিলকচিহ্নেও প্রকারভেদ হয়ে থাকে। সৌর সম্প্রদায়ের তিলকচিহ্ন দুটি স্থূল সরলরেখার সমন্বয়ে অঙ্কিত হয়। এর দ্বিতীয়টির দৈর্ঘ্য প্রথমটির এক-চতুর্থাংশের কম এবং এটি দুই ভ্রুর মধ্যস্থলে প্রথমটির নিচে কেন্দ্র বরাবর সংযুক্ত থাকে। গাণপত্যদের তিলকচিহ্ন ইংরেজি 'ইউ' অক্ষরের মতো এবং তার মধ্যস্থলে প্রদীপশিখার মতো একটি রেখা থাকে। তিলক রচনার জন্য কাঠ, ধাতুমুদ্রা বা গাঁদা ফুল ব্যবহার করা হয়। বর্ণনির্বিশেষে সব হিন্দুই তিলক ধারণ করতে পারে, তবে পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছু স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে। যেমন ব্রাহ্মণ ঊর্ধ্বপুণ্ড্র, ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড্র, বৈশ্য অর্ধচন্দ্রাকৃতি এবং শূদ্র বর্তুলাকার তিলক ধারণ করবে। লৌকিক দেবতার পূজার্চনায় তিলক ধারণের ক্ষেত্রে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়।

**তিলোত্তমা** হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী বিশ্বকর্মার সৃষ্ট এক অনিন্দ্যসুন্দরী নারী। স্বর্গ-মর্ত-পাতালের যাবতীয় সুন্দর ও সেরা জিনিসের সাহায্যে তিল তিল করে গড়ে তোলা হয় বলে তার নাম তিলোত্তমা। দেবতা, ঋষি ও যক্ষের প্রাণরক্ষার জন্য ব্রহ্মার নির্দেশে বিশ্বকর্মা এই তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেন। কাহিনিটি এ রকম: দৈত্যরাজ নিকুম্ভের দুই পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ ব্রহ্মার কাছে ত্রিলোক বিজয়ের জন্য অমরত্ব প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা তাদের সে বরদানে অস্বীকৃত হন। তবে তিনি সুন্দ ও উপসুন্দকে এটুকু আশ্বাস দেন যে যদি তারা একে অপরকে হত্যা না করে, তবে অন্য কেউ তাদের হত্যা করতে পারবে না। এই বর পাওয়ার পর সুন্দ-উপসুন্দ দেবতাদের পীড়ন শুরু করে। তখন দেবতা, ঋষি, যক্ষ সবাই মিলে ব্রহ্মার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা তখন সুন্দ ও উপসুন্দকে বধ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এই উদ্দেশ্যে বিশ্বকর্মাকে এক অপূর্ব সুন্দরী নারী সৃষ্টি করতে বলেন। তিলোত্তমার সৃষ্টির পরে ব্রহ্মা তাকে সুন্দ ও উপসুন্দের কাছে পাঠিয়ে দেন। তিলোত্তমা তাদের সামনে গিয়ে নৃত্য করতে থাকলে তার রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়ে দুই ভাই-ই তাঁকে অধিকার করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এতে দুজনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং

একে অপরকে হত্যা করে। তিলোত্তমার সাফল্যে সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে বর দেন।

**তীর্থঙ্কর** অর্থ যিনি তীর্থ করেন। জৈনরা তীর্থ বলতে সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা—এই চার ধরনের সংঘ প্রতিষ্ঠাকেই বুঝিয়ে থাকে। যিনি সাধনার দ্বারা জ্ঞান লাভের পর এই তীর্থ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন, তিনিই তীর্থঙ্কর। কেবল সংসার ত্যাগ করলেই তাঁকে তীর্থঙ্কর বলা যায় না। আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে তীর্থঙ্করত্ব অর্জন করতে হয়। জৈনশাস্ত্রে কালকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী। উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী আবার ছয় ভাগে বিভক্ত। এই ভাগকে বলা হয় 'অর'। প্রত্যেক উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণীর তৃতীয় ও চতুর্থ অর-এ ২৪ জন করে তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন এবং ধর্মের মূলবাণী প্রচার করেন। বর্তমান অবসর্পিণীর প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব ও শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর। মহাবীরকেই জৈনধর্মের প্রবর্তক গণ্য করা হয়।

**তুকারাম** মহারাষ্ট্রীয় সাধক ও কবি। জন্ম ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পরিবারে। সংসার ত্যাগ করে নির্জন সাধনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করেন এবং দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বিদ্যাভ্যাস ও শাস্ত্রচিন্তা করেন। অভঙ্গ সংগীত রচনা করে তিনি তা কীর্তনের সুরে গেয়ে বেড়াতেন। তাঁর মতে, সংসার বাসনা ও ঈশ্বরবাসনা পরস্পরবিরুদ্ধ, একই সঙ্গে দুটি চরিতার্থ করা সম্ভব নয়। সাধুসঙ্গই ঈশ্বরপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। ১৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

**তুফানে নুহ** মহাপ্লাবন। ইসলামি বিশ্বাস মতে, হজরত নুহ (আ.)-এর তুফান। নুহ (আ.) তাঁর জাতিকে সাড়ে নয় শ সৎপথ প্রদর্শন করার পরও যখন তারা সুপথে এল না, তখন আল্লাহ ওই জাতির ওপর গজবস্বরূপ এক ধ্বংসাত্মক বন্যা পাঠান। তাতে সেই অবিশ্বাসী জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই বন্যা বা তুফানের সময় আল্লাহ নুহ (আ.)-কে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে একটি নৌকা প্রস্তুত করে বিশ্বাসীর এবং প্রত্যেক জীবজন্তুর একটি করে জোড়া নিয়ে তাতে আরোহণ করার নির্দেশ দান করেন। চার পুত্রের মধ্যে সাম, হাম ও ইয়াফিস এই তিন পুত্র তাঁর সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করেন। অতঃপর আল্লাহর গজবরূপে বন্যা এসে সবাইকে ধ্বংস করে। পবিত্র কোরআনে এই নুহের প্লাবনের বিস্তারিত বিবরণ আছে। আধুনিক কালের পুরাতত্ত্ববিদেরা নৌকার চিহ্নের সন্ধান করে ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত সেই ঘটনার সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা করছেন। প্রাচীন ব্যাবিলন, গ্রিস, ভারত, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী জনগোষ্ঠী, রেড ইন্ডিয়ান প্রভৃতি দেশ ও জাতির উপকথায়ও এই মহাপ্লাবনের গল্প বিভিন্নরূপে প্রচলিত রয়েছে।

**তুব্বা** পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত আরবের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। পবিত্র কোরআনের ৫০ সুরা কাফ-এর ১২-১৪ আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওদের পূর্বেও অবিশ্বাস করেছিল নুহ সম্প্রদায়, রসবাসীরা ও সামুদ সম্প্রদায় এবং আদ, ফেরাউন ও লুত সম্প্রদায় এবং আইকাবাসীরা (শোয়াইব সম্প্রদায়) ও তুব্বা সম্প্রদায়। ওরা সকলেই রাসুলদের মিথ্যাবাদী বলেছিল। তাই ওদের ব্যাপারে আমার ভীতিপ্রদর্শন সত্য হয়েছিল।' আর সুরা দুখান-এর ৩৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'শ্রেষ্ঠ কারা? ওরা, না তুব্বা সম্প্রদায় ও তাদের আগে যারা এসেছিল? আমি তাদের ধ্বংস করেছিলাম, কারণ তারা ছিল অপরাধী।' ইয়েমেনের হিময়ারি সম্রাটদের উপাধি ছিল তুব্বা। তাঁরা দীর্ঘকাল আরব, শাম, ইরাক ও আফ্রিকার কিছু অংশ শাসন করেন।

**তুরীয় ধ্যান** কোনো মন্ত্র নীরবে বা মনে মনে বারবার উচ্চারণ করে ধ্যানের পদ্ধতি। এভাবে ধ্যানের ফলে উদ্বেগ থেকে মুক্তি এবং আধ্যাত্মিক প্রসাদ লাভ করা যায়। শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি অনুভব করা যায়।

**তোয়া** পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত একটি উপত্যকা। পবিত্র কোরআনের সুরা তা'হা-এর ১১-১২ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারপর যখন সে আগুনের কাছে এল, তখন তাকে ডেকে বলা হলো, হে মুসা! নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার জুতা খুলে ফেলো; কারণ, তুমি এখন পবিত্র তোয়া উপত্যকায় রয়েছ।' আর সুরা নাজিআত-এর ১৬-১৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তার প্রতিপালক পবিত্র তোয়া উপত্যকায় তাকে (মুসাকে) আহ্বান করে

বলেছিলেন, ফেরাউনের কাছে যাও, সে সীমা লঙ্ঘন করেছে।'

**তোরা** বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তকের হিব্রু নাম। এটা মোজেজ বা হজরত মুসা (আ.)-এর বিধান বা পেন্টাটিউক নামে পরিচিত। ইহুদিরা মনে করে, সিনাই পর্বতে এটা মুসা (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

**ত্রয়ী** (Traid) তিনের জোট। বিশেষ করে, দেবতাদের ক্ষেত্রে এ পদটি ব্যবহৃত হয়। যেমন—হিন্দু পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। কিংবা গ্রিক পুরাণে জুপিটার, জুনো ও মিনার্ভা।

**ত্রিকাল** অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

**ত্রিজগৎ** বা **ত্রিভুবন** স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল।

**ত্রিনিটি** বা **ত্রিত্ব** খ্রিষ্টধর্মের একটি ধারণা বা মতবাদ। এর মূলকথা হলো সৃষ্টিকর্তা পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা এই তিনজনের মধ্যে বর্তমান। খ্রিষ্টধর্মের প্রাথমিক যুগেই এই মতবাদের উদ্ভব। ইসলাম ত্রিত্ববাদকে স্বীকার করে না।

**ত্রিপাপ** রাশিচক্রে তিন পাপগ্রহের সমাবেশ। অতিপাতক, মহাপাতক ও উপপাতক এই ত্রিবিধ পাপ।

**ত্রিপাদ** বিষ্ণুর অপর নাম। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী দৈত্যরাজ বলি মহাশক্তি লাভ করে দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেন। দেবতাদের অনুরোধে তখন বিষ্ণু বামনরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং বলির যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে তার কাছে ত্রিপাদ পরিমাণ ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি সম্মত হলে বিষ্ণু এক পা দিয়ে স্বর্গ এবং অপর পা দিয়ে মর্ত অধিকার করেন। বিষ্ণুর নাভি থেকে উত্থিত তৃতীয় পা রাখার জন্য তিনি বলিকেই স্থান নির্দেশ করতে বলেন। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলি বিষ্ণুর ওই পা নিজ মস্তকে ধারণ করেন। বিষ্ণু তখন তৃতীয় পা দ্বারা বলির মস্তকে আঘাত করে তাকে পাতালে পাঠান। দেবতারা এরপর অনায়াসে স্বর্গ অধিকার করেন।

**ত্রিপাদ্র** ধর্ম, অর্থ ও মোক্ষ—এই তিনের সর্বনাশকারী দুরাশা।

**ত্রিপিটক, তিপিটক** বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। পালি ভাষায় রচিত। এতে বুদ্ধের দর্শন, বাণী ও উপদেশ লিপিবদ্ধ রয়েছে। ত্রিপিটক শব্দের অর্থ তিনটি পেটিকা বা খণ্ড। ত্রিপিটকের তিনটি খণ্ড হলো সুত্তপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধম্মপিটক। সূত্তপিটকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মোক্ষলাভের উপায় বর্ণিত হয়েছে। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের যেসব ধর্মোপদেশ দিয়েছেন সেগুলো সুত্ত (সূত্র) নামে অভিহিত। সুত্তে ধর্মের মূলতত্ত্ব ও সেই তত্ত্বগুলোর বিশদ বিশ্লেষণ এবং নৈতিক উপদেশ রয়েছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নৈতিক জীবনের উৎকর্ষসাধনের জন্য বিহারভিত্তিক নিয়মশৃঙ্খলার যে বিধিগুলো বুদ্ধ প্রবর্তন করেছিলেন, সেগুলো সংকলিত হয়েছে বিনয়পিটকে। বিনয়পিটকের তিনটি অংশ: সুত্তবিভঙ্গ, খন্ধক ও পরিবার। আর অভিধম্মপিটকে বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর বহুকাল পরে শ্রীলঙ্কা থেকে এটি উদ্ধার করা হয়। সুত্তপিটকের পাঁচটি ভাগ: দীঘনিকায়, মজঝিমনিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায় ও খুদ্দকনিকায়। এর মধ্যে খুদ্দকনিকায় ১৫টি গ্রন্থের সংকলন: খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক, নিদ্দেশ, পটিসম্ভিদামগগ, অপদা, বুদ্ধবংস ও চারিয়াপিটক। এর মধ্যে *ধম্মপদ* ও *জাতকই* সর্বাধিক পরিচিত। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায়ই এই দুটি গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। এর মধ্যে *ধম্মপদ*-এ রয়েছে ধর্মনীতিসংক্রান্ত ৪২৩টি গাথা বা পদাবলি। *জাতক* হলো আপন পূর্বজন্মের কথা শুনিয়ে শিষ্যদের উদ্দেশে গৌতম বুদ্ধের উপদেশবাণী। জাতকের মোট সংখ্যা হলো ৫৪৭। ঈশানচন্দ্র ঘোষ মোট ছয় খণ্ডে জাতক কাহিনি বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন।

**ত্রিপুর** হিন্দু পুরাণে বর্ণিত স্বর্গ, মর্ত ও অন্তরিক্ষে নির্মিত তিনটি নগর বা পুর একত্রে ত্রিপুর নামে অভিহিত। নগরগুলো হলো স্বর্গে স্বর্ণময়পুর, অন্তরিক্ষে রৌপ্যময়পুর এবং মর্তে কৃষ্ণলৌহপুর। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর তারকাসুরের তিন পুত্র তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী ব্রহ্মার তপস্যা করে এই তিনটি নগর স্থাপন ও তাতে বসবাস করার অনুমতি লাভ করেন। শর্ত থাকে যে ওই তিন নগরে অভীষ্ট সব বস্তুই থাকবে, যা দানব, যক্ষ, রাক্ষস এমনকি

ব্রহ্মশাপেও বিনষ্ট হবে না এবং সহস্র বর্ষ পর এই তিন নগর যখন একত্র হবে তখন যে দেবতা এক বাণে ত্রিপুর ভেদ করতে পারবেন, একমাত্র তিনিই তাদের তিন ভাইকে বধ করার অধিকারী হবেন। বর লাভের পর অত্যাচারী তিন ভাই এবং তাদের অনুচর দানবদের অত্যাচারে দেবতারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তখন দেবতাদের অনুরোধে শিব পাশুপাত বাণ দ্বারা একত্রে ত্রিপুর ভেদ করেন। পাশুপাত অস্ত্রের তেজে ত্রিপুর দগ্ধ হয়ে পশ্চিম সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। শিবের অপর নাম তাই ত্রিপুরারি।

**ত্রিপুণ্ড্রক** ললাটে অঙ্কিত ত্রিশূলাকৃতির তিলক।

**ত্রিবেণী** গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিন নদীর সঙ্গমস্থল।

**ত্রিরত্ন** বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ বৌদ্ধদের এই তিন শরণ। **ত্রিশরণ** দ্র.

**ত্রিপুরান্তক, ত্রিপুরারি** মহাদেবের আরেক নাম। তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালীর তিন নগর পাশুপাত অস্ত্র নিক্ষেপে বিনষ্ট করায় তাঁর এই নাম হয়।

**ত্রিশঙ্কু** রামায়ণে বর্ণিত সূর্যবংশীয় রাজা। যজ্ঞ করে সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার জন্য তিনি কুলগুরু বশিষ্ঠকে অনুরোধ করে প্রত্যাখ্যাত হন। একই বাসনা নিয়ে বশিষ্ঠের পুত্রদের কাছে গেলে তাঁরা তাঁকে চণ্ডাল হও বলে অভিশাপ দেন। তিনি চণ্ডালবেশে বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হন। বিশ্বামিত্র তাঁকে আশ্বাস দেন এবং এ জন্য নিজেই একটি যজ্ঞের আয়োজন করেন। সব ঋষি সে যজ্ঞে যোগ দিলেও বশিষ্ঠের পুত্ররা যোগ দেননি। দেবতারাও যখন যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতে এলেন না তখন দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর বিশ্বামিত্র নিজেই তপস্যাবলে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে পাঠানোর উদ্যোগ নেন। কিন্তু দেবতারা ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে স্থান দিতে রাজি হননি। দেবরাজ ইন্দ্র বরং ত্রিশঙ্কুকে অধোমুখে মর্তে পাঠিয়ে দেন। ক্রুদ্ধ বিশ্বমিত্র তখন ত্রিশঙ্কুকে শূন্যে স্থাপন করে সপ্তর্ষিমণ্ডল, নক্ষত্রলোকসহ দ্বিতীয় একটি স্বর্গ সৃষ্টি করেন। দেবতারা মেনে নিতে বাধ্য হন যে বিশ্বামিত্রের তৈরি স্বর্গলোকে নিম্নশির ত্রিশঙ্কু দেবতার মতোই অবস্থান করবেন। সেই থেকে ত্রিশঙ্কু আকাশে অধোমুখী অবস্থায় আছেন।

**ত্রিশরণ** বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন হওয়া। 'বুদ্ধংশরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি ও সংঘং শরণং গচ্ছামি' এই ত্রিশরণ বৌদ্ধধর্মে ত্রিরত্ন বা রত্নত্রয় বলে অভিহিত হয়। প্রার্থনার শুরুতে বৌদ্ধধর্মের অনুসারীরা তিনবার ত্রিশরণ উচ্চারণ করেন। ত্রিশরণের অন্য নাম শরণগমন।

**ত্রেতাযুগ** হিন্দু পুরাণমতে, চার যুগের দ্বিতীয় যুগ। এই যুগের তিন অংশ পুণ্য ও এক অংশ পাপ। ত্রেতাযুগের ব্যাপ্তি ১২ লাখ ৯৬ হাজার বছর। এই যুগের মানুষ ১৪ হাত দীর্ঘ ও তাদের পরমায়ু ১০ হাজার বছর। এই যুগের তিন অবতার বামন, পরশুরাম ও রাম। হরিশচন্দ্র, সগর, অংশুমান, অজ, দশরথ, রাম প্রমুখ ত্রেতাযুগের রাজা ছিলেন।

**ত্র্যক্ষর** অর্থ যাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-বোধক তিন অক্ষর (অ উ ম) আছে, ওঁ, ওঙ্কার। প্রণব।

**ত্র্যম্বক** অর্থ ত্রি অম্বক (চক্ষু) যাঁর, ত্রিলোচন, শিব।

## থ

**থিওসফি** গ্রিক শব্দটির অর্থ ঐশ্বরিক জ্ঞান, মরমিয়াবাদের (mysticism) সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত দার্শনিক তত্ত্ব। থিওসফি তত্ত্বে সরাসরি জ্ঞান, দার্শনিক পরিচিন্তন কিংবা কোনো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর ও বিশ্বের প্রকৃতি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়। এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর হলেন সকল জীব ও সকল মঙ্গলের অতীন্দ্রিয় উৎস। বস্তুজগতের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা থেকেই পৃথিবীতে যাবতীয় অমঙ্গলের সৃষ্টি। অসীমের সঙ্গে পূর্ণ মিলন দ্বারাই এই অমঙ্গলকে জয় করা যায়। থিওসফিস্টদের মূল লক্ষ্য মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটা দার্শনিক মতবাদ গড়ে তোলা। নব্য প্লেটোপন্থী, জ্ঞানবাদী (নস্টিক) ও ক্যাবালিস্টদের থিওসফিস্টদেরই প্রকারভেদ বলে বিবেচনা করা হয়। ইয়াকব বামে, শেলিং ও সুইডেনবর্গ হচ্ছেন তিনজন বিশিষ্ট পাশ্চাত্য থিওসফিস্ট। আধুনিক থিওসফি ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধদর্শন থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছে। এই মতবাদে বিশ্বকে সাতটি স্তরে বিভক্ত বলে কল্পনা করা হয়। মানুষের সব কাজকে এই সাতটি স্তরের মর্যাদা অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। সর্বনিম্ন স্তরে থাকে প্রাকৃতিক জীবন এবং সর্বোচ্চ স্তরে সর্বজনীন

আত্মা বা ইউনিভার্সাল সেলফ। মানুষের সুপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তি মহাত্মাদের মাধ্যমে বাস্তব রূপ ধারণ করে। সেই শক্তি অর্জনের জন্য মানব আত্মাকে বহুজন্মের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। জন্ম-জন্মান্তরের অভিজ্ঞতার ফলে আত্মায় ইন্দ্রিয়াতীত গূঢ় জ্ঞান সঞ্চিত হয়। মার্কিন থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাদাম হেলেনা পিইএভনা ব্ল্যাভাৎসকি। আর এ কাজে তাঁর সহকারী ছিলেন কর্নেল এইচ এস অলকট এবং ডব্লিউ কিউ জাজ। ওই সমিতির উদ্দেশ্য হলো মানবসমাজে একটা সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক বিধান ও মানুষের সুপ্ত শক্তি বা অস্তিত্বের নিয়মকানুন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করা। ইউরোপ, আমেরিকা ও প্রাচ্যদেশগুলোয় থিওসফির ধারণা প্রচারে মিসেস অ্যানি বেসান্ত উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন।

**থেটিস** গ্রিক পুরাণে সমুদ্রদেবতা নেরিউসের কন্যা এবং বীর একিলিসের জননী। ট্রয়যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বমুহূর্তে তিনি জানতে পারেন যে এই যুদ্ধে তাঁর প্রিয় পুত্র একিলিসের মৃত্যু হবে। তাই তিনি নানা অজুহাতে একিলিসের যুদ্ধযাত্রা বিলম্বিত করেন।

**থেমিস** গ্রিক পুরাণের টাইটান। বিচারের দেবী। তিনি সৎ কাজের পুরস্কার ও অন্যায়ের শাস্তি দেন। দেবী না হয়েও তিনি সব সময় জিউসের পাশেই থাকতেন। জিউস পরে তাঁকে নক্ষত্রলোকে স্থান দেন। জিউসের ঔরসজাত তিন ঋতুদেবী এবং ইউনেমি (শৃঙ্খলা), ডাইক (বিচার), আইরিনি (শান্তি) ছাড়াও তিনি তিন ভাগ্যদেবী ক্লুদো, ল্যাকেসিস ও অ্যাট্রোপস এবং বিখ্যাত অ্যাস্ট্রাইয়ার জননী।

**থের-থেরিগাথা** থেরগাথা ও থেরিগাথার সংক্ষিপ্ত নাম। থেরগাথা হলো পালি সুত্তপিটকের অন্তর্ভুক্ত খুদ্দকনিকায়ের একটি গ্রন্থ। এতে ১০৭ জন স্থবিরের অভিজ্ঞতা, আত্মোপলব্ধি, জীবনসাধনা ও অর্হত্ব লাভের কথা ১০৭টি স্বরচিত কবিতায় ব্যক্ত করা হয়েছে। আর থেরিগাথা হচ্ছে থেরগাথারই অনুরূপ খুদ্দকনিকায়ের অপর একটি গ্রন্থ। এতে ৭৩ জন থেরি, অর্থাৎ ভিক্ষুণীর স্বরচিত ৭৩টি কবিতায় তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি, সুখ-দুঃখ এবং সমাজে নারীদের করুণ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। থেরিগাথায় সুললিত কাব্য ও ছন্দের মাধ্যমে বৌদ্ধজীবনের নৈতিক আদর্শ, আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও অর্হত্ব লাভের বিষয় ছাড়াও সমকালীন সমাজচিত্র উন্মোচিত হয়েছে।

**থেরবাদ** 'থের' শব্দের আভিধানিক অর্থ স্থবির, স্থিত, স্থিতধী বা স্থিতিশীল। যিনি সংসার ত্যাগ ও ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করে কমপক্ষে ১০ বছর নিরন্তর ব্রহ্মচর্য পালনে স্থিত থাকেন, তাঁকে 'স্থবির' বা 'থের' বলা হয়। বৌদ্ধমত অনুযায়ী গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রথম সঙ্গীতিতে (সম্মেলনে) এই প্রথাটির প্রচলন হয়। পালি ত্রিপিটকে বর্ণিত আদি বা মৌলিক বৌদ্ধ ধর্মাচার ও দর্শনকেই বলা হয় থেরবাদ। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্ব পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ শ বছর থেরবাদের প্রাধান্য ছিল। খ্রিষ্টীয় প্রথম থেকে সপ্তম শতকের মধ্যে মহাযান দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। মহাযানপন্থীরা থেরবাদকে রক্ষণশীল বৌদ্ধধর্ম, হীনযান বা স্থবিরবাদ নামে আখ্যায়িত করেন। অনিত্যদুঃখ-অনাত্ম, চতুরার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার অনুশীলনে পরম শান্তি বা 'নির্বাণ' লাভের ধারণা থেরবাদ ও মহাযান উভয় মতবাদেই স্থান পেয়েছে। যদিও আচার-অনুষ্ঠানে দুই মতবাদে কিছুটা বৈসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। থেরবাদী বা হীনযানপন্থীরা আপন অন্তর থেকে অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও মোহ নাশ করে নির্বাণ লাভ এবং নির্বাণোত্তর বুদ্ধস্থানে উন্নীত হওয়ার সাধনা করেন। পক্ষান্তরে মহাযানপন্থীরা বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের আদর্শকেই বিশেষভাবে অনুশীলন করেন। মহাযানে আনুষ্ঠানিকতা কম, অন্যদিকে থেরবাদে বহু ধরনের আনুষ্ঠানিকতা বিদ্যমান।

**থেরবাদ সংঘ** বাংলাদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা থেরবাদী, তাই তাদের সমষ্টিগতভাবে বলা হয় থেরবাদ সংঘ। থেরবাদ সংঘের ধর্ম ও কর্মজীবনের সংবিধান হলো বিনয়পিটক। এতে ভিক্ষুদের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতা এবং তাঁর পুত্র মহিন্দ থেরোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ভারতসহ পৃথিবীর

বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। ক্রমে ধর্মের নীতি ও সংস্কারে বিভিন্ন দেশাচার ও আঞ্চলিক লোকাচার অনুপ্রবেশ করে। ভিক্ষুদের একটি অংশ আদি ধর্মের কিছু কঠোর নীতিমালা শিথিল করে নিজেদের সংস্কারবাদী বৌদ্ধ হিসেবে মহাসাংঘিক নামে পরিচয় দেন। তবে বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আদি মৌলিক রীতিতেই স্থিত থাকেন। থেরবাদ সংঘ বা হীনযান সংঘ বলতে তাঁদেরই বোঝানো হয়।

বাংলাদেশের ভিক্ষু সংঘ সামগ্রিকভাবে থেরবাদ সংঘ নামে পরিচিত এবং থেরবাদের নৈষ্ঠিক অনুসারী হলেও গুরুভেদে তাঁদের মধ্যে নানা বিভক্তি বিদ্যমান। ভিক্ষুদের এই ভাগ বা দলকে বলে 'নিকায়'। বাংলাদেশে বিরাজমান নিকায়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মহাস্থবির নিকায়, সংঘরাজ নিকায়, সুধর্মা নিকায় এবং দোহরা বা দোয়ারা নিকায়। মহাস্থবির ও সংঘরাজ নিকায়ের অনুসারীদের মধ্যে বাংলাদেশের সমতলীয় বাঙালি বৌদ্ধদের সংখ্যাই বেশি। এই দুই নিকায়ের মধ্যে মহাস্থবির নিকায় প্রাচীনতর। সংঘরাজ নিকায় ১৮৬৪ সালে সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুধর্মা ও দোহরা নিকায়ের অনুসারীদের মধ্যে উপজাতীয় বৌদ্ধদের প্রাধান্য বেশি। যদিও চার নিকায়ের ধর্মীয় অনুশীলন রীতিতে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই।

## দ

**দক্ষ** হিন্দু পুরাণে বর্ণিত একজন প্রজাপতি। তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। মনুর কন্যা প্রসূতি তাঁর স্ত্রী। তাঁর অন্যতমা কন্যা সতী বা গৌরী মহাদেবের পত্নী। একবার জামাতা মহাদেব দক্ষকে অসম্মান করায় তিনি শিব বা মহাদেবের নিন্দা করতে থাকেন। পরে ব্রহ্মা তাঁকে অন্য প্রজাপতিদের ওপর আধিপত্য করার অধিকার দান করলে দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। মহাদেব ছাড়া ত্রিলোকবাসী অন্য সকলেই তাতে আমন্ত্রিত হন। সতী স্বামীর নির্দেশ উপেক্ষা করে যজ্ঞে যোগ দিতে পিত্রালয়ে গমন করেন। কিন্তু পিতার মুখে সর্বজনসমক্ষে পতিনিন্দা শুনে তিনি যজ্ঞস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন। সতীর মৃত্যুসংবাদে মহাদেব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং আপন অনুচরদের দক্ষের যজ্ঞনাশ করতে পাঠান। বীরভদ্রের নেতৃত্বে শিবের অনুচরেরা দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট করে দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। পরে ব্রহ্মার ইচ্ছায় দক্ষের দেহের ওপর এক ছাগমুণ্ড স্থাপন করে তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। পুনর্জীবন লাভের পর দক্ষ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন এবং মহাদেবের স্তব করতে থাকেন।

**দক্ষযজ্ঞ** প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ। এই যজ্ঞে শিবের স্ত্রী সতী পিতা দক্ষের মুখে পতিনিন্দা শুনে মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করেন। শিব সেই যজ্ঞে আমন্ত্রিত না হওয়ায় অনুপস্থিত ছিলেন। স্ত্রীর অকালমৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর তিনি অনুচরবর্গসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ পণ্ড করেন। অতঃপর সতীর মরদেহ কাঁধে নিয়ে শিব নৃত্য করেন।

**দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস** ষোড়শ শতকে দক্ষিণ আমেরিকায় খ্রিষ্টধর্মের গোড়াপত্তন ঘটে। কিন্তু সেখানকার আঞ্চলিক ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার ওপর তার তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। অঞ্চলটিতে মানুষের প্রথম পদার্পণ ঘটে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে। প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের ধর্মবিশ্বাসের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল না। কৃষিকাজ বা পশুপালন সম্পর্কেও তাদের কোনো ধারণা ছিল না। শিকার আর ফলমূল সংগ্রহ করে তারা জীবন ধারণ করত। ফলে ওই অঞ্চলের আদিবাসীরা তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের নিরিখে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন একদল অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। তাই শামান-সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের যোগসূত্র অনিবার্য ছিল। উল্লেখ্য, শামানরা সাধারণ মানুষ এবং অতিপ্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করত এবং তাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল অসুস্থ ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করা। শুরুতে তাদের জীবনযাত্রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রভিত্তিক হলেও কালক্রমে পরস্পরের সংস্পর্শে আসায় এবং ভাব বিনিময়ের ফলে তাদের ধর্মীয় ধ্যানধারণা সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হতে থাকে।

সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসেও পরিবর্তন আসে। কৃষি ও প্রযুক্তির বিকাশের ফলে

শামানদের আচার-অনুষ্ঠান পালনের কায়দাকানুনও উন্নততর হয়। মধ্য-আন্দেস অঞ্চলে এর চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল। সেখানে শামানরা গ্রামীণ পর্যায়ে অনেকটা ওঝার কাজ করত। অপরদিকে রাজপুরোহিতেরা বংশানুক্রমিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করত এবং তাদের কার্যবিধি রাজনীতি ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল।

ইনকা সভ্যতাতেও অনুরূপ বংশানুক্রমিক পুরোহিত প্রথা, নানান পদমর্যাদাসম্পন্ন দেবতা, জাঁকজমকপূর্ণ সব অনুষ্ঠান, নবান্ন উৎসব ইত্যাদির প্রচলন ছিল। বিষুবীয় বনাঞ্চলে গুরানি, চকো ও টুপিয়ান আদিবাসীরা ছিল মূলত শিকারি জাতি। সেখানকার শামানরা তাদের নির্ধারিত করণীয়ের পাশাপাশি প্রাকৃতিক নবায়ন উৎসবেও অংশ নিত। তাদের মধ্যে শ্রেণীবৈষম্য কম থাকায় শামানদের কাজেও তেমন কোনো শ্রেণীবিভাগ ছিল না। ক্যারিবীয় অঞ্চলে শামান-সংস্কৃতির পাশাপাশি, মন্দির-পুরোহিত-নেতাকেন্দ্রিক এক ধর্মীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। সেখানকার জনসংখ্যা ছিল বিপুল। আঞ্চলিক সরকার ও অর্থনীতি ছিল ধর্মীয় এবং সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীন। পুরোহিত ও যোদ্ধারা সমাজের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের সুবিধা ভোগ করত।

সুদূর দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকার ইয়াহগানিদের ধর্মীয় জীবন গড়ে উঠেছিল তিমি বা সিল মাছের ঝাঁকের মতো 'বড় শিকার' উৎসবকে ঘিরে। শিকারে নতুন ছেলেমেয়েদের অভিষেক হতো। ইনকা-কুয়েঞ্চা গোষ্ঠীর ধর্মীয় আচার আজও পেরুর উচ্চভূমি অঞ্চলে টিকে রয়েছে। ইনকারা ধর্মীয় আচার-আচরণের ওপর বেশ জোর দিত। তাদের ছিল সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, মেঘ, বৃষ্টি ইত্যাদির পৃথক পৃথক দেবতা।

মোট কথা, শামান-সংস্কৃতির আলোকে দক্ষিণ আমেরিকায় এক ধর্মীয় ভাবধারার বিকাশ ঘটেছিল। ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই ভাবধারাই দক্ষিণ আমেরিকার আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে প্রভাবিত করে এসেছে।

**দক্ষিণা** পুরোহিতকে দেয় দ্রব্য বা অর্থ। ব্রত, পূজা, শ্রাদ্ধ ও দানসহ যাবতীয় ধর্মকর্মের সময় পুরোহিত, ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষুকে দক্ষিণা দেওয়া হয়। দক্ষিণা না দিলে পুণ্যকর্মেও কোনো ফল পাওয়া যায় না, এ রকম একটি ধারণা বা বিশ্বাস প্রচলিত আছে। একসময় দক্ষিণা হিসেবে সোনা-রুপা দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত ছিল। বর্তমানে অর্থ বা তৈজসপত্র দিয়ে এই নিয়ম রক্ষা করা হয়। কোনো কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠানে যেখানে ব্রাহ্মণ, সাধু-সন্ন্যাসী, ভিক্ষু বা কাঙালি ভোজন করানো হয়, সেখানেও ভোজন শেষে দক্ষিণা দেওয়ার বিধান আছে। পুরাকালে শিক্ষা সমাপনান্তে গুরুগৃহ ত্যাগের সময় গুরু বা গুরুপত্নীকে শিষ্যের দুর্লভ কোনো জিনিস উপহার দিতে হতো। একে বলা হতো গুরুদক্ষিণা।

**দক্ষিণেশ্বর মন্দির** কলকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গা নদীর পাড়ে অবস্থিত মন্দির। ভবতারিণী কালীর উদ্দেশে নিবেদিত। কলকাতার জানবাজারের রানি রাসমণি ১৮৫৫ সালে এ মন্দির নির্মাণ করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন এর প্রধান পুরোহিত।

**দজ্জাল বা দাজ্জাল** শব্দটির অর্থ মহাপ্রবঞ্চক। শেষ যুগে মানুষকে প্রতারণা করতে যার আবির্ভাব ঘটবে। পবিত্র কোরআনে দজ্জাল শব্দটি নেই। তবে হাদিসে দজ্জালের উল্লেখ আছে। হজরত মোহাম্মদ (সা.) দজ্জালের যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে ধারণা করা হয়, দজ্জালের ডান চক্ষু অন্ধ থাকবে। তা ছাড়া তার দেহ হবে স্থূল, গাত্রবর্ণ লোহিত ও মাথার চুল কুঞ্চিত। তার অন্ধ চোখটিকে একটি ভাসমান আঙুলের মতো দেখাবে। তার কপালে 'কাফির' শব্দটি লেখা থাকবে, যা কেবল মুমিনরাই দেখতে পাবেন। দজ্জালের আবির্ভাবের আগে তিন বছর ভীষণ দুর্ভিক্ষ হবে। দজ্জাল বের হবে খোরাসান থেকে। দজ্জালের কোনো সন্তানসন্ততি থাকবে না। দজ্জালের সঙ্গে থাকবে আগুন ও পানি। কোনো মুমিন যখন তাকে রব বলতে অস্বীকার করবে, তখন সে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবে, কিন্তু তাতে ওই মুমিন ব্যক্তি মহাশান্তি লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি তাকে রব বলে মানবে, তাকে সে তার পানির মধ্যে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু তাতে সে জ্বলন্ত আগুনে পুড়তে থাকবে। দজ্জালকে আল্লাহ এই ক্ষমতা দেবেন যে হত্যা করার পর তাকে সে একবার মাত্র পুনর্জীবিত করতে পারবে। পুনর্জীবিত

হওয়ার পর দজ্জাল তাকে আর দ্বিতীয়বার হত্যা করতে সক্ষম হবে না। দজ্জাল মক্কা ও মদিনা ছাড়া পৃথিবীর সব নগরেই প্রবেশ করতে পারবে। মদিনায় ওই সময় সাতটি প্রবেশদ্বার থাকবে; কিন্তু দজ্জাল তার কোনো দ্বার দিয়েই প্রবেশ করতে না পেরে ফিরে যাবে। দজ্জাল ৪০ বছর বা মতান্তরে ৪০ দিন ক্ষমতাসীন থাকবে। তারপর মরিয়মপুত্র ঈসা (আ.) প্যালেস্টাইনে অবতরণ করে তাকে হত্যা করবেন।

প্রত্যেক নবী তাঁর অনুসারীদের দজ্জাল সম্বন্ধে সতর্ক করে গিয়েছেন। দজ্জালের দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ হবে; আর এ তো নিশ্চিত যে আল্লাহ অন্ধ নন। এ থেকেও স্পষ্ট যে তার রব হওয়ার দাবি মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাথমিক যুগের খ্রিষ্টানদের সাহিত্যে যিশুখ্রিষ্টবিরোধী যে ব্যক্তির উল্লেখ রয়েছে তার বিবরণ এ রকম: 'সে দান গোত্রের স্বেচ্ছাচারী রাজা হবে। জেরুজালেমে সে নিজ রাজ্য স্থাপন করবে এবং সেখানেই সে তার সৈন্যসামন্তসহ যিশুখ্রিষ্টের হাতে নিহত হবে।' আর হাদিসে বলা হয়েছে, কিয়ামতের আগে মক্কার সাফা পর্বত বিদীর্ণ হবে এবং তা থেকে শুক্রবারে ৬০ গজ দীর্ঘ একটি প্রাণী বের হয়ে আসবে। তার কাছে সুলায়মান (আ.)-এর মোহর ও মুসা (আ.)-এর লাঠি থাকবে। সে ওই লাঠি দিয়ে মুমিনদের আঘাত করলে তাতে তাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং তখন সবাই তাদের মুমিন বলে চিনতে পারবে। আবার সে তার মোহর দিয়ে যখন কারও নাকের ওপর 'কাফির' শব্দ সিলমোহর করে দেবে, তখন সবাই তাকে কাফির বলে চিনতে পারবে।

**দণ্ডকারণ্য** রামায়ণ অনুযায়ী গোদাবরী ও নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত দণ্ডক রাজার রাজ্য। মহর্ষি শুক্রাচার্যের অভিশাপে সেই রাজ্য পরে অরণ্যে পরিণত হয়। এই অরণ্যের পঞ্চবটী বনে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ একাদিক্রমে ১৪ বছর বনবাস করেছিলেন। এখান থেকেই রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান।

**দণ্ডী রাজা** পুরাণে উল্লেখিত রাজা। স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী একবার শাপগ্রস্ত হয়ে ঘোটকীতে পরিণত হন, তখন রাজা দণ্ডী তাঁকে গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ এই ঘোটকীকে দাবি করলে দণ্ডী তাঁকে তা দিতে অস্বীকার করেন। পরে এ নিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে দণ্ডীর বিরোধ বাধলে কৌরব ও পাণ্ডবরা একযোগে দণ্ডীকে সমর্থন করেন। পক্ষান্তরে দেবতারা এই যুদ্ধে কৃষ্ণের পক্ষ নেন। উর্বশী শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে প্রস্থান করলে বিরোধের অবসান হয়, তখন দণ্ডী তাঁর নিজ রাজ্যে ফিরে যান।

**দত্তক** অপরের সন্তানকে নিজ সন্তান হিসেবে গ্রহণ করা। ভারতবর্ষে প্রাচীন আমল থেকেই দত্তক গ্রহণের রীতি প্রচলিত আছে। পুরাণ, শাস্ত্রগ্রন্থ ও ইতিহাস থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দত্তক গ্রহণের ব্যাপারে নন্দ পণ্ডিত রচিত দত্তকমীমাংসা এবং কুবের রচিত দত্তকচন্দ্রিকা সর্বভারতে স্বীকৃত। তবে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে বাংলা দেশে শেষেরটির বিধানই অনুসৃত হতো। দত্তচন্দ্রিকা মতে, দত্তক গ্রহণের দুটি উদ্দেশ্য: (ক) দত্তক গ্রহণকারী পিতা ও তাঁর পূর্বপুরুষদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা এবং (খ) দত্তক গ্রহণকারী পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া। যেকোনো পুত্রহীন ব্যক্তিই দত্তক নিতে পারেন; আর শাস্ত্রমতে 'পুত্রহীন' বলতে তাঁকেই বোঝায় যাঁর পুত্র, পৌত্র কিংবা প্রপৌত্র কোনোটাই নেই। একমাত্র শূদ্র ছাড়া আর কেউ দৌহিত্র কিংবা ভাগিনেয়কে দত্তক নিতে পারে না। কেউ যদি তার পিতার একমাত্র পুত্র হয় তবে শাস্ত্র অনুযায়ী তাকে দত্তক নেওয়া যাবে না। স্বামী জীবিত থাকলে তাঁর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী পুত্রকে দত্তক দিতে পারেন না। স্বামী যদি মৃত হন এবং তাঁর পূর্বনিষেধ না থাকে, তবেই কেবল স্ত্রী পুত্রকে দত্তক দিতে পারেন। দত্তক পুত্র পিতার সবকিছুতে আত্মজের অনুরূপ অধিকার লাভ করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও দত্তক গ্রহণের প্রথা চালু আছে। ইসলামে দত্তক গ্রহণের অনুমোদন নেই।

**দধীচি** ঋষি। ঋগ্বেদ অনুযায়ী দধীচির পিতা অথর্ব মুনি, মা শান্তি। শিবভক্ত এই ঋষি দক্ষকে শিবহীন যজ্ঞ করতে নিষেধ করেন। দক্ষ তাঁর উপদেশ মানতে অস্বীকৃত হলে দধীচি দক্ষযজ্ঞে অনুপস্থিত থাকেন। অন্যদিকে বৃত্র নামক দৈত্যের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ও স্বর্গচ্যুত দেবতারা জানতে পারেন যে একমাত্র দধীচির অস্থিনির্মিত অস্ত্র দ্বারাই বৃত্রকে বধ

করা সম্ভব। ইন্দ্রের আদেশে অপ্সরা অলম্বুষা নৃত্য করে দধীচির ধ্যান ভঙ্গ করেন। অলম্বুষাকে দেখামাত্র দধীচির রেতপাত ঘটে। অতঃপর দধীচির ঔরসে সরস্বতী নদীর গর্ভে পুত্র সারস্বতের জন্ম হয়। ইন্দ্রের অনুরোধে দেবকুলের উপকারার্থে আপন অস্থি দান করে দধীচি স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দেন। দধীচির সেই অস্থিনির্মিত বজ্র দ্বারা ইন্দ্র নিরানব্বইবার বৃত্রসহ দৈত্যদের বধ করেন।

**দনু** প্রজাপতির কন্যা। দনুর বিয়ে হয় ঋষি কশ্যপের সঙ্গে। কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভে বিপ্রচিত্তি, সম্বর, বৃষপর্বা, নিকুম্ভ, প্রলম্ব, বনায়ু, কেতুমান, বিরূপাক্ষ, কেশী, নমুচি, পুলোমা প্রভৃতি ৪০ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তারা সকলেই দনুজ বা দানব নামে পরিচিত।

**দনুজ রায়, রাজা** পূর্ববঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা। দেব বংশীয় দশরথ দেব ও দনুজ রায় সম্ভবত একই ব্যক্তি। ১২৬০ থেকে ১২৬৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময় তিনি সোনারগাঁয়ের পার্শ্ববর্তী সেনরাজ্যের একাংশ অধিকার করেন। তার কয়েক বছর পর কেশব সেনের এক উত্তরাধিকারীকে পরাভূত করে তিনি বিক্রমপুরের সেনরাজ্য দখল করেন।

**দময়ন্তী** বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে দেবতারা তাঁকে বিয়ে করতে চান। কিন্তু স্বর্গের স্বয়ংবর সভায় দেবতাদের উপেক্ষা করে দময়ন্তী নল রাজাকে পতিত্বে বরণ করেন।

**দয়ানন্দ সরস্বতী** হিন্দুধর্ম-সংস্কারক। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম ভারতের কাথিয়াবাড়ে ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর আসল নাম মূলশঙ্কর। সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে তিনি যোগ অধ্যয়ন করেন এবং বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। বৈদিক ধর্মের সংস্কারের জন্য ১৮৭৭ সালে লাহোরে তিনি আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। বেদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করতে তিনি 'ঋগ্‌বেদভাষ্য' ও 'সত্যর্থ প্রকাশ' নামক দুটি গ্রন্থ সংকলন করেন। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

**দরগাহ** পীরের আস্তানা। দরবেশ বা ধর্মীয় পুরুষের কবরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্থাপনা। ইসলামি শরিয়া মতে, কবরের ওপর কোনোরূপ নির্মাণ নিষিদ্ধ। কবরকে চিহ্নিত করার জন্য তা জমিন থেকে এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করা যেতে পারে। যদিও উপমহাদেশে এবং পৃথিবীর অন্যত্র অনেক ওলি-আউলিয়া ও দরবেশের কবরের ওপর দালানকোঠা রয়েছে এবং সেগুলো ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে তীর্থকেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করেছে। বর্তমান ভারতের আগ্রায় মইনুদ্দিন চিশতির (র.) মাজার, দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার (র.) মাজার কিংবা বাংলাদেশের সিলেটে শাহজালাল (র.)-এর মাজার, বাগেরহাটে খান জাহান আলীর (র.) মাজার, রাজশাহীতে মখদুম শাহ (র.)-এর মাজার, ঢাকায় শাহ আলী বাগদাদি (র.)-এর মাজার, চট্টগ্রামে আমানত শাহ (র.)-এর মাজার ইত্যাদি যার উদাহরণ। একইভাবে এ দেশে অনেক পীরের কবরকে কেন্দ্র করে অনেক দরগাহ গড়ে উঠেছে।

**দরবেশ** আভিধানিক অর্থে দরজা অনুসন্ধান করা। সাধারণত সংসারবিরাগী ধর্মানুসন্ধানী অর্থে কথাটা ব্যবহৃত হয়। যেসব লোক জাগতিক ব্যাপারে বীতস্পৃহ হয়ে আত্মার মুক্তির জন্য গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন বা একাগ্র মনে হয়ে সাধনা করেন তাঁদেরই দরবেশ বলা হয়। আরবি ভাষায় অবশ্য ফকির বা ভিক্ষুক অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মরক্কো ও আলজিরিয়ায় ব্যাপক অর্থে দরবেশ শব্দের পরিবর্তে ইখওয়ান অর্থাৎ 'এক সমাজভুক্ত ভ্রাতৃবর্গ' কথাটা ব্যবহৃত হয়। পুরোনোকালে পীর-আউলিয়া ছাড়াও একদল দীক্ষাগুরু ছিলেন, যাঁরা সব সময় শিষ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। গুরু বা মুরশিদের মৃত্যুর পরেও দুই এক পুরুষ পর্যন্ত শিষ্যরা তাঁর অনুসরণ করত এবং তাদের প্রধান হতেন সেই মুরশিদের মনোনীত কিংবা অধিকতর উপযুক্ত কোনো শিষ্য। দ্বাদশ শতকের বিপর্যয়পূর্ণ সময়ে সালজুক সাম্রাজ্য যখন খণ্ড-বিখণ্ড, তখন স্থায়ী সংস্থা হিসেবে দরবেশ প্রথার উদ্ভব হয়। এর মধ্যে একটি সংঘ গড়ে তোলেন প্রখ্যাত সাধক আবদ আল-কাদির জিলানি (র.)। এর পর থেকে মুসলিম জগতে এ ধরনের অসংখ্য সংঘ গড়ে উঠতে থাকে। এদের মধ্যে কতগুলো নতুন আর কতগুলো পুরোনো সংঘগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া দরবেশরা গড়ে তুলেছিলেন। কখনো গুরু-শিষ্যের এ পরম্পরা হজরত মোহাম্মদ (সা.) হতে (কিংবা বলা যায়

আল্লাহ-জিবরাইল-রাসুল হতে) বহু খ্যাতনামা দরবেশের মাধ্যমে সংঘের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থাপয়িতা পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়। একে সিলসিলা বা বিশিষ্ট তারকার পরম্পরা বলা হয়। আবার অন্য মতে, এই সিলসিলা প্রধান প্রচারক বা সংঘের প্রতিষ্ঠাতা থেকে বর্তমান কাল অবধি প্রসারিত। প্রত্যেক দরবেশ তাঁর নিজস্ব সিলসিলার সঙ্গে সুপরিচিত। গুরু, শায়খ, মুরশিদ, ওস্তাদ, পীর হচ্ছেন সিলসিলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মাধ্যম। গুরুই তাঁকে সংঘের অন্তর্ভুক্ত করেন। ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও প্রতিজ্ঞার রীতি বিভিন্ন সংঘে বিভিন্ন ধরনের। নবদীক্ষিতকে সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ দীক্ষা-পদ্ধতির ভেতর দিয়ে যেতে হয়। দীক্ষা শেষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

দরবেশ বা তাঁর শিষ্যরা যে তরিকারই অনুসারী হোন না কেন, সব ক্ষেত্রেই তাঁদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে জিকর অর্থাৎ স্মরণ, আল্লাহকে স্মরণ। জিকরের সঙ্গে ধর্মীয় আনন্দোল্লাস এবং সুখকর স্বপ্নালুতা আসে। তার সঙ্গে সৃষ্টি হয় উত্তেজনা এবং তৎপ্রসূত হালি বা দশা। পাশ্চাত্য মহল এসব দরবেশের ওই হালি বর্ণনায় নর্তন-কুর্দন, ক্রন্দন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। জালাল আল-দিন রুমি প্রতিষ্ঠিত মাওলাবি (দ্র.) সম্প্রদায় ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে উন্মাদনার উদ্রেক করেন। সাদিরা তাঁদের অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতেন এবং এখনো তাঁরা তাঁদের দরগাহগুলোতে বায নামক এক রকম ছোট ঢোল বাজিয়ে থাকেন, যা মিসরের মসজিদগুলোয় বিদ'আত বলে নিষিদ্ধ। সাদিরা, রিফাইনরা এবং আহমাদিরা নিজ নিজ তরিকা অনুযায়ী অলৌকিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার, জীবন্ত সর্প, বৃশ্চিক বা কাচ ভক্ষণ, শরীরে সুচ বা চোখে শলাকা বিদ্ধ করা। এসব প্রদর্শনী কতকটা জাদুকৌশল এবং কতকটা তন্ময় অবস্থার কারণেই সম্ভব হয়। এ ছাড়া বহু দরবেশ আলোকদৃষ্টি, আলোকশ্রবণ এবং নিজ দেহ ভারশূন্যকরণ ইত্যাদি ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। এগুলোকে আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে প্রাপ্ত কারামাত হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। দরবেশের খানকায় পূর্ণ সভ্য ছাড়াও বহু সাধারণ সভ্য থাকে; তাঁরা সংসারে বাস করলেও তাঁদের রোজ কয়েকবার জিকর করতে হয়। মামলুক বাদশাহদের আমলে, বিশেষ করে মিসরে খানকার সংখ্যা ছিল প্রচুর এবং সেসবের জন্য রাজকোষ থেকে অর্থও বরাদ্দ করা হতো। বর্তমান কালে শরিয়তপন্থী আইনবেত্তা এবং ধর্মতত্ত্ববিদেরা (উলামা) দরবেশ সম্প্রদায়কে অননুমোদন বা অবজ্ঞার চোখে দেখেন। এখন দরবেশদের অধিকাংশ ভক্ত আসে সমাজের নিম্নস্তর থেকে। দরবেশদের মধ্যে সংখ্যায় কম হলেও নারীও দেখা যায়। শায়খ তাঁদের শিক্ষা দেন এবং তাঁরা সাধারণত নিজেরা একত্রিত হয়ে জিকর করেন। ইসলামের মধ্যযুগে নারী দরবেশরা নির্জনবাস করতেন, ফলে নারীদের পরিচালিত আলাদা খানকাহ গড়ে উঠেছিল।

**দশ অনুজ্ঞা** (Ten Commandments or Decalogue) সিনাই পর্বতে মোজেজ বা মুসা নবী (আ.)-কে প্রদত্ত ঈশ্বরের দশটি অনুজ্ঞা। বাইবেল অনুসারে এগুলো মৌলিক ধর্মীয় বিধান। অনুজ্ঞাগুলো হলো: আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না; মূর্তি পূজা করবে না; আল্লাহর নামের অবমাননা করবে না; স্যাবাথ দিবস পালন করবে; পিতামাতাকে ভক্তি করবে; নরহত্যা করবে না; ব্যভিচার করবে না; চুরি করবে না; মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না; পরস্ত্রী ও পরদ্রব্যে লোভ করবে না। এর মধ্যে শুধু স্যাবাথ দিবস পালনের বিষয়টি বাদ দিলে ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের মতো ইসলামেরও প্রাথমিক ধর্মীয় অনুশাসন এগুলো। যদিও প্রথম দুটি ও শেষের অনুজ্ঞাটির ভাগ নিয়ে খ্রিষ্টান চার্চের মধ্যে মতভেদ আছে। রোমান ক্যাথলিক ও লুথারপন্থীরা প্রথম দুটিকে একত্রে করে এবং শেষেরটিকে বিভক্ত করে হিসাব করে। পক্ষান্তরে প্রটেস্ট্যান্টরা উপরিলিখিতভাবেই এগুলোকে গ্রহণ করে।

**দশকর্ম** মূলত শিশু ও তরুণদের মঙ্গলের জন্য ১০ রকম সংস্কার বা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। বেদে এই ১০টি সংস্কারের নাম করা হয়েছে এভাবে: গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন ও বিবাহ। তবে সাধারণভাবে দশকর্ম কথাটার দ্বারা বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানকেও বোঝায়।

**দশদিকপাল** অর্থ ১০ দিকের অধীশ্বর। দেবতারা যাঁরা ১০ দিক রক্ষা করেন, তাঁদের দশদিকপাল বলা হয়। এঁদের মধ্যে ইন্দ্র পূর্ব দিক; অগ্নি অগ্নি-কোণ; যম দক্ষিণ দিক; নির্ঋত নৈঋত কোণ; বরুণ পশ্চিম কোণ; মরুৎ বায়ু কোণ; কুবের উত্তর দিক; ঈশ ঈশান কোণ; ব্রহ্মা উর্ধ্ব দিক ও অনন্ত অধঃ দিক রক্ষা করেন।

**দশনামী সন্ন্যাসী** শঙ্করাচার্যের অনুসারী হিন্দু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। অষ্টম শতাব্দীতে ভারতে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব হয়। তৎকালীন শৈব ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়েরই হিন্দু রাজাদের সাহায্য নিয়ে তিনি বৌদ্ধধর্মকে ভারতবর্ষ থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিতে সমর্থ হন। হিন্দুধর্মের প্রসারে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি কতিপয় বা মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলোকে কেন্দ্র করে এবং তাঁর শিষ্য ও প্রশিষ্যদের ১০ জনের নামে (দশনামী) সন্ন্যাসীদের ১০টি শাখা গড়ে ওঠে। শাখাগুলোর নাম: পুরী, গিরি, পর্বত, সাগর, বন, অরণ্য, তীর্থ, আশ্রম, সরস্বতী ও ভারতী।

**দশমহাবিদ্যা** কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা—এই দশ মহাশক্তির ১০টি মূর্তি। মহাদেব তাঁর স্ত্রী সতীকে দক্ষযজ্ঞে যেতে নিষেধ করলে সতী বা ভগবতী প্রথমে কালীমূর্তি ধারণ করে স্বামীকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মহাদেব তাতে ভীত না হলে ভগবতী ১০ দিকে ১০ মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়ে শিব বা মহাদেবের পথ রোধ করেন।

**দসুকি** মিসরের সুফি সাধক। দসুকি নামক ধর্মীয় সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর আসল নাম ইবরাহিম ইবনে আবি আল-মাজদ আবদ আল-আজিজ। জন্ম ১২৩৫ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের গারবিয়া জেলার দুসুক নামক গ্রামে। সুফিমত গ্রহণের আগে তিনি ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর হিজব (দ্র.) ছিল কতকটা তান্ত্রিক ধরনের। তিনি দাবি করতেন যে তিনি সমস্ত সুরার তালাসিম অর্থাৎ বলশক্তি আয়ত্ত করেছিলেন। অলৌকিক কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১২৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

**দাইবুৎসু** অর্থ বুদ্ধের বিশালাকার মূর্তি। সাধারণত ব্রোঞ্জের তৈরি হয়। জাপানের এমন দুটি বড় ও বিখ্যাত বুদ্ধমূর্তি নারা ও কামাকুরায় সংরক্ষিত আছে। প্রথমটি স্থাপিত হয়েছিল ৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দে, যা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ কাঠের মূর্তি। দ্বিতীয়টা স্থাপিত হয়েছিল ১২৫২ খ্রিষ্টাব্দে।

**দাঈ** আভিধানিক অর্থ আহ্বানকারী। আরবি দা'আ ক্রিয়াপদ হতে নামবাচক কর্তৃপদ। ভালো কাজে বা ধর্মের দিকে আহ্বানকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উমাইয়া খিলাফতের শেষ বছরগুলোতে আব্বাসীয়দের পক্ষে গুপ্ত প্রচারণাকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কতিপয় শিয়া সম্প্রদায়ে এবং ইসমাইলি কারমাতিয়া ও পরবর্তীকালে দুরুজ সম্প্রদায়ে দাঈ শব্দটির ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্য পায়। সে সময়, বিশেষত দূরাঞ্চলের প্রচার সংগঠকদের দাঈ হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। ফাতিমীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা আবু আবদ আল্লাহ এ রকম একজন দাঈ সংগঠক ছিলেন। ফাতিমীয় বংশের খিলাফতের সময় প্রচার সংস্থা রাষ্ট্রের প্রধান বিভাগে পরিগণিত হয়। এর পুরোধা ছিলেন প্রধান দাঈ (দাঈ আল-দু'আত), পদমর্যাদায় উজির এবং প্রধান কাজির অব্যবহিত পরেই ছিল যাঁর স্থান। পরে তাঁর এবং প্রধান কাজির কার্য প্রায় একত্র করা হয়েছিল।

**দাউদ (আ.)** নবী ও বাদশাহ। নবী হিসেবে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে যে প্রত্যাদেশ পান সেগুলোর সংকলন হলো জাবুর। জাবুর ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ। পবিত্র কোরআনের অনেকগুলো সুরায় দাউদ নবীর উল্লেখ আছে। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত দাউদ (আ.) ছিলেন নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, আল্লাহভক্ত সাধক এবং লৌহবর্ম নির্মাণের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনকারী স্বনির্ভর নবী। লৌহ তাঁর হাতে নমনীয় হয়ে যেত। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অতি সুমিষ্ট। তাঁর পাঠ শুনে সবাই মুগ্ধ হতো। পাহাড়, তরুলতা, পশুপক্ষী এরাও তাঁর সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিত। আল্লাহ পাহাড়-পর্বত এবং পক্ষীকুলকে তাঁর প্রভাবাধীন করে দিয়েছিলেন। সুরা বাকারার ২৫১ আয়াতে দাউদ (আ.) কর্তৃক জালুতকে হত্যা এবং আল্লাহর তাঁকে কর্তৃত্ব ও হিকমত দানের কথা বলা

হয়েছে। সুরা আম্বিয়ার ৭৮ আয়াতে দাউদ (আ.)-কে সুলায়মান (আ.)-এর মতো বিজ্ঞ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কতগুলো ভেড়া একদিন কোনো খেতের ফসল নষ্ট করলে তাঁরা দুজনে সমবেতভাবে সেই ঘটনার যে বিচার করেছিলেন, এই আয়াতে তা স্মরণ করতে বলা হয়েছে। সুলায়মান (আ.)-এর বয়স তখন ছিল এগারো বছর মাত্র। তবু সেই বয়সেই তিনি পিতার রায় সংশোধন করে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। সুরা সোয়াদ-এ অন্য একটি ঘটনার কথা বলা হয়েছে, যেখানে দুজন অভিযোগকারী দাউদ (আ.)-এর কাছে বিচার প্রার্থনার ছলে এসে রাত্রির অন্ধকারে দেয়াল ডিঙিয়ে তাঁর খাস কামরায় ঢুকে পড়েছিল। হজরত দাউদ (আ.) মনে করেন যে, তাঁর কোনো ত্রুটির জন্যই আল্লাহ তাঁকে এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে ফেলেছেন। আর এ জন্য তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

অন্যদিকে বাইবেলে যে ডেভিডের কথা বলা হয়েছে, তিনি জেরুজালেমের রাজপ্রাসাদে বহুপত্নী ও অসংখ্য উপপত্নী-পরিবেষ্টিত হয়ে জীবন উপভোগ করতেন। বাথশেবা নাম্নী এক সুন্দরী রমণীর সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক হয় এবং তাকে লাভ করার জন্য তিনি সে রমণীর স্বামীকে অসমযুদ্ধে *ঠেলে* দিয়ে তাঁর প্রাণনাশের ব্যবস্থা করেন। এতে ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হন। বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী ডেভিডের ওই অবৈধ পত্নী বাথশেবার গর্ভে রাজা সোলোমন জন্মগ্রহণ করেন। ক্রুসেড যুদ্ধের সময় জেরুজালেমের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের পাহাড়ে যে সমাধি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, তাকে দাউদ (আ.)-এর সমাধি বলে অভিহিত করা হয়েছে। দাউদ (আ.)-এর অনুগামী, এক ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এখনো কুর্দিস্তানে বসবাস করে। তাদের মতে, দাউদ (আ.) সব নবী থেকে শ্রেষ্ঠ।

**দাওয়া** অর্থ দাবি বা অভিযোগ। পারিভাষিক অর্থে কথাটার দ্বারা দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিধানের আওতায় দাবি আদায় কিংবা অধিকার হরণের জন্য আইনগত শাস্তির দাবি উত্থাপনকে বোঝায়। মুসলিম আইন অনুসারে ফৌজদারি দণ্ডবিধির আওতাধীন কোনো মকদ্দমা এখনো পর্যন্ত আংশিকভাবে ব্যক্তি-অনুগ ব্যাপার, কারণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কিংবা তাঁর উত্তরাধিকারী (কিন্তু কোনো কর্তৃপক্ষ নয়) ইচ্ছা করলে অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারে বা তার শাস্তি প্রার্থনা করতে পারে। আইনের বিচারে মানুষের ব্যক্তিক অধিকার (হক্কুল এবাদ) এবং আল্লাহর প্রতি তার কর্তব্য (হক্কুল আল্লাহ)—এই দুইয়ের স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন লোক তার স্বজনহত্যার জন্য ক্ষতিপূরণ (দিয়াত), কোনো বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য আদায় বা চোর কর্তৃক অপহৃত দ্রব্যের প্রত্যর্পণ দাবি করতে পারে। অপরপক্ষে, কোনো মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়নি, শুধু আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘিত হয়েছে, এরূপ ক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তিবিধান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য বলে গণ্য। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যেকোনো মুসলিম পাপকার্য সম্পাদনকারীকে বিচারক্ষম ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির সমক্ষে উপস্থিত করে বিচারকের রায় (তাজির) তার ওপর প্রয়োগ করতে সহায়তা করার অধিকার রাখে। এই ধরনের অভিযোগকে দাওয়া আল-হিসবা বলে। দাওয়া আল-হিসবা অনুযায়ী শাস্তির উপযুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে কেউ সন্দেহভাজন হলে, বিচারক স্বয়ং ঘটনার তদন্ত করবেন এবং অভিযুক্তের অপরাধ আইনত ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলে তাকে আইনের নির্দেশমতো শাস্তি প্রদানের আদেশ দেবেন। কিন্তু যদি অন্যভাবে এ ধরনের অপরাধপ্রবণতা বন্ধ করা যায়, তবে যত দূর সম্ভব অপরাধীকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দান পুণ্যের কাজ।

ব্যক্তির নিজস্ব অধিকারসংক্রান্ত বিষয়ে কেউ কোনো অভিযোগ আনলে তার নিষ্পত্তি নিম্নবর্ণিত উপায়ে করা হয়। অভিযোগকারী (আল-মুদ্দাঈ) তার অভিযোগ দাখিলের পর বিচারক সে বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির জবাব শোনেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ আসামি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করলে তাকে দোষী প্রমাণিত করতে আর কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের দরকার হয় না। কিন্তু অভিযুক্ত যদি অভিযোগ স্বীকার না করে, তবে অভিযোগকারী তার অভিযোগের সমর্থনে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির না করা পর্যন্ত বিচারক অভিযুক্তকে দোষী প্রমাণ করতে পারেন না। অবশ্য বিচারক নিজে যদি ওই মামলার তথ্যাদি সম্পর্কে

অবগত থাকেন, তবে বিশেষ অবস্থায় তিনি কোনো পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াও আপন ধারণা ও পর্যবেক্ষণের ওপর রায় দিতে পারেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও অভিযুক্ত পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ তাঁর নিজের জ্ঞাত তথ্যের বিপরীত হলে তিনি তাঁর জানা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কোনো রায় দিতে পারেন না। মামলায় গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য হচ্ছে স্বাধীন বয়স্ক মুসলিম কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্য। এই প্রকার সাক্ষ্যদাতাকে আদল বলা হয়। লিখিত দলিল নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যদাতা কর্তৃক সমর্থিত না হলে তা বৈধ প্রমাণ বলে গণ্য হবে না।

অভিযোগকারী তার অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণ দিতে না পারলে এবং আসামিটি হলফ করে অপরাধ অস্বীকার করলে ওই মকদ্দমা বাতিল গণ্য হবে। আসামি হলফ করতে অস্বীকার করলে এবং সে ক্ষেত্রে ফরিয়াদি যদি হলফ করে ওই অভিযোগের সত্যতা দাবি করে, তবে ফরিয়াদির দাবিই সত্য বলে গৃহীত হবে। আর কোনো অভিযোগের ব্যাপারে যদি অভিযোগকারী উপযুক্ত কারণ ছাড়া অনেক দিন পর্যন্ত তার দাবি পেশে বিরত থাকে বা অবহেলা দেখায়, তবে বিচারক সে অভিযোগ বাতিল করবেন। কারণ সে ক্ষেত্রে বোঝা যায় যে অভিযোগটি ভিত্তিহীন। অবশ্য এ ব্যাপারে দাবি পেশের কোনো সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি।

**দাওয়াত** আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ। মুসলমানদের একটা পবিত্র দায়িত্ব অন্যকে ইসলামের সিরাতুল মুস্তাকিমের (সরল পথ) পথে আহ্বান করা। তবে এই আহ্বান অবশ্যই হতে হবে সৌজন্যপূর্ণ। এখানে জোরজবরদস্তি বা শ্রেয়ম্মন্যতা প্রদর্শনের কোনো সুযোগ নেই। কারণ, তেমন আচরণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ ও অসহিষ্ণুতার জন্ম নেয়। ফলে তখন তা আর দাওয়াত থাকে না।

**দানশীল** বৌদ্ধ গ্রন্থকার। তিব্বতীয় লামা তারানাথের মতে, তিনি রাজা মহীপালের আমলে জীবিত ছিলেন। জগদ্দল বিহারে থেকে তিনি *পুস্তক পাঠোপায়* ও ৬০টি তান্ত্রিক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদের ফলেই গ্রন্থগুলো বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

**দানিয়েল** ওল্ড টেস্টামেন্ট বা বাইবেলের পুরাতন অংশে বর্ণিত একজন ধর্মীয় পুরুষ। কথিত আছে, খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে দানিয়েল নামে স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাসী জনৈক ইহুদি সাধু বাস করতেন। তাঁকে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বলে ধারণা করা হয়। বন্দী অবস্থায় তাঁকে নেবিউকাদনেজারের দরবারে উপস্থিত করা হয়। সেখানে নেবিউকাদনেজারের অদ্ভুত স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে তিনি বিপুল প্রভাবের অধিকারী হন। তাঁকে বেলতিশ্যাযার নামে অভিহিত করা হয়। পুস্তকে তাঁর তিন বন্ধুর কথাও রয়েছে। তাঁরা একেশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁদের সাধুতার বলে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আরবি ও ইসলামি সাহিত্যে দানিয়েল ইসরাইল বংশীয় অন্যতম নবী। নেবিউকাদনেজারের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাইবেলে দানিয়েল যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে গবেষণা করে মওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন যে পারস্য সম্রাট প্রথম সাইরাস ও পবিত্র কোরআনে বর্ণিত জুলকারনাইন অভিন্ন। ওই স্বপ্নে হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাব ও ইসলামি শাসনাধিকারের ইঙ্গিত আছে বলে ধারণা করা হয়।

**দায়ভাগ** হিন্দুদের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত আইনগ্রন্থ। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে রচিত এই গ্রন্থের সংকলক ছিলেন জীমূতবাহন। স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোকে প্রধান যে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো ব্যবহার বা আইনশাস্ত্র। এতে সম্পদের উত্তরাধিকার বিষয় নিয়ে যে অংশটি রয়েছে তাকেই 'দায়ভাগ' বলা হয়। স্মৃতিশাস্ত্রের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির মিতাক্ষরা টীকা একসময় সমগ্র ভারতে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হতো। নব্যস্মৃতির যুগে বঙ্গদেশে মিতাক্ষরার সঙ্গে এ বিষয়ে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। সেই সূত্র ধরে জীমূতবাহন তাঁর *দায়ভাগ* গ্রন্থটি রচনা করেন।

**দারাজি** দুরুজদের অন্যতম ধর্ম-প্রবর্তক। হামজাকে দুরুজদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা হলেও দারাজি নাম থেকেই দুরুজ শব্দটির উদ্ভব। দারাজি একজন বাতেনি ধর্ম-প্রচারক ছিলেন। তাঁর নাম মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইল এবং তিনি ছিলেন পারসিক

বংশোদ্ভূত। ১০১৭ সালে তিনি মিসর গমন করেন। এর আগে তিনি হামজাকে ইমাম বলে স্বীকার করেন। কায়রো নগরে খলিফা আল-হাকিম বিআমর দরবারে চাকরি গ্রহণ করে তিনি খলিফার অনুগ্রহ লাভ করেন এবং হামজাকে অপসারণ করতে চেষ্টা করেন। এ সময় বেশ কিছু লোক তাঁর পক্ষভুক্ত হলে তাঁরা হামজার উৎপীড়নের শিকার হন। দারাজিদের মধ্যে খ্যাতনামা ছিলেন বারজাইল। দারাজিই সর্বপ্রথম খলিফা হাকিমের খোদাই সত্তার কথা ঘোষণা করেন। তাঁর মতানুসারে পৃথিবীর আদিকালে হজরত আদম (আ.) ছিলেন সৃষ্টি-কারণের মূর্ত-প্রতীক এবং তাঁর পরে তাঁর বংশধর ফাতিম বংশের খলিফাদের মধ্যে তা সঞ্চারিত হয়। কায়রোর জামে মসজিদে দারাজি তাঁর এ-সংক্রান্ত গ্রন্থখানি পাঠ করে শোনালে হাকিম তার কোনো প্রতিবাদ করেননি, তবে জনমনে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কথিত আছে, তিনি মদ্যপান এবং নিষিদ্ধ বিয়েকে বৈধ ঘোষণা করেন এবং পুনর্জন্মবাদ বিষয়ে প্রচার করেন। দারাজির বিরুদ্ধে যে গণরোষ সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে তিনি সিরিয়ায় চলে যেতে বাধ্য হন। সেখানে পর্বতবাসীর মাঝে তিনি তাঁর মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। তুর্কিদের সঙ্গে এক যুদ্ধে ১০১৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিহত হন। অন্য মতে, দারাজির শিক্ষায় কায়রোতে যে জনবিক্ষোভের সূচনা হয়, তার প্রতিক্রিয়ায় হাকিমের বাহনে চড়ে পথ অতিক্রমকালে এক তুর্কি বালক ভৃত্য তাঁকে হত্যা করে। দুরুজদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিবরণী পাঠে জানা যায়, হামজার প্ররোচনায়ই দারাজি ও বারজাইলসহ তাঁর অনুগামীদের অনেককে হত্যা করা হয়।

**দারিমি** হাদিস সংগ্রাহক বা মুহাদ্দিস। পুরো নাম আবু মোহাম্মদ আবদ আল্লাহ ইবনে আবদ আল-রাহমান ইবনে আল-ফাদল ইবনে বাহরাম ইবনে আবদ আল-সামাদ আল-তামিমি। জন্ম ১৮১ হিজরি বা ৭৯৭/৮ খ্রিষ্টাব্দে সমরকন্দে। মৃত্যু ২৫৫ হিজরি অর্থাৎ ৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি তাঁর মেধা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য পরিচিত ছিলেন। হাদিসের সন্ধানে তিনি খোরাসান, সিরিয়া, ইরাক, মিসর, হিজাজ প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মুসলিম, আবু দাউদ, আল-তিরমিজি, আল-নাসাই আবদ আল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হানজাল, ঈসা ইবনে উমার আল-সমরকান্দি প্রমুখ অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দরিদ্র জীবন যাপন করতেন। সমরকন্দের কাজি পদে নিযুক্ত হওয়ার পর কেবল একটি মোকদ্দমার বিচার করেই তিনি পদত্যাগ করেন।

**দারুল আমান** নিরাপদ এলাকা, যা পুরোপুরি ইসলামিও নয় আবার সম্পূর্ণ শত্রু-এলাকাও নয়। অমুসলমান শাসনকর্তার অধীনে হলেও যে-এলাকার মুসলমান অধিবাসীরা ইসলামি শরিয়ার প্রধান প্রধান ক্রিয়াকর্ম নিরাপদে পালন করতে পারে। কোনো কোনো মজহাবের আলেমরা দার আল-হারব এবং দার আল-ইসলাম ছাড়াও আরও একটি দার বা আবাসভূমির অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সেটি দারুস-সুলহ । যে দেশ মুসলিম শাসনাধীন নয় অথচ ইসলামের সঙ্গে তার করদ-সম্পর্ক বর্তমান, সেই দেশ হলো দার আল-সুলহ। ইসলামি আইনকানুনে এ সম্পর্কে সুলহান অর্থাৎ চুক্তি মোতাবেক শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

**দারুল-ইসলাম** অর্থাৎ শান্তির এলাকা। ইসলামি শাস্ত্রবিদদের একাংশের মতে, সারা দুনিয়া দুটি এলাকায় বিভক্ত: দারুল-ইসলাম বা শান্তির এলাকা ও দারুল-হরব বা যুদ্ধ-এলাকা। পরবর্তীকালে তৃতীয় একটি এলাকা দারুল-আমন বা নিরাপদ এলাকা নামে অভিহিত হয়েছে। যা পুরোপুরি ইসলামি এলাকাও নয় আবার সম্পূর্ণ শত্রু-এলাকাও নয়। অমুসলিম শাসনাধীন হলেও যেখানে মুসলিম অধিবাসীরা ইসলামি শরিয়তের বিধিবিধানগুলো মোটামুটি নিরাপদে পালন করতে পারে। যে দেশ মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের শাসনাধীন এবং যেখানে ইসলামি শরিয়তের আইনকানুন প্রতিষ্ঠিত, তাকে দারুল-ইসলাম বলা হয়। দারুল-ইসলামের অধিবাসীরা মুসলিম ও অমুসলিম দুই-ই হতে পারে। দারুল-ইসলামে অমুসলিম অধিবাসীদের মুসলিম রাষ্ট্রের শাসন মেনে চলতে হয় এবং তার পরিবর্তে রাষ্ট্র তাদের জীবন ও ধনসম্পদ নিরাপদ রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

**দারুল হরব** বা **দার আল-হারব** অর্থাৎ যুদ্ধ-এলাকা। যে দেশ মুসলমান শাসনাধীন নয়, যেখানে ইসলামি

আইনকানুনগুলো প্রতিষ্ঠিত নয় কিংবা যেখানে ইসলামি বিধিবিধান অনুসরণের পূর্ণ সুযোগ নেই, কোনো কোনো ইসলামি শাস্ত্রবিদের মতে, তা দার আল-হারব বা যুদ্ধ-এলাকা বলে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। তাঁদের মতে, দার আল-হারবকে দার আল-ইসলামে পরিণত করতে জিহাদ মুসলমানের জন্য কর্তব্য। কোনো মুসলমান দেশ দার আল-হরবে পরিণত হলে, সেই দেশের সব মুসলমানের অন্য দেশে হিজরত করা জায়েজ এবং যদি স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে দেশত্যাগ করতে অস্বীকার করেন, সে ক্ষেত্রে তিনিও আইনত পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবেন। পবিত্র কোরআন বা হাদিসের কোথাও অবশ্য দার আল-হারব কথাটার উল্লেখ নেই। তা ছাড়া এই মতবাদ অনুসারে মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর বাকি বিশ্বের বিরুদ্ধে সদা যুদ্ধরত থাকার কথা। যদিও ক্ষতিগ্রস্ত বা হুমকির সম্মুখীন না হলে কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বা যুদ্ধভাব পোষণ ইসলামের মূলনীতি বা শিক্ষার পরিপন্থী।

**দাসপ্রথা** এ ব্যবস্থায় বাজারে মানুষের আনুষ্ঠানিক বেচাকেনা চলত এবং ক্রীত ব্যক্তি ক্রেতার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিগণিত হতো। এ প্রথা প্রায় সব সমাজ ও ধর্মে স্বীকৃত ছিল। গ্রিক দূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায়, পাটলিপুত্রের রাজার নিরাপত্তার দায়িত্ব ক্রীতদাসীদের ওপর ন্যস্ত ছিল। সব ধর্মেই ক্রীত দাসদাসীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের উপদেশ রয়েছে। পবিত্র কোরআনের সুরা নিসার ৩৬ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।' একসময় ক্রীতদাস-ব্যবসা একটি আইনসম্মত ব্যবসা হিসেবে স্বীকৃত ছিল। পরবর্তীকালে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পৃথিবীর সব সভ্য দেশেই দাস ক্রয়-বিক্রয় এবং ক্রীতদাস আমদানি-রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়। ধর্মীয় আইন বা অনুশাসন দ্বারাও ক্রীতদাস প্রথাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। উপমহাদেশে ১৮৪৩ সালে আইন দ্বারা দাসপ্রথাকে নিষিদ্ধ করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সব ধরনের জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ।

**দাহরিয়া** ইসলামের আদিপর্বে প্রচলিত একটি বস্তুবাদী মতবাদ। পবিত্র কোরআনের সুরা দাহর-এর ২৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওরা সহজলভ্য পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং পরবর্তী কঠিন দিনগুলোকে উপেক্ষা করে চলে।' যারা আল্লাহর একত্ব, তাঁর দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও পরিচালনার কথা, ধর্মের প্রচারিত মতবাদ (অর্থাৎ ঐশী বিধানগুলো, পারলৌকিক জীবন ও পাপের শাস্তি) অস্বীকার করে এবং যারা বলে যে, কাল ও বস্তু উভয়ই অবিনশ্বর এবং জাগতিক সব ঘটনার মূল কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মগুলো (কিংবা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি), তাদেরকে পবিত্র কোরআনের উপরিউক্ত আয়াত মতে, দাহরিয়া নাম দেওয়া হয়। তাদের শিক্ষার মূল কথা, কালের আরম্ভ বা অন্ত নেই, তা অনাদি-অনন্ত। ইসলামি সাহিত্যে দাহরিয়া বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অর্থ-বাচক কোনো সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। দাহরিয়াদের মতবাদ বা শিক্ষা সম্বন্ধে ধর্মতাত্ত্বিক সাহিত্যে অবশ্য বিভিন্ন বর্ণনা বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। শাহরাস্তানি তাদের সম্বন্ধে এক জায়গায় বলেছেন যে তারা জ্ঞান দ্বারা বোধ্য বিষয়গুলোর (মাকুলাত) অস্তিত্ব অস্বীকার এবং কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধগম্য বস্তুগুলোর (মাহসুসাত) অস্তিত্বই স্বীকার করে। দাহরিয়া শব্দের এমন একটি সংজ্ঞা পাওয়া যায়, যাতে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে; কিন্তু তাতে বলা হয়েছে, মহাশূন্যে দ্রুত ঘূর্ণমান পরমাণুগুলোর উদ্দেশ্যহীনভাবে মিলনই জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ। এই মতের অনুসারীদের তাই পরমাণুবাদীও বলা যায়। দাহরিয়া শব্দটি বাংলা অনুবাদে আসলে 'জড়বাদী' বা 'নিসর্গবাদী' এর সর্বাধিক নিকটবর্তী। 'অদৃষ্টবাদী' এর সঠিক প্রতিশব্দ নয়।

**দিগ্‌গজ** পুরাণমতে অষ্টদিক রক্ষাকারী হস্তীসকল। ঐরাবত পূর্ব দিক, অঞ্জন পশ্চিম দিক, সার্বভৌম উত্তর দিক, বামন দক্ষিণ দিক, পুণ্ডরীক অগ্নি কোণ, কুমুদ নৈর্ঋত কোণ, সুপ্রতীক ঈশান কোণ ও পুষ্পদন্ত বায়ু কোণ রক্ষা করেন।

**দিগ্‌দর্শন** মাসিক পত্রিকা। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িকপত্র এটি। খ্রিষ্টধর্মপ্রচারক জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান ছিলেন এর

সম্পাদক। ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা বের হয়।

**দিয়ত** কতলে আমাদ, কাতলে খাতা এবং কাতলে শিবহুল আমদ দ্র.।

**দীক্ষা** দীক্ষা বলতে সাধারণত গুরুর কাছে মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করার আনুষ্ঠানিকতাকে বোঝানো হয়। ব্যাপক অর্থে যেকোনো মহৎ সংকল্প সাধনের লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞাই হলো দীক্ষা। মন্ত্রদীক্ষার বেলায় দীক্ষা গ্রহণের আগে গ্রহণীয় মন্ত্রের সঙ্গে গ্রহণকারীর নাম, জন্মনক্ষত্র, জন্মরাশি ইত্যাদি মিলিয়ে দেখার বিধান রয়েছে। যে দেবতার আরাধনা করার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করা হয় তাঁর নাম ও গৃহীত মন্ত্র অন্য সবার কাছ থেকে গোপন রাখাই নিয়ম। ষোড়শ শতাব্দীতে স্মৃতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য বঙ্গদেশে তান্ত্রিক দীক্ষার প্রবর্তন করেন। কোনো কোনো মতে, দীক্ষাদানে নিজের মা-ই হতে পারেন সর্বোত্তম গুরু। অনুকূল, জগবন্ধু, মতুয়া, মানিক প্রভৃতি গুরুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বহু সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। এখন যে-কেউ যেকোনো সম্প্রদায়ের গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। সব বর্ণের হিন্দু দীক্ষা গ্রহণের অধিকারী, যদিও সবার সব মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার অধিকার নেই। দীক্ষাগ্রহণে দীক্ষিতের পাপ ক্ষয় হয়। বহির্দীক্ষায় পূজা, হোম প্রভৃতি বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। অন্তর্দীক্ষায় মানুষের আত্মশক্তির জাগরণ ঘটে।

**দীন** আরবি শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আরামীয় হিব্রু থেকে গৃহীত দীন শব্দের অর্থ প্রতিফল বা বিচার। বিশুদ্ধ আরবি শব্দ হিসেবে দীনের অর্থ রীতিনীতি বা প্রথা। আর এর তৃতীয় অর্থ হলো ধর্ম। প্রাক-ইসলাম যুগ থেকে এই তিন অর্থেই দীন শব্দটি প্রচলিত। এমনিতে যেকোনো ধর্মকে বোঝাতে দীন শব্দ ব্যবহার করা হলেও, পবিত্র কোরআন ও হাদিসে একমাত্র আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের বেলায় শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইসলামের পাঁচটি মূল নীতি এবং ইমান ও ইহসানের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য পালন হলো দীনের কাজ। পবিত্র কোরআন, হাদিস, ফিকাহ, উসুল, তফসির ও তৎসংক্রান্ত সব বিষয়ের জ্ঞান হলো আল-উলুম আল-দীনিয়া বা সংক্ষেপে দীনিয়াত। দীন কথাটার মানে শুধু বিশ্বাস নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। এর অর্থ স্রষ্টা আর সৃষ্টির মধ্যে বন্ধন এবং সে বন্ধন মেনে জীবনাচরণ। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সুরা রুম-এর ৩০ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দীনে বা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখো। তুমি আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ করো। যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন নেই। এটি সরল দীন বা ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।'

**দীন-ই-ইলাহি** ফারসি ভাষায় কথাটার অর্থ খোদা বা ঈশ্বরের ধর্ম। ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর এটি প্রচার করেন। এটি একটি সমন্বয়বাদী ধর্ম। ইসলাম, হিন্দু, খ্রিষ্টান, জৈন ও পারশিক ধর্মের উপাদান নিয়ে এই ধর্ম সৃষ্টি করা হয়। আকবর তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেকার বিভেদ দূর করে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়েই প্রধানত এই ধর্মের প্রবর্তন করেন। ১৫৭৫ সালে শেখ মুবারক এবং তাঁর দুই পুত্র ফৈজি ও আবুল ফজলের সংস্পর্শে এসে আকবর বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ফতেপুর সিক্রিতে একটি ইবাদতখানা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হতো। ধর্ম সম্পর্কে জানতে গিয়ে আকবর লক্ষ করেন, বিভিন্ন ধর্মের মূল শিক্ষার মধ্যে যেমন মিল আছে তেমনি ধর্মীয় আচারপ্রথা, এমনকি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অমিলও কম নয়। এই পার্থক্য থেকেই মানুষের মধ্যে বিভেদ-বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এর আগে তিনি সাম্রাজ্যের অমুসলিম প্রজাদের ওপর আরোপিত 'জিজিয়া' কর প্রত্যাহার, হিন্দুদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। পরে তিনি একটি একক ধর্ম প্রচারের উদ্যোগ নেন। এ ব্যাপারে তাঁর 'নবরত্ন'সভার কয়েকজন গুণী ব্যক্তি, বিশেষ করে আবুল ফজল ও ফৈজি তাঁকে সাহায্য করেন। দীন-ই-ইলাহি নামে প্রচারিত এই ধর্মে দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি ইত্যাদি গুণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর লালসা, অহংকার,

পরনিন্দা ইত্যাদিকে পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। এই ধর্মে পুরোহিততন্ত্রের স্থান ছিল না। জীব হত্যাকে নিষিদ্ধ করা হয়। আবুল ফজল, শেখ ফৈজি, টোডরমলসহ সম্রাটের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন পারিষদ এবং রাজকুমার সেলিমসহ পরিবারের কয়েকজন সদস্য তাঁর প্রচারিত এই ধর্মে দীক্ষা নেন। শেখ আহমদ সিরহিন্দি ও আরও কয়েকজন ইসলামি আলেম এই ধর্ম প্রচারের জন্য আকবরকে খোদাদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করেন। আকবরের মৃত্যুর পরই কার্যত এই ধর্মের অবসান ঘটে।

**দুঃখ** জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ দৈহিক ও মানসিক দুঃখ পেয়ে থাকে। হিন্দুধর্মে মানুষকে সুখে-দুঃখে সমান অবিচলিত থাকতে বলা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে দুঃখ অস্তিত্বের তিনটি বৈশিষ্ট্যের একটি এবং চারটি পরম সত্যের একটি। বৌদ্ধধর্মে দুঃখকে তিন ও চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগে রয়েছে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা থেকে দুঃখ, রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান থেকে দুঃখ এবং অবস্থার পরিবর্তন থেকে দুঃখ। দ্বিতীয় ভাগটি করা হয়েছে এভাবে: অপ্রকাশমান দুঃখ, প্রকাশমান দুঃখ, অপ্রত্যক্ষ দুঃখ ও প্রত্যক্ষ দুঃখ। ইসলাম ধর্মেও দুঃখে বিমর্ষ ও আনন্দে উল্লসিত না হয়ে বিশ্বাসীদের মধ্যপন্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মানুষকে যখন দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে, তখন সে আল্লাহকে ডাকে এবং তার দুঃখ দৈন্যের অবসান হলে সে আল্লাহকে ভুলে যায়।

**দুয়া/দোয়া** শব্দটির অর্থ যাঞ্চা, প্রার্থনা, আকাঙ্ক্ষা। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করাকেই দুয়া বা দোয়া বলা হয়। পবিত্র কোরআনে মানুষকে দোয়া করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কী প্রার্থনা করতে হবে, তাও অনেক স্থানে বলে দেওয়া হয়েছে। নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে হজরত আদম (আ.) যখন অনুতপ্ত হয়েছিলেন, তখন আল্লাহ তাঁকে যে দোয়া শিখিয়েছিলেন, তা বিখ্যাত। একই রকম বিখ্যাত পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত হজরত ইউনুস (আ.)-এর দোয়া। হাদিসেও অনেক দোয়ার উল্লেখ আছে। পবিত্র কোরআন-হাদিসের দোয়া ছাড়াও মুসলমানদের মধ্যে আরও নানা দোয়া প্রচলিত আছে; যেগুলো প্রধানত ইমাম ও অলিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত। মওলানা আশরাফ আলী থানভির *মুনাজাতে মকবুল* নামক দোয়ার পুস্তকটি উপমহাদেশে বেশ জনপ্রিয়। জুমার রাত, শবে বরাত, শবে কদর এবং সাধারণভাবে গভীর রাতকে দোয়ার জন্য প্রশস্ত সময় বলে বিবেচনা করা হয়। হাদিসে বলা হয়েছে যে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি ও অত্যাচারিতের দোয়া শিগগিরই আল্লাহর কাছে পৌঁছায়।

**দুর্গাপূজা** দুর্গা পৌরাণিক দেবী। তিনি আদ্যাশক্তি, মহামায়া, শিবানী, ভবানী, দশভুজা, সিংহবাহনা ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। দুর্গ বা দুর্গম নামক দৈত্যকে বধ করায় তাঁর নাম দুর্গা। আবার জীবের দুর্গতি নাশ করেন বলে তাঁকে বলা হয় দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। ব্রহ্মার বরে পুরুষের অবধ্য মহিষাসুর নামে এক দানব স্বর্গরাজ্য দখল করলে রাজ্যহারা দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণুর নির্দেশে তখন সব দেবতার তেজঃপুঞ্জ থেকে দুর্গার জন্ম হয়। দেবতাদের শক্তিতে শক্তিময়ী এবং বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে তিনি যুদ্ধে মহিষাসুরকে বধ করেন। এ থেকে তাঁর আরেক নাম হয় মহিষমর্দিনী। পুরাণমতে, দুর্গা মহাদেব বা শিবের স্ত্রী। তাঁর গায়ের রং অতসী ফুলের মতো সোনালি হলুদ। তিনি দশভুজা ও ত্রিনয়নী। তাঁর বাহন সিংহ। *দেবীপুরাণ, দেবী ভাগবত, কালিকাপুরাণ, দুর্গোৎসববিবেক, দুর্গোৎসবতত্ত্ব* প্রভৃতি গ্রন্থে দুর্গা সম্পর্কে বর্ণনা আছে। পুরাণে উল্লেখিত আছে যে পুরাকালে রাজ্যহারা রাজা সুরথ এবং স্বজনপ্রতারিত বৈশ্য সমাধি মেধস মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলে তাঁর পরামর্শে উভয়েই দেবী দুর্গা বা ভগবতীর পূজা করেন। পূজায় তুষ্ট হয়ে তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ করেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসারে রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে শরৎকালে দেবীর পূজা করেছিলেন বলে এর নাম হয় অকালবোধন বা শারদীয়া দুর্গাপূজা। লঙ্কারাজ রাবণ চৈত্র মাসে দুর্গাপূজা করতেন। বসন্তকালে দুর্গাপূজা হলে তাকে বলা হয় বাসন্তী পূজা। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গসহ সর্বত্র বাঙালিরা সাধারণত শরৎকালেই দুর্গাপূজা করে। বাসন্তী পূজা হয় চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে, আর শারদীয়া পূজা হয় আশ্বিন বা কার্তিকের শুক্লপক্ষে।

শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে দেবীর বোধন হয় এবং সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে (মহানবমী) পূজা দিয়ে দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। ওই দিন কোথাও কোথাও দশোহরার মেলা হয়। পূজা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন নতুন পোশাক পরে। তা ছাড়া আলিঙ্গন, প্রণাম, আশীর্বাদ ইত্যাদির মাধ্যমে তারা একে অপরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। দশোহরার মেলার দিন নৌকাবাইচ হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অবাঙালিরাও ভিন্ন ভিন্ন নামে, যেমন—কাশ্মীর ও দাক্ষিণাত্যে অম্বা ও অম্বিকা, গুজরাটে হিঙ্গুলা ও রুদ্রাণী, কান্যকুব্জে কল্যাণী, মিথিলায় উমা প্রভৃতি নামে দেবী দুর্গার পূজা হয়।

**দুর্যোধন** মহাভারতে বর্ণিত অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মাতা গান্ধারী। এক শ ভ্রাতার মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। ভীম ও দুর্যোধন একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠিরসহ পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে দুর্যোধন ও তাঁর কৌরব ভ্রাতারা একই সঙ্গে প্রতিপালিত হন। দ্রোণাচার্য ও শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা বলরামের কাছে তিনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন এবং গদাযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী হন। পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক কারণে শত্রুতা সৃষ্টি হলে তিনি পাণ্ডবদের জতুগৃহে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করেন। তাতে ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় আহ্বান করেন। খেলায় কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করে তিনি যুধিষ্ঠিরকে পরাস্ত করেন। শর্তানুযায়ী পাণ্ডব ভ্রাতারা বনবাসে যেতে বাধ্য হন। বনবাস থেকে ফিরে আসার পর পাণ্ডবদের রাজ্যের অংশ দিতে দুর্যোধন অস্বীকৃতি জানান। এ থেকেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। দুর্যোধন ছিলেন যুদ্ধে কৌরবপক্ষের প্রধান সেনাপতি। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি প্রথমে আত্মগোপন করেন ও পরে ভীমের সঙ্গে গদাযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধকালে কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে দুর্যোধনের উরুতে আঘাত করেন। ফলে উরুভগ্ন হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

**দেওবন্দ দারুল উলুম** দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম বেসরকারি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়। অনেকের কাছে এটি ‘এশিয়ার আল-আজহার’ নামে পরিচিত। এটি ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ শহরে অবস্থিত। ১৮৬৬ সালের ৩০ মে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতের মুসলমানরা যখন খুব অসহায় ও দিশাহারা অবস্থার মধ্যে পড়ে, তখন তাদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও ইসলামি পুনরুজ্জীবনবাদী চেতনা বিস্তারের লক্ষ্যে মওলানা কাসিম নানুতাবির (১৮৩২-৮০ খ্রি.) নেতৃত্বে দেওবন্দের সাত্তা মসজিদে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু হয়। এর প্রথম শিক্ষক ছিলেন মুল্লা মাহমুদ দেওবন্দী। ব্রিটিশবিরোধী রেশমি রুমাল আন্দোলনের নায়ক মাহমুদ আল-হাসান ছিলেন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রথম ব্যাচের ছাত্র, যিনি পরবর্তীকালে শায়খ আল-হিন্দ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ক্ষেত্রে যে আটটি মূলনীতি গ্রহণ করা হয়, তার উদ্দেশ্য ছিল মাদ্রাসাটিকে সরকার ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। নিয়ম অনুযায়ী আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের পর এতে দাওরা-ই হাদিস পর্যন্ত আরও আট বছর আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, দর্শন, ফিকাহ, উসুল-ই-ফিকাহ, হাদিস, উসুল-ই-তফসির, ফারাইদ, আকাইদ, কালাম, মুলজারা, কিরাআত, তাজবিদ এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হয়। দাওরা-ই-হাদিসের পর এক বছর মেয়াদি তাকমিল-ই-তফসির, তাকমিল-ই-মাকুলাত, তাকমিল-ই-দীনিয়াত ও দওয়া প্রশিক্ষণ এবং দুই বছরের তাকমিল-ই-সাদার ও চার বছরের জন্য ইউনানি চিকিৎসাবিজ্ঞানে পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট আছে। একসময়ে এর সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু। ভারতের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটির গ্রন্থাগারেই সর্বাধিক সংখ্যক ইসলামবিষয়ক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান—উপমহাদেশের এই তিনটি দেশেই দেওবন্দের অনুসারী বহু মাদ্রাসা রয়েছে, যেগুলো কওমি মাদ্রাসা নামে পরিচিত। এগুলোর মধ্যে যেগুলো সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত সেগুলোকে সাধারণত খারিজি মাদ্রাসা বলা হয়।

**দেওয়াল পূজা** তিব্বতে প্রচলিত এক রকম পূজা। নিচু, লম্বা মাটি ও পাথরের দেওয়ালের গায়ে প্রশস্ত

পাথরের টুকরো বিছানো ও তাতে তিব্বতীয় মোটিফ আঁকা থাকে। এ ধরনের দেওয়াল সাধারণত সিকি মাইল দীর্ঘ হয়। ধর্মপ্রবণ তিব্বতবাসী উপকারের আশায় এই দেওয়ালের ওপর দিয়ে হাঁটে।

**দেওয়ালি** উৎসববিশেষ। এটি দীপাবলি, দীপান্বিতা, দীপালিকা, সুখরাত্রি, সুখসুপ্তিকা এবং যক্ষরাত্রি নামেও অভিহিত হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় এই উৎসব পালন করে থাকে। মহালয়ায় শ্রাদ্ধগ্রহণের জন্য যমলোক ছেড়ে যে পিতৃপুরুষেরা মর্তে আগমন করেন, এই ধারণা থেকে তাঁদের পথ প্রদর্শন করতে আলোকসজ্জা করা ও বাজি পোড়ানো হয়। এ উপলক্ষে ঘরের বাইরে ও দরজা-জানালায় প্রদীপ বা মোমবাতি জ্বালানো হয়। কেউ কেউ লম্বা বাঁশের মাথায় কাগজের তৈরি ছোট ঘরে আকাশপ্রদীপ জ্বালে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে কার্তিকী অমাবস্যায় কালীপূজা কিংবা কোথাও কোথাও লক্ষ্মীপূজাও হয় এবং নানাবিধ বাদ্যের দ্বারা অলক্ষ্মীকে বিদায় করা হয়। রাবণবধের পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এলে যে আনন্দোৎসব হয়েছিল, তার স্মরণেই এ উৎসব পালিত হয়। বৌদ্ধরা বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ স্মরণে এ উৎসব পালন করে। জৈনরা মহাবীরের নির্বাণ দিবস উপলক্ষে অমাবস্যার আগের দিন চতুর্থী তিথিতে আলোকসজ্জা করে। কৃষ্ণ কর্তৃক নরকাসুর বধের স্মারক হিসেবে একে নরকচতুর্দশীও বলা হয়।

**দেব বা দেবতা** শব্দটির আভিধানিক অর্থ অমর বা সুর। আর এর একটি সম্প্রসারিত অর্থ হলো যিনি বা যাঁরা আপন কীর্তি বা দীপ্তি দ্বারা বিশ্ব ব্যাপ্ত করেন। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষা ও সাহিত্যেই 'দেবতা' শব্দটির অস্তিত্ব রয়েছে। এই অর্থে সংস্কৃতে দেবস্, লাতিন ভাষায় দেবস্ বা দেইতাস, লিথুয়ানিয়ায় দেবস্, ইংরেজিতে ডেইটি, ফরাসিতে দেইতি, ইতালিতে দেইতা, স্প্যানিশ ভাষায় দেইদাদ, প্রুশিয়ায় দেইতাত, ফারসিতে দার্ব, জার্মানিতে দেইদাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় মতে, প্রজাপতি ঋষি কশ্যপের ঔরসে ও অদিতির গর্ভে দেবতাদের জন্ম।

পুরাণে ৩৩ কোটি দেবতার উল্লেখ আছে। দেবতাদের রাজা হলেন ইন্দ্র। তাই তাঁকে দেবরাজ বলা হয়। রামায়ণ, মহাভারত, জাতক, গ্রিক পুরাণ ও মহাকাব্যে দেবতার বহুল উল্লেখ রয়েছে। ঋগ্‌বেদে অদিতি, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎ, প্রজাপতি, বিষ্ণু, সবিতা প্রভৃতি দেবতার নাম আছে। চার বেদেও প্রায় একই দেবতাদের নাম আছে। অথর্ববেদে শুধু যম, মৃত্যু, কাল ইত্যাদি কয়েকজন দেবতার নাম আছে। বেদের দেবতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁদের মহিমা স্তব করে স্তোত্র পাঠ করা হয় তাঁরা 'স্তোত্রাঙ্গ দেবতা'। আর যাঁদের উদ্দেশে যজ্ঞ করা হয় তাঁরা 'যাগাঙ্গ দেবতা'। যৈমিনি মুনির মতে, দেবতারা কোনো শরীরী অস্তিত্ব নন, আসলে মন্ত্রই দেবতা। দেবতারা শরীরী হলে কখনো না কখনো ভক্তকে দেখা দিতেন। আবার কারও কারও মতে, দেবতারা শরীরী এবং হিমালয় পর্বতমালার নির্দিষ্ট উঁচু ভূমিতে তাঁরা বাস করেন। গ্রিকদের প্রধান দেবতার নাম জিউস। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য দেব-দেবীদের মধ্যে রয়েছেন পোসেইডন, অ্যাপোলো, আফ্রোদিতি, আরেস, হেরা, আর্তেমিস, আথেনা, দেমেতের, দিওনিসুস প্রমুখ। গ্রিক দেবরাজ জিউসই রোমানদের কাছে জুপিটার নামে পরিচিত। এ ছাড়া রোমানদের উল্লেখযোগ্য দেব-দেবীদের মধ্যে রয়েছেন অরোরা, স্যাটার্ন, জুনো প্রভৃতি।

**দেবতা জন্মতত্ত্ব ও কুলুজিবিদ্যা** (Theogony) যে শাস্ত্রে দেবতাদের জন্মতত্ত্ব ও তাঁদের বংশধরদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকেই বলা হয় দেবতা জন্মতত্ত্ব ও কুলুজিবিদ্যা।

**দেবদাসী** দেবমন্দিরের সেবিকা। অতীতে তাদের বলা হতো কলাবতী অর্থাৎ শিল্পকর্মে পারদর্শিনী। তাদের দায়িত্ব ছিল মন্দিরের মেঝে ঝাড় দেওয়া, পবিত্র প্রদীপে তেল ঢালা, পূজামণ্ডপে ও ধর্মীয় শোভাযাত্রায় নৃত্য-গীত করা এবং পূজার সময় প্রতিমাকে বাতাস দেওয়া। এ কাজের জন্য মন্দিরের তহবিল থেকে তাদের যা প্রদান করা হতো, তা তাদের জীবন নির্বাহের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এ কারণে তারা মাঝে মাঝে ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে উঠত ও অসদাচারী জীবন গ্রহণ

করত। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, দেবদাসী প্রথার উদ্ভব হয়েছে গর্ভধারণ ও পুনঃপ্রজননের দেবীর পূজাকে ভিত্তি করে। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে মেয়েকে দেবীমাতার নামে উৎসর্গ করার প্রথা চালু ছিল। ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে নর্তকীদের নিয়োগ করা হতো। দেবতাদের আনন্দ প্রদানের জন্য সৃষ্ট এ প্রথা শাসক ও সমাজপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্রুত বিকাশ লাভ করে। অনেক দেবদাসীকে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করে তাদের আসলে নিঃসন্তান অভিজাত পুরুষদের সন্তান ধারণের জন্য যৌনমিলনের কাজে ব্যবহার করা হতো। এসব সন্তান পরবর্তীকালে ঠাকুরদাদার নাম ধারণ করে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো।

ভারতে দেবদাসী প্রথার ব্যাপক প্রচলন হয় অষ্টম শতাব্দীতে পুণ্ড্রবর্ধন নগরে। বাৎস্যায়ন তার *কামসূত্র*-এ সমসাময়িক ভারতে দেবদাসীদের সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। পুণ্ড্রবর্ধন নগরের দেবদাসীরা বিলাসী এবং কামাচারপূর্ণ জীবন যাপন করত। দেওপাড়ায় প্রাপ্ত তাম্রফলক অনুযায়ী বিজয় সেন এবং ভট্ট ভবদেব তাঁদের মন্দিরে শত শত দেবদাসী নিয়োগ করেছিলেন। *রামচরিতম* এবং *পবনদূত* গ্রন্থে দেবদাসীদের জীবনযাত্রার বর্ণনা দেওয়া আছে। প্রবাদ অনুযায়ী আসামের কামাখ্যার মন্দিরে একসময় ৫ হাজার দেবদাসী ছিল। নিয়ম অনুযায়ী অল্প বয়স থেকে দেবদাসী হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তাদের অন্ধকার থাকতে থাকতে ঘুম থেকে উঠে দুঘণ্টা এবং সন্ধ্যার সময় দুঘণ্টা নৃত্যগীত শিখতে হয়। তাদের ভরণপোষণের জন্য মন্দির থেকে বৃত্তি নির্দিষ্ট থাকে। তারা কাউকে বিয়ে করতে পারে না। সম্প্রতি ভারতে কিছু কঠোর আইন বলবৎ হওয়ার ফলে দেবদাসী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পথে। বর্তমানে দক্ষিণ ভারত ছাড়া আর কোথাও দেবনর্তকী প্রথার প্রচলন নেই। প্রাচীনকালে মিসর, গ্রিস, সিরিয়া, ফিনিসিয়া, আর্মেনিয়ায় প্রভৃতি দেশের দেবালয়ে অনেক নর্তকী ছিল। যেমন গ্রিসের ভিনাস দেবীর মন্দিরে এই নিয়ম চালু ছিল।

**দেবদূত** (Angel) ঈশ্বরের বার্তাবাহক। অশরীরী অমর আত্মা। দেবদূত কাহিনির সূচনা প্রাচীন পারসিক ধর্মে এবং পরবর্তীকালে ইহুদি ধর্মের মাধ্যমে তা সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। ভালো দেবদূতদের সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম মনে করা হয়। তারা স্বর্গে বাস করে এবং দৃশ্য ও অদৃশ্যভাবে পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে পারে। পৌরাণিক আখ্যান, উপকথা ও চিত্রমালায় কখনো কখনো পাখাসহ তারা চিত্রিত ও বর্ণিত হয়। বাইবেল মতে, কতক দেবদূত মানুষের নিরাপত্তা বিধান করে। পক্ষান্তরে খারাপ দেবদূতেরা শয়তানের নেতৃত্বে মানুষকে কুপথে পরিচালিত করে। দান্তের *ডিভাইন কমেডি* ও মিল্টনের *প্যারাডাইজ লস্ট* কাব্যগ্রন্থ দুটিতে দেবদূতদের নানা কথা বর্ণিত আছে। স্বর্গীয় দেবদূতেরা প্রকৃতির কার্যাবলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত অর্থাৎ তারা বায়ু ও আলোর সঙ্গে যুক্ত। সাধারণভাবে দেবদূতদের কাজ হলো মানুষকে রক্ষা করা, মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে মধ্যস্থতা করা এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষের কাছে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ নিয়ে আসা। খ্রিষ্টধর্মে দেবদূত কাহিনি প্রচলিত আছে। অনুরূপভাবে ইসলাম ধর্মেও ফেরেশতার কাহিনি আছে। দেবদূত বা ফেরেশতাদের আলাদা আলাদা দায়িত্ব ভাগ করা আছে।

**দেবী** হিন্দু পুরাণমতে, মহাদেবের স্ত্রী, হিমালয়ের কন্যা। তাঁর দুই রূপ: স্নিগ্ধা ও উগ্রা। স্নিগ্ধ ভাবের জন্য তাঁর নাম গৌরী, পার্বতী, উমা, ভবানী, জগন্মাতা ও হৈমবতী। আবার উগ্রমূর্তির জন্য তিনিই চণ্ডী, চণ্ডিকা, ভৈরবী, শ্যামা ও কালী নামে পরিচিতা। এ ছাড়াও তাঁর জন্ম ও গুণসূচক অন্যান্য নাম রয়েছে, যেমন: অম্বিকা, আদ্রিজা, অনন্তা, আর্যা, গিরিজা, কন্যা, কন্যাকুমারী, সতী, বিজয়া, ঋদ্ধি, কর্ণমোতি, দক্ষিণা, ভ্রামরী, শিবদূতি সর্বমঙ্গলা, সিংহরথী প্রভৃতি। স্বামী মহাদেবের দেওয়া নাম: ভগবতী, ঈশানী, ঈশ্বরী, কপালিনী, কৌশিকা, কিরাতি, মহেশ্বরী, রুদ্রাণী, সর্বাণী, শিবা ও ত্র্যম্বকী। ভীষণ মূর্তির জন্য দেবী মহাকাশী, ভদ্রকালী, ভীমাদেবী, চামুণ্ডা, মহামারী, মহাসুরী, মাতাঙ্গী ও রক্তদন্তী নামেও উল্লেখিত হন।

**দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর** ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রবর্তক। জন্ম ১৮১৭ সালের ১৫ মে, কলকাতার জোড়াসাঁকোয়।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা। খুব অল্প বয়সেই তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং ধর্ম বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি তাঁর প্রচারকাজে ব্রতী হন। ১৮৪৮ সালে তিনি দুই খণ্ডে *ব্রাহ্মধর্ম* গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তুলে ধরা হয়। রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' এবং *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি পুরোপুরি ধর্মচর্চায় মনোনিবেশ করেন। বোলপুর শান্তিনিকেতনের তিনিই আদি প্রতিষ্ঠাতা। ব্রাহ্মচর্চা ও উপাসনার জন্য এই স্থানটি তিনিই নির্বাচন করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করে।

**দেবোত্তর** দেব-দেবীর উদ্দেশে কিংবা মন্দির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, পূজা-অর্চনা, ব্রাহ্মণ ও কাঙালিভোজ বা অন্যবিধ ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান পালনের জন্য উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি। এ ছাড়া হাসপাতাল ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি, অতিথিশালা নির্মাণ ও তার সংস্কার-সংরক্ষণ এবং এ ধরনের আরও অনেক কাজ দেবোত্তরের আওতায় পড়তে পারে। মানসিকভাবে সুস্থ যেকোনো সাবালক হিন্দু সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি উপরিউক্ত কাজের জন্য উৎসর্গ করতে পারেন। উৎসর্গীকৃত সম্পদে দাতার আর কোনো স্বত্ব থাকে না এবং একবার দেবোত্তর সম্পদ বলে নির্ধারিত হওয়ার পর তা আর বাতিল করা যায় না। দেবোত্তর দুই রকমের হতে পারে : সম্পূর্ণ দেবোত্তর এবং আংশিক দেবোত্তর। আংশিক দেবোত্তরে উত্তরাধিকারের পরম্পরা বর্তায় এবং তা হস্তান্তরযোগ্য। তবে যেকোনো অবস্থায়ই এতে দাতার নির্দেশ বহাল থাকে। দেবোত্তর সম্পত্তি অবশ্যই শর্তহীনভাবে ও চিরতরে দান করতে হয় এবং যে উদ্দেশ্যে দান করা হয়েছে তাও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হয়। দেবোত্তর সম্পত্তি দানের ক্ষেত্রে কোনো রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন কিংবা এ ব্যাপারে ট্রাস্ট গঠন করতেও কোনো লিখিত দলিলের দরকার হয় না। তবে ইচ্ছাপত্র মূলে দলিল সম্পাদন করলে সে ক্ষেত্রে তা সুস্পষ্টভাবে লিখতে হয়, অর্থাৎ তা যেন দ্ব্যর্থবোধক না হয়। ওই ইচ্ছাপত্র দুই বা ততোধিক ব্যক্তি দ্বারা আইনত সত্যায়িত করা প্রয়োজন। অবশ্য কেবল দলিল সম্পাদন করলেই কোনো সম্পদ দেবোত্তর বলে গণ্য হয় না। উৎসর্গীকৃত সম্পদকে বর্ণিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করতে ও কাজে লাগাতে হয়। যখন কোনো দাতা তাঁর বিষয়সম্পদের ভোগদখল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে তাকে দেবোত্তরে পরিণত করেন, তখন দেবতার পক্ষে সেই সম্পদ দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেবাইত বা মোহান্ত নিযুক্ত করতে হয়। সেবাইত বা মোহান্ত সে ক্ষেত্রে শুধু পূজারী বা অর্চক নন, তিনি সম্পদের সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনারও যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি প্রায়শ কোনো মন্দিরে স্থানান্তরিত হয় আর এই ধরনের মন্দিরের ব্যবস্থাপককে সেবাইত বলা হয়। মঠের ক্ষেত্রে একজন মোহান্ত এই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি করেন। আইনি প্রয়োজন ছাড়া কোনো সেবাইত দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারেন না। অসদাচরণের জন্য সেবাইতকে তাঁর দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা যেতে পারে। আদালতও তাঁকে তাঁর ব্যবস্থাপনাধীন দেবোত্তর সম্পত্তির হিসাব দাখিলের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

**দেহত্যাগের মার্গ** বৈদিক মতে, দেহত্যাগের দুটি মার্গ আছে, একটি শুক্ল এবং অপরটি কৃষ্ণ। কেউ শুক্লমার্গে দেহত্যাগ করলে তাকে আর জড়জগতে ফিরে আসতে হয় না। কিন্তু কৃষ্ণমার্গে দেহত্যাগ করলে তাকে ফিরে আসতে হয়।

**দৈত্য** ১. মনুষ্যসদৃশ বিশালদেহী ও মহাশক্তিশালী কাল্পনিক প্রাণী। হিন্দু, গ্রিক, জার্মান, কেলটিক প্রভৃতি জাতির পৌরাণিক উপাখ্যান এবং পৃথিবীর প্রায় সব দেশের শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত গল্প-উপাখ্যানে এমন ধরনের প্রাণীর সাক্ষাৎ ও তাদের কার্যকলাপের বর্ণনা পাওয়া যায়। ২. হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী ঋষি কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে যে পুত্রদের জন্ম হয়, তারাই দৈত্য নামে পরিচিত। এরা দেবকুলের চিরশত্রু। কশ্যপ

ছিলেন বিখ্যাত প্রজাপতি ঋষি। তিনি দক্ষ রাজার ১৩ কন্যাকে বিয়ে করেন। কন্যাদের নাম অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্ঠা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা ও তিমি। সেই ১৩ কন্যা থেকে ১৩টি জাতির উদ্ভব হয়। অদিতি থেকে দেবতারা, দিতি থেকে দৈত্যকুল, দনু থেকে দানবেরা ইত্যাদি। দৈত্যদের প্রধান কাজ দেবতাদের যজ্ঞ ও পূজা নষ্ট করা। দেবতাদের সঙ্গে দৈত্যদের অসংখ্য যুদ্ধের কাহিনি ও জয়-পরাজয়ের বিবরণ রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে বর্ণিত আছে। *শাহনামায়* মজিন্দিয়ানের দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে রুস্তম জয়ী হয়েছিলেন। এ ছাড়া আরব্যরজনী, পারস্যরজনী এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকসাহিত্যে ও প্রায় সব দেশের রূপকথায় দৈত্যদের নানা কাহিনি রয়েছে।

**দৈবদুর্বিপাক** দৈবনির্ধারিত দুর্যোগ। এমন বড় বিপদ বা দুর্ঘটনা, যার ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। যা প্রকৃতি বা নিয়তিনির্ধারিত। এবং যার সম্পর্কে আগে থেকে কিছু জেনে সতর্ক হওয়া কিংবা তাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

**দৈবপ্রতীক বা পূজাবস্তু** কোনো দেব বা দেবীর প্রতিমা নির্মাণ না করে যখন কোনো স্তম্ভ বা প্রস্তরখণ্ড সেই দেব বা দেবীর প্রতীক হিসেবে উপাসিত হয়।

**দোম আন্তোনিও দো রোজারিও** জীবনকাল সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত। অবিভক্ত বঙ্গে খ্রিষ্টধর্মের প্রথম প্রবর্তক ও প্রচারক হিসেবে তিনি সবিশেষ খ্যাত। তাঁর পুরো নাম দোম আন্তোনিও দো রোজারিও। তৎকালীন যশোর-ফরিদপুর অঞ্চলের অন্তর্গত ভূষণা নামক রাজ্যের রাজপুত্র। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে আরাকান অঞ্চলের মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের হাতে বন্দী হয়ে আরাকানে নীত হন। ফাদার দো রোজারিও নামক জনৈক পর্তুগিজ ধর্মযাজক তাঁকে উদ্ধার করেন। ধর্মযাজক আন্তনিও কর্তৃক তিনি খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। আন্তনিও ও ফাদার দো রোজারিওর স্মরণে দীক্ষার সময় 'দোম আন্তোনিও দো রোজারিও' নাম গ্রহণ করেন। ভূষণায় ফিরে নিজের স্ত্রী ও অন্য আত্মীয়-পরিজনদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা দেন তিনি। খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পিতার জমিদারির অন্তর্গত কোষভাঙায় মিশন স্থাপন করেন। পরে এই কেন্দ্র বর্তমান গাজীপুর জেলার ভাওয়াল রাজ্যের অন্তর্গত নাগরীতে স্থানান্তরিত হয়। ভাওয়ালে খ্রিষ্টধর্মের আদি প্রবর্তক। বাংলা গদ্যের অন্যতম আদি নিদর্শন *ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ* নামক গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। এই পুস্তক ১৯৩৭-এ সুরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

**দ্রৌপদী** ১. মহাভারত অনুযায়ী পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের যজ্ঞবেদি থেকে উদ্ভূতা কন্যা। দ্রুপদের কন্যা বলেই তাঁর নাম দ্রৌপদী। আর যজ্ঞবেদি থেকে উদ্ভূতা বলে তিনি অযোনিসম্ভবা ও যাজ্ঞসেনী নামেও অভিহিতা। রাজা দ্রুপদ আয়োজিত লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতায় ঘূর্ণমান চক্রের মধ্য দিয়ে তির চালনা করে একটি মাছের চক্ষু বিদ্ধ করে অর্জুন দ্রৌপদীকে লাভ করেন। পরে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এই পাঁচ ভাই মিলে তাঁকে বিয়ে করেন। পাণ্ডব ভ্রাতাদের ঔরসে তিনি পাঁচ পুত্রের জন্মদান করেন। পাণ্ডবরা কপট পাশাখেলায় দুর্যোধনের কাছে সবকিছু হারানোর পর অবশেষে দ্রৌপদীকেও বাজি রাখেন এবং তাতেও হেরে যান। দুর্যোধন তখন প্রকাশ্য সভায় তাঁকে বাম উরু দেখিয়ে অপমান করেন এবং দুঃশাসন বস্ত্রাকর্ষণ করে তাঁকে নিরাবরণ করতে চান। এ পর্যায়ে কৃষ্ণ বহু বর্ণের বস্ত্রের রূপ ধরে তাঁর দেহ আবৃত করেন। দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অন্যতম কারণ। যুদ্ধজয়ের পর স্বামীদের সঙ্গে স্বর্গযাত্রা করে অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতের পাপে পথিমধ্যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহাভারতে দ্রৌপদীকে কৃষ্ণা শ্যামবর্ণা ও পাঞ্চালী রাজকন্যা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। ২. ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উল্লেখিত আছে যে সীতার ছায়া মহাদেবের কাছে পাঁচবার পতি প্রার্থনা করায় মহাদেব তাঁকে বলেন, 'তুমি হরির অংশস্বরূপ পঞ্চ ইন্দ্রকে স্বামী হিসেবে লাভ করবে।' সেই ছায়াসীতাই সত্যযুগে বেদবতী, ত্রেতাতে সীতা এবং দ্বাপরে দ্রৌপদী।

**দ্বান্দ্বিকতা** দ্বন্দ্ব শব্দ থেকে কথাটার উৎপত্তি। এর মূল কথা হলো সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু ও ঘটনার মধ্যে দুই বিপরীত সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে এবং এই দুই সত্তার দ্বন্দ্বের ফলেই বস্তু বা ঘটনার বিকাশ বা পরিবর্তন

ঘটে। দ্বান্দ্বিকতার ইংরেজি ডায়ালেকটিক শব্দটি এসেছে গ্রিক ডায়ালগ শব্দ থেকে। কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রিক দার্শনিকেরা ডায়ালগ বা সংলাপ পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। প্লেটোর সংলাপগুচ্ছ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির উত্তম দৃষ্টান্ত। জার্মান দার্শনিক হেগেল গ্রিক দার্শনিকদের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন। তাঁর উপস্থাপিত দ্বান্দ্বিকতার মূল কথা হলো কোনো প্রামাণ্য বিষয়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরা, তারপর থিসিস (বা ন্যায়) ও অ্যান্টি-থিসিস (বা প্রতিন্যায়)-এর বাদানুবাদ থেকে একটা সিদ্ধান্ত বা সমন্বয়ে উপনীত হওয়া। হেগেলের মতে, চিন্তার ক্ষেত্রেই যে কেবল থিসিস ও অ্যান্টি-থিসিসের বিষয়টি প্রযোজ্য তা-ই নয়, চরম সত্তাও অনুরূপ অস্তি ও নাস্তির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে নিজের সত্তা সৃষ্টি করে চলে। হেগেল এই পদ্ধতি তাঁর ইতিহাস তত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন।

**দ্বাপর** হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী চারটি যুগের মধ্যে তৃতীয় যুগ। এক ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীর দিন বৃহস্পতিবার দ্বাপর যুগের উৎপত্তি। এই যুগের ব্যাপ্তি ৮৬ লাখ বছর। এই যুগের বৈশিষ্ট্য হলো এর অর্ধেক পাপ আর অর্ধেক পুণ্য। এই যুগের মানুষেরা সাত হাত দীর্ঘ এবং সহস্র বর্ষজীবী হতো। এই যুগের অবতার ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম। শাল্ব, কংস, যুধিষ্ঠির, বভ্রুবাহন প্রমুখ এই যুগের রাজা ছিলেন।

**দ্বারকা** হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান। গুজরাটে অবস্থিত। মহাভারত অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের আদেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা এই নগর নির্মাণ করেন। জরাসন্ধ ও অসুর কালযবনের অত্যাচার থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ যাদবদের নিয়ে দ্বারকায় গমন করেন। যদুবংশ ধ্বংস হওয়ার পর যাদবনারীদের নিয়ে অর্জুন হস্তিনাপুর যাত্রা করলে দ্বারকা নগর প্লাবনে ভেসে যায়।

## ধ

**ধন্যবাদ দিবস** ইউরোপ থেকে প্রথম যে জনগোষ্ঠী উত্তর আমেরিকায় এসে বসতি স্থাপন করে তারা 'নতুন' মহাদেশের মাটিতে প্রথম ফসল উৎপন্ন করার পর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। ওই ঘটনার স্মরণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার ও কানাডায় অক্টোবরের দ্বিতীয় সোমবার ধন্যবাদ দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়। দেশ দুটিতে তা সরকারি ছুটির দিন।

**ধর্ম** বিশ্বাস ও উপাসনার একটি পদ্ধতি, যার সঙ্গে সাধারণত একজন পরমপুরুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং সদাচার বা শ্রেয়োনীতি-বিষয়ক একটি সংহিতা সম্পৃক্ত থাকে। ধর্ম হচ্ছে এমন একটি বিশ্বাস, উপাসনা পদ্ধতি কিংবা আরও ব্যাপক অর্থে জীবনাচার, যেখানে এক পরম সত্তার ওপর এই ভেবে বিশ্বাস স্থাপন করা হয় যে তিনি ইহকালের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন এবং প্রত্যেকের কর্ম অনুযায়ী পরকালে পুরস্কার ও শাস্তির বিধান দেন। অনেকের মতে, মানব ইতিহাসে ধর্মের অত্যন্ত শক্তিশালী ও কল্যাণকর প্রভাব রয়েছে। আবার অনেকের মতে, শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি অন্যায়-অবিচারকে সহনীয় করার বা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন থেকেই ধর্মের সৃষ্টি। যেমন কার্ল মার্ক্স ধর্মকে আফিমের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবে একই সঙ্গে তিনি আবার বলেছেন, ধর্ম হলো নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, আত্মাবিহীন পরিবেশের আত্মা। অতীতে এক ধর্মানুসারীদের সঙ্গে অন্য ধর্মানুসারীদের বিরোধে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। প্রায়শ তা ধর্মযুদ্ধের রূপ নিয়েছে। একই ধর্মানুসারীদের মধ্যেও এ ধরনের সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে। ইসলামের ইতিহাসে ও খ্রিষ্টধর্মের ইতিহাসে যার প্রমাণ আছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা রাষ্ট্র ও ধর্মকে পৃথক রাখার নীতিতে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে ধর্মবিশ্বাসীদের একাংশ মনে করে, ধর্মকে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা অসম্ভব। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে ব্যক্তিজীবনের বাইরে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বিল অব রাইটসেও বলা হয়েছে, কংগ্রেস কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা বা কোনো ধর্মের অনুশীলন নিষেধ করে কোনো আইন প্রণয়ন করবে না। প্রকৃতির ওপর মানুষের কর্তৃত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সব সমাজেই ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে বলে মনে করা হয়।

**ধর্ম ও অপরাধ** বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ২৯৫ থেকে ২৯৮ ধারায় ধর্ম-সম্পর্কিত বিভিন্ন অপরাধ এবং তার শাস্তির মেয়াদ বর্ণিত আছে। তার মধ্যে ২৯৫ ধারা অনুসারে কোনো সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মের প্রতি অবমাননা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে উপাসনালয়ের ক্ষতিসাধন করা বা তা অপবিত্র করার শাস্তি দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ড একসঙ্গে। ২৯৬ ধারা অনুসারে ধর্মীয় সমাবেশে গোলমাল সৃষ্টি করার শাস্তি এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ড একসঙ্গে। ২৯৭ ধারা অনুসারে গোরস্থান ইত্যাদিতে অনধিকার-প্রবেশের শাস্তি হচ্ছে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ড একসঙ্গে। ২৯৮ ধারা অনুসারে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে, ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কিছু বলা বা লেখার শাস্তি হচ্ছে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ড একসঙ্গে।

**ধর্মকীর্তি** বৌদ্ধধর্মপ্রচারক। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে দাক্ষিণাত্যের চোল প্রদেশে এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরে তিনি বেদ, বেদাঙ্গ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলায় তিনি সমাজচ্যুত হন। আচার্য ধর্মপাল তাঁকে বৌদ্ধ সংঘভুক্ত করেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে কলিঙ্গ দেশে এক বিহার নির্মাণ করে তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দার্শনিক নাগার্জুন, মৈত্রেয় নাথ ও চন্দ্রকীর্তির অনুসারী ছিলেন। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য।

**ধর্মচক্র** জপচক্র দ্র.

**ধর্মঠাকুর** অনার্য দেবতা। প্রথম দিকে তিনি ছিলেন আদিবাসী কৌমদের দেবতা। শস্য উৎপাদন ও প্রজননকে কেন্দ্র করে কতকগুলো ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে ধর্মঠাকুরের উদ্ভব। কৌম সমাজের মানুষের কাছে পাহাড়, গাছ ও সাপ ছিল যথাক্রমে পৃথিবী, অরণ্য ও প্রজননশক্তির প্রতীক। রাঢ় অঞ্চলের অনার্য কৌমরা এদের পূজা করত। ধর্মঠাকুরের মধ্যে হিন্দুধর্মের সূর্য, বরুণ, সোম ও নারায়ণ; বৌদ্ধদর্শনের শূন্যতা ও করুণাসংক্রান্ত ধারণা এবং লৌকিক দেবী মনসার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের ডোম, বাগদি, হাড়ি প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা এর উপাসক। তাঁদের বিশ্বাস, ধর্মঠাকুর কুষ্ঠব্যাধি নিরাময় করেন। আদিম লোকদের বিশ্বাস, সূর্যের রং সাদা এবং তাঁর বাহন ঘোড়ায় টানা রথ। এ থেকে সূর্যের প্রতীক ধর্মঠাকুরকেও মনে করা হয় শুভ্রনিরঞ্জন এবং তাঁর পূজার সময় তাঁকে কাঠের ঘোড়ায় চড়ানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজার সময় মাটির ঘোড়া উপহার দেওয়ার প্রথাও প্রচলিত আছে। তাঁর আসল প্রতীক পাদুকা। ধর্মপূজার সময় পুরোহিতেরা গলায় একখণ্ড পাদুকা কিংবা পাদুকার মালা পরিধান করেন। এই পূজার প্রধান পুরোহিত হন একজন ডোম; তবে কৈবর্ত, শুঁড়ি, বাগদি এবং ধোপাদের ভেতর থেকেও ধর্মপণ্ডিত বা পুরোহিত হতে দেখা যায়। কোথাও কোথাও ধর্মঠাকুর হিন্দু দেবতা শিব বা বিষ্ণুর সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছেন। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে মধ্যযুগে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। মঙ্গলকাব্যের একটি প্রধান শাখাই হলো ধর্মমঙ্গল। চণ্ডী ও মনসার মতো ধর্মঠাকুরের বিষয় অবলম্বনে ধর্মমঙ্গল ছাড়া আরও এক ধরনের গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যেগুলোকে বলা হয় 'ধর্মপুরাণ'।

**ধর্মতত্ত্ব** শব্দগত অর্থে পদটির দ্বারা ঈশ্বরবিষয়ক আলোচনা বা মতবাদকে বোঝানো হয়। ধর্মতত্ত্বের মূল চিন্তাধারা ঈশ্বর, মানুষ, জগৎ, নির্বাণ এবং মানুষের অন্তিম পরিণতিকে ঘিরেই আবর্তিত। ধর্মতত্ত্বের উদ্ভব প্রাচীন গ্রিসে। মহাকবি হোমার তাঁর *ইলিয়ড* কাব্যে দেব-দেবী ও তাঁদের কার্যাবলি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। প্লেটো-অ্যারিস্টটলের মতো দার্শনিকেরাও পরম সত্য কী-জাতীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ধর্মতত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্টধর্মের আওতায়ই ধর্মতত্ত্ব তার বিষয় ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করেছে।

**ধর্মদ্রোহিতা** ধর্মীয় দিক থেকে পবিত্র বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তি, স্থাপনা বা বস্তুর প্রতি অসম্মানজনক আচরণ বা তার ক্ষতিসাধন। কোনো উপাসনালয় থেকে যানবাহন বা শোভাবর্ধনকারী মূল্যবান সামগ্রী চুরি বা পবিত্র বস্তু অপবিত্রকরণও এর আওতায় পড়ে। এমনকি, উপাসনালয়ে রক্ষিত কারও ব্যক্তিগত দ্রব্য কেউ চুরি করলে তা সাধারণ চুরি

হওয়া সত্ত্বেও কানুনি আইনে তাকেও উৎসর্গীকৃত বস্তু চুরির মতো অধর্মাচরণ বলে গণ্য করা হয়।

**ধর্মধাতু** লোকধাতু বা বিশেষ জগতের বিপরীতে ধর্মধাতু বা আধ্যাত্মিক জগৎ। মহাযানী হুয়ান-ইন বৌদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য। এক উজ্জ্বল বিশ্বের ধারণা, যেখানে বিশেষ ও অবিশেষ এক হয়ে মিলেছে।

**ধর্মনিরপেক্ষতা** ইংরেজি 'সেক্যুলার' (Secular) শব্দটির অর্থ পার্থিব বা ইহলৌকিক। আধ্যাত্মিক বা ধর্মসম্পৃক্তের বিপরীত। এই মত বা দৃষ্টিভঙ্গির মূলকথা হলো নীতিবোধ, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, শিক্ষা ইত্যাদি কোনো ধর্মের আদর্শ বা নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। স্থূল অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা হলো রাষ্ট্রকে ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত না করার নীতি বা মতবাদ। প্রবর্তনকালে বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির একটি।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে প্রতিস্থাপিত :

"১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা। —ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য

ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,

খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,

গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,

ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন,

বিলোপ করা হইবে।"

**ধর্মপদ** বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। এই ধর্মগ্রন্থে বুদ্ধের নীতিমূলক উপদেশ ও ধর্মতত্ত্ব দৈনন্দিন জীবন থেকে সংগৃহীত সুন্দর উপমার সাহায্যে সহজ-সরল ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। যমক, অপ্পমাদ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ২৬টি বর্গে এটি বিভক্ত। গ্রন্থটি এযাবৎ সংস্কৃত, প্রাকৃত, সিংহলি, তিব্বতি, চীনা, জাপানি, বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ফরাসি, জার্মান ইত্যাদি বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মূল পালি সংস্করণটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। ধর্মপদের অনেক গাথা ত্রিপিটকের অন্যান্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারতেও অনুরূপ গাথা পাওয়া যায়।

**ধর্মপাল** পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। জন্ম আনু. ৭৮১ ও মৃত্যু ৮২১ খ্রিষ্টাব্দে। রাজা ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বহু বিহার নির্মাণ করেন। বিক্রমশীলা, পাহাড়পুর ও সোমপুর বিহার তাঁর অন্যতম কীর্তি। তিনি বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করতেন।

**ধর্মপূজা** ধর্মঠাকুরের পূজা। এই পূজা সাধারণত তিন প্রকারের হয়: নিত্য, বারমতি ও বার্ষিক। নিত্যপূজা অনাড়ম্বর হলেও ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য ভক্তরা কিছুটা আড়ম্বরের সঙ্গেই পূজাটি করে থাকেন। বারমতি পূজা যেকোনো রোববার (অঞ্চলভেদে শনি বা মঙ্গলবার) অনুষ্ঠিত হয়। এ পূজায় সাদা রঙের পাঁঠা বা কবুতর বলি দেওয়া হয়। বারমতি পূজা অনেকটা সর্বজনীন এবং তা বিখ্যাত কোনো স্থানকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। এ জন্য কোনো একটি অঞ্চলের ১২টি স্থানে পূজিত ১২টি ধর্মশিলা বা ধর্মঠাকুরের প্রতীক কেন্দ্রীয় স্থানে স্থাপন করা হয় এবং ১২ দিনব্যাপী এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় সাধারণত বৈশাখী পূর্ণিমায়। কোনো কোনো স্থানে চৈত্র বা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায়ও এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজাকে 'দেল' বা 'দেউল পূজা'ও বলে। এ উপলক্ষে কোথাও কোথাও ধর্মঠাকুরের গাজন হয়।

**ধর্মাবমাননা** কোনো বক্তব্য-বিবৃতি বা রচনা, যা ধর্মপুস্তকের সত্যতা কিংবা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে আক্রমণ, অপমান বা অস্বীকার করে, তা-ই ধর্মাবমাননা বলে গণ্য হয়। প্রথাগত আইন অনুযায়ী এটি একটি অপরাধ। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ২৯৫-ক ধারা অনুসারে ইচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষমূলকভাবে সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মাবমাননা দণ্ডনীয় অপরাধ।

**ধর্মশিক্ষা** যে বিদ্যায় ধর্মের মূল প্রত্যয়, ধর্মীয় মূল্যবোধ, ধর্মনির্দেশিত আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা বা শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাচীনকালে শিক্ষা বলতে প্রধানত ধর্মীয় বা ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকেই বোঝাত। পাঠদানের বিষয় ছিল মূলত ধর্ম। প্রথমত মন্দির, মঠ, গির্জা, মসজিদ ইত্যাদি ধর্মীয় উপাসনালয়কে কেন্দ্র করেই ধর্মশিক্ষা দেওয়া হতো। পরবর্তী সময়ে টোল, মক্তব ইত্যাদি হয়ে দাঁড়ায় ধর্মশিক্ষার কেন্দ্র। ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় বোধ সঞ্চার, তাদের আচরণগত উৎকর্ষসাধন এবং জীবনে ও সমাজে

**ধীবর** মৎস্যজীবী সম্প্রদায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে ১২টি মধ্যম সংকর শূদ্র বর্ণের মধ্যে ধীবর ও জালিক নামে দুটি মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। বর্তমান বাংলাদেশে জালিক দাস ও পরাশর দাস এবং পশ্চিমবঙ্গের হুগলি, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের চাষি কৈবর্তরা নিজেদের মাহিষ্য বলে পরিচয় দেয়। বাংলাদেশের সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকা অঞ্চলের মৎস্যজীবী ধীবর ও জালিকরা কৈবর্ত হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের মৎস্যজীবীরা নিজেদের মালো, বর্মণ, রাজবংশী, কৈবর্ত, জলদাস ও দাস হিসেবেও পরিচয় দিয়ে থাকে। উত্তরবঙ্গে কৈবর্তরা দিব্যকের নেতৃত্বে দ্বিতীয় মহীপালের (১০৭১-৭২) বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করে, তা 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। এ বিদ্রোহে জয়ী হয়ে তারা কিছুকালের জন্য একটি কৈবর্তরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।

**ধ্যানীবুদ্ধ** আদিবুদ্ধ দ্র.।

## ন

**নটরাজ** নৃত্যের রাজা। দক্ষিণ ভারতীয় পুরাণ বা কাব্যকাহিনিতেই সম্ভবত প্রথম নটরাজের ধারণা রূপায়িত হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় পঞ্চম শতাব্দীতে ভাস্কর্যে নটরাজের আবির্ভাব ইলোরা ও এলিফ্যান্টার নিদর্শনে। নৃত্যশাস্ত্রে ১০৮ রকম ভিন্ন ভিন্ন নটরাজের নৃত্যভঙ্গি বর্ণিত রয়েছে। মহাভারতে প্রথমে শিবকে নৃত্যপর হিসেবে বর্ণনা করা হয়। মহাবনে ঋষিপত্নীদের সঙ্গে তাঁর উলঙ্গ নৃত্যে উত্ত্যক্ত হয়ে শিবের লিঙ্গ কর্তন করা হয় এবং তা থেকে লিঙ্গপূজার সূত্রপাত ঘটে। দক্ষিণি তামিল গ্রন্থে লিঙ্গ কর্তনের পর শিবের তাণ্ডব নৃত্যের উল্লেখ রয়েছে। এই প্রলয়নৃত্যে শিব তাঁর সংহার শক্তির পরিচয় দেন। তাণ্ডবের বিপরীতে রয়েছে শিবের নাট্যমূর্তি, যা তার স্ত্রী পার্বতীর সঙ্গে বা অন্য ঋষিপত্নীদের সঙ্গে উত্তেজক নৃত্যে প্রকাশ পায়। আবার কালীর সঙ্গে নৃত্যকালে শিব ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

**নফল** আরবি নাফিলা শব্দটির অর্থ অতিরিক্ত কাজ। পবিত্র কোরআনের দুই জায়গায় শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সুরা আম্বিয়ার ৭২ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর আমি তাকে (ইব্রাহিম) দান করেছিলাম ইসহাক এবং নাফিলা হিসেবে ইয়াকুবকে।' সুরা বনি ইসরাইল-এর ৭৯ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর রাতের এক সময় তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ো। এ তোমার জন্য নাফিলা।' হাদিসেও অতিরিক্ত কাজ অর্থেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণত ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ছাড়া অন্য নামাজকে নফল বলা হয়। যে কাজ করলে পুণ্য হয় কিন্তু না করলে পাপ হয় না, তাকে নফল বলা হয়।

**নফস ও রুহ** বাংলায় আরবি শব্দ দুটির অর্থ আমরা সাধারণত আত্মা করে থাকি। নফস-এর অর্থ ইংরেজিতে Self বা Soul এবং রুহ-এর অর্থ Spirit। শব্দ দুটি অনেক সময় সমার্থক হিসেবে, আবার কখনো কখনো বিশিষ্টার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কোরআনের সুরা বনি ইসরাইল-এর ৮৫ আয়াতে বলা হয়েছে: 'তোমাকে ওরা রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, রুহ আমার প্রতিপালকের আজ্ঞাধীন। এ বিষয়ে আমাকে সামান্যই জ্ঞান দান করা হয়েছে।' পবিত্র কোরআনের কয়েক জায়গায় রুহ বা আত্মার উল্লেখ আছে (সুরা হিজর : ২৮-২৯ আয়াত; সুরা বনি ইসরাইল : ৮৫ আয়াত; সুরা সা'দ : ৭১-৭২ আয়াত; সুরা মুজাদালা : ২২ আয়াত; সুরা ফাজর : ২৭-৩০ আয়াত)। রুহ যদিও সৃষ্ট কিন্তু তা চিরস্থায়ী। মানুষের মৃত্যুর সময় রুহ প্রাথমিক বিদায় হিসেবে জান্নাতে যায় এবং সেখান থেকে কবরে প্রত্যাবর্তন করে শেষ বিদায়ের জন্য অপেক্ষা করে। কেবল নবী ও শহীদদের আত্মাই সরাসরি জান্নাতে যায়। সুফিরা রুহ ও নফসের পার্থক্য এভাবে করেন যে, রুহ ভালোর উৎস এবং নফস মন্দের উৎস। মানবদেহ নফস ও রুহের সমন্বয়ে গঠিত এবং উভয়ে মানুষের শরীর ও তার চূড়ান্ত পরিণতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনুক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত।

**নব জেরুজালেম** বাইবেলের শেষ পর্ব 'রিভিলেশন' গ্রন্থে বর্ণিত স্বর্গ। অন্য কথায় মৃত্যুর পর যিশু যে আত্মাদের মুক্তি বা পুনর্জীবন দান করেন, তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট শেষ আশ্রমভূমি। আদর্শরূপে উপস্থাপিত, কল্পিত বা আকাঙ্ক্ষিত কোনো সমাজব্যবস্থা বা জীবনধারা বোঝাতেও কথাটি ব্যবহৃত হয়।

**নবান্ন** নতুন ফসল তোলার উৎসব। বাংলাদেশে অগ্রহায়ণ মাসে ফসল কাটার পর এ উৎসবটি একসময় ধুমধামের সঙ্গে পালিত হতো। বিশেষ করে, হিন্দু পরিবারে এ উৎসবটি পালিত হতো। প্রথাগত রীতি অনুযায়ী উৎসবের দিন ভোর না হতেই ছেলেমেয়েরা ঘরের বাইরে এসে ছড়া কেটে দাঁড়কাকদের নেমন্তন্ন করত: 'কো কো কো, আমাগো বাড়ি শুভ নবান্ন/ শুভ নবান্ন খাবা কাকবলি লবা/ পাতি কাউয়া লাথি খায়/ দাঁড় কাউয়া কলা খায়/ কো কো কো, মোরগো বাড়ি শুভ নবান্ন।' উৎসব উপলক্ষে এদিন ঢেঁকিতে নতুন চাল কোটা হয়। সকাল ১০টার দিকে বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তিরা পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। ছেলেমেয়েরা নতুন জামাকাপড় পরে। বাড়ির উঠোনে গর্ত করে জ্যান্ত কই মাছ ও কিছু দুধ দিয়ে একটি বাঁশ পোঁতা হয়। একে বলে 'বীর বাঁশ'। বীর বাঁশের চারপাশে চালের গুঁড়ো দিয়ে আলপনা আঁকা হয়। বাঁশের প্রতিটি গ্রন্থিতে নতুন ধানের ছড়া বাঁধা হয়। একটি কলার খোলে চালমাখা কলা ও নারকেল নাড়ু কাককে খেতে দেওয়া হয়। লক্ষ করা হয়, কলাটি মুখে নিয়ে কাক কোন দিকে যায়। লোকবিশ্বাস, বছরের শুভাশুভ অনেকটা এর ওপর নির্ভর করে। কাককে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত এই পর্বটির নাম 'কাকবলি'। এই অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ আহার করে না। শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে পূজা এবং নবান্ন দিয়ে তারপর সবাই আহার গ্রহণ করে। দিনের বেলা অন্যের বাড়িতে নবান্ন গ্রহণ করলেও রাতে নিজ বাড়িতেই খেতে হয়। উৎসবের শেষ হয় পরের দিন 'বাসি নবান্ন' দিয়ে। কোনো কোনো অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যেও নবান্নের প্রচলন ছিল, যাকে বলা হতো 'নয়াখাওয়া'। উৎসবের আমেজ থাকলেও তাতে হিন্দুদের মতো এত আনুষ্ঠানিকতা ছিল না।

**নবী** সংবাদবাহক, প্রেরিত পুরুষ। বিশেষভাবে হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর ক্ষেত্রে নবী বা রাসুল শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তাঁকে বলা হয় মহানবী। পবিত্র কোরআনে অনেক জয়গায় নবী ও রাসুল শব্দ দুটি পৃথকভাবে আবার কোথাও অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারও মতে, নবী বা পয়গম্বর হলেন আল্লাহর বার্তাবাহক। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। মানুষ যখন এক আল্লাহকে ভুলে বিপথগামী হয়েছে, তখন সেই বিপথগামী মানুষকে সত্যপথে ফিরিয়ে আনার জন্য যুগে যুগে তাঁর মনোনীত বাণীবাহক পাঠিয়েছেন, তাঁরাই নবী বা রাসুল। হজরত মোহাম্মদই (সা.) সর্বশেষ নবী। পবিত্র কোরআনের সুরা আহজাব-এর ৪০ আয়াতে বলা হয়েছে, 'মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসুল ও শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।'

**নমরুদ** অর্থ খোদাদ্রোহী। এর ব্যুৎপত্তিগত আরেকটি অর্থ হলো বাঘিনী। কিংবদন্তি অনুযায়ী নমরুদকে শৈশবে এক বাঘিনী তার দুগ্ধ পান করিয়ে লালন করেন। কাহিনি প্রচলিত আছে, ইডিপাসের মতোই নমরুদও না জেনেই তাঁর পিতাকে হত্যা ও মাতাকে বিয়ে করেন। মশার অত্যাচারে তাঁর মৃত্যু হয়। হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর জীবনীতে নমরুদের উল্লেখ রয়েছে। পবিত্র কোরআনের কোথাও নমরুদের নামোল্লেখ নেই। তবে সুরা বাকারার ২৫৮ আয়াতে তার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে: তুমি কি সে ব্যক্তির কথা ভেবে দেখোনি যে ইবরাহিমের সঙ্গে তাঁর প্রতিপালক সম্বন্ধে তর্ক করেছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন? যখন ইবরাহিম বলল, 'আমার প্রতিপালক তিনি যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান', সে বলল, 'আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।' ইবরাহিম বলল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে ওঠান, (দেখি) তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে ওঠাও।' তখন সে হতভম্ব হয়ে গেল।

**নাম** এখানে ঈশ্বরের বা দেবতার নাম হিসেবে কথাটা ব্যবহৃত হয়। নামজপ, নামকীর্তন, নাম উচ্চারণ করে ঈশ্বরভজনা করা হয়। নানক বলেন, 'ঈশ্বরের নাম ছাড়া আমার কোনো অলৌকিক জানা নেই।' ঈশ্বরকে বিভিন্ন নামে (যেমন: পিতা, প্রিতম, খসম, দাতা প্রভৃতি) জপ করার জন্য তিনি তাঁর শিষ্যদের আহ্বান জানান। হিন্দুদের মধ্যে নামজপের নানা

পদ্ধতি প্রচলিত। খ্রিষ্টানদের মধ্যেও এর প্রচলন রয়েছে। মুসলিমরা যখন তসবিহ জপেন, তখন তারাও আল্লাহর নাম জপ করেন।

**নামাজ** শব্দটি ফারসি। এর অর্থ একান্ত নির্ভরতা। তবে সাধারণভাবে নামাজ বলতে আমরা আল্লাহর উদ্দেশে প্রার্থনা বা উপাসনাকে বুঝি। আরবিতে বলা হয় সালাত। পবিত্র কোরআনে এই সালাত শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলাম ধর্ম যে পাঁচটি 'রুকন' বা স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে নামাজের স্থান দ্বিতীয়, কলমার পরই এর স্থান। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দিন-রাত্রি মিলে পাঁচবার নামাজ পড়া 'ফরজ' অর্থাৎ অবশ্যকর্তব্য। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হলো যথাক্রমে ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। বছরে দুটি ঈদ উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার নামাজ পড়া 'ওয়াজিব', অর্থাৎ অবশ্যকরণীয়ের মতোই। এ ছাড়া দিন ও রাতের আরও নানা সময়ে এবং নানা উপলক্ষে নির্দিষ্ট নিয়মে নামাজ পড়ার রীতি রয়েছে। নামাজের আগে অজু করতে হয়। অজুর পানির অভাব ঘটলে সে ক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে তায়াম্মুম করার বিধান রয়েছে। নামাজ পড়তে হয় কিবলামুখী হয়ে, অর্থাৎ পশ্চিম দিকে মুখ করে। সূর্য ওঠার পর প্রায় ২২ মিনিট এবং সূর্যের মধ্যগগনে অবস্থান ও পশ্চিম আকাশে অস্ত যাওয়ার সময় প্রায় চার মিনিট নামাজ পড়া নিষিদ্ধ।

**নালন্দ বিহার** প্রাচীন বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র। এটির অবস্থান ছিল ভারতের বিহার রাজ্যের বরগাঁও গ্রামে। মগধের শিশুনাগ বংশের রাজা বিম্বিসারের পুত্র রাজা অজাতশত্রু আনুমানিক ৪৯৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রমতে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ কয়েকবার নালন্দায় পদার্পণ করেছিলেন। এখানেই তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রিয় শিষ্য শারিপুত্রের সাক্ষাৎ হয়। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে (৪১৩-৫৫ খ্রি.) ও পরবর্তী পাল সম্রাটদের যুগে (৭৫০-১১৫৫) বৌদ্ধবিহারটি একটি আন্তর্জাতিক বিদ্যাপীঠ ও বৌদ্ধতীর্থস্থানরূপে খ্যাতি লাভ করে। মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য ও ভারতের বহু স্থান থেকে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা এখানে অধ্যাপনা ও গবেষণা করতে আসতেন। চীনা পর্যটক হিউ-এন সাং ও উয়ান-চুয়াং এখানে কয়েক বছর অবস্থান করে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা করেন। ধর্মপাল ও চন্দ্রপাল ছিলেন বিহারের গৌরব। এ ছাড়া বিখ্যাত গুণমতি ও স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জ্ঞানচন্দ্র এবং বাংলার সমতটের রাজকীয় ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত মহাপণ্ডিত শীলভদ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে চতুর্বেদ, বৌদ্ধশাস্ত্র, দর্শন, হেতু, শব্দ, চিকিৎসা, ভাষাতত্ত্ব, আইন, জ্যোতির্বিদ, সাঙ্খ্য, সংস্কৃত, পাণিনি ইত্যাদি পড়ানো হতো। ১০০ বিষয়ের ওপর সাড়ে আট হাজার শিক্ষার্থীকে দেড় হাজার শিক্ষক এখানে পাঠদান করতেন।

**নাস্তিক** গৌতম বুদ্ধের মতে, যাঁরা চতুরার্থ সত্য, প্রতীত্য সমুৎপাদননীতি, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও ত্রিলক্ষণ জ্ঞানে বিশ্বাস করেন না এবং সর্বোপরি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘে যাঁদের আস্থা নেই, তাঁরাই হলেন নাস্তিক।

**নাস্তিকতাবাদ** (Atheism) ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস। নাস্তিকতাবাদ একেবারে নতুন বা সাম্প্রতিক কোনো ব্যাপার নয়। বাইবেলে একজন সহজ-সরল লোকের উল্লেখ আছে, যে কিনা মনে মনে বলে, 'ঈশ্বর নেই'। নাস্তিকতাবাদীদের সরল যুক্তি হলো, বিশ্বে পাপের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে ঈশ্বর নেই। যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টি প্রমাণসাপেক্ষ নয়, সেহেতু এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা। নাস্তিকতাবাদীদের মতে, মানুষের স্বাধীনতার ধারণাকে এটি আক্রমণ করে, এবং ঈশ্বরের ধারণা প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যসৃষ্ট ও অবৈজ্ঞানিক। দর্শনে 'তাত্ত্বিক' এবং 'প্রায়োগিক' নাস্তিকতাবাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। বাস্তবে নাস্তিক কথাটিও সে রকম দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যিনি তাত্ত্বিক নাস্তিক তিনি বিশ্বাস করেন যে আসলে ঈশ্বর বলে কেউ নেই। অন্যদিকে গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরিয়ানের মত অনুসরণ করে অনেকে মনে করেন, ঈশ্বর আছেন কিন্তু তিনি বা তাঁরা মানুষের কর্মকাণ্ডে কোনো প্রভাব ফেলেন না। প্রচলিত অর্থে একজন নাস্তিক হচ্ছেন তিনি, যাঁর কর্মকাণ্ডকে ঈশ্বরবিশ্বাস কোনোভাবে প্রভাবিত করে না। অজ্ঞেয়বাদ ও নাস্তিকতাবাদ কথা দুটো অবশ্য এক নয়। অজ্ঞেয়বাদীদের অবস্থান ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রশ্নে অনিশ্চিত, সংশয়ী, প্রশ্নশীল।

**নিরিউস** গ্রিক পুরাণে উল্লেখিত সমুদ্রদেবতা। পন্টাস ও গেইয়ার পুত্র। সাগরপরি নেরেডিদের পিতা। তিনি নিজের আকৃতি পরিবর্তন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম ছিলেন।

**নিরীশ্বরবাদ** ঈশ্বরের অস্বীকার। বিশ্বের সর্বত্র অনেক লোক আছেন, যাঁরা নিরীশ্বরবাদী। তবে কথিত আছে যে, প্রাচীন তাজম্যানিয়ান, সিসমারিয়ান এবং পেরুবিয়ানরা নিরীশ্বরবাদী ছিল।

**নির্বাণ** কথাটার অর্থ পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ থেকে মুক্তি। মোক্ষলাভ। বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য হলো নির্বাণ। জৈন ও হিন্দুরা এই নির্বাণকে মোক্ষ বলে। নির্বাণ বিষয়টি অনুভূতিজনক। বৌদ্ধমতে নির্বাণের বহু সংজ্ঞা রয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, পুনর্জন্ম নিরোধ, সব রকম বন্ধন থেকে মুক্তি এবং তৃষ্ণা বা ভোগেচ্ছার অবসানই হলো নির্বাণ। নির্বাণ মানে মৃত্যু নয়। রিপুর নিয়ন্ত্রণ ও সাংসারিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি। দুঃখের বিপরীতে নির্বাণ হচ্ছে মহাসুখ। দার্শনিক নাগার্জুন নির্বাণকে শূন্যতার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

**নিসাব** যে পরিমাণ ধন থাকলে একজন মুসলমানের জন্য জাকাত ফরজ হয়, ইসলামি পরিভাষায় তাকে নিসাব বলে। রৌপ্যের নিসাব ২০০ দিরহাম। আমাদের দেশের ওজন হিসাবে তা বায়ান্ন তোলা ছয় মাশা পাঁচ রতির সমান। স্বর্ণের নিসাব ২০ মিশকাল, আমাদের হিসাবে তা সাত তোলা ছয় মাশার সমান। পণ্যদ্রব্যের নিসাবও তার মূল্যের ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয়। এর হিসাবও হয় স্বর্ণ ও রৌপ্যের হিসাবে। ফকির ও মিসকিন উভয় শব্দ দ্বারাই আমরা দরিদ্রকে বুঝি। যদিও মিসকিন অর্থ যার কিছুই নেই আর ফকির অর্থ যার নিসাবের কম অর্থ আছে। শাব্দিক অর্থের এই পার্থক্য অবশ্য জাকাতের বিধানে কোনো পার্থক্য ঘটায় না।

**নৃত্য** হিন্দুধর্মে শিব হলেন নটরাজ, অর্থাৎ নৃত্যের রাজা। নৃত্যশাস্ত্রে নটরাজের ১০৮ রকম নৃত্যভঙ্গি বর্ণিত হয়েছে। মন্দিরে দেবসেবায় নৃত্যের ব্যবহার অতি প্রাচীন। শালীন নৃত্য, যা কোনো বাড়তি আবেগ বা উত্তেজনাকে প্রশ্রয় দেয় না, বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করে না, মনে করা হয় তা মুসলমানদের জন্য জায়েজ। বিভিন্ন দেশের মুসলমান-সমাজে লোকনৃত্যের প্রচলন দেখা যায়। হজরত মোহাম্মদ (সা.) ও আয়েশা (রা.) মদিনার মসজিদে আবিসিনিয়ার লোকনৃত্য দেখেছিলেন।

**নৃসিংহ** বিষ্ণুর অবতার। ব্রহ্মার বরে অজেয় দানব হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুভক্ত পুত্র প্রহ্লাদকে বধ করতে উদ্যত হলে বিষ্ণু নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে হত্যা ও প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন।

**নেসটোরীয়বাদ** বিশেষ খ্রিষ্টীয় ধর্মমত। পঞ্চম শতকে কনস্ট্যান্টিনোপলের নেস্টোরিয়া এই মত প্রচার করেন। 'কুমারী মরিয়ম ঈশ্বরমাতা'—এই মত নেস্টোরীয়রা সমর্থন করেনি; কারণ, মাতা মরিয়ম যিশুকে মানবরূপেই প্রসব করেন। ইরাক, ইরান, মালাবার ও যুক্তরাষ্ট্রে এই মতবাদের কিছু অনুসারী রয়েছেন। এই মতবাদকে অ্যাসিরিয়ান চার্চও বলা হয়।

**ন্যাড়া** বাংলার একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্র এই সম্প্রদায়ের আদিগুরু। ভেকে (সাজ) ও ভাবে বৈষ্ণব ও বাউলদের সঙ্গে ন্যাড়াদের কিছু মিল আছে। তারা হরিবোল ও বীর অবধূত ধ্বনি দেয়, আবার বাউলদের মতো প্রকৃতিসাধনা এবং কায়সাধনাও করে। তাদের আলখাল্লা নানা বর্ণের বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তৈরি হয়। তারা মাথায় টুপি পরে এবং কাঁধে ঝুলি, হাতে লাঠি ও কিশতি নারকেলের মালা নিয়ে ভিক্ষা করে। বাংলাদেশের ঢাকা ও পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় ন্যাড়া সম্প্রদায়ের লোকেরা আজও বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে।

**ন্যায়** দর্শনের একটি ধারা। মহর্ষি গৌতম এই দর্শনের প্রবর্তক। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে তিনি যে ন্যায়সূত্র রচনা করেন, তা-ই হলো ন্যায়দর্শনের ভিত্তি। জীবের মোক্ষলাভের উপায় তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের তিনটি প্রক্রিয়া হলো শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। এর মধ্যে মননের সাধনই হলো ন্যায়দর্শন। ন্যায় হলো আত্মতত্ত্ব শ্রবণের পর যুক্তির দ্বারা তার স্বরূপ আলোচনা করার প্রধান উপায়।

## প

**পঞ্চকন্যা** অহল্যা, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী ও সীতা—হিন্দুধর্ম মতে, পঞ্চকন্যা নামে অভিহিত। এই পাঁচ কন্যার নাম প্রতিদিন স্মরণ করলে সব ধরনের পাপ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

**পঞ্চগব্য** গাভিজাত বস্তু হলো গব্য। হিন্দুমতে, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোমূত্র ও গোময়—পঞ্চগব্য।

**পঞ্চতন্ত্র** বিষ্ণুশর্মা রচিত সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। গ্রন্থটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। জীবজন্তুর ওপর মানুষের স্বভাব আরোপ করে রচিত এই নীতিগ্রন্থের কাহিনিগুলো বৌদ্ধ জাতক থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রে পাঁচটি হিতোপদেশের বিষয় হলো: মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, সন্ধিবিগ্রহ, লব্ধ সম্পদ নাশ ও পরীক্ষা-অপরীক্ষা। সংস্কৃতে রচিত এই গ্রন্থে রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি ও ব্যবহারনীতি আলোচনা করে এই হিতোপদেশ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি বিশ্বের ৫০টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

**পঞ্চতীর্থ** হিন্দুধর্ম মতে, ভারতের কাশীর পাঁচটি পুণ্যস্থান এই নামে অভিহিত। স্থান পাঁচটি হচ্ছে—জ্ঞানবাপী, নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর, মহাকালেশ্বর ও দণ্ডপাণি।

**পঞ্চত্বপ্রাপ্তি** ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—হিন্দুশাস্ত্রে এই পঞ্চভূতে মিলিত হওয়াকে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি বা মৃত্যু বলা হয়।

**পঞ্চপাণ্ডব** মহাভারতে উল্লেখিত পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে পঞ্চপাণ্ডব বলা হয়।

**পঞ্চবটী** অশথ, বট, বিল্ব, আমলকী ও অশোক—এই বৃক্ষপঞ্চককে এই নামে অভিহিত করা হয়। রামায়ণের দণ্ডকারণ্যস্থ বন এই পঞ্চদক্ষে রচিত।

**পঞ্চবাণ** মদনদেব যে পঞ্চবাণ ব্যবহার করতেন তা সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন; মতান্তরে অরবিন্দ, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল। পঞ্চবাণ পঞ্চশর নামেও অভিহিত।

**পঞ্চমকার** হিন্দু তান্ত্রিক সাধনার পাঁচটি অঙ্গ হচ্ছে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন।

**পঞ্চ মহাপাতক** হিন্দুধর্মে ব্রহ্মহত্যা, ব্রহ্মস্বহরণ, গুরুপত্নীতে উপগমন, সুরাপান-জাতীয় পাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের সংসর্গ বাসকে পঞ্চমহাপাতক বলে।

**পঞ্চামৃত** গর্ভিণীর পঞ্চম মাসে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি—এই পাঁচটি অমৃততুল্য দ্রব্য সহযোগে ভোজন করানো হিন্দুদের একটি সংস্কারগত রীতি।

**পঞ্জিকা** সময়কে পরিমাপের প্রয়াসে সময়কে দিন, সপ্তাহ, মাস ও বছরে বিভক্ত করার পদ্ধতিই পঞ্জিকার বিষয়। পৃথিবীর আবর্তন ও চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্তের ঘটনাকে মান ধরে বছরকে সৌরবর্ষ হিসেবে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ও ৪৫.৫ সেকেন্ড ও চান্দ্র বছর হিসেবে ৩৫৪ দিনে গণনা করা হয়। প্রাচীনকালে দুই পূর্ণিমার মধ্যবর্তী কালকে এক মাস হিসেবে ধরা হতো। চান্দ্র বছর সৌর বছরের চেয়ে ১১ দিন ছয় ঘণ্টা কম। মাসকে হিসাব করা হয় বছরের কম বা বেশি দিনের ১২টি অংশে। সপ্তাহ গণনা করা হয় সাত দিনে। দিন গণনা করা হয় আপন কক্ষে সূর্যের একটি পরিক্রমার ভিত্তিতে। রোমানরা সূর্য, চন্দ্র ও অন্য গ্রহের নামের সঙ্গে মিল রেখে বারের নামকরণ করেছিলেন।

প্রাচীন ব্যাবিলনের অধিবাসীরা প্রতি চান্দ্রমাস ৩০ দিনে গণনা করে ১২ মাসে বছর নির্ণয় করত। প্রাচীন মিসরীয়রা চান্দ্র বছরের পরিবর্তে সৌরবর্ষ গণনা শুরু করে। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে রোমান পঞ্জিকায় ১০ মাসে ও ৩০৪ দিনে বছর গণনা করা হতো। বছর শুরু হতো মার্চ মাসে। পরে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসকে যুক্ত করা হয়। পঞ্জিকার অগ্রগতির ক্ষেত্রে জুলিয়ান পঞ্জিকা ও গ্রেগোরিয়ান পঞ্জিকার ভূমিকা গভীর। বর্তমান সারা বিশ্বেই গ্রেগোরিয়ান পঞ্জিকাকে অনুসরণ করা হয়। ইসলামি পঞ্জিকা হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর হিজরতের সময় থেকে গণনা করা হয়। এটি চান্দ্র মাসকে অনুসরণ করে। বাংলাদেশে ভারতীয় পঞ্জিকার ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে নতুনভাবে সৌরবর্ষ অনুযায়ী বর্ষ গণনা করে মাসগুলো ৩১ ও ৩০ দিনে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। চার বছর অন্তর অধিবর্ষ গণনার বিধান রাখা হয়েছে।

**পদ্মা** লক্ষ্মীর অপর নাম। মনসা দেবীও পদ্মা ও পদ্মাবতী উভয় নামে পরিচিত। কলিযুগের শেষে বিষ্ণু কলিরূপে মর্তে অবতীর্ণ হবেন এবং বৃহদ্রথ রাজকন্যা পদ্মাকে বিয়ে করবেন।

**পদ্মাসন** এশিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় ধ্যানের আসন। পদযুগল বিপরীত জানুর ওপরে স্থাপন করে এবং হস্তযুগল বিভিন্ন মুদ্রায় বা ভঙ্গিতে রেখে শিব ও বুদ্ধের মতো পৃষ্ঠদেশ ঋজু ও স্থির রেখে পদ্মাসনে অনুশীলন করতে হয়।

**পবন** বায়ু কোণের অধিপতি হিন্দু দেবতা। তাঁর ঔরসে পাণ্ডু রাজার স্ত্রী কুন্তীর গর্ভে ভীম এবং

কেশরীর স্ত্রী অঞ্জনার গর্ভে হনুমানের জন্ম হয়। উনপঞ্চাশ বায়ুগণ পবনের আশ্রিত ও আজ্ঞাবহ বলে তাঁর অপর নাম বায়ুপতি।

**পরশুরাম** ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়দের উৎপীড়ন দমনের লক্ষ্যে তাঁর আবির্ভাব। কুঠার বা পরশু তার অস্ত্র বলে তাঁর নাম পরশুরাম। নৈতিকতার প্রশ্নে পিতা জমদগ্নির আদেশে তিনি কুঠারাঘাতে মা রেণুকাকে হত্যা করলে কুঠার তাঁর হাতে লেগে থাকে। তীর্থস্নানে পাপমুক্ত হলে তা হাত থেকে মুক্ত হয়। একবার তাঁর পিতা হোমধেনুর বৎস হরণ করেন, এই অপরাধে পরশুরাম ক্ষত্রিয় রাজা কার্তবীর্যকে হত্যা করেন। প্রতিশোধস্বরূপ তাঁর পুত্ররা পরশুরামের পিতা জমদগ্নিকেও হত্যা করে। ক্ষুব্ধ পরশুরাম তাঁদের ও তাঁদের অনুগত ক্ষত্রিয়দের হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেন। এভাবে তিনি একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন বলে কথিত হয়।

**পশুপূজা** পশুকে পূজা করা ও প্রার্থনা করা। এদের জন্য আবার মন্দিরও আছে। সর্বাধিক পরিচিত পশুপূজার মধ্যে আছে মিসরীয়দের ষাঁড় পূজা। ভারতীয় হিন্দুরাও গরুপূজা করে। তাকে দেবতা জ্ঞান করে। আফ্রিকান কোনো কোনো ধর্মে এখনো বৃহৎ সর্পকে দেবতুল্য মনে করে পূজা করা হয়। পশুপূজাকে ইংরেজিতে জুলাট্রি বলা হয়।

**পাঞ্চশীল** শীল দ্র.।

**পাতাল** সপ্ত পাতাল দ্র.।

**পায়টিজম** বাইবেল পাঠ ও অধ্যয়ন এবং শুদ্ধ ভক্তির ওপর জোর দিয়ে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানিতে খ্রিষ্টীয় ধর্মসংঘের প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত ও প্রচলিত ধর্মীয় পথ বা ধারা।

**পারসিউস** জুপিটারের পুত্র। গ্রিক কিংবদন্তি অনুযায়ী তিনি আকাশের একটি তারকামালার আকৃতিতে বিরাজমান। বলা হয়ে থাকে আকাশে এ রকম ৮৮টি তারকাপুঞ্জ রয়েছে।

**পার্থেনপি** সাইরেন হলো অর্ধেক নারী ও অর্ধেক পাখি আকৃতির সমুদ্র নিম্ফ। সেই সাইরেন ত্রয়ের অন্যতম পার্থেনপি। ইউলিসসের প্রেমে পড়েছিলেন পার্থেনপি। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে তিনি নিজেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন।

**পার্সিফোন** গ্রিক কিংবদন্তি অনুযায়ী পার্সিফোন হচ্ছেন পাতালপুরীর দেবী। জিউস ও দিমিতারের কন্যা। ফসলের দেবী হিসেবেও তিনি পরিচিত। রোমকদের কাছে তিনি দেবী প্রোসারপাইন।

**পাসোভার** মিসরের কবল থেকে ইসরাইলিদের মুক্তি লাভের জন্য ইহুদিদের এই উৎসব অনুষ্ঠান তাঁদের ধর্মীয় বছরের প্রথম মাসের ১৫ নিসান (মার্চ-এপ্রিল) আরম্ভ হয় এবং সাত দিন ধরে চলে। যিশুর শেষ নৈশ আহার পাসোভার আহার ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। খ্রিষ্টানদের ইস্টার উৎসবের দিন পাসোভার থেকে হিসাব করে ঠিক করা হয়।

**পাহাড়পুর বিহার** নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত এই বিহার। উপমহাদেশে আবিষ্কৃত প্রাচীন বৌদ্ধবিহারগুলোর মধ্যে এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম। অষ্টম শতকের শেষার্ধে পাল সম্রাট ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রিষ্টাব্দ) এই বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় এর নাম ছিল সোমপুর বা সোমপুরী বিহার। এর সংলগ্ন ওমপুর গ্রামেও তা ছড়িয়ে পড়েছিল। এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বাস করতেন। জ্ঞানচর্চা ও বৌদ্ধশাস্ত্রাদি আলোচনা ছিল তাঁদের কাজ। আয়তনে ভারতের নালন্দা ও ইন্দোনেশিয়ার বড়বুদুর বিহারের সঙ্গে এর তুলনা চলে।

**পিউরিট্যানিজম** ইংল্যান্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পুরোহিত-প্রাধান্য রহিত করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় খ্রিষ্টধর্মতন্ত্রের উদ্যোগে এক সংস্কারমূলক আন্দোলনের মাধ্যমে এই মতবাদের সূচনা। ১৫৬৭ সালে লন্ডনে এক সম্প্রদায় জেনেভার দৃষ্টান্তে উপাসনা আরম্ভ করে। ক্রমে ক্রমে লোকজন চার্চ অব ইংল্যান্ডের বিরোধী ক্যালভিনপন্থীদের সঙ্গে যোগ দেয়। প্রথম চার্লসের সময় পিউরিট্যান বিপ্লবে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পর সম্প্রদায়টির মধ্যে বিরোধ বাধে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সংগঠিত আন্দোলন হিসেবে এর আর অস্তিত্ব থাকে না। এই মতবাদে পরিবারকে ধর্মাচারের দুর্গ হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং বাইবেলের বিধানগুলো কঠোরভাবে অনুসরণ করে জীবন যাপন করার তাগিদ ছিল।

**পিটার বা পিতর** নিউ টেস্টামেন্টের ১ ও ২ পিটার নামক পুস্তক। এটা সেন্ট পিটারের লেখা বলে

বিবেচিত। পিটার ১-এ খ্রিষ্টানদের কর্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং যাঁরা ধর্মের জন্য উৎপীড়িত হন, তাঁদের উৎসাহিত করা হয়েছে। পিটার ২-এ ধর্মদ্রোহিতার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করা হয়েছে এবং যিশুর পুনরাবির্ভাবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

**পিটার দ্য হারমিট** ফরাসি ধর্মপ্রচারক এবং প্রথম ক্রুসেডের একজন উৎসাহদাতা। জেরুজালেম দখলের পর তিনি ইউরোপে ফিরে যান।

**পিটার, সেন্ট** মৃত্যু ৬৭ খ্রিষ্টাব্দে। আগের নাম সাইমন। তিনি বেথসাইদার অধিবাসী ও ধীবর জাতিভুক্ত ছিলেন। যিশুর শিষ্যদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রধান। কথিত আছে, রোমান সম্রাট নিরোর রাজত্বকালে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। রোমান ক্যাথলিকদের মতে, পোপের প্রাধান্য পিটারের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। পিটারের সমাধির ওপর সেন্ট পিটার গির্জা তৈরি করা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

**পিথাগোরাস** গ্রিক দার্শনিক। গ্রিসের স্যামোসে জন্ম। এই দার্শনিক ক্রোটোনায় এক ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। অরফিস রহস্যবাদ অনুযায়ী এই ভ্রাতৃত্ব আত্মার দেহান্তরে বিশ্বাস করত এবং পুনর্জন্ম থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আত্মশুদ্ধি অভ্যাসের বিধান দেয়। পিথাগোরীয় মতবাদে সংখ্যাই সব বস্তুর সার এবং সব ধরনের সম্পর্ক সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। প্রচলিত ধর্মের প্রতি তাঁদের বিরোধিতার জন্য এই মতানুসারীরা লাঞ্ছিত ও দেশ থেকে বিতাড়িত হন।

**পিনেলোপি** গ্রিক পুরাণে ওদিসিউসের স্ত্রী। তাঁর বিয়ের এক বছর না হতেই তাঁর স্বামীকে ১০ বছরের জন্য যুদ্ধে এবং ১০ বছরের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁকে অনেকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে তিনি বলেন তাঁর হাতের বোনার কাজ শেষ হলেই তিনি বিয়ে করবেন। তিনি দিনভর সুতো বুনে রাতভর খুলে ফেলতেন। তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কোরআনের ১৬তম সুরা নাহালের ৯২ আয়াতে বলা হয়েছে : 'অন্য দলের চেয়ে শক্তিশালী হওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমাদের শপথকে ব্যবহার করে সেই নারীর মতো হোয়ো না, যে সুতো মজবুত হওয়ার পর তা খুলে ফেলে তাঁর কাটা সুতো নষ্ট করে দেয়।'

**পির আলি** তাঁর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ তাহের। তিনি খান জাহান আলীর শিষ্য ও সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর কবরের পাশেই পির আলি সমাহিত।

**পিরালি ব্রাহ্মণ** ইসলামে ধর্মান্তরিত যশোরের একটি ব্রাহ্মণ পরিবার। দক্ষিণবঙ্গের মুসলমান শাসক পির আলি খানকে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলেন যে ইফতারির গন্ধ পির আলির নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করায় তাঁর রোজা ভেঙে গেছে। এরই জের ধরে শাসক পির আলি সরকারি কাজে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ কর্মচারীদের নিমন্ত্রণ করে এক বৈঠকে নিজে গোমাংস ভক্ষণ করে তাঁদের বলেন, যেহেতু ঘ্রাণে অর্ধভোজন হয়, সেহেতু তাঁরা নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করে ফেলেছেন। এইভাবে যশোর জেলার দক্ষিণানাথ রায় চৌধুরীর দুই পুত্র কামদেব ও জয়দেব ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে বাধ্য হন এবং অপর দুই পুত্র তাঁদের সংস্পর্শদোষে সমাজে পতিত হলে পিরালি ব্রাহ্মণ হিসেবে অভিহিত হন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পিরালি ব্রাহ্মণদের বংশধর।

**পিলগ্রিমস** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাসাচুসেটসে প্লিমাউথ কলোনির প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ। চার্চ অব ইংল্যান্ডের অনুষ্ঠানাদি ও নিয়মশৃঙ্খলার বিরোধিতা করে ১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে একদল রক্ষণশীল খ্রিষ্টান হল্যান্ডে (বর্তমানে নেদারল্যান্ডস) হিজরত করেন। হল্যান্ড সেই সময় স্বাধীনতার দেশ বলে খ্যাতি অর্জন করে। পরে সেই দেশের অধিবাসীদের প্রভাব প্রতিকূল হওয়ায় শরণার্থীরা নতুন পৃথিবী আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করেন। ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁরা মে ফ্ল্যাওয়ার জাহাজে যাত্রা করে ওই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ-পূর্ব ম্যাসচুসেটসে উপনীত হন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন। যাঁরা ওই জাহাজে প্রথমবার সমুদ্র পার হয়ে ওই জায়গায় পৌছান, তাঁরা পরে পিলগ্রিম ফাদারস নামে অভিহিত হন।

**পিলেজিয়ানিজম** পিলেজিয়াস (আ. ৩৫৫-৪২৫ খ্রি.) নামের এক সন্ন্যাসীর নামানুসারে খ্রিষ্টধর্মমত-বিরোধী যে সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে, তাঁদের মতবাদই পিলেজিয়ানিজম নামে অভিহিত। সেন্ট অগাস্টিনের শিক্ষাকে অস্বীকার করে তাঁরা বলেন,

প্রত্যেক শিশু নিষ্পাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে এবং তার জন্য ব্যাপটিজমের কোনো প্রয়োজন নেই। যুক্তি, স্বাধীন মতামত ও গসপেল বুঝতে পারার গুণ ইত্যাদি স্বাভাবিক অনুগ্রহ এবং এর মাধ্যমে মানুষ প্রভুর নৈকট্য লাভ করতে পারে। ৪৩১ খ্রিষ্টাব্দে এফেসাসের কাউন্সিলে ওই মতবাদের নিন্দা করা হয়। পিলেজিয়ানিজমের যে পরিবর্তিত রূপ ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল, তাও ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে অরেঞ্জ কাউন্সিলে নিন্দিত হয়।

**পিশাচ** মাংসাশী প্রেতযোনী বা ভূতবিশেষ। অসুর ও রাক্ষসদের সঙ্গে এদের জন্ম। ব্রহ্মা যে বারিবিন্দু দিয়ে দেবতা ও মানুষকে সৃষ্টি করেন, তার কিয়দংশ অন্যত্র পতিত হয়ে পিশাচদের জন্ম হয়। অসুর ও রাক্ষসদের নিচে এদের স্থান। এরা মৃত নরমাংস খায় এবং মানুষকে বিপথে চালিত করে।

**পুঁথি** ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে সব পুঁথি তুলট কাগজ, তালপাতা, তেরেট পাতা, ভূর্জপত্র, গাছের বাকল, সোলার শাঁসে হাতে লিখিত হতো। পুঁথির পাতাগুলো আলগাভাবে পরপর সাজানো থাকত। দুখানি কাঠের তক্তার সাহায্যে বস্ত্রখণ্ড সহযোগে বেঁধে রাখা হতো। তালপাতার পুঁথিতে তালপাতায় বোনা শক্ত আবরণ থাকত। পাতার মাঝখানে কিছুটা স্থান ফাঁকা রেখে ছিদ্র করে তাতে সুতা বা দড়ি ঢুকিয়ে বেঁধে রাখা হতো। প্রবাদ ছিল যে পুঁথিকে শত্রুর মতো বাঁধতে হবে ও পুত্রের মতো আদর করতে হবে। পোকার আক্রমণ নিবারণ ও স্থায়িত্ব বিধানের জন্য নানা ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হতো। বিভিন্ন দ্রব্য মিশ্রিত করে লেখার কালি তৈরি করা হতো। বাঁশের কঞ্চি, খাগ, পাখির পালক ইত্যাদির সাহায্যে কলম তৈরি করা হতো। ওডিশা ও দক্ষিণ ভারতে তালপাতার পুঁথিতে লোহার শলাকার সাহায্যে দাগ কেটে লেখা হতো। সেগুলোর ওপর ভুষা কালি ঘসে পড়তে হতো। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ, মধ্যযুগের সব সাহিত্য রামায়ণ, মহাভারত, ধর্মপুস্তক, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা সবই পুঁথির আকারে রচিত হয়েছে। পুঁথি লেখা ও দান করা পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হতো। *পুঁথিসাহিত্য* বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত দোভাষী পুঁথিসাহিত্য আরবি-ফারসি-হিন্দি-উর্দু শব্দসংবলিত এক ধরনের কাহিনিকাব্য। মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারাকে বাংলাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে পুঁথিসাহিত্যের অবদান রয়েছে। ফারসি ভাষায় রচিত বিভিন্ন উপাখ্যান বাংলা ভাষায় রচনা করতে গিয়ে জিন, পরি, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব এবং এদের সঙ্গে মানুষের ভাববিনিময়ের অবিশ্বাস্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রধানত ফারসি ভাষার রোমান্টিক কাহিনিকাব্য অবলম্বনে *ইউসুফ-জোলেখা, আমির হামজা, জঙ্গনামা* বা *শহীদে কারবালা, মকতুল হোসেন, হানিফার লড়াই* ইত্যাদি কাহিনিভিত্তিক পুঁথি রচনা করা হয়েছে। পুঁথিকে ইসলাম ধর্মের বিধিব্যবস্থা, নবী-পয়গম্বর ও চার খলিফার জীবনকাহিনি, রোমান্টিক প্রণয়কাহিনি, সুফিতত্ত্ব ও দরবেশদের বিষয় ইত্যাদি নিয়েও পুঁথি রচিত হতো। সর্বাধিক খ্যাতিমান পুঁথিকার গরিবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজা।

**পুণ্যাহ** রাজস্ব আদায়সংক্রান্ত একটি উৎসব। নববর্ষের প্রারম্ভে প্রজারা জমিদারকে এবং জমিদাররা সরকারকে খাজনা দিত এবং সে উপলক্ষে আয়োজন করা হতো এই উৎসবের। এ উপলক্ষে প্রজারা নতুন পোশাক পরে কাচারিতে যেত এবং সেখানে মেলা, নাচ-গান, যাত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে এর গুরুত্ব কমতে থাকে এবং ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এই উৎসব বাংলা নববর্ষের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

**পুত** হিন্দু পুরাণোক্ত নরকবিশেষ। মৃত্যুর পর প্রত্যেক পুরুষকে এই নরকে বাস করতে হয়। সন্তানেরা শ্রাদ্ধ পালন করে পিতাকে পুৎ বা পুন্নাম নরক থেকে ত্রাণ করে বলে তাদের নাম পুত্র।

**পুনর্জন্ম** জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম—এই তিনে মিলে হিন্দুধর্মের সংসারচক্রের ধারণা আবর্তিত। এটা ভারতের জনগণের মানসিকতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এই সীমাহীন পুনর্জন্ম যা দীর্ঘসময় স্বর্গবাসের পরেও ঘটতে পারে, তা অনেকের কাছেই আকর্ষণহীন এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম এবং সমসাময়িক অপেক্ষাকৃত

কম প্রচারিত অন্যান্য ধর্ম এই পুনর্জন্মসংক্রান্ত মতবাদের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় জনগোষ্ঠীর এক বৃহদংশ এখনো পুনর্জন্ম এবং তার ওপর কর্মের প্রভাব সম্পর্কে আস্থাশীল। ওই কর্মবাদ বিশ্বাস করে যে পুনর্জন্মের কর্মের ওপর পরবর্তী জন্মের সুখ-দুঃখ নির্ভরশীল। এর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ স্বভাবতই নিজেকে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হয় এই বিশ্বাস থেকে যে খারাপ কিছু করলে পরবর্তী জীবনে তার ফল ভোগ করতে হবে।

**পুরাণ** পুরাকালের ইতিহাস বা জনশ্রুতি অবলম্বনে রচিত শাস্ত্রবিশেষ। হিন্দু পুরাণের সংখ্যা ১৮টি : ব্রহ্মা, পদ্ম, ভাগবত, বিষ্ণু, বায়ু, অগ্নি, ব্রহ্মাণ্ড, গরুড়, ব্রহ্মবৈবর্ত, বরাহ, লিঙ্গ, নারদ, স্কন্দ, মার্কণ্ডেয়, মৎস্য, কূর্ম, ভবিষ্য ও বামন। দশখানি পুরাণ শিবের মাহাত্ম্যবোধক, চারটি বিষ্ণুর, দুইখানি ব্রহ্মার, একখানি অগ্নির এবং একখানি সবিতার মাহাত্ম্যসূচক। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, দেবতা, দৈত্য, ঋষি এবং প্রাচীন রাজাদের ইতিহাস, মন্বন্তর ইত্যাদি বিষয় পুরাণে বর্ণিত রয়েছে। উপপুরাণ দ্র.।

**পুরী** অপর নাম শ্রীক্ষেত্র। হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। এখানে ১১১টি মঠ ও মন্দির আছে। জগন্নাথ কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর অবতাররূপে পূজিত। কৃষ্ণ, বলরাম ও শুভদ্রার দারু মূর্তিও পূজিত হয়। প্রতি গ্রীষ্ম ঋতুতে জগন্নাথকে বিশালাকার রথে চড়িয়ে এক মাইল দূরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। তীর্থযাত্রীরাই এসব রথ টেনে থাকেন। পুরী শ্রীচৈতন্যের লীলাভূমি। এখানকার সমুদ্রে তাঁর দেহান্ত হয়।

**পুরুষোত্তম** ১. হিন্দু শাস্ত্রমতে, বিষ্ণু পুরুষদের মধ্যে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ বলে তাঁর অপর নামকরণ হয় পুরুষোত্তম। বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণও ওই নামে অভিহিত। ২. একাদশ শতকের বৌদ্ধ পণ্ডিত, যিনি অমর কোষের সম্পূরক ত্রিকাণ্ড শেষ রচনা করেন, তিনিও এই নামে অভিহিত। তাঁর অপর দুটো বিখ্যাত গ্রন্থের নাম *হারাবলি* ও *দ্বিরূপকোষ*।

**পুলপিট** প্রচারবেদি। গির্জায় উপদেশ প্রচারকাজে ব্যবহৃত ঢালু পার্শ্ববিশিষ্ট সমুন্নত বেদি। প্রাচীন বিশপীয় গির্জাগুলোয় বিশপের বিশেষ সম্মানসূচক আসনই প্রচারবেদি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বহু প্রচারবেদী সুন্দর স্থাপত্য ও নিপুণ কারুকাজের নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত। মুসলমানরা মসজিদের প্রচারবেদিকে মিম্বর বলে।

**পুষা** সূর্যের অপর নাম। বৈদিক ঋষিরা পুষার স্তব করার জন্য বহু ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। পুষার বাহন ছাগল। বেদে পুষা কোথাও কোথাও পশুদের পোষক, কোথাও বা মানুষের পোষক। সূর্যদেবরূপে তিনি পৃথিবী পরিদর্শন করেন এবং তাঁর সাহায্যেই দিন ও রাতের প্রকাশ ঘটে থাকে।

**পুষ্পক রথ** আকাশচারী রথ। হিন্দু পুরাণমতে ব্রহ্মা ধনপতি কুবেরের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এই আকাশচারী রথ দান করেন। যুদ্ধে কুবেরকে পরাজিত করে লঙ্কারাজ রাবণ রথটি নিজের অধিকারে আনেন। এই রথযোগেই রাবণ হরণ করেন সীতাকে। তাঁর মৃত্যুর পর এটা আবার কুবেরের হস্তগত হয়।

**পূজা** পূজাকে পাদবন্দনা, শ্রদ্ধাঞ্জলি ও বিনোদনের একটা অনুষ্ঠান বলা যেতে পারে। মন্দির হচ্ছে প্রধান কেন্দ্র, যেখানে পূজা হয় সম্পৃক্ত আচারাদি পালন করা। আরাধনার সহায়ক হিসেবে মহাত্মা গান্ধী বিগ্রহ-প্রথার সমর্থন করতেন। আবার অমুসলমান অনেক সম্প্রদায় মূর্তিপূজা সমর্থন করেনি। মন্দিরে বিগ্রহ দেব-দেবীর সেবার জন্য পুরোহিত ছাড়াও বহু পরিচারক থাকে। মন্দিরে পূজার সময় বিগ্রহকে চরণ প্রক্ষালনের জন্য জল দেওয়া হয়। অতিথিকে যেমনভাবে ফুল, পান ইত্যাদি প্রদান করা হয়, পূজার সময়ও দেব-দেবীর উদ্দেশে তা একইভাবে দেওয়া হয়। প্রভাতে প্রভাতসংগীত, ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে দেবতার ঘুম ভাঙানো হয়। তাঁকে স্নান করিয়ে গা মুছিয়ে পোশাক পরানো হয়। তাঁর সম্মানে ফুল, ফুলমালা, ধূপধুনা ও আরতিপ্রদীপ জ্বালানো হয়। প্রতীকীভাবে দেব-দেবীকে চাল ও ফল ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয়। পরে অভক্ষিত সেইসব পুজোপচার ভক্ত ও দরিদ্রজনের মধ্যে প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হয়। বড় বড় মন্দিরে দেবতাকে বিরাট পাখার সাহায্যে বাতাস করা হয়। দেবদাসীরা দেবতার জন্য নৃত্য করেন। গৃহীর ঘরে পূজা অনেকটা সহজভাবে পালন করা হয়।

উৎসবের দিন বিগ্রহকে মন্দিরের বাইরে শোভাযাত্রা সহকারে পালঙ্ক বা রথের ওপর চড়িয়ে শহর প্রদক্ষিণ করা হয়। শৈব সম্প্রদায় অর্চ বা প্রতীকের সামনে পূজা করে। পূজার কাজ নির্বাহ করা হয় বলে মন্দিরগুলো বেশ ধনসম্পদের মালিক।

**পূতনা** রাক্ষসী। তার পিতা বালী এবং ভ্রাতা বকাসুর। গোকুল নন্দের আশ্রিত শিশু কৃষ্ণকে বধ করার জন্য রাজা কংস পূতনাকে পাঠান। পূতনা ধাত্রীবেশ ধারণ করে কৃষ্ণকে বিষাক্ত স্তন পান করাতে যায়। কৃষ্ণ ছদ্মবেশী পূতনাকে চিনতে পেরে এমন শক্তিবলে তার স্তনপান করেন যে তার ফলে পূতনার মৃত্যু হয়।

**পূর্বপুরুষ পূজা** পূর্বপুরুষ পূজা এক ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস। অনেক আদিম মানুষ ও উপজাতির মধ্যে পূর্বপুরুষ পূজা দেখা যায়। এসব আদিম জনগোষ্ঠী পূর্বপুরুষ পূজাকে তাদের ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে থাকে। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, মৃত পূর্বপুরুষকে পূজা করলে মঙ্গল হয়। তাই তাদের খুশি করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে পূজা করা হয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী এবং মেলেনেশিয়ানদের ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল পূর্বপুরুষ পূজা। মৃত পূর্বপুরুষের বিদেহী আত্মার পূজা থেকে পূর্বপুরুষ পূজার উদ্ভব ঘটে।

প্রায় প্রতিটি ধর্মেই পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাভাজনের কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিদিন নির্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করে ঊর্ধ্বতন দ্বাদশ পিতৃপুরুষদের নাম স্মরণ করতেন। এর মধ্যে ছিল জগন্নাথ কুশারীর মধ্যমপুত্র পুরুষোত্তমের নাম।

**পেট্রিয়ার্ক** বাইবেলে ইহুদিদের অন্যতম মহাপ্লাবন-পূর্ব কালের পূর্বপুরুষ যথা—হজরত ইবরাহিম (আ.), ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.) ও ইয়াকুব (আ.)-এর বংশধরেরা। খ্রিষ্টীয় যাজকতন্ত্রে আলেকজান্দ্রিয়া, আন্তিয়ক ও রোমে মূল তিনটি পেট্রিয়ার্ক পদ ছিল। বিরুদ্ধ মতের উত্থানকালে নতুন যাজক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে এবং অনেকগুলো পেট্রিয়ার্ক পদবিশিষ্ট যাজকদের নেতৃত্বে চলে যায়।

**পেন্‌টিকস্ট** ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বিশিষ্ট ভোজ উৎসব। ইহুদিদের পাসোভার উৎসবের ৫০ দিন পর এটি অনুষ্ঠিত হয় এবং ৪৯ দিন ধরে চলে। বাইবেলে একে সপ্তাহের ভোজ, ফসলের ভোজ এবং প্রথম ফলের ভোজ বলা হয়েছে। পঞ্চাশতম দিবসের পেন্‌টিকস্টের ভোজকে হিব্রুতে শাবুত বলা হয়। খ্রিষ্টান মতে, ইস্টারের পর সপ্তম রোববারে পেন্‌টিকস্ট পড়ে।

**পেলপস্** প্রাচীন এশিয়া মাইনরের দেশ (বর্তমানে পশ্চিম মধ্যতুরস্ক) ফ্রাইজিয়ার রাজা। তিনি ট্যান্টালাসের পুত্র। তাঁর পিতা তাঁকে শিশু অবস্থায় দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। জুপিটার আবার তাঁকে প্রাণ ফিরিয়ে দেন।

**পোপতন্ত্র** রোমান ক্যাথলিকদের বিশ্বাস মতে, পোপ প্রথম বিশপ যিশুখ্রিষ্টের প্রধান শিষ্য সেন্ট পিটারের উত্তরাধিকারী এবং যিশুর প্রতিনিধি। 'পোপ' অর্থ 'পিতা'। অন্য খ্রিষ্টানরা পোপের আধিপত্য স্বীকার না করে ভিন্ন মত পোষণ করেন। দশম শতকে পোপতন্ত্রের চরম অবনতি ঘটে। পঞ্চম ক্লেমেন্ট পোপের অধিষ্ঠান স্থল অভিনিয়ঁতে স্থানান্তর করেন। এই সময়কে (১৩০৯-৭৮) রোমে ব্যাবিলনীয় অবরোধ বলে অভিহিত করা হয়। ক্লেমেন্ট রোমে প্রত্যাবর্তন করলে মহাভাঙনের উদ্ভব ঘটে এবং কাউন্সিল অব কনস্ট্যানস-এর মাধ্যমে সেই বিরোধের মীমাংসা করা হয়। পোপ ক্ষুদ্র ভ্যাটিকান রাষ্ট্র স্থাপন করেন। কিউরিয়া রোমানা নামক স্থানে তাঁর দরবার অবস্থিত।

*পোপ নির্বাচন* পোপের মৃত্যুর ১৫ থেকে ১৮ দিনের মধ্যে এক গোপন সভায় পোপের মন্ত্রণাসভার সদস্য কার্ডিন্যালরা নতুন পোপ নির্বাচন করে থাকেন। নির্বাচনে জয়ের জন্য দুই-তৃতীয়াংশের পর অন্তত একটি ভোট বেশি পেতে হবে। নীতিগতভাবে যেকোনো পূর্ণবয়স্ক ক্যাথলিক পোপ নির্বাচিত হতে পারেন। নির্বাচিত পোপ পদগ্রহণে অস্বীকার করলে, নির্বাচন চলতে থাকে। কার্ডিন্যালদের খাদ্য কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করে তাঁদের ভোট দান ত্বরান্বিত করতে উৎসাহিত করা হয়।

**পোসিডন** প্রাচীন গ্রিক ধর্মমতে সমুদ্রের দেবতা। ক্রোনাস ও রিয়ার পুত্র। অ্যামফ্রিটাইটের স্বামী পেগাসাস, ওরিয়ন, পলিফিমাস ও অন্যান্য দৈত্য-দানবদের পিতা। তিনি মানুষকে অশ্ব দান করেন।

তিনি ত্রিশূলের মতো ট্রাইডেন্ট অস্ত্র ধারণ করতেন এবং তিনিই সৃষ্টি করতেন ঝড়। গ্রিকদের পোসিডন ও রোমানদের নেপচুন অভিন্ন বলে মনে করা হয়।

**প্যাগোডা** পর্তুগিজ পাগোদ শব্দ সংস্কৃত ভাগবত থেকে উদ্ভূত। সাধারণত মন্দির বা সন্ন্যাসাশ্রমের অংশবিশেষ। পবিত্র তীর্থস্থান হিসেবে বিবেচিত। তীর্থস্তূপকে ঘিরে প্যাগোডার উদ্ভব। ভারতীয় প্যাগোডাগুলো পিরামিড আঙ্গিকের গাঁথুনি এবং ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে বিশেষ বিন্দুতে মিলিত। এ ভাস্কর্যও খোদাই দ্বারা অলংকৃত। চীন দেশীয় প্যাগোডা ভারতের অষ্টকৌণিক পরিকল্পনায় নির্মিত। জাপানি প্যাগোডা কাঠের তৈরি এবং চতুষ্কোণবিশিষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন ছাদ নিয়ে প্যাগোডা পাঁচতলা পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। কক্সবাজার জেলায় বহু প্যাগোডা রয়েছে।

**প্যান** মেষপালকদের গ্রিক দেবতা। মৌমাছিদের অভিভাবক, মৎস্য ও পশুপাখি শিকারের পৃষ্ঠপোষক। মনুষ্য আকৃতির এই দেবতার মাথায় শিং রয়েছে। তার পা ও লেজ দেখতে ছাগলের মতো।

**প্যানডোরা** গ্রিক পুরাণে জুপিটারের নির্দেশে ভালকান-সৃষ্ট প্রথম নারী। ভেনাস তাকে দান করেন অনিন্দ্য সৌন্দর্য। জুপিটার তাকে সব ধরনের দুর্ভাগ্য বোঝাই একটি বাক্স দিয়েছিলেন। প্যানডোরা কৌতূহলবশত বাক্সটি খুলে ফেললে সব দুর্ভাগ্য উড়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু বাক্সের তলায় তখনো অবশিষ্ট থাকে আশা।

**প্যারোকিয়াল স্কুল** স্থানীয় বিশপের শাসনাধীন জেলা কর্তৃক সংগঠিত বিদ্যালয়। প্রতিটি বিদ্যালয়ের স্বাধীন পদ্ধতি আছে এবং বিশপ কর্তৃক নিযুক্ত একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকেন। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকজন শিক্ষাদান করেন এবং এ জন্য তাঁরা জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনের বেশি অর্থ পান না। তাঁদের সম্প্রদায় এবং ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা করে থাকে। যেহেতু শিক্ষার প্রারম্ভ হচ্ছে নৈতিক শিক্ষা, সেহেতু তদারক করার অধিকার এবং কর্তব্য যাজক সম্প্রদায়ের আছে। ক্যাথলিকদের সন্তানদের এই স্কুলে পাঠানো বাধ্যতামূলক না হলেও এ জন্য অনুরোধ-উপরোধ করা হয়। প্যারোকিয়াল স্কুলের ধর্মবহির্ভূত পাঠক্রম পাবলিক স্কুলের পাঠক্রমের মতো। প্যারোকিয়াল স্কুল পদ্ধতি মার্কিনদের সৃষ্টি। অন্যান্য দেশেও প্যারোকিয়াল স্কুল আছে। দক্ষিণ এশিয়ার উপমহাদেশে মুসলিম শাসন আমলে ও ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক যুগে বহু মসজিদের সঙ্গে মক্তব-মাদ্রাসা যুক্ত ছিল। এসবের প্রধানত ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হলেও প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষাও দেওয়া হতো। আজও কোনো কোনো জায়গায় এ ধরনের বিদ্যালয় দেখা যায়।

**প্যাল্যাস** রোমক কিংবদন্তি অনুযায়ী প্যাল্যাস হলো জুপিটারের মাথা থেকে সম্পূর্ণ সশস্ত্র অবস্থায় জন্ম নেওয়া দেবী মিনার্ভা।

**প্যাশন প্লে** মধ্যযুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রচলিত যিশুর দুঃখকষ্ট ও মৃত্যুবিষয়ক একশ্রেণীর অলৌকিক ঘটনাবলির বিবরণধৃত নাটক।

**প্রকৃতিপূজা** প্রকৃতিপূজা এক ধরনের আদিম ধর্মীয় বিশ্বাস। প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে এক অলৌকিক শক্তি নিহিত—এমন বিশ্বাস থেকেই প্রকৃতিপূজার উদ্ভব। প্রেতাত্মার বিশ্বাস থেকে যেমন পূর্বপুরুষ পূজার প্রচলন, তেমনি ধর্মের বিবর্তনের সূত্র ধরে পরে প্রকৃতিপূজার উদ্ভব ঘটে। প্রকৃতির অসংখ্য বস্তু, যেমন—চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, পৃথিবী, বজ্র, বৃষ্টি, আগুন, জল, বাতাস, মাটি, নদীনালা, সমুদ্র, গাছপালা ইত্যাদিকে পূজা করা হয়।

**প্রজাপতি** হিন্দুমতে, জীবসমূহের স্রষ্টা, জন্মদাতা ও পূর্বপুরুষ। বেদে ইন্দ্র, সাবিত্রী, সোম, হিরণ্যগর্ভ ও অন্যান্য দেবতাকেও প্রজাপতি বলা হয়। মনুসংহিতায় ব্রহ্মা এই নামেই অভিহিত। ব্রহ্মার পুত্র এবং ১০ জন ঋষির সৃষ্টিকর্তা বলে স্বয়ম্ভু মনুকেও প্রজাপতি বলা হয়। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বিশিষ্ট, ভৃগু ও নারদ—ব্রহ্মার এই দশজন মানসপুত্রও প্রজাপতি বলে অভিহিত।

**প্রতিমাবিদ্যা** (Iconography) রূপধর্মে শৈলীর বিষয় বা প্রতীকের অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই শব্দটি ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধের মোটিফ ও বিষয়-সম্পর্কিত বিদ্যাকে চিহ্নিত করে। উনবিংশ শতাব্দীতে এটি খ্রিষ্টীয় ধর্মের

প্রতীকী সৌধ ও শিল্পকলার দিকে নির্দেশ দেয়। বর্তমানে খ্রিষ্টধর্ম ছাড়াও অন্যান্য ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুও এই বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

**প্রতিমা বিনাশন** প্রথম দিকের প্রতিমাবিরোধী মতবাদ। খ্রিষ্টানদের মধ্যে উপাসনায় ধর্মীয় চিত্র বা মূর্তির ব্যবহার ছিল। পঞ্চম শতকের পর এশিয়া মাইনরে প্রতিমা বিনাশ আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। অন্যান্য ধর্মমত, বিশেষ করে, ইসলাম, ইহুদি, ম্যানিকিইজম এবং পলিশীয় মতবাদের প্রভাবে এই আন্দোলন প্রভাবিত হয়। সম্রাজ্ঞী আইরিনি মূর্তিপূজার পুনঃপ্রবর্তন করেন। ৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে নাইসিয়ার কাউন্সিলে প্রতিমা বিনাশন মনোভাবকে বাতিল করা হয়।

**প্রবারণা পূর্ণিমা** বৌদ্ধদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। 'প্রবারণা' শব্দের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে বরণ করা, নিষেধ করা ইত্যাদি। 'বরণ করা' অর্থে বিশুদ্ধ বিনয়াচারে জীবন পরিচালিত করার আদর্শে ব্রতী হওয়া, আর 'নিষেধ' অর্থে আদর্শ ও ধর্মাচারের পরিপন্থী কর্মগুলো পরিহার করাকে বোঝায়। বর্ষাবাস সমাপনান্তে ভিক্ষু সংঘ আপন আপন দোষত্রুটি অপর ভিক্ষু সংঘের কাছে প্রকাশ করে তার প্রায়শ্চিত্ত বিধানের আহ্বান জানায়। এমনকি অজ্ঞাতসারে কোনো অপরাধ হয়ে থাকলে তার জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থানকালে গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষু সংঘে পালনীয় হিসেবে এর প্রবর্তন করেন।

আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে প্রবারণা পালিত হয়। প্রবারণার পর ভিক্ষু সংঘকে অধীত জ্ঞান প্রচারের জন্য গ্রামে-গঞ্জে যেতে হয়। এ সময় তাঁরা কল্যাণের বাণী প্রচার করেন, যাতে মানুষসহ সব প্রাণীর কল্যাণ সাধিত হয়। এভাবে প্রবারণা শেষ হওয়ার পর প্রতিটি বৌদ্ধবিহারে পালিত হয় কঠিন চীবর দান উৎসব। প্রবারণা পূর্ণিমার অন্য একটি উৎসবময় দিক হলো ফানুস ওড়ানো। বৌদ্ধশাস্ত্রমতে বুদ্ধদেব আধ্যাত্মিক শক্তিবলে দেবলোকে গিয়ে মাকে ধর্মদেশনা করে এদিন স্বর্গ থেকে মর্তে অবতরণ করেন। এ কারণে বৌদ্ধরা প্রবারণা পূর্ণিমায় আকাশে প্রদীপ প্রজ্বালনের প্রতীকরূপে ফানুস উত্তোলন করে।

**প্রব্রজ্যা** ১৫ বছর বয়সে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত নবীন ভিক্ষুদের বলা হয় শ্রমণ বা শ্রমণোদ্দেশক। এই অবস্থাকে বলা হয় শ্রামণ্য বা প্রব্রজ্যা। প্রব্রজ্যার সাধারণ অর্থ গৃহত্যাগী হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করা, আর বিশেষ অর্থ গৃহত্যাগের পর মুণ্ডিতমস্তক হয়ে গৈরিক বসন 'চীবর' পরিধান করা এবং বৌদ্ধসংঘে প্রবেশপূর্বক শ্রমণ হয়ে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ—এই ত্রিশরণ গ্রহণ করতে হয়। শ্রমণরা একজন উপাধ্যায়ের অধীনে শিক্ষানবিশ থাকেন এবং ১০ শিক্ষাপদ পালন করে পবিত্র জীবন যাপন করেন। ২০ বছর বয়স্ক শ্রমণরা উপসম্পদা লাভ করেন অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ভিক্ষুরূপে স্বীকৃত হন।

প্রত্যেক ভিক্ষুকে কর্মাসক্তি, বাক্যাসক্তি, নিদ্রাসক্তি, মিত্রাসক্তি, ইন্দ্রিয়াসক্তি ও আহারাসক্তি পরিহার করে কায়ানুদর্শী, বেদনাদর্শী, চিত্তানুদর্শী ও ধর্মানুদর্শী হয়ে তথাগত সম্যক-সম্বুদ্ধের শাসনে অবস্থান করতে হবে। প্রত্যেক ভিক্ষুকে ভোররাত তিনটার মধ্যে শয্যা ত্যাগ করতে হবে। এরপর হাত-মুখ ধুয়ে সমবেতভাবে ত্রিরত্নবন্দনা করে সকাল ছয়টা পর্যন্ত ভাবনা, সাতটায় প্রাতরাশ, ১০টা পর্যন্ত মৈত্রীভাবনা, একটায় দ্বিপ্রহরের আহার, দুপুর ১২টা থেকে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, সন্ধ্যা সাতটায় সমবেত ত্রিরত্নবন্দনা, রাত নয়টা থেকে ১১টা পর্যন্ত সমবেত ভাবনা এবং ১২টায় শয্যা গ্রহণ করতে হবে।

**প্রমিথিউস** গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী টাইটানদের অন্যতম। মানবজাতির কাছে তিনি এক বীর। কারণ তিনিই দেবতাদের কাছ থেকে চুরি করে আগুন এনেছিলেন এই পৃথিবীতে।

**প্রাণায়াম** এক ধরনের যোগসাধনা। শ্বাস গ্রহণ (পূরক), শ্বাস ধারণ (কুম্ভক) ও শ্বাস ত্যাগ (রেচক)-এর অনুশীলনই প্রাণায়াম। গীতার চতুর্থ অধ্যায় ২৯ শ্লোকে বলা হয়েছে :

আপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান প্রাণেষু জুহ্বতি। ২৯।

অর্থাৎ

আর যাঁরা প্রাণায়ামচর্চায় আগ্রহী, তাঁরা অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে এবং প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুতে আহুতি দিয়ে অবশেষে প্রাণ এবং অপান বায়ুর গতি

রোধ করে সমাধিস্থ হন। কেউ আবার আহার সংযম করে প্রাণবায়ুকে প্রাণবায়ুতেই আহুতি দেন।

**প্রায়শ্চিত্ত** (Penance) রোমান ক্যাথলিক চার্চের এক স্যাক্রামেন্ট বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। অনুতপ্ত ব্যক্তি বিগত পাপ স্বীকারের কাল থেকে বা দীক্ষাগ্রহণের পর যত গুরুতর পাপ করেছেন, তা নিজমুখে স্বীকার করে পাপমুক্ত হন। অনুতপ্ত হৃদয়ে এবং আত্মশুদ্ধির জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে স্বীকার করতে হবে বিশপের কাছে। যাঁর কাছে স্বীকার করা হয় তাঁর নিজস্ব ক্ষমতা নাই, তিনি প্রভুর প্রতিনিধি হিসেবে নির্দিষ্টসংখ্যক প্রার্থনা অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিতে পারেন। তিনি স্বীকৃত তথ্য কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। যদি কৃত পাপ নরহত্যার মতো গুরুপাপ হয়, তবে তিনি অনুতপ্ত ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পরামর্শ দেবেন। সাধারণত এই অনুষ্ঠান কনফেশান বা পাপ স্বীকার নামে পরিচিত। প্রত্যেক রোমান ক্যাথলিককে প্রতিবছর একবার প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান পালন করতে হয়।

**প্রেতাত্মা বা আত্মস্বরূপ** (Alter-Ego) আদিম মানুষের বিশ্বাস যে মৃত ব্যক্তির বিদেহী আত্মা প্রেতাত্মায় পরিণত হয়। এ প্রেতাত্মার নাম Alter-Ego। প্রেতাত্মায় বিশ্বাসীরা মনে করেন যে প্রেতাত্মা দৃশ্যমান নয়। ইথারে তাদের বিচরণ। যেকোনো কঠিন বস্তু ভেদ করে দেশ-কাল এবং প্রাকৃতিক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এরা যথেচ্ছ ভ্রমণ করতে পারে। জীবিত মানুষে ভর করে কারও ক্ষতি বা উপকার সাধন করতে পারে। অবিশ্বাসীদের কাছে এর গুরুত্ব না থাকলেও বিশ্বাসীদের কাছে প্রেতাত্মা একাধারে কৌতূহল, আতঙ্ক এবং কখনো কখনো পুলকের কারণ।

**প্রোটিয়াস** এক সমুদ্রদেবতা, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। তিনি যেকোনো রূপ ধারণ করার ক্ষমতা রাখতেন।

## ফ

**ফকির গরীবুল্লাহ** [অষ্টাদশ শতাব্দী] ফকির গরীবুল্লাহ হুগলি জেলার (তখনকার বর্ধমান জেলার ভেতরে) বালিয়া পরগনার অন্তর্গত হাফিজপুর গ্রামের অধিবাসী। গরীবুল্লাহ সম্পর্কে তেমন তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর পিতার নাম শাহ্ দনদীর ['সাহা দুন্দি']। কোনগুলো তাঁর রচনা তা নিয়েও মতবিরোধ আছে। ফকির গরীবুল্লাহর *ইউসুফ-জোলেখা* নামে একটি কাব্য আছে। ডক্টর শহীদুল্লাহ মনে করেন, কাব্যটি ১৭৬৫ সালের পরে রচিত। ঐতিহাসিকেরা বলেন, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ফকির গরীবুল্লাহ কয়েকটি পুঁথি রচনা করেছেন। সেগুলো হচ্ছে: *ইউসুফ-জোলেখা, আমির হামজা, জঙ্গনামা, সোনাভান* ও *সত্যপীরের পুঁথি*।

**ফকিরনাচ** মাদার পীরের উরস উপলক্ষে পরিবেশিত নৃত্য। পীরের অনুসারী ফকিরেরা এর আয়োজন করে। তারা ঢিলেঢালা পোশাক পরে এবং লম্বা বাবরি চুল রাখে। তাদের কেউ গৃহী, কেউ বা ভিক্ষোপজীবী। চৈত্রসংক্রান্তিতে তারা পীরের দরগায় জড়ো হয় এবং মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালিয়ে মাজার আলোকিত ও সুরভিত করে। পীরের নামে একটি বাঁশ লাল কাপড়ে জড়িয়ে তার মাথায় চামর অথবা পরচুলা বাঁধা হয়। এটি মাদার পীরের প্রতীক। একজন ভক্ত বাঁশটি ঘাড়ে নেয়, অন্যরা তার সঙ্গী হয়। তাদের পায়ে থাকে ঘুঙুর। আসরে একটি অগ্নিকুণ্ডে পীরের প্রসাদরূপে মাংস পোড়ানো হয়। এরপর ভক্তরা এর চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচে। তারা বাদ্যের তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে যায় আর মাথা দোলায়। তাদের এই পা ফেল্য ও মাথা নাড়ার ভঙ্গিই এই নৃত্যের প্রধান অঙ্গ। ফকিরনৃত্যের মূল উদ্দেশ্য ভক্তিভাব ফুটিয়ে তোলা। এতে পা ও মাথা ছাড়া দেহের অন্য কোনো অঙ্গের তেমন ক্রিয়া নেই। পাকিস্তানের খটকনাচের ভাব ও ভঙ্গির সঙ্গে ফকিরনাচের সাদৃশ্য আছে।

**ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন** সন্ন্যাসীরা ছিলেন বেদান্তীয় হিন্দু যোগী এবং একদণ্ডি সন্ন্যাসবাদের গিরি ও পুরী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সংগঠক ও নেতা ছিলেন মাদারিয়া তরিকার সুফিসাধক মজনু শাহ। সন্ন্যাসী বিদ্রোহে সম্পৃক্ত জনৈক ভোজপুরী ব্রাহ্মণ ভবানী পাঠক তখন মজনু শাহর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। জমিদার দেবী চৌধুরানীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৭৬০ সালে বিচ্ছিন্নভাবে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৭৬৩ সালে তা জোরদার হয়ে ওঠে। বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন

সংঘর্ষের পর এই আন্দোলনের শক্তি উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

কোম্পানি প্রবর্তিত রেগুলেশন দ্বারা মুসলিম ফকির ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা বিভিন্নভাবে ব্যাহত ও বাধাগ্রস্ত হয়। ফকির ও সন্ন্যাসীরা তাঁদের অনুসারী ও সহমর্মী জনসাধারণের কাছ থেকে দান গ্রহণ করে তার ওপর ভিত্তি করেই জীবন ধারণ করতেন। কোম্পানি-শাসকেরা দেশের ধর্মীয় রীতিনীতি ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে মোটেও ওয়াকিবহাল ছিলেন না; আর সে কারণেই ফকির-সন্ন্যাসীদের দান গ্রহণকে তাঁরা জনসাধারণের কাছ থেকে অননুমোদিত অর্থ আদায় বলে মনে করতেন। কাজেই কোম্পানি-সরকার ফকির-সন্ন্যাসীদের সংগঠিত দল কর্তৃক দান গ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফকির-সন্ন্যাসীরা ফিরিঙ্গি শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেন। এই প্রতিরোধ আন্দোলন দেশের কৃষককুলের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করে। কারণ তারাও কোম্পানি সরকারের নতুন ভূমি রাজস্ব নীতির অধীনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

**ফতোয়া** (ফতওয়া বা ফাতওয়া) আরবি শব্দ। ধর্মীয় আইন বিশেষজ্ঞ অথবা মুফতি কর্তৃক প্রদত্ত বা প্রকাশিত বিধান। এর উদ্দেশ্য একজন বিচারক বা একজন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দান। ফতওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখনই, যখন কোনো ব্যক্তি বা কোনো বিচারক পবিত্র পবিত্র কোরআন ও হাদিস থেকে প্রাপ্ত শরিয়ায় ও আগের ফিকাহ গ্রন্থাদিতে কোনো উদ্ভূত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানে উপনীত হতে পারেন না।

ইসলামের প্রাথমিক সময় থেকে ইমাম ও মুফতিদের প্রদত্ত অনেক ফতওয়া সংগৃহীত হয়েছে। এগুলোই ফিকাহ নামে পরিচিত। যখন একজন মুফতি ফিকাহ সাহিত্যে তাঁর বিশদ জ্ঞান সত্ত্বেও কোনো সংকটপূর্ণ সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হন, তখন তাঁর অনুরোধে ফকিহরা (ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ) পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে সমস্যাটি সমাধানের জন্য ইজতিহাদ (সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা) পরিচালনা করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে (ইজমা) একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং প্রয়োজনে পূর্বসিদ্ধান্তগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে যুক্তি ও সাদৃশ্য (কিয়াস)-ভিত্তিক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন। এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলোই ফাতওয়া। এগুলো মাসআলা নামেও অভিহিত হয়, তবে সব মাসআলা ফতওয়া নয়।

উমাইয়া ও 'আব্বাসি' আমলে প্রখ্যাত ও জ্ঞানী ধর্মবেত্তাদের পুরোভাগে আসা পর্যন্ত ইসলামের প্রথম যুগে কাজিরা ফতওয়া জারি করতেন। আধুনিককালে কোনো কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামের খ্যাতিমান আইন ব্যাখ্যাকারীদের নিয়ে ফতওয়া কমিটি গঠিত হয়েছে। মিসর, তুরস্ক, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মরক্কো, জর্দান, সুদান, সৌদি আরব ও আরব আমিরাতের কমিটিগুলোর অভিজ্ঞতা ফতওয়া অনুশীলনের কিছু বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটন করেছে। প্রথমত, শুধু ব্যক্তির মতের ওপর নির্ভর করে ফতওয়া দেওয়া হয়নি; দ্বিতীয়ত, এগুলো জরুরি ক্ষেত্রে যখন প্রয়োজন হয়েছে তখনই কেবল দেওয়া হয়েছে; তৃতীয়ত, উল্লিখিত দেশগুলোর চলমান আইনের সঙ্গে ফতওয়াগুলো সংগতিপূর্ণ। কয়েকটি ফতওয়া গ্রন্থের নাম হলো : *ফাতওয়া কাজি খান, ফাতওয়া শামি, ফাতওয়া আলমগিরি*।

**ফনাস** লাতিয়ামের কিংবদন্তির রাজা। মৃত্যুর পরে তিনি কৃষি ও মেষপালকদের দেবতা হিসেবে পূজিত হন।

**ফরচুনা** সৌভাগ্য, নিয়তি, আশীর্বাদ, ভাগ্য ও উর্বরতার রোমক দেবী।

**ফরজ, ফরয্** অবশ্যপালনীয় বা অবশ্যকরণীয় বিষয়, কাজ বা আদেশ-নিষেধ। ইসলামি পরিভাষায় পবিত্র কোরআনের বিধান মেনে চলা 'ফরয্' বা অবশ্যপালনীয়। পবিত্র কোরআনে যেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান দেওয়া হয়েছে, যেসব আদেশ-নিষেধ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, একজন মুসলমানের জন্য সেসব অবশ্যপালনীয় আইন। যেমন—পাঁচ ওয়াক্ত (পাঁচবার) নামাজ, রমজান মাসের রোজা, সামর্থ্যবানের জন্য হজ ও জাকাত আদায়, আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস ইত্যাদি। 'ফরয্' পালন করলে সওয়াব বা পুণ্য হয়। অন্যথায় আল্লাহর শাস্তি অনিবার্য বলে পবিত্র কোরআন ও হাদিসসূত্রে জানা যায়।

**ফরায়েজি আন্দোলন** উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় গড়ে ওঠা একটি সংস্কার আন্দোলন। প্রাথমিক পর্যায়ে এ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় সংস্কার। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলনে আর্থসামাজিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ফরায়েজি শব্দটি 'ফরজ' থেকে উৎপন্ন, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। কাজেই ফরায়েজি বলতে তাদেরই বোঝায়, যাদের লক্ষ্য হচ্ছে অবশ্যপালনীয় ধর্মীয় কর্তব্যগুলো কার্যকর করা।

ফরায়েজিদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে দুদু মিয়ার দুটি লক্ষ্য ছিল: ১. হিন্দু জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার থেকে ফরায়েজি কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষা করা এবং ২. জনগণের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। প্রথম লক্ষ্যটি অর্জনের জন্য তিনি এক স্বেচ্ছাসেবক লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন এবং তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি অর্জনের জন্য তিনি ফরায়েজিদের নেতৃত্বে সনাতন স্থানীয় সরকারব্যবস্থা (পঞ্চায়েত) পুনঃপ্রবর্তন করেন। প্রথমোক্তটি 'সিয়াসতি' বা রাজনৈতিক শাখা এবং পরেরটি 'দ্বীনি' বা ধর্মীয় শাখা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে এ দুটি শাখা একীভূত করে 'খিলাফত' ব্যবস্থার রূপ দেওয়া হয়। ফরায়েজি খিলাফত পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল সকল ফরায়েজিকে দুদু মিয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের (খলিফা) প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা। তিনি তিন পদমর্যাদার খলিফা নিয়োগ করেন: উপরস্থ খলিফা, তত্ত্বাবধায়ক খলিফা ও গাঁও খলিফা।

দুদু মিয়া ফরায়েজি বসতি এলাকাকে ৩০০ থেকে ৫০০ পরিবারের এককেকটি ছোট এককে বিভক্ত করেন এবং প্রতি এককে একজন গাঁও খলিফা নিযুক্ত করেন। অনুরূপ ১০ বা ততোধিক একক নিয়ে গির্দ গঠিত হতো। প্রতিটি সার্কেল বা গির্দে একজন করে তত্ত্বাবধায়ক খলিফা নিয়োজিত হতেন। তত্ত্বাবধায়ক খলিফাকে একজন পিয়ন ও পেয়াদারা সাহায্য করত। তারা একদিকে তত্ত্বাবধায়ক খলিফার সঙ্গে গাঁও খলিফাদের এবং অন্যদিকে ওস্তাদদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করত। 'উপরস্থ খলিফা'রা ছিলেন ওস্তাদের উপদেষ্টা এবং তাঁরা ফরায়েজি আন্দোলনের প্রধান কার্যালয় বাহাদুরপুরে ওস্তাদের সঙ্গে অবস্থান করতেন।

**ফাতরাত আল ওহি** প্রথম ও পরের নাজিলকৃত অংশগুলোর মধ্যকার সময়টুকু নিশ্চিত নয়, সম্ভবত ছয় মাস থেকে তিন বছর। এই বিশাল সময়টা রাসুল (সা.)-এর জন্য কষ্টকর ছিল। তিনি ভাবতে বসেছিলেন যে যা শুনেছেন তা মনের ভ্রান্তি। খাদিজা (রা.)-এর গভীর বিশ্বাস তাঁকে স্বস্তি দেয়।

**ফাতিমা (রা.)** শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) ও খাদিজা (রা.)-এর চতুর্থ কন্যা। আলী (রা.)-কে বিয়ে করেন এবং তাঁদের দুই ছেলে হাসান (রা.) ও হোসাইন (রা.); কন্যা জয়নাব (রা.) ও উম্মে কুলসুম (রা.)। মেয়ের প্রতি ভালোবাসার কারণে রাসুল (সা.) হজরত আলী (রা.)-কে ফাতিমা (রা.) বেঁচে থাকাকালে অন্য স্ত্রী গ্রহণ না করতে অনুরোধ করেছিলেন। আবুবকর (রা.)-এর খিলাফতের সময় ফাতিমার সঙ্গে আবুবকরের (রা.) সম্পর্ক শীতল হয়ে পড়ে।

**ফাতিমি বংশ** মিসরের এক রাজবংশ, যারা দাবি করে বিবি ফাতিমা (রা.)-এর মাধ্যমে তারা হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর বংশধর।

**ফাতিহা** আরবি শব্দটির অর্থ প্রারম্ভিকা, উন্মুক্তকারী ও উদ্বোধনকারী। মুসলিম-সমাজে এর ব্যবহার দ্বিবিধ; পবিত্র কোরআনের সুরা অর্থে এবং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়া অর্থে। পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম এবং সর্বজনপরিচিত সুরার নাম ফাতিহা। একে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়, যথা: ফাতিহাতুল কিতাব (গ্রন্থের প্রারম্ভিকা), সুরাতুদ দু'আ (প্রার্থনা সুরা), উম্মুল কিতাব (গ্রন্থসার), সাব'উলমাসানি (বারবার পঠিত সাতটি আয়াত) ইত্যাদি। এতে সাতটি আয়াত আছে এবং সেগুলো হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়ত লাভের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। নামাজের প্রত্যেক রাকায়াতে সুরা ফাতিহা পাঠ আবশ্যক। কিন্তু এসব আচার অবশ্যপালনীয় কিছু নয়। এগুলো একেবারেই মৃত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁর রুহের শান্তির জন্য করা হয়। এসব কাজের জন্য যে রুহের শান্তি হবে এবং না করলে কষ্ট হবে, তা ভাবা ঠিক নয়। মৃতের জন্য শুভকামনা, তাঁর স্মৃতি মনে ধরে

রাখা ও তাঁর জন্য ইবাদত করা ভালো হলেও এর ফলে আল্লাহর নির্ধারিত বিচারে কোনো হেরফের হবে, তা ভাবা যুক্তিযুক্ত নয়। বুখারি শরিফ অনুসারে, উম্মুল কিতাব নামটা স্বয়ং রাসুল (সা.) দিয়েছিলেন। হজরত আলী (রা.)-এর মতে, এই সুরাই প্রথমে নাজিল হয়, যদিও প্রমাণ পাওয়া যায় ৯৬ : ১-৫ ছিল প্রথম আয়াত। সম্ভবত আলী (রা.) বলেছিলেন যে এই সুরাটাই প্রথম পরিপূর্ণ নাজিলকৃত সুরা, যেখানে আগের সব সুরা নাজিল হয়েছে কিছু কিছু আয়াতরূপে। 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই, যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়াময়, বিচারদিনের মালিক। আমরা তোমারই উপাসনা করি, তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদের চালিত করো তাদের পথে, যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ, যারা (তোমার) রোষে পতিত হয়নি, পথভ্রষ্টও হয়নি।' (১ : ১-৭)

মৃত ব্যক্তির জন্য ইসালে সওয়াব বা পুণ্য পৌছানোর উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও সদকা খয়রাত বা বিশেষ ভোজের আয়োজনপূর্বক যে দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়, তা ফাতিহা নামে পরিচিত। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে সুরা ফাতিহা, সুরা বাকারার প্রথম কয়েক আয়াত, আয়াতুল কুরসি, সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, সুরা ইয়াসিন, সুরা মূলক, সুরা তাকাসুর ও সুরা ইখলাস এগারো অথবা সাতবার, ন্যূনপক্ষে তিনবার পাঠ করা হয়। এ অনুষ্ঠানে সুরা ফাতিহা অবশ্যপাঠ্য বলেই এর নাম হয়েছে ফাতিহা। কখনো কখনো তা ফাতিহাখানি নামেও অভিহিত হয়। ইরান, মধ্য এশিয়া, বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সাধারণত চতুর্থ দিনে ফাতিহা অনুষ্ঠানকে কুলখানি, ৪০তম দিবসকে চেহলাম বা চল্লিশা বলা হয়।

**ফাতিহা-ই-ইয়াজদাহম** ১১ তারিখের মৃত্যুবার্ষিকী। একে এগারোই শরিফও বলা হয়। ৫৬১ হিজরি রবিউস সানি চাঁদের ১১ তারিখে (১৪ ফেব্রুয়ারি ১১৬৬ খ্রি.) গওসুল আ'জম হজরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) [জন্ম ৪৭০ হি./১০৭৭-৭৮ খ্রি.] ইন্তেকাল করেন। তিনি কাদিরিয়া তরিকার প্রবর্তক ও ইসলামি দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষভাবে সম্মানিত। তাঁর অগণিত ভক্ত ওই দিন তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠান, তাঁর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা, জিকির আজকার, দোয়া ও দান প্রভৃতি সৎকার্য করে থাকেন। তাঁর ভক্তদের অনুরোধক্রমে ব্রিটিশ শাসনামলে এই দিনটি এ দেশের সরকারি বার্ষিক ছুটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই দিনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অফিসাদি বন্ধ থাকে।

**ফাদাক বাগ** খাইবারের অদূরে অবস্থিত বাগান। মহানবী (সা.) খাইবার বিজয়ের (৭ হি.) পর মুহাইয়িস ইবনে মসউদ আনসারিকে ফাদাক এলাকায় তবলিগের জন্য পাঠান। বাগানের মালিক ইহুদিদের সঙ্গে অর্ধেক বাগান মুসলমানদের প্রদানের শর্তে এই মর্মে চুক্তি করেন যে এর ফলে তারা সেখানে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। এই বাগান থেকে যে আয় হতো, তা মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করা হতো। অবশিষ্টাংশ বনু হাশিমের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। হজরত আবুবকর (রা.)-এর কাছে ফাতিমা (রা.) এই বাগান দাবি করলে তিনি অসম্মত হন। খুলাফায়ে রাশিদিনের আমলে এই বাগানকে কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত না করা হলেও উমাইয়া বংশের মারওয়ান একে ব্যক্তিগত সম্পদরূপে দখল করেন। একে বনু হাশিমের কাছে অর্পণ করা হয়।

**ফাদারস অব দ্য চার্চ বা গির্জার পিতৃবর্গ** প্রথম যুগের গোঁড়া খ্রিষ্টান লেখকদের উপাধি। এঁদের মধ্যে অনেক দল থাকলেও আটজন ডক্টর অব চার্চের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। এঁরা হলেন (গ্রিক চার্চ) মহামতি সেন্ট ব্যাসিল, সেন্ট গ্রেগরি নাজিয়ানজেন, সেন্ট জন ক্রিসস্টাম, সেন্ট অ্যাথানেশিয়াস (লাতিন চার্চ), সেন্ট অ্যামব্রোজ, সেন্ট জেরোম, সেন্ট অগাস্টিন ও মহামতি সেন্ট গ্রেগরি।

**ফানা** বিলোপপ্রাপ্তি। নিজে যথার্থ সুফি হতে পেরেছেন তিনি অবশ্যই স্বকীয় সত্তার বিলোপসাধনগত অবস্থায় উপনীত হয়েছেন। আল-হুজরিবিকৃত কাশফ আল-মাহজুব-এ ফানা শব্দের তাৎপর্যপূর্ণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাসাওউফ গুণ বলতে এই বোঝায় যে একজন সুফি সমস্ত সৃষ্টবস্তু

থেকে দৃষ্টি পরিহার করে তাঁর লক্ষ একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ করবেন। আত্মবিলোপ সাধনের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করে তিনি অনন্তজীবনের পূর্ণতার প্রতি আগুয়ান হবেন। প্রকৃত সুফি তাঁকেই বোঝায়, যাঁর নিজস্ব বলতে কিছু নেই এবং তিনি নিজেও কারও মালিকানাধীন নন। এই রূপ অনুভূতি যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে, তখন একে ফানা-ই কুল্লি বা পরিপূর্ণ আত্মবিলুপ্তি বলে।

ফানা ও নির্বাণ একার্থক নয়। বৌদ্ধমতের নির্বাণ আল্লাহর ধারণা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বরং নির্বাণের সঙ্গে আত্মার দেহান্তরবাদের সংস্রব রয়েছে। নির্বাণ লাভে পুনর্জন্মের পরিসমাপ্তি ঘটে। মুসলমানদের ফানার সঙ্গে জন্মান্তরবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। সুফিবাদে ফানার উচ্চস্তর স্থান হচ্ছে বাকা। বাকা দ্র.

**ফালসাফা** ফিলোসফি, দর্শন। ইসলামি দর্শনকে প্রভাবিত করেছে অ্যারিস্টটলিয়ানিজম ও নিওপ্লেটোনিজম; কিন্তু এর চিন্তাধারা একান্ত নিজস্ব।। অনেক মুসলমান দার্শনিককে অভিযুক্ত করা হয় নিজস্ব ভাবধারায় চিন্তা করার কারণে। দার্শনিকেরা মহাবিশ্ব ও বিজ্ঞানকে কার্যকারণে ব্যবহারের দিকনির্দেশ দেন। আল্লাহ্ সমগ্র কসমিক সিস্টেম বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি, আমাদের সীমাবদ্ধ মন ও চিন্তার গণ্ডি থেকে অনেক উর্ধ্বে। জানার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা আমাদের শুধু অধিকার নয়, অবশ্যকর্তব্য।

**ফাল্গুনী পূর্ণিমা** বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি ধর্মীয় উৎসব। বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘকাল পিতা-স্ত্রী-সন্তানসহ জ্ঞাতিদের সঙ্গে বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়নি। সকলের মতো পিতা রাজা শুদ্ধোধনও বুদ্ধদর্শনে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন এবং একদিন বুদ্ধের কাছে দূত পাঠান। দূত বুদ্ধবাণীতে আত্মহারা হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বুদ্ধের কাছেই থেকে যায়। এমনিভাবে রাজপ্রাসাদের অনেকেই বুদ্ধের কাছে গিয়ে প্রব্রজিত হয়ে আর ফিরে আসেন না। অবশেষে শুদ্ধোধন কালুদায়ি নামে সিদ্ধার্থের এক বাল্যবন্ধুকে তাঁর কাছে পাঠান। বুদ্ধদেব তখন রাজগৃহের বেণুবন বিহারে দেশনারত অবস্থায় ছিলেন। কালুদায়ির কাছে পিতার মানসিক অবস্থার কথা শুনে বুদ্ধ যেতে সম্মত হন এবং একদিন কপিলাবস্তুতে গিয়ে পরিবারবর্গের সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে তিনি পিতা শুদ্ধোধন, স্ত্রী যশোধরা এবং পুত্র রাহুলসহ অন্যদের শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষা দেন। সে দিনটি ছিল ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন। বৌদ্ধদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ এই দিনটি। এই দিনে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চলে মেলা বসে, যেমন শাক্যমুনি মেলা, আচারিয়ার মেলা, বোধিমেলা, ফতেনগর মেলা ইত্যাদি।

**ফা-হিয়েন** প্রথম চৈনিক বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী, যিনি মধ্য এশিয়া, ভারত ও শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ করে সে সম্পর্কে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে যান। তাঁর নামের সঠিক উচ্চারণ সম্ভবত ফাজিয়ান এবং তা ফা-সিয়েন হিসেবেও লেখা হয়। শানজির (শানসি) অধিবাসী ফা-হিয়েন মাত্র তিন বছর বয়সে বৌদ্ধ সংঘে যোগ দেন। নবব্রতিত্ব লাভ করার পর ফা-হিয়েনের মনে বৌদ্ধধর্মের মঠতান্ত্রিক নীতিসংবলিত গ্রন্থ *বিনয় পিটক*-এর সন্ধানে ভারতে আসার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। ৩৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি যখন ভারতের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স সম্ভবত ৬৪ বছর।

মধ্য এশিয়া ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে পরিভ্রমণ করে ফা-হিয়েন উত্তর ভারতে উপস্থিত হন। এরপর তিনি একে একে গঙ্গা উপত্যকায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিভিন্ন পবিত্র স্থান দর্শন করেন। এগুলো হলো: বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলাবস্তু, বুদ্ধগয়া, শারনাথ ও কুশীনগর। ভারত ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে তিনি সীমান্ত রাজ্য চম্পার মধ্য দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করেন। তাঁর গন্তব্যস্থল ছিল সে সময়ের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক বন্দর তাম্রলিপ্তি। ফা-হিয়েন দক্ষিণ ভারতের অঞ্চলগুলো ভ্রমণ করেননি। তিনি সমুদ্রপথেই ভারত ত্যাগ করে শ্রীলঙ্কা পরিভ্রমণের পর চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। সমুদ্রে অনেক কষ্টকর পরিস্থিতি মোকাবিলা করে ৪১৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চীনে প্রত্যাবর্তন করেন।

**ফিদ্‌য়াহ** শব্দটি আরবি। ধর্মীয় আদেশ লঙ্ঘন করলে, বা পালনে অক্ষম হলে, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেয় অর্থকে ইসলামি পরিভাষায় ফিদ্‌য়াহ বলা হয়। প্রাণ রক্ষার বিনিময়ে দেয় অর্থেরও একই নাম। রমজান মাসের

রোজা রাখতে অক্ষম হলে, হজ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা পালন না করলে, মুসলমানদের ফিদ্য়াহ প্রদান করতে হয়। ফিদ্য়াহর অর্থ দ্বারা গোলাম আজাদ করা এবং দরিদ্রকে আহার প্রদানের বিধান রয়েছে। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির জন্য ফিদ্য়াহর ব্যবস্থা করা হয়। মরক্কোতে পরকালীন মুক্তির জন্য এই প্রথা প্রচলিত। সুমাত্রায় নামাজ কাজা হলে ফিদ্য়াহ আদায় করা হয়। সিরিয়ায় শিশুদের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জন্তু জবাই করে ফিদ্য়াহ আদায়ের প্রথা প্রচলিত।

**ফিদাই** আরবি এই শব্দের অর্থ এমন কেউ যে তাঁর জীবন উৎসর্গ করে। এই নাম বিশেষত অ্যাসাসিনদের দেওয়া হয়। শব্দটি যাঁরা বীর, উৎসাহী ও স্থিরসংকল্প উৎসর্গকারী, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বীরত্বের বিবরণধৃত লোকগাথা ও কাব্য-সাহিত্যে এর নিদর্শন পাওয়া যায়।

**ফিরদাউস** বেহেশতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। পবিত্র কোরআনের ১৮ সুরা কাহাফ্-এর ১০৭-১০৮ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে ফিরদাউসের উদ্যান, যেখানে তারা স্থায়ী হবে ও এর পরিবর্তে তারা অন্য কোনো স্থান কামনা করবে না।' ২৩ সুরা মুমিন-এর ৮-১১ আয়াতে আছে, 'আর যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে আর যারা নিজেদের নামাজে যত্নবান, তারাই হবে অধিকারী, অধিকারী ফিরদাউসের, যেখানে তারা থাকবে চিরকাল।'

**ফেট্স** মানবজীবন নিয়ন্ত্রণকারিণী দেবীগণ। গ্রিকদের কাছে তারা ক্লথো, লেসিস ও অ্যাট্রপস নামে পরিচিত। প্রথম জন জীবনের সুতা প্যাঁচাত, দ্বিতীয় জন তা বজায় রাখত বা বর্ধিত করত ও তৃতীয় জন তা ছিন্ন করত।

**ফেরাউন** মিসরীয় ফারাওয়ের আরবি রূপান্তর (৬৯:২৬)। ফারাও একটা উপাধি, আসলে কোনো নাম নয়। অর্থ, 'মহান প্রাসাদ'। হজরত ইউসুফ (আ.)-এর সময়কার ফারাও হচ্ছে ১৭০০-১৫৮০ খ্রিষ্টপূর্ব সময়সীমার ছজন হাইকস রাজাদের একজন, যাঁরা সিনাই অঞ্চল থেকে মিসরে অনুপ্রবেশ করে। অন্যদিকে মুসা (আ.)-এর আমল ছিল চতুর্দশ রাজবংশের সময়। সম্ভবত সেথোসের পুত্র মেরেনেপ্টা সেই ফেরাউন।

*ফেরাউনের স্ত্রী* সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ২৮ সুরা কাসাসের ৯ আয়াতে বলা হয়েছে, ফেরাউনের স্ত্রী বলল, 'সে (শিশু মুসা) তো আমার ও তোমার নয়ন জুড়াচ্ছে, একে হত্যা কোরো না। সে আমাদের উপকারে আসতে পারে কিংবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবে নিতে পারি।'

**ফ্রান্সিস জেভিয়ার, সেন্ট** বাসক-এর জেসুইট পাদরি, লইওলার সেন্ট ইগনেশিয়াসের বন্ধু। তাঁর সঙ্গে তিনিসহ আরও পাঁচজন সভ্য মিলে যিশুর সংঘ গঠন করেন। তাঁরা উভয়ে একই সময়ে একত্রে পাদরির পদে অধিষ্ঠিত হন (১৫৩৭)। ১৫৪০ সালের পর তিনি জীবনের শেষ ১১ বছর তৎকালীন ভারত এবং দূরপ্রাচ্যের বহু জায়গা ভ্রমণ করে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার কাজে অতিবাহিত করেন। তাঁর সমাধি ভারতের গোয়াতে অবস্থিত।

**ফ্রান্সিস, সেন্ট** ফ্রান্সিসকান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম আসিসি, ইতালি। তাঁর আসল নাম জোভানদি বারনারদোনে। তাঁর পিতার ফ্রান্স পর্যটনের পর থেকে তাঁকে ফ্রান্সিসকো (ফরাসি) বলে অভিহিত করা হয়। ২২ বছর বয়সে তিনি সংসারধর্ম ত্যাগ করেন। ১২০৯ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মপ্রচারে বের হন এবং প্রথম থেকেই নম্রতা, মানুষের প্রতি একনিষ্ঠ সেবাব্রত এবং ধর্মীয় ন্যায়নিষ্ঠার জন্য তিনি অপরের মন জয় করেন। পোপ তাকে ফ্রাইঅ্যার নামক খ্রিষ্টান সন্ন্যাসী দল গঠনে অনুমতি প্রদান করেন। ফ্রান্সিসপন্থীরা ইতালি পরিভ্রমণ করেন এবং স্বল্পকালের মধ্যেই অন্যান্য দেশেও খ্রিষ্টীয় ধর্মাদর্শ প্রচার আরম্ভ করেন। ফ্রান্সিস স্বয়ং বিদেশ পর্যটন করেন। তাঁর অনাড়ম্বর জীবনকে কেন্দ্র করে অনেক গল্প রচিত হয়।

**ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়** সেন্ট ফ্রান্সিস কর্তৃক নির্দেশিত ধর্মীয় নীতি অনুসারী সম্প্রদায়ের সদস্যদের নাম। খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীদের তিনটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে ফ্রান্সিসকানদের সম্পূর্ণ সম্প্রদায়টি গঠিত। ফ্রাইঅ্যারস মাইনর, ফ্রাইঅ্যারস মাইনর ক্যাপিউচিন এবং ফ্রাইঅ্যারস মাইনর কনভেনচুয়াল। ১৩২২ খ্রিষ্টাব্দে পোপ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো তাঁদেরও সম্পত্তির মালিকানা বিষয়ে সমান অধিকারী বলে ঘোষণা দেন।

ফ্রাইঅ্যারদের মধ্যে যাঁরা আরও কঠিনভাবে প্রাচীন পন্থা অনুসরণে ব্রতী হন, ১৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁরাই ক্যাপিউচিন নামে অভিহিত হন। মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফ্রান্সিসকানদের প্রাধান্য বিস্তৃত হয় এবং তাঁরাই মধ্যযুগের পাশ্চাত্য খ্রিষ্টীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের (Scholasticism) উৎস ছিলেন। সেন্ট ফ্রান্সিসের নীতি অনুসরণকারীদের গ্রে ফ্রাইঅ্যারম বা ধূসর সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বলা হতো; বর্তমানে তাঁদের পোশাক বিশিষ্ট ধরনের বাদামি বর্ণের।

**ফ্রিয়া** প্রাচীন স্ক্যান্ডেনেভীয় অঞ্চলের কিংবদন্তি অনুযায়ী ফ্রিয়া নীলনয়না, স্বর্ণকেশী এবং ভালোবাসার দেবী। খরগোশ তাঁর সঙ্গী এবং তিনি সূর্যকিরণের দেবতা অদুরের স্ত্রী।

## ব

**বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতি** বিংশ শতকে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে এই সমিতি গঠিত হয়। সৈয়দ আমীর আলীর সভাপতিত্বে ক্যালকাটা মোহামেডান ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশনে এর পত্তন ঘটে। মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণই ছিল এর মূল নীতি। এই সমিতি নানা স্থানে অনেকগুলো অধিবেশন করে এবং শিক্ষার ব্যাপারে নানা প্রস্তাব ও কার্যকর ব্যবস্থাও নেয়, যেমন প্রথম অধিবেশনে শিক্ষার বিস্তার ত্বরান্বিত করার জন্য প্রতি জেলায় একটি শিক্ষা তহবিল গঠন, নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোযোগ দান, উপযুক্ত পুস্তক প্রণয়ন ইত্যাদি। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয়ে ১৯২০ সাল পর্যন্ত সমিতি কমবেশি কার্যকর ছিল।

**বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী** ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারিতে এর প্রতিষ্ঠা। বাংলা নামটি দেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রথম অধিবেশনে এর ইংরেজি নাম হয় বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লিগ। এটি ননফর্মাল বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'আবাঁধা' রীতিতে শিক্ষা—বাংলার গ্রামে ও বস্তিতে প্রসারের কর্মকাণ্ডে যুক্ত প্রথম প্রতিষ্ঠান। শিক্ষাক্ষেত্রে অডিও ভিস্যুয়ালের ব্যবহার শুরু হয়। ম্যাজিক লণ্ঠনের প্রচলন ঘটে। লিগের উদ্যোগে ১৯১৭ সালে কলকাতায় অল ইন্ডিয়া সোশ্যাল ওয়ার্কার্স কনফারেন্স হয়। ১৯৪০ সালে মেয়েদের বয়স্ক শিক্ষার জন্য শ্রীনন্দা নামে এর একটি শাখা গড়া হয়। সেখানে সহজ ভাষায় নানা বিদ্যাপাঠ ছাড়াও সংগীত ও চিত্রকলা ইত্যাদি বিষয়ে চর্চা হতো। ১৯৬১ থেকে সত্যেন মৈত্র বয়স্ক শিক্ষা নিয়ে বিশ্বজুড়ে আন্দোলনরত ল্যুবাক কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হয়ে লিগের কার্যক্রমে বয়স্ক সাক্ষরতা সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করেন। শ্রমজীবী মা ও শিশুদের জন্য 'অঙ্কুর' নামে একটি বিদ্যালয় চালু করা হয়। সেলাইয়ের স্কুলও খোলা হয়। সহজ ভাষায় সাক্ষরতার ওপর বইপত্র লেখা শুরু হয়।

**বজ্রযান** বৌদ্ধধর্মের একটি মতবাদ। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মন্ত্রযানের সঙ্গে মহাসুখবাদের সংযোগের ফলে উদ্ভূত এই মতবাদ বাংলার সমতট অঞ্চলে বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। বজ্রযান মতে, নির্বাণের পর শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ লাভ হয়। শূন্যতার পরম জ্ঞানই নির্বাণ। এই জ্ঞানকে বলে নৈরাত্মা। নৈরাত্মার মধ্যে আত্মা লয়প্রাপ্ত হয়। বোধিচিত্ত যখন নৈরাত্মায় আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে নৈরাত্মাতেই লীন হয়, তখন উৎপন্ন হয় মহাসুখ। চিত্তের যে পরমানন্দ ভাব, যে এককেন্দ্রিক ধ্যান, তাই বোধিচিত্ত। বোধিচিত্তই বজ্র। কঠোর যোগের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় দমিত হলে চিত্ত বজ্রের মতো দৃঢ় হয়। এ অবস্থায় সাধক বোধিজ্ঞান লাভ করেন। বজ্রকে আশ্রয় করে যে যানে বা পথে নির্বাণ লাভ হয়, তা-ই বজ্রযান।

বজ্রযানে গুরু অপরিহার্য। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের গুরু জেতারি ছিলেন বজ্রযানের অন্যতম গুরু। তিনি এ বিষয়ে বহু গ্রন্থও রচনা করেন। সপ্তম শতাব্দীর বৌদ্ধপণ্ডিত বাঙালি তান্ত্রিক আচার্য শান্তরক্ষিতও বজ্রযান বিষয়ে তিনখানি তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন।

**বদর আউলিয়া** চট্টগ্রামের এক দরবেশ। চট্টগ্রাম 'বারো আউলিয়ার দেশ'। ১২ জন দরবেশের মধ্যে বদর আউলিয়াই প্রধান। চট্টগ্রাম জেলার মানব বসতির সঙ্গে বদর আউলিয়ার নাম জড়িত।

চট্টগ্রামের অধিবাসীরা তাঁকে তাদের অভিভাবক হিসেবে গভীর শ্রদ্ধা করে।

পূর্ব বাংলার মাঝিরা অন্য পাঁচজন দরবেশের (যারা পাঁচ পীর নামে পরিচিত) সঙ্গে বদর আউলিয়ার নাম উচ্চারণ করে থাকে। সমুদ্র উপকূল ধরে দক্ষিণে মালয় উপদ্বীপ ছাড়িয়েও সমুদ্রগামীদের কাছে তিনি রক্ষক হিসেবে বিবেচিত। আরাকানের মধ্যযুগীয় বৌদ্ধ রাজারা তাঁর সমাধির জন্য কয়েকটি গ্রাম দান করেন এবং তাঁরা তীর্থযাত্রী হিসেবে এই পবিত্র মাজারে আসতেন ও মাজারে দান করতেন। মিয়ানমারের টেনাসেরিমের জনগণ তাঁকে মাদরা বলে ডাকত। আকিয়াবের অধিবাসীদের কাছে তিনি বুদ্ধ আউলিয়া বা বুদ্ধ সাহেব হিসেবে পরিচিত।

বৌদ্ধ, হিন্দু ও চৈনিকেরা বদর আউলিয়াকে পরমেশ্বর অথবা আত্মার অধস্তন হিসেবে ভক্তি করে। চট্টগ্রামের অধিবাসীরা তাঁকে বিভিন্ন নামে ডাকে, যেমন—বদর আলম, বদর আউলিয়া, বদর পীর বা পীর বদর ও বদর শাহ। অন্দরকিল্লার অন্তর্গত বর্তমানের বখশিরহাটের নিকটবর্তী বদরপট্টি নামে পরিচিত স্থানে বদর আউলিয়ার মাজার অবস্থিত।

**বনবিবির জহুরনামা** পীরমাহাত্ম্যবিষয়ক পাঁচালিকাব্য। দোভাষী পুঁথিকার মহম্মদ খান কর্তৃক রচিত। বনবিবি সুন্দরবনের অধিষ্ঠাত্রী কাল্পনিক পীরানি। তিনি হিন্দুর বনদুর্গা বা বনদেবীর মুসলমানি রূপ। মধ্যযুগীয় লোকসমাজ রোগশোক ও হিংস্র জীবজন্তুর প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য এসব কাল্পনিক দৈবসত্তার পূজা করত, তাদের কাছে মানত করত এবং শিরনি দিত। সেই ধারা এখনো বহমান। বনবিবি সুন্দরবনের মউল্যা বা মধুসংগ্রহকারী শ্রমজীবীদের রক্ষাকর্ত্রী। গভীর বনে মধু ও মোম সংগ্রহ করতে যাওয়ার আগে তারা বনবিবির উদ্দেশে ক্ষীরাদি অন্নযোগে শিরনি দেয়। এতে বাঘ ও ভূতপ্রেতের ভয় থাকে না বলে তাদের বিশ্বাস, কারণ, বনবিবি ওইসব অপশক্তির ওপর কর্তৃত্ব করেন।

**বম** পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি ক্ষুদ্র কৌমসত্তা। বমরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। এরা দেখতে চাকমা ও মারমাদের মতোই। 'বম' শব্দের অর্থ হলো বন্ধন। জীবনের যাবতীয় কর্ম, শিকারপর্ব, নৃত্যগীত, পানাহার, দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ নিবেদন—সবকিছুই একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে সম্পাদন করার রীতিনীতি থেকে 'বম' বা 'বন্ধন'-এর ধারণাটি এসেছে।

**বয়ঃসন্ধি উৎসব** যৌবনারম্ভের উৎসব। এর মধ্যে রয়েছে নৃত্য, উপবাস, বিচ্ছেদ ও নিষেধাজ্ঞা। উত্তর আমেরিকার এই উৎসবে প্রথম ঋতুস্রাব হওয়া বালিকাকে তার হাতের আঙুল দিয়ে মাথায় আঁচড় দিয়ে শপথ করানো হয়, যেন অবৈধভাবে কোনো পুরুষের সঙ্গে মিলিত না হয়। উত্তর আমেরিকার বালকদেরও একইভাবে যৌবনারম্ভের উৎসবের মাধ্যমে প্রতীকী শপথ করানো হয় এবং শুরুতেই বিশেষ কাজে প্রেরণ করা হয়।

**বরাহ** হিরণ্যাক্ষ নামক এক দানব পৃথিবীকে সমুদ্রতলে নিয়ে গেলে বিষ্ণু বরাহরূপে এক হাজার বছর যুদ্ধ করে তাকে বধ করে পৃথিবী উদ্ধার করেন।

**বর্ণপ্রথা** উপমহাদেশে আর্যীকরণের ফলে বর্ণের ভিত্তিতে বিভক্তির সমস্যা সমাধানের প্রবণতাকে ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের প্রথার দিকে চালিত করে। তত্ত্বগতভাবে বিভিন্ন বর্ণের বৈশিষ্ট্য ও তাদের চরিত্র ও কার্যাবলিতে যে গুণাবলি প্রদর্শিত হতো, সেসবের গুরুত্বের ক্রমপর্যায়ের ভিত্তিতে ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ নির্ধারিত হতো। সত্ত্বের রক্ষক হিসেবে ব্রাহ্মণদের পবিত্রতম বলে গণ্য করা হতো। অন্য কথায় বলতে গেলে, ব্রাহ্মণদের পবিত্রতার প্রতিমূর্তি বলে বিশ্বাস করা এবং পৃথিবীতে দেবতা বলে শ্রদ্ধা করা হতো। এ বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মাধ্যমে যথা, রজ ও তম গুণের প্রকাশ ঘটায় পবিত্রতার মাত্রা ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেতে থাকে। সামাজিক বিন্যাসের সর্বনিম্ন ধাপে অধিষ্ঠিত শূদ্রদের ব্যাপারে বিশ্বাস করা হতো, তারা এ গুণের অধিকারী ছিল না।

**বর্ষাবাস** বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘের শিক্ষাব্রতবিশেষ। এ সময় ভিক্ষুরা বিধিবদ্ধ শিক্ষা ও একান্ত ধ্যান-সমাধির চর্চা করেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং রাজগৃহে অবস্থানকালে ভিক্ষু সংঘের জন্য এই বর্ষাবাস বিধান প্রবর্তন করেন। বর্ষায় জলসিক্ত ও কর্দমাক্ত পথে ভ্রমণকালে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সবুজ তৃণ,

চারাগাছ এবং ক্ষুদ্র প্রাণী পদদলিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। বুদ্ধদেব তাই এ সময়ে সর্বাধিক পরিভ্রমণ ত্যাগ করে নিজ নিজ বিহারে অবস্থানপূর্বক শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাচর্চা করার বিধান দেন। তিনি নিজেই আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা—এই তিন মাস বর্ষাবাসের সময় নির্ধারণ করেন। কোনো ভিক্ষু অসুস্থতার কারণে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বর্ষাবাস অধিষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে না পারলে তিনি মধুপূর্ণিমা (ভাদ্র পূর্ণিমা) থেকে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাস বর্ষাবাস পালন করতে পারেন।

বর্ষাবাস, প্রবারণা ও কঠিন চীবর দান—এই তিনটি উৎসব পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বর্ষাব্রত পালন না করলে কোনো ভিক্ষু কঠিন চীবর গ্রহণ করতে পারেন না। আবার কঠিন চীবর গ্রহণ করতে না পারলে ভিক্ষুবিনয় অনুসারে ভিক্ষুরা বহুবিধ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। বর্ষাব্রত গণনা করে ভিক্ষুজীবনের বয়স ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হয়।

**বলরামী** বলরাম নামের জনৈক সাধু এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এটি 'বলাহাড়ি' বা 'বলরাম ভজা' নামেও পরিচিত। বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর; পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, বীরভূম, বর্ধমান, কলকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে এই সম্প্রদায় একসময় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বলরাম বর্তমান মেহেরপুর জেলার মালোপাড়ায় এক ঝাড়ুদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গোবিন্দ হাড়ি এবং মাতার নাম গৌরমণি। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ৬৫ বছর বয়সে বলরাম মৃত্যুবরণ করেন। তিনি নিরক্ষর ছিলেন। মেহেরপুর শহরের মল্লিক বাবুদের পারিবারিক বিগ্রহ এবং বিগ্রহ সমীপে প্রদত্ত স্বর্ণালংকার চুরি যাওয়ায় তাঁকে দায়ী করা হয়। তীব্র মনঃকষ্টে পেশা ত্যাগ করে তিনি নিরুদ্দেশ হন। দীর্ঘদিন পরে তিনি মেহেরপুরে প্রত্যাবর্তন করে শিষ্যাদিসহ বলরামী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন।

ঈশ্বরোপাসনাকে সার জ্ঞান করে ইন্দ্রিয় দমন ও শুদ্ধ জীবনযাপন তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। তাঁদের মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হলো ঈশ্বরের শরীর। এরূপ উপাস্যকে হিন্দু শিষ্য হলে বলে হাড়িরাম এবং মুসলমান শিষ্য হলে বলে হাড়িআল্লা।

বলরামের জীবিতকালে শিষ্যসংখ্যা ছিল প্রায় ২০ হাজার। তারা ছিল হাড়ি, ডোম, বাগদি, বেদে, যোগী, মাহিষ্য, নমশূদ্র প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। বলরামের মেধাবী ও বাকপটু অনেক উক্তি, গান ও বচন-প্রবচনে তাঁর ধর্মতত্ত্ব ও প্রতিবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে।

বলরামী সম্প্রদায় কোনো বিগ্রহ মানে না এবং বিগ্রহের পূজাও করে না। এমনকি তারা জাতিভেদও মানে না। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই এদের অনুসারী। বলরামীদের নিজস্ব কোনো পোশাকাদি নেই। সংসারত্যাগীরা ভিক্ষাজীবী, কিন্তু ভিক্ষা গ্রহণের সময় কোনো দেব-দেবতার নামোচ্চারণ করে না। তারা চুরি করা ও মিথ্যা বলাকে পাপ বলে মনে করে।

বলরামী সম্প্রদায় দুই শাখায় বিভক্ত। এক শাখা মেহেরপুরের মালোপাড়ায় বলরামের মৃত্যুস্থানে সন্ধ্যায় প্রদীপ দেয় ও প্রণাম করে। অপর শাখা এ বিষয়ে তাঁর নির্দেশ নেই বিধায় কোনো রীতিনীতি অনুসরণ করে না। বলরামীর দোল পূর্ণিমায় উৎসবাদি এবং সংগীত পরিবেশন করে বলে এই সম্প্রদায়কে অনেকে বৈষ্ণব ধর্মের শাখাবিশেষ মনে করে। প্রকৃতপক্ষে বলরামী সম্প্রদায় বৈষ্ণব মতাদর্শ থেকে ভিন্ন।

**বলাহাড়ি** বলরামী দ্র.

**বাইবেল** গ্রিক শব্দ। অর্থ গ্রন্থাবলি। খ্রিষ্টধর্ম-সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ। এটা তাঁদের ধর্মবিশ্বাস ও আচরণবিধির পবিত্র সংবিধান। খ্রিষ্টানদের প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী বাইবেল স্বয়ং ঈশ্বরের নির্দেশে লিখিত, তাই শব্দার্থে অথবা রূপক অর্থে এর প্রতিটি বাণীই সত্য। প্রধানত বাইবেলের ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করেই খ্রিষ্টানরা প্রটেস্ট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিক—এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রটেস্ট্যান্টদের মতে, বাইবেলের ব্যাখ্যার ব্যাপারে ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকৃত; রোমান ক্যাথলিক মতে, শুধু যাজক সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যার আলোকেই জনসাধারণ তা পাঠ করার অধিকারী। সেন্ট

জেরোমের ভালগেট লাতিন ভাষায় সমগ্র বাইবেলের প্রথম বিখ্যাত অনুবাদগ্রন্থ। লাতিন ভাষায় পাঠ্যাংশ-সংবলিত বাইবেলই প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। অনুমোদিত অনুবাদ অর্থাৎ ল্যানসেলট অ্যান্ড্রুজের নেতৃত্বে পরিচালিত এক যাজক কমিটি কৃত রাজা জেমসের (আমলের) অনুবাদগ্রন্থই (১৬১১) বাইবেলের শ্রেষ্ঠ ইংরেজি অনুবাদ; উনবিংশ শতকে ইংল্যান্ডের যাজক সম্প্রদায় কর্তৃক অনুমোদিত অনুবাদ পূর্বের অনুবাদের ভাষা থেকে সংশোধিত হয়ে 'সংশোধিত ইংরেজি অনুবাদ' ও 'সংশোধিত মার্কিন অনুবাদ' রূপে প্রকাশিত হয়। ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য সাহিত্যের ইতিহাসেও বাইবেলের অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যথা—আধুনিক জার্মান ভাষার উন্নয়নে মার্টিন লুথারের অনুবাদের মূল্য অত্যন্ত বেশি। বিংশ শতকে মার্কিন বাইবেল-পণ্ডিতেরা একযোগে 'সংশোধিত আদর্শ অনুবাদ' প্রস্তুত করেন। বহু চার্চ কর্তৃক এটা অবিলম্বে গৃহীত হয়েছে।

উইলিয়াম কেরি বাংলায় প্রথম বাইবেল অনুবাদ করেন। ১৮০১-৪৫ সময় পরিসরে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে এই অনুবাদ 'ধর্মপুস্তক' (৫ খণ্ড) নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে বাইবেলের একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বের অধিকাংশ ভাষায় বাইবেল অনূদিত ও পঠিত।

**বাউল** কোনো কোনো মতে, বায়ু শব্দের সঙ্গে 'আছে'—এই অর্থবোধক 'ল' প্রত্যয় যোগে 'বাউল' শব্দের সৃষ্টি। এই 'বায়ু' শব্দের অর্থ যোগশাস্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার বোঝায়। যে সম্প্রদায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চারসাধনের জন্য সাধনা করে, তারাই বাউল। কেউ কেউ মনে করেন, সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দের প্রাকৃত রূপ 'বাউল'। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাউলেরা এই সহজ সাধনায় বিশ্বাসী—তাঁদের হৃদয়ই বৃন্দাবন-কাশী, মক্কা-মদিনা; আল্লাহ বা ভগবান থেকেই পৃথিবীর সৃষ্টি, সকল মানবের মধ্যেই আছে এই ঈশ্বরের সত্তা; আত্মারূপী আল্লাহই বাউলের কাছে সহজ মানুষ বা মনের মানুষ; অন্যদিকে সুফিদের সাধনা ও বৈষ্ণবসাধনার সঙ্গেও বাউল সাধনার মিল আছে। বাউলদের সাধনধর্মী একটি গান:

'আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দেশে দেশ-বিদেশে
বেড়াই ঘুরে।'

অথবা

'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।
লালন কয় জেতের কী রূপ দেখলাম না এই নজরে।
ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান, নারী লোকের কী হয় বিধান?
বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ, বামনী চিনি কিসে রে॥'

বাউলেরা প্রচলিত হিন্দু বা মুসলিম আচার-বিচারের অনুসারী নয়। সংগীত এদের সাধনার এক প্রধান অঙ্গ। বাউলকবিদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাত লালন। অন্যান্য প্রসিদ্ধ বাউলকবিদের মধ্যে ছিলেন উত্তরবঙ্গের গঙ্গারাম, জগাকৈবর্ত, পদ্মলোচন, বিশা ভুঁইমালী, কাঙ্গালী ও সিরাজ সাঁই; সিলেটের মুনিরুদ্দিন ফকির, কুষ্টিয়ার কুমারখালীর হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ)।

লালনের আগে বাউলদের অস্তিত্ব থাকলেও সম্প্রদায় হিসেবে তারা তখনো আত্মপ্রকাশ করেনি। লালন কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় আস্তানা স্থাপন ও সাধন-ভজন করে, গান রচনা করে ও গেয়ে এবং শিষ্যদের দীক্ষা দিয়ে বাউলদের প্রথম সংগঠিত করে তোলেন। তাঁর সময়ে শিষ্য ও ভক্ত মিলে প্রায় ২ লাখ বাউল ছিল বলে জানা যায়। সাধারণত কৃষক, তাঁতি ও যুগী শ্রেণীর দরিদ্র, বঞ্চিত ও নিগৃহীত মানুষই বাউল সম্প্রদায়ের ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। তিনি তাদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে জমিদারের বিরোধিতা করেন এবং নিরাপত্তার কারণে লাঠিয়াল দল গঠন করেন। তিনি ধর্মীয় মতামত নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে একাধিক বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর জীবদ্দশায় শরিয়তপন্থী মুসলমানরা ফতোয়া দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে।

বাউলদের প্রধানত দুটি ভাগ—গৃহী ও গৃহত্যাগী। গৃহত্যাগী বাউলরা ভিক্ষান্ন খেয়ে

একতারা বাজিয়ে গান গায় আর মনের মানুষের সন্ধানে পথেঘাটে ঘুরে বেড়ায়। অজানা অচেনা অধরা পরমাত্মা হলো তাদের সেই মনের মানুষ। তাঁকে 'অচিন পাখি', 'সোনার মানুষ', 'মনুরায়' ইত্যাদি নামেও তারা অভিহিত করে।

*বাউলগান* বাউল সম্প্রদায়ের সাধনসংগীত। এটি লোকসংগীতের অন্তর্গত। এ গানের উদ্ভব সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায় না। অনুমান করা হয় যে, খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতক কিংবা তার আগে থেকেই বাংলায় এ গানের প্রচলন ছিল। বাউলসাধকের রচিত গান গ্রামাঞ্চলে 'ভাবগান' বা 'ভাবসংগীত' নামে পরিচিত। কেউ কেউ এসব গানকে 'শব্দগান' ও 'ধুয়া' গান নামেও অভিহিত করেন। বাউলগান সাধারণত দুই প্রকার : দৈন্য ও প্রবর্ত। এ থেকে সৃষ্টি হয়েছে রাগ দৈন্য ও রাগ প্রবর্ত। এই 'রাগ' অবশ্য শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ নয়, ভজন-সাধনের রাগ। কাঙ্ক্ষিতজনের প্রতি নিবেদিত প্রেমের প্রগাঢ় অবস্থার নামই রাগ। রাগ দৈন্যে এমন ভাবই লক্ষণীয়। বাউলরা তাদের সাধনপন্থাকে রাগের কারণ বলে অভিহিত করে এই ভাবে—'আমার হয় না রে সে মনের মতো মন/আগে জানব কি সে রাগের কারণ।'

*বাউলনাচ* বাউলদের ধর্মাচারের অঙ্গ। তাদের গানগুলো তত্ত্বভিত্তিক। বাউলরা এই গান গাওয়ার সময় আবেগে আত্মহারা হয়ে নাচে এবং অধ্যাত্মরস উপভোগ করে। তাদের ডান হাতে থাকে একতারা এবং কোমরে বাঁধা থাকে বাঁয়া নামক একটি বাদ্যযন্ত্র। কেউ কেউ পায়ে ঘুঙুরও পরে। বাউল নিজেই বাদ্য বাজিয়ে গানের সুর ও নাচের তাল রক্ষা করে। বাউলনাচ মূলত পুরুষের একক নাচ, তবে কখনো কখনো দ্বৈত নাচ এবং আখড়াদিতে দলবদ্ধ নাচও হয়ে থাকে। বাউলনাচে মুদ্রা ও অঙ্গভঙ্গির কোনো স্থান নেই। হাত-পায়ের কিছু ভঙ্গি ও গতি আছে। একতারাটি কখনো কানের কাছে ধরে, কখনো ঊর্ধ্বে প্রসারিত করে তারা নাচে। বাউলের বিচিত্র পদচালনা ও গতিবিধিতে এ নাচের প্রকৃত সৌন্দর্য ও মাধুর্য নিহিত। বাংলাদেশের কুষ্টিয়া ও যশোর এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও বীরভূমে এ নাচের প্রচলন বেশি।

*বাউলবিরোধী আন্দোলন* বাউল সম্প্রদায় এক শ্রেণীর মানুষের কাছে যেমন সমাদৃত, তেমনি অন্য এক শ্রেণীর গোঁড়া সম্প্রদায়ের কাছে ধিকৃত ও নিন্দিতও। বাউলরা সব ধরনের শাস্ত্রাচার ও জাতিভেদপ্রথাকে অস্বীকার করে এবং দেহবাদী অধ্যাত্মসাধনায় নিয়োজিত থাকে। তাদের সাধনা প্রেমনির্ভর আধ্যাত্মবাদী হলেও তা মিথুনাত্মক যৌনাচারমূলক হওয়ায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সুশীল সমাজ কর্তৃক নিন্দিত। ১৯৪২ সালে কুষ্টিয়া অঞ্চলে আফসারউদ্দিনের নেতৃত্বে 'বাউল খেদা' নামে একটি আন্দোলনও হয়।

**বাংলা নববর্ষ** বাংলা নববর্ষ এখন জাতীয় উৎসব হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে গ্রামবাংলার কৃষক পরিবারে চৈত্রসংক্রান্তির রাতে গৃহিণীরা 'আমানি' প্রস্তুত করে। একটি বড় হাঁড়িতে অনেকটা পানির মধ্যে আম আর কিছু চাল ভেজানো হয়। আর ওই হাঁড়ির ভেতর রাখা হয় একটি সপত্র আমের ডাল। ভোরবেলা বাড়ির সবাইকে জাগিয়ে গৃহিণী তাদের ওই ভেজানো চাল খেতে দেয়, আর আমের ডাল দিয়ে গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়। এতে শরীর ঠান্ডা থাকে বলে তাদের বিশ্বাস। এদিন সবাই সাধ্যমতো উন্নত ভোজের আয়োজন করে। এর মূলে তাদের এই বিশ্বাস কাজ করে যে বছরের প্রথম দিন ভালো ভোজ হলে সারা বছরই ভালো ভোজ হবে। এই উৎসবকে উপলক্ষ করে বিভিন্ন শহরে, নগরে ও গ্রামাঞ্চলে মেলা বসে।

**বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন** বৌদ্ধদের মহাসংঘ। ১৯৮১ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সাল থেকে এটি 'বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন' নামে পরিচিত। এর তত্ত্বাবধানে ১৯৮১ সালে ঢাকার মেরুল বাড্ডায় প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধবিহার।

**বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ** বৌদ্ধধর্মীয় একটি সংগঠন। ১৯৪৯ সালের ৪ ডিসেম্বর পটিয়ার লাখেরা অভয় বিহারে 'পূর্ব পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ' নামে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এটি বর্তমান নামে পরিচিত হয়। ১৯৬০ সালে সংঘের তত্ত্বাবধানে ঢাকার কমলাপুরে ধর্মরাজিক বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত

হয় এবং এখানে সংঘের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬২ সালে এখানে সংঘের পক্ষ থেকে থাইল্যান্ডের রাজা ভূমিবল ও রানি সিরিকিতকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ১৯৬৩ সালে সংঘের তৎকালীন সভাপতি বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অতীশ দীপঙ্করের দেহভস্ম বাংলাদেশে আনয়ন ও সংরক্ষণের যে প্রস্তাব করেন, তা ১৯৭৮ সালে কার্যকর হয়।

১৯৮৩ সালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সহস্রতম জন্মবার্ষিকী পালন, ১৯৮৭ সালে আয়োজিত 'পাহাড়পুর বৌদ্ধ সভ্যতা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে ইউরোপ-আমেরিকাসহ বহু রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

**বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি** এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হচ্ছে বাংলাদেশের পক্ষে 'বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ' প্রতিষ্ঠা করা ও বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করা। ১৯৯৯ সালে প্রথমবারের মতো এই বিহারে কঠিন চীবর দান উদ্‌যাপিত হয়। ১৯৫৬ সালে বার্মায় যে ষষ্ঠ বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়, বার্মা সরকারের আমন্ত্রণে সমিতির সভাপতি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মহাথেরো পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে তাতে যোগদান করেন। চট্টগ্রাম বৌদ্ধবিহারে সুরক্ষিত বুদ্ধের কেশধাতুর কিয়দংশ ১৯৫৮ সালে শ্রীলঙ্কা, ১৯৬৪ সালে জাপান এবং ১৯৭৯ সালে থাইল্যান্ডের সরকারকে সে দেশের জনগণের পূজার জন্য বাংলাদেশের সরকারের মাধ্যমে অর্পণ করা হয়। বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘ বিশ্বের বৌদ্ধ নেতাদের মিলনতীর্থস্বরূপ। শ্রীলঙ্কা সরকার এই সমিতিকে একটি বোধিবৃক্ষের চারা উপহার দেয়। ১৯৮০ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চারাটি চট্টগ্রাম বৌদ্ধবিহার চত্বরে রোপণ করেন।

**বাকা** সুফিবাদে বাকার সর্বোত্তম স্থান। 'বাকা'র দুটি অর্থ: স্রষ্টা ও সৃষ্টির পার্থক্যের অনুভূতিতে প্রত্যাবর্তন এবং আল্লাহর প্রদত্ত গুণাবলি সংরক্ষণ করে চলা। সুফিদের মতে, 'ফানা' অপেক্ষা 'বাকা' শ্রেষ্ঠতর। 'ফানা' থেকে অধিকতর স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে 'বাকা'তে ফিরে দুনিয়ার অপূর্ণতা আরও বেশি করে সুফির চোখে পড়বে এবং তা দূর করার চেষ্টা তিনি করবেন। সাধারণ সুফি 'ফানা'তেই তৃপ্ত হতে পারেন, কিন্তু উচ্চ স্তরের সুফি 'ফানা' ও 'বাকা'র মাধ্যমে আল্লাহ ও দুনিয়ার সংযোগে যাতায়াত করবেন এবং স্বর্গীয় সত্যকে কাজে পরিণত করে ইতিহাসের ধারাকে সত্যের পথে পরিচালিত করবেন।

**বাকানালিয়া** গ্রিক সুরার দেবতা বাক্কুনের দেশ-সম্পর্কিত সুরা উৎসব। গ্রিক পুরুষ পুরোহিত ও মহিলা পুরোহিতদের এক ধরনের নৃত্য। নর্তক-নর্তকীরা হরিণ শিশুর চামড়ার পোশাক পরত। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে প্রথমে রোমে এই নৃত্যের প্রচলন ঘটে। তখন কেবল নারীরাই এ নৃত্যে অংশগ্রহণ করত। পরবর্তীকালে পুরুষেরা এতে অংশগ্রহণ করে। ফলে বাকানালিয়া তৎকালীন সময়ে লাম্পট্য ও অনৈতিক প্রকৃতির উৎসব বলে পরিচিতি লাভ করে। খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৬ সালে এটা সিনেট কর্তৃক বেআইনি ঘোষিত হয়। অনেক নর্তক-নর্তকীর মৃত্যুদণ্ড বা নানা ধরনের শাস্তি পর্যন্ত হয়।

**বাণ** হিন্দু পুরাণমতে, দৈত্যরাজ বলির এক শত পুত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাণ। মহাদেবের বর লাভ করে তিনি শোণিতপুরের রাজা হন। তাঁর কন্যা উষা শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের প্রেমে পড়ে গান্ধর্বমতে বিয়ে করেন। ক্রুদ্ধ পিতা অনিরুদ্ধকে বন্দী করেন। পরে কৃষ্ণ বাণকে পরাস্ত করেন এবং তাঁর অনুগ্রহে মহাকাশ নামে পরিচিত হয়ে শিবের অনুচর হন।

**বাতেনিয়া** গোপন বা গূঢ়। বাতেনিয়া শিয়ারা বিশ্বাস করতেন, পবিত্র কোরআনের প্রকাশ্য অর্থ ছাড়াও গুহ্য অর্থ রয়েছে, যা ইমাম ছাড়া সাধারণের বোধ্য নয়। ইমাম জাফর সাদিকের শিষ্য আবদুল খাত্তাব এই মতবাদের প্রবর্তক। কারামাতিয়া ও ইসমাইলিরা এই মতবাদের অনুসারী। তাঁরা গোপনে তাঁদের ধর্মবিশ্বাস প্রচার করতেন।

**বাৎসায়ন** ভৃগুবংশীয় এই ঋষি *কামসূত্র* গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি গৌড়ের নারীগণকে নম্র, ভীরু, মিষ্টভাষিণী ও লাবণ্যময়ী বলে উল্লেখ করেছেন। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলেও সমাজে তাদের কোনো স্বাধীন সত্তা ছিল না। কামসূত্র দ্র.

**বানু-কুরাইজা** পবিত্র কোরআনে বর্ণিত ইহুদিদের একটি গোষ্ঠী। মুসলমানরা এদের পরাজিত করে। ৩৩ সুরা আহজাব-এর ২৬-২৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'কিতাবিদের মধ্যে যারা (ইহুদি বানু-কুরাইজারা) ওদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদের তিনি দুর্গ থেকে নামতে বাধ্য করলেন। তোমরা ওদের কিছু লোককে খতম করেছিলে ও কিছু লোককে বন্দী করেছিলে। আর তিনি তোমাদের ওদের জমিজায়গা, ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী করলেন, আর উত্তরাধিকারী করলেন এমন এক দেশের, যেখানে তোমরা এখনো পা দাওনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

**বাব** আরবি এই শব্দটির অর্থ দরোজা। ইরানের শিরাজ শহরের মির্জা সৈয়দ আলী মোহাম্মদ (১৮১৯/২০-১৮৫০) বাবধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। বাবধর্ম আল্লাহ যাঁর মাধ্যমে প্রকাশমান হবেন, তাঁর আগমনীবার্তা প্রচার করে এবং ইসলামি শরিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য করে। মির্জা ইরানি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্যাতিত হন এবং আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। আরবি ও ফারসি দুই ভাষায় পুস্তকে তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ আছে।

**বামন** বিষ্ণুর এক অবতার। ত্রেতাযুগে দৈত্যরাজ বলি তপস্যাবলে স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল দখল করে অত্যন্ত গর্বিত ও অত্যাচারী হয়ে ওঠেন। তাঁর হাত থেকে দেবতা ও মানবদের রক্ষার জন্য বিষ্ণু বামনরূপ ধারণ করে বলির কাছে তিন পদক্ষেপ পরিমাণ ভূমি প্রার্থনা করেন। বিষ্ণুকে একজন সাধারণ মানুষ মনে করে বলি ওই প্রার্থনা পূরণে সম্মত হয়। বামনরূপী বিষ্ণু তখন স্বমহিমায় আবির্ভূত হয়ে এক পদক্ষেপে স্বর্গ এবং অন্য পদক্ষেপে মর্ত অধিকার করেন। বলি তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে বামনরূপী বিষ্ণুকে চিনতে পেরে ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। বিষ্ণু তখন বলির প্রতি কৃপাবশত তৃতীয় পদক্ষেপের দাবি প্রত্যাহার করেন এবং বলি পাতালে চলে যান।

**বামিয়ান বুদ্ধ** আফগানিস্তানের খাইবার গিরিপথের বাইরে মরু অঞ্চলে ১৩০ ফুট উঁচু বামিয়ান বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়। আফগান তালেবানরা তা বিনষ্ট করেছে।

**বারজাখ** ইহকাল ও পরকালের মধ্যবর্তী সীমানা, যেখানে মৃত্যুর পর এবং বিচারের আগে মানুষ অবস্থান করে।

**বাহরাম সাক্কার সমাধি** বর্ধমানে (পশ্চিম বাংলা) এটি অবস্থিত। যে স্থানে সুফি বাহরাম সাক্কা (র.) সমাহিত আছেন, সে স্থানটিকে তাঁর নামানুসারে পীর বাহরাম বলা হয়। পীর বাহরাম, দরবেশ এবং হাজি বলে অভিহিত হলেও বর্ধমানে তিনি পীর বাহরাম বা বাহরাম সাক্কা নামে পরিচিত।

**বাহন** দেব-দেবীর বাহন হিসেবে পশুপক্ষীর কল্পনা হিন্দু মূর্তিবিদ্যার এক চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য। বাহনের পরিচয় জানা থাকলে হিন্দুদের দেব-দেবীকে সহজেই শনাক্ত করা যায়। হংস ব্রহ্মা ও তাঁর স্ত্রী সরস্বতীর বাহন হংস। বিষ্ণুর বাহন গরুড় এবং তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। শিবের বাহন বৃষ। তাঁর স্ত্রী পার্বতীর বাহন সিংহ। শিবের পুত্র গণেশের বাহন ইঁদুর। যমের বাহন মোষ। বেদোক্ত দেবতার অগ্নির বাহন পাঁঠা বা ছাগল। ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত ও মেঘ। যক্ষদের দেবতা কুবেরের বাহন মানুষ।

**বাহাই** 'বাহাউল্লাহ' শব্দের অর্থ আল্লাহর জ্যোতি। এই উপাধি ধারণ করে মির্জা হুসেন আলী নুরি 'বাব' প্রবর্তিত বাবি মতবাদের কিছুটা সংস্কার সাধন করে প্রচার করতে থাকেন। ১৮১৭ সালের ১২ নভেম্বর তিনি ইরানের মাজান্দারানের নুর জনপদে জন্মগ্রহণ করেন। বহু নির্যাতন সহ্য করার পর ফিলিস্তিনে তিনি নির্বাসিত হন এবং বন্দী অবস্থায় একর-এ তিনি ১৮৯২ সালে প্রাণ ত্যাগ করেন। বাহাইরা সমগ্র মানবজাতির ঐক্য ও নারী-পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে। তাঁদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম *কিতাবুল আকদম* এবং অন্যটির নাম *কিতাবুল ইকান*। ১৯৫২ সালে বাংলাদেশে ঢাকার শান্তিনগরে বাহাইদের আধ্যাত্মিক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

**বাহাস** 'বাহাস' আরবি শব্দ। অর্থ ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত তাত্ত্বিক তর্ক-বিতর্ক। যেসব তাত্ত্বিক বিষয়ে বিভিন্ন আলেম সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ আছে, সেসব বিষয়ে উভয় পক্ষে পবিত্র কোরআন-হাদিস এবং তফসির থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উদ্ধৃতিসহ বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। আর এসব বক্তব্যের অনুকূলে প্রমাণসাপেক্ষে তথ্যসহ যুক্তি প্রদর্শন করা হয়ে

থাকে। এ ধরনের বাহাসে বক্তার বাচনিক কুশলতা, কণ্ঠস্বর ও বক্তব্য উপস্থাপন-পদ্ধতি বেশ প্রভাব বিস্তার করে। বাহাসে উপস্থিত লোকজন ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেয়ে থাকে।

**বিচার গান** নির্দিষ্ট একটি বিষয় ধরে দুটি পক্ষ কথা ও সুর সহযোগে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ গান পরিবেশন করে। বিচার গান মূলত অধ্যাত্মসংগীত এবং এ গান বাউলদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাউলদের মধ্যে সাধন-ভজন সংক্রান্ত মৌখিক কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে গানের মাধ্যমে সেগুলোর ব্যাখ্যা করা হতো। কালক্রমে এ ধারার বিস্তার ঘটে এবং অন্য মতের অনুসারী কবি-গায়েনরাও বিচিত্র বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে থাকে। বিচার গানের বিষয় প্রধানত শরিয়ত, মারিফত, নবীতত্ত্ব, আদমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, নারীতত্ত্ব, যৌবনতত্ত্ব প্রভৃতি। নারী-পুরুষ, গুরু-শিষ্য প্রভৃতি বিষয় নিয়েও এ গানের প্রতিযোগিতা হয়। বিচার গান দীর্ঘসময় ধরে পরিবেশিত হয়। গান পরিবেশনকালে মূল গায়েন দাঁড়িয়ে গান করেন এবং দোহাররা তাঁর সঙ্গে ধুয়া ধরে।

**বিদ্যা** প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হিন্দু ধর্মমতে বিদ্যা জ্ঞানের সমার্থক। যে জ্ঞান প্রমাণভিত্তিক, শাস্ত্র-অধীত বা যোগলব্ধ। বৈদিক যুগে বিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান ও লৌকিক জ্ঞানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হতো না। ঈশ্বরবন্দনা, উপাসনা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উৎসর্গ বা বিসর্জনের মাধ্যমে যে বিদ্যা বৈদিক ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা পুনরুজ্জীবিত করতে সহায়তা করে, তাও জ্ঞান ও বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিশ্বাস করা হতো, বিদ্যা সামাজিক, রাজনৈতিক সংহতি রক্ষা করে ধর্মকে পরিপূর্ণ করতে এবং স্বর্গে অমরত্ব লাভের পথ প্রদর্শন করতে খুবই সহায়ক। উপনিষদকালে বিদ্যার ধারণার ব্যাপ্তি ঘটে। তখন মনে করা হতো বিদ্যা কেবল আত্মার পরিবর্তন ও পুনরুজ্জীবনের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু মুক্তি আনতে পারে না। রক্ষণশীলদের ধারণা ছিল, বিদ্যা ও কর্ম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ভিন্ন মতের বিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা তাঁরা অস্বীকার করতেন। তাঁদের কথা, বিদ্যা এক দিক থেকে মুক্তির প্রতিবন্ধকতা। বেদান্তের অন্যান্য মতের বিরোধিতা করে শঙ্কর বলেন : প্রকৃত জ্ঞান ও কর্ম সম্পর্কহীন।

**বিধবা ভ্রাতৃবধূ বিবাহরীতি** (Levirate) ভ্রাতার বিধবা পত্নীকে বিয়ে করার রীতি আদিম সমাজে প্রচলিত ছিল। এ রীতি অনুযায়ী স্বামী মারা গেলে স্বামীর ভাই অথবা জ্ঞাতি ভাইকে বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিয়ে করতে হতো। যেহেতু আদিম অর্থব্যবস্থায় কোনো ব্যক্তির পক্ষে ধনসম্পদ রেখে যাওয়া সম্ভব ছিল না, সেহেতু ব্যক্তির মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততির পক্ষে জীবন ধারণ কষ্টসাধ্য ছিল। তাই অনেকটা অর্থনৈতিক কারণেই আদিম সমাজে ভ্রাতৃবধূকে বিয়ে করার রীতি প্রচলিত হয়।

**বিধবার সম্পত্তি** বাংলাদেশের হিন্দু দায়ভাগ আইন অনুসারে স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সম্পত্তি হিসেবে একজন হিন্দু বিধবা যে সম্পত্তি লাভ করেন, তা-ই বিধবার সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়। বিধবার সম্পত্তিকে জীবনস্বত্বও বলা হয়ে থাকে। বিধবার সম্পত্তি ওই বিধবা আজীবন ভোগদখল করতে পারেন, কিন্তু আবশ্যকীয় বা আইনানুগ প্রয়োজন ছাড়া ওই সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারেন না। বিধবার মৃত্যুর পর তাঁর স্বামীর উত্তরাধিকারীরা ওই সম্পত্তির মালিক হন। কোনো বিধবা যথেচ্ছভাবে বা সম্পত্তির চিরস্থায়ী ক্ষতিসাধন করে ওই সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারেন না।

**বিবাহ** দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা অনুসারে হিন্দুদের মধ্যে আট প্রকার বিয়ে প্রচলিত ছিল, যার প্রথম চারটি সামাজিকভাবে অনুমোদিত এবং অবশিষ্ট চারটি অননুমোদিত। আট প্রকার বিয়ে হলো : ক. ব্রাহ্ম—সর্বোত্তম পদ্ধতি, যাতে অলংকারে সজ্জিতা কন্যাকে শিক্ষিত ও চরিত্রবান বরের হাতে তুলে দেওয়া হতো। এ ক্ষেত্রে বরের কাছ থেকে কোনো পণ নেওয়া হতো না; খ. দৈব—এ ধরনের বিয়েতে যজ্ঞ সম্পাদনকারী পুরোহিতের কাছে কন্যা সম্প্রদান করা হতো; গ. আর্য—এ বিয়েতে কনের পিতা বরের কাছ থেকে এক বা দুই জোড়া গাভি গ্রহণ করতেন; ঘ. প্রাজাপত্য—এ বিয়েতে কনের পিতা বরের কাছ থেকে কোনো পণ গ্রহণ ছাড়াই কন্যা দান করতেন এবং তাদের আশীর্বাদ করতেন, যাতে তারা পারস্পরিক বিশ্বাস ও সুখের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন

যাপন করতে পারে; ঙ. আসুর—এ বিয়েতে বর পিতা অথবা অভিভাবকের কাছ থেকে মূল্য দিয়ে কনেকে ক্রয় করত; চ. রাক্ষস, এ বিয়েতে কন্যার আত্মীয়দের প্রহার করে রোরুদ্যমানা কন্যাকে নিয়ে যাওয়া হতো; ছ. গান্ধর্ব—বর ও কনের পরস্পরের পরিচয় ও সম্মতিতে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হতো; জ. পৈশাচ—নিকৃষ্টতম বিয়ে; এতে কন্যার প্রেমিক কন্যার অসম্মতিতে নিদ্রিত অথবা প্রমত্ত কন্যার সঙ্গে সংগত হতো।

দায়ভাগ অনুসারে পুরুষের বিয়ের ক্ষেত্রে তেমন কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। স্ত্রীর সতীত্বসংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া বিবাহ-বিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা ছিল না। কোনো কারণে স্ত্রী বর্জিত হলে স্বামীর কাছ থেকে সে নিজের ও সন্তানের ভরণপোষণ পেত। একজন বিধবা তার শ্বশুরের কাছ থেকে ভরণপোষণ পেত, যদি না স্বামী তার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ রেখে যেত। বিধবা চাইলে পুনরায় বিয়ে করতে পারত। উল্লেখ্য, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৬৫ সালে সাধারণভাবে হিন্দু বিধবা বিয়ে আইন পাস হয়।

**বিশুদ্ধিমার্গ** বৌদ্ধ দর্শনমতে দুঃখাদি থেকে মুক্তিলাভের সাধনপথ। শাব্দিক অর্থ বিশুদ্ধ পথ। বৌদ্ধ দর্শনের মূল বক্তব্য হলো জগৎ অনিত্য, দুঃখময় ও অনাত্মকে অনাত্মরূপে দেখার যে প্রজ্ঞাদৃষ্টি, তা-ই বিশুদ্ধিমার্গ। বিশুদ্ধিমার্গ যাবতীয় দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ। তাই এ পথকে বিমুক্তিমার্গ বা বিমুক্তিপথ নামেও আখ্যায়িত করা হয়। পালি ভাষায় একে বলা হয় 'বিমুক্তিমার্গ'। বৌদ্ধরা ইহলোক ও পরলোকের সুখ কামনায় বিহারকেন্দ্রিক সাধনাকেন্দ্রে বিশুদ্ধিমার্গের অনুশীলন করে।

**বিশ্ব ইজতেমা** তাবলিগ জামাত বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ। ১৯৬৬ সাল থেকে প্রতিবছর টঙ্গীর তুরাগ নদের তীরে এই ইজতেমা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আরবি শব্দ 'ইজতিমা'র বাংলা অর্থ সম্মিলন, সভা বা সমাবেশ। ১৯২৭ সালে হজরত মওলানা ইলিয়াস (র.) ভারতের উত্তর প্রদেশের স্যাহরানপুরে তাবলিগের গোড়াপত্তন করেন এবং একই সঙ্গে এলাকাভিত্তিক সম্মিলন বা ইজতেমার আয়োজন করেন। কালক্রমে তাবলিগ সমগ্র উপমহাদেশে বিস্তার লাভ করে এবং উপমহাদেশের বাইরেও এর প্রভাব পড়ে।

**বিশ্বকর্মা পূজা** দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার আশিস কামনায় এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বকর্মা চতুর্ভুজ ও গজারূঢ়। তাঁর আকৃতি অনেকটা কার্তিকের মতো। বেদে বিশ্বকর্মাকে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ভক্তদের বিশ্বাসমতে, তিনি বিশ্বের তাবৎ কর্মের সম্পাদক। তিনি শিল্পসমূহের প্রকাশক, অলংকারশিল্পের স্রষ্টা, দেবতাদের গমনাগমনের জন্য ব্যোমযানের নির্মাতা ইত্যাদি। অর্থাৎ শিল্পবিদ্যায় তাঁর একচ্ছত্র অধিকার। তাই যাঁরা শিল্পকর্মে পারদর্শিতা লাভ করতে চান, তাঁরা বিশ্বকর্মার অনুগ্রহ কামনা করেন। রামায়ণে অপূর্ব শোভা ও সম্পদবিশিষ্ট লঙ্কা নগরের নির্মাতা বিশ্বকর্মা বলে কথিত। তিনি উপবেদ, স্থাপত্যবেদ ও চতুঃষষ্টিকলারও প্রকাশক। দেবশিল্পীরূপে তিনি দেবপুরী, দেবাস্ত্র ইত্যাদিরও নির্মাতা। জনশ্রুতি আছে যে পুরীর প্রসিদ্ধ জগন্নাথমূর্তিও বিশ্বকর্মার তৈরি।

**বিষাদ-সিন্ধু** কারবালার কাহিনি অবলম্বনে রচিত মীর মশাররফ হোসেনের ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রথমে ১৮৮৫, ১৮৮৭ ও ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে তিন খণ্ডে এটি প্রকাশিত হয়; পরে সেগুলো একখণ্ডে মুদ্রিত হয়। মীর মশাররফ ইতিহাস অবলম্বনে *বিষাদ-সিন্ধু* রচনার দাবি করলেও সেকালে প্রচলিত পুঁথিসাহিত্যের দ্বারাই তিনি সমধিক প্রভাবিত হন। কারবালার বিষাদাত্মক কাহিনির সঙ্গে জড়িত অধিকাংশ চরিত্র ঐতিহাসিক হলেও সব ঘটনা ঐতিহাসিক নয়। এজিদ ও হাসানের সংঘর্ষের পেছনে শুধু যে ক্ষমতা বা সিংহাসন অধিকারের বাসনাই ক্রিয়াশীল ছিল, তা নয়; জয়নাব নাম্নী এক বিবাহিতা নারীকে কেন্দ্র করেও এই উপন্যাসের ঘটনাবলি আবর্তিত হয়েছে। রূপবতী জয়নাবের প্রতি এজিদের আসক্তি এবং তাঁকে না পাওয়ার কারণে হাসানের প্রতি তাঁর আক্রোশ এবং পরিণামে এক নিষ্ঠুর চক্রান্তের ঘটনাই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। এজিদ হাসানের দ্বিতীয় স্ত্রী জায়েদাকে কৌশলে প্রলুব্ধ করে তাঁর সাহায্যে হাসানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। এরপর তিনি

ঘাতকের সাহায্যে হাসানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসাইনকেও হত্যা করেন। ইসলামের ইতিহাসে অবশ্য খলিফা বা সম্রাট হওয়ার বাসনায় এজিদ কর্তৃক এরূপ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় বলে উল্লেখ আছে। গ্রন্থটি দীর্ঘকাল বাংলার মুসলমানের ঘরে ঘরে অতি উৎসাহের সঙ্গে পঠিত হয়েছে।

**বিষ্ণু** হিন্দু দেবতা। তিনি সমগ্র সৃষ্টির রক্ষাকারী ও পালনকর্তা বলে কীর্তনশাস্ত্রে বর্ণিত। ঋগ্‌বেদ ও পুরাণে তাঁর নানাবিধ মহিমা কীর্তিত। কথিত আছে, সৃষ্টি রক্ষাকল্পে বিষ্ণু দশবার দশরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, যাকে বলা হয় দশাবতার। বামনাবতাররূপে বলিবিনাশ, বরাহাবতাররূপে নিমজ্জমানা পৃথিবীর উত্তোলন, নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুবধ, দাশরথি রামরূপে রাবণবধ প্রভৃতি তাঁর অবতারকেন্দ্রিক কাহিনি। বুদ্ধরূপে তিনি অমর হয়ে আছেন। দশম অবতার কল্কি এখনো আবির্ভূত হননি। ভগবদ্‌গীতায় (৪। ৭-৮) বলা হয়েছে যে, অধর্মের বিনাশ ও ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দুর্বৃত্তের দমন ও সাধু ব্যক্তিদের পরিত্রাণের জন্য বিষ্ণু বিভিন্ন রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন।

বিষ্ণুর উপাসকেরা বৈষ্ণব। তাঁকে কেন্দ্র করে যে ধর্মদর্শনের উৎপত্তি, তা বৈষ্ণব ধর্ম নামে পরিচিত। শ্রীচৈতন্য বঙ্গদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন করেন। সাহিত্য, চিত্রকলার, ভাস্কর্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিষ্ণু সুবিদিত। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন মন্দির ও জাদুঘরে বিষ্ণুর অনেক মূর্তি আছে। ভারতের বিহারে অবস্থিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্মে পিতৃপুরুষকে পিণ্ডদান করা হিন্দুদের জন্য অতীব পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত।

**বিসমিল্লাহখানি** বাংলাদেশে সুলতানি ও মোগল আমলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাগুরুর প্রচলিত অনুষ্ঠান, যা হাতেখড়িরই নামান্তর। শিক্ষক এদিন পবিত্র কোরআনের নির্ধারিত আয়াত পড়াতেন আর শিশু তা-ই পুনরাবৃত্তি করত। সে সময় চার মাস চার দিনের দিন শিশুকে শিক্ষার জন্য শিক্ষক বা মৌলভির কাছে সবক দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হতো। এদিন পায়েস, ফিরনি, গুড়, বাতাসা ইত্যাদি ভালো খাবারদাবারের ব্যবস্থা করা হতো।

**বীরপূজা** যেসব মানুষ তাঁদের জনগণের জন্য মহৎ কাজ করে থাকেন এবং দিব্যজ্ঞান বা গুণাগুণের অধিকারী, তাঁদের পূজা করা হয়। যেসব বীর মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেন এবং একটি সামাজিক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁদের নামেও পূজা করা হয়। এ ধরনের ব্যক্তিপূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। মিসরে মৃত রাজা, স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে কিংবদন্তির নায়কপূজা ইত্যাদিও বীরপূজারই নামান্তর। গ্রিসে বীরদের সম্মান দেবতুল্য।

**বুৎদেন** বৌদ্ধমন্দির, যেখানে পূজার জন্য বুদ্ধমূর্তি সংরক্ষিত থাকে।

**বুৎসিদান** জাপানের বৌদ্ধমন্দির অর্থাৎ বুদ্ধের মূর্তি রক্ষার স্থান। ঘরে বুদ্ধের মূর্তি পরিবারের পূর্বপুরুষদের স্মৃতিচিহ্নসহ দুই দরজার মাঝ বরাবর কালো একটি বাক্সে রক্ষিত হয় এবং স্মরণোৎসবের সময় খোলা হয়।

**বুৎসুজো** জাপানি শব্দ। অর্থ ছবি, ভাস্কর্য ও খোদাই করা অবস্থায় বুদ্ধমূর্তি।

**বুদ্ধ, গৌতম** (জন্ম আনু. ৫৬৩ খ্রিষ্টপূর্ব, মৃত্যু ৪৮৩ খ্রিষ্টপূর্ব) বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। তাঁর পিতা শাক্যবংশীয় শুদ্ধোধন হিমালয়ের পাদদেশস্থ কপিলাবস্তু নামের এক ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যের শাসক ছিলেন; মায়ের নাম মহামায়া। কপিলাবস্তুর নিকটবর্তী লুম্বিনী নামক উদ্যানে (বর্তমান নেপালের দক্ষিণ অংশ) তিনি ভূমিষ্ঠ হন। তাঁর জন্মের সাত দিন পরে মাতার মৃত্যু ঘটে। বিমাতা ও মাসি মহাপ্রজাপতি তাঁকে লালনপালন করেন। বাল্যনাম শাক্যসিংহ, গৌতম ও সিদ্ধার্থ। কিংবদন্তি অনুযয়ী তাঁর জন্মের পরেই জ্যোতিষীরা ঘোষণা করেন যে নবজাত শিশু বিশ্বের শাসক অথবা বিশ্বের শিক্ষক হবেন। পিতা শুদ্ধোধন পুত্রকে রাজধর্ম শিক্ষাদানের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন। তাঁর কৈশোর ও যৌবন পরম বিলাসিতার মধ্যে অতিবাহিত হয়। ১৬ বছর বয়সে যশোধারা নাম্নী এক রূপসী কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ২৯ বছর বয়সে একদা ভ্রমণকালে তিনি পথিমধ্যে জনৈক রোগী, জনৈক বৃদ্ধ, একটি মরদেহ এবং সবশেষে জনৈক ভ্রাম্যমাণ ধর্মপরায়ণ ভিক্ষুককে দেখে ব্যথিত হন এবং মানবজীবনের দুঃখ-দুর্দশা, তথা রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যুর কবল

থেকে মানবাত্মার কল্যাণের কথা ভাবতে থাকেন। উল্লিখিত চারটি দৃশ্য তাঁর জীবনের গতি নির্দেশ করে দেয়; প্রথম তিনটি দৃশ্যে তিনি মানবাত্মার নির্যাতন এবং শেষ দৃশ্যে মুক্তির উপায় খুঁজে পান। স্ত্রী ও নবজাত পুত্র রাহুলকে নিদ্রিত রেখে একদিন গভীর রাতে তিনি রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেন। দীর্ঘ ছয় বছর বিভিন্ন স্থান পর্যটনের মধ্য দিয়ে তিনি নিদারুণ আত্মদহন সহ্য করেন। অতঃপর তিনি বুদ্ধগয়ার নিকটবর্তী উরুবিল্ব গ্রামে একটি অশ্বত্থগাছের নিচে বসে গভীর ধ্যানে মগ্ন হন। মানবজন্মের দুঃখ-সমস্যার সমাধান না পেয়ে তিনি ধ্যানাসন ত্যাগ করবেন না—এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। ধ্যানাসনে তিনি (বোধিসত্ত্বা বা ভবিষ্যৎ বুদ্ধরূপে) মার বা দুষ্টমতির প্রলোভনে অটল থাকেন। ৪৮ দিন কঠোর তপস্যার পরে ৪৯তম দিবসে তিনি বোধি বা নির্বাণ লাভ করেন। এর পর থেকে তাঁর নাম হয় বুদ্ধ (আলোকপ্রাপ্ত) ও ভগবান তথাগত। এরপর তিনি ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। বারানসির নিকটবর্তী সারনাথ নামক স্থানে (মৃগকাননে) প্রথম উপদেশ দান করেন। অল্পকালের জন্য স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে পিতা, স্ত্রী ও পুত্রকে ধর্মান্তরিত করেন। খুল্লতাত ভ্রাতা দেবদত্ত ঈর্ষাকাতর হয়ে তাঁকে হস্তীর পদতলে পিষ্ট করার মাধ্যমে হত্যা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু বুদ্ধ প্রশান্ত বদনে হস্তীকে বিরত করেন। দীর্ঘ ৪৫ বছরকাল তিনি বিভিন্ন স্থান পর্যটন শেষে ধর্ম প্রচার করেন এবং ভগবান তথাগতরূপে পরিচিত হন। ৮০ বছর বয়সে কুশীনগরে (নেপালে, জন্মস্থান থেকে অল্প দূরে) তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর ধর্মনীতির ফলে সনাতন হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণদের সামাজিক অধিকার খর্ব হয়; হিন্দু শাস্ত্রমতে বুদ্ধদেব বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে নবম অবতার। প্রথমদিকে শূন্য সিংহাসন, পায়ের জোড়াছাপ, চক্র অথবা অশ্বত্থগাছের মূর্তি দ্বারা বুদ্ধকে কল্পনা করা হতো। পাশ্চাত্যের প্রভাবান্বিত গান্ধার ও মথুরা চারুশিল্পকলার যুগে (প্রথম ও দ্বিতীয় শতক) তাঁর মানবমূর্তি কল্পিত হয়। মতান্তরে গৌতম বুদ্ধের জন্মবর্ষ খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৪, (৭ এপ্রিল, শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা), বিবাহের বর্ষ খ্রিষ্টপূর্ব ৬০৮, গৃহত্যাগ বর্ষ খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯৫, বুদ্ধত্ব লাভের বর্ষ খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৯ এবং মহাপরিনির্বাণ খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৪ (২২ এপ্রিল শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা)। তাঁর জীবন সম্পর্কে লেখা গ্রন্থগুলো হচ্ছে: নবীনচন্দ্র সেনের বুদ্ধজীবনীকাব্য *অমিতাভ* (১৩০২), গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক *বুদ্ধদেব-চরিত্র* (১৮৮৭), অঘোরনাথ গুপ্তের ৩ খণ্ড *শাক্যমুনি-চরিত্র*, শরচ্চন্দ্র দেবের নাটক *শাক্যসিংহ প্রতিভা* বা *বুদ্ধদেব-চরিত* (১২৯৫)।

**বুদ্ধগয়া** ভারতের বিহার রাজ্যের অন্তর্গত গয়া জেলার ফল্গু বা নিরঞ্জনা নদীতীরস্থ একটি গ্রাম। গয়া শহর থেকে ৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এই গ্রামের প্রাচীন নাম উরুবেলা (উরুবিল্ব)। এখানকার একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৯ অব্দে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করার পর থেকে এর বুদ্ধগয়া নাম। এখানে একটি সুউচ্চ, শিল্প চাতুর্যময় মন্দির, যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য সিংহলি, বর্মী, তিব্বতি, নেপালি, জাপানি, থাই ও চীনাদের নির্মিত বিশ্রামাগার, ধর্মশালা, বিহার, পপিগান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান। বৌদ্ধদের পরম পবিত্র স্থানগুলোর মধ্যে এটি দ্বিতীয়। প্রতিবছর বহু দর্শনার্থীর এখানে সমাগম ঘটে থাকে।

**বুদ্ধঘোষ** বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদ। আবির্ভাবকাল চতুর্থ-পঞ্চম খ্রিষ্টাব্দ। তাঁর জ্ঞান ও ভাষার দখলের জন্য তিনি বুদ্ধঘোষ নামে অভিহিত হন। বৌদ্ধশাস্ত্রের ওপর অসংখ্য নিবন্ধের রচয়িতা। তাঁর জীবন বৃত্তান্তের জন্য প্রধান উৎসগ্রন্থ হচ্ছে *সিংহালী চুলবংশ*। তাঁর জন্ম উত্তর ভারত, না দক্ষিণ ভারতে—এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। পালি ভাষায় দক্ষতা প্রমাণের জন্য তিনি *বিশুদ্ধমাগ্গো* রচনা করেন। মঠের নিয়মকানুন ও শাসন অনুশাসনের ওপর তাঁর বহু নিবন্ধগ্রন্থ রয়েছে।

**বুদ্ধপূর্ণিমা** বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব। বৈশাখ মাসের এই পূর্ণিমা দিবসে বুদ্ধের জীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বলে দিনটি 'বুদ্ধপূর্ণিমা' নামে খ্যাত। খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৩ অব্দের এ দিনে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন, ৫৮৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের এ দিনে তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে জগতে বুদ্ধ নামে খ্যাত হন এবং ৫৪৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের এ দিনে তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বলাভের মধ্য দিয়েই জগতে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হয়।

বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে বৌদ্ধরা বুদ্ধপূজাসহ পঞ্চশীল, অষ্টশীল, সূত্রপাঠ, সূত্রশ্রবণ, সমবেত প্রার্থনা এবং নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিবিধ পূজা ও আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এদিন বিবিধ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। বৌদ্ধবিহারগুলোতে বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাসহ ধর্মীয় সভার আয়োজন করা হয়। এই পূর্ণিমাকে ঘিরে অনেক বৌদ্ধবিহারে চলে তিন দিনব্যাপী নানামুখী অনুষ্ঠান। বৌদ্ধধর্মীয় পর্ব হিসেবে এ দিনে সাধারণ সরকারি ছুটি থাকে।

**বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলন** ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকায় এই আন্দোলন গড়ে ওঠে ও সক্রিয় থাকে। এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল কাদির, আবুল ফজল, কাজী মোতাহার হোসেন, আবদুর রহমান খাঁ প্রমুখ। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামক সংগঠনকে কেন্দ্র করে এটি গড়ে ওঠে। সাহিত্যিক সমাজ আয়োজিত সভা-সমাবেশে প্রবন্ধ ও রচনাদিও পাঠ করা হতো। এগুলো আবার সংগঠনের মুখপত্র *শিখা* পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। এর লেখকেরা শিখাগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তবে এ আন্দোলন রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীলদের রুদ্ররোষে পড়ে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

**বুরদা** যে পশমি পোশাক মোহাম্মদ (সা.) কবি ইবনে জুহায়েরকে একটি কবিতার জন্য উপহার দিয়েছিলেন। প্রথম উমাইয়া খলিফা এটি সংগ্রহ করেন। ১২৫৮ সালে মঙ্গোলরা এটি পুড়িয়ে ফেলে। ওসমানি তুর্কিরা দাবি করেন যে এটা এখনো তাঁদের প্রযত্নে ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত রয়েছে।

**বুরাক, বোরাক** আরবি শব্দ 'বারক' শব্দ থেকে উদ্ভূত। 'বারক' অর্থ বিদ্যুৎ। হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী মিরাজের সময় মক্কা থেকে জেরুজালেম এবং সেখান থেকে বুরাকের পিঠে চড়ে হজরত মোহাম্মদ (সা.) সাত আসমানে, অর্থাৎ ঊর্ধ্বলোকে পরিভ্রমণ করেন। পবিত্র কোরআনে বুরাকের কোনো উল্লেখ নেই। বুরাকের আকৃতি গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চেয়ে ছোট ছিল। এর মাথা ছিল নারীর মতো এবং এর লেজ ছিল ময়ূরের মতো।

**বুশিদো** কনফুসিয়াসের পঞ্চনীতি, জেনের ভয়হীনতা ও স্থৈর্য এবং জাপানি সংস্কারের প্রতি শিন্টো আনুগত্যের মিশ্রণে ইউরোপের যে শিভালরিজম, তা ক্ষাত্রাদর্শেরই নামান্তর।

**বৃন্দা** অসুররাজ জলন্ধরের সাধ্বী স্ত্রী। তপস্যার দ্বারা জলন্ধর ব্রহ্মার কাছ থেকে এই বর লাভ করেন যে, যত দিন তাঁর স্ত্রী বৃন্দা সতী থাকবেন, তত দিন জলন্ধর অজেয় থাকবেন। বরলাভের পর জলন্ধর স্বর্গ জয় করলে স্বয়ং মহাদেব তাঁকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হন। তখন দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করে বৃন্দার সতীত্ব নাশ করেন। আর সেই সুযোগে দেবতারা জলন্ধরকে বধ করেন। মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণ বরণ করলে বৃন্দার দেহভস্ম থেকে তুলসী, অশ্বত্থ ইত্যাদি হিন্দুদের পবিত্র তরুর সৃষ্টি হয়। দ্বাপর যুগে বৃন্দা রাধার সখীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নামানুসারেই কৃষ্ণের লীলাভূমির নামকরণ করা হয়।

**বৃন্দাবন** ভারতের উত্তর প্রদেশে মথুরা থেকে ছয় মাইল দূরে যমুনা নদীর তীরে উদ্যানবেষ্টিত তীর্থস্থান। বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি ও যৌবনের লীলাভূমি। গোকুলের দানবদের বধ করে শ্রীকৃষ্ণ এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তী পুরাণমতে, বৃন্দাবন স্বর্গের পার্থিব প্রতিচ্ছবি। সেখানে কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে নৃত্য, লীলা ও নানা রঙ্গে কালাতিপাত করতেন। বৃন্দাবনই হচ্ছে রাসলীলা নৃত্যের পীঠস্থান।

**বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির** পশ্চিমবঙ্গের ত্রিবেণী ও নবদ্বীপের মধ্যবর্তী স্থানে গুপ্তিপাড়ায় এটি অবস্থিত। অষ্টাদশ শতকে রক্তবর্ণ ইষ্টকে নির্মিত এই মন্দিরগাত্রে দেব-দেবীর মূর্তি, রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলির দৃশ্য এবং প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্যদের জীবনচিত্র অঙ্কিত আছে।

**বৃন্দাবন দাস** আনু. ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে বৈশাখী কৃষ্ণ-দ্বাদশীতে নলিন আচার্যের কন্যা ও শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে ও অদ্বৈতপ্রভু, গদাধর প্রমুখ চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে চৈতন্য জীবনের উপাদান সংগ্রহ করে *চৈতন্যভাগবত* (১৫৭৩) নামে চৈতন্যদেবের জীবনচরিত রচনা

করেন। বৃন্দাবন দাসকে চৈতন্যলীলার ব্যাস বলা হয়। তিনি কাব্যে শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতার ও নিত্যানন্দ প্রভুকে বলরামের অবতার মনে করে ব্যাসদেব রচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুসরণে চৈতন্যলীলার বর্ণনা করেন।

**বৃষকেতু** মহাভারত-বর্ণিত অঙ্গরাজ কর্ণের অন্যতমা পত্নী পদ্মাবতীর গর্ভে এঁর জন্ম। কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন অর্জুনকে বধ না করা পর্যন্ত তিনি জল গ্রহণ করবেন না। কর্ণের দানশীলতা পরীক্ষার জন্য কৃষ্ণ জনৈক ব্রাহ্মণের বেশে তাঁর কাছে উপস্থিত হন এবং কর্ণের প্রিয় বৃষকেতুর মাংস আহার করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সত্যবাদী ও দানশীল কর্ণ সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকে বধ করেন। বিস্মিত হয়ে কৃষ্ণ সঞ্জীবনীবিদ্যার সাহায্যে পুনরায় বৃষকেতুকে জীবনদান করেন।

**বৃষোৎসর্গ** হিন্দু শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে শ্রাদ্ধকর্তা চারটি বৃষ উৎসর্গ করে ছেড়ে দেন। একেই বৃষোৎসর্গ বলা হয়।

**বৃষ্টি আবাহন** যথাসময়ে বৃষ্টি না হলে কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে সমাজে বিপর্যয় দেখা দেয়। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য নানা ধরনের ক্রিয়াগত আচার পালন করা হয়। এসবের মধ্যে ব্যাঙবিয়ে, বদনাবিয়ে, মেঘারানি, হুদমাদেও-এর মতো বৃষ্টি আবাহন অনুষ্ঠান এবং পুণ্যিপুকুর ব্রত ও বসুধারা ব্রত পালন বা উদ্‌যাপন উল্লেখযোগ্য। আদিবাসী মেয়েরা বৃষ্টির কামনায় রাতের অন্ধকারে বিবস্ত্র হয়ে দল বেঁধে হুদমাদেও-এর গান গায়। প্রাচীনকালে আজটেকদের মধ্যে বৃষ্টির দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য একটি সুন্দরী কুমারী মেয়েকে নানা অর্ঘ্যসহ উৎসর্গ করার প্রথা ছিল। এতে সমাজের সব মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে সারা গ্রাম ঘুরত এবং শেষে মেয়েটিকে ছুড়ে ফেলে দিত একটি কুয়োর মধ্যে। বৃষ্টি আবাহনের ক্ষেত্রে কাদামাটি অনুষ্ঠানও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেয়েরা কলসিতে জল ভরে বাড়ি বাড়ি ঘোরে এবং মাটিতে জল ঢেলে একজন আরেকজনের গায়ে মাখিয়ে দেয়।

**বৃহৎ-সংহিতা** ষষ্ঠ শতকে বরাহমিহির রচিত হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ। এতে গৌড়কা অঞ্চলকে বাংলার এমন একটি অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা পৌণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), তাম্রলিপ্তিকা (মেদিনীপুর জেলার অংশ), বঙ্গ ও সমতট (মধ্য ও পূর্ববঙ্গ) এবং বর্ধমান অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। বৃহৎ-সংহিতায় উপবঙ্গ নামক জনপদেরও উল্লেখ আছে। যশোর ও তৎসংলগ্ন কতিপয় অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত।

**বৃহদ্ধর্ম** হিন্দু উপপুরাণ। মহাপুরাণের সংখ্যা ১৮টি। মহাপুরাণগুলো ছাড়া এবং লেখকের নাম উল্লেখবিহীন পুরাণগুলোকে উপপুরাণ বলা হয়। বৃহদ্ধর্ম পুরাণকে ধর্ম সংগীতা বা ধর্মনামকও বলা হয়। এটি একটি উপদলীয় অসূয়ামুক্ত উপপুরাণ, যার মধ্যে ধর্মীয় ঔদার্যগুণের ঐতিহ্যকে প্রথায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।

**বৃহন্নলা** অর্জুনের অপর নাম। অর্জুন অস্ত্রশিক্ষার জন্য স্বর্গে গেলে তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে উর্বশী তাঁকে প্রেম নিবেদন করেন। অর্জুন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলে ক্রুদ্ধা উর্বশীর অভিশাপে এক বছরের জন্য তিনি ক্লীবত্বপ্রাপ্ত হন। অজ্ঞাতবাসের বছরে অর্জুন বৃহন্নলা নাম নিয়ে বিরাট রাজার কন্যাদের নৃত্য-গীতাদির শিক্ষক নিযুক্ত হন।

**বৃহস্পতি** প্রার্থনার কর্তা। বৈদিক দেবতা অগ্নি ও ইন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বেদোত্তর সাহিত্যে বৃহস্পতিকে প্রজ্ঞা ও কাব্যের দেবতা হিসেবে বা দেবতাদের গুরু হিসেবে কল্পিত হয়। বৃহস্পতি গ্রহ তার নক্ষত্রের স্বামী। মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র। তাঁর কর্মফলেই চন্দ্র ও সূর্যের উদয়। তিনি দেবগুরু। তাঁর উচ্চারিত শ্লোক স্বর্গে যায়। তিনি সপ্তমুখ, সপ্তরশ্মি, মিষ্টজিহ্ব, নীলপৃষ্ঠ ও তীক্ষ্ণশৃঙ্গ। তাঁকে আটটি লোহিতবর্ণ অশ্ব রথযোগে বহন করে। তিনি দেবতাদের পুরোহিত। মন্ত্রের অধিপতি দেবরূপে খ্যাত। তাঁর প্রসাদ ছাড়া যজ্ঞফল লাভ হয় না।

**বেদ** হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। 'বেদ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জ্ঞান। যার অনুশীলনে ধর্মাদি চতুর্বর্গ লাভ হয়, তা-ই বেদ। বেদের চারটি অংশ—মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। মন্ত্রাংশ প্রধানত পদ্যে রচিত। যজুসংহিতার কিছু অংশ গদ্যে রচিত। এটাই বেদের প্রধান অংশ। এতে আছে দেবস্তুতি, প্রার্থনা ইত্যাদি। ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞে দেবতাদের আহ্বান করা হয়। যজুমন্ত্রের দ্বারা তাঁদের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করা

হয়। সামমন্ত্রের দ্বারা তাঁদের স্তুতি করা হয়। ব্রাহ্মণ মূলত বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা। এটি গদ্যে রচিত এবং প্রধানত কর্মাশ্রয়ী। আরণ্যক কর্ম ও জ্ঞান উভয়াশ্রয়ী এবং উপনিষদ বা বেদান্ত সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানাশ্রয়ী। বেদের বিষয়বস্তু সাধারণভাবে দুই ভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড।

**বেদাঙ্গ** বেদ সম্যকরূপে বুঝতে হলে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ও নিরুক্ত—এই ছয়টি বেদের অঙ্গকে আয়ত্ত করা আবশ্যক। শিক্ষা অর্থ স্বরবিজ্ঞান, যার দ্বারা বৈদিক সূক্তগুলো উচ্চারণ করে স্বরসংযোগে গান করার নিয়মাদি দেওয়া হয়েছে। ছন্দের জ্ঞানের অভাবে বেদপাঠ সম্পূর্ণ হয় না। রস, গুণ, দোষের উপলব্ধি হয় না এবং উচ্চারিত শব্দও হৃদয়ঙ্গম হয় না। গায়ত্রী, উষ্ণীব, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী—এই সাতটি বৈদিক এবং এর পরের অন্যগুলো হলো লৌকিক ছন্দ। ব্যাকরণ বৈদিক সাহিত্য পরিচয়ের সহায়ক। নিরুক্ত হচ্ছে বৈদিক শব্দ ও বাক্যের অর্থ প্রতিপাদক গ্রন্থ। জ্যোতিষ দ্বারা সূর্যাদি গ্রহের অবস্থান, গতি ও স্থিতিবিষয়ক জ্ঞানলাভ হয়। যজ্ঞাদি কার্যে গ্রহাদির অবস্থান জানা প্রয়োজন। কল্প হচ্ছে সেই সূত্রগ্রন্থ, যেখানে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ থেকে সারতত্ত্ব সূত্রাকারে গ্রথিত এবং যে গ্রন্থের দ্বারা বাকপ্রয়োগ কল্পিত অর্থাৎ সমর্থিত হয়।

**বেদান্ত** 'বেদান্ত' শব্দের আক্ষরিক অর্থ বেদের অন্ত বা শেষভাগ। কিন্তু প্রচলিত বিশ্বাসমতে অপৌরুষেয় নিত্য বেদের আদি-অন্ত নেই। তাই বেদান্ত বলতে প্রকৃতপক্ষে বেদের শ্রেষ্ঠভাগকেই বোঝায় এবং তা হলো ব্রহ্মতত্ত্ব। বেদে এই তত্ত্ব-সম্পর্কিত আলোচনাংশকে বলা হয় জ্ঞানকাণ্ড, যার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে উপনিষদে। উপনিষদ ও বেদান্ত সমার্থক। বেদান্তদর্শনে তিনটি প্রস্থান—শ্রুতিপ্রস্থান (উপনিষদ), স্মৃতিপ্রস্থান (ভগবদ্‌গীতা) ও ন্যায়প্রস্থান (বেদান্তসূত্র)।

**বেরা ভাসান** নদ-নদী ও হাওর-বাঁওড় অঞ্চলে জলের সব রকম অকল্যাণকর প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে পালিত উৎসব। ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার খোয়াজ খিজিরের উদ্দেশে উৎসবটি নিবেদিত হয়। সামাজিক, পারিবারিক কিংবা ফকির সম্প্রদায়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। মোগল আমলে মুর্শিদাবাদ, রাজমহল ও ঢাকায় নবাব-নায়েবে নাজিমদের উদ্যোগে মহাসমারোহে এই উৎসব পালিত হতো। এজাতীয় উৎসবে এক নিশ্বাসে কলাগাছ কেটে ভেলা বানানো হয় এবং তাতে নানা রকমের শিরনি সাজিয়ে গান গাইতে গাইতে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

**বেলোন্যা** যুদ্ধের দেবী। রোমক কিংবদন্তি অনুযায়ী তিনি মার্সের ভগ্নি। মার্স যুদ্ধের দেবতা এবং রোমের প্রতিষ্ঠাতা।

**বেহুলা** *মনসামঙ্গল* কাব্যের প্রধান চরিত্র। পুরাণকাহিনিতে বেহুলা স্বর্গের অনিরুদ্ধের স্ত্রী উষা, লোককাহিনি অনুযায়ী তিনি ছিলেন উজানীনগরের সায়বেনের কন্যা এবং চম্পকনগরের চাঁদ সওদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র *মনসামঙ্গল* কাব্যের নায়ক লখিন্দরের স্ত্রী। বেহুলা ছিলেন সতী-সাধ্বী, পরমাসুন্দরী এবং সর্বগুণে গুণান্বিতা। সর্পদেবী মনসার আক্রোশে বিবাহরজনীতে লৌহবাসরে সর্পদংশনে স্বামীর মৃত্যু হলে স্বামীর পুনর্জীবন কামনায় বেহুলা কলাগাছের ভেলায় স্বামীর শব নিয়ে গাঙুরের জলে ভেসে দেবপুরীর উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে গোদা ও আপু ডোম বেহুলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি তাদের অভিশাপ দেন। মনসার নির্দেশে নিতাই ধোবিন বাঘ ও চিলের রূপ ধরে তাঁর স্বামীর মরদেহ আক্রমণ করলে বেহুলা প্রাণপণে তা রক্ষা করেন। অবশেষে স্বর্গের নিতাইয়ের ঘাটে ভেলা ভিড়লে তাঁর পুনরাত্মা প্রদানের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়ার আশায় তাঁর আশ্রয় নেন। নিতাই বেহুলাকে স্বর্গের দেবতাদের কাছে নিয়ে যান। বেহুলা দেবপুরীতে পৌছান এবং নৃত্য-গীতে মহাদেব ও অন্যান্য দেবতাকে তুষ্ট করলে স্বামী পুনর্জীবন লাভ করেন। চাঁদ সওদাগর মনসাকে পূজা দেবে—এই শর্তে বেহুলা স্বামীর এবং মনসার কোপে অতীতে নিহত সওদাগরের অন্য ছয়পুত্রের জীবন ও সম্পদসহ সপ্তডিঙ্গা উদ্ধার করে শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। শিবভক্ত চাঁদ মনসার পূজা দিতে অস্বীকার করলেও বেহুলার অনেক অনুনয়-বিনয়ে তিনি মনসার পূজা দেন। মর্তে মনসার পূজা

প্রচলন করে লখিন্দর-বেহুলারূপী স্বর্গের দম্পতি অনিরুদ্ধ-উষা শাপান্তে স্বর্গে গমন করেন। বণিক চাঁদ ছিলেন শিবের ভক্ত, তাই মনসার পূজা দিতে নারাজ ছিলেন। দেবীর কোপে তিনি সপ্তপুত্র ও সপ্তডিঙ্গা হারান এবং নিজেও নানা দুর্ভোগ পোহান।

**বৈকুণ্ঠ** মেরু পর্বত বা উত্তর সমুদ্রে অবস্থিত বিষ্ণু দেবতার আবাসস্থল বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠের মধ্য দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হয় এবং সেখানে পদ্ম, স্বর্ণ ও হীরা-জহরত বিরাজ করে। অন্য মতে, বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুর কাল, পাত্র ও ভালোমন্দের অতীত এক আবাসস্থল। বৈকুণ্ঠের আকাশ নীল ও চতুর্ভুজ এবং মণিমানিক্য ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত। বিষ্ণু সর্পোপরি শায়িত হিসেবে কল্পিত হন। বৈকুণ্ঠ চিরস্থায়ী আবাস এবং ভক্তের হৃদয়েও বৈকুণ্ঠ বা বিষ্ণুভাব অনুভব করা যায়।

**বৈদিক যুগ/ধর্ম** ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে বৈদিক যুগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই যুগে রচিত বিপুল সাহিত্যসম্ভার থেকে ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যেসব সূত্র পাওয়া যায়, পরবর্তীকালে সেগুলোই বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের উৎস হিসেবে গণ্য হয়েছে। বৈদিক সাহিত্য মূলত চার শ্রেণীতে বিভক্ত—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ।

বৈদিক যুগের একেবারে শেষ পর্যায়ে শিক্ষার্থী ও পেশাদারদের জন্য সূত্র বা বেদাঙ্গ সাহিত্য রচিত হয়েছিল, যা বিষয়বস্তু হিসেবে ছয় ভাগে বিভক্ত—শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ। শিক্ষা পর্যায়ের গ্রন্থগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল ধ্বনিবিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষাদান, যাতে বিশুদ্ধ উচ্চারণসহকারে ছাত্ররা বৈদিক গ্রন্থগুলো পড়তে পারে। এ ছাড়াও এগুলোতে আচার-অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ ইত্যাদিরও কথা আছে।

ঋগ্‌বেদের যুগের সমাজ অর্থাৎ বৈদিক যুগ ছিল প্রধানত পশুপালনমূলক অর্থনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। পশুপালনমূলক সমাজের যে পুরুষপ্রাধান্য দেখা যায়, এই জাতীয় সমাজের ধর্মীয় চেতনাতেও তার প্রভাব থাকে। ঋগ্‌বেদে তাই দেবীদের তুলনায় দেবতাদেরই প্রাধান্য। ঋগ্‌বেদের দেবতারা তিন প্রকার—দ্যুলোক বা স্বর্গের দেবতা, যাঁদের মধ্যে প্রধান মিত্র, পুষা, বিষ্ণু, উষা, আদিত্যগণ, অশ্বিদ্বয় ইত্যাদি; অন্তরিক্ষ বা আকাশের দেবতা, যা ইন্দ্র, ত্রিত আপ্ত্য, মাতরিশ্বা, রুদ্র, মরুদগণ, বায়ু, পর্জন্য ইত্যাদি এবং ভূলোক বা পৃথিবীর দেবতা, যেমন—অগ্নি, পৃথিবী, সোম ইত্যাদি।

ঋগ্‌বেদের বহু দেবতা ইরানীয় ধর্মগ্রন্থ *অবেস্তায়* বর্তমান। মিত্র ও বরুণ অবেস্তার খুবই বড় দেবতা, সোমের স্থানও খুবই উচ্ছে, ইন্দ্রও সেখানে আছেন, যদিও তাঁর ভূমিকা খুব গৌরবের নয়। ইরানীয় ধর্মকে অসুর আখ্যা দেওয়া হয়, যে নামটি গ্রহণ করা হয়েছে অসুর দেশের (আসিরিয়া) নাম থেকে। পক্ষান্তরে ভারতীয় বৈদিক ধর্ম দৈব নামে পরিচিত। পুরাণোক্ত দেবাসুর সংগ্রাম আসলে দুটি দেশের প্রায় একই ধরনের ধর্মবিশ্বাসের জ্ঞাতশত্রুতা। এই দ্বন্দ্বের ফলে 'দেব' ও 'অসুর' দুটি শব্দেরই অর্থবিপর্যয় ঘটেছে উভয় দেশে। পরবর্তীকালের ইরানীয় রচনাগুলোয় দৈব বা দেব শব্দটি নিন্দিত। পক্ষান্তরে পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে অসুর শব্দটি নিন্দাব্যঞ্জক, যদিও ঋগ্‌বেদে তা নয়, যেখানে অনেক দেবতারই উপাধি অসুর। বিরোচন, প্রহ্লাদ, বলি প্রভৃতি অসুর ভারতীয় ঐতিহ্যে আজও শ্রদ্ধেয়। বৈদিক ভারতীয়রা এবং প্রাচীন ইরানীয়রা একই অগ্নিপূজা ও সোমযাগের শরিক ছিল। যাগযজ্ঞের পরিভাষা উভয় দেশে ছিল একই যেমন হওম=সোম, যাওতর=হোতৃ, অথ্রবন=অথর্বন, মনথ্র=মন্ত্র, যযত=যজত, যশ্ন=যজ্ঞ, আযুইতি= আহুতি, ইত্যাদি। *বেদ* ও *অবেস্তায়* একই ধরনের উপনয়ন প্রথার অস্তিত্ব দেখা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই দেবতাদের সংখ্যাও সমান। মিত্র (মিথ্র) এবং বরুণ (অসুর, অহুর মাজদা) বিশ্বচরাচরের নিয়মরক্ষক, বৈদিক ঋত অবেস্তীয় অশ ওই নিয়মশৃঙ্খলার প্রতীক। নাসত্য ও অপাম নপাত স্বনামেই *অবেস্তায়* বর্তমান। বৈদিক গন্ধর্ব *অবেস্তায়* গন্দরেও, কৃশানু কৃশনি, যম যিম। ইরানীয় ধর্মে দৈব উপাদানগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেন জরথুস্ত্র, তথাপি সম্রাট জেরেক্সেসের লেখা থেকে জানা যায় যে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকেও ইরানে দেবপন্থায় বিশ্বাসী অনেক মানুষ ছিল।

একটা বহুলপ্রচলিত ধারণা আছে এই যে ঋগ্‌বেদের যুগের ধর্ম ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। সে

যুগে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হতো। কালক্রমে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ, পশুবলি ইত্যাদির বৃদ্ধির জন্য বৈদিক ধর্মের অধঃপতন ঘটে এবং তারই প্রতিবাদে গড়ে ওঠে উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম এবং বৈষ্ণব, শৈব ইত্যাদি ভক্তিমূলক ধর্মগুলো। কিন্তু এটি একটি ধারণা, কেননা সামগ্রিকভাবে দেখলে বৈদিক সাহিত্যের চৌদ্দ আনাই যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপমূলক। উপনিষদগুলোও যজ্ঞ কথায় ভরপুর। প্রতিটি যজ্ঞের খুঁটিনাটি বিষয় পরীক্ষা করলে দেখা যায় যজ্ঞের অনুষ্ঠানগুলো একটি আদিম জীবনচর্যার স্মারক, যার মূলে আছে জাদুবিশ্বাস বা ম্যাজিক।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোয় যজ্ঞকে সর্বোচ্চ মহাজাগতিক শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং সমগ্র সৃষ্টিকার্যকেই যজ্ঞক্রিয়ার ফল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইন্দ্রাদি প্রাচীন ঋগ্‌বেদের দেবতারা এই শক্তির অধীন ও আজ্ঞাবহ। অথর্ববেদে ইন্দ্র, অগ্নি, সোম প্রভৃতি দেবতারা রয়েছেন কিন্তু তাঁদের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হয়েছে, তাঁদের পেছনকার প্রাকৃতিক ভিত্তি একেবারে লুপ্ত হয়েছে। অথর্ববেদে নতুন কিছু দেবতার আবির্ভাব দেখা যায়, যাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য প্রজাপতি, যিনি বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা এবং রক্ষাকর্তা হিসেবে কল্পিত। রুদ্ধ-শিবও অথর্ববেদে নতুনভাবে এসেছেন, যিনি ঋগ্‌বেদের রুদ্রের থেকে পৃথক, এবং যাঁর কল্পনা পরবর্তীকালের শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শিবকল্পনার সূচনা করে। একটি সূক্তে (১২/১) পৃথিবীদেবী বন্দিত হয়েছেন, অপর একটি সূক্তে (৪/১৬) সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের ধারণার আভাস আছে। সৃষ্টির প্রথম কারণ হিসেবে অথর্ববেদের বিভিন্ন স্থানে কাল (১০/৫৩/৫-৬), প্রাণ (৯/৪) ও কামের (৯/২) ধারণা পাওয়া যায়। রোহিত সূক্তগুলোয় (১৩/১-৪) সূর্যকেই সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে বলা হয়েছে। সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে ব্রহ্মার ধারণাও অথর্ববেদে (১১/৮) উপস্থিত।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে মৃত্যু ও পরলোকসংক্রান্ত চিন্তাগুলোর নানা দিক পরবর্তীকালের কর্মফলবাদ ও জন্মান্তরতত্ত্বের সূচনা করে। এখানে বলা হয়েছে কর্তব্য পালনই পুণ্য, যার ফলাফল মৃত্যুর পর ভোগ করা যায়। কর্তব্যগুলো নির্দিষ্ট। দেবঋণ, পিতৃঋণ প্রভৃতি কতকগুলো ঋণ নিয়েই মানুষ জন্মায়, যা সারা জীবন ধরে তাকে দেবপূজা, বেদপাঠ, শ্রাদ্ধ, অতিথি সৎকার প্রভৃতি দৈনন্দিন কর্তব্য পালন করে পরিশোধ করতে হবে। এর ফল স্বর্গ, যেখানে মানুষ মরুৎগণকে আশ্রয় করে যাত্রা করবে, এবং তাঁদের প্রদত্ত শীতল বাতাসে নতুন দেহ লাভ করে পিতৃগণের সঙ্গে সে সাক্ষাৎ করবে এবং যমলোকের পাকাপাকি বাসিন্দা হবে। তার বংশধরেরা তার উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করবে যমলোকে তাতেই তার পুষ্টি ঘটবে। অথর্ববেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোয় নরকেরও বর্ণনা আছে, তবে তা খুব ভয়ংকর নয়। দেবযান ও পিতৃযানের ধারণাও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বর্তমান। জন্মান্তর ও কর্মফলবাদের কিছুটা ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়, যখন বলা হয় যে মৃত্যুযন্ত্রণা মানুষকে শুধু একবারই ভোগ করতে হয় না, বারবার বিভিন্ন জন্মে ভোগ করতে হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে এই জগতে মানুষ যে খাদ্য গ্রহণ করবে প্রতিদানে সেই খাদ্য তাকে গ্রহণ করবে অন্য জগতে। এর মধ্যে কর্মফলতত্ত্বের পরোক্ষ ইঙ্গিত আছে।

ইতিহাস অনুসন্ধানীদের ধারণা, গাঙ্গেয় অববাহিকায় বসতি স্থাপন করা ইন্দো-আর্য সম্প্রদায় কর্তৃক বেদ রচনা শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে। বেদ থেকে বৈদিক যুগে ভারতের জনজীবন এবং নারীর অবস্থান-সম্পর্কিত ধারণা পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের স্তোত্রে পুত্রকামনা প্রকাশ পেলেও, কন্যাকে অপরিণত বয়সে বিয়ে দিতে বারণ করা হয়েছে। বেদের রচয়িতাদের মধ্যে লোপামুদ্রা, বিশ্বাভারার মতো আরও অনেক নারীর নাম প্রমাণ করে যে বৈদিক যুগে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল এবং তাঁরা আচার্য (গুরু) হতে পারতেন। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ 'বিদাথা'তে তাঁরা উপস্থিত থাকতেন। বর্ণাশ্রমের উদ্ভব, জমির ওপর ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও পিতৃসূত্রে উত্তরাধিকারের বণ্টন শুরু হওয়ায় নারীর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে গৃহমুখী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। স্মৃতিযুগে (খ্রিষ্টপূর্ব ২০০-৩০০ খ্রিষ্টাব্দ) এসে দেখা যায়, নারী সংস্কৃত পড়ার এমনকি বেদ

স্পর্শ করার অধিকারও হারিয়েছে। প্রহসন এই যে চতুর্বেদের শাশ্বত অধিষ্ঠান যাঁর হাতে, তিনি হলেন একজন নারী—বিদ্যার দেবী সরস্বতী।

**বৈদ্য** হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'বৈদ্য' শব্দের অর্থ কবিরাজ। প্রচলিত একটি মতে, দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনকালে ধন্বন্তরীর জন্ম হয় এবং বৈদ্যরা তার উত্তরপুরুষ। অন্য মতে, ধন্বন্তরীর জন্ম হয় জনৈক মুনির বৈদিক মন্ত্র জপের মাধ্যমে খড়ের গাদা থেকে, তাই তিনি বৈদ্য নামে পরিচিত হন। যেহেতু তাঁর পিতা ছিল না এবং তিনি এক পালিতা মায়ের আদর-যত্নে বড় হন, সেহেতু তাঁকে বলা হয় অম্বষ্ঠ। বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি মতও প্রচলিত আছে যে অম্বষ্ঠ নামে সিন্ধু নদের তীরে একটি স্থান ছিল এবং সেখান থেকে বৈদ্যদের একটি দল দক্ষিণ ভারতে এবং অন্য একটি দল বাংলায় আসে।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের বর্ণনানুসারে ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্যমাতার সন্তানেরা অম্বষ্ঠ এবং দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমার ব্রাহ্মণী স্ত্রীর সন্তানরা বৈদ্য। বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ উভয়ই সৎশূদ্র। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বৈদ্যবর্ণের উল্লেখ না থাকলেও অম্বষ্ঠদের উত্তম সংকর-শূদ্র উপবর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেন, সেনগুপ্ত, রক্ষিত, দাশ, দাশগুপ্ত, দত্ত, সরকার, কর, রায়, মল্লিক প্রভৃতি উপাধির সাধারণত বৈদ্য। ব্রিটিশ আমলে তারা বর্ণহিন্দু হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং শিক্ষায় বিশেষ উন্নতি লাভ করে।

**বৈশেষিক দর্শন** এক মতে, এই দর্শনে 'বিশেষ' নামে একটি অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকৃত, তাই এর নাম হয়েছে 'বৈশেষিক'। অন্য মতে, ভারতীয় দর্শনগুলোর মধ্যে চীনদেশে সর্বপ্রথম প্রচারিত হয়েছিল সাংখ্য, তারপর বৈশেষিক এবং চীনাদের কাছে এই দর্শন সাংখ্য থেকে বিশিষ্ট ও উৎকৃষ্ট প্রতীয়মান হওয়ায় এর নাম হয় বৈশেষিক। বৈশেষিক দর্শনের উদ্ভবকাল খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক বলে মনে করা হয়। একে একসময় সকল শাস্ত্রের উপকারক মনে করা হতো। বৈশেষিক সূত্রের রচনাকাল গৌতমের ন্যায়সূত্রের কিছু আগে। এই দর্শনের প্রবর্তক কণাদ বা উলূক। বৈশেষিক দর্শনে সাতটি পদার্থ স্বীকৃত। যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। জগতের সবকিছুই এই সপ্ত পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের জ্ঞানের মাধ্যমে পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হলে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। বৈশেষিকেরা পরমাণুকারণবাদী বলে সমধিক প্রসিদ্ধ।

**বৈশ্য** হিন্দুদের চতুর্বর্ণের তৃতীয় বর্ণ। 'বৈশ্য' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হলেও তা মূলত ব্যবসায়ী বর্ণ ও সম্প্রদায়কেই নির্দেশ করে। পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের প্রধান পেশা। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে একটি বিশিষ্ট ও উদীয়মান ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে। তারা অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে বৈশ্য একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট উপবর্ণ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি। বাংলায় তাম্বুলি ও স্বর্ণকার নামে বহু উপবর্ণের মানুষের উল্লেখ আছে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল। বর্তমান বাংলাদেশে সাহা, কুণ্ডু ও বণিকেরা নিজেদের বৈশ্য বলে পরিচয় দেয়।

**বৈষ্ণব ধর্ম** বৈষ্ণব ধর্ম বলতে ভগবান বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে ভক্তির মাধ্যমে ভজনা করা বোঝায়। এখন বাংলাভাষী অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম গৌড়ীয় ধর্ম-দর্শনের প্রায় সমার্থক, যা প্রধানত কৃষ্ণের আদি রসাত্মক লীলায় ভরপুর। এই ধর্ম-দর্শনের প্রেরণা ও প্রতিষ্ঠাতা হলেন চৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩), যাঁর ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে তিনি স্বয়ং ভগবান পরমেশ্বর কৃষ্ণের যুগলসত্তাস্বরূপ। খুব সহজভাবে কৃষ্ণের সংকীর্তন বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম করেছে।

চৈতন্য রাধাকৃষ্ণের তত্ত্বভিত্তিক বৈষ্ণব মতবাদ এক নতুন পথের সন্ধান দেয়, যার ফলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রায় সমগ্র ভারতে সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। বৈষ্ণব ধর্মের আধ্যাত্মিকতার অবনতি ঘটে যখন বৈষ্ণবেরা ঈশ্বরপ্রেমের পরিবর্তে লৌকিক প্রেমে জড়িয়ে পড়েন।

রাধাকৃষ্ণের প্রতি মানুষের অনুরাগকে উচ্চ অধ্যাত্মমার্গে উন্নীত করে ধর্মের এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে প্রচার করেন। তিনি ধর্মের নিছক আচার-আনুষ্ঠানিকতাকে বর্জন করে ধর্মের নৈতিকতাকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেন।

ভক্তিবাদের পরিশোধন এবং একে উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিক চেতনা ও নৈতিকতায় উন্নীত করার মাধ্যমে চৈতন্যসহ অন্যান্য বৈষ্ণবপণ্ডিত মধ্যযুগীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ধর্ম প্রচারে তাঁদের মূল নীতি ছিল : ক. দেশীয় ভাষায় ধর্ম প্রচার করা; খ. বর্ণপ্রথার বিলোপসাধন ও সব বর্ণের লোকদের সমান মর্যাদা দেওয়া এবং গ. অপ্রয়োজনীয় আচারগুলো বর্জন করে নৈতিকতা ও আত্মার পবিত্রতার ওপর গুরুত্বারোপ করা। রামানন্দ স্বামী এবং চৈতন্যদেব ছাড়া অন্যান্য বৈষ্ণব পণ্ডিত মূর্তিপূজাকেও সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন।

**বোধিসত্ত্ব** 'বোধি' অর্থ জ্ঞান এবং 'সত্ত্ব' অর্থ প্রাণী বা জীব। এখানে বোধি বলতে সেই জ্ঞানকে বোঝায়, যার অনুশীলনে জীবের দুঃখনিবৃত্তি ঘটে। এ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং প্রতিজন্মেই অপরের দুঃখনিবৃত্তির জন্য কাজ করতে হয়। কথিত আছে যে, সিদ্ধার্থ গৌতম ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করে জগতের সব জীবের মুক্তি কামনা করেন। এই পূর্বজন্মসমূহে তাঁকে বোধিসত্ত্ব বিশেষণে ভূষিত করা হয়। এভাবে বোধিসত্ত্ব হিসেবে সাধনা করে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে (খ্রিষ্টপূর্ব ৫২৮) বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। ওই সময় তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে অতীত জীবনের সকল কথা স্মরণ করেন, যা জাতকের গল্প হিসেবে সংরক্ষিত হয়েছে। মহাযান বৌদ্ধধর্মে বোধিসত্ত্বের আদর্শকে সর্বোচ্চে স্থান দেয়।

জন্মের ক্রমানুসারে বোধিসত্ত্বের বিভিন্ন রূপ কল্পনা করা হয়। তাঁর প্রথম রূপ হচ্ছে অবলোকিতেশ্বর। অবলোকিতেশ্বর করুণার আধার। তারপর মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব। তিনি প্রজ্ঞার আধার। অতঃপর বজ্রপাণি, বজ্রগর্ভ, ক্ষিতিগর্ভ, রত্নগর্ভ, আকাশগর্ভ, সূর্যগর্ভ, মৈত্রেয় প্রভৃতি বোধিসত্ত্বের কল্পনা করা হয়। বোধিসত্ত্বের এরূপ রূপকল্পনা মূলত গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মসমূহের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। বোধিসত্ত্বের এ ধারণা ভারতবর্ষ থেকে এশিয়ার সমগ্র অঞ্চলে, যথা—চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, নেপাল, তিব্বত, ভুটান, সিকিম প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বোধিসত্ত্বের যাঁরা বড়, তাঁরাই মহাসত্ত্ব

**বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী** বৌদ্ধ দেবতা। প্রায় সব দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করে। ভিন্ন ভিন্ন নামে তাঁর নানা প্রতিমূর্তি আছে, যথা : মঞ্জুবজ্র, মঞ্জুবর, মঞ্জুঘোষ, ধর্মধাতু বাগীশ্বর, ধর্মচক্রমঞ্জুশ্রী, নামসঙ্গীতি মঞ্জুশ্রী ইত্যাদি।

মঞ্জুশ্রীর মুখমণ্ডল তিনটি এবং সেগুলো হলুদ, সবুজ ও সাদা বর্ণের। তিনি ষড়্ভুজা। তাঁর ডান দিকের তিন হাতে তরবারি, বরদামুদ্রা ও তির এবং বাঁ দিকের তিন হাতে *প্রজ্ঞাপারমিতা* গ্রন্থ, নীলপদ্ম ও ধনু। তিনি তরবারি দ্বারা সমস্ত অজ্ঞানতাকে দূরীভূত এবং *প্রজ্ঞাপারমিতা* গ্রন্থ দ্বারা সবাইকে সর্বোৎকৃষ্ট অতীন্দ্রিয় জ্ঞানদান করেন। মহাযান বা বজ্রযানী বৌদ্ধমন্দিরগুলোয় অবলোকিতেশ্বরের পর মঞ্জুশ্রীর অবস্থান। অধিবিদ্যামূলক জ্ঞানের দেবতা হিসেবে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী খ্রিষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

**বৌদ্ধধর্ম** শাক্যমুনি বা গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জীবনদর্শন ও নীতিবিধান তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মমত। মূলত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে এর পার্থক্য খুবই অল্প ছিল। তবে এই ধর্মমতে আচার-অনুষ্ঠানের বাহুল্য নেই এবং এতে অহংবোধ ও পার্থিব মায়া বর্জনের ওপর জোর দেওয়া হয়। বুদ্ধের 'চারিটি মহা সত্য' হচ্ছে : অস্তিত্বই দুঃখের কারণ। দুঃখের মূলে বাসনা, বাসনার নিবৃত্তিতেই দুঃখের নিবৃত্তি এবং মহান 'অষ্টনীতি' (অষ্টপন্থা) অনুসরণেই বাসনা নিবৃত্তির উপায় নিহিত। এই 'অষ্টনীতি' হলো : সৎ-বিশ্বাস, সৎ-সংকল্প, সৎ-বাক্য, সৎ-আচরণ, সৎ-বৃত্তি বা সৎ-জীবনযাপন, সৎ-চেষ্টা, সৎ-চিন্তা বা সৎ-মনোভাব, এবং সৎ-সাধনা। বুদ্ধের মতে, ধর্মপ্রাণ মানুষের পরম লক্ষ্য হচ্ছে অস্তিত্ব থেকে মুক্তি বা নির্বাণ লাভ। বুদ্ধের এই নির্বাণতত্ত্ব বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে দ্রুত প্রচারিত হতে থাকে এবং অল্প সময়ের জন্য ভারতে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক) বৌদ্ধধর্ম চরম উন্নতি লাভ করে। পরবর্তীকালে ভারতে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, কিন্তু সিংহল ও ব্রহ্মদেশে সহজতর ও 'বিশুদ্ধতর' আকারে (হীনযান মতবাদ) তার অস্তিত্ব টিকে

থাকে। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে কোরিয়া হয়ে জাপানে প্রসার লাভ করে। এখানে কয়েকটি দেবতা ও স্থানীয় ধর্মের কিছু অংশ যুক্ত হয়ে বৌদ্ধধর্মের 'মহাযান' মতবাদের সৃষ্টি হয়। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম লামাতন্ত্র রূপ লাভ করে। পরবর্তী আমলে বৌদ্ধধর্মে বহু সম্প্রদায় ও আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এসবের মধ্যে 'জেন (=ধ্যান) বৌদ্ধ' ধর্মমত (Zen Buddhism) জাপানে খুব প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। বৌদ্ধধর্ম ও বুদ্ধের জীবনের ওপর ভিত্তি করে রচিত গ্রন্থ: *ভগবান বুদ্ধ* (রণধীর বড়ুয়া); *তথাগত বুদ্ধ* (অমলেন্দু দাশগুপ্ত); *মহাশান্তি মহাপ্রেম* (শীলানন্দ ব্রহ্মচারী); *গৌতমবুদ্ধ* (ড. বিমলাচরণ নাথ), *অমিতাভ* (নবীনচন্দ্র সেন); *বুদ্ধদেব* (সতীশ-চন্দ্র বিদ্যাভূষণ); *অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত* (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর); *শাক্যমুনি চরিত* (অঘোরনাথ গুপ্ত); *গৌতমবুদ্ধ* (ত্রিভঙ্গ রায়); *বুদ্ধদেব চরিত* (গিরিশচন্দ্র ঘোষ); *বাংলায় বৌদ্ধধর্ম* (নলিনীনাথ দাশগুপ্ত); *জাতকের গল্প* (গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া); *গৌতম বুদ্ধের গল্প* (শ্রীউপগুপ্ত) ও *গৌতমের পুনর্জন্ম* (নরেন্দ্র দেব)।

**বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা** ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ এবং বৌদ্ধসমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে ১৮৯২ সালের ৫ অক্টোবর এটি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে কৃপাশরণ মহাস্থবির ও সুরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী। এ সভার উদ্যোগেই কলকাতায় নির্মিত হয় ধর্মাঙ্কুর বিহার। ১৯০৩ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে এর উদ্বোধন করা হয় এবং এর সঙ্গে যুক্ত থেকেই খ্যাতি অর্জন করেন বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ ও ভারততত্ত্ববিদ বেণীমাধব বড়ুয়া।

**বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট** বাংলাদেশি বৌদ্ধদেব ধর্মীয় উন্নয়নকল্পে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৮৪ সালে গঠিত একটি স্থায়ী প্রকল্প। এর উদ্দেশ্য বৌদ্ধদের ধর্ম পালন ও উপাসনালয়গুলো রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করা। এ লক্ষ্যে পদাধিকারবলে ধর্মমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে তিন বছর মেয়াদি সাত সদস্যের একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। বর্তমানে ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধবিহারে এর দপ্তর অবস্থিত।

**বৌদ্ধবিহার** বিহার বা মঠ প্রধানত বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ভিক্ষুদের বাসস্থান, ধর্মীয় আচারাদি পালন ও ধ্যান করার স্থান এবং বৌদ্ধশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে একে চিহ্নিত করা যায়। ভিক্ষুদের জন্য লিখিত বৌদ্ধধর্মের অনুশাসনমূলক গ্রন্থগুলো থেকে পাঁচ ধরনের আবাসনের (পঞ্চ লেনাণী) কথা জানা যায়। সেগুলো হচ্ছে: বিহার, আদ্যযোগ, পাসাদ, হাম্মীয় ও গুহা। এগুলোর মধ্যে টিকে আছে শুধু বিহার (মঠ) ও গুহা।

**বৌদ্ধশিক্ষা চিন্তা** বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটানোর লক্ষ্য থেকে বৌদ্ধশিক্ষার চিন্তার সূত্রপাত ঘটে। বৌদ্ধশিক্ষা দুই স্তরে বিভক্ত ছিল। প্রাথমিক স্তরে পড়া, লেখা, অঙ্ক, ব্যাকরণ এবং বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি এবং উচ্চস্তরে ধর্ম, তুলনামূলক ধর্ম, বেদ উপনিষদ ও ত্রিপিটক পড়ানো হতো। বৌদ্ধ শিক্ষাক্রম আট থেকে ২০ বছর মেয়াদি। বৌদ্ধ দর্শনমতে চারিত্রিক শুদ্ধতাই ধর্মচর্যার মূল ভিত্তি। চরিত্র শুদ্ধ না হলে অধ্যাত্ম কিংবা গার্হস্থ্য জীবনে উৎকর্ষ লাভ সম্ভব নয়। দুঃশীলতা ও দুর্নীতি পরিত্যাগের মাধ্যমে চরিত্র শোধন করা সম্ভব। বুদ্ধ-নির্দেশিত শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন অপরিহার্য। চিত্তের পরিশোধন মানে কামক্রোধাদি চৈতিক রিপুগুলোর মূলোৎপাটনপূর্বক চিত্তকে শুদ্ধ ও ক্লেশশূন্য করা। প্রজ্ঞা ভাবনার শেষ সীমায় উপনীত হলে সাধক রিপুমুক্ত হন। এ অবস্থায় তাকে বলা হয় অর্হৎ। অর্হৎদের অন্তরে কোনো ধরনের বন্ধন থাকে না। বন্ধনহীন অবস্থাই জীবনের পরম অর্জন, পরম বিশুদ্ধি, যা বিশুদ্ধমার্গ দ্বারা আয়ত্ত করা যায়।

**ব্যক্তিনিষ্ঠতা** (Subjectivity) প্রত্যয়টি ভাববাদী দর্শনের অন্তর্গত অন্যতম মতবাদ। এ মতে, ব্যক্তি বা বস্তুর অস্তিত্বের বাইরে ওই ব্যক্তির বা বস্তুর বিদ্যমানতা স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই বাস্তবতা, সত্য, সততা এবং সৌন্দর্যের একমাত্র মাপকাঠি। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে গভীর আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মাধ্যমে কেবল ঈশ্বর, ধর্ম, সত্য প্রভৃতির প্রকৃত অস্তিত্ব জানা

যায়। বিশেষ করে, বৌদ্ধধর্মে এজাতীয় রহস্যময় আত্মিক অভিজ্ঞতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সুফিবাদীরাও এই রহস্যময় আত্মিক অভিজ্ঞতাকে বিশেষ মূল্যবান মনে করেন।

**ব্যাস্ট** মিসরীয় মার্জারি দেবী। তাঁর মস্তক সিংহ আকৃতির। তিনি সূর্যের ইতিবাচক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন।

**ব্রজ** মথুরা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। এই ব্রজভূমিতে ১২টি বন, উপবন, প্রতিবন ও অধিবন ছিল, যা শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বলে খ্যাত।

**ব্রত** পার্থিব কল্যাণ কামনায় ইষ্টদেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে হিন্দু নারীরা যে আচারানুষ্ঠান পালন করে, তাকে বলা হয় ব্রত।

**ব্রতকথা** যেসব কাহিনির সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের কোনো ব্রত বা অনুষ্ঠান জড়িত থাকে, তাকে ব্রতকথা বলে। এমন অনেক কাহিনি আছে, যেখানে কোনো বিশেষ লৌকিক দেবতার বিশেষ অনুগ্রহে কোনো ইষ্টসাধনের বিবরণ পাওয়া যায়। কালক্রমে সাধারণ সমাজে তা-ই ব্রতকথায় রূপ নেয়। ব্রত অনুষ্ঠানে কাহিনিগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হয়। হিন্দুসমাজে এমন কাহিনিকে কেন্দ্র করে 'সংকটের ব্রত', 'সন্তান ব্রত', 'বিবাহ ব্রত' ইত্যাদি নানা ব্রতকাহিনির উদ্ভব হয়েছে। অষ্টম/নবম শতাব্দী থেকে ব্রতকথার মধ্যে বঙ্গীয় হিন্দু নারীর ধর্ম ও সামাজিক বুদ্ধি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রতকথা গদ্যে, পদ্যে অথবা গদ্য-পদ্য কোনো একটি বিশেষ দেবীকে অবলম্বন করে রচিত হতো। দেবতার মূর্তি মাটি ও চালের গুঁড়ার সাহায্যে তৈরি করা হতো। দেবতাদের মধ্যে থুয়া, লাউল, ভাদুলি ও সেঁজুতির উল্লেখ দেখা যায়। সূর্যঠাকুর ও শিবঠাকুরের নামও উল্লেখযোগ্য। *গোপীচন্দ্রের গান, মহীপালের গান, মিবায়ন,* বিভিন্ন *মঙ্গলকাব্য, মৈয়মনসিংহ গীতিকা* ও *পূর্ববঙ্গ গীতিকার* মধ্যে ব্রতকথার উল্লেখ দেখা যায়।

**ব্রতনৃত্য** ব্রতের সঙ্গে পরিবেশিত নৃত্যই ব্রতনৃত্য। ব্রতানুষ্ঠান সম্মিলিতভাবে পালিত হয় এবং এর উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই নারীরা ব্রতনৃত্য করে থাকে। ব্রতের ছড়া বা গানে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যেসব কামনা-বাসনা প্রকাশ পায়, সেসবের প্রতিফলন ঘটে ব্রতনৃত্যে।

ব্রতনৃত্যে ইহজাগতিক যেসব কামনা-বাসনার প্রকাশ ঘটে, তাতে কোনো জটিল দর্শন নেই, আছে জীবনের কথা। অধিকাংশ নৃত্যে কিশোরী মেয়েরাই অংশ নেয়। সধবা নারীরা সাধারণত সূর্যব্রত, কার্তিকব্রত ও মেঘরানির কুলা নামানো ব্রতে অংশ নেয়। শেষোক্ত ব্রতে কয়েকজন সধবা নারী মাথায় ঘোমটা দিয়ে ডান হাতে আঁচল টেনে ধরে এবং মাথায় কুলা নিয়ে ছড়া বলতে বলতে নাচের ভঙ্গিতে ব্রতের স্থান কয়েকবার প্রদক্ষিণ করে।

**ব্রহ্মা** হিন্দু ধর্মশাস্ত্রমতে তিনি সর্বসৃষ্টিকর্তা, অব্যয়, অব্যক্ত, সর্বব্যাপক, স্বয়ম্ভূ , স্বমহিমায় অদ্বিতীয়, অদৃশ্য, আদি, অন্তহীন, কালের সীমার অতীত। সমস্ত জিনিসই তাঁর সৃষ্টি এবং সমস্তই তাঁর মধ্যে বিলীন হয়। এক কথায় সবকিছুই ব্রহ্মা।

**ব্রহ্মচর্য** চতুরাশ্রম ধর্মের প্রথম আশ্রম। উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে আট থেকে ১২ বছর বয়সে যিনি এই আশ্রম গ্রহণ করবেন, তিনি কৈশোরের উপনয়নের পর নিয়মপূর্বক বেদাধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহে অবস্থান করবেন। এই সময় ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক প্রতিদিন স্নান, শুদ্ধভাবে দেব, ঋষি ও পিতৃতর্পণ, দেবপূজা এবং সায়ং প্রভাতকালে হোম করবেন। ব্রহ্মচারীর পক্ষে মধু ও মাংস ভোজন, গন্ধদ্রব্য সেবন, মাল্যাদি ধারণ, গুড় প্রভৃতির রসগ্রহণ এবং স্ত্রীসম্ভোগাদি নিষিদ্ধ। তিনি আচার্যের প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ ও প্রতিদিন ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করবেন। জীবনের চতুর্থ ভাগ গুরুগৃহে প্রত্যাবর্তন করে যিনি ইন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তিবৃদ্ধির জন্য আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন, তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।

**ব্রহ্মদত্ত** রামায়ণ-বর্ণিত কাম্পিল্যায়ন রাজ্যের রাজা। তাঁর পিতা চুলী, মাতা গন্ধর্বকন্যা সোমদা। রাজা কুশনাভের এক শত কন্যাকে বায়ু বিয়ে করতে চান। কিন্তু কুশনাভ বায়ুকে কন্যাদান করতে অসম্মত হলে বায়ুর অভিশাপে শতকন্যার সকলেই বিকলাঙ্গ হয়ে যান। ব্রহ্মদত্ত বিকলাঙ্গ কন্যাদেরকে বিয়ে করেন। এবং তিনি তাঁর স্ত্রীদের পাণি স্পর্শ করামাত্র তাঁরা দেহসৌন্দর্য ফিরে পান।

**ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়** (১৮৬১-১৯০৭) জন্ম কলকাতায়। পূর্বনাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় বক্তৃতা করে খ্যাতি লাভ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বন্ধুদের অনুরোধে তিনি আবার হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হন। *টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি* এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় *সন্ধ্যাসহ* কয়েকটি সংবাদপত্র তিনি সম্পাদনা করেন।

**ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ** ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীতে দীক্ষিত হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থ। এটি মূলত একটি উপপুরাণ। মূল পুরাণের সংখ্যা ১৮ এবং সেগুলো ছাড়া লেখকবিহীন পুরাণগুলোকে উপপুরাণ বলে। এটিকে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলা হয়, কারণ এ পুরাণে ব্রহ্মাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এতে বৈদ্য, গণক, ভট্ট, প্রভৃতি বর্ণের উৎপত্তির বর্ণনা আছে।

**ব্রহ্মশির অস্ত্র** ব্রহ্মতেজপূর্ণ অস্ত্র। অর্জুন এই অস্ত্র মহাদেবের কাছ থেকে লাভ করেন। দ্রোণাচার্য এই অস্ত্র তাঁর পুত্র অশ্বত্থামাকে দান করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন এবং অশ্বত্থামা উভয়েই পরস্পরের প্রতি ব্রহ্মশির নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলে নারদ ও ব্যাস মুনি উভয়েই অস্ত্র সংবরণ করতে বলেন। অর্জুন নিজ অস্ত্র প্রত্যাহার করেন। কিন্তু অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির প্রত্যাহার করতে অসমর্থ হলে প্রলয়াগ্নির মতো প্রজ্বলিত এই অস্ত্র পাণ্ডব নারীদের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়।

**ব্রহ্মর্ষি** হিন্দু শাস্ত্রমতে, যে মহাতপস্বী বা ঋষি ব্রহ্মার কাছে গমন করার ক্ষমতা রাখেন, তাঁরাই ব্রহ্মর্ষি। কশ্যপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা ও অত্রি—এই ঋষিদের গোত্রে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের সকলেই ব্রহ্মর্ষি।

**ব্রহ্মসংগীত** ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা সংগীত। ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) এর রূপকার। তাই ধর্মের কঠিন তত্ত্বালোচনায় সংগীতের নান্দনিকতা ব্যবহার করে তিনি ব্রাহ্মধর্মের বিকাশসাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধন করে একেশ্বরবাদিতার যে আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন, সেই আদর্শ বাস্তবায়নের সহায়ক শক্তি ছিল এই ব্রহ্মসংগীত। এই সংগীত বাংলা সংগীতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

রামমোহন কর্তৃক ১৮১৫ সালে আত্মীয় সভা গঠন এবং ১৮২৮ সালে নিজগৃহে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মসংগীত চর্চার প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়। অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজের প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এই ব্রহ্মসংগীত পরিবেশিত হতো।

**ব্রহ্মা** হিন্দুধর্মের প্রধান তিন দেবতার একজন। অন্য দুজন বিষ্ণু ও শিব। বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা 'প্রজাপতি' নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। ঋগ্‌বেদসহ বৈদিক সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থে ব্রহ্মার উল্লেখ পাওয়া যায়। অনন্তশয্যায় শয়ান বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে তাঁর প্রকাশ। তিনি বৈদিক যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত এবং সাধারণত চতুর্মুখ, চতুর্ভুজ ও হংসবাহনরূপে কল্পিত। তিনি উন্নত দেহের অধিকারী এবং তাঁর গায়ের রং রক্তাভ গৌরবর্ণ। তাঁর চার হাতে থাকে কমণ্ডলু, স্রক, ঘৃতপাত্র বা পুস্তক এবং অক্ষমালা।

তাঁর প্রথমে পাঁচটি মস্তক ছিল। কিন্তু শিবের তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে তাঁর একটি মস্তক দগ্ধ হয়ে যায়। তাঁর বাহন হংস। সরস্বতী তাঁর স্ত্রী। দেবসেনা ও দৈত্যসেনা তাঁর দুই কন্যা। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ ও নারদ—এই ১০ জন প্রজাপতিকে ব্রহ্মা তাঁর মন থেকে সৃষ্টি করেন এবং প্রজাপতিদের থেকেই ব্রহ্মার নাম হয় বিধাতা। ঋগ্‌বেদে তাঁকে ব্রাহ্মণপতি বা বৃহস্পতি বলা হয়েছে। যেহেতু সৃষ্টিকে বলা হয় প্রজা, তাই ব্রহ্মার আরেক নাম প্রজাপতি। পুরাণমতে, ব্রহ্মা নিজের দেহের অধিকাংশ শতরূপা নামে এক নারী সৃষ্টি করেন। এই শতরূপা তাঁর এক স্ত্রী। সৃষ্টি একবার ধ্বংস হলে ব্রহ্মা তা পুনর্বার সৃষ্টি করেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র ও নাট্যশাস্ত্রের প্রবক্তা।

কুম্ভকারের চক্রে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে ব্রহ্মার পূজা হয়। এ ছাড়া বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও ব্রহ্মাপূজার আয়োজন করা হয়। পূজার স্বাভাবিক উপকরণের সঙ্গে বিশেষভাবে লাল ফুলের ব্যবস্থা থাকে। এ পূজার নির্দিষ্ট কোনো তারিখ নেই এবং পূজার সময় ঢাক বাজানো হয় না। উপমহাদেশের বাইরে চীন, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা স্থানে ব্রহ্মার ভাস্কর্য লক্ষিত হয়। বিবাহের লগ্নপত্রে, সূতিকাগৃহে, শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিনে

এবং বাস্তুপ্রতিষ্ঠার সময় ব্রহ্মাকে স্মরণ করা হয়।

**ব্রহ্মানন্দ স্বামী** (১৮৬৩-১৯২২ খ্রি.) জন্ম চব্বিশ পরগনা জেলার শিকরা-কুলীন গ্রামে। পিতা আনন্দমোহন ঘোষ। ছাত্রজীবনে বিবেকানন্দের সাহচর্যে আসেন এবং পরে রামকৃষ্ণদেবের কাছে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সভাপতি।

**ব্রহ্মাস্ত্র** ব্রহ্মতেজোময় পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ।

**ব্রাহ্মণ** হিন্দুদের চতুর্বর্ণের প্রথম বর্ণ। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে নব্বইসংখ্যক পুরুষসূক্তের বর্ণনা অনুসারে ব্রাহ্মণের জন্ম পুরুষের (স্রষ্টার) মুখ থেকে। মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, ব্রহ্মা প্রথমে সমস্ত জগৎ ব্রাহ্মণময় করেছিলেন, পরে কর্মানুসারে সকলে নানা বর্ণত্বপ্রাপ্ত হয়; কেউ হয় ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য, কেউ বা শূদ্র। মহাভারতে আরও বলা হয়েছে, যিনি সদাচারী ও সর্বভূতে মিত্রভাবাপন্ন, যিনি কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ ত্যাগ করেছেন, যিনি সন্তোষকারী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও শাস্ত্রজ্ঞ, তিনিই ব্রাহ্মণ। গুণ ও কর্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের সৃষ্টি, জন্মানুসারে নয়। পরবর্তীকালে অবশ্য জন্মসূত্রে বর্ণ নির্ধারণ-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়।

**ব্রাহ্মসভা** হিন্দুধর্মসংস্কারক রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) কর্তৃক ১৮২৮ সালের আগস্ট মাসে এটি প্রতিষ্ঠিত। রামমোহন ধর্মীয় সত্য অনুসন্ধানে সব গুরুত্বপূর্ণ ধর্মের শাস্ত্রগুলো অধ্যয়ন করেন। এভাবে তিনি সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলো, আরবি ভাষায় পবিত্র কোরআন এবং হিব্রু ও গ্রিক ভাষায় বাইবেল পাঠ করেন। বিভিন্ন ধর্ম অধ্যয়নে তাঁর মনে এই দৃঢ়প্রত্যয় জন্মায় যে যেহেতু প্রত্যেক ধর্মেরই উদ্দেশ্য অভিন্ন, যথা—মানবজাতির নৈতিক পুনর্জাগরণ, তাই পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রতিটি ধর্মের পুনর্ব্যাখ্যা ও পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে তাঁর পক্ষে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণের পেছনে কোনো যুক্তি নেই। তিনি প্রতিটি ধর্মের গোঁড়ামি, শাস্ত্রীয় আচার পালন ও কুসংস্কার বাদ দিয়ে সর্বজনীন নৈতিক উপদেশাবলি গ্রহণ করলেন। ১৮২৮ সাল নাগাদ তাঁর ধর্মীয় ধ্যানধারণা কিছুটা স্পষ্ট রূপ লাভ করে। ওই বছরের আগস্ট মাসে তিনি ব্রাহ্মসভা (পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মসমাজ) অর্থাৎ ঈশ্বরের সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও এই নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের তাত্ত্বিক দাবি ছিল যে এটাকে সর্বজনীন ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, তবুও এটা হিন্দুধর্মেরই একটি শাখায় পরিণত হয় এবং সেভাবেই বিরাজমান। এই নতুন ধর্মবিশ্বাসের ধর্মীয় মতবাদগুলো ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টের দলিলে লিপিবদ্ধ আছে।

**ব্ল্যাসফেমি** ধর্মাবমাননা দ্র.।

## ভ

**ভগদত্ত** মহাভারতে বর্ণিত প্রাগ জ্যোতিষপুরের রাজা নরকাসুরের পুত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি কৌরবদের পক্ষ গ্রহণ করেন। যুদ্ধের দ্বাদশ দিনে অর্জুনের ওপর তিনি পিতৃপ্রদত্ত বৈষ্ণবাস্ত্র প্রয়োগ করলে অর্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণ তা ব্যর্থ করে দেন এবং অর্জুনের অর্ধচন্দ্র বাণে তাঁর মৃত্যু হয়।

**ভগবৎ পুরাণ** ব্যাস রচিত হিন্দু শাস্ত্রবিশেষ। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে বৃত্রাসুরের পরাজয় ও মৃত্যু এর মূল বিষয়। এর ১০ম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে।

**ভগীরথ** ইক্ষাকুবংশের রাজা দিলীপের পুত্র। মাংসপিণ্ডরূপে জন্মগ্রহণ করলেও পরে অষ্টাবক্র মুনির ইচ্ছাক্রমে তিনি রূপবান হন। তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা গঙ্গা নদীকে প্রথমে স্বর্গ থেকে শিবের জটায় ও পরে শিবের জটা থেকে মর্তে আনেন। গঙ্গার স্রোতোধারার স্পর্শে সগরের পুত্ররা পুনরায় প্রাণ লাভ করে স্বর্গে যান। ভগীরথের নামানুসারে গঙ্গার একটি শাখার নাম ভাগীরথী।

**ভজন** এক ধরনের আধ্যাত্মিক ভক্তিগীতি। সংগীতের মাধ্যমে দেব-দেবী এবং ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার উপাসনার লক্ষ্যে এ গানের সৃষ্টি। ভজন ভক্তিরস প্রধান গান এবং অধ্যাত্মবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর উৎপত্তি ঠিক কোন সময়ে, তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। প্রথম পর্যায়ে হিন্দুদের যেকোনো ভক্তিগীতিই ভজন নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু ভারতীয় সংগীতের স্বর্ণযুগ হিসেবে খ্যাত ষোড়শ শতকে ভজন ব্যাপক

প্রসার লাভ করায় তা আর কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেনি। তখন বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রার্থনাসংগীত হিসেবে বহু ভজন রচিত হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক সুফি সাধক, সন্ত, কবি ও গায়ক-গায়িকা ভজন গানের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন।

**ভদন্ত** থেরবাদী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক সম্বোধন। এর প্রতিশব্দ ভদন্ত, ভন্তে, ভদন্তে ইত্যাদি। শব্দটির বাংলা অর্থ ভক্তিভাজন, শ্রদ্ধেয়, পূজনীয় ইত্যাদি। অভিনন্দনজ্ঞাপক বাক্য 'ভদ্দংতে' অর্থাৎ 'আপনাকে অভিনন্দন'। এই সম্বোধন থেকেই 'ভদন্ত' শব্দের উৎপত্তি। বিশেষত, ধর্মীয় শ্রদ্ধাবোধে সম্মান জ্ঞাপনার্থে 'ভদন্ত' বা 'ভন্তে' শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। পালি সাহিত্যে বুদ্ধকে সম্বোধন করতে 'ভদন্ত' বা 'ভন্তে' শব্দ ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে। থেরবাদ-অধ্যুষিত দেশে বৌদ্ধ জনসাধারণ ভিক্ষুদের সম্বোধন করতে 'ভন্তে' শব্দ ব্যবহার করে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের থেরবাদী বৌদ্ধরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এভাবেই সম্বোধন করে থাকেন।

**ভদ্রকালী** হিন্দু পুরাণমতে, দুর্গার অপর নাম। ষোড়শ হস্তযুক্তা ভদ্রকালীরূপিণী দুর্গা যখন মহিষাসুরকে বধ করেন, তখন অসুর এই প্রার্থনা করে যে মৃত্যুর পর সে যেন দেবীর অনুগ্রহ পায়। দেবী তার কামনা পূরণ করে এই বর দান করেন যে মৃত্যুর পরও মহিষাসুর তাঁর পদলগ্ন থাকবে। সেই কারণে দুর্গাপূজার সময় উগ্রচণ্ডী ভদ্রকালী দুর্গার সঙ্গে মহিষাসুরও পূজা পায়।

**ভবঘুরে ইহুদি** খ্রিষ্টীয় সমাজের জনশ্রুতি অনুযায়ী অভিশপ্ত ইহুদি। যিশুখ্রিষ্ট যখন ক্রুশকাঠ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন জনৈক ইহুদি তাঁকে লক্ষ করে বিদ্রূপ করে বা তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সেই ইহুদি পৃথিবীতে ভবঘুরে জীবন যাপন করবে বলে অভিশপ্ত হয়। পশ্চিম ইউরোপে এই কাহিনি সুপরিচিত। অঞ্চলবিশেষে এই কাহিনি ভিন্নরূপে প্রচলিত। স্পেন ও পর্তুগালের কাহিনি অনুযায়ী উল্লিখিত ইহুদি পরে অনুতপ্ত হৃদয়ে মুক্তি কামনায় সারা জীবন পুণ্য সঞ্চয় করে বেড়ায়। ইউরোপের সুবিখ্যাত কবি ও নাট্যকারেরা এই কাহিনি অবলম্বনে নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

**ভবানী** দুর্গার অপর নাম।

**ভবিষ্যপুরাণ** হিন্দু শাস্ত্রবিশেষ। পূজাপ্রণালি এর প্রধান আলোচ্য বিষয়। ভবিষ্যতে কী ঘটবে, তা-ও এতে লিপিবদ্ধ আছে। এই পুরাণের দেবতা শিব।

**ভরত** ১. রামায়ণ অনুসারে অযোধ্যার রাজা দশরথের মধ্যম পুত্র। তাঁর মাতা কৈকেয়ী। রাম তাঁর জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। কৈকেয়ীর চক্রান্তে রাম অরণ্যবাসে গেলে তিনি রামের পাদুকা সিংহাসনে রেখে নিজে রামের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজ্য পালন করেন। বনবাস থেকে ফিরে এলে রামকে তিনি তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন। ২. চন্দ্রবংশীয় রাজা। দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। হিন্দু পুরাণমতে, তাঁর নামানুসারে এককালে ভারতের নামকরণ হয় ভারতবর্ষ। ৩. নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরতমুনি।

**ভরতমুনি** ব্রহ্মার অন্যতম শিষ্য। কথিত আছে, ব্রহ্মা চতুর্বেদ থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে নাট্যবেদ সৃষ্টি করেন এবং এই বেদ তাঁর শিষ্য ভরতমুনিকে শিক্ষা দেন। ব্রহ্মার আদেশে ভরতমুনি নাট্যবেদ অবলম্বন করে একটি নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন। এই নাট্যাভিনয়ে শিব তাণ্ডবনৃত্য, পার্বতী লাস্যনৃত্য এবং বিষ্ণু নাট্যরীতি দান করেন। এরপর ভরতমুনি ভারতীয় নাটকের নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যাভিনয়-সম্পর্কিত নাট্যসূত্র গ্রন্থ রচনা করেন, যা *ভরতনাট্যশাস্ত্র* নামে খ্যাত। ভরতমুনির পরিচালনায় *অমৃতমন্থন*, *ত্রিপুরদহ* ও *লক্ষ্মী-স্বয়ংবর* নাটক অভিনীত হয়েছিল।

**ভাদু** পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের একটি কৃষিভিত্তিক উৎসব। ভাদ্র মাসজুড়ে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার হিন্দু ও আদিবাসী মেয়েরা ভাদুর পূজা করে। জনশ্রুতি আছে যে কাশীপুররাজের অবিবাহিতা কন্যার ভাদ্র মাসে মৃত্যু হওয়ায় তাকে স্মরণ করার জন্য এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। একজন বর্ষীয়ান মহিলা 'ভাদ্যেশ্বর্যে নমঃ' বলে ভাদুমূর্তির দিকে ফুল ছুড়ে দেন। এ সময় ভাদুর গান গাওয়া হয়। শেষ দিনে তারা সাশ্রুনয়নে ভাদুকে বিসর্জন দেয়।

**ভানুমতী** ১. মহাভারত অনুসারে জ্যেষ্ঠ কৌরব দুর্যোধনের স্ত্রী। দুর্যোধনের ঔরসে তাঁর গর্ভে পুত্র লক্ষ্মণ ও কন্যা লক্ষ্মণার জন্ম হয়। ২. কনিষ্ঠ পাণ্ডব

সহদেবের পত্নী। যদুবংশীয় রাজা ভানুর কন্যা বলে ভানুমতী নামে অভিহিত। নিকুম্ভ দৈত্য তাঁকে হরণ করলে কৃষ্ণ ও অর্জুন নিকুম্ভকে বধ করে তাঁকে উদ্ধার করেন এবং সহদেবের সঙ্গে বিয়ে দেন। ৩. প্রচলিত লোকশ্রুতি অনুযায়ী লোকশ্রুত রাজা বিক্রমাদিত্যের স্ত্রী। ভোজরাজের কন্যা। জাদুবিদ্যা প্রদর্শনে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল বলে ওই বিদ্যা আজও ভানুমতীর খেল বা খেলা নামে পরিচিত।

**ভার্টামনাস** বসনে-র রোমক দেবতা। তিনি পেমোনার প্রেমিক।

**ভিনাস** রোমান উদ্ভিদের দেবী, পরে গ্রিক অ্যাফ্রোডাইটি বা আফ্রোদিতি বলে পরিগণিত। সাম্রাজ্যের যুগে তিনি ইনিয়াসের মাতা ভিনাস জেনেট্রিক্স্, সৌভাগ্যদাত্রী ভিনাস ফেলিক্স্, বিজয়ের-ধাত্রী ভিনাস ভিকট্রিকস এবং সতীত্ব রক্ষাকারী ভিনাস ভারটিকরডিয়া হিসেবে পূজিতা হতেন। তাঁর বিখ্যাত মূর্তিগুলো হচ্ছে মিলোসের ভিনাস এবং মেডিচির ভিনাস বা মেডিসিয়ান অ্যাফ্রোডাইটি।

**ভীম** মহাভারত-বর্ণিত দ্বিতীয় পাণ্ডব। হস্তিনাপুরের রাজা পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র। কুন্তির গর্ভে বায়ুর ঔরসে তাঁর জন্ম। তিনি এবং দুর্যোধন একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন। বায়ুর ঔরসজাত বলে তাঁর অপর নাম বায়ুপুত্র। বৃক নামক অগ্নি তাঁর উদরে প্রবেশ করে বলে তিনি বৃকোদর নামে পরিচিত এবং অতিভোজনে বাধ্য হন। ভীম শ্মশ্রুগুম্ফহীন। তাঁর দেহে অযুত হস্তীর বল ছিল। বলরাম ও দ্রোণাচার্যের কাছে তিনি অস্ত্রশিক্ষা করেন এবং গদাযুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর বলে পরিচিত হন। বাল্যকালে দুর্যোধন বিষপ্রয়োগে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। দুর্যোধন জতুগৃহে পাণ্ডবদের অগ্নিদগ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করলে ভীম মাতা ও ভ্রাতৃবর্গকে বহন করে গোপন পথে পলায়ন করেন। যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় পরাজিত হয়ে রাজ্যহারা হলে দুর্যোধন ও দুঃশাসন প্রকাশ্য রাজসভায় পঞ্চপাণ্ডব-পত্নী দ্রৌপদীকে অপমান করেন এবং ভীম দুর্যোধনের উরুভঙ্গ ও দুঃশাসনের বক্ষোরক্ত পান করার প্রতিজ্ঞা করেন। বনবাসকালে তিনি বক্, হিড়িম্ব প্রভৃতি রাক্ষসকে বধ করেন এবং হিড়িম্বের ভগ্নি হিড়িম্বাকে বিয়ে করেন। তাঁর ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে সুতসোম ও হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রকে একাকী বধ করেন এবং দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করে ও দুঃশাসনের বক্ষোরক্ত পান করে পূর্বপ্রতিজ্ঞা পালন করেন। যুদ্ধজয়ের পর অন্যান্য ভ্রাতার সঙ্গে স্বর্গে গমনকালে অভিভোজনের পাপে সুমেরু পর্বত শিখরে তাঁর মৃত্যু হয়।

**ভীমা** হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী দেবী দুর্গার অপর নাম। হিমাচলে রাক্ষসেরা যখন মুনিদের ওপর প্রবল অত্যাচার আরম্ভ করে, তখন দুর্গা ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করে রাক্ষসদের বধ করেন এবং মুনিগণকে নিশ্চিন্ত করেন। ভীষণ মূর্তি ধারণ করেন বলেই তাঁর নাম হয় চণ্ডী বা ভীমা।

**ভীষ্ম** মহাভারত-বর্ণিত রাজা শান্তনুর ঔরসে গঙ্গামাতার গর্ভে তাঁর জন্ম। প্রকৃত নাম সত্যব্রত। পূর্বের নাম দেবব্রত। গঙ্গার গর্ভে জন্ম বলে তাঁর অপর নাম গাঙ্গেয় ও নদীজ। তিনি পিতার একমাত্র ন্যায্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু রাজা শান্তনু ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধা বা সত্যবতীকে বিয়ে করতে চাইলে তিনি পিতার বাসনা পূরণে স্বেচ্ছায় সিংহাসনের উত্তরাধিকার ত্যাগ করেন এবং চিরকুমার থাকার প্রতিজ্ঞা করেন। তাঁর এই ভীষণ প্রতিজ্ঞায় মুগ্ধ হয়ে দেবতারা স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করেন। তার পর থেকে তিনি ভীষ্ম নামে অভিহিত হন। পরে সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্র বিচিত্রবীর্য শান্তনুর রাজ্যলাভ করেন। পিতা শান্তনু ভীষ্মকে ইচ্ছামৃত্যুর বর দান করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে ভীষ্ম কৌরব ও পাণ্ডব—উভয় পক্ষকেই যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হওয়ার জন্য বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে যুদ্ধে তিনি কৌরবপক্ষ গ্রহণ করলে দুর্যোধন তাঁকে সর্বপ্রথম সেনাপতি নিযুক্ত করেন। প্রতিদিন যুদ্ধে তিনি ১০ হাজার সেনা এবং ১ হাজার রথীকে বধ করেন। যুদ্ধের দশম দিনে অর্জুন রথাগ্রে নপুংসক শিখণ্ডীকে স্থাপন করে ভীষ্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হন। কিন্তু বিকলেন্দ্রিয় বা নারীর প্রতি অস্ত্রাঘাত হবে বলে ভীষ্ম আক্রমণ থেকে বিরত থাকেন। ফলে প্রতিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে ভীষ্ম নিপতিত হন। অজস্র শর বিদ্ধ করে তাঁর শরশয্যা প্রস্তুত করা হয়।

শরশয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি কর্ণকে আশীর্বাদ করেন, দুর্যোধনকে সৎ পরামর্শ দান করেন এবং যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন।

**ভীষ্মক** মহাভারতে উক্ত ভোজদেশের রাজা। তাঁর কন্যা রুক্মিণীকে বিয়ে করেন তাঁর পুত্র রুক্মী। কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেবের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য করদানে বাধ্য হন।

**ভুবনেশ্বর** ১৯৪৭-এ ভারতের ওড়িশা রাজধানীরূপে নির্বাচিত হওয়ার আগে পর্যন্ত এটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল; এখানে অশোকের আমলে বসতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখানেই ছিল ওড়িশার কেশরী বংশের রাজাদের রাজধানী (পঞ্চম থেকে দশম শতক পর্যন্ত)। একদা ধর্মীয় কেন্দ্র ভুবনেশ্বরের পবিত্র হ্রদের চারদিকে ৭ হাজার মন্দির ছিল। বর্তমানে যে ৫০০ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান, তা হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্য এবং শিল্পের বহু রীতির পরিচয় বহন করছে। সুন্দর গম্বুজবিশিষ্ট লিঙ্গরাজ মন্দির (সপ্তম-একাদশ শতক) সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। মুক্তেশ্বর, মেঘেশ্বর, বৈতাল প্রভৃতি নামের মন্দিরগুলোও বিখ্যাত। এখানকার অন্যান্য দর্শনীয় স্থান: কেদারগিরিকুণ্ড, বিন্দুসাগর পুষ্করিণী, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, শিশুপালগড় ও ধৌলি।

**ভুয়াধর্ম** বা **গ্রন্থ** বা **সিউডিপিগ্রাফা** (Pseudepigrapha) ভুয়া তারিখসংবলিত ও মিথ্যা গ্রন্থকারের নামে লিখিত ধর্মের অনুমোদিত বাইবেল ধরনের গ্রন্থাবলি। ইহুদিদের ভুয়া গ্রন্থগুলো খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ থেকে ২০০ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত। এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করার জন্য সাধারণত কোনো বিখ্যাত হিব্রু নেতা বা ভবিষ্যদ্বক্তার নামে চালানো হয়; এবং মহাবিচারের দিনের বর্ণনা তুলে ধরে ও মেসাইয়ার আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে সাধারণত এ-জাতীয় গ্রন্থ লিখিত হয়। ইহুদিদের ভুয়া ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: (১) *টেস্টামেন্ট অব দ্য টুয়েলভ প্যাট্রিয়ার্ক* বা *ইয়াকুবের দ্বাদশ পুত্রের গল্প*, (২) *দি অ্যাসামশন অব মোজেজ* বা *মুসার অধিরোহণ*, (৩) *সামস অব সলোমন* বা *সোলায়মানের ধর্মসংগীত* উল্লেখযোগ্য। খ্রিষ্টানদের ভুয়া ধর্মগ্রন্থগুলো ৫০-৪০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত।

**ভুশুণ্ডী** ১. হিন্দু পুরাণের ত্রিকালজ্ঞ কাক যে সত্যযুগ থেকে সর্বকাল পর্যন্ত জীবিত থেকে পৃথিবীর সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে। ২. অন্ধকাসুরের রক্ত পান করার জন্য মহাদেব সৃষ্ট এক মাতৃকা।

**ভূত-উপাসনা** পারস্যের ইয়াজিদি ধর্মগোত্রীয় একটি ধর্মবিশ্বাস। তারা নিজেদের মনে করে তারাই শুধু আদমের বংশধর এবং মানবজাতির অন্যরা আদম ও হাওয়া থেকে উদ্ভূত। এই ধর্মবিশ্বাসী ২০ হাজার লোক কুর্দিস্তানে বসবাস করে এবং আলেপ্পো, ডাইআরবিকর ও বিটলিসের আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তাদের এই ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাস জরথুস্ত্র, ইহুদি, ইসলাম ও গেসটুরিয়াল ধর্ম থেকে উদ্ভূত।

**ভূতনৃত্য, সিংহলের** সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সিংহলের অধিবাসীরা অনেকাংশে দক্ষিণ ভারতের অনুরূপ। ধর্মের দিক দিয়ে হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ হলেও তাদের মধ্যে নিজস্ব প্রাচীন রীতিনীতি ও সংস্কারের প্রভাব বিদ্যমান। সিংহলের প্রায় সব অঞ্চলেই 'ভূতনৃত্যের' প্রচলন রয়েছে। এই নৃত্য রুগ্ণ ব্যক্তির সামনে কোনো উন্মুক্ত স্থানে রাত্রিকালে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নৃত্য অঙ্গনের এক প্রান্তে থাকে ভূতরাজা 'বেশামুনি' এবং তার কিছু সহচর। প্রধান ভূতের জন্য পূজাবেদি রচনা করা হয়। রুগ্ণ ব্যক্তিকে এনে একটি খাটিয়ায় শয়ন করিয়ে এক পাশে রাখা হয়। ভূতের পূজা শুরু হয় নৃত্যের মাধ্যমে এবং অগ্নি প্রজ্বাল করে নর্তকরা সারা রাত সেই নৃত্যক্ষেত্রে বেদির সামনে নাচতে থাকে।

**ভূতবিশ্বাস** আমেরিকান গোল্ডকোস্ট এলাকার আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ ধরনের বিশ্বাস রয়েছে। তারা নিজেদের ভূতসদৃশ ছায়াতে নিজেদের দ্বিতীয় অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। তাদের এ ধরনের বিশ্বাস ভূতবিশ্বাস বলে প্রচলিত।

**ভৃগু** ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন দেবতার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তা নিরূপণ করার জন্য ভৃগু ব্রহ্মলোকে যান। তিনি ইচ্ছা করে ব্রহ্ম ও শিবের অমর্যাদা করলে তাঁরা ক্রুদ্ধ হন। স্তবের দ্বারা তাঁদের তুষ্ট

করে অবশেষে তিনি পদাঘাত করেন। ভৃগুর পায়ে আঘাত লেগেছে ভেবে বিষ্ণু তাঁর পদসেবা করতে থাকেন। বিষ্ণুর এই বিনয়ে তুষ্ট হয়ে ভৃগু বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন। বিষ্ণুর বুকজুড়ে ভৃগুর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে থাকে।

**ভেরোনিকা** খ্রিষ্টের মুখের প্রতিকৃতি-চিহ্নিত যে বস্ত্রখণ্ড, পদক বা অভিজ্ঞান খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীরা বহন বা ধারণ করে থাকেন, তা-ই এই নামে অভিহিত। কথিত আছে, যিশুখ্রিষ্টকে যখন ক্রুশস্কন্ধে বধ্যভূমি অভিমুখে শোভাযাত্রাসহযোগে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন ভেরোনিকা রুমাল দিয়ে তাঁর মুখ মুছিয়ে দিলে খ্রিষ্টের মুখের প্রতিকৃতি তাঁর সেই রুমালে চিত্রিত হয়ে যায়। পরে ভেরোনিকা সন্ত আখ্যায় ভূষিত হন।

**ভৈরব** মহাদেবের সঙ্গে অন্ধকাসুরের যুদ্ধ হয়। অন্ধক মহাদেবের মাথায় পদাঘাত করলে তা চার ভাগে ভেঙে যায় এবং রক্তধারা নির্গত হয়। সেই রক্তধারা থেকে ভৈরবের সৃষ্টি হয়। পূর্ব দিকের রক্তধারা থেকে বিদ্যারাজ, দক্ষিণধারা থেকে কারওজ, পশ্চিম ধারা থেকে নাগরাজ এবং উত্তরধারা থেকে স্বাচ্ছন্দ্যরাজ ভৈরবের জন্ম হয়। ক্ষতস্থান থেকে জন্ম হয় লম্বিতরাজ। এ ছাড়া অন্য ভৈরবরা নন্দী, তুঙ্গী, মহাকাল ও বেতাল।

**ভৈরবী** চৌষট্টি যোগিনীর মধ্যে প্রধান। দশমহাবিদ্যার অন্যতম মূর্তি। শৈবসন্ন্যাসিনী। মহেশ্বরীর সহচরী ও তাঁর মতো পূজনীয়া। যোগিনীরা দেবীর সাহায্যার্থে বা তাঁর উপদেশে নানা কাজ করতেন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা এই যোগিনীদের নাম জপ করবে, তার দুষ্টব্যাধি ও অনতিক্রমণীয় বাধা দূর হবে। এই সব নাম উচ্চারণ করলে শিশুদের পীড়া ও গর্ভিণীর গর্ভবেদনার উপশম হয়।

**ভৈরবী চক্র** তান্ত্রিক সাধনার একধরনের পদ্ধতি বা আসন। তন্ত্রোক্ত মদ্যপানকারী গোষ্ঠী।

## ম

**মওলানা উবায়দুল্লাহ আল-উবায়দি সুহরাওয়ার্দি** শিক্ষাব্রতী। জন্ম মেদিনীপুর (১৮৩২-৮৫)। কলকাতা মাদ্রাসা থেকে জামাআত-এ উলা পাস করার পর নিজের চেষ্টায় গ্রিক ও লাতিনের পাশাপাশি নানা ভাষায় লাভ করেন ব্যুৎপত্তি। বড়লাটের ব্যবস্থাপনা পরিষদে মিরমুনসি ছিলেন। বাংলার তিনি অন্যতম মুসলিম শিক্ষাবিদ, যিনি ইংরেজি ও আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হন। ১৮৭৩ সালে তিনি বাংলার মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে উদ্যোগী হন। মুসলিম-সমাজে সাধারণ শিক্ষা, বিশেষত নারীশিক্ষার বিস্তারে তাঁর ও ঢাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের প্রচেষ্টায় ১৮৮৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় আনজুমান-ই-আহবাব-ই-ইসলামিয়া। ঢাকা মাদ্রাসার তিনি প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট (১৮৭৪)। আমৃত্যু তিনি এই পদে বৃত ছিলেন।

**মওলিদ বা মওলুদ সাহিত্য** হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী সম্পর্কে গদ্য ও পদ্যে রচিত একধরনের জনপ্রিয় ধর্মীয় সাহিত্য; পুণ্যলাভের আশায় সাধারণত মহানবী (সা.)-এর জন্মদিবস (মওলিদুন নবী) ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে, অথবা এর আগে ও এর পরবর্তী বিভিন্ন দিনে মসজিদে এটা পাঠ করা হয়। সাধারণভাবে একে মওলিদ, মওলুদ কিংবা মিলাদ শরিফও বলা হয়। মুসলিম মহল্লায় প্রকাশ্য স্থানে কিংবা রাস্তার বড় বড় মোড়ে বিরাট শামিয়ানা টানিয়ে শানশওকতের সঙ্গে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মহানবী (সা.)-এর গুণাবলি ও মহত্ত্ব এবং মানবজাতির কল্যাণে তাঁর অপূর্ব অবদান মওলুদ সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তু। বাংলাদেশে আগে মিলাদ শরিফ আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় পাঠ করা হতো। বর্তমানে বাংলা ভাষায়ও এই সম্পর্কে বহু পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর জন্মদিবস ছাড়াও মুসলমানদের বিয়ে প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে, রোগ থেকে মুক্তির পর শুকরিয়া হিসেবে, যেকোনো বিপদ-আপদে পরিত্রাণ লাভের জন্য এবং নতুন কোনো কাজকর্মে শুভ ফল লাভের আশায় মিলাদ শরিফ অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত মিলাদের পর সবাইকে মিষ্টিমুখ করানো হয়।

**মকর** সামুদ্রিক জন্তু। শৃঙ্গ আছে। কেউ এদের মীন, কেউ বা হাঙর বলে থাকে। গঙ্গাদেবীর বাহন হচ্ছে

মকর, কামদেবের ধ্বজচিহ্ন এবং রাশিচক্রের দশম রাশি। পৌরাণিক বর্ণনায় মকরের মস্তক ও সামনের পদদ্বয় কৃষ্ণসার মৃগের মতো এবং দেহ ও পুচ্ছ মাছের মতো।

**মকরুহ, মাকরুহ** শরিয়তের দৃষ্টিতে যা বাঞ্ছনীয় নয়। এটি দুই ধরনের। মকরুহ তাহরিমি, যা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং ইসলামি আইনে যা হারামের কাছাকাছি। শরিয়া অনুযায়ী মকরুহ তানজিহিও পছন্দযোগ্য কিছু নয়, তবে তাহরিমির চেয়ে এতে পাপের অপেক্ষাকৃত আশঙ্কাভাবে কম।

**মক্কা** হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জন্মস্থান। হিজাজের রাজধানী। মুসলমানদের পবিত্রতম তীর্থস্থান কাবা শরিফ এখানে অবস্থিত। লোহিত সাগরের তীরবর্তী বন্দর জেদ্দা থেকে আনুমানিক ৫০ মাইল পূর্বে এবং রিয়াদ থেকে ৪৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পাহাড়বেষ্টিত সংকীর্ণ ও অনুর্বর উপত্যকাভূমিতে অবস্থিত মক্কা নগরের দৈর্ঘ্য প্রায় দুই মাইল। চারদিকে কোনো দেয়াল নেই। উত্তর-দক্ষিণগামী প্রাচীন বাণিজ্যপথটি (মসলা সড়ক, Spice road) মক্কার ভেতর দিয়ে চলে গেছে। এই পথে পূর্ব দেশগুলো থেকে মসলা, সুগন্ধি দ্রব্য ও অন্যান্য পণ্য ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আসত। পবিত্র কোরআনের ভাষায় 'কৃষির অনুপযোগী' এই উপত্যকা অনুর্বর। এখানে অসহ্য গরম পড়ে। নগরের চারপাশের পাহাড়ে নানা ধরনের প্রাসাদ অবস্থিত।

নগরের মধ্যস্থলে উপত্যকার তুলনামূলকভাবে নিচু জায়গায় বিরাট 'মসজিদুল হারাম' (পবিত্র মসজিদ)। এখানে এসে শেষ হয়েছে চারদিক থেকে আসা প্রশস্ত পাকা বিভিন্ন রাস্তা। ইরাকি স্তম্ভ (রুক্‌ন্), সিরীয় স্তম্ভ, ইয়ামিনি স্তম্ভ ও কৃষ্ণস্তম্ভ নামে চারটি স্তম্ভ দিয়ে পরিবেষ্টিত মসজিদটির বিরাট চত্বরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত চার কোনাবিশিষ্ট পবিত্রতম কাবা গৃহ। কাবার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রাখা আছে 'হাজরে আসওয়াদ' (কৃষ্ণপ্রস্তর)। চত্বরের মধ্যেই রয়েছে হজরত হাজেরা ও ইসমাইল (আ.)-এর সৃষ্ট জমজম কূপ। 'মাস'আ'য় 'সুওয়াইকা' নামে পরিচিত মক্কার প্রধান বাজার পবিত্র সাফা (দক্ষিণ-পূর্ব) ও মারওয়া (উত্তর-পূর্ব) পাহাড়কে সংযুক্তকারী প্রশস্ত রাস্তার দুই পাশে অবস্থিত। এটা রেশমি বস্ত্র, তসবির মালা এবং আতর প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। ধর্মীয় কার্যে ব্যবহৃত উপাদান তৈরি করা ছাড়া মক্কার নিজস্ব কোনো শিল্প নেই। হজ ও ওমরার সময় হাজিদের ভরণপোষণ এবং তত্ত্বাবধানই এর একমাত্র আয়ের সূত্র। বর্তমানে প্রতিবছর ২০ লক্ষাধিক মুসলমান এখানে হজব্রত পালন করে থাকেন। তীর্থ ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে মক্কা নগর অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রসিদ্ধ। টলেমি মক্কাকে ম্যাকোরাবা বলে উল্লেখ করেছেন। এটা সাবিয়ান মাকুরাবা (পবিত্র স্থান) শব্দ থেকে এসেছে। হজরত আদমের (আ.) সময় থেকে পবিত্র কাবাকে ভিত্তি করে মক্কার ইতিহাসের শুরু। হজরত আদম (আ.) বেহেশতের পবিত্র ঘর বায়তুল মামুরের অনুকরণে প্রথম এটা নির্মাণ করেন। হজরত নুহের (আ.) আমলের মহাপ্লাবনের পর (বিশ্বাস করা হয় যে ওই সময় কাবা ঘরকে বেহেশতে তুলে নেওয়া হয়) হজরত ইবরাহিম (আ.) ও হজরত ইসমাইল (আ.) এটা পুনর্নির্মাণ করেন। তাঁদের কাছেই হজরত জিবরাইল (আ.) পবিত্র 'হাজরে আসওয়াদ' প্রদান করেন। এটি পুরুষানুক্রমে হজরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশধরদের তত্ত্বাবধানে ছিল। তাঁদের কাছ থেকে হস্তান্তরিত হয়ে প্রায় ২ হাজার বছর পর্যন্ত পবিত্র কাবাসহ মক্কা নগর বনু খুজা'আহ গোত্রের তত্ত্বাবধানে ছিল। এদের আমলেই একেশ্বরবাদের জায়গায় কাবা গৃহে 'হুবাল' মূর্তি স্থাপনের মাধ্যমে প্রথম মূর্তিপূজার প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন গোত্র ৩৬০টি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। কালক্রমে মক্কা পুনরায় হজরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশধর কুরাইশদের তত্ত্বাবধানে আসে। ইতিমধ্যে মক্কা নগর এশিয়া ও আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। উত্তর-দক্ষিণগামী বাণিজ্যপথে মারিব ও গাজা শহর দুটির মধ্যবর্তী স্থানে মক্কা অবস্থিত।

**মক্তব** ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক বিষয়াবলি শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়, তা-ই পরিচিত মক্তব

বলে। আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলমানদের আগমনের পর মক্তব গড়ে উঠেছিল। মক্তব সম্পূর্ণ বেসরকারিভাবে পরিচালিত। সরকারের কোনো সহযোগিতা বা নিয়ন্ত্রণের অবকাশ ছিল না। মক্তব-শিক্ষায় সুনির্দিষ্ট কোনো শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ছিল না। আগে পাঠশালা বা স্কুলের সংখ্যা কম থাকায় মুসলমান জনগোষ্ঠী শিক্ষার জন্য মক্তবের ওপর বেশ নির্ভরশীল ছিল।

মহানবী (সা.)-এর আমলে আবু সুফিয়ান মক্কার বাণিজ্যকাফেলা নিয়ে গাজা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথেই বদরের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ওই সময় তাঁর কাফেলায় ১ হাজার উট ও ৫০ হাজার দিনার (২০ হাজার পাউন্ড) মূল্যের পণ্য ছিল। প্রাক-ইসলামি যুগে বাণিজ্যকেন্দ্র ছাড়া তীর্থকেন্দ্র হিসেবেও মক্কার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী (সা.) এখানকার কাবা শরিফের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের বছরই ইয়েমেনের শাসনকর্তা আবিসিনীয় সেনাপতি আবরাহা হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণ করেন। আল্লাহর গজবে হানাদাররা বিধ্বস্ত হয়। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে হিজরি সনের সূচনা করেন। অষ্টম হিজরিতে (৬৩০) তিনি মক্কা জয় করেন। জীবনের বেশির ভাগ সময় তিনি মক্কায় অতিবাহিত করেন বলে এখানে তাঁর কাছে যেসব 'ওহি' নাজিল হয়, সেগুলো 'মক্কি' নামে পরিচিত। হিজরতের পর ধীরে ধীরে মক্কার উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত মদিনা শহরই ইসলামের প্রধান কেন্দ্র হয়ে পড়ে। ৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা উমাইয়াদের কর্তৃত্বাধীনে আসে। এই সময় থেকে বাণিজ্যিক গুরুত্ব হ্রাস পায়। বিলাসিতাপূর্ণ জীবন মক্কার ঐতিহ্যগত পবিত্রতাকেও অনেকখানি ক্ষুণ্ন করে। ৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে গোঁড়াপন্থী কারামতিয়া সম্প্রদায় মক্কা নগর ধ্বংস করে 'হাজরে আসওয়াদ' অপহরণ করে। ৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে এটা পুনরুদ্ধার করা হয়। মিসরীয়দের আমলে এবং ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দের পর তুর্কিদের আমলে মক্কা নগর স্থানীয় হাশিমি বংশের আমিরদের (পরবর্তীকালে শরিফ) দ্বারা শাসিত হতো। ১৮০৩-১৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা ছিল ওয়াহাবিদের অধিকারে। নগরটি আবার তুর্কিদের কর্তৃত্বাধীনে আসে। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে হাশিমি বংশের আমির হুসেন ইবনে আলী তুর্কিদের বিতাড়িত করে মক্কাসহ সমগ্র হিজাজের স্বাধীন বাদশাহ হন। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে ইবনে সউদ মক্কা জয় করেন এবং বর্তমানে এটা সোদি আরবের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাক-ইসলামিক যুগে চিকিৎসা, সংগীতবিদ্যা ও শিল্প-সাহিত্যের কেন্দ্র ছিল মক্কা। এর নিকটবর্তী 'উকাজ' নামক স্থানে বার্ষিক মেলা ও সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো। সম্মেলনে নির্বাচিত ম'আল্লাহ নামে বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো কাবা শরিফের দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। উমাইয়াদের আমলেও এটা একটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। নগরের উত্তর-পশ্চিম দিকে মিনা ও মুজদালিফা এবং পূর্ব দিকে আরাফাত ময়দান। হজের সময় এসব স্থানে বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে হয়।

**মখদুম জাহানিয়ান জাহান গাশ্‌ত** দরবেশ; জন্ম বুখারা। পূর্বনাম মির সাইয়িদ জালালুদ্দিন। তিনি সারা দুনিয়া ভ্রমণ করেছেন এমন কথা প্রচলিত। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে তিনি বাংলায় আসেন এবং পাণ্ডুয়াতে আস্তানা গড়ে তোলেন। তাঁর গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং অন্য বহু মুসলমান তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উচনগরে তাঁর মাজার এখনো আছে।

**মখদুম শাইখ জালালুদ্দিন তাবরিজি** সুফি সাধক। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে তাঁর আবির্ভাব। জন্ম পারস্যদেশের তাবরিজ নগরে। সাধক শেখ শাইখ আবু সাইদ তাবরিজির কাছে তিনি সুফিধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে এলে দিল্লির সুলতান ইলতুতমিশ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি বাংলায় এসে পাণ্ডুয়া ও দেউতলাতে (তবরিজাবাদ) নিজের আস্তানা গড়ে তোলেন। তাঁর নানা অলৌকিক গুণে মুগ্ধ হয়ে স্থানীয় অগণিত মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। পাণ্ডুয়াতে এখনো তাঁর মাজার বর্তমান।

**মখদুমুল শাইখ শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরি** সুফি-সাধক। নিবাস বিহারে নিবাস। তিনি মুরশিদ মওলানা শরফুদ্দীন আবু তাওওয়ামার সঙ্গে বাংলায় এসে সোনারগাঁয়ে (১২৮৩ থেকে ১২৮৭-র মধ্যে) অস্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। গণিত, দর্শন, ন্যায় এবং ইসলামি ধর্মশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন তিনি। শিক্ষাজীবন শেষে তিনি ফিরে যান মাতৃভূমি বিহারে। পরবর্তী জীবনে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সুফি বলে খ্যাত হন তিনি।

**মগ** পাহাড়ি এলাকায় মারমা এবং সমতল এলাকার রাখাইনদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ উপজাতি। মারমা সম্প্রদায়ের মতো কোনো স্বতন্ত্র উপজাতি নয়। জাতিগতভাবে তারা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। সাংস্কৃতিকভাবে মিয়ানমারের জনসাধারণের সঙ্গে তাদের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। মগেরা নিজেদের থেরবাদ শ্রেণীর বৌদ্ধ বলে মনে করে।

**মঙ্গলঘট** বিয়ে, গৃহপত্তন, গৃহপ্রবেশ, বিদেশযাত্রা বা অন্য মঙ্গলকর্মে জলপূর্ণ যে ঘট বা কলসি বাড়ির সিংহদ্বারে বা প্রবেশপথে স্থাপন করা হয়, সাধারণত তাকে মঙ্গলঘাট বলা হয়। মঙ্গলঘটের মুখে আমের পত্রপল্লবসহ ডাব বা নারকেল স্থাপন করাই রীতি। অনেক ক্ষেত্রে সিঁদুর দিয়েও লেপন বা চিত্রিত করা হয়। স্বস্তিক বা প্রতীক চিত্র এঁকে দেওয়াই রীতি। সাধারণ রীতি কচি কলাগাছ পুঁতে দেওয়া। কলাগাছের গোড়ায় 'মঙ্গলঘট' স্থাপন করতে হয়।

কলাগাছ ও আমের পল্লব দীর্ঘায়ুর প্রতীক। ভালো জীবনীশক্তির প্রতীক, ডাব-নারকেল উর্বরতা বা প্রজননের প্রতীক। চট্টগ্রামের সপ্তদশ শতকের কবি মোহাম্মদ রফিউদ্দিন বিরচিত 'জেবল মুলুক গামারেকা' কাব্যে লিখেছেন :

কুম্ভ দুই জল ভরি পন্থ দুই পাশে।
আম্র ডাল দিয়া তাতে রাখিছে হরিষে॥

বাংলার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ সবাই এই মঙ্গলঘট শুভকর্মে ব্যবহার করেন।

**মঙ্গলচণ্ডী** হিন্দু শাস্ত্রমতে, দেবী দুর্গা বা ভগবতীর এক রূপ। তিনি গৌরবর্ণা এবং দ্বিভুজা। রক্তপদ্ম তাঁর আসন। ধনপতি সওদাগরের প্রথম পত্নী খুল্লনা মর্তে তাঁর পূজা প্রবর্তন করেন। তখন থেকে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির লক্ষ্যে হিন্দু নারীরা মঙ্গলবারে তাঁর পূজা দিয়ে থাকেন। অর্চনার দিবস মঙ্গলবার বলে তাঁর এ রকমের নামকরণ। সুলতান হোসেন শাহের সময় দ্বিজ জনার্দন মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যান রচনা করেন। উনবিংশ শতকে রঘুনাথ দাস তাঁর উপাখ্যানে ১৫০ শ্লোক রচনা করেন। শ্রীমদন দত্তও রচনা করেন একটি উপাখ্যান।

**মজহাব** আরবি শব্দটির অর্থ পথ, ধর্মপথ, সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্কের বিবরণ, মানুষকে যা অশরীরী বস্তুর ওপর বিশ্বাসের নির্দেশ দান করে, যা বিধিনিষেধ আরোপ করে মানবজীবন নিয়ন্ত্রণ করে। মুসলমান উপসম্প্রদায় বা খণ্ড সম্প্রদায় বোঝাতে মজহাব শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

**মঠ** মূলত কৃচ্ছ্রসাধনকারী শিক্ষার্থীদের আবাসস্থল। ধর্মীয়ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ সংঘ জীবনের জন্য বুদ্ধ নির্দেশিত চার পন্থার অন্যতম বৌদ্ধবিহার থেকেই এর উৎপত্তি হয়। বাংলায় মঠবিষয়ক বিবরণ স্বল্প পরিমাণে পাওয়া যায় খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী শিলালিপিতে। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে মঠের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মন্দিরের পাশাপাশি মঠগুলো মূলত ধর্মীয় কেন্দ্র হলেও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবেও এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

**মৎস্য অবতার** হিন্দু পুরাণমতে, বিষ্ণুর ১০ অবতারের প্রথম অবতার। বিবস্বানের পুত্র রাজা মনু গভীর তপস্যারত ছিলেন। তখন একটি ক্ষুদ্র মৎস্যকে আশ্রয় দিলে ক্রমে এর দেহ এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে যে পুকুর, গঙ্গা নদী কোথাও তার স্থানসংকুলান না হলে মনু মৎস্যটিকে সমুদ্রে রাখেন। মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হলে মনু সপ্তর্ষিগণের সঙ্গে একটি নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহাপ্লাবনের সময় বিষ্ণু শৃঙ্গধারী মৎস্যরূপে মনুর কাছে উপস্থিত হন এবং নিজের শৃঙ্গের সঙ্গে সর্পরজ্জুর সাহায্যে মনুর নৌকা বেঁধে রাখেন। তিনি প্লাবন শেষে মনুকে পুনরায় সৃষ্টি-প্রক্রিয়া শুরু করার উপদেশ দেন। তিনি তপস্যার মাধ্যমে প্রাণিজগৎ সৃষ্টি করেন এবং হয়গ্রীব দৈত্যকে বধ করেন। মৎস্য মনুর কাছে সত্য উদ্‌ঘাটিত করে বলেন যে, তিনি স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার।

**মৎস্যগন্ধা** মহাভারতে বর্ণিত মতে, রাজা উপরিচর বসুর ঔরসে যমুনার জলেআদ্রিকা নাম্নী মৎস্যরূপী এক শাপগ্রস্তা অপ্সরার গর্ভে এঁর জন্ম। মৎস্যের গর্ভ থেকে উদ্ধার করে একে প্রতিপালন করেন এক জেলে। এর আরেক নাম সত্যবতী। গায়ে মৎস্যের গন্ধ ছিল বলে এঁর নামকরণ হয় মৎস্যগন্ধা। যমুনার ঘাটে তিনি খেয়া পারাপার করতেন। পরাশর মুনির ঔরসে কুমারী মৎস্যগন্ধার গর্ভে ব্যাসদেবের জন্ম হয়। যমুনার এক দ্বীপে এই পুত্রের জন্ম বলে ব্যাসদেবের আরেক নাম দ্বৈপায়ন। পরাশরের বরে মৎস্যগন্ধার দেহ থেকে মৎস্যগন্ধ দূর হয়ে যায় এবং সুগন্ধের অধিকারিণী হন বলে তার নাম হয় গন্ধবতী। এক যোজন দূর থেকে এই সুগন্ধ পাওয়া যেত বলে এর আরেক নাম যোজনগন্ধা। পরে তাঁর সঙ্গে হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনুর বিয়ে হয়। শান্তনুর ঔরসে মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্ম হয় চিত্রাঙ্গদা ও বিচিত্রবীর্য নামক দুই সন্তানের।

**মৎস্যেন্দ্রনাথ** বা **মীননাথ** দ্বাদশ শতক, নাথবাদ ও কৌলবাদের প্রতীক। সিদ্ধ পুরুষ গোরক্ষনাথের পুত্র। চন্দ্রদ্বীপে ধীবর বংশে জন্ম। তিব্বতীয় প্রবাদে সিদ্ধাচার্য লুইপাদ (বা লুইপা) এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি। স্বয়ং শিবই তাঁকে গুহ্য মন্ত্র দান করলে তিনি আদিসিদ্ধ নামে অভিহিত হন। তাঁর ধর্মমত সংস্কৃত ও দোহায় প্রচারিত হয়; সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে কৌলজ্ঞান নির্ণয় সর্বপ্রাচীন ও সমধিক প্রসিদ্ধ। কৌল নামটি কুল শব্দ থেকে উৎপন্ন। এই কৌল সম্প্রদায়ের লোকেরা কৌল, কুলপুত্র বা কুলীন নামে অভিহিত। এদের শাস্ত্রের নাম কুলাগম বা কুলশাস্ত্র। এই কুল বা শ্রেণীবিভাগ সহজিয়া ধর্মের প্রধান অঙ্গ। বর্ণাশ্রম-বিরোধীরা মীননাথের ধর্মমত গ্রহণ করে। ময়নামতির গানে মৎস্যেন্দ্রনাথ (মীননাথ)-কে গোরক্ষনাথের গুরু বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

**মতুয়া** মত্ত বা মাতোয়ারা থেকে মতুয়া শব্দের উৎপত্তি। ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দির হরিচাঁদ ঠাকুর এবং তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ এর সাংগঠনিক রূপ দেন। উচ্চকণ্ঠে হরিবোল ধ্বনি, ডঙ্কা ও ঝান্ডা সহযোগে উন্মত্ত নৃত্য, প্রেমাপ্লুত আবেগে ক্রন্দন, ঘর্মাক্ত কলেবরে ধূলিস্নান—ধর্মসাধনার এরূপ মত্ত অবস্থা থেকেই এই সম্প্রদায়ের নাম হয়েছে মতুয়া। কর্তাভজারা যেমন 'দশ নিয়ম' পালন করে থাকেন, মতুয়ারা তেমনি পালন করে থাকেন 'দ্বাদশ আজ্ঞা'। এসবের মধ্যে প্রধান হচ্ছে সত্যবাদিতা, সাধুসঙ্গ, ত্যাগধর্ম, জীবে দয়া, হাতে কাজ ও মুখে নাম ইত্যাদি।

**মথি, সেন্ট ম্যাথু** বা **ম্যাথিউ** যিশুর ১২ জন প্রধান শিষ্যের একজন। কেপারনেয়ামের একজন পাবলিক্যান বা সরাই-রক্ষক। তাঁকে লেভি নামেও অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে তিনি বাইবেলের সেন্ট ম্যাথুর গসপেলের (মথিলিখিত সুসমাচার) রচয়িতা বলে বিবেচিত। তাঁর প্রতীক এক যুবক বা দেবদূত। তাঁর স্মরণে উৎসব হয়ে থাকে প্রতিবছর ২৪ সেপ্টেম্বর।

**মথিলিখিত সুসমাচার** নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম পুস্তক। যিশুর ১২ জন শিষ্যের অন্যতম সাধু মথি বা সেন্ট ম্যাথু এর রচয়িতা। এতে যিশুর জন্ম, তাঁর ধর্মপ্রচার এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যুর অতুলনীয় বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

**মথুরা** ভারতের পৌরাণিক ও ইতিহাসবিখ্যাত নগর। মহাভারতের যুগে কংস এই অঞ্চলে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনির সঙ্গে মথুরা ও বৃন্দাবন সংশ্লিষ্ট। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেব সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। ভারতের বৈষ্ণব সাহিত্যে মথুরা তীর্থস্থানতুল্য বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

**মদন** কামদেব। তিনি দেবতাদের চিত্ত মথিত করেন বলে তার নাম মন্মথ, মহাদেবের দর্প চূর্ণ করেন বলে তাঁর নাম কন্দর্প; অসাধারণ কামরূপী বলে কামদেবতা এবং সমস্ত মানবকে মত্ত করেন বলে মদন।

**মদিনা** আরবি, অর্থে শহর। মক্কা শরিফের পর আরবের সবচেয়ে পবিত্র শহর। মক্কা থেকে ২৭৫ মাইল উত্তরে হিজরতের জন্য মহানবী (সা.) এই শহরটিকেই পছন্দের স্থান হিসেবে বেছে নেন। তখন শহরটির নাম ছিল ইয়াস্‌রিব, পরে নাম হয় মদিনা-তুন্নবী (নবীর শহর), মদিনাতুর রাসুলুল্লাহ। সাধারণত একে মদিনা-ই-মুনাওয়ারা বলা হয়। এই

শহরে পানির কোনো অভাব নেই। মাউনা এবং বোজায়া নামে দুটি বিখ্যাত কূপ রয়েছে। আগে মদিনায় আওজ, খায়রাজ, বনি নাজির, বনি ফুরাইয়া নামের গোত্রগুলো দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত থাকত। ফলে মদিনায় কোনো দিন শান্তি বিরাজ করেনি। মহানবী (সা.)-এর আগমনের পর (৬২২) অবস্থার পুরোপুরি পরিবর্তন ঘটে। মহানবী (সা.) প্রথম মদিনাতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এই মসজিদকে কেন্দ্র করে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করেন। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে পারস্পরিক সহাবস্থানের নীতি ঘোষণা করে একটি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে এক জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলে মদিনায় শান্তি স্থাপিত হয়। চার খলিফার আমলে মদিনাই ছিল দারুল খিলাফত বা রাজধানী (৬৫৬ খ্রি. পর্যন্ত)। হাদিস শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবেও মদিনার সুখ্যাতি ছিল। বাইতুল্লাহ শরিফ জিয়ারত করার পর হাজিদের মদিনায় যেতে হয়। মদিনার ৪ মাইল উত্তরে ওহোদ পাহাড়। সেখানে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পঞ্চম হিজরিতে মক্কার কুরাইশরা মদিনার ওপর আক্রমণ করলে মহানবী (সা.) প্রথম পরিখা খনন করেন। হজরত আলী (রা.) রাজনৈতিক কারণে ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজধানী স্থানান্তর করেন কুফায়।

**মধুপূর্ণিমা** বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের একটি উৎসবের দিন। পারিলেয়্যক বনে অবস্থানকালে বুদ্ধের প্রতি বন্য প্রাণীদের সেবাপরায়ণতা ও সহযোগিতার স্মারক হিসেবে ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ধর্মীয় উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। বুদ্ধদেব যখন পারিলেয়্যক বনে দশম বর্ষাবাস ব্রত পালন করছিলেন, তখন একটি হাতি ও একটি বানর ভিক্ষা করা, ফলমূল সংগ্রহ করা, হিংস্র প্রাণীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদি কাজে বুদ্ধকে সব সময় সাহায্য করত। এভাবে তাদের সেবা পেয়ে বুদ্ধ নির্বিঘ্নে বর্ষাবাস যাপন করছিলেন। একদিন বানরটি বুদ্ধকে একটি মৌচাক এনে দিলে তিনি তা থেকে মধু সংগ্রহ করেন। তা দেখে আনন্দচিত্ত সেই বানর গাছে গাছে লাফালাফি করতে গিয়ে মাটিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। সেদিন ছিল ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথি। তাই একটি মানবেতর প্রাণীর দানের মহিমা স্মরণীয় করে রাখার জন্য দিনটিকে 'মধুপূর্ণিমা' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

দানের মহিমা প্রচারকেরা ছাড়াও এ পূর্ণিমার আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো পারস্পরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষু সংঘের মধ্যে যে দ্বিধাবিভক্তি ছিল, তার অবসানে এদিন ভিক্ষু সংঘ পারিলেয়্যক বনে গিয়ে বুদ্ধের কাছে ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষিত হয়।

এদিন বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকা ও আবালবৃদ্ধবনিতা মধু দিয়ে বুদ্ধপূজা করে এবং ভিক্ষু সংঘকে মধু দান করে।

**মধুসূদন কিন্নর** ঢপকীর্তন গানের রচয়িতা ও গায়ক। মধুকান (১৮১৩/৮-১৮৬৮) নামে তিনি সমধিক পরিচিত। ১৮১৩ (মতান্তরে ১৮১৮) সালে যশোর জেলার উলুসিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি মধুসূদনের আকর্ষণ ছিল না। তিনি গান-বাজনা, বিশেষত ভক্তিমূলক গান পছন্দ করতেন। তাই পাঠশালা থেকে পালিয়ে তিনি গানের দলে যোগ দেন। ওই সময় তাঁর স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটে। তিনি মুখে মুখে তাৎক্ষণিকভাবে গান রচনা করতেন।

উচ্চাঙ্গসংগীতের প্রতিও মধুসূদনের আকর্ষণ ছিল। এ উদ্দেশ্যে ঢাকায় এসে তিনি ওস্তাদ ছোটে খাঁ ও বড়ে খাঁর দরবারে স্থান লাভ করেন এবং পরে খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরিতে তালিম নেন। নানা রকম রাগ ও তালেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। তারপর যশোরের রায়খাদিয়ার রাধামোহন বাউলের কীর্তনদলে যোগ দিয়ে তিনি বাংলার নানা স্থানে সংগীত পরিবেশন করেন। রাধামোহন ছিলেন তাঁর কীর্তনগানের গুরু।

মধুসূদন যশোরের মোহন দাস, রূপো দাস, অঘোর দাস, দ্বারিক দাস, শ্যামা বাউল প্রমুখের গান, প্রচলিত কীর্তন এবং খেয়াল সংগীতের ভাবধারা ও সুরের মিশ্রণে নতুন এক কীর্তনগানের প্রবর্তন করেন, কালক্রমে যা ঢপকীর্তন নামে পরিচিত হয়। ঢপ ছাড়া তিনি অন্য গানও রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর *অক্রূর সংবাদ, কলঙ্কভঞ্জন, মাথুর* ও *প্রভাস* নামে তাঁর গানের সংকলন প্রকাশিত হয়। কাশিমবাজার রাজবাড়িতে গান

গাইতে যাওয়ার পথে কৃষ্ণনগরে তাঁর মৃত্যু হয়।

**মধুসূদন সরস্বতী** (১৫২৫-১৬৩২) সংস্কৃত পণ্ডিত ও দার্শনিক। ফরিদপুর জেলার তৎকালীন কোটালীপাড়া পরগনার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা প্রমোদ পুরন্দের আচার্য ছিলেন একজন সংস্কৃত পণ্ডিত। মধুসূদনের প্রকৃত নাম ছিল কমলজনয়ন। প্রথম জীবনে সংসার ত্যাগ করে তিনি গুরু বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর কাছে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তখন তাঁর নাম হয় মধুসূদন। শৈশবে তিনি পিতার কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তারপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি নবদ্বীপ যান। সেখানে বিখ্যাত দার্শনিক হরিরাম তর্কবাগীশ ও মথুরানাথ তর্কবাগীশ ছিলেন তাঁর শিক্ষক। গদাধর চক্রবর্তী সতীর্থ এবং পরবর্তীকালে পুরুষোত্তম সরস্বতী তাঁর ছাত্র হন।

**মনসেরেট, ফাদার অ্যান্টোনিও** ষোড়শ শতকের পর্তুগিজ খ্রিষ্টান যাজক। পরধর্মসহিষ্ণু সম্রাট আকবর খ্রিষ্টধর্মের মূলনীতি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে গোয়ার পর্তুগিজ কর্তৃপক্ষকে ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে পত্র লিখে দুজন ধর্মযাজককে তাঁর কাছে পাঠানোর অনুরোধ জানান। তদনুসারে তাঁরা ফাদার অ্যান্টোনিও মনসেরেট ও অন্য একজন ধর্মযাজককে তাঁর বরাবর পাঠিয়ে দেন। উভয়ই সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে ফতেহপুর সিক্রি পৌছান। খ্রিষ্টধর্মের মূলনীতি ও পর্তুগিজ ভাষা শিক্ষা দানের জন্য আকবর শাহজাদা মুরাদকে মনসেরেটের হাতে তুলে দেন। অত্যল্পকাল পর আকবর স্বীয় ধর্মমত দীন-ই-ইলাহি প্রবর্তন করলে খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কমে যায়। তা ছাড়া সমুদ্রবক্ষে এবং তীরসংলগ্ন এলাকায় নিরীহ লোকদের ওপর পর্তুগিজদের অকথ্য অত্যাচারেও তিনি বিরক্ত ও বিব্রত হয়ে পড়েন। ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে গোয়া কর্তৃপক্ষ ধর্মযাজকদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেন। মনসেরেট আকবরের রাজত্বকালের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। গ্রন্থটির নাম *মঙ্গোলিকা লিগটিওনিস কমেনটেরিয়াস*।

**মনাকিয়ানিজম** গ্রিক এই শব্দের অর্থ একের শাসনে বিশ্বাস। অর্থাৎ ঈশ্বর যিশুখ্রিষ্ট ও পবিত্র আত্মার ওপরও কর্তৃত্ব করেন। এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে প্রভু, পিতা ও যিশুখ্রিষ্ট একই ব্যক্তি। সেই কালে প্রচলিত এই ধর্মমতবিরোধী মতবাদটি দত্তকতাবাদ (adoptionism, যিশুকে ঈশ্বরের দত্তকগ্রহণবাদ) ও স্যাবেলিয়াসের দর্শন হিসেবে গড়ে ওঠে।

**মনু** হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে, ব্রহ্মার পুত্র, মানবজাতির আদি পুরুষ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চার সহস্র যুগে ভগবান ব্রহ্মার এক দিন। ওই এক ব্রহ্ম দিবসে চতুর্দশ মনু জন্মগ্রহণ করেন। মনুকে অনেকে হিন্দু মতের নুহ বলে মনে করেন। বেদোত্তর পুরাণকাহিনি মতে, মনুকে একটি প্রকাণ্ড মৎস্য সতর্ক করে দিয়ে একটি নৌকা (আর্ক) বানাতে বলে। মহাপ্লাবনের পরে মনুর স্বার্থত্যাগের ফলে তিনি কন্যা লাভ করেন এবং ওই কন্যার মাধ্যমে তিনি মানব (মনু থেকে জাত) জাতির আদি পুরুষ হয়ে দাঁড়ান। অধিকতর ঐতিহাসিক মতে, মনু হলেন *মনুসংহিতার* গ্রন্থকার। এই সংহিতা বৌদ্ধযুগে হিন্দুদের ধারণা প্রকট করে। মনুর জন্ম সম্পর্কে একটি কাহিনিতে কথিত আছে যে ব্রহ্মা নিজেই মনুরূপে সৃষ্ট হলেন এবং তাঁর এক অংশে শতরূপা নামে নারী সৃষ্টি করলেন। কন্যা শতরূপার সঙ্গে ব্যভিচারের ফলে মনুর জন্ম। মনুই আবার এই শতরূপাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। মনু ব্রহ্মার কাছ থেকে স্মৃতিশাস্ত্রকে মানবধর্মে পরিণত করেন। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অবশ্যপালনীয় (রাজার ও সাধারণ প্রজার) কর্তব্যগুলো, হিন্দু জাতির আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ ও যথাকর্তব্য *মনুসংহিতায়* নির্ধারিত হয়েছে। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ থেকে ২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে প্রাচীন সূত্রগুলো থেকে এই সংকলন প্রস্তুত হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। অন্য মতে, প্রচলিত *মনুসংহিতা* আনুমানিক ১০০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত একটি সংশোধিত ছন্দোবদ্ধ শ্লোকগ্রন্থ সংরক্ষিত। এতে ২৬৪টি শ্লোক পাওয়া যায়; প্রথম *মনুসংহিতায়* নাকি এক লাখ শ্লোক ছিল।

**মনুস্মৃতি** মনু-লিখিত হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ। এটা প্রণয়নের সময় থেকে বঙ্গদেশের লোকজন আর্যদের সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হতে আরম্ভ করে।

**মনের মানুষ** বাউলদের আরাধ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'বিশ্ব দেবতা আছেন, তাঁর প্রধান আসন লোকে লোকে গ্রহ চন্দ্রতারায়। বাউল তাঁকেই বলেছেন মনের মানুষ।' চণ্ডীদাস সেই মনের মানুষ সম্পর্কে বলেছেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য। তাহার উপরে নাই'।

**মন্ত্র** সংস্কৃত শব্দটির মূল অর্থ চিন্তার বাহন। নৃতত্ত্ববিদদের মতে, আদি মানুষেরা কোনো দেবতা, দেবী বা ঈশ্বরের কাছে যখন কোনো করুণা ভিক্ষা করত, তখন তারা বিশেষ কোনো রীতি বা পদ্যের আকারে তাদের আবেদন পেশ করত। কালক্রমে সেসব পদ্য বা বাণীগুলো এমনভাবে রক্ষিত হতে থাকে যে যেন ওই কথাগুলো ঠিকভাবে উচ্চারিত না হলে প্রার্থনা মঞ্জুর হবে না। এসব প্রার্থনার সঙ্গে জীবজন্তু বলিদানের প্রথাও প্রবর্তিত হয়। আদিম মানুষের সমাজব্যবস্থা যখন কিছুটা উন্নতি লাভ করে তখন এসব প্রার্থনা বা আবেদন দলপতি, সমাজপতি বা যাজকের মাধ্যমেই আচরিত হতে থাকে। যাজক বা দলপতিরা এসব প্রার্থনার কিছুটা সত্য রূপ দেন—এগুলো সুন্দর শব্দ ও ছড়ার মাধ্যমে উচ্চারিত হতে থাকে। ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস মানুষের মধ্যে আদিম কাল থেকেই প্রচলিত। যে ইন্দ্রজাল মানুষের হিতকর বলে মনে করা হয় ও প্রকাশ্যে সম্পন্ন হয়, তা শ্বেত ইন্দ্রজাল নামে পরিচিত। যে ইন্দ্রজাল গোপনে সম্পন্ন হয় তা কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল বা নামে পরিচিত। মন্ত্রদ্বারা কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ বিদূরিত করা বা সাপের বিষ নামানো অথবা ভূততাড়ানো মন্ত্রেই শ্বেত ইন্দ্রজাল নামে অভিহিত। অন্যদিকে বশীকরণ, উচাটন বা যেসব মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে শত্রুপক্ষের অনিষ্টকরণ করা হয়, সেগুলোকে কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল বলা হয়। মন্ত্রেই রোগ নিরাময় বা তার প্রতিবিধানের জন্য উচ্চারণ করা হয় অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দেব-দেবী বা ব্যক্তির নাম। যেমন সাপের বিষ ঝাড়ার জন্য এমন মন্ত্র উচ্চারণ করতেও দেখা যায়:

'হাটের বিষ ঘাটের বিষ অজগর কালকূটের বিষ
শঙ্খিনী, পদ্মিনী আর যত বিষধরের বিষ
যদি তুই আমার অমুককে না ছেড়ে যাস
তবে কামরূপ কামাক্ষার মা মনসার মাথা খাস॥'

কোনো কোনো মন্ত্রে 'হজরত আলী' (রা.) এবং 'মা ফাতিমা' (রা.)-এর নামও উচ্চারণ করতে শোনা যায়। সাধারণ বিচারে মন্ত্র আসলে লোকসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। সংক্ষেপে জাদুবিদ্যা প্রদর্শনে ব্যবহৃত সূত্র বা ফরমুলাকেই মন্ত্র বলা চলে। সাধারণত কাউকে সহায়তা, রক্ষা বা অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে উপকারী নানাবিধ অতিপ্রাকৃত আত্মাগুলোকে মন্ত্রের সাহায্যে আবাহন করা হয়ে থাকে। দুষ্ট ভৌতিক আত্মা-সৃষ্ট মন্দ ফল দূর করার রক্ষাকবচ হিসেবেও মন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ডাইনিবিদ্যায় মন্ত্রের সাহায্যে দুষ্টশক্তিকে উপস্থিত করার মাধ্যমে অসৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

প্রায় সব মন্ত্রই উচ্চারিত হয় ছন্দে। যেমন, 'আওলা চাল বকের পাক/ যেমন পিঠা তেমন থাক'। এটি হলো পিঠা নষ্ট করার একটি মন্ত্র। তৈরি খাবারে 'নজর' দিলে বদহজম হয়—এ বিশ্বাসও গ্রামের মানুষের আছে এবং সে জন্য নির্দিষ্ট ছড়াও আছে। বড়শি দিয়ে মাছ শিকারের জন্যও আছে বিভিন্ন মন্ত্র। রোগব্যাধিকে দীর্ঘস্থায়ী করা, আবার রোগ সারানোর জন্যও মন্ত্রের অভাব নেই। মন্ত্রের ভাষায় হিন্দু ও মুসলমানের ঐতিহ্য কোথাও আলাদাভাবে, কোথাও মিশ্রভাবে আছে। কোনো কোনো দেব-দেবী, পীর-পীরানি বা ধার্মিক ব্যক্তির দোহাইও আছে। মন্ত্রগুলো দুই থেকে আট-দশ চরণে ছন্দোবদ্ধ ও চরণাশ্রিত কতগুলো শব্দসমষ্টি; এর ভাষায় কোনো কবিত্ব নেই। উপলক্ষ বা প্রয়োজন ছাড়া যখন-তখন এবং যেখানে-সেখানে এগুলো উচ্চারিত হয় না।

**মন্ত্রপূত কবচ** অলংকৃত একধরনের বস্তু, যা বিভিন্ন ধরনের আপদ ও বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিধান করা হয়। এটাকে সাধারণত মন্ত্রপূত কবচ বলা হয়। আদিম মানুষের এটাই সম্ভবত প্রাচীন কেশ অলংকার। কিছু কিছু মন্ত্রপূত কবচ ছিল পূর্বপুরুষদের শরীরের অংশ দিয়ে নির্মিত। মন্ত্রপূত কবচ বিপদ থেকে রক্ষা করা ছাড়াও এটা মানুষের শক্তি, সম্পদ ও ভাগ্যের জন্য সহায়ক বলে মনে করা হতো। কোনো ব্যক্তির করোটি

কেটে যে কবচ তৈরি করা হয় সেটাকে বলা হয় করোটি কবচ। বিশ্বাস করা হতো, করোটি কবচের কিছু জাদুকরি গুণ ছিল।

**মন্ত্রায়ণ** সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর এক বৌদ্ধ সম্প্রদায়, যারা দুর্বোধ্য শব্দ বা বাক্যাংশের জাদুর মাধ্যমে বৃষ্টি আনয়ন, অশুভ শক্তির বিতাড়ন, দেব-দেবীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং বৌদ্ধত্বপ্রাপ্তির প্রয়াস পেতেন।

**মন্দির স্থাপত্য** গুপ্ত যুগ হিন্দু পুনর্জাগরণের যুগ। এ সময় প্রচুর পাথরের মন্দির তৈরি হয়। রাজা ও বিত্তবানদের আনুকূল্যে মন্দিরের কাঠামোর প্রতিটি অংশ কীভাবে নির্মিত হবে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধান ও বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল শিল্পশাস্ত্রে।

**মমি** প্রাচীন মিসরে বিশেষভাবে সংরক্ষিত মরদেহ। মিসরে মূলত রাজা এবং রাজপরিবারের সদস্যদের মরদেহ সংরক্ষণের জন্য মমি করে রাখা হতো। মমিকে ঢেকে রাখা ও সৌন্দর্য রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হতো একটি কাষ্ঠফলক। মমির কাষ্ঠফলকের ওপরের অংশে মৃত ব্যক্তির প্রতিকৃতি এঁকে সাজানো হতো এবং নিচের অংশে, যেখানে মমি শায়িত, সেখানটা বেগুনি রঙে রাঙানো হতো। পবিত্র কোরআনের সুরা ইউনুস-এর ৯২ আয়াতে বলা হয়েছে, '(আল্লাহ বললেন, 'ফেরাউন!) আজ আমি তোমার দেহকে সংরক্ষণ করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের নিদর্শন হয়ে থাকো। অবশ্য মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার নিদর্শন সম্বন্ধে খেয়াল করে না।'

**ময়দানব** দিতিপুত্র ময় এক মায়াবী দানব। দানবদের মধ্যে বিশ্বকর্মার মতো এক অদ্বিতীয় শিল্পী। হাজার বছর আরাধনা করে তিনি ব্রহ্মার বর পান এবং শুক্রাচার্যের সমস্ত শিল্পবিদ্যার অধীশ্বর হন। 'ময়মত' নামক গৃহনির্মাণশিল্প গ্রন্থের প্রণেতা হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পাণ্ডবদের জন্য ময় ইন্দ্রপ্রস্থ নগর নির্মাণ করেন। তাঁর ঔরসে অপ্সরা হেমার গর্ভে মন্দোদরীর জন্ম হয়। রাবণের সঙ্গে মন্দোদরীর বিয়ে হয়। হেমাকে বিয়ে করার অপরাধে ইন্দ্র ময়দানবকে বজ্রাঘাতে বধ করেন।

**মরসিয়া** আভিধানিক অর্থ শোক প্রকাশ। পরিভাষা অনুযায়ী যে কাব্যে কোনো ব্যক্তির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ এবং তাঁর গুণাবলি বর্ণনা করা হয়, তাকে 'মরসিয়া' বলে। কারবালার শহীদদের স্মরণে যে মরসিয়া, তা চতুষ্পদী কবিতাকারে রচনা করা হতো। পরে মুসাদদাস আকারে মরসিয়া লেখার প্রচলন হয়।

**মরিয়ম (আ.)** হজরত ঈসা (আ.)-এর মাতা। বিশ্বাসীদের মতে, তিনিই একমাত্র মহিলা, যাঁকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেননি, অথচ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় তাঁর সন্তান হয়। পবিত্র কোরআনে মরিয়ম নামে একটি সুরা আছে। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে আকসায় থেকে স্বর্গীয় আহার্য অহরহ লাভ করতেন। জিবরাইল যখন তাঁকে সংবাদ দেন যে, তাঁর পুত্রসন্তান হবে, তখন তিনি বললেন: 'আমাকে কোনো পুরুষ কখনো স্পর্শ করেনি, কীভাবে আমার সন্তান হবে।' তাঁকে বলা হয়, 'এভাবেই হবে, এটা সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ কাজ।' ইংরেজিতে মেরি এবং হিব্রু ভাষায় তাঁর নামের উচ্চারণ মিরিয়াম। বাইবেল মতে, গাব্রিয়েল তাঁকে সুসংবাদ দেন যে তিনি ত্রাণকর্তাকে জঠরে ধারণ করবেন। মরিয়মের কুমারী অবস্থায় যিশু জন্ম গ্রহণ করেন। গাব্রিয়েল মরিয়মকে জানান, 'পবিত্র আত্মা তোমার ওপর আসবেন এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার ওপর ছায়াপাত করবে; এই কারণ, যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাবে।' বাইবেলমতে, নাজারেত নগরের এক সূত্রধর জোসেফের সঙ্গে মরিয়মের বিয়ে হয়।

**মরো** স্প্যানিশ মুর থেকে শব্দটি উদ্ভূত। ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত মিনদানাও, সুলু দ্বীপপুঞ্জ ও বোর্নিওর মুসলিম অধিবাসীদের সম্প্রদায়গত নাম মরো, যা স্প্যানিশ মুর শব্দের উচ্চারণভেদ মাত্র। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমান ধর্মপ্রচারকেরা এদের ধর্মান্তরিত করেন। মরোরা লেখার সময় স্বরবর্ণযুক্ত আরবি ব্যবহার করে থাকে। এরা দুর্ধর্ষ, গর্বিত, স্বাধীনতাকামী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

**মর্টমেইন** ধর্মীয়, দাতব্য, ব্যবসামূলক সমবায় প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন সম্পত্তি। আইনগত স্থায়ী অস্তিত্বের অধিকারী হিসেবে এ-জাতীয় প্রতিষ্ঠান সরকারকে কর না দিয়ে সম্পত্তি

ভোগদখল ও বৃদ্ধি করতে পারে। ত্রয়োদশ শতকে চার্চের সম্পত্তি নিয়ে চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। উনবিংশ শতকে চার্চের সম্পত্তিগত অধিকার বহুল পরিমাণে খর্ব করা হয়।

**মর্মন** খ্রিষ্টধর্মের একটি শাখা। লেটার-ডে সেন্ট চার্চের সদস্যদের এই নামে অভিহিত করা হয়। জোসেফ স্মিথ দাবি করেন, নিউ ইয়র্কের প্যালমাইরায় তাঁর ওপর স্বর্ণফলকে লিখিত মর্মন ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। ওহাইও-র কির্টল্যান্ডে তাঁর ধর্মের একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মিজুরিতে অন্য সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে বিরোধের ফলে তাদেরকে ইলিনয়ের নভু শহরে চলে যেতে হয়। ১৮৪৪-এ স্মিথ ও তাঁর ভাই হাইরাম জনতার আক্রমণে নিহত হন। মর্মনরা গ্রেট সল্ট লেকে বসতি স্থাপন করে (১৮৪৭)। ব্রিগাম ইয়ংয়ের নেতৃত্বে তারা নিজেদের সুষ্ঠু অর্থনীতি গড়ে তোলে। এই ইয়ংয়ের বহুবিবাহবাদ ঘোষণার ফলে কংগ্রেসের উদ্যোগে বহুবিবাহ-নিরোধ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। বহুবিবাহ প্রথার দরুন ইউটার স্টেট মর্যাদা লাভ ব্যাহত হয়। পরে ১৮৯০ সালে মর্মনদের প্রেসিডেন্ট উইলফোর্ড ডডরাফ এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের আইন মর্মনদের ওপর প্রযোজ্য ঘোষণা করার পর ইউটা স্টেটের মর্যাদা লাভ করে।

**মর্মবাদ, মরমিয়াবাদ** বা **অতীন্দ্রিয়বাদ** (Mysticism) সাধারণ অর্থে মর্মবাদ বলতে যুক্তি-নিরপেক্ষ বিশ্বাসকে বোঝায়। খ্রিষ্টীয় মর্মবাদের উদ্দেশ্য স্রষ্টার সঙ্গে একাত্মতা সাধন। মর্মবাদী সাহিত্যে কয়েকটি পৃথক স্তর বিন্যাস করা হয়ে থাকে। অতীন্দ্রিয় সাধনার সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টির (সমাধির অবস্থায় দৃষ্ট প্রত্যাদেশের) যোগাযোগ থাকা ও না-থাকা দুই-ই সম্ভব। সেন্ট অগাস্টিন, সেন্ট গ্রেগরি (প্রথম), বিংগেনের সেন্ট হিলডগার্ড, হিউ অব সেন্ট ভিকটর, ডেকোপনে দ্য ডোদি, সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস, রামোন লাল, নিকোলাস অব কিউসা, সিএনার সেন্ট ক্যাথারিন, সেন্ট জন অব দ্য ক্রস, আভিলার সেন্ট টেরিসা এবং লিযিঅ্যার সেন্ট টেরিসা খ্রিষ্টান জগতের কয়েকজন বিখ্যাত অতীন্দ্রিয়বাদী। প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে 'সোসাইটি অব ফ্রেন্ডস (কোয়েকারগণ) মর্মবাদের বিকাশের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ইহুদি জগতে ক্যাবালা সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ইহুদিদের হাসিদিম সম্প্রদায় মর্মবাদী। ইসলামে সুফিবাদ মর্মবাদের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ।

**মসজিদ** মুসলমানদের উপাসনালয়। আক্ষরিক অর্থে সিজদা করার স্থান। মুসলমানদের ধর্মীয় প্রয়োজনে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধদের প্রচলিত মন্দিরের তুলনায় তা অন্য রকম। মূলত ধর্মাচারে অংশগ্রহণের ধরনের জন্যই এই পার্থক্য। মন্দিরে একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত একটি দেবমূর্তির সামনে বসে পূজা করেন; তিনি একাই প্রার্থনাকক্ষের ভেতরে প্রবেশ করেন, আর সাধারণ পূজারিদের সবাই বাইরে অপেক্ষা করে। সমবেতভাবে প্রার্থনা করার মতো মুসলমানদের জন্য প্রয়োজন একটি প্রশস্ত স্থান, বিশেষ করে শুক্রবারে, যেদিন সবাইকে জামাতে নামাজ পড়তে হয়। মসজিদে কোনো পবিত্র দেবমূর্তি-সংবলিত গর্ভগৃহ থাকে না। মুসল্লিদের সবাইকে প্রার্থনায় ইমামের পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হয়। একমাত্র অপরিহার্য স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মিহরাব-কিবলা থাকে। এই কিবলা থাকে মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র তীর্থস্থান কাবার দিকে।

**মসজিদুন্নববী** মদিনায় আগমনের পর মহানবী (সা.) প্রথম যে মসজিদ নির্মাণ করেন। আরবিতে এর অর্থ হলো নবীর মসজিদ। নাজ্জার গোত্রের দুজন বালকের কাছ থেকে কেনা ভূমিতে মহানবী (সা.) ও তাঁর সহচররা নিজেদের একান্ত শ্রমে মসজিদটি নির্মাণ করেন। কাঁচা ইটের দেয়াল, খেজুরগাছের খুঁটি এবং খেজুরপাতার চালা এই মসজিদের বৈশিষ্ট্য। মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের দিক থেকে মসজিদুল হারামের পরই এর স্থান। মহানবী (সা.) বলেছিলেন, এখানে এক রাকাত নামাজের সওয়াব সাধারণ মসজিদের ৫০ হাজার রাকাতের সওয়াবের সমান। এখানে বিশ্বনবী (সা.)-এর রওজা থাকা এই মসজিদের গুরুত্ব অনেক বেশি। হাজিরা হজপর্ব সুসম্পন্ন করার পর রওজা শরিফ জিয়ারত করেন।

**মসজিদুল আকসা** বায়তুল মুকাদ্দাস নামেও সমধিক পরিচিত। পবিত্র কোরআনে রাসুলুল্লাহর (সা.) মিরাজের আলোচনায় বিশেষভাবে এর উল্লেখ রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই মসজিদই ছিল মুসলমানদের কিবলা, অর্থাৎ এর দিকে মুখ করে নামাজ পড়া হতো। প্রথম সুলাইমান (আ.) এই মসজিদ নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় খলিফা ওমর এর সম্প্রসারণে কাজ করেন। মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের দিক বিচারে এই মসজিদটি তৃতীয় স্থান অধিকার করে। তফসিরকারদের মতে, এই মসজিদেই মহানবী (সা.) নবীদের নামাজে ইমামতি করেছেন। মক্কা শরিফের মসজিদের পর এই মসজিদই সর্বাধিক প্রাচীন।

**মসজিদুল হারাম** মক্কা শরিফের এই মসজিদ দুনিয়ার প্রথম, শ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ। মুসলমানদের তীর্থস্থান। প্রতিবছর হজের সময় অগণিত মুসলমান এখানে সমবেত হন। হজরত ইবরাহিম (আ.) এর অভ্যন্তরীণ চত্বরে কাবা শরিফ বা আল্লাহর ঘর নির্মাণ করেন। এর দিকে মুখ করেই নামাজ পড়তে হয়। জমজম কূপ ও 'মুকামে ইবরাহিম' কাবা গৃহের সন্নিকটে। বহুদিন পৌত্তলিকদের আয়ত্তে থাকার পর মক্কা বিজয়ের দিন থেকে নামাজ পুনরারম্ভ হয়। হজরত ওমর (রা.), হজরত উসমান (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) এবং আব্বাসীয় বংশের খলিফা মাহদি পর্যায়ক্রমে এর সম্প্রসারণ করেন। মুসলমানদের চার মজহাবের কারণে চারটি জামাতের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই মসজিদে নামাজ আদায়ের সওয়াব সর্বাধিক।

**মসজিদে দিরার** মহানবী (সা.)-এর আমলে ইসলামকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মদিনার মুনাফিকরা একটি মসজিদ নির্মাণ করে, মুসলমানরা এতে গমন করে পথভ্রষ্ট, পাশাপাশি মহানবী (সা.)-এর মসজিদ ও প্রকৃত মুসলমানদের অন্যান্য মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখা ছিল এর উদ্দেশ্য। মহানবী (সা.)-কে মুনাফিকদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত করা হলে তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। যেসব মসজিদ অথবা প্রতিষ্ঠান কলহ-দ্বন্দ্বের মাধ্যমে গড়ে ওঠে সেগুলোর ব্যাপারেও একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

**মহর** এই আরবি শব্দের অর্থ স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে প্রদত্ত অর্থ। প্রাক-ইসলামি যুগেও এর প্রচলন ছিল, তবে মহরের সেই টাকা তখন সাধারণত কনের অভিভাবকেরাই ভোগ করত। ইসলাম এর ওপর স্ত্রীর নিরঙ্কুশ অধিকার ঘোষণা করে। এটা বিয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মহরের নিম্নতম পরিমাণ দশ দিরহাম, ঊর্ধ্ব পরিমাণ অনির্দিষ্ট।

**মহাদেব** শ্রেষ্ঠ তিন দেবতার অন্যতম। তাঁর আরেক নাম শিব। তিনি পরমেশ্বরের সংহারশক্তিস্বরূপ। মহাপুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট হয়ে তিনি তপস্যামগ্ন হন, এবং এ ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করে ধারণ করেন যোগী বেশ। ব্যাঘ্রচর্ম তাঁর পরিধেয়, সর্প তাঁর কটিবন্ধ ও উত্তরীয়, ভস্ম তাঁর বিভূতি এবং নন্দী তাঁর পার্শ্বচর। মহামুনি অত্রির তিনি শিষ্য। ঈশ্বরের সংহারমূর্তি বলে তিনি সব ধরনের অস্ত্রচালনায় সুদক্ষ। ত্রিশূল তাঁর প্রধান আয়ুধ। তাঁর ধনুর নাম পিনাক। যুদ্ধের সময় এটি শরনিক্ষেপ ও অন্য সময়ে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সমরে তিনি অজেয়। ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করে তিনি ত্রিপুরারি উপাধিতে ভূষিত হন। বিষ্ণুর সহায়তায় তিনি জলন্ধরকে বধ করেন। এ ছাড়া বাণাসুরকে সাহায্য করার জন্য শোণিতপুরে গেলে সেখানে সংঘটিত যুদ্ধে কৃষ্ণের কাছে তিনি পরাজিত হন।

দেবতাদের সমুদ্রমন্থনকালে তিনি সবার শেষে উপস্থিত হয়ে পুনরায় সমুদ্রমন্থনের ইচ্ছা পোষণ করেন। দ্বিতীয়বার মন্থনে হলাহল উত্থিত হলে তিনি তা পান করে নীলকণ্ঠ নাম ধারণ করেন। তপস্যায় অতি সহজে তুষ্ট হয়ে তিনি ঈপ্সিত বর প্রদান করে থাকেন বলে তাঁর আরেক নাম আশুতোষ। তাঁর বরপ্রভাবে বৃত্র, বাণ প্রমুখ দৈত্য উদ্দীপ্ত হয় এবং অত্যাচারী হয়ে ওঠে। পরে তারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। পরশুরাম তাঁর কাছেই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনে সমর্থ হন। বিশ্বামিত্রও তাঁর অস্ত্র লাভ করেন। অর্জুনের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁকে কিরাতবেশে দেখা দেন, এবং ছলে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে প্রসন্ন হয়ে তিনি অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন।

মহাদেব প্রথমত দক্ষরাজতনয়া সতীর পাণিগ্রহণ করেন। একদা ভৃগুর যজ্ঞে তিনি শ্বশুরকে যথোচিত অভিবাদন না করায় দক্ষ কুপিত হয়ে তাঁকে অবমাননা করার অভিপ্রায় নিয়ে শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সতী অনিমন্ত্রিতা হওয়া সত্ত্বেও পিতৃযজ্ঞে গমন করেন। সেখানে সতীকে দেখে দক্ষ অযথা শিবনিন্দায় আত্মরসনা কলুষিত করেন। পতিপরায়ণা সতী পতির নিন্দা শ্রবণে অভিমানে যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করেন। এ খবর পেয়ে মহাদেব ক্রোধে স্বীয় জটা ছিন্ন করার পর তা থেকে বীরভদ্রের উৎপত্তি হয়। বীরভদ্র দক্ষালয়ে গমন করে দক্ষের যজ্ঞনাশ ও মুণ্ডচ্ছেদ করেন। পরে মহাদেব সেখানে উপস্থিত হলে শাশুড়ি প্রসূতির অনুরোধে দক্ষকে পুনর্জীবন দান করেন। এরপর সতীর শবদেহ কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি উন্মত্তের মতো দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করতে উদ্যত হলে বিষ্ণু স্বীয় চক্রের আঘাতে সেই শবদেহকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেন। তখন মহাদেব মহাযোগে নিমগ্ন হন। এদিকে সতী হিমালয়ের গৃহে পার্বতী নাম ধারণ করে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে মহাদেবকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞ হন। মদন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করতে গিয়ে তাঁর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যান। পার্বতী নিরন্তর কঠোর তপস্যা করার পর ঈপ্সিত স্বামীকে কাছে পান। কার্তিকেয় ও গণেশ নামে তাঁদের দুই সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গাও মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন।

তাঁর কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী। তিনি স্বয়ং যোগী, কুবের তাঁর ধনরক্ষক। উত্তেজক দ্রব্য পানের পর মহাদেব স্ত্রীর সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্যে রত হন। মতান্তরে বিশ্বধ্বংসের সময় তিনি যে নৃত্য করবেন সেই নৃত্যকেই তাণ্ডব নৃত্য বলা হয়। শ্মশানে মহাদেব সর্পজড়িত মস্তকে ও গলদেশে কঙ্কালমালা ভূষিত অনুচরদের সঙ্গী হয়ে ভ্রমণ করেন। ধ্যানমগ্ন মহাদেবের তৃতীয় নয়নের ওপর অর্ধচন্দ্র, মাথায় জটা, পরিধানে রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণসার মৃগচর্ম, গলদেশে সর্পের উপবীত, হস্তে ডমুর এবং দুর্জনের শাস্তির জন্য মুদ্গর।

**মহাদেবের তৃতীয় নেত্র** পার্বতী একবার পরিহাসচ্ছলে মহাদেবের দুই চোখ হাত দিয়ে ঢেকে দেন। ফলে সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং মানুষের সৃষ্ট সবকিছু বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। তখন পৃথিবীকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মহাদেব তৃতীয় চোখ ধারণ করেন। তাঁর এই চোখের জ্যোতিতে মহাদেব হিমালয়কে আবার আগের মতোই সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন। প্রলয়কালে তাঁর তৃতীয় নেত্রাগ্নিতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে বলে বিশ্বাস।

**মহাপাতক** হিন্দু শাস্ত্রমতে, কতিপয় গুরুতর পাপ। স্মৃতিশাস্ত্রে পাপের নানা ধরনের শ্রেণীবিভাগ আছে। এসবের মধ্যে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের সর্বস্বহরণ, গুরুপত্নীহরণ এবং এসব পাপাচরণকারীর সংসর্গ—এই কয়টি পাপ মহাপাতক।

**মহাপুরাণ** বিষ্ণু পুরাণ ও ভগবৎ পুরাণকে মহাপুরাণ বলা হয়।

**মহাপ্রলয়** প্রত্যেক কালের শেষে পৃথিবী ধ্বংস হয়। তখন সপ্তলোক ও তাদের অধিবাসী, দেব-দেবী, ঋষিবৃন্দ, এমনকি ব্রহ্মা নিজেও এক মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হয়ে যান। হিন্দু শাস্ত্রমতে, প্রত্যেক যুগের শেষে প্রলয়কাণ্ডে একবার করে পৃথিবী বিধ্বস্ত হয় এবং পুনরায় নতুন করে বিশ্বের সৃষ্টি হয়। প্রতি মহাপ্রলয়ে সপ্তলোকের সমস্ত প্রাণী, মুনি-ঋষি, দেবতাবৃন্দ এবং স্বয়ং ব্রহ্মা পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যান।

**মহাপ্রাণবা** (Animatism) প্রকৃতির ঝড়ে বস্তু ও নৈর্ব্যক্তিক অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস। আদিম মানুষের পক্ষে আত্মার ধারণায় পৌছতে হলে সর্বাগ্রে যে বিশ্বাস ও অনুভূতির প্রয়োজন তা হলো প্রকৃতির জড় বস্তুতে একটি নৈর্ব্যক্তিক অতিপ্রাকৃত শক্তির ধারণা আরোপ। কোনো বস্তুতে আত্মা-প্রেতাত্মার ধারণা আরোপের চেয়ে তাতে নৈর্ব্যক্তিক অতিপ্রাকৃত শক্তি রয়েছে—এ বিশ্বাস সহজে বোধগম্য। ম্যারেট মেলেনেশীয়দের মধ্যে মহাপ্রাণ একটি শব্দ 'মানা'-র অর্থ বিশ্লেষণ করে তাঁর তত্ত্ব দাঁড় করান। মানা বলতে বোঝায় একটি অস্বাভাবিক ও অসাধারণ শক্তি। কিন্তু এটা কোনো জীবনীশক্তি বা আত্মা-প্রেতাত্মা নয়।

**মহাপ্লাবন** নুহ (আ.)-এর সময়ের বন্যাকে পবিত্র কোরআনে এমন কোনো প্লাবন হিসেবে দেখানো হয়নি, যা পুরো পৃথিবীর সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল (৭:৬৪; ১১:৪০)। নুহ (আ.) যাদের কাছে দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু যারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, ডুবে গিয়েছিল শুধু তারাই। উপরন্তু, এই প্লাবনে শুধু নুহ (আ.)-এর সম্প্রদায় দুর্গত হয়, পুরো পৃথিবী নয়। পুরো পৃথিবী ভেসে যাওয়ার কথা তোলা হয় বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে। বাইবেল ও সুমেরীয়-ব্যাবিলনীয় পুরাণে যে মহাপ্লাবনের কথা বলা হয়, সেটা সম্ভবত বরফযুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পরের পৃথিবীব্যাপী মহাবান। ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের মাটির নিচে আর্কিওলজিস্টরা কাদার বিশাল এক স্তর আবিষ্কার করেন, যা থেকে টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর দুই পাশের অববাহিকা আর উপত্যকা আক্রান্ত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তুরস্কের কাছে, আরারাতে, জুদি পর্বতের ওপরই সবাইকে সঙ্গে নিয়ে নুহ (আ.) বিশ্রাম করেছিলেন, পবিত্র কোরআনে এমন ভাষ্যই পাওয়া যায় (১১:৪৪)। ভ্যান হ্রদের দক্ষিণে ছিল উল্লিখিত পুরো এলাকা।

**মহাবংশ** বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত শ্রীলঙ্কার বিখ্যাত ছন্দোবদ্ধ বৃত্তান্তটি পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধে বা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমাংশে রচিত হয়। ভিক্ষু মহানাম এর রচয়িতা বলে কথিত। দীপাঙ্কের সঙ্গে এর সাদৃশ্য থাকলেও গ্রন্থটি পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে আরও বিস্তৃত এবং সাহিত্যিক শৈলীসমৃদ্ধ। পরে তিন পর্যায়ে আধুনিক কাল পর্যন্ত মহাবংশের সংস্করণ হয়। পরবর্তীকালের বৃত্তান্ত চুলবংশ নামে পরিচিত।

**মহাবিদ্যা** কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—এই ১০ জন মহাবিদ্যা। দশ মহাবিদ্যা দ্র.

**মহাবোধি সোসাইটি** শ্রীলঙ্কা ও ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ এবং বৌদ্ধদের উন্নতির জন্য শ্রীলঙ্কার পণ্ডিত অনাগারিক ধর্মপাল ১৮৯১ সালের ৩১ মে শ্রীলঙ্কার কলম্বো শহরে 'মহাবোধি সোসাইটি অব শ্রীলঙ্কা' গঠন করেন। তারই ভারতীয় শাখা হিসেবে ১৮৯২ সালে কলকাতায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

**মহাভারত** কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য। পৃথিবীর বৃহত্তম মহাকাব্য। প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের মতে, খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের পূর্বে এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে, খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ ও খ্রিষ্টাব্দ ২০০ অব্দের মধ্যে রচিত। কথিত আছে, বেদব্যাস বদরিকা আশ্রমে তিন বছরকাল ধরে এটি রচনা করেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ষষ্ঠ পর্বের অন্তর্ভুক্ত। এটা পঞ্চমবেদ নামেও প্রসিদ্ধ। মহাভারতে ষোলোমাত্রিক চরণের এক লাখ শ্লোক আছে। এটা অষ্টাদশ পর্বে এবং একশত পর্বাধ্যায়ে বিভক্ত। এর পর্বগুলোর নাম : আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ। মহাভারতের কাহিনিটি সংক্ষেপে এই: হস্তিনাপুরের রাজার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলে কনিষ্ঠ পাণ্ডু রাজ্যাধিকারী হন। কিন্তু পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ভীষ্মের সহযোগিতায় ধৃতরাষ্ট্র রাজা হন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা প্রপিতামহ কুরুর নামানুসারে কৌরব বা কুরু এবং পাণ্ডুর পুত্ররা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব পিতার নামানুসারে পাণ্ডব নামে পরিচিত। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজে অভিষিক্ত করেন এবং পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে হস্তিনাপুরে বাস করতে থাকেন। তাদের শ্রীবৃদ্ধিতে ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর শতপুত্র, দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ, চিত্রসেন প্রমুখের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হলে বারণাবতের জতুগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাঁরা সেই সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা পান। পাঞ্চাল রাজকন্যার স্বয়ংবর সভায় অর্জুন প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে দ্রৌপদীকে লাভ করেন; এবং দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী হন। অতঃপর ভ্রাতৃবিরোধ নিবারণ করে, ভীম দ্রোণাদির পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দান করেন এবং খাণ্ডবপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করতে বলেন। সেখানে পাণ্ডবরা ধনেমানে যশস্বী হয়ে উঠলে দুর্যোধন কপট দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবদের পরাজিত করেন। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীসহ সর্বস্ব হারান এবং সভামধ্যে ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদী ও ধনসম্পত্তিসহ পাণ্ডবদের মুক্তি দেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হলে পাণ্ডবরা

শর্তানুযায়ী যাত্রা করেন বারো বছরের বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাত বাসে। নির্দিষ্ট বনবাস অতিক্রান্ত হলে পাণ্ডবরা দ্রৌপদীসহ মৎস্যরাজ্য আক্রমণ করলে পাণ্ডবরা বিরাটের পক্ষাবলম্বন করেন। এভাবে ১৮ দিন ধরে চলা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে যায়; এবং বিজয়ী পাণ্ডব পক্ষে পঞ্চপাণ্ডব ও অর্জুনের সারথি কৃষ্ণ ছাড়া সমগ্র বাহিনী নিহত হয়। যুদ্ধ শেষে জয়ী জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির রাজা হন এবং এর ১৫ বছর পর বনবাসী ধৃতরাষ্ট্র দাবাগ্নিতে স্ত্রী গান্ধারী ও পাণ্ডুর স্ত্রী কুন্তীর সঙ্গে সমাধিস্থ অবস্থায় প্রাণ বিসর্জন দেন। কুরুবংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণের মৃত্যুসংবাদ শুনে যুধিষ্ঠির অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন এবং পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীসহ যাত্রা করেন মহাপ্রস্থানের পথে। এই সময় একটি কুকুর তাঁদের সঙ্গী হয়। পথে চার পাণ্ডব ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর পতন হলে যুধিষ্ঠির কুকুরসহ সশরীরে পৌছান স্বর্গদ্বারে। ইন্দ্র তাঁকে কুকুরের সঙ্গ ত্যাগ করে স্বর্গে প্রবেশ করতে বলেন। কিন্তু ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্মভয়ে ভীত হয়ে সঙ্গী কুকুরটিকে ত্যাগ করে স্বর্গে যেতে রাজি হননি। তখন কুকুররূপী ধর্ম আপন মূর্তি ধারণ করেন এবং যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করেন। কিন্তু স্বর্গে আপন স্ত্রী ও ভ্রাতাদের দেখতে না পেয়ে যুধিষ্ঠির নরকবাসী হতে চান এবং তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় নরকে। প্রকৃতপক্ষে এটাও ছিল পরীক্ষামাত্র এবং তৃতীয়বারের পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হলে সকলেই স্বর্গে মিলিত হন।

**মহাভারতের লিপিকার** এক লাখ শ্লোক-সংবলিত অষ্টাদশ পর্বের মহাভারত কে লিপিবদ্ধ করবে—এই দুর্ভাবনায় কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মার উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি তাঁর পুত্র গণেশের নাম সুপারিশ করেন। গণেশ এই শর্তে লিপিকার হতে সম্মত হন যে তাঁর লেখনী ক্ষণমাত্রও থামানো যাবে না। ব্যাস ভাবলেন, তাঁর রচনায় ৮ হাজার ৮০০ এমন শ্লোক আছে, যার অর্থ গণেশ বুঝতে পারবেন কি না সন্দেহ। তাই তিনি গণেশের শর্তে রাজি হয়ে এই মর্মে একটা পাল্টা শর্ত আদায় করলেন যে তিনি যখন বলে যাবেন তখন তার অর্থ না বুঝে লিখতে পারবেন না। বেশির ভাগ শ্লোক জানা থাকলেও কঠিন শ্লোক লেখার সময় সর্ববিষয়ে পণ্ডিত গণেশকে সময়ে সময়ে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হতো। সেই অবসরে ব্যাস বহু শ্লোক মনে মনে রচনা করে নিতেন।

**মহামায়া** কপিলাবস্তুর সন্নিকটস্থ দেবদহ নগরের নৃপতি অঞ্জনের ঔরসে রানি যশোধরার গর্ভে জন্ম, সিদ্ধার্থের মাতা। কুমারী মায়া ছিলেন সর্বসুলক্ষণা ও রূপসী। দেবদহে প্রচলিত প্রথানুযায়ী মেয়েদের মধ্যে সব বিদ্যায় পারদর্শিনী ও গৃহকর্মে নিপুণা হওয়ার পর ১৭ বছর বয়সে তিনি 'মহা' উপাধিতে ভূষিতা হন এবং ১৯ বছর বয়সে কপিলাবস্তুর যুবরাজ শুদ্ধোধনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর বহু বছর নিঃসন্তান থাকায় শুদ্ধোধন তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর কনিষ্ঠা মহাপ্রজাপতিকে বিয়ে করেন। এই সময় মহামায়া ভোগবিলাসে নিস্পৃহ, শুচিশুদ্ধ জীবন যাপন করতেন। এরপর শাক্যদের রাজকীয় উৎসব আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে নিজের গর্ভে সন্তান আগমনের কথা জানতে পারেন। ১০ মাস গর্ভে ধারণের পর পিতৃগৃহে যাওয়ার পথে লুম্বিনী উদ্যানে শালগাছের নিচে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। নবজাতকের নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ বা গৌতম।

**মহাযান** বৌদ্ধধর্মের দুটি মূলধারার একটি, অন্যটি হীনযান। 'মহা' অর্থ মহৎ বা উৎকৃষ্ট এবং 'যান' অর্থ মার্গ, উপায় বা শকট। বুদ্ধ-নির্দেশিত নির্বাণে উপনীত হতে যে মহৎ মার্গ বা উপায় অবলম্বন করা হয়, তার নাম মহাযান। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর সংঘে সংঘাত শুরু হলে বৌদ্ধরা থেরবাদ এবং মহাসাংঘিক—এ দুটি প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। এ দুটি ধারা থেকে আবার মোট ১৮টি ধারার উদ্ভব হয়, যার একটি মহাযান পন্থা। এটি মহাসাংঘিক ধারার অন্তর্ভুক্ত।

নির্বাণ বা মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধ 'অষ্টাঙ্গিক মার্গের' প্রচার করেন। সত্যদৃষ্টি, সদ্বাক্য, সৎকর্ম, সৎসংকল্প, সৎজীবন, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি ও সম্যক সমাধি হলো এই আটটি পথ। বুদ্ধের এই সহজ ও সরল নীতিধর্মে বহু দেব-দেবী প্রবেশলাভ করে এবং বুদ্ধ স্বয়ং অবতাররূপে পূজিত হতে থাকেন। এই অবতারবাদে বিশ্বাসী ও ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তিপূজারি বৌদ্ধদের ধর্মমত 'মহাযান' নামে পরিচিত।

মহাযানীদের মতে, বুদ্ধ হচ্ছেন ঈশ্বর এবং সিদ্ধার্থ গৌতম তাঁর প্রতিভূ। গৌতম বুদ্ধের আগে ২৬ জন বুদ্ধ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সিদ্ধার্থ ২৭তম বুদ্ধ এবং জীবের মুক্তির জন্য তিনি বারবার পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। নাগার্জুন ছাড়া এ মতবাদের আরও কয়েকজন বিখ্যাত দার্শনিক হলেন চন্দ্রকীর্তি, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙনাগ, ধর্মকীর্তি, অশ্বঘোষ, অতীশ দীপঙ্কর প্রমুখ। জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান, মঙ্গোলিয়া, চীন, তিব্বত, ভিয়েতনাম, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধরা মহাযান পন্থার অনুসারী।

**মহালয়া** আশ্বিন মাসের অমাবস্যা। এই তিথিতে হিন্দুরা পিতৃবর্গের উদ্দেশে পার্বণ শ্রাদ্ধ করে থাকেন। কৃষ্ণা প্রতিপদে যে তর্পণ আরম্ভ হয়, এই তিথিতে এসে তা শেষ হয়। মহালয়া থেকে দেবীপক্ষ আরম্ভ হয়।

**মহিষমর্দিনী** দুর্গার অপর নাম। মহিষাসুরকে বধ করে তিনি এই নামে পরিচিত হন। মহিষাসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে দেবতারা বহু চেষ্টা করেও অসুরকে বধ করতে অসমর্থ হন। ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষদের অবাধ্য ছিল। তখন দেবতাদের প্রার্থনায় দেবী দুর্গা অষ্টাদশহস্তরূপিণী হয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর চক্র দিয়ে মহিষাসুরের মস্তক ছেদন করেন। মহিষমর্দিনী-মূর্তি দুর্গার রুদ্রভাবের পরিচয় দেয়। শরৎকালে বাংলায় দুর্গার যে পূজা হয়, তা এই মূর্তি থেকেই উদ্ভূত। মার্কণ্ডেয় পুরাণে অসুরের সঙ্গে যুদ্ধনিরত এই অষ্ট বা দশভুজা সিংহারোহিণী দেবীর বর্ণনা আছে। তাঁর হাতে থাকে শর, খড়গ, ধনু, ত্রিশূল ও নাগপাশের নানা অস্ত্র।

**মহিষাসুর** হিন্দু পুরাণোক্ত দৈত্যবিশেষ। মহাদেবের বরে রম্ভ নামক অসুরের ঔরসে এই ত্রিলোকবিজয়ী অসুরের জন্ম। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি স্বর্গ অধিকার করেন। বিতাড়িত দেবতাদের মিলিত প্রার্থনার ফলে তাঁদের দেহ থেকে উদ্ভূত তেজে দেবী সৃষ্টি হয়। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পর দুর্গার হাতে মহিষাসুরের মৃত্যু হয়।

**মাইকেল** প্রধান স্বর্গীয় দূত। বাইবেলে তাঁকে রাজা বা যোদ্ধা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। খ্রিষ্টধর্মানুসারে তিনি শয়তানকে পরাজিত করেন, হাতে সর্বদা ধরা থাকে তরবারি। তিনি বিভিন্ন সময়ে মানবদেহ ধারণ করে মর্তে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর প্রধান ভোজোৎসব মাইকেলমাস নামে পরিচিত। ইসলামি মতে, তিনি ফেরেশতা মিকাইল (আ.)।

**মাইজভাণ্ডারি গান** সুফি সম্প্রদায়ের মাইজভান্ডারি তরিকার অনুসারীদের গীত মরমি গান। প্রায় ১০০ বছর আগে চট্টগ্রামে মাইজভাণ্ডারি তরিকার উদ্ভব। সৈয়দ আহমদউল্লাহ (১৮২৬-১৯০৬) এই আধ্যাত্মিক ধারার প্রবর্তক।

**মাইডাস** গ্রিক পুরাণকাহিনিতে উল্লেখিত ফ্রিজিয়ার রাজা। সুরা ও প্রজননশক্তির দেবতা সাইলেনাসের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের দরুন সাইলেনাসের শিষ্য সিরাকিউসের শাসক ডাইওনিসাস তাঁকে যাবতীয় বস্তু স্পর্শের মাধ্যমে স্বর্ণে পরিণত করার ক্ষমতা দান করেন। কিন্তু যখন খাদ্য পর্যন্ত তাঁর স্পর্শমাত্র স্বর্ণ হতে শুরু করে তখন তিনি প্রমাদ গোনেন এবং প্যাকটোলাস নদীতে স্নান করে তাঁর এই অদ্ভুত ক্ষমতা পরিত্যাগ করেন। মাইডাস নামে ফ্রিজিয়ার এক ঐতিহাসিক রাজা খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

**মাইনস** গ্রিক পৌরাণিক কাহিনিতে বর্ণিত ক্রিটের রাজা। জিউস ও ইউরোপার পুত্র, অ্যারিয়াডনি ও ফ্রিডার পিতা। তাঁর স্ত্রী প্যাসিফেই-এর গর্ভে মিনোটর-এর জন্ম হয়। মাইনস নামে সম্ভবত ক্রিটের একজন ঐতিহাসিক রাজা ছিলেন এবং তাঁরই নামানুসারে প্রাচীন মিনোয়ান সভ্যতার নামকরণ করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

**মাইমুনা** মহানবী (সা.)-এর পত্নী, (উম্মুল-মুমেনিন)। সম্পূর্ণ নাম মাইমুনা বিনতে হারিস ইবনে হাজান, ইবনে বুজাইরুল হিলালি। মহানবী (সা.) সপ্তম হিজরিতে ওমরার সময় তাঁকে বিয়ে করেন। মহানবী (সা.)-এর পত্নীদের মধ্যে সবশেষে ৬১ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**মাও নু** খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের তাও-পন্থী চীনা সন্ন্যাসিনী। ডাকনাম ইউ-সিয়াং। সমস্ত দেহ লোমাবৃত ছিল বলে তাঁর নাম মাও নু (লোমশ নারী)। তিনি নিজেকে চীন রাজবংশের চীন শিহ হুয়াং রাজপরিবারের লোক বলে দাবি করেন। চীন

বংশের পতনকালে তিনি সন্ন্যাসিনী হয়ে পর্বতে অবস্থান করতে থাকেন।

**মাজার** দরগাহর প্রতিশব্দ। এর ধাতুগত অর্থ 'জিয়ারতের স্থান'। মাজার বলতে সাধারণত আউলিয়া-দরবেশদের সমাধিস্থলকে বোঝায়। মাজারকে রওজা বা কবরও বলা হয়। এর নিকটবর্তী স্থানে মসজিদ, মক্তব ইত্যাদি গড়ে ওঠে। হজরত মোহাম্মদ (সা.) মদিনার কবরস্থান জান্নাত-আল বাকিতে এবং ওহোদযুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্ত সাহাবিদের কবরস্থানে গমন করতেন এবং তাঁদের জন্য দোয়া করতেন। কবরকে মসজিদে পরিণত করা অর্থাৎ সিজদাহ করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

**মাতসু** চীনা মৎস্যজীবীদের রক্ষাকর্ত্রী। তাঁর নামানুসারে তাইওয়ান প্রণালির দুই দ্বীপের নাম কামোই ও মাতসু রাখা হয়েছে। জাপান ও চীনের মধ্যে নৌবিরোধ এই দ্বীপকে ঘিরেই ঘটে চলেছে।

**মাথুর** রাধাকৃষ্ণলীলাকে অবলম্বন করে যশোর জেলার মধুসূদন কান (১২২০-৭৫ বাংলা) রচিত অষ্টাদশ শতাব্দীর যাত্রাপালার নাম। এই পালায় ঢপকীর্তন-জাতীয় গান তৎকালীন জনসাধারণের খুব প্রিয় ছিল।

**মাদারি ফকির** জিন্দাশাহ মাদারের অনুসারী ফকিরকুল এই নামে পরিচিত। বিখ্যাত ফারসি গ্রন্থ *দাবিস্তান*-এর লেখক এই শ্রেণীর ফকিরদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, এরা সন্ন্যাসী অবধূতদের মতোই মাথায় জটা ধারণ এবং শরীরে ছাই মাখে। এরা গলায় ও মস্তকে লোহার বেড়ি ধারণ করে এবং পরিধান করে থাকে কালো পাগড়ি। এরা নামাজ ও রোজার ধার ধারে না, অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে থাকে ও শরবত পান করে। অনেকে কাশ্মীর ও কাবুলের মতো শীতপ্রধান অঞ্চলেও খালি গায়ে চলাফেরা করে থাকে। তাদের বক্তব্য, বদিউদ্দিন মাদার হিন্দুস্থানে এসে যোগী হয়েছিলেন এবং হিন্দুরাও তাঁকে খুব মান্য করত। নওয়াবজাদা আবদুল আলীর মতে, মাদারি ফকিরদের চালচলন ও আচরণ বহুলাংশে ইসলামবিরোধী। তারা প্রধানত আতপ চাল, ঘি ও লবণ দিয়ে তৈরি আহার গ্রহণ করে থাকে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও এদের অনেকে কৌমার্য ব্রত পালন করত। এরা বসরিয়া তরিকার অন্তর্ভুক্ত তৈফুরিয়া, খুনওয়াদ্‌ ও তাবাগাতি ঘরের অনুসারী ফকির। আগে এই শ্রেণীর অনেক ফকির দেখা যেত; বর্তমানে এদের সংখ্যা কমে গেছে।

**মাদুলি** অশুভ শক্তির প্রভাব নষ্ট করার জন্য দৈবশক্তিসম্পন্ন বস্তুজ্ঞানে ব্যবহৃত কবচ। আবহমানকাল থেকেই নানা জাতের মানুষ এই শ্রেণীর মাদুলি ব্যবহার করে আসছে। প্রাচীনকালে মিসরীয়দের মধ্যে এই ধরনের মাদুলির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ইহুদিরাও ধর্মীয় বাণীখচিত কবচ ধারণ করত। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোকজন ক্রুশচিহ্ন ব্যবহার করে থাকে। মুসলমানদের তাবিজ ও হিন্দুদের মন্ত্রপূত কবচও এই শ্রেণীর দ্রব্য। জীবজন্তুর নখর বা দাঁত থেকে শুরু করে ধর্মীয় বাণী বা উক্তি এবং সূর্যদেবতার চক্র প্রভৃতি নানা প্রতীক মাদুলিতে ব্যবহার করা হয়। মূল্যবান পাথরও মাদুলি হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

**মাদ্রাসা** আরবি 'দারস' শব্দ থেকে উদ্ভূত। দারস-এর শাব্দিক অর্থ পাঠদান, যেখানে পাঠদানের কাজ চলে, তা-ই মাদ্রাসা। একসময় মসজিদুন্নব্বীর সংরক্ষিত অংশ সুফফাতে পাঠদানের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন স্থানে মসজিদে পাঠদানের জন্য একটি জাবিয়া বা পৃথক অংশ বরাদ্দ থাকত। মাদ্রাসার প্রাথমিক স্তর মক্তব, নুরানি বা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা নামে অভিহিত। ফোরকানিয়া শব্দের মূল 'ফোরকান', যার অর্থ 'বিশিষ্ট'। মিথ্যা থেকে সত্যকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে বলে পবিত্র কোরআনের আরেক নাম আল ফোরকান। প্রাথমিক স্তরের যেসব মাদ্রাসায় পবিত্র কোরআন পাঠ ও আবৃত্তি শেখানো হয়, সেগুলোকে বলা হয় দরসে পবিত্র কোরআন। সাধারণত স্থানীয় কোনো মসজিদেই আশপাশের পরিবারের ছোটদের প্রাথমিক পর্যায়ের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনরাই সাধারণত এর শিক্ষক বা ওস্তাদ হয়ে থাকেন।

মাদ্রাসাশিক্ষার উৎস হচ্ছে, রাসুল (সা.)-এর ওপর ওহি হিসেবে নাজিলকৃত প্রথম শব্দ ইকরা, অর্থাৎ পাঠ করো। মাদ্রাসাশিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান ছিল সাফা পর্বতের পাদদেশে জায়েদ-বিন-

আরকামের বাড়িতে, যেখানে স্বয়ং রাসুল (সা.) ছিলেন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী ছিলেন তাঁর কয়েকজন অনুসারী। হিজরতের পর মদিনায় মসজিদুন্নববীর পূর্ব পাশে স্থাপিত হয় মাদ্রাসা আহলে সুফফা। শিক্ষক ছিলেন উবাদা-ইবনে জবর গিফারি (রা.) প্রমুখ। উমাইয়া শাসকদের আমলে (৬৪১-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ) প্রাথমিক পাঠশালা হিসেবে মক্তব ও কুত্তাব গড়ে উঠতে শুরু করে। পরে আব্বাসি আমলে (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) আল-মামুন প্রতিষ্ঠিত বায়ত আল-হিকমা বা বিজ্ঞানভবন শিক্ষাদানের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে এবং মাদ্রাসাকে মসজিদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। মসজিদের বাইরে নিশাপুরে চারটি স্বতন্ত্র মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ১০৬৫-৬৭ সময়পরিসরে বাগদাদে গড়ে ওঠা নিজামিয়া মাদ্রাসাই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম সুবিদিত মাদ্রাসা। মুসলিম-অধ্যুষিত সব স্থানেই শিক্ষালয় হিসেবে মাদ্রাসা গড়ে ওঠে। তুর্কি বিজয়ের পর বাংলাদেশেও স্থাপিত হয় মাদ্রাসা।

*নিউ স্কিম মাদ্রাসা* আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ইসলামি শিক্ষার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক নতুন মাদ্রাসা-শিক্ষাব্যবস্থা। মওলানা আবু নসর ওহিদ ও মওলানা শিবলির মতো ব্যক্তিবর্গ এর পরিকল্পনা করেন। ১৯১৫ সালে প্রবর্তিত এই স্কিমের বৈশিষ্ট্য এখানেই যে, নতুন এই মাদ্রাসা-শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি ভাষা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয় এবং ফারসি শিক্ষা এর পাঠ্যসূচি থেকে বাদ দেওয়া হয়। চারটি সরকারি মাদ্রাসা পাঁচটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসা ও বেশ কয়েকটি ব্যক্তি-উদ্যোগের মাদ্রাসাকে এই স্কিমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কলকাতা মাদ্রাসা এর বাইরে থাকে। এর পাঠ্যসূচিতে ছিল উর্দু, বাংলা, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, ইংরেজি, আরবি, ড্রয়িং, সূচিকর্ম ও ড্রিল। উচ্চতর ক্লাসের পাঠে আরবি, ইংরেজি ও অঙ্কের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৬০-এর দশকে নিউ স্কিম মাদ্রাসাগুলো হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়।

*মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি* মদিনার মসজিদে নামাজের পর অনেক সময় পবিত্র কোরআন, তাজবিদ, হাদিস, ফারাইজ, চিকিৎসাশাস্ত্র, সামরিক বিজ্ঞান, ইলমুল আননাব বা কুলজি-সম্পর্কিত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হতো। বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসায় পবিত্র কোরআন, তফসির, হাদিস, ইসলামি নীতি ও ব্যবহারিক শাস্ত্র সেই সঙ্গে সাহিত্য, কলা ও মানবিক বিষয়ের উচ্চতর শিক্ষা গবেষণা পরিচালিত হতো এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণও হতো। শিক্ষার মাধ্যম আরবি হলেও ফারসি ভাষা ও সাহিত্য যথেষ্ট গুরুত্ব পেত। বাংলায় সুলতানি ও মোগল আমলের (১২০৫-১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) যেসব মাদ্রাসার খবর পাওয়া যায়, সেসবেও পবিত্র কোরআন, হাদিস, তফসির, ফিকাহ, দর্শন, ইতিহাস, হিসাব (অঙ্ক), আরবি, ফারসি, চিকিৎসাশাস্ত্র, ভূগোল ও সমরবিদ্যা পাঠ্য ছিল। ব্রিটিশ আমলে কলকাতা মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয় লক্ষ্ণৌর মাহালির মোল্লা নিজামুদ্দিনের পাঠ্যসূচি অনুসারে, যা দারস-এ নিজামিয়া পাঠ্যসূচি হিসেবে পরিচিত। পরে এতে ইংরেজি পাঠ্যক্রম চালু করা হয় ১৮২৬ সালের দিকে। অন্যান্য মাদ্রাসায়ও এ ধারাই অনুসৃত হয়। ১৯১৫ সালে নিউ স্কিম মাদ্রাসায় কিছুটা ভিন্ন রকম পাঠ্যসূচি চালু করা হয়।

*ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা* ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাসা ভারতের দিল্লিস্থ 'দারস-ই-নিজামিয়া'র কার্যক্রম অনুসারে পরিচালিত হতো। ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এরই কার্যক্রম তথা পাঠ্যক্রম অনুসারে। বেসরকারিভাবেও এ ধারায় অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭-এর পূর্ব পর্যন্ত সরকার অনুমোদিত ওল্ড স্কিম মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৩৭৮টি।

*কওমি মাদ্রাসা* দেওবন্দ দারুল উলুমের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মাদ্রাসা। বাংলাদেশে ১৫ হাজারের বেশি কওমি মাদ্রাসায় ১৫ লাখ শিক্ষার্থী এবং দেড় লাখ শিক্ষক রয়েছেন। সরকার এই মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রি 'দাওরা'-কে মাস্টার্স ডিগ্রির সমান স্বীকৃতি দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকেরা সরকারি দান বা অনুদান চান না।

**মানবতাবাদ** মধ্যযুগের ধর্মীয় প্রাধান্যের বিরুদ্ধে রেনেসাঁ যুগে এই আন্দোলনের সূত্রপাত। এর মাধ্যমে প্রসার ঘটে ক্লাসিক শিক্ষার। ইউরোপীয়

নবজাগরণের সময় প্রাচীন গ্রিক ও রোমক শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে আগ্রহ, ওই বিষয়ে চর্চা এবং ধর্মীয় বা ধর্মতত্ত্বীয় চিন্তার পরিপন্থী সম্পূর্ণ মানবিক চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি পূরণে বা ঐহিক সত্তার বিকাশে যুক্তিনির্ভর পন্থার সন্ধানে নিয়োজিত জীবনদর্শন। জ্যাঁ পল সার্ত্রের নেতৃত্বে পরিচালিত ইউরোপের অস্তিত্ববাদ-সংক্রান্ত আন্দোলনেও এই শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। বিংশ শতাব্দীতে এফ সি এস শিলার, আর্ভিং ব্যাবিট এবং সি এফ পটারও বিভিন্ন আন্দোলনে মানবতাবাদ শব্দটি ব্যবহার করেন।

**মানবধর্মশাস্ত্র** প্রাচীন হিন্দু আইনগ্রন্থ। ব্যাকরণ গ্রন্থগুলো এবং বৈদিক ধর্মসূত্রে আর্যাবর্তকে বাংলার বাইরে গঙ্গার ওপর দিকের উপত্যকায় সীমাবদ্ধ বলা হলেও এই গ্রন্থে বাংলাদেশকে আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

**মানস সরোবর** চীনা নাম না-না-সা-ল-ওউ চা। তিব্বতি নাম মাফামসো। হিন্দু পুরাণমতে, ব্রহ্মের আত্মা থেকে এই হ্রদের উৎপত্তি। ব্রহ্মপুত্র নদ এই হ্রদ থেকেই উৎসারিত। সিন্ধু নদ ও শতদ্রু নদীর মূল উৎস এর কাছেই। এখানে প্রতিবছর বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত সীমান্ত থেকে থোলিং মঠে যাওয়ার সময় এই হ্রদের তীরে এক সপ্তাহ অবস্থান করেন।

**মানা** পলিনেশীয় ঐশ্বরিক ক্ষমতাধর ব্যক্তি। বৈধভাবে শক্তি প্রয়োগকে তাঁদের কর্তব্যনিষ্ঠা মনে করেন। ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় তাঁদের অগাধ বিশ্বাস। সৃজনশীল পুরুষের প্রকাশ আকাশ, ছায়াপথ, জন্ম ও ফসলের ভেতর দিয়ে। নারী একই সঙ্গে সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রতীক। পৃথিবী, ভূগর্ভস্থ বিশ্ব, ভূমিকম্প, সামুদ্রিক স্রোত এবং অগ্ন্যুৎপাতের মধ্য দিয়ে নারীর শক্তি মূর্ত।

বিভিন্ন দ্বীপ ও ব্যক্তিভেদে এসব বিশ্বাসের মধ্যে কিছুটা পার্থক্যও রয়েছে। অনেকে ঝোপঝাড়, গাছপালা, সমুদ্রস্রোত প্রভৃতি থেকেও নিজেদের স্বকীয় দেব-দেবী কল্পনা করে নেন। ওই জটিল সম্পর্ক ও বিষয়গুলো 'মানা' কথাটির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। যার কার্যক্রম যেমনই হোক না কেন, একজন প্রমাণিত বিশেষজ্ঞই 'মানা' হিসেবে খ্যাত হবেন। জনগণের চোখে 'মানা' খেতাবধারী ঐশ্বরিক ক্ষমতাধর। কোনো উচ্চ পর্যায়ের প্রধানের সবচেয়ে বেশি প্রভাবক 'মানা' থাকতে হয়। তিনি যখন জনগণের আনুগত্য হারাবেন, তখন ধরে নেওয়া হয়, তিনি বিধাতার অনুকম্পা হারিয়েছেন। তার 'মানা' খর্ব হয়েছে।

**মানাত, উজ্জা ও লাত** প্রাক-জাহেলিয়ার আরবে পৌত্তলিকদের তিনটি মূর্তি। মক্কার কুরাইশরা এই তিনটি মূর্তিকে কাবা শরিফে সংরক্ষণ করেন। পৌত্তলিকেরা তাঁদের কামনা-বাসনা পূরণের লক্ষ্য থেকে এঁদের কাছে প্রার্থনা করতেন।

**মানাসিকে হজ** হজের একান্ত করণীয় কর্তব্য, যথা: তওয়াফ, আরাফাতে অবস্থান, মুজদালেফা ও মিনায় গমন।

**মানিবাদ** বা **ম্যানিকিইজম** আনুমানিক ২১৬-২৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মানি পারস্যে এই ধর্মের প্রবর্তন করেন। ২৪২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিজেকে পয়গম্বর বলে ঘোষণা দেন। জরথুস্ত্রীয়দের উৎপীড়নে তিনি দেশত্যাগে বাধ্য হন। দেশে ফেরার পর তাঁর গায়ের চামড়া তুলে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর প্রচারিত ধর্মে জরথুস্ত্র, বুদ্ধ ও যিশুখ্রিষ্টের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ন্যায়-অন্যায়ের সংগ্রাম বলে মানি আধ্যাত্মিক রূপ দেন। সন্ন্যাসীদের মতো সংযম ও কৃচ্ছ্রসাধন, কৌমার্য ও অনাড়ম্বর জীবন শেষে মৃত্যুর পর অনন্ত সুখের আশ্বাস দেয় এই ধর্ম। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, মধ্য এশিয়া এবং ভারতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মানিবাদের প্রভাব ছিল।

**মামাইয়া মতবাদ** পলিনেশিয়ার একধরনের দার্শনিক মতবাদ। এটা নেটিভিজম নামে খ্যাত। এই মতবাদের অবতার নিজেকে ১৮২৭ সালে যিশুখ্রিষ্টের সমতুল্য বলে প্রচার করেন। তাঁর মতবাদ দীর্ঘদিন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি এবং ১৮৩৩ সালের পর থেকে এর প্রভাব শেষ হয়ে যায়।

**মায়া ও মুক্তি** পরমেশ্বরের দিব্যশক্তিসম্ভূত জীব ও দিব্য কিন্তু জড় প্রকৃতির সংস্পর্শে সেই দিব্যশক্তি আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত না হতে পারলে জড় প্রকৃতির গুণের বা রজ্জুর প্রভাব থেকে মুক্তি নেই। যাঁরা মহাজ্ঞানী তাঁরাও কেবল

জ্ঞানের মাধ্যমে মায়ামুক্ত হতে পারেন না। এমনকি যোগের মাধ্যমে আত্মাকে দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত করা গেলেও মায়ার বন্ধন থেকে রক্ষা করা যায় না। জীব পরমেশ্বরের নিত্য পরাশক্তির অংশ হয়েও অপর প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ায় তার দেহও নিত্য এবং সে নিত্যবদ্ধ। কিন্তু শ্বেতাশ্বর উপনিষদে বলা হয়েছে, 'মায়া যদিও মিথ্যা বা অনিত্য, তবু মায়ার উৎস হচ্ছেন পরম জাদুকর পরম নিয়ন্তা স্বয়ং মহেশ্বর।' যখন পরমেশ্বর তাঁর অহৈতুকি করুণাবশে জীবকে মুক্ত করতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি মায়াকে আদেশ দেন তাঁকে মুক্ত করতে। ঈশ্বরের কৃপার ফলেই কেবল মুক্তিলাভ সম্ভব।

**মায়া সভ্যতা** মেক্সিকো এবং উত্তর-মধ্য-আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতা। তৃতীয় থেকে নবম শতক পর্যন্ত এর বিস্তার ঘটে। মায়া সভ্যতার আমলে বড় বড় শহর, মন্দির এবং বিশেষ ধরনের পিরামিড তৈরি হয়েছিল। এই সভ্যতাভুক্ত অধিবাসী এবং তাদের পূর্বপুরুষেরাও ঈশ্বরের পূজা করত। নবম শতকে স্পেনের আগ্রাসনের পর থেকে মায়া সভ্যতার পতনের শুরু হয়। ষোড়শ শতক পর্যন্ত মায়া সভ্যতা কোনো-না-কোনোভাবে টিকে ছিল। মায়া সভ্যতার পৌরাণিক সংস্কৃতিতে আলো-ছায়ার দ্বৈত মতবাদের প্রচলন রয়েছে। পরস্পর বিপরীত অবস্থানে এখানে একদিকে রয়েছে সূর্য দেবতা, উষ্ণতা এবং আলোর দেবতা, সভ্যতা ও জীবনানন্দের দেবতা এবং অপর দিকে অন্ধকারের দেবতা, রাতের দেবতা, বিষণ্নতার দেবতা, ভয়ের দেবতা ইত্যাদি।

**মারমা** বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠী। মারমা জনগণের অধিকাংশই বাংলাদেশের তিনটি পার্বত্য জেলা রাঙামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়িতে বসবাস করে। কিছুসংখ্যক মারমা উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার এবং পটুয়াখালীতেও বসবাস করে। এসব মারমা নিজেদের 'রাখাইন' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। প্রায়শই তাদের আলাদা জনগোষ্ঠী হিসেবে দেখা হয়। শুরুতে এরা ছিল প্রকৃতির উপাসক। পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। আরও পরে তাদের অনেকেই গ্রহণ করে খ্রিষ্টধর্ম। কিন্তু মারমা সম্প্রদায়ের প্রায় সবাই নিজস্ব প্রাচীন ধর্মীয় কিছু রীতি এখনো মেনে চলে।

**মারাবুত** আরবি 'মুরাবিত' শব্দের অর্থ ভক্ত দরবেশবৃন্দ। আফ্রিকার মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে এঁদের অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দরবেশ বলে অভিহিত করা হয়। আফ্রিকার বার্বার মুসলিম সম্প্রদায়ে এরা পীর ও ওলির মতোই সম্মানিত। সেনিগাল নদীর নিম্নাংশে দুর্গসংরক্ষিত আশ্রম রিবাতে মুরাবিতরা বসবাস করতেন।

**মারুৎগণ** হিন্দু ধর্মশাস্ত্রমতে, কশ্যপের পত্নী দিতির গর্ভজাত সাত পুত্র। জন্মের পর মায়ের আদেশে মারুৎগণ দিব্যরূপে সপ্তলোকে বিচরণ করতে থাকেন।

**মার্ক, সেন্ট** পুরো নাম জন মার্ক। তিনি সেন্ট পিটার, সেন্ট পল ও সেন্ট লিউক-এর সহযোগী। অনেকে মনে করেন, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগে মার্কের মাতৃগৃহে যিশু তাঁর শেষ নৈশভোজ (লাস্ট সাপার) সম্পন্ন করেন।

**মার্টিন লুথার** প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের প্রবর্তক ও ধর্মসংস্কারক। জন্ম জার্মানির লোয়ার স্যাক্সনির অন্তর্গত আইসলেবেনের এক রোমান ক্যাথলিক পরিবারে, ১৪৮৩ সালের ১০ নভেম্বর। ১৮ বছর বয়সে লুথার জার্মানির এর্ফুট বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৫০৯ সালে যাজকবৃত্তি গ্রহণ করার পর সহজ-সরল ভাষায় তিনি খ্রিষ্টের বাণী প্রচার করতে শুরু করেন। ১৫১১ সালে তিনি রোমে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে বিভিন্ন স্তরের যাজকদের মধ্যে নানা অনাচার এবং খ্রিষ্টধর্মের বিকৃত রূপ লক্ষ করেন। এমনকি স্বয়ং পোপের অর্থের বিনিময়ে পাপ থেকে মুক্তির ফতোয়া বিক্রির ঘটনায় তাঁর মন বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। দেশে ফিরে তিনি শুরু করেন ধর্মসংস্কার আন্দোলন। ১৫১৭ সালের ১ নভেম্বর লুথার তাঁর সংস্কারধর্মী ধর্মমতের এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। লুথারের এই বিদ্রোহের কথা রোমের তৎকালীন পোপ দশম লিওর কাছে পৌছালে তিনি তাঁকে ক্ষমা চাইতে এবং ঘোষণাপত্র প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। অন্যথায় তাঁকে খ্রিষ্টীয় ক্যাথলিক ধর্ম

থেকে বহিষ্কার করা হবে বলে হুমকি দেন। মার্টিন লুথার পোপের এই হুকুমনামা প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলে বলেন, 'পোপের এমন কোনো স্বর্গীয় অধিকার নেই, যাতে করে তিনি কাউকে ধর্ম থেকে বহিষ্কার করতে পারেন।' ১৫২৩ থেকে ১৫৪০ সালের মধ্যে মার্টিন লুথার ইউরোপের একাংশে তাঁর প্রতিবাদী ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। প্রতিবাদী চরিত্রের বলে তাঁর প্রচারিত ধর্মমতের নাম হয় 'প্রটেস্ট্যান্ট'। মার্টিন লুথারের মৃত্যু হয় ১৫৬৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি।

**মালাক** নুরের সৃষ্ট ফেরেশতা। তাঁরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং সর্বদা আল্লাহর উপাসনায় ব্যস্ত। অগণিত ফেরেশতার মধ্যে চারজন প্রধান ফেরেশতা হলেন জিবরাইল (আ.), তিনি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ প্রবর্তন ও সংবাদ আদান-প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদের নেতা। আজরাইল (আ.) মৃত্যুসংক্রান্ত ব্যাপারে নিয়োজিত ফেরেশতাদের প্রধান। মিকাইল (আ.) নিয়োজিত খাদ্য উৎপাদন ও বৃষ্টিবর্ষণের দায়িত্বে। ইসরাফিল (আ.) শিঙ্গা নিনাদের দায়িত্বে, যার ধ্বনিতে পৃথিবী ধ্বংস হবে। ইসলাম ধর্ম ছাড়া খ্রিষ্টান, ইহুদি ও হিন্দুধর্মেও দেবদূত বা ফেরেশতাদের অস্তিত্ব রয়েছে।

**মালিক ইবনে আনাস** ইসলামি শরিয়া-ব্যবস্থায় তিনি একটি মজহাবের প্রতিষ্ঠাতা। হিজরি ৯৫ সনে মদিনায় মালিক ইবনে আনাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর মজহাব খুবই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। আবু হানিফার মতবাদের সঙ্গে তাঁর মতবাদের তেমন কোনো মৌলিক পার্থক্য ছিল না।

**মাসতাবা** প্রাচীন মিসরে সমভূমির ওপর তৈরি চতুষ্কোণ সমাধি-স্মৃতিসৌধগুলো চুনাপাথর ও রোদে পোড়ানো মাটির ইট দিয়ে তৈরি করা হতো। এদের ছাদ সমতল এবং দেয়াল ভেতরের দিকে ঢালু। প্রথম দিকে মমি সংরক্ষণের জন্য এগুলো ব্যবহার করা হতো। বিখ্যাত পিরামিডগুলো এরই উন্নত সংস্করণ।

**মাসিয়াত** আরও পরে আরবি এই শব্দটির অর্থ বিদ্রোহ, স্রষ্টার সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিদ্যমান তাঁর নির্ধারিত নিয়মের ব্যতিক্রম করা। শিরক গুরুতর পাপ। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শিরক করার পাপকে ক্ষমা করবেন না। তওবা করলে কোনো পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন। আল্লাহ সৎ কাজের কারণেও ব্যক্তির পাপ ক্ষমা করতে পারেন।

**মাহাদি** আরবি, অর্থ পথ প্রদর্শিত ব্যক্তি। শিয়ামতে, মোহাম্মদ (সা.)-এর এক বংশধর ইসলামের পবিত্রতা ও গৌরব পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে ত্রাণকর্তা ইমাম হিসেবে আবির্ভূত হবেন। তাঁর বুদ্ধি ও বিবেকের সাহায্যে মানুষ সাধারণত সৎ পথের অনুসারী হয়ে থাকে। এ ছাড়া আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের কাউকে কাউকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন। যাঁরা পথপ্রাপ্ত তাঁরা মুহতাদুন, যাঁরা পথপ্রদর্শক তাঁরা হুদা এবং পথপ্রদর্শকের নেতা হলেন হুদাত আল মুহতাদুন।

ন্যায়ভিত্তিক সমাজ সৃষ্টির মোহাম্মদ (সা.) পবিত্র কোরআনের বাণী তাঁর অনুসারীদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সেই সমাজের আকর্ষণে মোহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় অনেকে প্রত্যাবর্তন করতে চান। অনেকে আশা করেন, মোহাম্মদ (সা.)-এর এক বংশধর, যাঁর নামও হবে মোহাম্মদ, আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীতে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা করবেন। বহু মুসলমান প্রশাসকের অকৃতকার্যতার ফলে মাহাদির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। ইমামিয়া শিয়ারা আশা করেন, দ্বাদশ ইমাম, যিনি লুকিয়ে বা অপ্রকাশ্যে তিনি মাহাদি হিসেবে আবির্ভূত হবেন। শিয়াদের প্রার্থনায় পুনঃপুন বলা হয়, তাঁর (মাহাদির) আবির্ভাব আমাদের দুঃখ-যন্ত্রণার অবসান ত্বরান্বিত করুক। আলী ও আল হুসেনকে মাহাদি উপাধিতে অভিহিত করা হয়। আলীর এক সন্তান (যিনি ফাতিমার গর্ভের নন) ইবনে আল-হানাফিয়াকে মাহাদি হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা সফল হয়নি। হানাফিয়ার মৃত্যুর পর শিয়ারা মনে করেন যে তিনি মারা যাননি এবং আত্মগোপন করে আছেন। এর ফলে শিয়াদের মধ্যে গায়েব (গুপ্ত বা লুক্কায়িত ও রাদা (প্রত্যাবর্তন) মতবাদের বিস্তার লাভ করে। কোন সময় মাহাদি আসবেন তা জানা না থাকলেও তাঁর জন্য শিয়ারা সদাজাগ্রত থাকেন।

শিয়াদের মতো সুন্নিদের কাছে মাহাদি-প্রসঙ্গ মোটেই মুখ্য নয়। সুন্নিদের বিশ্বাস, কিয়ামতের নিদর্শন হিসেবে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মসংস্কারক আসবেন, যিনি মাহাদি বলে অভিহিত হবেন। মুসলিম ও বুখারি হাদিস গ্রন্থে মাহাদির উল্লেখ নেই। বহু সুন্নি ধর্মতাত্ত্বিক মাহাদি সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করেননি। ইবনে খলদুন তাঁর সমসাময়িক কালের মাহাদি-সম্পর্কিত ধারণার বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর সমর্থন জানাননি।

**মিউজেস** জিউস ও নিমসিনির কন্যা। শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠাপোষিকা নয়জন গ্রিকদেবী। অ্যাপোলো তাঁদের নেতা। এদের মধ্যে ক্যালাইওপি মহাকাব্য ও বাগ্মিতার দেবী, ইউটারপি সংগীত ও গীতিকবিতার, এরাটো প্রেমকাব্যের, পলিহিমনিয়া ধর্মীয় কবিতার, ক্লাইও ইতিহাসের, মেলপমিনি বিয়োগান্ত সাহিত্যের, থ্যালাইয়া মিলনান্ত সাহিত্যের, টারপসিকারি সংগীত ও নৃত্যের এবং ইউরেনিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের দেবী।

**মিকাইল** বিশিষ্ট ফেরেশতার নাম। জিবরাইলের পরই তাঁর স্থান। মুসলমানদের বিশ্বাস যে, খাদ্য উৎপাদন ও বিতরণের ভার তাঁর ওপর অর্পিত। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি জিবরাইল ও মিকাইলের শত্রু, সে আল্লাহর শত্রু।' আল্লাহ ফেরেশতাদের আদমকে সিজদার আদেশ করলে জিবরাইল ও মিকাইল সিজদা করেন। ইঞ্জিল কিতাবে মিকাইল মানবজাতির রক্ষক এবং তওরাত কিতাবে তাঁকে 'মর্যাদাসম্পন্ন' বলা হয়েছে। জাহান্নাম সৃষ্টির পর কোনো দিন তাঁর মুখে নাকি হাসি দেখা যায়নি।

**মিকো** সাদা কিমোনো ও লাল স্কার্ট পরিহিত মন্দির-কুমারী। এরা জাপানে শিন্টো পুরোহিতকে সহযোগিতা করে থাকে এবং মন্দিরে পবিত্র শিন্টো নাচ পরিবেশন করে থাকে। এঁরা মন্দিরের নিকটবর্তী স্থানে লিখিত দৈববাণী বিক্রি করে থাকে।

**মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ** মিতাক্ষরামতে, জন্মমাত্রই পুত্র পূর্বপুরুষের সম্পদে পিতার সমান অংশীদার হয়; কিন্তু দায়ভাগমতে, পিতা স্বেচ্ছায় দান না করলে অথবা পিতার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত পুত্রের ওই সম্পদে অধিকার জন্মায় না। দায়ভাগে এই পৈতৃক সম্পত্তির বিভাগ, বিবিধ প্রকার পুত্র, উত্তরাধিকার ও উত্তরাধিকারীদের ক্রম, স্ত্রীধন, অবিভাজ্য সম্পদ প্রভৃতি সংক্রান্ত বিধিবিধান আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন দায়ভাগ অনুসারে পরিচালিত হয়ে থাকে।

**মিথ** শাব্দিক অর্থ পৌরাণিক কাহিনি বা অতিকথা। পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণভাবে অতিপ্রাকৃত ঘটনা ও দেব-দেবীর কাহিনিমূলক উপাখ্যানকে মিথ বলা হয়। আধুনিক যুগে পৌরাণিক কাহিনির উৎসসন্ধানে প্রথম মনোনিবেশ করেন ম্যাকস মুলার। তাঁর মতে, এটা ভাষার বিকৃতি। ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যামতে, পৌরাণিক কাহিনি ধর্মশাস্ত্রের পূর্বাভাস বা বিকৃতি। জেমস জয়েস, ফ্রানৎস কাফকা, ইয়েটস এবং টি এস এলিয়টের সাহিত্যকর্মে প্রাচীন ধর্ম থেকে গৃহীত পৌরাণিক কাহিনি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

**মিথ্রা** প্রাচীন ফারসি শব্দটির অর্থ বন্ধু বা মিত্র। মিথ্রা ছিলেন জরথুস্ত্রবাদের একজন দেবতা। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে তিনি ইরানের প্রধান দেবতায় পরিণত হন। মেসোপটেমিয়া ও আরমেনিয়াতে মিথ্রা ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এই ধর্মের নীতি অত্যন্ত কঠোর ছিল। উপবাস ও জিতেন্দ্রিয়তা এই ধর্মে বাধ্যতামূলক ছিল।

**মিনার** আরবি শব্দ মানার বা মানারার ভারতীয় রূপ। শাব্দিক অর্থে এর দ্বারা এমন জায়গাকে বোঝায়, যেখানে আগুন জ্বালানো হয়। এর প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘরে, যেখানে নাবিকদের সতর্ক করার জন্য রাতে আগুন জ্বালানো হতো। আরবি কবিতায় নির্দেশক দণ্ড বা খ্রিষ্টান ধর্মযাজকের কক্ষে ব্যবহৃত কুপি হিসেবেও শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। ক্রমান্বয়ে শব্দটির অর্থান্তর ঘটে। মুসলিম আমলে এর দ্বারা শুধু মসজিদের মাচানকেই বোঝানো হতো না, বরং যেকোনো ধরনের উঁচু কাঠামোকেই বোঝাত। এ কাঠামোটি ভবন থেকে বিচ্ছিন্ন কিংবা ভবনের অংশ হিসেবে ব্যবহারযোগ্য অথবা শোভাবর্ধনের জন্যও হতে পারত। তুরস্কের মিনারগুলো লম্বা ও উপরিভাগে ছুঁচালো গম্বুজবিশিষ্ট। পারস্যের মিনারগুলো টালি

দিয়ে আবৃত ও কারুকার্যখচিত এবং শীর্ষদেশে গম্বুজবিশিষ্ট। ভারত উপমহাদেশের মিনারগুলো পারস্যেরই অনুরূপ। স্পেন ও উত্তর আমেরিকার মিনার বর্গাকৃতির।

**মিনোটর** গ্রিক পুরাণের এক দানব। এর মাথা ষাঁড়ের মতো এবং দেহের বাকি অংশ মানুষের দেহের মতো। পেসিফাই এবং একটি ষাঁড়ের মিলনে এর জন্ম। পেসিফাইয়ের স্বামী মাইনস এই দানবকে রাখার জন্য ডেডালাসকে দিয়ে একটি গোলকধাঁধা তৈরি করান। থিসিউস মিনোটরকে হত্যা করেন।

**মিরাজ** পবিত্র কোরআনের বনি ইসরাইল সূরার প্রথমে বলা হয়েছে, 'পবিত্র ও মহিমময় তিনি, যিনি তাঁর দাসকে তাঁর নিদর্শন দেখানোর জন্য সফর করেছিলেন মসজিদ-উল-হারাম থেকে মসজিদ-উল-আকসায়, যেখানকার পরিবেশ তাঁরই আশীর্বাদপূত।' ২৭ রজব রাত্রে জিবরাইল মহানবী (সা.)-কে স্বর্গীয় বোরাকে আরোহণ করিয়ে প্রথম বায়তুল মুকাদ্দাস এবং পরে সাত আসমান ভ্রমণ করান। সিদরাতুল মুনতাহার পর জিবরাইল আর যেতে পারেননি। রফরফে চড়ে নবী (সা.) একা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হন। দুনিয়ার কোনো মানুষ এই মর্যাদা লাভ করেননি। এ সময় দৈনিক পাঁচবার নামাজ ফরজ করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ হাদিসে রয়েছে। মিরাজের সত্যতায় প্রথম হজরত আবুবকর (রা.) বিশ্বাস করেন বলে তাঁকে সিদ্দিক বা পরম বিশ্বাসী বলা হয়।

**মিরিয়ম** বাইবেল অনুসারে মুসা ও হারুনের ভগ্নি। তিনিই শিশু মুসাকে শরবনের মধ্যে দেখাশোনা করেন এবং গান গেয়ে নারীদের লোহিত সাগরের তীর বেয়ে নিয়ে যান। পরে মুসাকে অমান্য করার পাপে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। মরিয়ম ও মেরি একই মূল নাম থেকে উৎপন্ন।

**মিলাদ** আরবি মাওলিদ শব্দ থেকে উদ্ভূত মাওলিদ-এর অর্থ হলো কোনো ব্যক্তির, বিশেষ করে নবী করিম হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জন্মকাল, জন্মস্থান এবং জন্মোৎসব। সাধারণত জন্মকাল অর্থেই মিলাদ শব্দ ব্যবহার করা হয়। এই উপমহাদেশে মাওলিদ শব্দের পরিবর্তে 'মৌলুদ' বা 'মৌলুদ শরিফ'-এর ব্যবহার প্রচলিত। কিন্তু অধুনা 'মিলাদ' শব্দটিই বাংলাদেশে বহুলভাবে ব্যবহৃত। সাধারণত রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জন্মদিন উপলক্ষে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। তবে, যেকোনো ব্যক্তির জন্মদিন, বিয়ে, নতুন ব্যবসার সূত্রপাত, গৃহনির্মাণ ও সমাপ্তি ইত্যাদি উপলক্ষেও বছরে যেকোনো দিন মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হতে পারে।

**মিল্লাত** রীতিনীতি বা জাতি। প্রত্যেক নবীর অনুসারী জাতিকে তাঁর মিল্লাত বলা হয়। মুসলমানদের 'মিল্লাতে ইসলামিয়া' বলা হয়।

**মিশকাতুল মাসাবিহ** বিখ্যাত হাদিস সংকলন। আবু মোহাম্মদ আল-হুসেন ইবনে মাসউদুল ফর্যাউল বাগাবি এর সংকলক। *বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নিসাই, ইবনে মাজাহ*—এই ছয়টি হাদিস গ্রন্থকে *মিশকাত* নামে সংকলন করা হয়েছে। এর ২১০টি পরিচ্ছেদে মহানবী (সা.)-এর হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে।

**মিশন** দেশে ও বিদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ও ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে গঠিত বিভিন্ন সংগঠন। এসব মিশনের মাধ্যমেই গ্রিস ও রোমের পথে খ্রিষ্টধর্ম এশিয়া মাইনর থেকে ইউরোপে প্রসার লাভ করে। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও মধ্য ইউরোপে এবং আইসল্যান্ড ও গ্রিনল্যান্ড পর্যন্ত এলাকার নর্থমেনদের মধ্যে বিশেষ মিশনারির কর্মতৎপরতা লক্ষ করা যায়। সেন্ট প্যাট্রিক, সেন্ট অগাস্টিন ও সেন্ট বনিফেস—এই যুগের শ্রেষ্ঠ মিশনারি। উনবিংশ শতকে আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে মিশনারি তৎপরতা বৃদ্ধি পায়।

*মিশনারিদের শিক্ষা তৎপরতা* 'সোসাইটি ফর দ্য ফরমেশন অব ইন্ডিয়ান্স' নামের একটি প্রতিষ্ঠান ১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপীয় ধাঁচের একটি স্কুল কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করে। ১৭২০-এ রেভারেন্ড বেলারমির চেষ্টায় স্থাপিত হয় একটি স্কুল। ক্লাইভের আমন্ত্রণে কিয়ারন্যান্ডার বাংলায় আসেন এবং ১৭৫৮ সালে কলকাতায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮৮ সালে হিন্দুদের জন্য ব্রাউন-এর বোর্ডিং স্কুল স্থাপিত হয়। ১৭৮৯ সালে ক্যালকাটা ফ্রি স্কুল সোসাইটি গঠিত হয় এবং তার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত

হয় শ্রীরামপুর মিশন। উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং নারীশিক্ষার জন্য কলকাতায় স্কুল স্থাপনে উদ্যোগী হন। ১৮০৪ সালের মধ্যে দিনাজপুরে চারটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮১০ সালে কেরি ও মার্শম্যান দেশীয় খ্রিষ্টান শিশুদের শিক্ষার জন্য ক্যালকাটা বেনেভোলেন্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৭ সালের মধ্যে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের চেষ্টায় ১০৯টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, ভাষাশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বই লেখা হয়। মিশনারিরাই প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছেন এঁরাই। স্কুল বলতে আজ যা বোঝায় মিশনারিরাই তার সূচনা করেন। ইংরেজির পাশাপাশি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার প্রচলনেও মিশনারিদের অবদান রয়েছে।

**মিসকিন** আরবি এই শব্দের অর্থ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি। ইসলাম ধর্মে ধনীদের ওপর জাকাত ফরজ করে ফকির-মিসকিনদের সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে এমন লোকজনকে সাহায্য দেওয়ার নির্দেশ আছে।

**মিসরীয় ধর্ম** প্রাচীন মিসরের ধর্ম সম্পর্কে অনেক লিখিত সাক্ষ্য থাকলেও এই ধর্মে বিদ্যমান জটিলতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। মিসরীয়রা দেহ ও আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী ছিল। মৃত পূর্বপুরুষদের ধর্ম-পদ্ধতির ওপর অনেক জোর দেওয়া হয়। রাজাদের সমাধিসৌধ পিরামিড নির্মাণ এবং সুগন্ধি দিয়ে মমি করে মরদেহ সংরক্ষণ করা হতো। মিসরে সূর্যের উপাসনা ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই ধর্মে বিশ্ব ও প্রাকৃতিক দৃশ্যমান বস্তুর সৃষ্টির ব্যাখ্যায় পরস্পর বিপরীত উপকথাকেও গ্রহণ করা হয়েছে।

**মিহির খনা** খনার বচন হলো কৃষকদের মৌখিক শাস্ত্র, প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যার ব্যবহার চলে এসেছে আবহমান কাল থেকে। জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে খনার বচনগুলো রচিত। নবরত্নের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মিহির খনার স্বামী। উভয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। খনাও এঁদের মতোই এ ক্ষেত্রে দক্ষ ছিলেন। এমন অনেক বচন আছে, যা হয়তো খনার নয় কিন্তু তাঁর নামে চলে এসেছে। এ উপমহাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে খনা অথবা সমপর্যায়ের কৃষি-সম্পর্কিত বচন এখনো প্রচলিত আছে। আবহাওয়া, কৃষি, রোগ-ব্যাধি, শুভাশুভ, দিন-ক্ষণ-মাস ইত্যাদি খনার বচনের বিষয়। এসব বচন সুদীর্ঘকালব্যাপী কৃষকদের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো এবং এই বচনকে অনুসরণ করে তারা নিজেদের দৈনন্দিন এবং কৃষিসংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করত। বর্তমানে কৃষি প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে খনার বচনের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে।

**মীমাংসা** জৈমিনি (খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যে রচিত) প্রবর্তিত এবং তাঁর মীমাংসাসূত্র-বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। এ দর্শন সম্পূর্ণই বেদনির্ভর এবং আকারে সর্ববৃহৎ। এটি 'পূর্বমীমাংসা' নামেও পরিচিত, কারণ এর বিষয়বস্তু বেদের কর্মকাণ্ডভিত্তিক। কর্ম বলতে এখানে বৈদিক যাগযজ্ঞকে বোঝায় এবং সেগুলো বেদের পূর্ব বা প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত; কিংবা বলা হয়ে থাকে যে কর্ম আগে ও জ্ঞান পরে, তাই কর্মভিত্তিক দর্শন পূর্বমীমাংসা; আর বেদের উত্তর বা শেষভাগ হচ্ছে জ্ঞানকাণ্ড, যা বেদান্ত নামে পরিচিত; এ জন্য বেদান্তের এক নাম 'উত্তরমীমাংসা'।

মীমাংসা দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য ধর্মের স্বরূপ নির্ণয় করা। এ কথা জৈমিনি গ্রন্থের প্রথম সূত্রেই উল্লেখিত হয়েছে : 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা।' এখানে ধর্মের অর্থ বেদোপদিষ্ট কর্তব্যকর্ম।

মীমাংসা দর্শন বস্তুবাদী ও বহুত্ববাদী। প্রত্যক্ষজ্ঞানে যার অস্তিত্ব অনুভূত হয়, মীমাংসামতে তা সত্য; তবে প্রত্যক্ষ বিষয় ছাড়া আত্মা, দেবতা, স্বর্গ, নরক ইত্যাদিও সত্য। জগতের উপাদানগুলো নিত্য এবং জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনা কর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদ ও বেদান্তের মায়াবাদ এতে স্বীকৃত নয়।

**মীরাতুল আখবার** রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক পত্রিকা, ফারসি ভাষায় কলকাতার ধর্মতলা হতে প্রকাশিত হতো। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮২২ সালের ১১ এপ্রিল। প্রায় এক বছর কাল পত্রিকাটি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় সংবাদপত্রের

মাধ্যমে জনমত গড়ে তোলা আইনে নিষিদ্ধ করায় রামমোহন রায় পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দেন। এর শেষ সংখ্যা প্রকাশের তারিখ ১৮২৩ সালের ৪ এপ্রিল।

**মীরাবাঈ** (আ. ১৪৯৮-১৫৪৬) রাজপুতনার মেরতার রাজা রতিয়ারানা রাঠোরের একমাত্র কন্যা এবং মেওয়ারের রাজা কুম্ভকরণের স্ত্রী। তিনি রণছোড়লালরূপী কৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর মাতা, পিতা ও স্বামীর মৃত্যু হলে তাঁর মনে ধর্মভাব প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। স্বামীর চিতায় সহমরণে সম্মত না হওয়ায় তাঁর শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা তাঁকে পরিত্যাগ করেন। তিনি নিজেকে কৃষ্ণের দয়িতা হিসেবে কল্পনা করে ব্রজ ভাষায় ও হিন্দিতে ভজন রচনা করেন। ধর্মীয় কড়া অনুশাসন বর্জন করে ভক্তিবাদে কৃষ্ণের প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করে সর্বজনীন প্রেম ও মুক্তির বাণী প্রচার করেন। তাঁর রচিত একটি ভজন গানের বাণী এ রকমের: 'ঘর আও সজন মিঠ বোলা তেরে বেখাতর সব কুছ ছোড়া কাজর তেল তমোলা/ জো নহি আওএ রয়ন বিহায়ে ছিন মাসা ছিল তোলা মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর কর ধর রহে কপোলা।' কৃষ্ণভক্ত মীরা তাঁর স্বামীর রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে সাধিকার বেশে বৃন্দাবনে যান, তিনি কৃষ্ণমূর্তির সামনে মুখে মুখে ভজন রচনা করে গাইতেন। তিনি গরিব-দুঃখীদের সেবা করে দিন কাটান এবং তীর্থ পর্যটনকালে দ্বারকায় প্রাণত্যাগ করেন।

**মু'আহহিদিন** মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পর্বে যাঁরা নিজেদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের গুণে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন এবং আপনাপন ধারণামতে, তাঁর উপাসনা করতেন, তাঁদের মু'আহহিদিন বলা হয়। এঁদের মধ্যে কয়েক জন বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁরা হলেন: কাইস ইবনে সাইদাহ, ওরাকা ইবনে নওফল, উবাইদুল্লাহ ইবনে জহশ, উসমান ইবনুল হুয়াইরিস এবং যাইদ ইবনে ও ওমর ইবনে নফিল। অবশ্য সেই মুসলমানকেও মু'আহহিদিন বলা হয়, যিনি আল্লাহর একত্ববাদের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ ব্যতীত আর কারও কাছে মাথা নত করেন না।

**মুইনুদ্দিন চিশতি** (র.) (১১৪২-১২৩৬) খাজা (খওয়াজা) চিশতিয়া তরিকার প্রবর্তক সুফি সাধক। 'আফতাব-ই-মুলক হিন্দ' হিসেবেও তিনি পরিচিত। তাঁর মৃত্যুদিবস উপলক্ষে প্রতিবছর আজমিরে অসংখ্য মুসলিম ও অমুসলিম ভক্তের সমাবেশ ঘটে। মুইনুদ্দিন ইরানের সিসতানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫ বছর বয়সে তিনি অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে পিতা ও মাতাকে হারান। পিতা গিয়াসুদ্দিনের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া স্বল্প সম্পত্তি বিক্রি করে গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে দেন এবং লেখাপড়া করার জন্য খোরাসানে যান। সেখানে তিনি পবিত্র কোরআন ও হাদিসশাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। খোরাসান থেকে তিনি বোখারা ও নিশাপুর যান এবং সুফি ও অন্যান্য মুসলিম দর্শন শিক্ষা লাভ করেন। নিশাপুরে অবস্থানকালে তিনি প্রখ্যাত সাধক উসমান হারুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ২০ বছর কাল তিনি মক্কা ও মদিনা সফর করেন। তারপর নিশাপুর থেকে তিনি বোখারা যান এবং সেখান থেকে যান দিল্লি। দিল্লি থেকে যান আজমির। নিজের জীবনাদর্শের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তিনি নানা প্রতিকূলতার মধ্যে ইসলাম ধর্মের প্রচারকাজ অব্যাহত রাখেন। আজমিরেই তাঁর মৃত্যু এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। মালওয়ার সুলতান মোহাম্মদ খলজি তাঁর কবরের ওপর একটি সুন্দর ইমারত নির্মাণ করান।

**মুকতাদির বিল্লাহ ইবনে মুতাজিদ** আব্বাসি খলিফা। শাসনকাল ৯০৮-৩২। আল মুকতাদির নামেও পরিচিত। মুকতাদির বিল্লাহর আমলে, উত্তর আফ্রিকায় ফাতিমি উবাইদুল্লাহ (৯০৯) এবং স্পেনে তৃতীয় আবদুর রহমান (৯২৯) ক্ষমতা দখল করে খিলাফতের দাবিদার হন।

**মুকছুদোল মোমেনীন** আলহাজ কাজী মওলানা মো. গোলাম রহমান প্রণীত এই গ্রন্থটির অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

মুসলিম নারী পাঠকদের জন্য রচিত এই গ্রন্থে হায়েজ, নেফাছ, পর্দা, কিরূপ স্ত্রীলোক বিয়ে করা হারাম, স্বামীর হক বা স্ত্রীর কর্তব্য, গর্ভিণীর কর্তব্য এবং স্ত্রীলোকদের জন্য পঁয়ত্রিশটি নসিহত দেওয়া

হয়েছে। বলা হয়েছে, 'সমস্ত পৃথিবীটাই সুখভোগের বস্তু এবং যাবতীয় সুখভোগের বস্তুগুলোর মধ্যে সতী-সাধ্বী নারীই সর্বোৎকৃষ্ট এবং সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখার জিনিস। যে স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে নিজের স্বামীর কাপড় ধৌত করিয়া দিবে, আল্লাহ তায়ালা তার আমলনামা হইতে দুইহাজার গুনাহ বাদ দিবেন।...কখনো কোনো কাজে ডাকলে স্ত্রী তৎক্ষণাৎ হাজির হইবেন...এবং যে মকসুদে ডেকেছেন তা সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবেন। যদি শরিয়তে কোনো নিষেধ না থাকে, কোনো কাজে ও কোনো কথায়ই স্বামীর মতের বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। জ্ঞান ভজনে স্ত্রীলোকের ইমান ও পুরুষের ইমান অর্ধেক মাত্র।'

স্বামী নিম্নলিখিত চার কারণে স্ত্রীকে প্রহার করতে পারবে—১. স্বামী যদি স্ত্রীকে সাজসজ্জা করে তার কাছে উপস্থিত হবে বলে, আর যদি সে তা অমান্য করে; ২. স্বামী ছোহবতের উদ্দেশ্যে তাকে ডাকলে যদি সে উপস্থিত না হয়; ৩. যদি স্ত্রী নামাজ ও নাপাকির গোসল ত্যাগ করে; ৪. যদি সে স্বামীর বিনা হুকুমে অন্য লোকের বাড়ি যায়। স্বামীর একাধিক বিয়ে করাকে ('যে সমস্ত স্ত্রীলোক স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে হিংসা না করে ছবর করে থাকে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা শহীদের তুল্য ছওয়াব দান করবেন।') বৈধতা দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হলেও তার প্রতি রাগান্বিত বা বিচারপ্রার্থী হওয়ার কোনো নিয়ম নেই। এ গ্রন্থ নছিহত করছে, 'স্বামী যদি কোনো সময় কোনো ত্রুটি পেয়ে আপনাদের মারেন বা গালাগালি করেন তজ্জন্য চুপচাপ গাল ফুলিয়ে মনের রাগে দূরে সরে থাকবেন না; বরং হাতে-পায়ে ধরে অনুনয়-বিনয় করে ও নিজের দোষ স্বীকার করে যাতে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন।' এ গ্রন্থ বলে, 'স্বামী বড় লোক হোক আর ছোট লোক হোক, ধনী হোক আর গরিব হোক, বিদ্বান হোক কি মূর্খ হোক, অন্ধ হোক কি কানা হোক, খঞ্জ হোক কি আতুর হোক, সুশ্রী হোক কি কুশ্রী হোক, সর্বদাই সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর পদতলে জীবনখানিকে লুটিয়ে দিতে থাকুন এবং সর্বদাই উভয়ে মিলে-মিশে মহব্বতের সঙ্গে জেন্দেগি কাটাতে চেষ্টা করুন।'

**মুক্ত ইচ্ছা** মানুষের সত্তার ব্যাপ্তির একটা প্রধান দিক এবং স্রষ্টা কেন তা দিলেন, তা বোঝা দুষ্কর। কিন্তু মুক্তচিন্তার পাশাপাশি আরও একটা অস্তিত্ব রয়ে গেছে মানবমনে। আর তা হলো বিবেক, যেটা ছাড়া মানুষ হয়ে যেত পুরোপুরি সম্পর্কহীন দ্বীপের মতো এক একটা অংশ। নীতি-বোধ-মন্দ-ভালো কোনো কিছুই তার থাকত না। ইসলামে এই মুক্ত ইচ্ছা খুব গুরুত্বপূর্ণ; মানুষ ইচ্ছামতো যা খুশি করতে পারে কিন্তু সেসবের জন্য জবাবদিহি করতে হবে মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনে, ভোগ করতে হবে সেসবের ফল।

**মুক্তির ধর্মতত্ত্ব** বা **লিবারেশন থিওলজি** লাতিন আমেরিকার এই ধর্মতত্ত্ব খ্রিষ্টান ধর্মমতকে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যার মাধ্যমে ঈশ্বরকে শোষিতদের ত্রাণকর্তা হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। বিমূর্ত ধারণা থেকে প্রাক্সিস বা অনুশীলনের দিকে অগ্রসর হলে ধর্মতত্ত্বের ভূমিকা কী হবে, বিশেষ করে যাত্রার প্রারম্ভে দারিদ্র্যের মধ্যে কী হতে পারে, লিবারেশন থিওলজির তাই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা। এই ধর্মতাত্ত্বিক আন্দোলন সূচিত হয় ১৯৬৮ সালে লাতিন আমেরিকার বিশপদের এক সম্মেলনে কলম্বিয়ার মেডেলিনে। বিভিন্ন মুক্তির ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে ভিন্নতা সত্ত্বেও কিছু সাদৃশ্য রয়েছে, যেমন—নিপীড়ন-পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে গির্জার প্রধান কর্তব্য দরিদ্রদের প্রতি সমর্থন প্রদান করা। পরিত্রাণ পেতে হলে মুক্তি আবশ্যিক, পরিত্রাণ মানুষের সমগ্র অবস্থা নিয়ে ভাবিত, শুধু আধ্যাত্মিক পরিত্রাণ-প্রাপ্তি নয়। এক্সোডাস বা মিসর থেকে ইসরাইলবাসীদের মহানিষ্ক্রমণ বাইবেলের পরিকাঠামো হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সেই পূর্বানুমানের ভিত্তিতে ব্যক্তির পরিবর্তন শুধু সামাজিক রূপান্তরের মাধ্যমেই আসা সম্ভব। যিশু কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করেননি বলা হলেও তিনি অনুশীলনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সঠিক বিশ্বাসের উৎস শুধু সঠিক কার্যই হতে পারে। যে প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তা বলপ্রয়োগকারী কাঠামোর চেয়ে কোনো অংশে কম সহিংস নয়। ১৯৮৪ সালে দ্য সেক্রেড কনগ্রিগেশন অব দ্য ডক্ট্রিন অব দ্য ফেইথ, লিবারেশন

থিওলজির বিভিন্ন দিক নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে। ১৯৮৬ সালে পরবর্তীকালের ইনস্ট্রাকশনে এটিকে আরও সুনজরে দেখা হয়। মুক্তির ধর্মতত্ত্বের অনুসারীদের মধ্যে যেমন শান্তিপ্রিয় সংঘ আছে, তেমনি জঙ্গি সংঘও আছে, যারা অস্ত্রের ব্যবহার সমর্থন করে।

**মুখোশ** (Kachina or Katein) আমেরিকান ইন্ডিয়ান আরিজোন হোপিও পিউবলোসহ অন্য আদিবাসীরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কারুকার্যময় একধরনের মুখোশ পরিধান করে থাকে, যাকে তাদের ভাষায় বলা হয় Kachina বা Kateina। যেসব ব্যক্তি মুখোশ পরিধান করে বা বহন করে তাদের মানবজাতির অতিপ্রাকৃত ব্যক্তিদের বংশধররূপে গণ্য করা হয়। তাদের বিশ্বাস, তারা শীতকালটা পৃথিবীর বুকে ও বাকি সময়টা আধ্যাত্মিক জগতে বসবাস করে থাকেন। আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের বিশ্বাস, অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের হত্যা করা হলে তারা হরিণে পরিণত হয়। তাদের আরও বিশ্বাস যে এসব ব্যক্তি খাদ্য, বৃষ্টি ও তরমুজ নিয়ে আসে। অতিপ্রাকৃত ব্যক্তিরা নিজেদের মুখোশ অন্য মানুষকে দিয়ে দেয় এ উদ্দেশ্যে যে অন্য মানুষের রূপে যেন তারা পরোপকারের ইচ্ছা সিদ্ধ করতে পারে। মুখোশগুলো অবাস্তব ও আকারের দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

**মুখোশনৃত্য** শিব, ধর্ম ও নীলের গাজন উৎসবে বিভিন্ন দেব-দেবীর মুখোশ পরে গান ও নৃত্য প্রদর্শনের প্রচলন আছে। বোলান গাজনে শ্মশান জাগানো নৃত্য, গৃধিনীর মুখোশ পরে গৃধিনীর শব ভক্ষণের অভিনয়-নৃত্য, নৃসিংহনৃত্য ও মুখাখেলনৃত্যেরও প্রচলন রয়েছে। নৃসিংহনৃত্যে নৃসিংহের দানবমূর্তির মুখোশ পরে নানা ভঙ্গির পদচারণ ও ঘূর্ণন প্রদর্শন করা হয়। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত রয়েছে মুখাখেলনৃত্য। গ্রামের সাধারণ মানুষ নিজেদের রচিত পালার চরিত্র অনুযায়ী কাঠ, কাপড়, কাগজ ইত্যাদি দিয়ে মুখোশ তৈরি করে। রাজা-মন্ত্রী থেকে গৃহস্থ-কাঠুরিয়াসহ বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় তারা নৃত্য করে।

**মুজাদ্দিদিয়া তরিকা** চার সুফি তরিকার অন্যতম। শায়খ আহমদ সারহিন্দি (১৫৬৪-১৬২৪ খ্রি.) এ তরিকার স্থপতি। তিনি মুজাদ্দিদে আলফে সানি অর্থাৎ সপ্তদশ শতকে ভারতে ইসলামের পুনর্জীবনদাতা হিসেবে পরিচিত। তিনি সম্রাট আকবর প্রবর্তিত দীন-ই-ইলাহি ধর্মের প্রভাব থেকে মুসলমানদের মুক্ত করেন। শায়খ আহমদ সারহিন্দি নানাভাবে মুসলিম-সমাজকে সংস্কারের পথ প্রদর্শন করেন। তিনি কামালিয়াতের মাধ্যমে ওলি-দরবেশদের একটি জামাত কায়েম করেন, যাঁরা কার্যকর আদর্শ হিসেবে ইসলামি বিধান ও আখলাকের প্রচারে ব্রতী হন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি সুধী সমাজকে খাঁটি ইসলামি আকিদা সম্পর্কে অবহিত করেন। বিভিন্ন স্তরের রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী আমির-উলামাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টার পাশাপাশি তিনি তৎকালীন ভারত সম্রাটের ওপরও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন।

**মুজিজা** আরবি শব্দটির অর্থ অলৌকিক ঘটনা। আল্লাহ নবীদের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন। মুজিজার যথার্থতার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে: এটা সাধারণ মানুষের জ্ঞানের উর্ধ্বে হবে, এটা বাতিল করা সম্ভব হবে না, নবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য হতে হবে এবং মানুষের ওপর সেই মুজিজা ও নবীর প্রভাব ফলপ্রসূ হবে। মহানবী (সা.)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিজা পবিত্র কোরআন। বিভিন্ন যুগে আল্লাহ বিভিন্ন নবীকে মুজিজা দান করেছেন, যেমন—মুসা (আ.)-কে লাঠি, সুলায়মান (আ.)-কে জিন, বাতাস এবং জীবজন্তুর ওপর খবরদারি করার ক্ষমতা এবং ঈসা (আ.)-কে দান করেছেন মৃতকে জীবিত করার শক্তি।

**মুতআ** আরবি শব্দটির অর্থ সাময়িক বিয়ে। প্রাক-ইসলামিক যুগে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। অস্থায়ী বা সাময়িক বিয়ে শিয়া সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সব মুসলমানের কাছে অবৈধ। মুতআ বিয়েতে ব্যভিচার বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে এবং সন্তানের ব্যাপারে পিতার কোনো ধরনের দায়িত্ব অর্পিত হয় না বলে শিয়ারাও এই বিয়ে মর্যাদাসম্পন্ন কাজ বলে মনে করেন না।

**মুতাওয়াতির** আরবি হাদিসশাস্ত্রের এমন একটি সংজ্ঞা, যে হাদিসের একাধিক বর্ণনাকারী এবং বেশির ভাগ লোক যে হাদিস সম্পর্কে অবগত,

তেমন হাদিসকেই মুতাওয়াতির বলা হয়। এমন হাদিসের মান খুবই উঁচু।

**মুতাওয়াল্লি** ইসলামে মসজিদ, মাদ্রাসা, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং এ-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বহনের জন্য সম্পত্তি ওয়াকফ করার যে ব্যবস্থা রয়েছে তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করেন, তাকেই মুতাওয়াল্লি বলা হয়। সাধারণত যে পরিবার সম্পত্তি আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে, তাদের ভেতর থেকেই একজনকে মুতাওয়াল্লি মনোনীত করা হয়। তারপর মূল মালিকের তাতে কোনো কর্তৃত্ব থাকে না এবং সম্পূর্ণ আয় সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় করা হয়।

**মুতাজিলা, মুতাজেলা, মুতাজিলি** ইসলামের একটি ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ। ওয়াসিল ইবনে আতা মুতাজেলা (মুতাজিলা, মুতাজিলি) আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান যখন তিনি তাঁর শিক্ষক হাসান আল-বসরির কাছ থেকে আলাদা হয়ে যান। মুতাজেলা শব্দের মূল শব্দ ইতাজালার অর্থ হচ্ছে 'আলাদা হওয়া'। প্রশ্ন ছিল : কোনো মুসলমান যদি কোনো গূঢ় অপরাধ করে থাকেন, তাহলে তাঁর অবস্থা কী হবে! সমস্যা উত্থাপিত হয় উসমান (র.)-কে হত্যার পর। খারিজিদের মতে, বিশ্বাসী কেউ কবিরা গুনাহ বা মহাপাপ করে থাকলে তিনি আর মুসলমান থাকেন না, কাফির হয়ে যান। আর এ ক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য। ওয়াসিল ইবনে আতা মনে করেন, কাফির, বিশ্বাসী ইত্যাদি পবিত্র কোরআনে যেভাবে বর্ণিত তা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। একজন পাপী এ দুটো অবস্থানের 'মধ্যবর্তী' অবস্থায় অটুট বিশ্বাস এবং সম্পূর্ণ অবিশ্বাসের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকেন। তিনি শুধু ফাসিক বা সত্যত্যাগী। মুরতাদ বা কাফিরের ক্ষেত্রে যে শাস্তি প্রযোজ্য তা তাঁর বেলায় প্রযোজ্য নয়। তাঁরা কঠোরভাবে পূর্বনির্ধারণবাদের সমালোচনা করেন। আল-আশারি এবং আল-মাতুরিদিরা মুতাজেলাপন্থীদের বিরোধিতা করেন। তাঁরা পবিত্র কোরআনকে যুক্তিশীলতার ওপরে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন।

অগ্রণী মুতাজেলা ধর্মতাত্ত্বিকেরা-আবুল-হুদেল আল-আলাফ (মৃত্যু ৮৩৬/৮৪৫ খ্রি.), ইবরাহিম আল-নাজ্জাম (আনু. ৭৭৫-৮৪৫ খ্রি.), আমর ইবনে বাহার আল-জাহিজ (৭৬৬-৮৬৮/৮৬৯ খ্রি.), মুতাজেলা মতবাদের বাসরা শাখা; আর প্রতিদ্বন্দ্বী বাগদাদ শাখার অন্তর্ভুক্ত বিশর ইবনে আল-মুতামির (মৃত্যু ৮২৫ খ্রি.), আবু মুসা আল-মিরদার (মৃত্যু ৮৪১ খ্রি.), জাফর ইবনে-হারব (মৃত্যু ৮৫১), আহমাদ ইবনে আবি-দুয়াদ (মৃত্যু ৮৫৫ খ্রি.) পাঁচটি মূলনীতির ওপর একমত ছিলেন। যেমন— (ক) আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা, (খ) আল্লাহর ঐক্য, (গ) 'মধ্যবর্তী অবস্থান' (ঘ) আল্লাহর পুরস্কার ও শাস্তিপ্রদান ওল্টানো যায় না এবং (ঙ) সঠিক কাজ করা না করা হচ্ছে আল্লাহর হুকুম। এই নীতিগুলো সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, যদি মুতাজেলারা কাদের বিরোধিতা করেন, তা যদি বিবেচনা করা হয়। তাঁরা বিরোধিতা করেন আক্ষরিকতাবাদী (পবিত্র কোরআনের আক্ষরিক ব্যাখ্যা যাঁরা করেন), নির্ধারণবাদী (ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে পূর্বনির্ধারিত), এবং সনাতনবাদীদের (হাদিস অধ্যয়নে বিশেষজ্ঞ)। মানবিক ক্রিয়াকর্ম 'প্রকৃতির নিয়ম' দ্বারা, কিংবা 'যান্ত্রিকভাবে' পরিচালিত—নির্ধারণবাদীদের এই অবস্থান আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতার গৌণ ধর্মীয় কর্তব্যের ধারণাকে গৌণ করে দেয়। মুতাজেলাপন্থীরা মনে করেন যে, পরজন্মের প্রতিশ্রুত সুখের যোগ্য হতে হলে মানুষকে যুক্তিসহকারে ভালো-মন্দের বিচার করতে হবে। আমরা পাপ-পুণ্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। আল্লাহ প্রজ্ঞাবান এবং ন্যায়পরায়ণ বলে পাপ নিষেধ করা, আর পুণ্য অনুমোদন করা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারেন না। পূর্বনির্ধারণবাদী আর সনাতনপন্থীদের মতে, আল্লাহ কোনো বাধ্যবাধকতার অধীন নন, তিনি যা অনুমোদন করেন, তা সঠিক। তিনি যা নিষেধ করেন, তা যথার্থ।

পবিত্র কোরআনের কিছু কিছু আয়াতে আল্লাহ মানবরূপী হিসেবে বর্ণিত—যেমন তিনি শোনেন, তিনি জানেন, তিনি বলেন, তিনি সিংহাসনে আসন গ্রহণ করেন। এ কারণে কিছু Anthropomorphistic আল্লাহকে 'শাশ্বত মানুষ'-এর সঙ্গে তুলনা করেন। মুতাজেলাপন্থীরা বলেন, আল্লাহর গুণাবলিকে (জ্ঞান, ক্ষমতা, প্রাণ, ইচ্ছা,

বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি) রূপক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর গুণাবলি তার সারবত্তা থেকে স্বতন্ত্র, এগুলো সহ-শাশ্বত। মুতাজেলাপন্থীরা এই অবস্থানকে আরও সমস্যাসংকুল মনে করেন। এক এবং অভিন্ন—ইসলাম ধর্মের এই আকর ধারণাকে সংকটাপন্ন করে তুলবে। মুতাজেলাপন্থীদের দৃষ্টিতে, সারবত্তা এবং গুণাবলি অভিন্ন। এই ধারণা অ্যারিস্টটল এবং প্লোটিনাসের ধারণার সঙ্গে মেলে, দ্বাদশ এবং একাদশ শতকের আল-ফারাবি, ইবনে সিনার মতো দার্শনিকদের ধারণার সঙ্গেও মেলে।

পবিত্র কোরআন যে ঐশ্বরিক বচন—এ ব্যাপারে মুতাজেলাদের কোনো সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তাঁরা মনে করতেন যে পবিত্র কোরআন হচ্ছে সৃষ্ট ব্যবস্থার একটি অংশ, যা অস্তিত্ব লাভ করে একটি অনির্ধারিত সময়ে। সুতরাং, যেহেতু এর শুরু আছে, এ কারণে একে ঐশ্বরিক বলা সম্ভব নয়। সনাতনপন্থী মুসলমানরা বলেন, যেহেতু পবিত্র কোরআন হচ্ছে আল্লাহর কথা, একে আল্লাহর কাছ থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়, এটি নিশ্চয়ই আল্লাহর সঙ্গেই সহ-অবস্থান করেছে অনন্তকাল ধরে এক অসৃষ্ট অবস্থায়। এই ঐশ্বরিক সূত্র থেকে এর অবতরণ ঘটে মোহাম্মদ (সা.)-এর কাছে ইতিহাসের সবচেয়ে যথার্থ সময়ে। যখন আব্বাসি খলিফা আল-মামুন 'সৃষ্ট' পবিত্র কোরআনের মুতাজেলা তত্ত্ব রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব বলে ঘোষণা করেন, তখন ধর্মীয় বাহাসের বিস্ফোরণ ঘটে। আহমাদ ইবনে হাম্বলের অনুসারী এবং সর্বসাধারণও কোনোভাবে মেনে নিতে পারেনি যে পবিত্র কোরআন, যা হচ্ছে ঈশ্বরের কালাম, তা বর্ণিত হতে পারে একটি সৃষ্ট ও আকস্মিক ঘটনা হিসেবে। তাদের মতে, এর অস্তিত্ব শুরু থেকেই 'কিতাবের মূল'-এ (১৩:৩৯), 'লওহে মাহফুজে' [সংরক্ষিত ফলকে] (৮৫:২২)। মুতাজেলাদের সমর্থনের কারণে আল-মামুন ঘোষণা করেন, কাজি যদি 'সৃষ্ট' পবিত্র কোরআন তত্ত্বের বিরোধিতা করেন, তাহলে তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। এই তত্ত্বের ঘোর বিরোধী ছিলেন আহমাদ ইবনে হাম্বল (৭৮০-৮৫৫ খ্রি.)। কারাভোগ করেও তিনি কালাম হিসেবে পবিত্র কোরআন 'অ-সৃষ্ট,' এবং শাশ্বত, এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন। পরে তিনি মুক্তি লাভ করেন, আব্বাসি খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল তাঁকে সসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর তিন পূর্বসূরির ধর্মীয় নীতি উল্টে দেন।

সৃষ্টিকর্তার ঐক্যের ধারণা, সৃষ্টিকর্তা এবং আর সব সৃষ্ট জিনিসের মধ্যে পার্থক্যের ধারণা; মানুষের যুক্তির ওপর আস্থা; মানুষের স্বাধীনতার ওপর গুরুত্বারোপ, তার ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারার ক্ষমতা, ভেতরে-বাইরে—সব স্থানেই পাপের বিরুদ্ধে লড়াই করা মানুষের কর্তব্য, এসব ধারণার জন্য অনেক আধুনিকতাবাদী মুতাজেলাবাদের ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকেন।

**মুনকির-নকির** দুই ফেরেশতা, যাঁরা মৃত্যুর পর কবরে প্রশ্ন করতে আসেন। তাঁরা প্রশ্ন করেন, তোমার প্রভু কে? তোমার ধর্ম কী? আর মহানবী (সা.)-এর দিকে ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করেন, উনি কে? যে ব্যক্তি সৎভাবে জীবন যাপন করে সে উত্তর দিতে সমর্থ হয় আর তার কবরকে শান্তিময় করে দেওয়া হয়। উত্তরদানে অক্ষম ব্যক্তির জন্য কবরে শাস্তি আরম্ভ হয়।

**মুনাফিক** আরবি এই শব্দের অর্থ কপট, যারা প্রকাশ্যে বন্ধু আর গোপনে শত্রু হয়। পবিত্র কোরআনে সুরা বাকারার শুরুতে এদের পরিচিতি রয়েছে। এদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সুরা 'মুনাফিকুন'-এ। মুনাফিকরা সর্বদা মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবিদের কষ্ট দেওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকত। মদিনায় হিজরতের পর মদিনাবাসীর মধ্যে কিছু লোক মহানবী (সা.)-এর মজলিশে উপস্থিত হতো, মুসলমানদের সঙ্গে নামাজ পড়ত আবার পেছনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। এই মুনাফিকদের দলের নেতা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল।

**মুনি** তপস্বী, ঋষি। যিনি কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে নানা রকম অনুমান করার জন্য মনকে আলোড়িত করতে পারেন। এই জন্যই বলা হয় 'নানা মুনির নানা মত'।

**মুবাহ** এমন কাজ, যা করা বা না-করার জন্য শরিয়তে কোনো বিধান নেই। শরিয়ার দৃষ্টিতে

যে কাজ উপকারীও নয়, অপকারীও নয় এবং যা সম্পর্কে শরিয়তে কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি।

**মুমতাছার** এমন প্রিয় কাজ, যা করার জন্য শরিয়তে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে ও প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তা না করলেও কোনো পাপ হবে না।

**মুয়ামালাত** মানবিক কাজের যে অংশ পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে যেসব কাজে আইনের প্রশ্ন জড়িত থাকে, যেমন বিয়ে, ব্যবসায়। ইসলামে এদের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মোহাম্মদ (সা.)-এর আদেশ, অপরিচিত লোকের মতো মুয়ামালা করো, যাতে কারও অধিকার বিনষ্ট না হয়। তিনি হকদারের হক আদায়ের জন্য তাগিদ দেন।

**মুরজিয়া** সপ্তম শতাব্দীতে উমাইয়া বংশের প্রথম দিকে একটি মুসলমান সম্প্রদায় এই মর্মে বিশ্বাস ও আশা পোষণ করত যে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাই মুক্তি লাভের জন্য যথেষ্ট। মুক্তি মানুষের কর্মের ওপর নির্ভরশীল নয়। মুসলমান যত পাপই করুক না কেন, সে ইসলাম ধর্ম থেকে খারিজ হবে না। অপরদিকে খারিজি সম্প্রদায়ের মতে, কোনো মুসলমান ইসলামি আইন ভঙ্গ করামাত্রই ইসলাম ধর্ম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

**মুরতাদ** যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তা পরিত্যাগ করেন। পবিত্র কোরআনে ইসলামত্যাগীকে কেবল পরকালের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। তাঁদের প্রতি বর্ষিত হবে আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষের অভিশাপ। সুরা বাকারার ২১৭ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'কেউ তোমাদের স্বীয় ধর্ম থেকে যদি ফিরে যায় এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী হিসেবে মৃত্যু হয়, ইহকাল ও পরকালে তাঁদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়।' ইমাম শাফেয়ি একে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে প্রধান প্রমাণ হিসেবে উদ্ধৃত করেন। পবিত্র কোরআনে মুরতাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের কোনো আদেশ বা কোনো নজির নেই। ফিকাহ শাস্ত্রে সবাই একমত যে সাবালক ও সুস্থ মনের পুরুষ স্বেচ্ছায় কোনো বলপ্রয়োগে বাধ্য না হয়ে ধর্মত্যাগ করলে তাঁর শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। সব ধরনের পীড়ন, যেমন—আগুনে পোড়ানো, পানিতে ডোবানো, গলা টিপে শ্বাস রোধ করা, শূলে চড়ানো এবং জীবিত অবস্থায় চামড়া ছাড়ানোর বিরুদ্ধেও মত দেওয়া হতো। ধর্মত্যাগীকে তওবা করার সুযোগ দেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে হাদিসে মতভেদ রয়েছে।

অনেকে মনে করেন, মুরতাদকে বন্দী রেখে তওবা করার সুযোগ দিতে হবে। মুরতাদ হওয়ার পর ইসলামি আইন অনুসারে কারও ধনসম্পদ এবং স্ত্রীর ওপর অধিকার থাকবে না, স্ত্রী তালাক হবে এবং সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হবে। পুরুষ ও নারীর শাস্তির ব্যাপারে হানাফি ও শিয়াদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। পুরুষকে হত্যা এবং নারীকে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী রাখতে হবে। ধর্মীয় স্বাধীনতা দ্র.

**মুরশিদি** গুরু। যিনি খোদা তায়ালা এবং সাধকের মধ্যে মধ্যস্থতা করে থাকেন। আধ্যাত্মিক পথের পথিক হতে হলে কোনো মুরশিদের মুরিদ হতে হয়। দলীয় আদর্শকে ফুটিয়ে তোলার জন্য অনেক মুরশিদ আধ্যাত্মিক গান রচনা করে শিষ্যদের অনুপ্রাণিত করেন, যা মুরশিদি গান নামে পরিচিত।

**মুরসাল** হাদিসের একটি পরিভাষা। মুরসাল শব্দ নবী বা রাসুল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যদি কোনো হাদিস সংকলকের প্রামাণ্য গ্রন্থে সন্দেহব্যঞ্জক শব্দ দিয়ে হাদিস বর্ণিত হয়, যেমন, 'বলা হয়েছে' বা 'বলা হয়' এবং বর্ণনাকারীদের সনদের শেষে কোনো বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা না হয়, সে ক্ষেত্রে ওই হাদিসকে মুরসাল বলা হয়।

**মুল্লা, মোল্লা** ইসলাম ধর্মের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি। মুল্লা বা মোল্লারা এখনো গ্রামাঞ্চলে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দান ও অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। জামাতে ইমামতি করেন। ইসলাম ধর্মানুসারে বংশগতভাবে এদের বিশেষ কোনো গরিমা বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

**মুসতাহাব, মাকরুহ, মুবাই** ফিকাহ শাস্ত্রের তিনটি আরবি পারিভাষিক শব্দ। মুসতাহাব এমন কাজ যা করার জন্য শরিয়ায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রতিদান ঘোষিত হয়েছে, তবে তা না করলে কোনো পাপ হয় না। মাকরুহ অবাঞ্ছনীয় কাজ।

মাকরুহ দুই ধরনের। মাকরুহ তাহারিমি হারামের কাছাকাছি। তা না করার জন্য তাগিদ রয়েছে। মাকরুহ তানজিহি অপছন্দনীয় হলেও অপেক্ষাকৃত পাপের অংশ কম। মুবাই এমন কাজ, যা করা বা না-করার ব্যাপারে শরিয়ায় কোনো বিধান নেই। শরিয়তের দৃষ্টিতে এই কাজ উপকারীও নয়, অপকারীও নয়।

**মুসনাদ** যে হাদিসে সকল বর্ণনাকারীর নামের উল্লেখ আছে এবং সেই সব নামের উল্লেখসহ সনদ মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে, সেই হাদিসকে মুসনাদ বলা হয়। সাধারণভাবে ইমাম হামবলের হাদিস সংকলনকে মুসনাদ বলা হয়।

**মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে কমিটি** গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলমানদের মধ্যে আরবি ও ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও প্রচারের জন্য বেশকিছু কমিটি গঠিত ও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়, যেমন আর্ল কনফারেন্স ১৯০৭, হর্নেল কমিটি ১৯১৪, হার্লে কমিটি ১৯১৫, শামসুল হুদা কমিটি ১৯২১, মোমেন কমিটি ১৯৩১, মওলা বখশ কমিটি ১৯৩৮, সৈয়দ মুয়াজ্জম হোসেন কমিটি ১৯৪৬ ইত্যাদি। এসব কমিটি মাদ্রাসাশিক্ষা ও আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় ও সংস্কার সাধন করে আধুনিকায়নের যে সুপারিশ করে, তাতে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়।

**মুসলিম ধর্মীয় আন্দোলন** উনবিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত বাংলার মুসলিম ধর্মীয় আন্দোলন ছিল প্রধানত ধর্মীয় পুনর্জাগরণধর্মী, তবে অংশত এগুলো আধুনিকতাবাদী সংস্কারমূলক প্রকৃতিরও ছিল। এসবের মধ্যে ফরায়েজি, তরিকা-ই-মুহম্মদিয়া, তাইয়ুনি ও আহল-ই-হাদিস-এর মতো ইসলামি সংস্কার আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতিগতভাবে এগুলো ছিল পুনর্জাগরণধর্মী এবং পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর বাংলাব্যাপী মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে গভীরভাবে উদ্দীপিত করে মুসলিম জনগণকে আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার কাজে এগুলো উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। যে তাবলিগ জামাত ও সিরাত সম্মেলন আন্দোলন সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে অনুরূপ গুণ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে, তা পূর্ববর্তী শতাব্দীর আন্দোলনগুলোর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এগুলো অনেকাংশে পূর্ববর্তী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীও বটে।

**মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ** ১৯২৯ সালে মিসরে প্রতিষ্ঠিত একটি আধা-ধর্মীয় ও আধা-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যার মূল মতবাদ ছিল পবিত্র কোরআন ও হাদিস প্রতিটি যুগে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সব ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ পথপ্রদর্শক। সাবেক স্কুলশিক্ষক ও ঘড়ি মেরামতকারী হাসান আল-বান্না এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৫ সালে সিরিয়া-মিসর একত্রীকরণের পর এই সংঘকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়।

**মুসলিম সাহিত্য সমাজ** মুক্তবুদ্ধি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে এটি ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সক্রিয় থাকে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল কাদির, আবুল ফজল ও কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ ছিলেন। মুখপত্র ছিল *শিখা* পত্রিকা। রক্ষণশীলেরা এ সংগঠনের বিরোধিতা করলে সংগঠনটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

**মুসা ইবনে উকবা** বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও গ্রন্থকার। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম জুহরির শিষ্য। ইমাম মালিকের কাছ থেকেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। অনেক মুহাদ্দিস অপেক্ষাকৃত দুর্বল বিবরণ গ্রহণ করলেও তিনি তা করেননি। তিনি মূলত জিহাদ-সংক্রান্ত হাদিস সম্পর্কে খ্যাতি লাভ করেন।

**মুসাফা** দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলে একে অন্যের হাত ধরে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য ও আন্তরিকতার ভাব প্রকাশ করাকেই মুসাফা বলে। চীনের অধিবাসীরা সাক্ষাৎকালে ওপরের দিকে হাত তোলে। নিউজিল্যান্ডের একটি জাতি একে অপরের নাক স্পর্শ করে। হিন্দুরা হাত জোড় করে নমস্কার করে। মুসলমানদের সালাম দেওয়া সুন্নত এবং সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। সালাম দেওয়া ও সালামের উত্তর দেওয়ার পর মুসাফা করা হয়। হজরত মোহাম্মদ (সা.) বলেছিলেন, 'দুজন মুসলমান পরস্পর সাক্ষাতের পর হাত মেলালে সেই হাত পৃথক হওয়ার আগেই তাদের গুনাহগুলো মাফ হয়ে যাবে।'

**মুসাল্লা** সালাত বা নামাজের স্থান। হজরত মোহাম্মদ (সা.) মদিনার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের যে খোলা জায়গায় প্রথম ঈদের নামাজ পড়া হয়, সেই জায়গাকে মুসাল্লা বলা হয়। সেখানে বৃষ্টির জন্য ইসতিসকা ও মৃতের জন্য জানাজার নামাজও পড়া হতো। পরে যে জায়গায় নামাজের সময় ইমাম দাঁড়ান তাঁকেও মুসাল্লা বলা হয়। ক্রমে ক্রমে যে নির্দিষ্ট জায়নামাজের ওপর নামাজ পড়া হয়, তারও নাম মুসাল্লা।

**মুসাহির** রমজান মাসে সেহরির সময় যে ব্যক্তি রোজাদারদের ঘুম থেকে জাগান, তাঁকে এ নামে ডাকা হয়। মুসলিম মহল্লায় মুসাহির দুই ঘণ্টা আগে রোজাদারদের ঘুম ভাঙান। কখনো কখনো ঢাক পেটানো হয় এবং সুর করে কবিতাও পড়া হয়। আরব দেশের মুসাহিরের জনপ্রিয় নাম আবু-তাবলাহ বা ঢাকের পিতা। আজকাল সেহরির সময় সাইরেন বাজানো হয়।

**মুহাজিরিন** আরবি শব্দ, বহুবচন, একবচন মুহাজির অর্থাৎ দেশত্যাগী। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করে, তাদের এ নামে অভিহিত করা হয়। ইসলামিক পরিভাষায় ধর্মীয় উদ্দেশ্যে দেশত্যাগকে 'হিজরত' বলা হয়। পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মক্কার কুরাইশদের অত্যাচারে হজরত রাসুল (সা.)-কেও প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে ২৭০ মাইল দূরে মদিনায় হিজরত করতে হয়। অতঃপর প্রায় সব মুসলমান মদিনায় সমবেত হতে থাকে, তারাই মুহাজিরিন। এরা শুধু আল্লাহর প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার বাস্তবায়নের জন্য বাড়িঘর, ব্যবসায়-বাণিজ্য, অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুত্র ও পরিবারের সদস্যদের পর্যন্ত ত্যাগ করে পুরোপুরি নিঃস্ব অবস্থায় মদিনায় হিজরত করে, এ জন্য মুহাজিরিনের স্থান অতি উচ্চে।

**মুহাদ্দেস** হাদিসশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। মহানবীর (সা.) হাদিসশাস্ত্রে যাঁরা পারদর্শী হন, তাঁদের মুহাদ্দেস বলা হয়। মুসলিম-সমাজে তাঁরা সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তৃতীয় হিজরি থেকে হাদিস সংকলন প্রকাশিত হতে শুরু করে। ছয়টি সংকলন বিশ্ববিখ্যাত এবং সর্বজনস্বীকৃত। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ হলো বুখারি শরিফ। এটি ইমাম মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আলবুখারি (৮১০-৮৭০ খ্রি.) কর্তৃক সংকলিত।

**মূর্তিতত্ত্ব** পাথরের ভাস্কর্য তৈরির জন্য যে পরিমাণ পাথরের প্রয়োজন, বাংলায় তা না থাকলেও খ্রিষ্টীয় নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় বিপুলসংখ্যক শিল্পসম্মত ও সুন্দর প্রস্তর ভাস্কর্য, বিশেষত বিভিন্ন ধর্মীয় মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। বাংলায় এসব ভাস্কর্য নির্মাণ করার জন্য পূর্ব ভারতের বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার রাজমহল পাহাড় থেকে ধূসর কালো পাথর আমদানি করা হতো।

**মৃত আত্মা** (Tupilaq) এস্কিমোদের কোনো কোনো গোত্রের মধ্যে মৃতদের আত্মা সম্পর্কে যে ধরনের বিশ্বাস প্রচলিত আছে, তাকে মৃত আত্মা বলা হয়। তাদের সেই ধারণা অনুসারে মৃত আত্মাকে এড়িয়ে চলা হয়। কারণ এটা রোগব্যাধি বহন করে আনতে পারে এবং এর সংস্পর্শে মৃত্যুও হতে পারে।

**মৃত্যু** প্রাণী সৃষ্টির পর ব্রহ্মা তাদের সংহারের উপায় ভাবতে থাকেন। তাঁর ক্রোধ থেকে আকাশে উৎপন্ন অগ্নি সমস্ত জগৎ দগ্ধ করতে থাকে। তখন প্রজাদের রক্ষায় মহাদেব ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা বললেন, পৃথিবী ভারবহ হলে প্রাণ সংহারের জন্য অনুরোধ করার কোনো উপায় না দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। মহাদেবের প্রার্থনায় ব্রহ্মা তাঁর নিজের দেহেই তাঁর ক্রোধাগ্নি ধারণ করলেন। তখন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার থেকে পিঙ্গলবর্ণা, রক্তনয়না, স্বর্ণকুণ্ডলধারিণী মৃত্যু-দেবী আবির্ভূত হন। ব্রহ্মা তাঁকে সকল প্রাণী সংহারকার্যে নিয়োজিত করতে চান। মৃত্যু-দেবী বলেন যে তিনি নারী; সুতরাং তিনি এই কর্ম করতে পারবেন না। তখন তিনি ধেনুক ঋষির আশ্রমে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিতে এলে মৃত্যু তখন বললেন, তিনি সুস্থ প্রাণীকে বধ করতে চান না। তিনি স্বয়ং আর্ত ও ভীত হয়ে ব্রহ্মার কাছে অভয় প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা বলেন, এতে মৃত্যু-দেবীর কোনো অপরাধ হবে না। সনাতন ধর্মই তাঁকে পবিত্র রাখবেন। যম এবং ব্যাধিও তাঁকে সাহায্য

করবেন। ব্রহ্মা ও দেব তাদের বলে বলীয়ান হয়ে তিনি নিষ্পাপ আদেশ শিরোধার্য করে বলেন যে লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, দ্রোহ, মোহ, অলজ্জা ও পুরুষ আচরণ ইত্যাদি দোষ দেহে বিদ্ধ হলেই তিনি বললেন যে, মৃত্যুর যে অশ্রুবিন্দু ব্রহ্মার হাতে পড়েছিল, তা-ই ব্যাধি হয়ে প্রাণীকে সংহার করবে, মৃত্যুর কোনো অধর্ম হবে না।

**মেঘনাদ** রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিতের এক নাম। লঙ্কার যুদ্ধে তিনি দুইবার রাম-লক্ষ্মণকে পরাজিত করেন। পরে রাম-লক্ষ্মণের কাছে পরাজিত হন।

**মেজবান** চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। ফারসি মেজবান শব্দটির অর্থ নিমন্ত্রণকর্তা, তবে বাংলাদেশে চট্টগ্রামে ব্যাপকভাবে চালু মেজবান মূলত কোনো উপলক্ষকে কেন্দ্র করে আয়োজিত গণভোজের পোশাকি নাম। বর্তমানে মেজবান আয়োজনের একটি প্রধান দিবস হচ্ছে হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও মৃত্যুদিবস ১২ রবিউল আউয়াল।

**মেথডিজম** নিয়মনিষ্ঠাবাদ। ইংল্যান্ডের প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের মতবাদ এবং উপাসনাপদ্ধতি। জন ওয়েলেসলি কর্তৃক প্রবর্তিত। জন ওয়েলেসলি এবং তাঁর ভাই চার্লস, জর্জ হুইটফিলর্ড এবং আরও কয়েকজন মিলে ১৭২৯ সালে অক্সফোর্ডে যে সংঘ গঠন করেন, তারই সদস্যদের মেথডিস্ট বলা হতো।

**মেনকা** হিন্দু পুরাণমতে, অপ্সরা। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে অপ্সরা নৃত্যের মাধ্যমে বিশ্বামিত্র মুনির তপস্যা ভঙ্গ করলে বিশ্বামিত্রের ঔরসে তাঁর গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। শকুন্তলার জন্মের পর স্বর্গ থেকে ডাক এলে নবজাত শিশুকে মালিনী নদীর তীরে ফেলে রেখে তিনি স্বর্গে চলে যান।

**মেনহির** কবরে বা কবরের কাছে অবস্থিত খাড়া পাথর, যা প্রাগৈতিহাসিক কালের স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বড় ও ছোট পাথর গোলাকারভাবে একসঙ্গে দেখা যায়, যেখানে একটি বড় মেনহিরকে অনেক ছোট ছোট পাথর ঘিরে থাকে। ফ্রান্সের কারনাকে অনেক মেনহির আবিষ্কৃত হয়েছে।

**মেনা** উমার মাতা ও হিমালয়ের স্ত্রী। যে সময়ে দক্ষকন্যা সতী মহাদেবের সঙ্গে হিমালয়ে বাস করতেন সেই সময় মেনকা সতীর সখী ছিলেন। সতী যখন দক্ষগৃহে প্রাণত্যাগ করেন মেনকা তখন এই মর্মে কঠোর তপস্যা করতে আরম্ভ করলেন, সতী যেন তাঁর কন্যা হয়ে আবার জন্মগ্রহণ করেন। ভগবতী তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলে তিনি এই মর্মে বর চাইলেন, তাঁর যেন ১০০ পুত্র ও একটি কন্যা হয়। দেবী বললেন, 'তা-ই হবে এবং আমি তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করব।' বর লাভের পর মৈনাক প্রভৃতির জন্ম হয় এবং সতী জন্মগ্রহণ করেন।

**মেনিকেইজম** পারস্য দেশে এই মতবাদের উদ্ভব ঘটে। মেনি এ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং অনেক ধর্মীয় দার্শনিক প্রত্যয়ের সমন্বয় করার প্রয়াস চালান। মেনিকেইজমের মধ্যে ভালো ও মন্দের ধারণা আছে। এ মতবাদে জরথুস্ত্রবাদ, বৌদ্ধধর্ম, যিশুখ্রিষ্টের জীবন এবং হিন্দুধর্মের মিশ্রণ আছে। মেনি প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ধর্মের সংমিশ্রণে সৃষ্ট মতবাদ মেনিকেইজম নামে খ্যাত।

**মেনেলেয়াস** গ্রিক পৌরাণিক কাহিনিতে বর্ণিত স্পার্টার রাজা, হেলেনের স্বামী। তিনি হারমাইওনির পিতা এবং আগামেমননের অনুজ। প্যারিস হেলেনকে নিয়ে ট্রয়ে পালিয়ে গেলে অন্যান্য গ্রিক বীর মেনেলেয়াসের পক্ষে ট্রয়ের যুদ্ধে যোগ দেন। ট্রয়ের পতনের পর অনেক দুঃসাহসিক পর্যটন শেষে তিনি হেলেনসহ স্পার্টায় প্রত্যাবর্তন করেন।

**মেরু** পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থানে অবস্থিত পর্বত, যার ওপরে আছে ইন্দ্রের স্বর্গ। দেবতাদের বাসস্থান। মেরু অন্য নামেও পরিচিত, যেমন—সুমেরু, হিমাদ্রি ইত্যাদি।

**মেসাইয়া** হিব্রু শব্দটির অর্থ তৈল লেপন করে যে ব্যক্তিকে পবিত্র করা হয়। ইহুদি ধর্মমতে, তিনি সেই ধর্মপ্রাণ মানুষ, আল্লাহ যাঁকে ইসরাইল পুনরুদ্ধার করতে পাঠাবেন। ওল্ড টেস্টামেন্টে যে মেসাইয়ার উল্লেখ রয়েছে, যিশুখ্রিষ্ট নিজেকে সেই ব্যক্তি মনে করতেন এবং খ্রিষ্টানরাও তা-ই বিশ্বাস করতেন। যিশুর সময় লোকের ধারণা ছিল যে মেসাইয়া পৃথিবীতে গৌরবময় রাজত্ব করবেন। যিশু তাঁর প্রথম আগমনে ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুতি

নেন। দ্বিতীয় আবির্ভাবে শেষ প্রতিকার সাধিত হবে এবং বিশ্বে ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। সংস্কারবাদী ইহুদিরা ব্যক্তি মেসাইয়ার আদর্শ পরিত্যাগ করে সর্বজনীন শান্তির মেসাইয়ানিক যুগের কথা বলছেন। বহু রক্ষণশীল ইহুদি ইসরাইল রাষ্ট্রকে সেই প্রতিকার যুগের সূত্রপাত মনে করেন। জাইয়ানবাদ অনেক সময় ধর্মনিরপেক্ষ মেসাইয়াবাদ হিসেবে বিবেচিত হয়। ইহুদিদের কাছে মেসাইয়া ঐতিহ্যগতভাবে দাউদ (আ.)-এর একজন বংশধর হিসেবে বিবেচিত। মেসাইয়াবাদের আশা ও প্রত্যাশা ইহুদিদের নানা ধর্মগত অনুষ্ঠান—স্যাবাথ, প্যাসোডার, শাভুত, সুক্কোত ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত।

**মৈত্রেয়** জনৈক ঋষি। কাম্যক বনে বনে তীর্থ পর্যটন করতে গিয়ে যুধিষ্ঠির প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ধৃতরাষ্ট্র সেই সময় বিদুরকে নির্বাসিত করেন ও পরে অনুতপ্ত চিত্তে ফিরিয়ে আনেন। ধৃতরাষ্ট্রের অস্থির মতির কথা জানতে পেরে ব্যাস ও মৈত্রেয় পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ দেন এবং দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরোধ করতে নিষেধ করেন। দুর্যোধন কোনো উত্তর না দিয়ে আপন উরুতে চপেটাঘাত করে মৈত্রেয়কে উপেক্ষা করেন। মৈত্রেয় ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন যে, গদাযুদ্ধে ভীম দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন।

**মৈত্রেয়ী** যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী। দ্বিতীয়া স্ত্রী কাত্যায়নী সাধারণ গৃহিণীর মতো গার্হস্থ্য জীবনেই নিরত ছিলেন। মৈত্রেয়ী সংসারধর্ম পালনের পাশাপাশি ব্রহ্মবিদ্যাও অনুশীলন করতেন। সংসার ত্যাগ করার আগে যাজ্ঞবল্ক্য দুই স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে আমি এখন সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছি। তোমাদের অনুমতি পেলে আমি তোমাদের দুজনের মধ্যে আমার সমস্ত অর্থসম্পদ বন্টন করে দিয়ে সংসার ত্যাগ করে অরণ্যে চলে যাব।' মৈত্রেয়ী স্বামীকে প্রশ্ন করলেন, 'পৃথিবীর সমস্ত ধন ও অর্থ যদি আমার হয়, তবে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব?' যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, 'বিত্ত দিয়ে কখনো অমৃতত্ব লাভ করা যায় না।' মৈত্রেয়ী স্বামীর যাত্রাকালে জিজ্ঞেস করলেন, 'যে নাহর নাহমৃতা স্যাং; কি মহর তেন কুর্যাম।' যাতে অমৃত পাব না, তা দিয়ে আমি কী করব? ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীর প্রশ্ন শুনে যাজ্ঞবল্ক্য সংসার ত্যাগ করলেন না, স্ত্রীর সঙ্গে অমৃতের, অমরত্বের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

**মোপলা** কারও কারও মতে, শব্দটি মহা (প্রধান) ও পিল (পিস্তল), মতান্তরে মা ও পিল শব্দের অপভ্রংশ। অতি প্রাচীনকাল থেকে মালাবারের সঙ্গে আরবদের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। কোনো কোনো আরব বণিক নায়ার রমণী বিয়ে করে মালাবারে বসতি স্থাপন করেন। মোপলারা এরকম মিলনের ফসল।

**মোমেন কমিটি** খানবাহাদুর আবদুল মোমেনের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি। ১৯৩৪ সালে কমিটির রিপোর্টে এই মন্তব্যে ছাত্রদের মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কোরআন ও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া, প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা, এ জন্য পৌরসভাগুলোকে উৎসাহিত করা, উচ্চশিক্ষা খাতের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ভেটেরিনারি ও ট্রেনিং কলেজে নির্দিষ্টসংখ্যক আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত রাখা এবং চাহিদা অনুসারে তা বাড়ানো, ইসলামিয়া কলেজে বিজ্ঞানবিষয়ক কোর্স খোলার ব্যবস্থা করা ইত্যাদিসহ আরও অনেক সুপারিশ করা হয়।

**মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি** ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে নবাব আবদুল লতিফ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সংঘ। উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে মুসলমানদের পরিচিত করানো এবং প্রয়োজনে সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার মাধ্যমে সাহায্য করা। সোসাইটির সদস্যরা ছিলেন অভিজাত ও উচ্চবিত্ত। তাঁরা উর্দুকেই মাতৃভাষা অথবা মুসলমানদের ভাষা বলে গণ্য করতেন। সোসাইটিতে সব আলোচনা উর্দু, ফারসি বা ইংরেজিতে হতো। ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে এই সংগঠন বক্তব্য রাখত। 'তরিকা-ই-মুহম্মদিয়া'র ইংরেজশাসন-বিরোধী প্রভাবকে বাধা দেওয়ার জন্য ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় যে সভার আয়োজন করা হয়, সেখানে ঠিক করা হয় যে, ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষ হচ্ছে দার-উল-ইসলাম, দার-উল-হরব নয়। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হবে ভেবে ১৮৮৫-তে ইন্ডিয়া কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদানের আমন্ত্রণ

সোসাইটি প্রত্যাখ্যান করে। ১৮৯৯-এ সৈয়দ আমীর আলী মুসলিম শিক্ষা বিষয়ে অনুসৃত সরকারি নীতির সমালোচনা করলে সোসাইটি তার প্রতিবাদ করে সরকারি নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন দান করে। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম তহবিলের সর্বস্তরে মাদ্রাসা স্থাপনেই এটি বেশি উৎসাহ দিত। সোসাইটি বস্তুত বাংলা ভাষা চর্চার বিরোধিতা করত এবং মাদ্রাসায় উর্দু ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা সমর্থন করত।

**মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক** (আ.৭০৪-৭৬৭) হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রথম জীবনী রচয়িতা। তিনি এক অন-আরব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হাদিস এবং বিভিন্ন কবিতা ও কাহিনি সংগ্রহ করেন। আব্বাসি খলিফা আল-মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় খলিফার পুত্র মাহদির বিদ্যালয়ে পাঠের জন্য তিনি এই জীবনী রচনা করেন। সৃষ্টির সূচনা থেকে মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত বিস্তৃত কালপরিসরকে ধারণ করেই তিনি এই ইতিহাস রচনা করেন। তিনি ইবরাহিম (আ.), মুসা (আ.), ইয়াকুব (আ.), বিশেষ করে ঈসার আদলে এক নতুন নবীর বর্ণনা দেন। জীবনীটির সংক্ষিপ্ত সার রচনা করেন ইবনে হিশাম (মৃ. ৮৩৪) এবং তাঁর গ্রন্থটি মুসলিম দুনিয়ায় খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

**মোহাম্মদ (সা.), হজরত** ইসলাম ধর্মের প্রচারক মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)। আরবদেশের প্রসিদ্ধ মক্কা নগরে প্রতিপত্তিশালী কুরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। মক্কার নেতৃত্ব ও কাবা গৃহের হেফাজতের ভার বহুকাল কুরাইশদের হাতে ছিল। বাণিজ্য ছিল কুরাইশদের প্রধান অবলম্বন। হজরত মোহাম্মদ (সা.) মাতৃগর্ভে থাকতেই তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ব্যবসা উপলক্ষে ইয়াসরিব (মদিনা) নগরে মাতুলালয়ে যাওয়ার পর সেখানে মারা যান। হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম হলে পিতামহ আবদুল মুত্তালিব এই শিশুর লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। হজরত মোহাম্মদ (সা.) তাইফবাসিনী বিবি হালিমার গৃহে থেকে তাঁর স্তন্যপান করেন। চার বছর পর পিতামহের আশ্রয়ে ফিরে আসেন। মোহাম্মদ (সা.)-এর ছয় বছর বয়সে তাঁর মাতা আমিনা তাঁকে ও দাসী উম্মে আয়মানকে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় তাঁর পিতার মাতুলালয়ে যান। সেখানে এক মাস থেকে মক্কা ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে আমিনার মৃত্যু হয়। উম্মে আয়মান অসহায় শিশুকে নিয়ে পিতামহের গৃহে ফিরে আসেন।

পিতামহের স্নেহ তিনি বেশিদিন ভোগ করতে পারেননি। তাঁর আট বছর বয়সের সময় পিতামহ তাঁর লালন-পালনের ভার চাচা আবু তালিবের ওপর অর্পণ করে মারা যান। শিক্ষার সুযোগ তাঁর কখনো ঘটেনি। মাঠে মাঠে ছাগ বা মেষপাল চরানো তাঁর একটি কর্তব্য ছিল। প্রকৃতির কোলে অসীম আকাশ আর দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি ও পাহাড় তাঁর একমাত্র শিক্ষাগার ছিল। তাঁর বয়স যখন ১৩ বছর তখন আবু তালিব ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া গমন করলে তিনিও তাঁর সঙ্গী হন। ২০ বছর বয়সের সময় মোহাম্মদ (সা.) নিজ বংশের প্রথা অনুযায়ী ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততার জন্য মক্কাবাসী তাঁকে 'আল-আমিন' অর্থাৎ বিশ্বস্ত আখ্যা দিয়েছিলেন। মক্কার খাদিজা-নাম্নী এক উচ্চমনা ধনবতী বিধবা তাঁর সততা ও কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের কথা শুনে তাঁকে তাঁর সঙ্গে ভাগে ব্যবসা করতে আহ্বান জানান। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বাণিজ্যযাত্রা করেন। এ ব্যবসায় প্রচুর লাভ হয় এবং তিনি তাঁর ভাগে যথেষ্ট অর্থ লাভ করেন। মোহাম্মদ (সা.)-এর গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে বিবি খাদিজা তাঁকে বিয়ে করেন। এই সময় তাঁর বয়স ২৫ বছর ও বিবি খাদিজার বয়স ৪০ বছর। এই বিয়ের ফলে বিবি খাদিজা তিন পুত্র ও চার কন্যার জন্ম দেন। পুত্রসন্তানরা শৈশবেই মারা যান।

কাবা গৃহ পুনর্নির্মাণের পর পবিত্র কৃষ্ণপ্রস্তর সংস্থাপনের মর্যাদা লাভের জন্য কুরাইশ গোত্রগুলোর মধ্যে ভীষণ বিবাদ চলতে থাকে। অবশেষে মোহাম্মদ (সা.)-কে সালিস মান্য করা হলে তিনি একটা চাদরের ওপর কৃষ্ণপ্রস্তর রেখে সব গোত্রের নেতাদের বিভিন্ন প্রান্ত ধরে তা যথাস্থানে বহন করার সুযোগ দেন এবং স্বহস্তে প্রাচীরগাত্রে তা স্থাপন করেন। এভাবে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে তিনি বিবাদ নিষ্পত্তি ও রক্তপাত বন্ধ

করেন। চার বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী ফিজার যুদ্ধের পর শান্তিরক্ষা, অত্যাচারীর শাসন নিবারণ ও নিপীড়িতের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মক্কায় হিলফুল-ফুজুল নামে যে সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা সংগঠনে তিনি নেতৃস্থানীয়দের একজন ছিলেন। মোহাম্মদ (সা.) বাল্যকাল থেকেই গভীর চিন্তাশীল ছিলেন। মূর্তিপূজা ও বর্বরোচিত মারামারি, মদ্যপান, জুয়াখেলা, অবিচার, ব্যভিচার প্রভৃতি অনাচার দেখে তাঁর মন তিক্ততায় ভরে যায়। তিনি বাড়ি ছেড়ে মক্কার দু-তিন মাইল দূরবর্তী পাহাড়ে চলে যান এবং গিরিগুহায় কয়েক দিন ধরে গভীর ধ্যান ও প্রার্থনায় মগ্ন হয়ে কাটান। এভাবে ধ্যান করতে করতে ৪০ বছর বয়সকালে তাঁর কাছে সত্য প্রকাশিত হয়। আল্লাহর দূত জিবরাইল তাঁকে লক্ষ্য করে বলে যান যে একমাত্র আল্লাহই সারা জাহানের স্রষ্টা, তিনিই একমাত্র উপাস্য, অন্য কেউ নয়; আর তিনি নিজ আদেশ-উপদেশ শিক্ষা দেওয়ার জন্য মোহাম্মদ (সা.)-কে রাসুল হিসেবে মনোনীত করেছেন। গৃহে ফিরে তিনি স্ত্রীকে এসব কথা জানালেন। বিবি খাদিজা (রা.) তাঁর কথায় বিশ্বাস করে প্রথম মুসলিম হন। এরপর আল্লাহর তরফ থেকে জিবরাইল (আ.) মারফত মাঝেমধ্যে পবিত্র কোরআন মজিদের অংশবিশেষ তাঁর কাছে আসতে থাকে। তিনি গোপনে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। রিসালতের প্রথম তিন বছরে প্রায় ৩০ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। আলী (রা.), উসমান (রা.) ও আবু উবাইদা তাঁদের অন্তর্গত। চতুর্থ বর্ষে তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন। বস্তুত, তখন থেকেই ইসলামের ধর্মমত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পাশাপাশি তাঁর ও তাঁর ধর্মানুসারীদের জীবন নানাভাবে বিপৎসংকুল হতে থাকে। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নবুয়তের পঞ্চম বর্ষে একদল মুসলিম আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। মোহাম্মদ (সা.) নানারূপ প্রলোভন ও অকথ্য নির্যাতন নীরবে সহ্য করে মক্কায় থেকে প্রচারকাজ চালাতে থাকেন। নবুয়তের ষষ্ঠ বর্ষে রাসুল (সা.)-এর চাচা হামজা ও মক্কার প্রতিপত্তিশালী নেতা ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলে মুসলমানদের মনে সাহসের সঞ্চার হয় এবং তাঁরা প্রকাশ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে থাকেন। ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মুশরিকদের শত্রুতাও বৃদ্ধি পায়। তাদের নির্মম অত্যাচার ও অসহযোগের ফলে মুসলমানরা তিন বছরকাল একটি গিরিসংকটে অবরুদ্ধ থেকে খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে নিদারুণ কষ্টে অতিবাহিত করেন। অসহযোগ নীতিতে কোনো ধরনের সুফল না হওয়ায় নবুয়তের দশম বর্ষে তা পরিত্যক্ত হয়। এ সময় আবু তালিব ও খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুতে মোহাম্মদ (সা.) বিমর্ষ হয়ে পড়েন এবং মক্কা ছেড়ে তাইফে ইসলাম প্রচার করতে যান। কিন্তু প্রস্তরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। নবুয়তের দ্বাদশ বর্ষে মিরাজ বা ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এদিকে মুশরিকদের অত্যাচার ক্রমেই বাড়তে থাকে। ফলে মুসলমানরা এ সময় ক্রমে ক্রমে পিছিয়ে যেতে থাকেন। এটা দেখে মুশরিকরা মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণবধ করতে দৃঢ়সংকল্প হন। শত্রুদলকে নিরাশ করে তিনি রাতের বেলা আবুবকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় চলে যান। মদিনায় বহু অধিবাসী আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মদিনাবাসী আনসাররা মক্কার মুহাজিরদের নিজ নিজ গৃহে স্থান দিয়ে তাঁদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হন। অল্পদিনের মধ্যেই ইহুদি ছাড়া প্রায় সমস্ত মদিনাবাসীই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁরা রাসুল (সা.)-কে নগরে একমাত্র বিচারক ও শাসনকর্তা হিসেবে মেনে নেন।

তিনি একটি মিত্রতার চুক্তিপত্র সম্পাদনের মাধ্যমে মদিনার অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করে মুসলিমদের সঙ্গে এক জাতি গঠনের ভিত্তি স্থাপন করেন। মুসলমানরা মক্কা ত্যাগ করলেও মক্কার কুরাইশরা তাদের শত্রুতা ছাড়েনি। মদিনার ইহুদিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তারা মদিনা আক্রমণের আয়োজন করতে থাকে। হিজরি দ্বিতীয় (৬২৪ খ্রি.) বর্ষে মক্কার এক হাজার কুরাইশ অস্ত্রসজ্জিত হয়ে মদিনা আক্রমণ করতে আসেন। মোহাম্মদ (সা.) মাত্র ৩১৩ জন সঙ্গী নিয়ে আক্রমণ

প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হন। বদর নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং কুরাইশরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ১৩ জন মুসলিম শহীদ হন এবং মুশরিকদের পক্ষে ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দী হয়। পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে হিজরি তৃতীয় বর্ষে (৬২৫ খ্রি.) আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৩ হাজার কুরাইশ মদিনা আক্রমণ করতে আসে। মদিনার নিকটবর্তী ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে সাত শত মুসলিমের সঙ্গে তাদের ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বহু মুসলিম শহীদ হন। মোহাম্মদ (সা.) স্বয়ং ভীষণভাবে আহত হন ও প্রস্তরাঘাতে তাঁর একটি দাঁত ভেঙে যায়। শত্রুপক্ষও ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। হিজরি চতুর্থ বর্ষে কুরাইশরা বিভিন্ন আরবগোত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে মদিনা অবরোধ করে। মদিনার ইহুদিরাও তাদের সাহায্য করে। মুসলমানরা মদিনার চারপাশে খন্দক বা পরিখা খনন করে আত্মরক্ষা করেন। প্রবল ঝড়বৃষ্টি ও শিলাপাতের ফলে শত্রুপক্ষ ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধকে আহজাবের (দলগুলো) বা খন্দকের (পরিখা) যুদ্ধ বলা হয়। হিজরি ষষ্ঠ বর্ষে রাসুল (সা.) পবিত্র কাবা গৃহের ওমরা ব্রত পালন করার জন্য ১ হাজার পাঁচ শ সাহাবিসহ মক্কার উদ্দেশে রওনা হন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে মক্কাবাসী তাঁদের বাধা দিয়ে সন্ধি দাবি করে। নিরাপত্তা স্থাপনের ফলে আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায় অবাধে মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পেয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। মদিনার ইহুদিরা নানাভাবে শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নির্বাসিত হলে খায়বার নামক স্থানে গিয়ে অন্য ক্ষমতাবান ইহুদিদের সঙ্গে মিলে মুসলিমদের ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। মোহাম্মদ (সা.) হিজরি সপ্তম বর্ষে খাওয়ার অভিযানে গিয়ে আটটি অজেয় দুর্গ দখল করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

মক্কার মুশরিকরা মুসলিমদের এক মিত্রগোত্রকে আক্রমণ করে বহু লোককে হত্যা করেন। সন্ধি ভঙ্গ হওয়ায় মোহাম্মদ (সা.) ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কাবিজয়ে অগ্রসর হলে শত্রুদলপতি আবু সুফিয়ান তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করেন। এইভাবে মক্কার সমস্ত নর-নারী দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। যখন সংবাদ এল পার্শ্ববর্তী তাইফ অঞ্চল থেকে মুশরিক সৈন্যরা মুসলমানদের আক্রমণ করতে আসছে, তখন মোহাম্মদ (সা.) ১৪ হাজার সৈন্যসহ হুনাইন নামক স্থানে এক ভীষণ যুদ্ধে শত্রুদলকে পরাস্ত করার পর তিনি মক্কার শাসনভার সেখানকার প্রতিনিধির ওপর ন্যস্ত করে মদিনায় ফিরে আসেন। নবম ও দশম হিজরিতে বিভিন্ন এলাকার বহু প্রতিনিধিদল মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে নিজ নিজ অঞ্চলের সমস্ত লোককে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দিতে থাকেন। দশম হিজরিতে মোহাম্মদ (সা.) শেষবার হজব্রত পালন করেন। আরাফাত পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে ভক্তবৃন্দকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে তিনি মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের পবিত্র কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সব মুসলিম এক ভ্রাতৃসমাজ; নর-নারীর পরস্পরের ওপর সমান অধিকার; দাস-দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার; ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা; পৌত্তলিকতা, নরহত্যা, অত্যাচার, ব্যভিচার, চুরি ও সুদ বর্জন; আল্লাহর কিতাব ও সুন্নত অনুসরণ ও শেষ বিচারের দিনে যাবতীয় কৃতকর্মের হিসাব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি উপদেশ দান করেন। বিদায় হজ সম্পাদন করে মোহাম্মদ (সা.) মদিনায় ফিরে আসেন। হিজরি একাদশ বর্ষে (৬৩২ খ্রি.) ৬৩ বছর বয়সে কয়েক দিন জ্বরভোগের পর ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন এক 'মহান-চরিত্র' এবং তাঁর অনুসারীদের জন্য এক 'উত্তম আদর্শ'।

**মৌলবাদী** একজন মৌলবাদী হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁর নীতিকে মৌলিক বিশ্বাসের সঙ্গে পুরোপুরি মিলিয়ে নিতে চান। মৌলবাদী মুসলমান এমন কেউ, যিনি ইসলামের নীতিগুলো পুরোপুরি পালন করতে চান। আরও স্পষ্টভাবে, একজন মৌলবাদী মুসলমান তিনি, যিনি নির্ভর করেন মূলের ওপর, পবিত্র কোরআনের ওপর। প্রতিটা হাদিসকেই অস্বীকার করা যায়, যদি তা পবিত্র কোরআনের পরিপন্থী হয়। খ্রিষ্টধর্মে মৌলবাদীর অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু

মুসলমানরা কোনো পুরাণ এবং অনৈতিক নিয়ম মানতে বাধ্য নন। তাই তাদের মৌলবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর মানে, এমন এক ইসলামের কাছে ফিরে যাওয়া, যা ছিল 'রাশেদিনের' সময়ে। অনেক মুসলমান তাই মনে করেন, আধুনিক বিশ্বের ইসলাম অনেকাংশে বিনষ্ট হয়েছে এবং তাঁদের ফিরে যেতে হবে সেই ইসলামে, যে সময়ে এটা পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। হিন্দু মৌলবাদীরাও হিন্দুত্বের আদি নীতিমালা মেনে চলতে বদ্ধপরিকর।

**ম্রো** একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। বান্দরবান জেলার বিভিন্ন এলাকায় এদের বিক্ষিপ্ত বসতি রয়েছে। ম্রোরা ম্রু ও মুরং নামেও পরিচিত। চাকমা ও মারমারা তাদের লেংটা, কুকি বা ল্যাংগাই বলে ডাকে। এসবের অর্থ হচ্ছে 'বন্য মানুষ বা আদিম মানুষ'। আবার সমতলের কিছু মানুষ তাদের মুরং হিসেবে অভিহিত করে। খাগড়াছড়ি জেলায় যেসব মুরং দেখা যায়, তারা আসলে 'ত্রিপুরা'দেরই একটি গোত্র। এই দুই গোত্রের লোকদের মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক সাদৃশ্য তাদের মধ্যকার সম্পর্ক প্রমাণ করে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে মুরংদের সমগোত্রীয়দের রিয়াং নামে অভিহিত করা হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে ম্রোদের অবজ্ঞাপূর্ণভাবে ম্রো-ড্যাং বা মায়কটং নামে ডাকা হয়, যার অর্থ নিম্নশ্রেণীর পশু। কিন্তু ম্রোরা নিজেদের 'ম্রো-চা' হিসেবে পরিচয় দেয়। 'ম্রো' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'মানুষ' আর 'চা' মানে 'সত্তা'। ম্রো সম্প্রদায়ের মানুষ যে ধর্ম পালন করে তা হলো 'ক্রামা'। এই ধর্মের যিনি প্রবর্তক, তিনি ম্রো ভাষার লিপিও তৈরি করেছিলেন।

ম্রোরা ধর্মপ্রাণবাদী এবং তাদের তিনজন দেবতা আছেন। বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা তুরাই, পাহাড়ের দেবতা সাংতুং এবং নদীর দেবী ওরেং। কোনো কিছু শুরুর আগে ম্রোরা তুরাইয়ের নামে শপথ নেয়। সাংতুংকে পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং জুমচাষে ভালো ফসল পাওয়ার আশায় তারা এই পাহাড়-দেবতার কাছে প্রার্থনা করে থাকে। গ্রামবাসীদের মঙ্গল কামনায় এবং মহামারি ও অশুভ শক্তিকে বিতাড়নের জন্য তারা দলগতভাবে ওরেং-এর পূজা করে। তারা পরজন্মে বিশ্বাসী নয়। আর তাই তাদের সকল কর্মকাণ্ড বর্তমানকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। ম্রোদের মতে, মৃত্যু হচ্ছে জীবনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি। ম্রোদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষণীয়। ম্রোদের একাংশ খ্রিষ্টধর্মমতে বিশ্বাসী। ম্যানলে নামে এক ম্রো প্রবর্তিত নতুন ধর্ম 'ক্রামা' চালুর পর বেশ কিছুসংখ্যক লোক এই ধর্মে দীক্ষিত হয়। তবে সব ধরনের শপথই নেওয়া হয় বন্দুক, দা এবং বাঘের নামে। তারা সূর্য ও চন্দ্রকে শ্রদ্ধা করে, তবে পূজা করে না।

**ম্যাক্সমুলার**, ফ্রিডরিশ (১৮২৩-১৯০০ খ্রি.) প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ। ১৮৪৩-এ লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। বার্লিনে ফ্রানৎস বোপ ও প্যারিসে বুর্জুক-এর কাছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, কিংবদন্তি, নীতিমূলক কাহিনি, হিতোপদেশ ও কালিদাসের *মেঘদূত* জার্মান ভাষায় রূপান্তর করেন। অক্সফোর্ড থেকে তাঁর ঋগ্‌বেদের ছয় খণ্ড সংকলন প্রকাশিত হয়। ঋগ্‌বেদ ছাড়া তিনি উপনিষদ, ধম্মপদ ইত্যাদি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংকলন ও ভাষান্তর করেছিলেন। *লেকচারস অন দ্য অরিজিন অ্যান্ড গ্রোথ অব রিলিজিয়ন অ্যাজ ইলাসট্রেটেড বাই দ্য রিলিজিয়স ইন ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া হোয়াট ক্যান টিচ আজ*-সহ ৫০ খণ্ডে *সেক্রেড বুক অব দ্য ইস্ট* গ্রন্থমালার সংকলন ও প্রকাশ তাঁর বিশাল কীর্তি। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন পথিকৃৎ পণ্ডিত।

**ম্যাজারিন বাইবেল** গুটেনবার্গ প্রথম এই গ্রন্থ লাতিন ভাষায় মুদ্রণ করেন। এর অক্ষরগুলো ওই সময়ের শ্রেষ্ঠ হস্তাক্ষর অনুসারে তৈরি। কার্ডিন্যাল ম্যাজারিন-এর লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থের এক কপি প্রথম আবিষ্কৃত হওয়ায় এর নামকরণ হয় 'ম্যাজারিন বাইবেল'।

## য

**যক্ষ** ১. হিন্দু পুরাণমতে, কুবেরের অনুচরবৃন্দ। ক্ষুধার্ত অবস্থায় ব্রহ্মা এদের সৃষ্টি করেন বলে এরা কৃষ্ণবর্ণ ও বিকৃতাকার। ২. কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্য *মেঘদূত*-এর নায়ক 'গুহ্যক' নামক যক্ষ। কুবেরের

কাজে অবহেলার অপরাধে তিনি এক বছরের জন্য রামগিরিতে নির্বাসিত হন।

**যজুর্বেদ** হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ চার বেদের একটি। যজুর্বেদ কৃষ্ণযজু এবং শুক্লযজু নামে দুই খণ্ডে বিভক্ত। যজ্ঞানুষ্ঠানের মন্ত্রগুলো এবং সেসব পালনের বিধি যজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত।

**যজ্ঞ** দেবতার অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অগ্নিকে আহুতি প্রদান অনুষ্ঠানই যজ্ঞ। এর মাধ্যমে সম্পদ বা সমৃদ্ধি লাভ, শত্রুক্ষয়, যুদ্ধজয়, রোগারোগ্য ও স্বর্গলাভের মতো বিষয়াদি কামনা করা হতো। বৈদিক যুগে এর উদ্ভব ঘটে এবং যজ্ঞই ছিল প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। যজ্ঞকর্মকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ্যসাহিত্য নামে এক বিশাল বৈদিক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। যজ্ঞকে মনে করা হয় সর্বপাপহর। যজ্ঞকর্মের সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক অপরিহার্য। অগ্নিকে বলা হয় দেবতাদের মুখ; তার মাধ্যমেই সব দেবতা আহুতি দ্রব্য লাভ করেন। কোনো দেবতাকে উদ্দেশ্য করে সমন্ত্রক অগ্নিকে আহুতি দিলে অগ্নি তা উদ্দিষ্ট দেবতার কাছে পৌঁছে দেয়।

যজ্ঞকর্ম সম্পাদনের জন্য চারজন ঋত্বিকের প্রয়োজন: হোতা, অধ্বর্যু, উদ্‌গাতা ও ব্রহ্মা। হোতা যজ্ঞদেবতাকে আহ্বানের জন্য ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্র আবৃত্তি করেন, অধ্বর্যু আহুতিদান-সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করেন, উদ্‌গাতা সামবেদীয় মন্ত্র গান করেন, আর ব্রহ্মা এই তিনজনের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। সহকারীরা থাকতে পারেন। ফলে পুরোহিতের সংখ্যা হয় মোট ১৬ জন।

যজ্ঞধর্মকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়: হোম, ইষ্টি, পশু, সোম ও সত্রযাগ। এ ছাড়া রাজ্যলাভ, আধিপত্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্মে সাফল্য লাভের জন্য রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ, নরমেধ প্রভৃতি যজ্ঞেরও ব্যবস্থা আছে। রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ রামায়ণ-মহাভারতের যুগেও বিশেষ পরিচিত ছিল। যজ্ঞে দুগ্ধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং শস্যচূর্ণ সহযোগে প্রস্তুত পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হয়। নরমেধ যজ্ঞে প্রকৃতপক্ষে নরবলি দেওয়া হয় না, পর্যগ্নিকরণের পর যূপকাষ্ঠে বদ্ধ মানুষটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানে নিযুক্ত ঋত্বিকদের স্বর্ণ, গো, বস্ত্র, অশ্ব ইত্যাদি দক্ষিণা প্রদানের রীতি আছে।

**যন্ত্র** ধ্যান করার সময় মনকে সংবৃত করতে যে জ্যামিতিক নকশায় ধ্যানী প্রথমে তার দৃষ্টি সর্বতোভাবে নিবদ্ধ করেন, তাকেই যন্ত্র বলা হয়।

**যন্ত্রবাদ** দর্শনের এই মতবাদ অনুসারে, এই বিশ্ব স্রষ্টার উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি নয় এবং এই বিশ্বের সকল মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ও পদার্থ নিজে থেকেই সৃষ্ট এবং স্বয়ংক্রিয়।

**যবন** অর্থ ঘৃণা। ভগবৎ পুরাণে যবনদের পাপাশয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর সমার্থক শব্দ অহিন্দু। কঠোর জাতিভেদ-প্রথা অনুসারী হিন্দুরা প্রথমে মগধ যুগে একাধিক বর্ণ বা জাতির সংকরশ্রেণীর লোকদের যবন নামে অভিহিত করত। পরবর্তীকালে হিন্দুরা বাহিরাগত আরবদের এবং ভারতীয় মুসলমানদেরও যবন বলত। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সমসাময়িককালে হিন্দু পৌরাণিক গ্রন্থে এই শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সেই সময়ে বহিরাগত গ্রিকদের এবং গ্রিস দেশকে যবন দেশ বলা হতো।

**যবিল আরহাম** যেসব আত্মীয়স্বজন মৃতের সম্পত্তির অংশের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরা নিকটাত্মীয়ের নির্দিষ্ট অংশগ্রহণের পর সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন। এহেন উত্তরাধিকারী চার ধরনের। যেমন—মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যাদের সন্তানসন্ততি, মৃত ব্যক্তির পিতামহ গয়রহ, মৃত ব্যক্তির ভাইবোনের সন্তানসন্ততি এবং মৃত ব্যক্তির পিতৃসম্পর্কীয় কেউ। যেমন—পিতৃব্য।

**যম** দক্ষিণের দিকপাল। সূর্যের ঔরসে এবং তাঁর স্ত্রী সংজ্ঞার গর্ভে তাঁর জন্ম। তিনি বৈবস্বত মনুর ভাই। স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা ছায়াকে স্বামীর কাছে রেখে পালিয়ে যান। কিন্তু ছায়া সংজ্ঞার সন্তানদের যথোচিত যত্ন করতেন না বলে যম ক্রুদ্ধ হয়ে বিমাতা ছায়াকে পদাঘাত করেন। বিমাতার শাপে তাঁর পদযুগল ক্ষত ও কীটদুষ্ট হয়। যম পিতা সূর্যকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালে সূর্য তাঁর ক্ষতস্থানের পুঁজ ও কীট ভক্ষণের জন্য যমকে একটি কুকুর দান করেন। কুকুরটি ক্ষতস্থান থেকে নির্গত পুঁজ ও কীট ভক্ষণ করাতে যম সুস্থ হলেও দুর্বল পায়ের জন্য

মহিষ বাহনে ভ্রমণ করতে বাধ্য হন। এক ঋষি যমকে মর্তে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দেন। যম মর্তে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। যম স্বর্গের দেবতা হলেও নরকের অধীশ্বর। যমের পুরীর নাম সংযমনী। তাঁর সম্মুখে বিরাজ করেন কালদণ্ড। তাই তিনি দণ্ডধর নামে খ্যাত। দেবতাদের মধ্যে যম সর্বাপেক্ষা পুণ্যবান বলে তাঁর নাম ধর্ম বা ধর্মরাজ। শান্তি বা নিবৃত্তি এনে দেন, তাই শমন; অন্ত আনেন বলে তিনি কৃতান্ত বা অন্তক; পিতৃপুরুষের ওপর তাঁর প্রাধান্য বলে তিনি পিতৃপতি। জীবের পাপ-পুণ্যের হিসাবরক্ষক চিত্রগুপ্ত তাঁর মন্ত্রী। যমের দেহের রং সবুজ, তিনি রক্তবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত। তাঁর দুজন অনুচর— মহাচন্দ ও কালপুরুষ। যমের দূতেরা যমদূত নামে খ্যাত। এঁরা মৃত মানুষের আত্মাকে নরকে নিয়ে যান, যেখানে যমের প্রধান সাহায্যকারী মন্ত্রক চিত্রগুপ্ত মানুষের পাপ-পুণ্যের বিবরণ পাঠ করেন এবং সেই বিবরণ অনুযায়ী যম মানুষের আত্মার শাস্তি বা শান্তি প্রদান করেন। যমের নাম প্রায় ৫০ বার ঋগ্‌বেদে উল্লেখ আছে। যম পুণ্যাত্মা মৃতদের ও নেতৃগণের প্রধান। তিনি প্রথম মৃত হন। যম দেবসহচর হলেও কোথাও তাঁকে দেবতা বলা হয়নি। যম রাজা।

ঋগ্‌বেদের অনেক স্থলে যমকে বরুণ ও অগ্নির সঙ্গে একত্রে বর্ণিত হতে দেখা যায়। কোনো কোনো জায়গায় অগ্নি ও যম অভিন্নভাবে উল্লেখিত হয়েছেন। অথর্ববেদে উল্লেখিত আছে, যমই মৃতদের আশ্রয় দেন ও ভবিষ্যৎ বাসের স্থান নির্দেশ করেন।

যমের আত্মাই প্রথম স্বর্গে গমন করে। যমের দূত পক্ষী উলুক বা কপোত এবং সারমেয়। সারমেয়দের চার চক্ষু, বর্ণ বিচিত্র, বৃহৎ নাসিকা। তারা যমের প্রহরী, পথরক্ষী, সকল ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করে থাকে। পণ্ডিতদের মতানুসারে এই দুই কুকুর চন্দ্র ও সূর্যের রূপক মাত্র। যম পুণ্যবান লোকদের দেখলে নারায়ণরূপে দেখা দেন। আর পাপীদের কাছে তিনি ভীষণ রূপ ধারণ করেন।

**যশোদা** হিন্দু পুরাণমতে, কৃষ্ণের পালয়িত্রী মা। বসুদেবের স্ত্রী দেবকী ভাই কংসের কারাগারে সাতটি সন্তান প্রসব করলে কংস তাদের সবাইকেই হত্যা করেন। দেবকীর অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণের প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর পিতা তাঁকে যমুনার অপর তীরে নিয়ে নন্দের স্ত্রী যশোদার কাছে রাখেন এবং যশোদার সদ্যোজাত কন্যা যোগমায়াকে নিয়ে কারাগারে দেবকীর কাছে রাখেন। কৃষ্ণ পালিতা মা যশোদার কাছেই লালিত-পালিত হন।

**যাজ্ঞবল্ক্য** বৈদিক ঋষি, ব্যাসের শিষ্য। *যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা* তাঁর রচিত স্মৃতিগ্রন্থ। তাঁকে যোগশাস্ত্রের স্রষ্টা বলা হয়। তাঁর শিক্ষা ছিল বানপ্রস্থ অবলম্বন ও যোগাভ্যাস। তিনি ১৫ জন শিষ্যকে বেদ শিক্ষা দেন বলে বেদ পঞ্চদশ শাখায় বিভক্ত।

**যাজ্ঞসেনী** দ্রৌপদীর অপর নাম। [দ্রৌপদী দ্র.]

**যিশু** খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক। খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের কাছে তিনি প্রভু ও মুক্তিদাতা হিসেবে স্বীকৃত। যিশুর জীবনের ঘটনাবলি বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেন্ট' বা নববিধান অংশে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর জন্ম বেথলেহেমে। তিনি জাতিতে ইহুদি ছিলেন। হিব্রু ভাষায় তাঁর নাম যিহোশুয়া অর্থাৎ ত্রাণকর্তা। যিহোশুয়া শব্দ থেকে গ্রিক ভাষায় জেসাস (Jesus) নামটি গ্রহণ করা হয়। ক্রাইস্ট (Christ) শব্দটি হিব্রু মোসাইয়া (তেল মেখে পবিত্র করা হয়েছে যাঁকে) শব্দ থেকে গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করা শব্দ।

ঈশ্বর-প্রেরিত একজন মুক্তিদাতার আবির্ভাব বহুকাল ধরে প্রত্যাশা করছিলেন ইহুদিরা। বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' বা পুরাতন বিধানে এই মহামানবের আবির্ভাবের কথা লেখা আছে। যাঁরা যিশুকে বিশ্বের ত্রাণকর্তা হিসেবে স্বীকার করেন তাঁরাই অভিহিত খ্রিষ্টান নামে। খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস যিশু ঈশ্বরপুত্র।

কুমারী মেরি যিশুর মা। যোসেফ তাঁর পালক-পিতা। খ্রিষ্টপূর্ব ৮ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৪ অব্দের মধ্যে তাঁর জন্ম হয়। খ্রিষ্ট-বর্ষ বা খ্রিষ্টাব্দ গণনা শুরু হয় তাঁর জন্মের অনেক পরে। যোসেফ গ্রাম্য সূত্রধর বা কাঠমিস্ত্রি ছিলেন। যিশুও কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন। বৈষয়িক কাজ ফেলে রেখে যিশু নির্জনে বসে থেকে ঈশ্বর উপাসনায় মগ্ন হন। পরবর্তী তিন বছর ধরে তিনি ধর্মপ্রচারে বের হন।

২৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিক থেকে ৩০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত গালিলেয়া ও যুদেয়ার কোনো কোনো জায়গায় এবং জেরুজালেমে ইহুদিদের কাছে ঘোষণা করেন যে স্বর্গীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা আসন্ন। সেই রাজ্যে প্রবেশ করে নবজীবন লাভ করতে তিনি শুধু ইহুদিদের নয়, সব মানুষকেই আহ্বান জানান। মুষ্টিমেয় শিষ্য নিয়ে তিনি স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে জনগণকে শিক্ষাদান করতে থাকেন। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে বিপুলসংখ্যক লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় তাঁর উপদেশমূলক সংক্ষিপ্ত গল্প শোনার জন্য অজস্র মানুষ দলে দলে তাঁর অনুসারী হতে থাকে।

যিশুর বাণী হলো—ভগবানই সকল মানুষের পিতা, পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল। ভগবানের সেবা করতে হলে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করা বিশ্বাসী ভক্তের কর্তব্য। এ জন্য অহংকার, হিংসা, ভোগের স্পৃহা দমন করে শিশুর মতো সারল্য ও পবিত্রতা অবলম্বন করে পরম পিতার ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। মানুষকে সব ধরনের লৌকিক মনোভাব ও স্বার্থপর সংকীর্ণতা ত্যাগ করে পরম আত্মার (হোলি স্পিরিট) প্রেরণায় চলতে হবে। তাঁর এই বাণী শুনে অনেক ইহুদি তাঁকে খ্রিষ্ট বলে গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু তখনকার ইহুদিসমাজের প্রতিপত্তিশালী ধর্মযাজক ও অতি রক্ষণশীল নেতৃবর্গ যিশুর বাণী গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ষড়যন্ত্রকারীরা যিশুর শিষ্য জুডাসকে ৩০টি রৌপ্যমুদ্রা উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করে। যিশু তাঁর শিষ্যসহ 'শেষ ভোজন' সমাপ্ত করে উপাসনার জন্য নগরের বাইরে গেথসেমানির উদ্যানে গমন করেন। সেখান থেকে তাঁকে ধরে রোমান শাসনকর্তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ইহুদি জনসাধারণও যিশুর ধর্ম বুঝতে না পেরে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে। ফলে শত্রুকে ক্ষমা করে এবং বিশ্ব-মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য তিনি প্রাণ উৎসর্গ করেন। জেরুজালেমের প্রান্তে কালভারি নামক স্থানে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে অশেষ যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার ভেতর দিয়ে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সেদিন ছিল শুক্রবার ৭ এপ্রিল ৩০ খ্রিষ্টাব্দ। পার্শ্ববর্তী এক উদ্যানে তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয়। পরবর্তী রোববার উষার আলোয় মৃত্যুকে জয় করে তিনি পুরুত্থান করেন বলে কথিত আছে। এর ৪০ দিন পর তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করেন বলে খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে থাকে।

**যিশুপট** এক প্রকার লোকচিত্রকলা। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার কয়েকটি গ্রামের পটুয়ারা যিশুখ্রিষ্টের জীবনের নানা দিক অবলম্বনে এই পটচিত্র অঙ্কন করে থাকেন। যিশুপট পটচিত্রের মূল ধারার সঙ্গে একীভূত হয়নি। মূলত ব্যক্তিগত চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই এই পটচিত্র অঙ্কিত হয়। গোয়ালঘরে জাবের মধ্যে যিশুর জন্ম, শিষ্যদের প্রতি যিশুর ধর্মোপদেশ, ঈশ্বরের সঙ্গে যিশুর আত্মিক যোগাযোগ, ক্রুশবিদ্ধ যিশু ইত্যাদি যিশুপটের বিষয়বস্তু।

**যুধিষ্ঠির** পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। ধর্মের ঔরসে কুন্তীমায়ের গর্ভে জন্ম বলে তাঁর অপর নাম ধর্মপুত্র। মহাভারত মতে, হস্তিনাপুরের রাজা। রথযুদ্ধে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। যুধিষ্ঠির ধর্মপ্রাণ, সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। দুর্যোধনের সঙ্গে কপট পাশাখেলায় তিনি রাজ্য হারিয়ে ভাইদের সঙ্গে বনবাসে যান। বনবাস থেকে ফিরে এসে দুর্যোধনের কাছে রাজত্বের দাবি করলে দুর্যোধন অসম্মত হন। ফলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনা হয়।

**যেসুইট সম্প্রদায়** যিশুর সংঘ। রোমান ক্যাথলিক চার্চের অন্তর্ভুক্ত একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। ১৫৩৪-৩৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে লাইওলার সেন্ট ইগনেসিয়াস ও তাঁর ছয়জন সহচর মিলে এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা মিশনারি, শিক্ষাব্রতী ও বিজ্ঞানী হিসেবে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। এঁরা বিভিন্ন দেশে মিশনারি কাজে ব্রতী হয়েছেন। সম্প্রদায়টির প্রথম যুগের অন্যতম মিশনারি সেন্ট জেভিয়ার দূরপ্রাচ্যেও যান। যুক্তরাষ্ট্রে জেসুইটদের পরিচালিত অনেক উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। এসবের মধ্যে জর্জটাউন, ফোর্ডহ্যাম ও সেন্ট লুই বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

**যোগ** হিন্দুধর্মে কঠোর মানসিক শৃঙ্খলা ও সাধনার মাধ্যমে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির প্রাচীন দার্শনিক নিয়ম। সমস্ত ভৌতিক অনুভূতি নিঃশেষ করে মনকে আত্মস্থ করা যোগাভ্যাসের মূল কথা। বিশ্বাস করা হয় যে, যোগের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছালে যোগী অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন যদিও এই শক্তির প্রয়োগ কাম্য নয়। সংসারধর্মী লোকজনের জন্য এর প্রাথমিক পদ্ধতি 'ক্রিয়াযোগ' নামে পরিচিত। যোগের প্রত্যক্ষ পদ্ধতিকে অভিহিত করা হয় 'রাজযোগ' নামে। ঈশ্বরের প্রতি একাগ্রতার জন্য 'ভক্তিযোগ' করা হয়। এই দর্শনের প্রবর্তক পতঞ্জলি (খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক)। এ জন্য এর অপর নাম 'পাতঞ্জল দর্শন'। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের চারটি পাদ। প্রথম পাদে যোগের লক্ষণ ও সমাধি, দ্বিতীয় পাদে সমাধি লাভের আগে অনুসরণীয় ব্যবহারিক যোগ এবং যম, নিয়ম, আসন ইত্যাদি যোগাঙ্গের কথা। তৃতীয় পাদে ধারণা, ধ্যান, সমাধি ও এসবের ফল এবং বিভূতি বা ঐশ্বর্য। চতুর্থ পাদে পাঁচ ধরনের সিদ্ধি ও প্রয়োজনীয় কৈবল্যের আলোচনা করা হয়েছে।

যোগমতে পরমেশ্বর ক্লেশ, কর্ম, কর্মফল, সংস্কার ইত্যাদি থেকে মুক্ত পুরুষবিশেষ। তিনি লীলাবশে বহু দেহ ধারণ করে লৌকিক ও বৈদিক সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন এবং দুঃখদগ্ধ সংসারী জীবকুলের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে থাকেন। যোগের আটটি অঙ্গ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। অহিংসা, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদিকে বলা হয় যম। শৌচ, সন্তোষ ইত্যাদিকে বলা হয় নিয়ম। দেহকে স্থির ও সুখকর রাখার উপায় হলো আসন।

**যোগবাশিষ্ট** রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। বশিষ্ঠ মুনি রামকে বেদান্ততত্ত্ব ও আত্মার শান্তি বিষয়ে যে যোগোপদেশ দান করেন, তা-ই যোগবাশিষ্ট। এই গ্রন্থের অপর নাম বশিষ্ঠ-রামায়ণ। কারও কারও মতে, এটি বাল্মীকি রামায়ণেরই উত্তর ভাগ। এর ভাষ্যকারদের কয়েকজন হলেন—অন্বয়ারণ্য, গঙ্গাবরেণ্য সরস্বতী, মাধব সরস্বতী।

**যোগমায়া** হিন্দু পুরাণে যশোদার কন্যা। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর সঙ্গে বদল করা হলে কংস তাঁকেই দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান মনে করে বধ করার জন্য শিলায় নিক্ষেপ করেন। নারায়ণের পত্নী লক্ষ্মীও যোগমায়া বলে পরিচিত।

**যোগিনী** হিন্দু পুরাণে দুর্গার সহচরী। যোগিনীর সংখ্যা ৬৪। দুর্গাপূজার সময় এই ৬৪ যোগিনীর পূজা করতে হয়। এরা বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন চক্রে অবস্থান করে।

**যোগীর ভবন** বগুড়ার মহাস্থানগড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে এটি অবস্থিত। গ্রামটি শৈব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত নাথ গোষ্ঠীর বসতিস্থল হিসেবে সুপরিচিত। সমগ্র বসতিস্থল বা ভবনগুলোর এলাকা প্রাচীরবেষ্টিত এবং একটি বিভাজক দেয়াল দিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত। পশ্চিম ভাগে রয়েছে ধর্মডুঙ্গি ও গদিঘর নামক দুটি মন্দির। এ ছাড়া পূর্ব ভাগে রয়েছে সর্বমঙ্গলা, দুর্গা, কালভৈরবী এবং গোরক্ষনাথের চারটি মন্দির। মন্দিরগুলো সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের দেব-দেবীর প্রতিমাগুলো হারিয়ে গেছে। সর্বমঙ্গলা মন্দিরটি নকশাকৃত ইট ও পোড়ামাটির ফলক দ্বারা ব্যাপকভাবে অলংকৃত।

**যোনি** শক্তির প্রতীকরূপে পূজিত যোনিচিহ্ন বা যোনিমূর্তি। শক্তি-উপাসকেরা স্ত্রীযোনি ও পুরুষলিঙ্গের একত্রে পূজা করে।

**যৌতুক** 'যু' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'যুত' শব্দের অর্থ 'যুক্ত'; পাত্র-পাত্রীর যুক্ত হওয়ার সময়ে অর্থাৎ বিয়ের সময় পাত্রীর উদ্দেশে যা দেওয়া হয়, তা-ই যৌতুক। এটি স্ত্রীধন অর্থাৎ স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয়।

## র

**রক্তবীজ** হিন্দু পুরাণে রয়েছে দানবরাজ রম্ভের মৃত্যু হলে যক্ষরা মরদেহ চিতায় স্থাপন করে। তাঁর স্ত্রীও সহমরণের জন্য চিতারোহণ করেন। চিতায় অগ্নিসংযোগ করলে স্ত্রীর কুক্ষি ভেদ করে মহিষাসুর নির্গত হয়। তখন রম্ভ সেই পুত্রের প্রতি স্নেহবশত চিতা থেকে উত্থিত হন। এই রূপান্তরিত রম্ভই রক্তবীজ। তিনি দৈত্যরাজ শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি ছিলেন। দেবীর সঙ্গে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধকালে রক্তবীজ ও দেবীর সহচরীদের ঘোর যুদ্ধ

হয়। যুদ্ধে রক্তের শর-বিদ্ধ দেহ থেকে যত বিন্দু রক্ত ভূমিতে পড়ত, তা থেকে রক্তবীজের মতো ভয়ংকর বলবীর্যবান তত মহাশূর তৎক্ষণাৎ উদ্ভূত হতো। বজ্র দিয়ে একে নিপাত করতে গেলে শত শত রক্তবীজের আবির্ভাব হয়েছিল। দেবতাদের বিপদ দেখে দেবী মহাশক্তি নিজের অঙ্গনির্মাতা ও অঙ্গীভূতা কালীকে বললেন, 'সমস্ত রক্তবীজস্বরূপ দৈত্যকে ভক্ষণ করো এবং সমস্ত শোণিত পান করো। তাহলে রক্তবীজ নিঃশোধিত হয়ে আমার হাতে নিহত হবে।' তিনি চামুণ্ডা ও কালীর সাহায্যে রক্তবীজের নিপাত করেন।

**রক্ষিতা** কোনো কোনো মুসলমান মনে করেন, দাস ও রক্ষিতা বা খাদেমা রাখা জায়েজ। আসলে দাস এবং রক্ষিতা রাখা—দুটোই ইসলামের মূল আদর্শের পরিপন্থী।

**রথযাত্রা ও উল্টোরথ** আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় দিন জগন্নাথদেবের রথে চড়ে যে উৎসব হয়, তার নাম রথযাত্রা। জগন্নাথদেব তাঁর ভাই বলরাম এবং ভাগনি সুভদ্রা ওই দিন রথে চড়ে বের হন। বলরাম ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সখা ও সুভদ্রা অর্জুনের দ্বিতীয় স্ত্রী। উড়িষ্যার পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির থেকে গুণ্ডিচাবাড়ী যাত্রা ও সেখান থেকে ফিরে আসাকে কেন্দ্র করে সেখানে সাড়ম্বরে রথযাত্রার উৎসব ও মেলা হয়। পুরীর রথযাত্রাকে কেন্দ্রীয় উৎসব ধরে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায় এই ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে। গুণ্ডিচাবাড়ী থেকে সাত দিন পর উল্টোরথে পুনরায় জগন্নাথদেব যাত্রা করেন ও মন্দিরে ফিরে আসেন। রাজধানী ঢাকার অদূরে ধামরাইয়ের রথযাত্রা উৎসব ও মেলা খুবই বিখ্যাত।

**রনগো** পলিনেশীয় কৃষি দেবতা। কোনো কোনো দ্বীপাঞ্চলে রনগোকে বক্তৃতা ও অলংকারশাস্ত্রের দেবতা হিসেবে সম্মান করা হয়। কোথাও কোথাও আবার তাঁকে যুদ্ধের দেবতা বলেও মান্য করা হয়। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে মনে শান্তির দেবতা হিসেবেও করা হয়। এই দেবতার অন্য অনেক নামও আছে। যেমন লুনু রউউ এবং ওনো।

**রমজান, রামাদান** হিজরি বর্ষপঞ্জির নবম মাস। ইসলামপূর্ব যুগেও এটি পবিত্র মাস হিসেবে গণ্য হতো এবং এটি ছিল যুদ্ধবিরতি মাসগুলোর অনত্যম। পবিত্র কোরআনে কেবল রমজান মাসের উল্লেখ করা হয়েছে। রমজান মাসের লাইলাতুল কদরে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়। রমজান মাসে সিয়াম বা রোজা পালন মুসলমানদের জন্য ফরজ বা অবশ্যকর্তব্য। আল-বিরুনি ও আরও অনেকে বলেন, রমজান মাসের ৬ তারিখ আলীর পুত্র হুসেনের জন্মদিন, ১০ তারিখ খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুদিবস, ১৭ তারিখে বদরের যুদ্ধ, ১৯ তারিখ মক্কা বিজয়, ২১ তারিখ আলী ও শিয়া সম্প্রদায়ের ইমাম আলী আল-রিদার মৃত্যুদিবস, ২২ তারিখ আলী (রা.)-এর জন্মদিন এবং ২৭ তারিখের রাত্রি লাইলাতুল কদর। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, ২৩ তারিখ লাইলাতুল কদর। অনেকের মতে, রমজান মাসের শেষ ১০ দিনের মধ্যে ২১, ২৩, ২৫, ২৭ বা ২৯-এর মধ্যে কোনো বেজোড় রাত্রির মধ্যে এক রাত্রি হচ্ছে লাইলাতুল কদর।

**রাসুল** প্রেরিত বার্তাবাহক, দূত, ভবিষ্যদ্বক্তা। ইসলামি বিধানমতে, আল্লাহর মনোনীত বাণীবাহক, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। মানুষ যখন এক আল্লাহকে ভুলে বিপথগামী হয়েছে, তখন সেই বিপথগামী মানুষকে সত্যপথে ফিরিয়ে আনার জন্য যুগে যুগে তাঁর মনোনীত বাণীবাহক পাঠিয়েছেন, তাঁরাই নবী বা রাসুল। নবী ও রাসুলের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। আল্লাহর সব বাণীবাহকই নবী অর্থাৎ পয়গম্বর; কিন্তু সকলেই রাসুল নন। যাঁদেরকে সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় সংবিধানসহ মানুষকে হেদায়েতের নির্দেশ দেওয়া হয়, কেবল তাঁরাই রাসুল, অন্যরা নবী। পবিত্র কোরআন শরিফের বর্ণনা অনুযায়ী নবী ও রাসুলের সংখ্যা ১ লাখ বা ২ লাখ ২৪ হাজার। হজরত আদম (আ.) প্রথম নবী এবং হজরত মোহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ নবী ও রাসুল। ধর্মীয় সংবিধানপ্রাপ্ত রাসুলের সংখ্যা ৩১৫ জন বলে জানা যায়।

**রা** মিসরের পুরাকাহিনিতে বর্ণিত হেলিওপোলিসের সূর্যদেবতা। তিনি মৃতের প্রভু। তিনি তাঁর সূর্যতরণি দিনের বেলায় আকাশে এবং রাতে পাতালে

চালান। সাধারণত বাজের মাথা এবং সূর্যের প্রভার পরিমণ্ডলে রা-এর মাথা চিত্রিত করা হয়।

**রাক্ষস** রামায়ণে বলা হয়েছে, প্রজাপতি ব্রহ্মা জল সৃষ্টি করেন। তারপর প্রাণীকুলকে সৃষ্টি করে বললেন, 'তোমরা সযত্নে এই জল রক্ষা করো।' একদল বলল, 'রক্ষামঃ' অর্থাৎ আমরা রক্ষা করব। ব্রহ্মার আদেশে তারা রাক্ষস হলো। আর একদল বলল, 'যক্ষামঃ' অর্থাৎ আমরা পূজা করব। তারা যক্ষ হলো।

বিষ্ণুপুরাণ মতে, কশ্যপ ও দক্ষের **কন্যা খসা** থেকে রাক্ষসদের জন্ম। রামায়ণ ও মহাভারতের মতে, আর্যদের আগমনের আগে যে জাতি এ দেশে বাস করত, তারা অনার্য এবং তাদের রাক্ষস বলা হতো। আর্যরা যুদ্ধ করে এই অনার্য রাক্ষসদের পরাজিত করে। রাক্ষসদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীকে অনেকটা যক্ষদের মতো বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণী অত্যন্ত শক্তিশালী, এরা দেবতাদের শত্রু; তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হচ্ছে দানব ইত্যাদি। এরা নিষিদ্ধ জায়গায় ভ্রমণ করে, যজ্ঞ ইত্যাদি নষ্ট করে, শ্মশানে-শ্মশানে ঘুরে বেড়ায়, সাধু ব্যক্তির ওপর অত্যাচার করে, মানুষ ভক্ষণ করে এবং সমস্ত মানুষকে নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ফেলতে চেষ্টা করে। এই শ্রেণীভুক্ত রাক্ষসদের শ্রেষ্ঠ হচ্ছে রাবণ।

শিব ও পার্বতী একবার রাক্ষসদের বর দিয়েছিলেন যে, রাক্ষসীরা গর্ভ ধারণমাত্রই সন্তান প্রসব করবে এবং সেই সন্তান মাতার সমকক্ষ হবে। মহাভারতে ভীম কর্তৃক বক, কির্মীর ও হিড়িম্ব রাক্ষসদের বিনাশ এবং হিড়িম্বাকে বিয়ে করার ঘটনা রয়েছে। ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়।

**রাখাইন** আরাকান রাখাইনদের আদি বাসভূমি। নৃতাত্ত্বিক বিচারে এরা মঙ্গোলীয় মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত ভোট-বর্মি জনগোষ্ঠীর ছোট শাখা। কারও কারও মতে, রাখাইনরা মারমাদের সমগোত্রীয়। বাঙালিদের কাছে এরা 'মগ' নামে পরিচিত।

ধর্মে বৌদ্ধ হলেও রাখাইনরা উপজাতীয় সংস্কার, জাদু ও অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস করে। এরা বুদ্ধের জন্মবার্ষিকী এবং বৈশাখী, মাঘী, প্রবারণা পূর্ণিমাসহ বসন্ত উৎসব পালন করে। চৈত্রসংক্রান্তিতে তিন দিনব্যাপী 'সান্দ্রে' উৎসব এদের সবচেয়ে বড় সামাজিক অনুষ্ঠান।

**রাখিবন্ধন** শ্রাবণী-পূর্ণিমায় বিপদ থেকে রক্ষা কামনায় প্রিয়জনের মণিবন্ধে প্রীতিবন্ধনের স্মারক-সূত্র বা রাখি (রঙিন সুতো) বেঁধে দেওয়া হয়। রাখি বাঁধার মন্ত্রে বলা হয়, 'যা দ্বারা মহাবলশালী দানবরাজ বলিকে বন্ধ করা হয়েছিল তা দিয়ে আমি তোমাকে বন্ধন করছি।' রাখিবন্ধন ছিল মূলত উত্তর ভারতের উৎসব। বঙ্গদেশে এর তেমন প্রচলন ছিল না। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আইনের দ্বারা বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হলে এর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ওই বছরের অক্টোবরে অর্থাৎ ১৩১২ বঙ্গাব্দের ৩০ আশ্বিন (শুক্লা-অষ্টমী) রাখিবন্ধন উৎসবের প্রবর্তন করা হয়। আইন বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেছে, ঈশ্বর নয়—এই সত্য স্মরণ ও প্রচারের জন্য সেদিন বাঙালিরা পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বেঁধে দেয়। এর মূলমন্ত্র ছিল 'ভাই ভাই এক ঠাঁই'। রাখিবন্ধনের রঙিন সুতো প্রতীক মাত্র, কিন্তু সভ্য ও চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে তা পবিত্র আবেগ ও দায়িত্বের বন্ধন।

**রাজবংশী** ভোট-বর্মিদের একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। তাদেরকে ক্ষত্রিয় নামক এক কোচ শাখার সঙ্গেও অভিন্ন বলে ভাবা হয়। দূরাতীতকালে এরা হিমালয় অঞ্চল বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমায় প্রবেশ করেছিল। এরা বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী। বর্তমানে এদের কেউ কেউ মুসলমান, কেউ বা খ্রিষ্টান। বাংলাদেশে এদের বসবাস প্রধানত রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী এবং অতি অল্পসংখ্যায় বগুড়া ও ময়মনসিংহ জেলায়।

**রাজসূয়** রাজার রাজ্যাভিষেকের সময়। এর প্রধান অর্থ হচ্ছে, যিনি এই যজ্ঞ করবেন, তিনি সার্বভৌম রাজা হবেন। অন্য রাজরাজড়ারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করবেন। কেবল রাজারা এই যজ্ঞ করে সম্রাট উপাধি লাভ করতেন।

**রাজা রামমোহন রায়** পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে জন্ম। সমাজসংস্কারক, ধর্মসংস্কারক এবং বহুভাষাবিদ। রংপুরের ডেপুটি কালেক্টর ডিগবির আমন্ত্রণে রাজস্ব বিভাগে উচ্চপদে

চাকরি গ্রহণ করেন। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) মুর্শিদাবাদে থাকাকালীন একেশ্বরবাদ সম্পর্কে প্রথম আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত তাঁর *তুহফাৎউল মুয়াহহিদ্দিন* প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল ১৮০৩। একেশ্বরবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে 'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮১৫ সালে। একেশ্বরবাদের ওপর ভিত্তি করে তিনি 'ব্রাহ্মধর্ম' প্রচার শুরু করেন। ১৮২১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'ইউনিটারিয়ান কমিটি' নামে আরেকটি ধর্মসভা। ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে মিলে ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপন এবং ১৮২৩ সালে নিজ ব্যয়ে 'অ্যাংলো হিন্দু স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখের সহায়তায় ১৮২৮ সালে তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় লর্ড বেন্টিংক ১৮২৯ সালে 'সতীদাহ'-প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর উদ্যোগে বাল্যবিবাহ, কন্যাদান এবং গঙ্গায় সন্তান বিসর্জনের মতো কুপ্রথা নিষিদ্ধ হয়। ১৮১৮ সালে প্রেস রেগুলেশনের প্রতিবাদ করে তিনি সুপ্রিম কোর্টে এক দরখাস্ত পেশ করেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা *ব্রাহ্মণসেবধি*, *সম্বাদকৌমুদী* ও *মিরাৎ উল আখবার*।

**রাতিব** এই আরবি শব্দের অর্থ কর্ম, দেয় বা প্রাপ্য। এই শব্দটি পবিত্র কোরআনে নেই। ইন্দোনেশিয়ায় এর ব্যবহার রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে যে অতিরিক্ত ইবাদত বা জিকর করা হয়, তাকে রাতিব বলা হয়।

**রাধা** হিন্দু শাস্ত্রমতে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতাররূপে দ্বাপরযুগে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন; আর বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করেন বৃষভানুর কন্যারূপে রাধা নামে। বয়ঃক্রমকালে আয়ান ঘোষের সঙ্গে রাধার বিয়ে হয়, কিন্তু তাঁর জীবন কাটে কৃষ্ণপ্রেম, আর কৃষ্ণবিরহে। রাধাকৃষ্ণের এই প্রণয়-কাহিনিতে নিহিত রয়েছে এক উচ্চমার্গীয় দার্শনিক তত্ত্ব। কৃষ্ণ মূলত স্বয়ং বিষ্ণু বা ঈশ্বর, আর রাধা তাঁর জীবনসঙ্গিনী লক্ষ্মী। তাঁরা ভিন্ন পরিচয়ে জন্মগ্রহণ করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। ভারতীয় দর্শনমতে, বিষ্ণু হচ্ছেন পরমাত্মা, আর সব জীবাত্মা। জীবাত্মার সর্বদা আকাঙ্ক্ষা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়া। পরমাত্মা বিষ্ণুই হচ্ছেন একমাত্র পুরুষ, আর সব প্রকৃতি অর্থাৎ নারী। রাধা এখানে সকল জীবাত্মার প্রতীক এবং কৃষ্ণ বিষ্ণু বা পরমাত্মার প্রতীক। তাই কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রণয়াসক্তি পরামাত্মা-জীবাত্মার শাশ্বত মিলনাসক্তির নামান্তর, অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার আত্মসমর্পণ।

রাধা জন্মসূত্রে একজন সাধারণ গোপনারী হলেও কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব রচিত *গীতগোবিন্দ* এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে বড়ু চণ্ডীদাস রচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ রাধাকৃষ্ণের এই প্রণয়লীলা বর্ণিত হয়েছে। বর্তমানে *পদাবলিকীর্তন* নামে রাধাকৃষ্ণের তত্ত্বমূলক পালাগান গ্রামাঞ্চলে গীত হয়। রাধাকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবন হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র। কৃষ্ণের সাহচর্যগুণে রাধা গোপী থেকে দেবীর পর্যায়ে উন্নীত হন। কৃষ্ণের পাশাপাশি তিনিও এখন সমান গুরুত্বের সঙ্গে ভক্তদের পূজা পেয়ে থাকেন। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি হিন্দুদের, বিশেষত বৈষ্ণবদের পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিষয়। রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপের অন্তরালে ভক্তজন এক ঈশ্বরকেই কল্পনা করেন।

**রানজি** নিউজিল্যান্ডের পুরাণের আকাশ দেবতা। তিনি ধরিত্রী মাতার স্বামী।

**রানি রাসমণি** (১৭৯৩-১৮৬১) সমাজসেবিকা ও একজন ধর্মানুরাগী মহিলা। তিনি এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ধন্যাঢ্য ব্যবসায়ী রাজচন্দ্র মাড়ের তাঁকে বিয়ে করেন। ৪৩ বছর বয়সে বিধবা হয়েও রাসমণি তাঁর পরিবারের সম্পদ উল্লেখযোগ্য সামাজিক কর্মকাণ্ড ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দির নির্মাণ তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান। রাসমণি নিম্নবর্ণজাত হওয়ায় ব্রাহ্মণরা দক্ষিণেশ্বর মন্দির নির্মাণে বাধা দিয়েছিলেন।

**রামকোট বনাশ্রম** একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহার। কক্সবাজার জেলার রামু থানার অন্তর্গত রাজারকুলে এটি অবস্থিত। এই বিহারকে কেন্দ্র করে একসময় এ অঞ্চলে বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। ১৯৩০ সালে জগৎচন্দ্র মহাথের নামের একজন ব্রহ্মদেশীয় ভিক্ষু শ্রীলঙ্কায় অবস্থানকালে

একটি শিলালিপি উদ্ধার করেন। সেই শিলালিপির তথ্যানুযায়ী অনুসন্ধান ও খননকার্যের ফলে এ বিহার আবিষ্কৃত হয়। সেই সঙ্গে আবিষ্কৃত হয় বৃহদাকার অভয়মুদ্রায় খচিত বুদ্ধমূর্তি। বর্তমানে মূর্তিটি বনাশ্রম বিহারে রক্ষিত আছে।

চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলের রাজা চেন্দির (চেঁদি) পুত্র কেয়কচু (কেয়ঁজউল) ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করে চন্দ্রজ্যোতি নাম ধারণ করেন। তিনি ত্রিপিটকে ব্যুৎপত্তি লাভ করে ধর্মপ্রচারে বের হন। আগরতলার রাজার সহায়তায় তিনি কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। পরে সীতাকুণ্ড পাহাড়, চক্রশালা এবং চেঁদিরপুনি গ্রামে বিহার ও ধাতুচৈত্য প্রতিষ্ঠা করে রামকোটে এসে পৌঁছান।

রামকোট বনাশ্রমের ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে সেখানে গড়ে উঠেছে 'জগজ্জ্যোতি শিশুসদন' নামে একটি সেবাপ্রতিষ্ঠান। ইতালীয় মানবপ্রেমিক ফাদার লুইজি লুফি ১৯৯৪ সালের ৮ জানুয়ারি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে 'শরণ' নামে একটি সংগঠন। ৫ থেকে ১১ বছরের পিতৃমাতৃহীন দুস্থ শিশুরা এখানে আশ্রয় পেয়ে থাকে।

**রামকৃষ্ণ** শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬-৮৬) হিন্দুধর্মসংস্কারক ও আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী। ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কামারপুর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা চন্দ্রমণিদেবী দেবতা বিষ্ণুর অপর নামানুসারে পুত্রের নাম রাখেন গদাধর। পরবর্তীকালে গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নামে পরিচিত হন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি গদাধরের মনোযোগ ছিল না। অন্যদিকে শৈশবেই তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায় দিব্যভাব। তাঁর ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। রামায়ণ-মহাভারতের পালা একবার শুনেই তিনি মুখস্থ বলতে পারতেন। পিতার কাছ থেকে তিনি ধর্মীয় শ্লোক শিখেছিলেন। গ্রামের কথকদের কাছ থেকে শেখেন রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনি। পুরীগামী তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে শেখেন ধর্মগীতি।

পিতার মৃত্যুর পর অগ্রজ রামকুমার কলকাতার ঝামাপুকুরে নিজস্ব টোলে গদাধরের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। পরে রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রামকুমার পূজার ভার পেলে গদাধর অগ্রজের সঙ্গে মন্দিরে স্থান পান। অল্পকাল পরে রামকুমারের মৃত্যু হলে পূজার দায়িত্ব পড়ে গদাধরের ওপর।

১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে গদাধরকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতায়, কিন্তু তাতে তেমন ফল হয়নি। একমাত্র সাধনমার্গ ছাড়া জাগতিক শিক্ষার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হন। তিনি দাবি করতেন, দেবী কালীর হাতেই তাঁর শিক্ষার শুরু। সকল দেব-দেবীর একত্ব সম্পর্কে তিনি বিশ্বমাতার কাছ থেকে ধারণা লাভ করেন। দীক্ষা লাভের পর তাঁর নাম হয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। একই সঙ্গে রামকৃষ্ণ বৈষ্ণবসাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করেন।

রামকৃষ্ণ শুধু হিন্দু ধর্মমতভিত্তিক সাধনাতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি, তিনি ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের আরাধনা পদ্ধতিকেও জানার চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে তিনি হজরত মোহাম্মদ (সা.) ও যিশুখ্রিষ্ট-প্রবর্তিত ধর্মীয় ধারাও পর্যবেক্ষণ করেন। এভাবে সমুদয় ধর্মসাধনার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন। তাঁর ভাষায়, 'সকল ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ।' তিনি সন্ন্যাসীদের মতের সঙ্গে একমত ছিলেন না বা তাঁদের মতো পোশাকও পরতেন না। তিনি স্ত্রী সারদা দেবীকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেন এবং তাঁকে তিনি সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে পূজা করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন লোকগুরু। ধর্মের কঠিন তত্ত্বকে সহজ করে বোঝাতেন তিনি। বলতেন, ঈশ্বর রয়েছেন সকল জীবের মধ্যে, তাই জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা। তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) তাঁর ধর্মীয় আদর্শ প্রচার করেন।

রামকৃষ্ণের উদার ধর্মীয় নীতির প্রভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবাদর্শে মোহগ্রস্ত অনেক শিক্ষিত যুবক ভারতীয় আদর্শে ফিরে আসেন। তিনি যেমন বিভিন্ন

ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে যেতেন, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গও তাঁর কাছে আসতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন, মহেন্দ্রনাথ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষসহ আরও অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন।

রামকৃষ্ণের সাধনাস্থল দক্ষিণেশ্বর এখন অন্যতম তীর্থস্থান। তাঁর মতে, ঈশ্বরলাভ জীবনের পরম উদ্দেশ্য এবং এ জন্য গভীর নিষ্ঠা নিয়ে সাধনা করতে হয়। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* নামক গ্রন্থে তাঁর উপদেশাবলি বিধৃত হয়েছে। ফরাসি মনীষী রমাঁরলাঁ রামকৃষ্ণের জীবনী রচনা করেছেন। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ আগস্ট কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**রামকৃষ্ণ মিশন** এই প্রতিষ্ঠানটি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আত্মজ্ঞানের ধারণা, বিশেষ করে বেদান্ত দর্শন এবং সামাজিক শিক্ষা ও ন্যায়বিচারের প্রসারে কাজ করে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, হল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, কানাডাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর কার্যক্রম রয়েছে। প্রধান কার্যএলাকা বেলুড়, হাওড়া ও কলকাতায়। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ, বাগেরহাট, বরিশাল, ফরিদপুর, দিনাজপুর, চাঁদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে মিশনের কার্যালয় রয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে এবং অসুবিধাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের সহায়তা দান করে।

**রামচন্দ্র** হিন্দু দেবতা ও বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। ত্রেতাযুগের শেষে পৃথিবীর উপদ্রবস্বরূপ দানবদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তিনি নবরূপ গ্রহণ করেন। পিতা অযোধ্যার রাজা দশরথ, মা রানি কৌশল্যা এবং স্ত্রী সীতা। তিনি রামায়ণের প্রধান চরিত্র। রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি 'রাম' চরিত্রটিকে এমনভাবে নির্মাণ করেছেন যে এর প্রভাব যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সমাজে অটুট রয়েছে। পিতৃভক্তি, প্রজাবাৎসল্য, পরোপকার, মানবপ্রেম, লোভহীনতা, সত্যপালন ইত্যাদি রামচরিত্রের আকর্ষণীয় দিক। রামচরিত্রে পরোপকারের বিষয়টি তাঁর বাল্যকাল থেকেই লক্ষ করা যায়। তপোবনে একসময় মুনি-ঋষিরা দানবদের অত্যাচারে যজ্ঞ করতে পারছিলেন না। তখন বিশ্বামিত্রের আহ্বানে অনুজ লক্ষ্মণসহ রাম সেখানে যান এবং দানবদের হত্যা করে ঋষিদের যজ্ঞক্রিয়া নির্বিঘ্ন করেন। পুত্র হিসেবে পিতার প্রতি এবং রাজা হিসেবে প্রজাদের প্রতি কর্তব্য কী হওয়া উচিত, তার দৃষ্টান্ত রামচরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। রামের যেদিন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার কথা, সেদিন পিতৃসত্য পালন এবং পিতার সম্মান রক্ষা করার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় রাজত্ব ত্যাগ করে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যান।

রাম বিষ্ণুর অবতার, কিন্তু মনুষ্যরূপে জন্ম নিয়ে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি মানবীয় আচরণই করেছেন। রাবণের লক্ষ্মীপুরীতে অবস্থানহেতু সীতার চরিত্র সম্পর্কে নিজের কোনো সংশয় না থাকলেও প্রজাদের সন্দেহের কারণে রাম সীতাকে বিসর্জন দেন। নিষ্পাপ চরিত্র সীতাকে বিসর্জন দিয়ে অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হলেও নিজের সুখের চেয়ে রাজ্যের মঙ্গল ও প্রজাদের সুখের বিষয়টিই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। যে বিমাতার ষড়যন্ত্রে অভিষেকের দিন রামকে বনবাসে যেতে হয়েছিল, সেই কৈকেয়ীকেও তিনি নিজের মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর পুত্র ভরতকে তিনি সহোদরের মতোই দেখতেন। অবতার হয়েও রাম এভাবে একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করেন এবং সমাজে আইনশৃঙ্খলা, সত্য, মানবতা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। তাই হিন্দুরা তাঁকে শুধু দেবতা হিসেবেই নয়, একজন আদর্শ পুত্র, আদর্শ রাজা, আদর্শ পতি এবং ক্ষমা, সততা ও মহত্ত্বের প্রতীক হিসেবে শ্রদ্ধা করে থাকে। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে তারা তাঁকে নিত্য স্মরণ করে থাকে।

**রামচরিতম্** সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত একটি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটির গুরুত্ব এখানে যে, এটি একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার অবস্থার ওপর আলোকপাত করে। *রামচরিতম্* বরেন্দ্রের (উত্তর বাংলা) একজন কবি কর্তৃক বাংলায় বসে রচিত একমাত্র সংস্কৃত গ্রন্থ, যার মূল বিষয়বস্তু সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনা। এ কারণে গ্রন্থটি পরবর্তী পালযুগের ইতিহাসের

নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত। লেখক পাল বংশের শেষ রাজা মদনপালের (১১৪৩-১১৬২ খ্রি.) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতা প্রজাপতি নন্দী ছিলেন রামপালের (আনুমানিক ১০৮২-১১২৪ খ্রি.) 'সান্ধিবিগ্রহিক'। পুণ্ড্রবর্ধনপুর শহরের কাছে বৃহদ্বটু গ্রামে ছিল তাঁর আদি নিবাস।

*রামচরিতম্* 'কবি প্রশস্তি' শিরোনামে ২০ শ্লোকের পরিশিষ্টসহ ২১৫টি (যদিও বৌদ্ধ অনুলিপিকার শীলচন্দ্র ২২০টি শ্লোকের উল্লেখ করেছেন) শ্লোক রয়েছে। শ্লোকগুলো অসামান্য সংস্কৃত শব্দালংকার 'শ্লেষ' (দ্ব্যর্থবোধক) রীতিতে রচিত। এগুলোতে শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে এই কাব্যটি এক অর্থে সুপরিচিত রামায়ণের কাহিনি এবং অন্য অর্থে বাংলার পালবংশের রাজা রামপালের ইতিহাস পাওয়া যায়।

**রামতনু লাহিড়ী** শিক্ষক, সংস্কারক ও শিক্ষাসংগঠক। নদীয়ার কৃষ্ণনগরে এক উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৩ সালে রামতনু (১৮১৩-১৮৯৮) বৃত্তি নিয়ে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডিরোজিওর সান্নিধ্য লাভ করেন।

রামমোহনের প্রভাবে রামতনু পৈতা ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এ কারণে তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই সামাজিকভাবে অপমানিত হতেন। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাঁকে একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে এবং তাঁর অনুপম চরিত্রের জন্য গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর শিষ্যরা তাঁকে তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরেও অত্যন্ত সম্মান করতেন। শিষ্যদের অন্যতম শিবনাথ শাস্ত্রী ১৯০৪ সালে *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* নামে নিজের সমকালীন সমাজ-সমীক্ষামূলক যে গ্রন্থ করেছেন, তাতে তিনি তাঁর গুরুকে স্মরণীয় করে রেখেছেন।

**রামাই পণ্ডিত বা রামাই ডোম** একাদশ শতকের প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের এক লৌকিক রূপ ধর্মপূজার প্রবর্তক। ধর্মসেবক সম্প্রদায়ে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর রচিত *শূন্যপুরাণ* প্রাচীন সমাজ ও ভাষার পরিচয় তুলে ধরে।

**রামানন্দ** বৈষ্ণব ধর্মের সংস্কারক। জন্ম প্রায়াগের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। রামানন্দ (১২৯৯-১৪১০) নতুন শ্রীবৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক দার্শনিক রামানুজের চতুর্থ উত্তরাধিকারী। রামানুজের তৃতীয় উত্তরাধিকারী রাঘবানন্দ ১২ বছরের বালক রামদত্তের অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন, নাম রাখেন রামানন্দ এবং মৃত্যুকালে তাঁকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। দীর্ঘকাল বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করে রামানন্দ বারানসি ফিরে যান এবং পঞ্চগঙ্গা ঘাটে বসতি স্থাপন করেন। কথিত অপবিত্রতার জন্য নিজ সম্প্রদায় থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি রামায়ত নামে অমায়িক ও কম আনুষ্ঠানিক এক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দর্শন রামানুজের দর্শনের মতোই, তবে তিনি বর্ণভেদ, আচার-অনুষ্ঠানের ওপর কম গুরুত্ব দেন এবং তাঁর ধর্মের দুটি প্রধান মূলনীতি : ভক্তি, ভগবানে বিশ্বাস, জন্ম বা অবস্থা নির্বিশেষে মানবভ্রাতৃত্ব। তাঁর ১২ জন শিষ্যের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন ব্রাহ্মণ, মুসলমান, সৈনিক, নাপিত, চামার এবং দুজন স্ত্রীলোক। তিনি ও তাঁর শিষ্যবর্গ সংস্কৃতের পরিবর্তে সাধারণের বোধগম্য মাতৃভাষায় কথাবার্তা বলতেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কবীর এবং তুলসীদাস উল্লেখযোগ্য।

**রামানন্দ ঘোষ** অষ্টাদশ শতকের কবি। তাঁর কাব্যের নাম *রামতত্ত্ব রামায়ণ*। সংস্কৃতে পণ্ডিত রামানন্দ তাঁর রামায়ণে নিজেকে বুদ্ধদেবের অবতার বলে দাবি করেন। *রামায়ণ পাঁচালী* রচনার চৌদ্দ বছর পর রামানন্দ একখানি *চণ্ডীমঙ্গল* লিখেছিলেন।

**রামানন্দ বসু** ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব কবি। জন্ম বর্ধমান জেলায়। বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই তিনি পদ রচনা করেন। তিনি চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্শ্বচর ছিলেন।

**রামানুজ** আবির্ভাব একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী সময়পরিসরে। জন্ম চোল রাজ্যের শ্রীপেরাম্বুদুর গ্রামে, চেন্নাইয়ের অনতিদূরে। বৈষ্ণব ধর্মের বিশিষ্ট দ্বৈতবাদের তিনি প্রচারক। তাঁর ধর্মমত অনুসরণ করে পরবর্তীকালে রামানন্দ ও কবীর স্ব স্ব মত প্রচার করেন। তাঁর প্রচারিত দর্শনশাস্ত্রের নাম 'রামানুজ দর্শন'। ব্রহ্মসূত্রের ওপর বিখ্যাত টীকা

শ্রীভাষ্যসহ তিনি প্রায় অর্ধশত গ্রন্থ রচনা করেন। রামানুজ অনুসারীরা শ্রীবৈষ্ণব নামে পরিচিত। এঁরা বিষ্ণু লক্ষ্মীর উপাসক। বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর অবতার রাম ও সীতার পূজাও তাঁরা করেন। শ্রীরঙ্গম, মঙ্গলকোট, দ্বারকা, পুরী প্রভৃতি রামানুজ অনুসারীদের তীর্থস্থান। তুলসীগাছ ও শালগ্রাম শিলা তাঁদের কাছে পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক। রামানুজ বহু বৌদ্ধ ও জৈনকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই শ্রীরঙ্গমে তাঁর একটি মূর্তি স্থাপিত হয়। মৃত্যু আনু. ১১৩৭ খ্রি.।

**রামায়ণ** প্রাচীন ভারতীয় সূর্যবংশীয় রাজাদের কাহিনি অবলম্বনে মহর্ষি বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য। এর রচনাকাল আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক। বাল্মীকি রচিত পৃথিবীর আদি মহাকাব্য। অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের জীবনকাহিনি এর মূল উপজীব্য। রামায়ণ সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত। (১) আদিকাণ্ডে রামের জন্ম ও বাল্যজীবন; (২) অযোধ্যাকাণ্ডে অযোধ্যা থেকে রামের বন-নির্বাসন; (৩) অরণ্যকাণ্ডে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার বনবাস ও রাবণ কর্তৃক সীতা-হরণ; (৪) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে রামের বন্ধুত্ব; (৫) সুন্দরকাণ্ডে রামের সসৈন্যে লঙ্কায় উপস্থিতি; (৬) লঙ্কাকাণ্ডে রাম-রাবণের যুদ্ধ; রাবণের সবংশে মৃত্যু ও রাম কর্তৃক সীতার উদ্ধার ও সদলবলে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন; (৭) উত্তরকাণ্ডে রাজা রাম কর্তৃক সীতার বনবাস, লব-কুশের জন্ম, রাম ও সীতার পুনর্মিলন এবং মৃত্যু। আদি ও উত্তরকাণ্ড পরবর্তীকালে সংযোজিত বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই মহাকাব্যের শ্লোকসংখ্যা বিভিন্ন ভাষ্য অনুসারে ২৪ হাজার থেকে ৪৩ হাজারের মধ্যে। কৃত্তিবাস ওঝা এর বাংলা অনুবাদ করেন। অনুবাদ থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে পরিচিত। হিন্দি তুলসীদাসী রামায়ণ (রামচরিত মানস) উত্তর ভারতে বহুল প্রচলিত।

*রামায়ণ কাহিনি* অযোধ্যার রাজা দশরথের তিন মহিষীর গর্ভে চার পুত্র জন্মে। প্রথমা পত্নীর গর্ভে রাম, দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে ভরত ও তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নর জন্ম। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম বিশ্বামিত্র মুনির আমন্ত্রণে তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেন। বিশ্বামিত্র রামকে রাজা জনকের সভায় নিয়ে যান এবং সেখানে রাম শিবের ধনুকে জ্যা পরিয়ে ধনুকটি ভেঙে ফেলেন। রামের বীরত্বে মুগ্ধ জনক রাজা তাঁর সঙ্গে নিজের কন্যা সীতার বিয়ে দেন। জনকের ভ্রাতুষ্পুত্রীদের সঙ্গে রামের তিন ভাইয়েরও বিয়ে হয়। দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে উদ্যোগী হলে তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী কৈকেয়ী তাতে বাধা দেন। একবার কৈকেয়ী স্বামীকে সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে 'ইচ্ছাবর' লাভ করেছিলেন। সেই কথা স্মরণ করিয়ে তিনি দশরথকে বলেন রামকে বনবাসে পাঠিয়ে নিজের পুত্র ভরতকে রাজা করতে। দশরথ প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠান। রামের সঙ্গী হলেন তাঁর পত্নী সীতা ও পরমভক্ত অনুজ লক্ষ্মণ। দশরথ মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করেন। ভরত তখন অন্যখানে ছিলেন। তিনি অযোধ্যায় ফিরে রামকে রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতে ও রাজা হতে অনুরোধ করেন। রাম রাজি না হওয়ায় ভরত রামের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজ্য শাসন করতে থাকেন। সীতা ও লক্ষ্মণসহ রাম দণ্ডকারণ্যে বনবাসের জীবন আনন্দে কাটাচ্ছিলেন। লঙ্কারাজ রাবণের বোন রাক্ষসী শূর্পণখার অভিসারমূলক উৎপাতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লক্ষ্মণ তাঁকে তাড়িয়ে দেন। শূর্পণখা রাবণকে সীতাহরণে প্ররোচিত করেন। রাবণ ছলনা করে সীতাকে একাকিনী পেয়ে হরণ করেন। সীতাহারা রাম নানা জায়গায় ঘুরে কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন। সেখানে বানর রাজ্যের দুই রাজপুত্র বালী ও সুগ্রীবের মধ্যে বিবাদ ছিল। রাম সুগ্রীবের পক্ষ নিয়ে তাঁর অগ্রজ বালীকে বধ করেন। সুগ্রীব রাজা হয়ে বানর সেনাদের নিয়ে রামের সাহায্যে অগ্রসর হন। রাম লঙ্কায় গিয়ে রাবণ, তাঁর পুত্র ও ভাইদের বধ করেন। বানরদের মধ্যে রামের পরম ভক্ত হনুমান লঙ্কা থেকে সীতার খোঁজ নিয়ে আসেন এবং রাবণের ভাই বিভীষণও রামের পক্ষ নেন। রাম বিভীষণকে লঙ্কার রাজা হতে সাহায্য করে নিজ রাজ্যে ফেরেন ও অযোধ্যার রাজা হন। রাবণের হাতে সীতা বহুদিন বন্দিনী থাকায় প্রজাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক সীতার চরিত্রহানি ঘটেছে, এমন

সন্দেহ প্রকাশ করে। প্রজানুরঞ্জনে রাম সীতাকে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে নির্বাসন দেন। বাল্মীকির আশ্রমে রামের ঔরসে সীতা দুই যমজ পুত্র কুশ ও লব প্রসব করেন। বাল্মীকি তাঁদের দিয়ে রামায়ণ রচনা করিয়ে গান করাতে থাকেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে কুশ ও লব অযোধ্যায় গিয়ে রামায়ণ গান শোনান। রাম যমজ ভ্রাতৃদ্বয়কে আপন সন্তান বলে বুঝতে পারেন। তিনি তখন পত্নী সীতাকে ফিরিয়ে আনেন। সীতার চরিত্র শুদ্ধির প্রমাণ চাওয়া হলে সীতা মনের দুঃখে ধরিত্রী-গর্ভে অদৃশ্য হয়ে যান। রাম কুশকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে ভ্রাতৃবর্গ ও পরিজনবর্গসহ তিনি নিজেও সরযূ নদীতে আত্মবিসর্জন করেন।

**রাষ্ট্রধর্ম** রাষ্ট্রধর্মের কথা বহু প্রাচীন। সেই মিসর ও সুমের সাম্রাজ্যের কালে প্রতিটি নগররাষ্ট্র বা জাতির নিজস্ব একজন দেবতা থাকত বা একাধিক দেব-দেবী। কোনো কোনো রাজত্ব শেষে রাজারা ভূমুজিদের মতো দেবতা বলে স্বীকৃত বা দেবতায় উন্নীত হতেন। আক্কাদের রাজা মহা সারগন রাজ্যাভিষেকের পরপরই দেবতা বলে গণ্য হতেন। তাঁদের রাজত্বকালেই যাদের দেবতা হিসেবে ঘোষণা করা হতো, তাঁদের মধ্যে প্রথম ছিলেন লাগাশের গুদিয়া। তারপরে আসে উর রাজ্যের শুলগি। মিসরে সরকারের ভিত্তিমূলে ছিল ধর্মের প্রভাব। ফেরাউনকে দেবতা হোরাসের মূর্তপ্রতীক হিসেবে গণ্য করা হতো। সাসানিদ (২২৬-৬৫১) সাম্রাজ্যে জরথুস্ত্রবাদী ধর্ম ছিল রাষ্ট্রধর্ম। অনেক গ্রিক নগররাষ্ট্রের নিজেদের বিশেষ দেবতা থাকত। অ্যাথেন্স, স্পার্টা, ডেলস ও অলিম্পিয়ার বিশেষ দেব-দেবী ছিল যথাক্রমে অ্যাথিনা, আর্টেমিস, অ্যাপোলো ও জিউস। রোমে সম্রাটকে পন্টিফেক্স বা ম্যাক্সিমাস বা প্রধান পুরোহিত বলা হতো। তিনি দেবতা হিসেবে মরণোত্তর স্বীকৃতি পেতেন। সম্রাটের পূজা-অর্চনা সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যের অংশস্বরূপ ছিল। অন্যথা হলে শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা খুবই নির্যাতিত হয়।

৩১১ অব্দে সম্রাট গ্যালেরিয়াস সারা রোমক সাম্রাজ্যে ধর্মের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ৩১৩ সালে ইডিক্ট অব মিলান দ্বারা কনস্টানটাইন রোমান ধর্ম বাতিল করে দেন। ৩৬১-৩৬৩ অব্দে পর্যন্ত জুলিয়ান প্রাচীন রোমান ধর্ম পুনঃপ্রবর্তন করলেও ধর্মের জন্য নির্যাতনের রীতি আর ফিরিয়ে আনেননি। ৩৯২ অব্দে থিওডোসিয়াম খ্রিষ্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা দেন।

হান রাজত্বকালে, ২০৬-২২০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে কনফুসিয়ানবাদকে প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে গণ্য করা হতো। সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করার সময় কনফুসিয়ানবাদের সঙ্গে পরিচিতির পরীক্ষা দিতে হতো। সুই রাজত্বকালে (৫৮১-৬১৮ অব্দে) বৌদ্ধধর্ম কনফুসিয়ানবাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। দশম শতকে নব্য কনফুসিয়ানবাদ ফিরে আসে।

সরকারি ধর্ম হিসেবে রোমান ক্যাথলিসিজম ১০টি দেশে স্বীকৃত। লুথেরান চার্চ রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃত চারটি দেশে: আইসল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও ফিনল্যান্ড। চার্চ অব ইংল্যান্ড রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃত ইংল্যান্ডে। রিফর্মড চার্চ সুইজারল্যান্ডের কিছু কিছু ক্যান্টনে স্বীকৃত।

সুন্নি ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ২১টি দেশে স্বীকৃত: সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরাক, ইরান, ওমান, কাতার, কুয়েত, জর্দান, বাহরাইন, সৌদি আরব, ইয়েমেন, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, লিবিয়া, সোমালিয়া, ব্রুনেই, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ। শিয়া ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃত কেবল ইরানে।

ছয়টি দেশে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বৌদ্ধধর্ম স্বীকৃত: কম্বোডিয়া, কালমাইকিয়া, তিব্বত, থাইল্যান্ড, ভুটান ও শ্রীলঙ্কা।

কতকগুলো দেশ প্রতিষ্ঠিত কোনো ধর্মের পক্ষে কোনো ঘোষণা দিতে সরকারিভাবে রাজি নয়। রাষ্ট্রগুলো হলো: অস্ট্রেলিয়া, আজারবাইজান, ইসরাইল, কানাডা, চিলি, জাপান, তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড, নেপাল, ফিলিপিন্স, ফ্রান্স, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, রোমানিয়া ও সিঙ্গাপুর।

গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে স্বাধীনতা অর্জনের পর বহু রাষ্ট্র রাষ্ট্রধর্মের কোনো বিধান রাখেনি: আলবেনিয়া, বুসনিয়া ও হার্জেগোভিনা,

ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া, ইউক্রেন, লাভিয়া, মলদোভা ইত্যাদি। অনেক দেশ পুরোনো প্রতিষ্ঠিত ধর্ম পরিত্যাগ করে বেশ আগে। যেমন ১৮৩০ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বেলজিয়াম কোনো রাষ্ট্রধর্মের বিধান রাখেনি। অনেক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ছিল, সংরক্ষিত হয়নি।

১৯৬৭ সালে আলবেনিয়ায় নাস্তিকতা ছিল রাষ্ট্রধর্ম। ১৯৯১ সালের পর কোনো রাষ্ট্রধর্মই নেই। ১৭৭৬ সালের রাজ্য-সংবিধান অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনায় অ্যাংলিক্যান চার্চের সরকারি অবস্থানের সমাপ্তি ঘটে। ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত কেবল প্রটেস্ট্যান্টরা সে রাজ্যে চাকরি পেতেন। পরে রোমান ক্যাথলিকদেরও চাকরির সুযোগ মেলে। বর্তমানে সরকারি অফিসে নাস্তিকদের কোনো চাকরি হওয়ার কথা নয়, অবশ্য এ বিধান কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করা হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উটাহ রাজ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মর্মনরা রাষ্ট্রীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু মার্কিন সরকার এবং বেশির ভাগ নাগরিকের আপত্তিতে তা সফল হয়নি।

ইউরোপে গির্জা ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব বহু শতাব্দী ধরে চলে। ৩০ বছর ধরে চলে ধর্মযুদ্ধ। ওয়েস্টফ্যালিয়ার সন্ধি অনুযায়ী রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম—এই নীতি বর্জিত হয় এবং ধর্মের সহ-অবস্থান ঘটে। ইহজাগতিকতা সমাজে প্রসার লাভ করেছে। অ্যাংলিক্যান চার্চের দৌরাত্ম্যে পীড়িত হয়ে পিউরিটানরা আমেরিকায় পালিয়ে যায়। সেখানে রোমান ক্যাথলিসিজম সম্পর্কে একটি ভীতি ছিল। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়, যার নিরসনে ইহজাগতিকতা বা ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণযোগ্য, সে অবস্থা দক্ষিণ এশিয়া বা চীনে ছিল না। সে জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটা তেমন করে আলোচিত হয়নি। এই ধারণাটা পশ্চিমা জগৎ থেকে প্রাচ্যে এসেছে এবং এর সঙ্গে তেমন একাত্মবোধ বা মমত্ব লক্ষ করা যায় না।

বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতা দিয়ে শুরু করে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামে পৌঁছেছে। সংবিধানের ২ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম তবে অন্যান্য ধর্ম প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাবে।' এই বিধান মালয়েশিয়ার সংবিধান থেকে হুবহু ধার করা।

বহুধর্মাবলম্বীর দেশে একটি ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করলে অন্য ধর্মের মানুষদের সেই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য নাও থাকতে পারে। অন্যান্য ধর্মও শান্তিতে পালন করা যাবে, এই ভরসা অন্য ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেয় না। নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি অন্য ধর্মের মানুষের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে পারে। তবে রাষ্ট্রধর্মের বিধানকে বেশি প্রাধান্য বা গুরুত্ব না দিলে সে বিধান নাগরিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও উন্নয়নের পথে তেমন বিঘ্ন নাও সৃষ্টি করতে পারে, যদি না সব নাগরিক আইনের চোখে সমান মর্যাদা ও আইনের কাছে সমান আশ্রয় পায়। রাষ্ট্রধর্মের বিধান মালয়েশিয়ায় বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বড় ধরনের মনোমালিন্য সৃষ্টি করেছে বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক প্রশ্ন বা স্বার্থের সংঘাত ধর্মের ভিত্তিতে নয়, ইহজাগতিকতার ভিত্তিতে মোকাবিলা ও সমাধান করলে তেমন সমস্যা সৃষ্টি হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্রিটেনে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে, যদিও সেখানে একটি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী চার্চ রয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তনকালে ১২ অনুচ্ছেদে বলা হয়, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, (গ.) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার, (ঘ) কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার ওপর নিপীড়ন বিলোপ করা হবে। ১৯৭৮ সালের দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র আদেশ দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা হয় এবং এটা সংবিধানের পঞ্চম সংশোধন দ্বারা সমর্থিত হয়। সংবিধান প্রবর্তনকালে ৩৮ অনুচ্ছেদে যে সংগঠনের স্বাধীনতার কথা বলা হয়, সে সম্পর্কে একটি শর্ত ছিল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোনো সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোনো সমিতি বা সংঘ গঠন করার

বা তার সদস্য হওয়ার বা অন্য কোনো প্রকারে তার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করার অধিকার কোনো ব্যক্তির থাকবে না। ওই শর্ত ১৯৭৮ সালের দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র আদেশ দ্বারা বিলুপ্ত হয় এবং সংবিধানের পঞ্চম সংশোধন দ্বারা সমর্থিত হয়। অন্যদিকে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২০ ধারায় বিধান রয়েছে যে, ১. কোনো ব্যক্তিই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হাসিলের জন্য ধর্মভিত্তিক বা ধর্মের নামে গঠিত কোনো সাম্প্রদায়িক বা অন্য সংঘ ইউনিয়ন গঠন করতে বা তার সদস্য হতে বা অন্যভাবে তার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। ২. যে ক্ষেত্রে সরকার সন্তুষ্ট হয় যে, ১ উপধারার বিধান লঙ্ঘন করে সংঘ ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছে, যা সংঘ বা ইউনিয়ন কাজ চালাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বক্তব্য শ্রবণের পর সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা দিতে পারেন যে, তেমন সংঘ বা ইউনিয়ন ১ উপধারার বিধান লঙ্ঘন করে গঠন করা হয়েছে বা বিধান লঙ্ঘন করে চালানো হচ্ছে এবং এই ঘোষণার পর সংশ্লিষ্ট সংঘ বা ইউনিয়ন ভেঙে গেছে বলে গণ্য হবে এবং তার সমস্ত সম্পত্তি ও তহবিল সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে। ৩. উপধারা ২ অনুসারে একটি সংঘ বা ইউনিয়নের সদস্য বা তেমন সংঘ বা ইউনিয়নের পক্ষে কাজ করেন বা অন্য কোনোভাবে কাজে অংশগ্রহণ করেন, তাহলে তিনি তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে যা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। ১৯ ধারায় ধ্বংসাত্মক সংঘগুলোর নিয়ন্ত্রণের যে বিধান দেওয়া হয়েছে তার ৯ উপধারায় বলা হয়েছে, এই ধারায় বর্ণিত সংঘ ইউনিয়ন বা রাজনৈতিক দলকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

**রাসতাফারিয়ানিজম** পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের এক ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী রাসতাফারি প্রথম হাইলে সেলাসিকে ভজনা করা হয়। গত শতাব্দীর বিশের দশকে জ্যামাইকায় মার্কাস গার্ভে কৃষ্ণকায়দের ওপর নিপীড়নের বিরুদ্ধে আফ্রিকা প্রত্যাবর্তনের আন্দোলন শুরু করেন। রাসতাফারিয়ারা খাদ্যগ্রহণের ব্যাপারে কড়া নিয়ম পালন করেন।

**রাসমেলা** মণিপুরিদের প্রধান উৎসব। রাসলীলা নামেও পরিচিত। বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ, সুন্দরবনের দুবলার চর এবং কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে এ উৎসব হয়। 'রস' থেকে রাস কথাটির উৎপত্তি এবং রস আস্বাদনের জন্য পালিত হয় বলে এর এরূপ নামকরণ হয়েছে। বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক রাসলীলার অনুকরণে রাসমেলার উদ্ভব। রাসমেলার প্রধান দিক হলো চিরাচরিত মণিপুরি পোশাকে শিশুদের রাখাল নাচ ও তরুণীদের রাসনৃত্য। মণিপুরি সংগীত ও নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে কৃষ্ণ-অভিসার, রাধা-গোপী অভিসার, রাগ আলাপন ইত্যাদি অভিনীত হয়। নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও নদীয়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় ধুমধাম করে রাস উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

**রিয়োওবু-শিন্টো** শিন্টো ধর্মের একাংশ। শিন্টো ও বৌদ্ধধর্মের মিশ্রণে যে ধর্মীয় জীবনচর্যা মেইজি যুগে আবির্ভূত হয়েছিল।

**রূপক আয়াত** পবিত্র কোরআনের সূরা আল-ই-ইমরান-এর ৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার মধ্যে মজবুত আয়াতগুলো উম্মুলকিতাব [কিতাবের মূল অংশ], আর অন্যগুলো রূপক। যাদের মনে বিকৃতি আছে, তারা ফিতনা [বিরোধ] সৃষ্টি ও কদর্থের উদ্দেশ্যে যা রূপক তা অনুসরণ করে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানী তারা বলে, আমরা এতে বিশ্বাস করি। সবই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে।'

**রূপান্তর** (Transformation) জাদুর মাধ্যমে কোনো প্রাণীর রূপান্তর। আমেরিকান লোককাহিনির একটি সাধারণ উপাদান হলো মানুষকে জীবজন্তুতে অথবা জড় পদার্থে রূপান্তর। দেবতারা বিভিন্ন কারণে নিজেদের মানুষের আকৃতিতে অথবা জীবজন্তুর আকৃতিতে রূপান্তর ঘটাতে পারেন। রূপান্তরকরণ ঘটতে পারে কোনো লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য, শাস্তি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য অথবা কোনো প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করার জন্য। লোককথার নায়কেরা অল্প সময়ে বিভিন্ন আকার ধারণের মাধ্যমে রূপান্তরিত হতে পারে।

**রেড ক্রিসেন্ট** রেডক্রসতুল্য মুসলিমদের সেবামূলক আন্তর্জাতিক সংগঠন। মুসলিম দেশগুলোয় কর্মরত। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ ইত্যাদিতে বিপর্যস্ত জনগোষ্ঠীর সেবায় নিয়োজিত। রেডক্রস-এর তুল্য আন্তর্জাতিক সংগঠন। ওই সংগঠনের প্রতীক রেড ক্রিসেন্ট।

**র‍্যাডাম্যানথাস** গ্রিক পুরাণমতে, ক্রিট আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। জুপিটারের পুত্র ও মিনোসের ভাই। তিনি তাঁর ন্যায়বিচারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে পাতালপুরীর অন্যতম বিচারক নিয়োগ করা হয়।

**র‍্যাফায়েল** বাইবেলে উল্লেখিত আর্ক অ্যানজেল। র‍্যাফায়েল, গ্যাবরিয়েল ও ইউরিয়েল ঈশ্বরের দূত। সাতজন দেবদূতের মধ্যে র‍্যাফায়েল একজন, যাঁর মাধ্যমে সাধুসন্তদের প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাত।

**র‍্যাবাই** হিব্রু বাইবেল ও তালমুদ শাস্ত্র অধ্যয়নের পর ইহুদি ধর্মসমাবেশের প্রধান ধর্মনেতা হিসেবে অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করেন। তাঁর অনুসারীদের শিক্ষা এবং আত্মিক পথ প্রদর্শনের কর্তব্য পালন করেন। বর্তমান ইসরাইলে র‍্যাবাইদের একটা কাউন্সিল রয়েছে, যেখানে দুজন প্রধান র‍্যাবাইয়ের একজন সেফারাদ্রিক প্রথা এবং অন্যজন আসকেনাজি প্রথার প্রতিনিধিত্ব করেন।

**র‍্যাশনালিজম** যুক্তিবাদীদের বিশ্বাস, বিশ্বপ্রকৃতির জ্ঞান কেবল যুক্তির মাধ্যমে আয়ত্ত করা সম্ভব। দেকার্তে, লাইবনিৎজ এবং স্পিনোজার ধারণা ছিল স্বতঃপ্রমাণিত পথে সিদ্ধান্ত থেকে দর্শনের মাধ্যমে বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই মত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের বিপরীত। ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদীদের বক্তব্য স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ দ্বারা নয়, বরং মানবিক যুক্তির দ্বারাই ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

## ল

**লক্ষ্মীপট** মাটির সরার ওপর আঁকা লক্ষ্মীমূর্তি। লক্ষ্মীসরাও বলা হয়। লক্ষ্মীসরা বাংলা লোকশিল্পকলার এক সনাতন প্রকাশধারা। লক্ষ্মী হিন্দুদের ধন, সৌন্দর্য, সমৃদ্ধি ও জনন-উর্বরতার দেবী। সকল নিষ্ঠাবান হিন্দুগৃহে প্রতি বৃহস্পতিবার এই দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হলেও দেবীর বার্ষিক পূজা হয়ে থাকে শারদ পূর্ণিমা রাতে।

**লক্ষ্মীপূজা** ঋগ্‌বেদে শ্রী ও ঐশ্বর্যের দেবী অর্থে লক্ষ্মীর নাম পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়সংহিতায় লক্ষ্মী ও শ্রীআদিত্যের দুই স্ত্রীরূপে কল্পিত। শতপথব্রাহ্মণে প্রজাপতি থেকে এবং রামায়ণে সমুদ্রস্নানের সময় পদ্মহস্তে তিনি উত্থিত হন বলে বর্ণিত হয়েছে। পৌরাণিক যুগে লক্ষ্মী নানাভাবে বর্ণিত হয়েছেন। তিনি কখনো বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী, আবার কখনো কমলা, গজলক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী ইত্যাদি নামে পরিচিত। লক্ষ্মীদেবীর রূপবৈচিত্র্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তিনি কখনো দ্বিভুজা, কখনো বা চতুর্ভুজা। তবে তিনি সর্বত্রই পদ্মা সেনা ও পদ্মহস্তা। প্রভাত সূর্যের মতো তাঁর জ্যোতি। তিনি বিভিন্ন অলংকারে অলংকৃতা। তাঁর বাহন পেঁচক।

দুর্গাপূজার পর পূর্ণিমা তিথিতে ভক্তরা বিনিদ্র থেকে লক্ষ্মীর পূজা করে বলে একে বলা হয় কোজাগরী পূর্ণিমা বা কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। আশ্বিনী পূর্ণিমা ছাড়াও কেউ কেউ প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর বিশেষ পূজা করে থাকে। কোনো কোনো অঞ্চলে দীপান্বিতা অমাবস্যায় সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্মীপূজার রীতি প্রচলিত আছে। সরায়, ঘটে বা মূর্তিতে লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। এ পূজা ব্যক্তিগত বা সর্বজনীনভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

**লাঙ্গলবন্দ** বাংলাদেশে নারায়ণগঞ্জ জেলার পুরোনো ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। ব্রহ্মপুত্র নদে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ভক্তরা স্নান করে পবিত্র হন। পুরাণমতে, ব্রহ্মপুত্র নদের অপর নাম লৌহিত্য। পরশুরাম লাঙল দিয়ে পথ কেটে কেটে নদীটিকে দক্ষিণ দিকে বইয়ে নিয়ে আসেন। প্রবাদ আছে, যেখানে তাঁর লাঙল টানা 'বন্দ' (শেষ) হয়, সেই জায়গাটিরই নাম রাখা হয় লাঙ্গলবন্দ।

**লাইলাতুল কদর** পবিত্র কোরআনের সুরা কদর-এর ১-৫ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি এ (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি লাইলাতুল কাদ্‌রে [মহিমার রাত্রিতে]। মহিমার রাত্রি সম্বন্ধে তুমি কী জানো? মহিমার রাত্রি হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সে রাত্রে প্রত্যেক কাজে ফেরেশতারা ও রুহ্ [জিবরাইল]

অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে। এ শান্তি! উষার আবির্ভাব পর্যন্ত।'

**লাইলাতুল মুবারক** পবিত্র কোরআনের সুরা দুখান-এর ১-৪ আয়াতে বলা হয়েছে, 'হা-মিম। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের, আমি তো এ (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি এক লাইলাতুল মুবারকে [সৌভাগ্যের রাত্রিতে]। আমি তো সতর্ককারী। এ রাত্রিতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয়।'

**লাঠিনাচ** মহররম উপলক্ষে পরিবেশিত হয় এই নাচ। যুবকেরা লাঠি হাতে নিয়ে দলবদ্ধভাবে নাচে। লাঠিনাচের তাল ও ছন্দ রক্ষা করা হয় ঢোল ও কাঁসির সঙ্গে। লাঠিয়ালেরা আঁটসাঁট পোশাক পরে, কোথাও পায়ে ঘুঙুর বা মেকুর পরে। বাঁশের তৈরি তিন-চার হাত লম্বা লাঠি এ নাচের প্রধান উপকরণ। তবে তলোয়ার, ছোরা এবং থালাও ব্যবহার করা হয়। লাঠিনাচ প্রকৃতপক্ষে আধা নাচ, আধা খেলা। লাঠি ঘোরানোর বিভিন্ন কৌশল আছে। লাঠিয়াল হাতের লাঠি সামনে, পাশে, দুই পায়ের মাঝে এবং মাথার ওপরে দ্রুত ঘুরিয়ে থাকে। দুজনে লাঠির আঘাত-প্রত্যাঘাত হেনে দ্বৈতযুদ্ধের রূপকে নাচ দেখায়। ঢুলির তাল অনুযায়ী নাচের চাল, গতি ও ছন্দ পরিচালিত হয়। এ নাচ আরম্ভ, পাঁয়তারা, লড়াই, বিরতি প্রভৃতি কয়েকটি অংশে বিভক্ত। লাঠিনাচ প্রধানত ধীর লয়ে শুরু হয় এবং শেষ হয় দ্রুত লয়ে। মহররমের চাঁদের ১০ দিন ধরে লাঠিয়াল দল গৃহস্থের বাড়ির উঠানে, রাস্তার মোড়ে এবং শেষ দিন কৃত্রিম কারবালায় লাঠিখেলা ও নাচ প্রদর্শন করে।

**লালন শাহ** বাউল সাধনার প্রধান গুরু। ১১৭৯ বঙ্গাব্দের ১ কার্তিক (১৭৭২) ঝিনাইদহ জেলার হরিশপুর গ্রামে লালন শাহর (১৭৭২-১৮৯০) জন্ম। মতান্তরে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীতে ভাঁড়রা গ্রামে এক কায়স্থ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, লালন শাহ যৌবনকালে একবার তীর্থভ্রমণে বের হয়ে পথিমধ্যে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। তখন সঙ্গীরা তাঁকে পরিত্যাগ করে যার যার গন্তব্যে চলে যায়। এমতাবস্থায় সিরাজ সাঁই নামে একজন মুসলমান ফকির তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন। এরপর লালন তাঁর কাছে বাউলধর্মে দীক্ষিত হন এবং ছেঁউড়িয়াতে একটি আখড়া নির্মাণ করে স্ত্রী ও শিষ্যসহ বসবাস করতে শুরু করেন। তাঁর কোনো সন্তানাদি ছিল না, কিন্তু বহু শিষ্য ছিল।

আপন সাধনাবলে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের শাস্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। আধ্যাত্মিক ভাবধারায় তিনি প্রায় ২ হাজার গান রচনা করেন। তাঁর গান মরমি ব্যঞ্জনা ও শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। সহজ-সরল শব্দময় অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ তাঁর গানে মানবজীবনের আদর্শ, মানবতাবাদ ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। লালন কোনো জাতিভেদ মানতেন না। তাই তিনি গেয়েছেন: 'সব লোক কয় লালন কী জাত সংসারে/ লালন কয় জাতির কী রূপ দেখলাম না এ নজরে।' এক সর্বজনীন ভাবরসে ঋদ্ধ বলে লালনের গান বাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমান জনপ্রিয়। তাঁর 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি', 'বাড়ির কাছে আরশি নগর', 'আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে' ইত্যাদি গান বাউল তত্ত্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। মানবগুরু আর মনের মানুষ দুইই তাঁর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রশ্ন করেন, 'ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি জান্নাতে হুর পাবেন, ধর্মপ্রাণ নারী কী পাবেন।'

**লুক্কায়িত ইমাম** সাতজন ইমাম, নাকি ১২ জন ইমামে বিশ্বাস করবেন, এমন প্রশ্নে শিয়ারা দুই ভাগে বিভক্ত। দুই শাখাতেই একটা দাবি আছে, শেষ ইমাম মারা না গিয়ে রহস্যময়ভাবে হারিয়ে গেছেন। বেঁচে আছেন রহস্যময় উপায়ে, পথ দেখাচ্ছেন এবং শেষ সময়ে হাজির হবেন, পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগে।

**লুত (আ.), হজরত** বাইবেলে তাঁকে লোট বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন পয়গম্বর হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর সমসাময়িক। তিনি ইবরাহিম (আ.)-এর শিষ্য ছিলেন বলেও জানা যায়। তাঁর সম্প্রদায়ের নাম সদম্। হজরত লুত (আ.) ধর্মপ্রচার তথা সত্য, ন্যায় ও মানুষের সার্বিক কল্যাণের কথা, স্রষ্টার প্রতি ইমান ও আনুগত্যের কথা প্রচার করতে গিয়ে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিল ব্যভিচারী এবং সীমা

লঙ্ঘনকারী। তা সত্ত্বেও হজরত লুত (আ.) তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হননি।

**লুসেই** বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র উপজাতি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী সিনোটিবেটান পরিবারের তিব্বত-বর্মি শাখার অন্তর্ভুক্ত কুকি-চীন উপদলের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র জনজাতি। রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলার পাহাড়ি অঞ্চলে এদের বসবাস। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী লুসেই জনসংখ্যা ছিল ১ হাজার ৯৮ জন। কিন্তু ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায়, বাংলাদেশে তাদের সংখ্যা মাত্র ৬৬২ এবং পরিবারসংখ্যা ১২৪। সম্ভবত লুসেইরা পার্শ্ববর্তী ভারতের মিজোরামে চলে যাওয়ার কারণেই তাদের সংখ্যা কমে গেছে। কারণ লুসেইদের মূল অংশ বসবাস করে ভারতের মিজোরামে। ১৯৬১ সালে মিজোরামে লুসেই জনসংখ্যা ছিল ২ লাখ ১১ হাজার ৮০৭ জন। লুসেইদের পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে পিতার ভূমিকাই মুখ্য। পিতার সূত্র ধরেই সন্তানদের বংশগণনা করা হয়। অতীতে লুসেইদের একক কোনো রাজা ছিল না। তাদের গ্রামগুলোর প্রতিটিতে একজন করে প্রধান থাকতেন, তাঁকে তারা 'লাল' নামে অভিহিত করত।

**লোকনাথ ব্রহ্মচারী** হিন্দু যোগী-সন্ন্যাসী। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বারাসাতের অন্তর্গত কচুয়া (মতান্তরে চাকলা) গ্রামে ১৭৩০ মতান্তরে ১৭৩১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১২ বছর বয়সে কালীঘাটের সাধক ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এবং ২৫ বছর ব্রত পালন শেষে হিমালয়ে গিয়ে যোগসাধনার মাধ্যমে সিদ্ধি ও যোগবিভূতি লাভ করেন। আফগানিস্তান, পারস্য, আরব, প্যালেস্টাইন, চীন, তিব্বত ইত্যাদি দেশ পরিভ্রমণ করে ১৮৬৩ সালে তিনি নারায়ণগঞ্জের বারদী গ্রামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আধ্যাত্মিক দর্শন ও শিক্ষার প্রতিপাদ্য হচ্ছে : সর্বভূতে ব্রহ্ম বিরাজমান, আত্মা অজর অমর অবিনাশী, আত্মোপলব্ধি, ভক্তি ও একনিষ্ঠ যোগই মুক্তির (সিদ্ধির) পথ, কর্ম ও জীবের হিতসাধনই শ্রেষ্ঠ মানবধর্ম। তিনি 'বারদীর ব্রহ্মচারী' নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর আশ্রমে ধনী-দরিদ্র সবার সমান অধিকার ছিল। ১৮৯০ সালে তিনি এই আশ্রমেই মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর দেহাবশেষ এখানেই সংরক্ষিত হয়। বর্তমানে এটি ভক্তজনের তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ও পশ্চিমবঙ্গে তাঁর আদর্শ ও বাণী প্রচারের জন্য ব্রহ্মচারীর নামে বহুসংখ্যক আশ্রম পরিচালিত হচ্ছে।

**লোকনৃত্য** আদিম বা পল্লি জনগোষ্ঠীর জীবনঘনিষ্ঠ নৃত্য। এ নৃত্য বিশেষ কোনো নরগোষ্ঠী, অঞ্চল বা উপজাতীয় সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে উদ্ভূত ও বিকশিত। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহ, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় সংস্কারের একটা গভীর সম্পর্ক থাকে। বাংলাদেশে সুদূর অতীত থেকে নৌকা বাওয়া, মাছ ধরা, ফসল কাটা, বিয়ে ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে লোকনৃত্যের উদ্ভব ও চর্চা হয়ে আসছে।

**লোকবাদ্যযন্ত্র** হিন্দুদের পূজা-পার্বণে ঢোল-কাঁসর-শঙ্খধ্বনি অত্যাবশ্যক। কোনো কোনো দেবতার মূর্তিকল্পনায় বিশেষ বাদ্যযন্ত্রের যোগসূত্র লক্ষ করা যায়। শঙ্খধারী বিষ্ণু, ডমরুধারী শিব, মুরলীধারী কৃষ্ণ এবং বীণাধারিণী সরস্বতীর মূর্তি এভাবেই কল্পিত হয়েছে। বাদ্যযন্ত্রের প্রভাবে সরস্বতী 'বীণাপাণি' এবং কৃষ্ণ 'মুরলীধর' নামে পরিচিত। হিন্দুদের মধ্যে শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি দিয়ে বধূবরণ ও নবজাতকের আবির্ভাব ঘোষণা করা হয়। শবযাত্রা ও শোভাযাত্রায় শঙ্খধ্বনি শোনা যায়।

**লোকবিশ্বাস ও সংস্কার** মানুষের মানসিক দুর্বলতা, অনিশ্চয়তা, শুভাশুভ বোধ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি থেকে এর উদ্ভব। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে ব্যক্তিক, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। লোকবিশ্বাস ও সংস্কার আপাতদৃষ্টিতে এক মনে হলেও উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্যও আছে। বিশ্বাস পূর্ণাঙ্গ রূপ নেওয়ার আগেই মন থেকে তিরোহিত হতে পারে, কিন্তু কোনো বিশ্বাস যখন পূর্ণরূপ নিয়ে ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তা হয় সংস্কার। তা ছাড়া লোকবিশ্বাস একান্তই ব্যক্তির ধ্যানধারণা মাত্র, কিন্তু সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু আচার-আচরণের ব্যাপার আছে। লোকবিশ্বাস অনুসৃত না হলে তেমন মানসিক

প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না, কিন্তু সংস্কার অনুসৃত না হলে মনের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়; এমনকি ব্যক্তির কর্মোদ্যোগ ক্ষণিকের জন্য হলেও ব্যাহত হয়। যেমন কোনো শুভ কাজে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় যদি কেউ হোঁচট খায়, তাহলে সে কিছুক্ষণের জন্য বসে যায়। অন্যথায় তার বিশ্বাস, শুভ কাজে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে না। এটাই সংস্কার। এজাতীয় শুভ কাজে হাঁচি, পিছু ডাক ইত্যাদি অমঙ্গলের লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

**লোকসংস্কৃতি** জনগণের ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস ও আচার-আচরণ, জীবনযাপন-প্রণালি, চিত্তবিনোদনের উপায় ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এই সংস্কৃতি। তাই বেশিরভাগ দেশের জাতীয় সংস্কৃতির ধারা প্রধানত দুটি : নগরসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি। বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধারা তিনটি : নগরসংস্কৃতি, গ্রামসংস্কৃতি ও উপজাতীয় সংস্কৃতি। গ্রামের বিশাল জনগোষ্ঠী নিজস্ব জীবনপ্রণালির মাধ্যমে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে বহুমুখী ও বিচিত্রধর্মী সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে, তা-ই বাংলার লোকসংস্কৃতি নামে অভিহিত।

নগরে ঘনবসতিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষাদীক্ষা, ব্যবসায়, বৃত্তি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, আনন্দোৎসব, যাতায়াত ও উৎপাদন পদ্ধতির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে নগরসংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি সূক্ষ্ম, জটিল, বৈচিত্র্যময় ও গতিশীল। গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা প্রধানত ঐতিহ্যমুখী ও মন্থর। গ্রামবাসী পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উৎপাদন, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য, ধর্মকর্ম, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তাকে অবলম্বন করেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করে।

বাংলাদেশে ৩২টি উপজাতি রয়েছে। উপজাতীয় সংস্কৃতি এক অর্থে লোকসংস্কৃতিরই অন্তর্ভুক্ত। উপজাতীয় সংস্কৃতি বেশি মাত্রায় রক্ষণশীল ও পরিবর্তনবিমুখ। একই রাষ্ট্রব্যবস্থায় বসবাস করে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ও শিক্ষাদীক্ষা থেকে বঞ্চিত উপজাতীয় জনগোষ্ঠী বৃহত্তর লোকসমাজের সঙ্গে মিলেমিশে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে এগিয়ে না এসে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করে।

'লোক' অভিধাভুক্ত বিশ্বের বেশির ভাগ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, সমাজব্যবস্থা, বিশ্বাস-সংস্কার ও প্রথা-প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বিকশিত সংস্কৃতিতে বিস্ময়কর মিল রয়েছে। বাংলার কৃষক ফসল তোলার সময় এক গোছা ধান মাঠ থেকে এনে ঘরের চালে ঝুলিয়ে রাখে। একে বলা হয় 'লক্ষ্মীর ছড়'। বিশ্বের নানা দেশের কৃষকসমাজেও একই প্রথা চালু আছে; কোথাও তা 'শস্যরানি', কোথাও 'শস্যপুতুল', কোথাও বা 'শস্যমাতা' নামে অভিহিত।

**লোকসম্প্রদায়** বিশেষ ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসী এবং পৃথক সামাজিক আচার-আচরণে অভ্যস্ত একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান—এই চারটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বাংলাদেশে এরা বসবাস করে আসছে। হিন্দুরা পৌত্তলিকতার মাধ্যমে ব্রহ্মতত্ত্বে, বৌদ্ধরা নির্বাণতত্ত্বে, মুসলমানরা তৌহিদবাদে এবং খ্রিষ্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে। পাশাপাশি বিভিন্ন লোকসম্প্রদায়ের ধর্মীয় মত, জীবনাচরণ ও সংস্কার-সংস্কৃতি তাদের থেকে অনেকটাই ভিন্ন। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে কর্তাভজা, কিশোরীভজন, জগোমোহিনী, ন্যাড়া, বলাহাড়ি, বাউল, মতুয়া, সাহেবধনী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠী এখনো টিকে আছে।

**ল্যাবিরিনথ** এক ধরনের গোলক ধাঁধা। এক অজ্ঞাত উদ্দেশ্যে মিসরের মিরিস হ্রদের কাছে প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ এই গোলকধাঁধা নির্মিত হয়। ক্রিট দ্বীপের গোলকধাঁধাও বিখ্যাত ছিল। গ্রিক কাহিনিতে বলা হয়েছে মিনোটরকে বন্দী করে রাখার জন্য ডেডালস ল্যাবিরিনথ নির্মাণ করেন।

## শ

**শঙ্কাবোধ** অস্তিত্ববাদী দর্শনে মানুষের ভবিষ্যৎ পূর্বনির্ধারিত নয়, বরং প্রত্যেক মানুষকেই তা স্বেচ্ছায় স্বদায়িত্বে নির্বাচন করে নিতে হবে, এ বোধে উপনীত হয়ে ব্যক্তিমানুষের মনে যে গভীর শঙ্কা সৃষ্টি হয়, তা-ই শঙ্কাবোধ নামে অভিহিত।

**শঙ্খ** হিন্দুধর্মমতে শঙ্খের ধ্বনি পবিত্র ও মাঙ্গলিক ধ্বনি হিসেবে বিবেচিত হয়। দেবীর আরাধনাকালে ব্যবহৃত হয় জলশঙ্খ এবং পূজা-অর্চনা, পুত্রসন্তান জন্ম, অন্নপ্রাশন, মৃত ব্যক্তির শ্মশান অথবা কোনো বিয়ের যাত্রাকালে বাজানো হয় বাদ্যশঙ্খ। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তেও হিন্দু নারীরা শঙ্খধ্বনি দিয়ে থাকেন। নারীর হাতের উপকরণ হিসেবেও বিবেচিত হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যুধিষ্ঠির-অর্জুন-ভীম-নকুল-সহদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের ঠোঁটেও ধ্বনিত হয় শঙ্খনিনাদ। দেবী দুর্গার হাতেও শঙ্খ শোভিত আছে। পুত্রসন্তানের জন্মের সময়ে শঙ্খধ্বনি করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। কন্যাসন্তানের জন্মের সময়ে কোনো শঙ্খধ্বনি দেওয়া হয় না।

**শবর পা** সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ও চর্যাপদকর্তা (অষ্টম শতক)। চর্যাপদ সংকলনে শবর পা'র দুটি পদ আছে। উভয় পদে অরণ্যবাসী শবর-শবরী দম্পতির সাজসজ্জা, প্রেম-মিলন, মদ্যপান, পানোন্মত্ত নৃত্য, মৃত্যুজনিত বিরহ ইত্যাদির চিত্র আছে। এ থেকে অনুমিত হয়, কবি পাহাড়ি শবর অর্থাৎ শিকারোপজীবী ছিলেন। পরবর্তীকালে গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে ও সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে তিনি ধর্মগুরুর মর্যাদা লাভ করেন।

একমতে শবর পা'র দীক্ষাগুরু ছিলেন নাগার্জুন। অন্যমতে সরহ পা তাঁর গুরু ও লুইপা ছিলেন তাঁর শিষ্য। শবর পা'কে বাঙালি এবং বিক্রমশীলার অধিবাসী বলে মনে করা হয়। তাঁর নামে একাধিক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। তেঙ্গুর তালিকায় উল্লেখিত তিনটি গ্রন্থ হলো : *বজ্রযোগিনী সাধনা, মহামুদ্রাবজ্রগীতি* ও *চিত্তগুহ্য গম্ভীরার্থগীতি। সিতকুরুকুল্লা সাধক* ও *বজ্রযোগিনী আরাধনাবিধি* গ্রন্থগুলো বজ্রযানবিষয়ক। শবর পা'র নামে আরও অনেক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। এ থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন যে, শবর পা নামে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন।

**শবে কদর** ইসলাম ধর্মমতে বছরের সর্বাধিক বরকতময় রাত। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে এর নাম 'লাইলাতুল কদর'; বাংলাদেশে শবে কদর হিসেবেই পরিচিত। শব ফারসি শব্দ, অর্থ রাত, কদর আরবি, অর্থ মর্যাদা, ক্ষমতা। শবে কদর অর্থ 'মর্যাদার রাত'। এই পবিত্র রাতে হেরা গুহায় মহানবী (সা.)-এর কাছে আল-কোরআনের প্রথম সুরার (আলাক) পাঁচটি আয়াত নাজিল হয়।

শবে কদর সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে : 'নিশ্চয়ই আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে; আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কি জানো? মহিমান্বিত রজনী হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সেই রাতে ফেরেশতারা ও রুহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে; শান্তি, শান্তি, সেই রজনীর উষার আবির্ভাব পর্যন্ত।' এই মহিমান্বিত রাতটি মুসলমানদের জন্য আল্লাহর এক বিরাট রহমত, কারণ এই একটিমাত্র রাতে ইবাদত করে তারা হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা বেশি সওয়াব পেতে পারে।

শবে কদরের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। পবিত্র কোরআনে রমজান মাসের উল্লেখ আছে, তবে কোনো নির্দিষ্ট তারিখের কথা নেই। হাদিসে এর তারিখ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন উক্তি আছে: 'রমজান মাসের শেষ দশকের মধ্যে একটি বিজোড় রাত, শেষ সাত দিনের মধ্যে একটি বিজোড় রাত, ২১তম, ২৩তম ও ২৫তম রাতের অথবা ২৫তম, ২৭তম ও ২৯তম রাতের মধ্যে একটি।' মহানবী (সা.) মুমিনদের এই রাতে মাত্রাধিক ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন। অধিকাংশ আলেম মনে করেন যে রমজান মাসের ২৭তম রাতই শবে কদর। বাংলাদেশেও এই মত প্রচলিত। শবে কদরের রাত জেগে কেউ ইবাদত করলে তার অতীতের সমুদয় পাপ মার্জনা করা হয়।

বাংলাদেশে গভীর ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে শবে কদর পালিত হয়। এশার নামাজের সময় মুসল্লিরা মসজিদে একত্রিত হন এবং অনেকে শেষরাত পর্যন্ত নফল ইবাদত করেন। শবে কদরের পরদিন (২৭তম রমজান) বাংলাদেশে সরকারি ছুটি থাকে। রেডিও-টেলিভিশন বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে ও পত্রপত্রিকায় বিশেষ বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সারা দেশে একটি ভাবগাম্ভীর্যময় ধর্মীয় অবস্থা বিরাজ করে।

**শবে বরাত** মুসলমানদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। হিজরি সনের শাবান মাসের পঞ্চদশ রাতে এ অনুষ্ঠান পালিত হয়। 'শবে বরাত' একটি ফারসি যৌগিক শব্দ; 'শব' অর্থ রাত এবং 'বরাত' অর্থ মুক্তি, যার সম্মিলিত অর্থ দাঁড়ায় মুক্তি পাওয়ার রাত। একে আরবিতে 'লাইলাতুল বরাত' বলা হয়, যার অর্থ মুক্তির রাত। উপমহাদেশে শবে বরাত প্রধানত সৌভাগ্য রজনী হিসেবে পালিত হয়। শবে বরাত পালনের বিশেষ তাৎপর্য আছে। মুসলমানদের ধারণা, এ রাতে পরবর্তী বছরের ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়; সারা রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগি ও আল্লাহর থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করলে গুনাহ মাফ হয় বলে আশা করা হয়।

**শবে মিরাজ** শবে মিরাজ অর্থ ঊর্ধ্বগমনের রজনী। মিরাজ শব্দটি আরবি রুজ ক্রিয়াপদ থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ আরোহণ বা ওপরে ওঠা। কথিত আছে, হজরত মোহাম্মদ (সা.) আরবি রজব মাসের ২৬ তারিখ রাতে (অর্থাৎ ২৭ রজব) ঐশী বাহন বুরাকে চড়ে ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণ করেন এবং আল্লাহর কাছ থেকে দৈনিক পাঁচবার নামাজের নির্দেশ লাভ করেন। রাসুলুল্লাহর (সা.) এই ঊর্ধ্বলোক ভ্রমণের রাতকেই ইসলামি পরিভাষায় 'শবে মিরাজ' বা 'লাইলাতুল মিরাজ' বলা হয়।

**শরিয়ত** 'শরিয়ত' আরবি শব্দটি 'শার' থেকে উৎপন্ন। 'শারে'র অর্থ জলাশয়ে কিংবা কূপে যাওয়ার পথ, অনুসরণীয় স্পষ্ট পথ। পারিভাষিক অর্থে এ হলো ইসলামি আইনকানুন। পবিত্র কোরআন শরিফের পঞ্চম সুরার ৪৮ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের প্রত্যেক জাতিকে একটি শির'আ (পথ) ও একটি মিনহাজ (পদ্ধতি) প্রদান করেছি।' ৪৫তম সুরার ১৮ আয়াতে বলা হয়েছে, 'অতঃপর আমি তোমাকে দীনের শরিয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত করলাম। অতএব, তুমি তা অনুসরণ করো এবং অজ্ঞ ব্যক্তিদের খেয়ালখুশি অনুসরণ কোরো না।' তাবারির মতে, শরিয়ত বলতে ফারাইদ (দায়ভাগ), হদ্দ (শাস্তি), হুকুম (আদেশ) এবং শার বলতে সামগ্রিকভাবে মানুষের কার্যাবলি সম্পর্কে আল্লাহর অনুশাসনকে বোঝায়। 'ফিকাহ' শরিয়তের বিজ্ঞান, একে শরিয়তের সমার্থবাচক বলা যেতে পারে। শরিয়তের প্রধান উৎস পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ ও অপর দুটি উৎস হলো ইজমা ও কিয়াস। কোনো সমস্যার সমাধান যদি পবিত্র কোরআন ও হাদিসে পাওয়া না যায়, তাহলে মুসলিম সম্প্রদায়ের একত্রে মিলে বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করার প্রচেষ্টাকে ইজমা বলে। ইজমা-ই-ফাউল (কথার মাধ্যমে), ইজমা-ই-ফিল (কাজের মাধ্যমে) ও ইজমা-ই-সাকুতি (মৌনতা অবলম্বন) করে ঐকমত্যে পৌছানো যায়। কিয়াস হলো যুক্তিতর্কের সাহায্যে তুলনা করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানো। উল্লিখিত চারটি উৎসের মাধ্যমে সমাধান যদি না হয়, তাহলে ব্যক্তিগত যুক্তিতর্ক ও বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে সমস্যা-নিরসনের যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে ইজতেহাদ বলে। কিয়াস ও ইজতেহাদের মতবিরোধের ফলে সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে চারটি মজহাব বা গোষ্ঠী অর্থাৎ হানাফি, মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলির সৃষ্টি। পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে এই চার গোষ্ঠীর কোনো মতবিরোধ নেই। কিয়াস, ইজতেহাদ, ইসতেহসান ও ইসতেদলালের প্রয়োগভেদে সুন্নি সম্প্রদায় চার গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়। ইমাম আবু হানিফা কিয়াস ও ইজতেহাদকে প্রাধান্য দেন। ইমাম মালিক মাসলাহাতকে (জনহিতকর নীতি) বিশেষ গুরুত্ব দেন। ইমাম শাফেয়ি কিয়াস ও ইজতেহাদ পদ্ধতিতে বিশ্বাস করলেও হাদিসের ওপর বিশেষ জোর দেন। ইমাম হাম্বলি ইজতেহাদের গুরুত্ব দেননি, বরং তিনি হাদিসকে প্রাধান্য দেন। বাংলাদেশের আইন দ্বারা পরিবর্তন সাপেক্ষে মুসলিম পারিবারিক আইন অর্থাৎ উত্তরাধিকার, বিয়ে, বিয়ে বিচ্ছেদ, নাবালকের অভিভাবকত্ব ইত্যাদি বিষয়ে শরিয়ত অনুসরণ করা হয়।

ইসলামি অনুশাসন অনুযায়ী, সাধারণত মানুষের কর্মের ভালোমন্দ নির্ণয় করা হয় শরিয়তের মানদণ্ডে। শরিয়ত আল্লাহ এবং মানুষের বাহ্যিক সম্পর্ককে প্রধানত বিধিবদ্ধ করে, কিন্তু শরিয়তের দ্বারা অভ্যন্তরীণ অনুভূতি ও মনোভাব সব সময় জ্ঞাত হওয়া যায় না, নির্ণয় করা যায় না। সে জন্য প্রয়োজন হয় মারেফাতের। শরিয়তকে বাদ দিয়ে মারেফাতের ধারণা করা যায় না।

শরিয়ত সুফির যাত্রাপথের প্রথম ধাপ।

শরিয়তের মূলনীতিগুলো আল্লাহ তায়ালার প্রজ্ঞা ও ইচ্ছার ওপর প্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘদিনের নানা কারণ পরম্পরার ভেতর দিয়ে শরিয়তের আইনগুলো ক্রমশ বিকশিত হয়েছে। এ আইনের তাৎপর্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে আল্লাহ মানুষকে অনুমতি দিয়েছেন, সুতরাং শরিয়তের বিধানগুলো সাধারণত যুক্তিগ্রাহ্য। বিশ্বাসের সঙ্গে শরিয়তের দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে শরিয়ত প্রচলিত অর্থে একটি আইনমাত্র নয়, এটি এর অনুসারীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান বা ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে অভ্রান্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। শরিয়তের বিধানগুলো সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত: (১) ইবাদত-উপাসনা সংক্রান্ত কর্তব্য, (২) মু'আমালাত বা পারস্পরিক লেনদেন ও আচার-আচরণ এবং (৩) আদল ও উকুবাত অর্থাৎ বিচার ও দণ্ড-সম্পর্কিত বিধান। মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুত্বের দিক দিয়ে এগুলো সমপর্যায়ের বলে গণ্য। ফিকাহের কিতাবগুলোতে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

বাংলাদেশে শরিয়ত বলতে ইসলামি বিধানকে বোঝানো হয়। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি মাদ্রাসায় শরিয়ত শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুল-কলেজেও ধর্মীয় শিক্ষা তথা শরিয়ত-শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এ শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

**শস্য ও খাদ্যবৃদ্ধি উৎসব** অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের একটি বিশেষ উৎসব। বন্য গাছপালা ও পশু সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য এই উৎসব পালন করা হয়। বিশেষ করে, যেসব পশু খাদ্যশস্য ও শস্যের ওপর নির্ভরশীল। তাদের বিশ্বাস, এই উৎসব তাদের খাদ্য ও শস্যের সরবরাহের বৃদ্ধি ঘটাবে।

**শাঁখা** সামুদ্রিক শঙ্খ থেকে তৈরি এবং হিন্দুধর্মীয় বৈবাহিক রীতির একটি অলংকার। হাতের বালার মতো এই অলংকার বিবাহিত হিন্দু মহিলারা ব্যবহার করে থাকেন। বিয়ের মন্ত্র পড়ার সময় কনের পিতা কনের হাতে দুটি শাঁখা দিয়ে থাকেন, স্বামীও স্ত্রীর জন্য শাঁখা কিনে আনেন। হিন্দু রমণীরা তাঁদের স্বামীর মঙ্গলকামনায় শাঁখা যত্নসহকারে ব্যবহার করেন। কাটা বা ভাঙা শাঁখা ব্যবহার করা অমঙ্গল ও শঙ্কাজনক মানসিকতার সৃষ্টি করে। এ শাঁখা স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রতীক। সাধারণ শঙ্খে ডান থেকে বাঁয়ে গোলাকার মোড় দেখা যায়। যখন কোনো শঙ্খে বিপরীতমুখী মোড় দেখা যায়, সেটিকে বলা হয় 'দক্ষিণবার্তা' বা সৌভাগ্যবান শঙ্খ। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ শঙ্খকে পবিত্র শঙ্খ বলা হয়।

**শাক্তপীঠ** হিন্দুধর্মবিশ্বাস অনুসারে ভারত উপমহাদেশে দেবতা শিবের স্ত্রী সতীর বিভিন্ন দেহাংশ ছড়িয়ে থাকা পবিত্র স্থানগুলো। বাংলা ভাষায় একে সাধারণত বলা হয় পীঠস্থান বা 'মহাপীঠ'। 'পীঠ' শব্দের অর্থ 'বেদি' বা 'আসন', যেখানে বিষ্ণুচক্রে খণ্ডে খণ্ডে কর্তিত হওয়ার পর দেবী সতীর (দেবী দুর্গার আরেক নাম) দেহখণ্ড পৃথিবীতে পতিত হয়েছিল। মোট ৫১টি শাক্তপীঠের যথার্থ অবস্থান নিয়ে মতৈক্য নেই। মহাপীঠ নিরূপণ নামে একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে (১৬৯১-১৭২০) এসব পীঠের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে বৃহৎ বঙ্গে এবং এর পরিপার্শ্বের এলাকাগুলোতে অবস্থিত মোট ২৩টি পীঠ শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১৪টি পশ্চিমবঙ্গে এবং সাতটি বাংলাদেশে।

শাক্তপীঠের উদ্ভব প্রসঙ্গ মহাভারতের 'দক্ষযজ্ঞ' নামে একটি পুরাণ কাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে। একদিন প্রজাপতি দক্ষ পবিত্র অগ্নির যজ্ঞ করছিলেন। ওই যজ্ঞে তিনি সব দেবতাকে আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু তাঁর কন্যা সতীর স্বামী শিবকে বাদ দেন। এই ঘটনায় অপমান বোধ করে প্রতিবাদ জানাতে বিক্ষুব্ধ দেবী সতী যজ্ঞবেদিতে এসে আগুনে আত্মাহুতি দেন। প্রিয়তমা ভার্যার মৃত্যুর সংবাদ শুনে শোকার্ত দেবতা শিব দক্ষযজ্ঞে এসে সতীর মরদেহ কাঁধে তুলে নেন এবং শোকোন্মত্ত হয়ে পদাঘাতে মেদিনী প্রকম্পিত করে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকেন। ধরিত্রী এই কম্পনে ভয়াবহভাবে বিপর্যস্ত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত উন্মত্ত শিবকে থামানোর জন্য দেবতারা বিষ্ণুকে অনুরোধ জানালেন। বিষ্ণু তাঁর অস্ত্রচক্র শিবের প্রতি নিক্ষেপ করেন এবং তা শিবের কাঁধে অবস্থিত সতীর

মরদেহকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলে। এই কর্তিত দেহখণ্ডগুলোই পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর যে স্থানে সতীর দেহখণ্ড পড়েছে, সেখানেই ভক্তরা দেবীর পূজার জন্য মন্দির নির্মাণ করে বেদি স্থাপন করেছে। সময়ের বিবর্তনে, স্থানীয় লোকদের প্রচেষ্টায় এই স্থানগুলো মাতৃকা পূজার নিমিত্ত তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি পীঠ সতী-সম্পর্কিত পুরাণকাহিনির জন্মবৃত্তান্তসহ পৃথক পৃথক পীঠস্থান হিসেবে নাম পরিগ্রহ করেছে। সেগুলো দেবী ও তাঁর স্বামী দেবতার (শিব) নানা নামও গ্রহণ করেছে। দেবী সতী মূল মাতৃকাদেবী বা শক্তিদেবী দুর্গার অন্যান্য লৌকিক নামরূপের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছেন। আবার নানা অবতার মূর্তিতে দুর্গারও বিভিন্ন নাম হয়েছে। প্রতিটি পীঠ কেন একেক দেবীর নামে পরিচিত এবং কেন সেগুলো দেহবিচ্ছিন্ন সতীর নানা নামে পুনর্জন্ম গ্রহণের কাহিনিতে রূপান্তরিত হলো, তার কারণ এই লোকায়ত দেবীরূপ ও তার অবতারত্ব।

**শাবাত** হিব্রু এই শব্দটির অর্থ বিশ্রাম, সপ্তাহের শেষ দিন, যা শুক্রবারে সূর্যাস্ত থেকে শুরু হয়। ঐতিহ্যগতভাবে সেই দিন ইহুদিদের পরিচারক ও জন্তুদের বিশ্রামের দিন। এই দিনে প্রার্থনা ও অধ্যয়নে উৎসাহিত করা হয়। শাবাতে ঘরে দুটো মোমবাতি, কোনো কোনো ঘরে পরিবারে যত জন সদস্য, ঠিক ততগুলো মোমবাতি জ্বালানো হয় এবং তাদের স্বাগত জানিয়ে গান গাওয়া হয়। শাবাতকে মর্যাদাময় করার জন্য বিশেষ আহার, আহারের পাত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা হয়। দিনটি পালনের জন্য এক কাপ মদের ওপর যে প্রার্থনা করা হয়, তা কিদ্দুশ নামে অভিহিত। বাইবেলে শাবাত করুণার দিন হিসেবে বিবেচিত। কবর থেকে পুনরুত্থানের স্মৃতিস্বরূপ প্রথম যুগের খ্রিষ্টানরা সপ্তাহের প্রথম দিনকে বিশ্রাম দিবস হিসেবে পালন করত। দিনটা ছিল রোববার। গোঁড়া খ্রিষ্টানরা রোববারের কর্মবিরতি কড়াকড়িভাবে পালন করে থাকে।

**শামান** উত্তর এশীয় বা আদিবাসী মার্কিন জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আচরিত জটিল ব্রত আচার ও জাদু ইত্যাদির সাহায্যে রোগনিরাময়ে এবং ভবিষ্যদ্‌দর্শনে ও দেবতাদির সঙ্গে সংযোগ রচনায় সমর্থ বলে কথিত পুরোহিত-চিকিৎসকদের শামান বলা হয়। আমাদের দেশে যেমন ওঝা ও গুনিন।

**শায়েখ** আক্ষরিক অর্থ বয়োবৃদ্ধ। কিন্তু এর প্রায়োগিক অর্থ হচ্ছে ইসলামিক আইন ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। এই অর্থে শায়েখ একজন আলেমও বটে। কিন্তু শায়েখ হচ্ছেন সেই আলেম, যিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন এবং অন্যের আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভে সহায়তা করেন। মুসলমানদের মধ্যে সুফিদের শায়েখ বলা হয়। ভারত উপমহাদেশ এবং বাংলায় সুফিদের শায়েখ, মাখদুম, পীর ও মুর্শিদ বলা হয়। বাংলার সুলতানদের লিপিমালায় শায়েখ ও মাখদুমের মাধ্যমে সুফিদের বোঝানো হয়েছে। এ আমলের লিপিগুলো আরবি ভাষায় লেখা হতো বলে ফারসি পীর শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়নি। কিন্তু বাংলার জনসাধারণের থেকে শায়েখ অপেক্ষা পীর শব্দটি বেশি জনপ্রিয়।

**শিখণ্ডী** মহাভারতের চরিত্র। তিনি দ্রুপদরাজপুত্রের আড়ালে থেকে বাণ ছুড়ে অর্জুন ও ভীষ্মকে অন্যায়ভাবে পরাস্ত করেন।

**শিন্টো** জাপানের প্রাচীন দেশজ ধর্ম। শিন্টো শব্দটি দুটি চৈনিক অক্ষরে লেখা। অক্ষর দুটির উচ্চারণও চৈনিক উচ্চারণ। অর্থ ঈশ্বরের পথ। অক্ষর দুটির জাপানি উচ্চারণ হলো কামি (ঈশ্বর) এবং মিচি (পথ) কামি নো মিচি, অর্থ ঈশ্বরের পথ। এ ধর্মের কোনো প্রবর্তক নেই, নেই কোনো নীতিসংহিতা। এ ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য হলো প্রকৃতি, পূর্বপুরুষ ও প্রাচীন জাতীয় বীরদের পূজা। সম্রাটের দেবত্বে বিশ্বাসই ছিল এ ধর্মের মূল মতবাদ। শিন্টো ১৮৬৭ থেকে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের রাষ্ট্রধর্ম ছিল। সে সময় সরকারি সহায়তায় শিন্টো মন্দিরগুলো পরিচালিত হতো। বর্তমানে এগুলো জনসাধারণের দান করা অর্থে পরিচালিত হয়।

**শিনবুৎসু কংকোও** জাপানিদের দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ও শিন্টো ধর্মের মিশ্রণ। বিয়ে, সন্তানের জন্ম ইত্যাদিতে জাপানিরা যান শিন্টো মন্দিরে। মৃত্যুর সময় তাঁরা যান বৌদ্ধমন্দিরে মৃতের আত্মার মঙ্গল কামনা করতে। জাপানিদের ঘরে শিন্টো ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেরই বেদি পাশাপাশি রাখতে দেখা যায়।

**শিব** হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান দেবতা। ঈশ্বরের সৃজন, পালন ও সংহার—এই ত্রিশক্তি যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতারূপে পরিচিত। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন আর শিব ধ্বংস করেন। এই সৃজন, পালন ও সংহারপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই জগৎসংসার চলমান আছে।

প্রলয়ের তমোগুণে রুদ্র মূর্তিতে বিশ্বসংসার হরণ করেন। তাই তিনি 'হর'। 'মহাকাল' তাঁর নাম। তিনি বিরূপ নেত্র হেতু বিরূপাক্ষ। ত্রিনয়ন হেতু ত্রিলোচন। মৃত্যুঞ্জয়ী বলে মৃত্যুঞ্জয়। অগ্নিনেত্রে কামদাহ হেতু স্মরহর। পিনাক তাঁর ধনু। তাই তিনি পিনাকী, মস্তকে জটাজূট হেতু কপর্দী। সমুদ্রমন্থনে হলাহল পানে নীলকণ্ঠ হেতু নীলকণ্ঠ। ডমরু তাঁর প্রিয় বাদ্য, কৈলাস প্রিয় ধাম ও প্রিয় সহচর। শিব অনার্য দেবতা, অর্থাৎ আর্যদের ভারত আগমনের আগে ভারতের আদিম জনগোষ্ঠীর দেবতা ছিলেন শিব। তিনি খুব প্রভাবশালী ছিলেন, তাই আর্যসমাজে তাঁর স্থান হয়েছে। বেদে তিনি রুদ্র নামে বহুল পরিচিতি লাভ করেন।

শিবের সঙ্গে সমাজের একেবারে সাধারণ মানুষের নিবিড় সম্পর্ক দেখা যায়। তাঁর পার্ষদেরা সমাজের নিম্নশ্রেণীর প্রতিনিধি। তাঁর নিজের চলাফেরা, কাজকর্ম, এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদেও কৌলীন্যের ছাপ নেই। তাঁর পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম ও মৃগচর্মের উত্তরীয়, মাথায় জটা, গলদেশে সর্পের উপবীত এবং হাতে নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র। দারিদ্র্যের কারণে তাঁকে ভিক্ষাও করতে হয়েছে। তিনি প্রাচীন ভারতের একটি পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি অল্পতেই রুষ্ট, আবার অল্পতেই তুষ্ট। এ জন্য তাঁকে ভোলানাথও বলা হয়। তাঁর একটি শিশুসুলভ কোমল মন আছে। কারও দুঃখকষ্ট এবং আবেদনে তিনি সহজেই সাড়া দেন।

**শিবানী** দেবী আদ্যাশক্তি যখন কালিকারূপে শুম্ভ দানবকে বধ করতে যান, তখন দেবতাদের শক্তিগণও তাঁকে সাহায্য করেন। শিবশক্তি শিবানী বাহুতে সর্পবলয়, কপালে অর্ধচন্দ্র ও ত্রিশূল ধারণ করে বৃষবাহনে দেবীর সাহায্যে যাত্রা করেন।

**শিয়া** একটি মুসলিম সম্প্রদায়। তারা খেলাফতের উত্তরাধিকার নির্ধারণে হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর বংশধারাকে অনুসরণ করে। নবীর জামাতা হজরত আলী (রা.)-কে তারা প্রথম খলিফা মানে। তাদের অভিমতে নবীর মৃত্যুর পর হজরত আলী (রা.) খলিফা নির্বাচিত হতে ব্যর্থ হন এবং ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এ পদে নির্বাচিত হন। কিন্তু তৃতীয় খলিফা উসমান (রা.)-এর আত্মীয় মুয়াবিয়া (রা.) এর তীব্র বিরোধিতা করেন। হজরত আলী (রা.) ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে শাহাদাতবরণ করলে তাঁর পুত্র হজরত হাসান (রা.) খলিফা হন, কিন্তু তিনি মুয়াবিয়ার (রা.) কাছে খেলাফত ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এর অল্পকাল পরেই বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। মুয়াবিয়া (রা.)-এর মৃত্যুর পর হজরত হাসান (রা.)-এর ভাই হজরত হুসেন (রা.)-কে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করা হবে বলে আশা করা হয়েছিল, কিন্তু মুয়াবিয়ার (রা.) পুত্র ইয়াজিদ খলিফা হন। হজরত হুসেন (রা.) ইয়াজিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানে ৬১ হিজরিতে কারবালা প্রান্তরে শহীদ হন।

**শিরক ও মুশরিক** আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু বা কারও ওপর আল্লাহর ক্ষমতা আরোপ করা বা আল্লাহর শরিক করাকে আরবিতে শিরক বলে। যে শিরক করে সে মুশরিক। আরবি শিরক ও মুশরিক শব্দের বাংলা হলো যথাক্রমে অংশীবাদ ও অংশীবাদী। শিরক করা মহাপাপ। শিরক দুই প্রকার। যেমন—জালি বা প্রকাশিত। এর মধ্যে পড়ে দেব-দেবীর পূজা করা। দ্বিতীয় প্রকারের শিরক হলো খফি বা অপ্রকাশিত। যেমন—লোক দেখানো ইবাদত বা উপাসনা করা। ইবাদত শুধু আল্লাহরই উদ্দেশে না করে কেউ যদি তা মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য করতে চায়, তাহলে তা শিরকে খফি হবে। পবিত্র কোরআনের সুরা নিসার ৪৮ আয়াতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তো তাঁর অংশী করার অপরাধ ক্ষমা করেন না।'

**শির্নি/শিরনি** পীরের উদ্দেশে নিবেদিত মিষ্টান্ন বা চাল-আটা-দুধ-কলা-চিনির তৈরি খাদ্যবিশেষ। 'শিরনি' শব্দটি ফারসি। এটি 'শিন্নি' নামেও প্রচলিত।

**শিশুপাল** হিন্দুপুরাণে বর্ণিত চেদিদেশের রাজা। তিনি কৃষ্ণের বিরুদ্ধে জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন। ভীষ্ম রাজকন্যা রুক্মিণীকে বিয়ে করতে গেলে কৃষ্ণ

রুক্মিণীকে হরণ করেন। অপমানিত শিশুপাল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণের নিন্দা করেন। কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রের সাহায্যে তাঁর মাথা কেটে ফেলেন। বিষ্ণুপুরাণ মতে, শিশুপাল পূর্ব দুই জন্মে হিরণ্যকশিপু ও রাবণরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিষ্ণু ও রামের হাতে নিহত হন।

**শিশুমার** হিন্দু শাস্ত্রমতে আকাশে জলজন্তুর মতো নক্ষত্রমণ্ডল। ধ্রুব নক্ষত্র এর নিচে অবস্থিত। হিন্দুদের বিশ্বাস শিশুমারের হৃদয়ে বিষ্ণু অবস্থান করেন। রাত্রিতে এই নক্ষত্রমণ্ডলের দিকে তাকালে মানুষের সমস্ত দিনের পাপ ক্ষয় হয়।

**শিশুহত্যা** নবজাত শিশুহত্যা প্রথা। ঊনবিংশ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত বাংলার হিন্দুসমাজে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। শিশুহত্যায় পিতা-মাতা, পরিবার বা সম্প্রদায়ের সম্মতি থাকত। প্রথা হিসেবে শিশুহত্যা পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় লক্ষ করা যায়। একসময় চীন ও এস্কিমো সমাজব্যবস্থায় খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে কন্যাশিশু হত্যা করা সাধারণ ব্যাপার ছিল। কোনো কোনো প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় বিকলাঙ্গ শিশুদের এই বিশ্বাসে হত্যা করা হতো যে তারা অপদেবতাদের দ্বারা বিকৃত হয়েছে। রোমান আইনে প্যাটরিয়া পোটেসটাস (Patria Potestas) পিতাকে তার সন্তান উৎসর্গ করার বা তাকে হত্যা করার অধিকার প্রদান করে। ইসলাম, খ্রিষ্ট এবং ইহুদি ধর্ম এই অমানবিক প্রথা প্রত্যাখ্যান করে।

হিন্দুসমাজে ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে এই রীতির বিরুদ্ধে তীব্র সামাজিক সমালোচনা শুরু হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় বারানসি, কাথিয়াওয়ার, কচ্ছ, জব্বলপুর এবং সাগরে প্রধানত রাজপুতদের মধ্যে এই শিশুহত্যা সীমাবদ্ধ ছিল। পাঞ্জাবে শিশুহত্যা অত্যন্ত সাধারণ বিষয় ছিল। বাংলা ছিল শিশুহত্যা এলাকার প্রান্তিক সীমায়। পুরুষ শিশুরা উৎসর্গ থেকে একেবারে রেহাই না পেলেও, প্রথানুসারে নারী শিশুরাই শুধু এর শিকার ছিল।

পবিত্র কোরআনের সুরা বনি ইসরাইল-এর ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্যভয়ে হত্যা কোরো না। ওদের ও তোমাদের আমিই জীবিকা দিয়ে থাকি। নিশ্চয় ওদের হত্যা করা মহাপাপ।' সুরা আনআম-এর ১৩৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর এইভাবে বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে তাদের দেবতারা সন্তানহত্যাকে শোভন করেছে, তাদের ধ্বংস করার জন্য ও তাদের ধর্মবিশ্বাসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা এটা করত না। তাই তাদের মিথ্যা নিয়ে তাদের থাকতে দাও।' সুরা আনআম-এর ১৪০ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত, যারা নির্বুদ্ধিতার জন্য ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে এবং আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বানানোর জন্য আল্লাহ যে জীবিকা দিয়েছেন, তা হারাম করে। অবশ্যই তারা বিপথগামী ও তারা সৎপথও পায়নি।' একই সুরার ১৫১ আয়াতে বলা হয়েছে, '...দারিদ্র্যের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদের ও তাদের আহার দিয়ে থাকি।'

**শিস** হিব্রু ও ইংরেজিতে শব্দটির এ রকমের উচ্চারণ। শিস হজরত আদম (আ.) ও বিবি হাওয়ার (আ.) তৃতীয় পুত্র। হাবিল হত্যার পাঁচ বছর পর তার জন্ম হয়। আদমের অন্য দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের সব উত্তরাধিকারী নুহের প্লাবনে প্রাণ হারান। মানুষ জাতি প্রকৃতপক্ষে শিসের বংশধর। কথিত আছে, তিনি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মক্কায় বসবাস করেন এবং হজের অনুষ্ঠানাদি পালন করেন।

**শীতলা** লৌকিক দেবী। বসন্ত রোগের দেবী। অনেকে মনে করেন, অথর্ববেদে তক্‌মন শব্দের অর্থ শীতলা। কেউ কেউ বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখিত 'অপদেবী'কে শীতলার সঙ্গে এক করে ফেলেন। স্বপুরাণ ও পিচ্ছিলাতন্ত্রে শীতলার বিবরণ আছে। কাশ্মীর দশাশ্বধাম ঘটে শীতলাদেবীর একটি মন্দির আছে। বৌদ্ধধর্মের যরিতী দেবী শীতলা উভয়েই ব্রণ্যনাশিনী দেবী। শীতলার পুরোহিতেরা অনেকাংশে ডোম সম্প্রাদায়ের। হিন্দুদের শীতলার জন্য ভিন্ন পুরোহিত নিয়োগ করা হয়। বসন্ত রোগের দেবী হিসেবে তিনি একসময় গ্রামবাংলায় ব্যাপকভাবে পূজিত হতেন। তখন মানুষের ধারণা ছিল, শীতলার পূজা দিলে পূজার ফলে রোগাক্রমণ থেমে যাবে। এখন শীতলাপূজার সেই গুরুত্ব আর নেই। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন 'শীতলা

ষষ্ঠী'তে শীতলাদেবীর পূজা হয়ে থাকে। শীতল বা বাসি নৈবেদ্যাদি দিয়ে শীতলার পূজা হয়। স্কন্দপুরাণের পিচ্ছিলাতন্ত্রে শীতলা শ্বেতবর্ণা, গর্দভবাহিনী, দুই হস্তে পূর্ণকুম্ভ ও সম্মার্জনী ধারিণী হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন। সম্মার্জনীর দ্বারা অমৃতময় জল ছিটিয়ে তিনি রোগতাপ দূর করে শান্তি স্থাপন করেন বলে বিশ্বাস।

**শীল** বৌদ্ধশাস্ত্রে শীলের অর্থ অনুশীলন বা সমাধান। শীল হলো সব রকম শিষ্টাচারের বিধান, সাধারণভাবে শীল শব্দের অর্থ চরিত্র। যেসব নিয়ম পালন করলে চরিত্র শুদ্ধ ও দৃঢ় হয়, তাকেই বলে শীল। বৌদ্ধ মতানুসারে যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ মানুষকে নির্বাণের দিকে নিয়ে যায়, সেগুলোর মধ্যে সম্যক বাক, কর্ম ও জীবিকা—এই তিনটিকেও শীল বলে। প্রকৃতপক্ষে প্রাণীহত্যা, মিথ্যাভাষণ ও হিংসা থেকে বিরত এবং ব্রহ্মচর্য পালন, সত্যভাষণ, পবিত্র জীবনযাপন ইত্যাদি সদাচার হলো শীল। কায়িক, মানসিক ও বাচিক কর্মে সংযম ও শৃঙ্খলা আনয়ন এবং মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনই এর মূল লক্ষ্য। শীল সকল কুশলকর্মের আধারস্বরূপ এবং এর ফলে মুক্তিলাভের পথ প্রশস্ত হয়। শুধু বৌদ্ধধর্মে নয়, প্রতিটি ধর্মেই শীল বা সুনীতির প্রশংসা করা হয়েছে। শীল মোট ১০টি নিষিদ্ধ বা পাপকর্ম: প্রাণীহত্যা, পরধন চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা কথন, মাদকদ্রব্য সেবন, বিকেলে ভোজন, নাচ-গান-বাজনার উৎসব উপভোগ, শরীরের শোভাবর্ধনকারী মালা বা সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহার, উচ্চাসন ও উচ্চশয্যা, মহাসন ও মহাশয্যায় উপবেশন ও শয়ন এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ।

দশ শীলের মধ্যে প্রথম পাঁচটি বৌদ্ধ গৃহীদের প্রতিদিন পালন করতে হয়, যা পঞ্চশীল নামে পরিচিত। পঞ্চশীল তিন উপায়ে সম্পাদিত হতে পারে—নিজে করে, অন্যকে দিয়ে করানো বা করার জন্য অনুমতি দেওয়া। তিনটি উপায়ের কোনো একটি দ্বারা পাঁচটি পাপকর্ম সম্পাদিত না করাই পঞ্চশীল পালনের মূল কথা। এরা এমনভাবে সম্পৃক্ত যে, একটি পালন করলে অন্যগুলো পালনের ইচ্ছা হয়। একটি ভঙ্গ করলেও অন্য চারটি গুণ অটুট থাকে। নৈতিক চরিত্র গঠন ছাড়াও পঞ্চশীল পালন ভবিষ্যৎ কুশলের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় বলে বিশ্বাস। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ১০টি শীল সব সময় পালন করতে হয়।

**শীলভদ্র** সপ্তম শতকের বৌদ্ধ পণ্ডিত। সমতটের এক ব্রাহ্মণ রাজার পুত্র, যিনি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে শুধু রাজ্যত্যাগ নয়, দেশও ত্যাগ করেন। নানা স্থানে ভ্রমণের ভেতর দিয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। বসুবন্ধুর অনুগামী শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ধর্মপালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হর্ষবর্ধনের সময় শীলভদ্র নালন্দার মহাচার্য হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। নবদ্বীপ বা বিক্রমপুরস্থ রামপাল তাঁর জন্মস্থান বলে অনুমান করা হয়। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়ে তিনি 'দণ্ডদেব' নামে আখ্যাত হন। মাত্র ৩০ বছর বয়সে তিনি দাক্ষিণাত্যের জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে মগধরাজ শীলভদ্রকে যে পারিতোষিক দান করেন, তা দিয়ে তিনি একটি বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

শীলভদ্র বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের পাশাপাশি বেদ, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নালন্দা মহাবিহারের প্রধান আচার্য ও সর্বাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। সংঘবাসী তাঁকে 'সদ্ধর্মনিধি' উপাধিতে ভূষিত করে। ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে নালন্দায় চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁর কাছে যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অপর এক চৈনিক পরিব্রাজক হুই লি বলেন, শীলভদ্র সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন। তিব্বতের তেঙ্গুরে তাঁর *আর্যবুদ্ধভূমিব্যাখ্যান* গ্রন্থের তিব্বতি অনুবাদ সংরক্ষিত আছে।

**শীলাদেবীর ঘাট** কথিত ঘাটটি বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের করতোয়া নদীসংলগ্ন এলাকায়। মহাস্থানগড়স্থ বৈরাগীর ভিটার বিপরীত দিকে এর অবস্থান। জনশ্রুতি এবং স্থানীয় কিংবদন্তি অনুযায়ী শীলাদেবী ছিলেন মহাস্থানগড়ের শেষ হিন্দু রাজা পরশুরামের কন্যা বা ভগ্নি। মুসলিম সাধক শাহ সুলতান বলখি মাহিসওয়ারের হাতে রাজা পরশুরাম পরাজিত হলে শীলাদেবী করতোয়ার এই জায়গায় জলে ডুবে আত্মাহুতি দেন। এই স্থানটি তাই শীলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত।

স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় এখানে তাদের বার্ষিক পৌষ-নারায়ণী স্নান সমাপন করে থাকে।

**শূদ্র** হিন্দুদের চতুর্বর্ণের শেষ বর্ণ। বেদে আছে, প্রজাপতির পাদদ্বয় থেকে শূদ্রের উৎপত্তি। উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণশ্রেণীকে পরিচর্যা করা তাদের কর্তব্য। বাংলাদেশে হিন্দুদের মধ্যে এদের সংখ্যাই বেশি। কামার, ছুতার, চিত্রকর, বারোই, নাপিত, ডোম, যুগী, কাপালী, তাঁতি, বাগদি, চণ্ডাল প্রভৃতি বৃত্তি ও পেশার শ্রমজীবী মানুষ শূদ্র শ্রেণীভুক্ত। অতীতে এদের বেশির ভাগই কৃষিকাজ ও অন্যান্য গার্হস্থ্য পেশায় নিয়োজিত থাকত। বর্তমানে শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যে এই সম্প্রদায়ের লোকজনের কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।

**শূন্যপুরাণ** ধর্মপূজার শাস্ত্রগ্রন্থ। রামাই পণ্ডিত কর্তৃক এটি ত্রয়োদশ শতকে রচিত বলে অনুমান করা হয়। 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামে *শূন্যপুরাণ*-এর একটি অংশ আছে, যাতে মুসলিম পীর-গাজি কর্তৃক ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কবল থেকে সদ্‌ধর্মী তথা বৌদ্ধদের রক্ষা করার বিবরণ আছে। অনেকের মতে, 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' অংশটি হিন্দু-মুসলমানের ধর্মসমন্বয়ের চেতনা থেকে পরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। মূল গ্রন্থে ধর্মপূজার যে বিবরণ আছে, তাতে বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদ ও হিন্দু লোকধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে। বঙ্গে পালদের পতন ও সেনদের আবির্ভাবে বৌদ্ধমত ও ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের যুগসন্ধিক্ষণের ধর্মীয় চেতনা থেকে ধর্মপূজার উদ্ভব হয়। রামাই পণ্ডিত একে সংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে রচিত *শূন্যপুরাণ* একটি চম্পূকাব্য। প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা আছে। ধর্মদেবতা নিরঞ্জনের যে কল্পনা করা হয়েছে তা বৌদ্ধদের শূন্যবাদের অনুরূপ। সেতাই, নীলাই, কংসাই, রামাই ও গোসাঁই—এই পঞ্চপণ্ডিত পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের প্রচ্ছন্ন রূপ। পরের ৪৬টি অধ্যায়ে ধর্মপূজার রীতি-পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে পশুবলি নিষিদ্ধ হলেও 'দেবীর মনঞি' অধ্যায়ে হিন্দুদের অনুরূপ পশুবলির কথা আছে। শেষের দুটি অধ্যায়ে নাথদেবতার উল্লেখ আছে। নাথধর্ম ও ধর্মপূজা দুটি ভিন্ন ধর্ম। ধর্মপূজা পশ্চিমবঙ্গে এবং নাথধর্ম উত্তরবঙ্গে প্রচলিত।

**শূলপাণি** নব্যস্মৃতির প্রবর্তক। জন্ম পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে। শূলপাণি (আনু. ১৩৭৫-১৪৬০) তাঁর গ্রন্থের ভণিতায় নিজেকে 'সাহুড়িয়ান' বলে পরিচয় দিয়েছেন। শব্দটি সম্ভবত বঙ্গীয় রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের একটি শাখাকে বোঝায়। শ্রাদ্ধ, একাদশী, বৈবাহিক সম্বন্ধ, ব্রত, তিথি, প্রায়শ্চিত্ত, দুর্গোৎসব, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, সংক্রান্তি, আয়ুর্বেদ ও দত্তক বিষয়ে শূলপাণি ১৫টির মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির দীপকলিকা নামক টীকা আয়ুর্বেদশাস্ত্রের একটি মূল্যবান গ্রন্থ। গৌড় ও মিথিলার পণ্ডিতমণ্ডলীতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ছিলেন তাঁর দৌহিত্র।

**শৃঙ্গ দানব** (Unicorn) একটি কিংবদন্তির প্রাণী, দেখতে অনেকটা শ্বেতহস্তীর মতো এবং মাথায় দুই থেকে তিন ফুট লম্বা একটি শিং আছে। কোনো সতী নারীই কেবল একে বন্দী করতে পারত।

**শেষ কৃত্যাচার** রোমান ক্যাথলিক ও অরথোডক্স খ্রিষ্টীয় ধর্মসংঘের অন্তর্গত কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে পুরোহিত কর্তৃক সম্পাদিত শেষ কৃত্যাচার, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Last Sacrament।

**শোয়াইব** হুদ, সালেহ ও নুহ নবীদের পর তিনি মাদিয়ানবাসীর মধ্যে আবির্ভূত হন। তাঁকে অরণ্যবাসীও বলা হতো। পবিত্র কোরআনে (২৮:২৩-২৮) হজরত মুসা (আ.)-এর শ্বশুর হিসেবে মাদিয়ানবাসী যে বৃদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অনেকের মতে, তিনি ছিলেন শোয়াইব। তাঁর গোত্রের লোকের সমর্থনের কারণে বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি। আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার ছাড়াও তিনি তাঁর দেশবাসীকে সততার সঙ্গে ওজন ও পরিমাপ দেওয়া এবং অরাজকতা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। এক মহানাদের পর শোয়াইব ও তাঁর অনুসারীরা ছাড়া সকলেই মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে।

**শ্রাদ্ধ** হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী পিতৃপুরুষের উদ্দেশে দান, ধ্যান ও অতিথিভোজন অনুষ্ঠান। সাধারণত মৃত ব্যক্তির সন্তান কিংবা আত্মীয়স্বজন এ অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। অবশ্য কোনো ব্যক্তি নিজেও মৃত্যুর আগে এ কাজ করে যেতে পারেন।

শ্রাদ্ধ প্রধানত তিন প্রকার: আদ্যশ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িক বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ। আদ্যশ্রাদ্ধ অশৌচান্তে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে করণীয়। বর্ণভেদে ব্যক্তির মৃত্যুদিবসের ১১, ১৫ অথবা ৩০ দিন পরে এটি অনুষ্ঠিত হয়। মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকজন ওই সময় ফলমূল, নিরামিষ এবং লবণ ছাড়া আতপ চালের ভাত খায়। শ্রাদ্ধের আগের দিন মৃত ব্যক্তির পুত্রেরা মাথার চুল ফেলে দেয় এবং শাস্ত্রীয় বিধিগুলো পালন করে। শ্রাদ্ধের দিন সামর্থ্য অনুযায়ী আত্মীয়স্বজন-পাড়াপ্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়স্বজনকে নানারকম দানধ্যানও করা হয়।

উপনয়ন, বিয়ে ইত্যাদি শুভকাজের আগে পিতৃপুরুষের আশীর্বাদ কামনায় যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তার নাম আভ্যুদয়িক বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। আর সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ মৃত্যুর এক বছর পরে করা হয়। এ তিনটি ছাড়া আরও কয়েক ধরনের শ্রাদ্ধ আছে।

**শ্রীকৃষ্ণকীর্তন** বৈষ্ণব কাব্য। রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকের বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের পরেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থান। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ খ্রি.) বসন্তরঞ্জন রায় বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের কাঁকিল্যা গ্রামনিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এর পুঁথি আবিষ্কার করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আসলে একটি গীতি-আলেখ্য। এর বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা। মোট ১৩ খণ্ডে ৪১৮টি পদে এটি বিন্যস্ত। খণ্ডগুলো হলো: জন্মখণ্ড, তাম্বুল খণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, কালীয়দমন খণ্ড, যমুনা খণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও বিরহখণ্ড। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল কাহিনি ভাগবত থেকে নেওয়া হলেও এতে বিভিন্ন পুরাণ এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাব আছে। কাব্যটি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। এতে শৃঙ্গাররসপ্রধান এবং ঝুমুর গানের লক্ষণাক্রান্ত।

**শ্রীচৈতন্য** সনাতন হিন্দুধর্ম সংস্কারক শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচী দেবী। তাঁদের আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্ট জেলায়।

শ্রীচৈতন্যের ডাকনাম ছিল নিমাই। ভালো নাম বিশ্বম্ভর। তাঁর গায়ের রং ছিল ফরসা। গৌরবর্ণ দেহের জন্য লোকে তাঁকে গৌরাঙ্গ বলে ডাকত। তিনি যখন গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন তাঁর নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য।

তিনি নবদ্বীপের গঙ্গাধার পণ্ডিতের টোলে লেখাপড়া শুরু করেন। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন মেধাবী।

১৫ বছর বয়সে তিনি বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিয়ে করেন। তারপর তিনি তৎকালীন পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে আসেন। প্রথম স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর পর তিনি সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করেন। তার পরও সংসারে তাঁর মন বসে না। মানুষের দুঃখকষ্ট, ধর্মের নামে অনাচার এবং জাতিভেদ ও বর্ণভেদ প্রথা থেকে তিনি মুক্তির পথ খুঁজতে থাকেন। এ সময়ে তিনি গয়া যান এবং কৃষ্ণভক্ত মাধবেন্দ্র পুরীর শিক্ষক ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা নেন। পরে কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসের দীক্ষা নিয়ে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যান।

হিন্দুধর্মের জটিল ও কঠিন নিয়মকে তিনি সহজ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষা হলো: ঈশ্বরকে ভালোবাসো এবং তাঁর নামকীর্তন করো; ভুলে যাও সব ভেদাভেদ। তাঁর কাছে ধর্ম হলো প্রেম ও ভক্তির ধর্ম। তাঁর প্রচারিত ধর্মকে বলা হয় 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম'।

সন্ন্যাস নিয়ে শ্রীচৈতন্য সংসার ছেড়ে জীবের কল্যাণের জন্য, উদ্ধারের জন্য বেরিয়ে পড়েন। ওড়িশার নীলাচল থেকে তিনি ধর্মপ্রচার শুরু করেন। দক্ষিণ ভারতের অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেছিলেন তিনি। রাজা রামানন্দ রায়, রাজা প্রতাপরুদ্র, সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য, প্রবীণ অদ্বৈত আচার্য, রাজকর্মচারী রূপ ও সনাতন, হরিদাস প্রমুখ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর প্রভাবে হিন্দুধর্ম পেয়েছিল এক অনাড়ম্বর ও ভক্তিভিত্তিক পথ এবং সত্যের সন্ধান। তাঁর প্রভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য লাভ করেছিল নতুন বিষয়, ভাব ও গতি।

তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৫৩৩ সালের ৬ জুন।

**শ্রুতি** আক্ষরিক অর্থে শ্রুতি অর্থ যা শ্রবণ করা হয়েছিল। শ্রুতির অপর নাম বেদ। অতি প্রাচীনকালে দেবতারা প্রত্যক্ষভাবে যা বলেছিলেন এবং মুনিরা যা শ্রবণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে যা সংকলিত হয়, তা-ই বেদ। বেদ চার ভাগে বিভক্ত। যথা—ঋক্‌, যজু, সাম ও অথর্ব। এই চার বেদকে একত্রে শ্রুতি বলা হয়। হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি বেদ এবং বেদকে হিন্দু আইনের মূল উৎস হিসেবে ধরা হয়।

**শ্যামাসংগীত** হিন্দুদেবী শ্যামা বা শক্তির উদ্দেশে রচিত এক ধরনের ভক্তিগীতি। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি শাক্তধর্মের উদ্ভব ঘটে এবং শাক্তগীতি চর্চার একটি ধারা প্রচলিত হয়। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন সেই ধারায় প্রাণ সঞ্চার করে বাংলা গানের জগতে শাক্তপদাবলি বা শ্যামাসংগীত নামে একটি বিশেষ সংগীতধারা প্রতিষ্ঠিত করেন। রামপ্রসাদ শক্তিসাধনাকে নীরস শাস্ত্রাচার ও তান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করে একটি সহজ আবেদনপূর্ণ সাংগীতিক অভিব্যক্তি দান করেন। কালীমূর্তিকে ঘিরে বীভৎস, কদর্য ও বিকৃত শক্তিসাধনার যে অশোভন সংস্কার সমাজে প্রচলিত ছিল, তা পরিহার করে রামপ্রসাদ মা ও সন্তানের মধ্যে বাৎসল্য ও ভক্তির যে শাশ্বত সম্পর্ক, তারই সাংগীতিক রূপ দেন। বাণী, সুর ও গায়নভঙ্গিতে তিনি শ্যামাসংগীতে এমন একটি ধারার সৃষ্টি করেন, যা এক স্বতন্ত্র পরিচিতি লাভ করে এবং তাঁর গানগুলো রামপ্রসাদী গান হিসেবে খ্যাত হয়। নজরুল ইসলাম বহু শ্যামাসংগীত রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত সেই গান 'কালো মায়ের পায়ের তলায় দেখে যা তোরা আলোর নাচন'।

## স

**সংস্কার আন্দোলন** অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় চিন্তাধারায় পাশ্চাত্য প্রভাব পড়ে এবং উনবিংশ শতকে তা ধর্মীয় সংস্কারকে ত্বরান্বিত করে। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এই সংস্কার আন্দোলনের প্রধান পুরুষ। তখন সংস্কারের ফলে একদিকে যেমন ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ও আধ্যাত্মিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্যদিকে তেমনি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে আমূল পরিবর্তন ঘটে। তখনকার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সংস্কার হলো সতীদাহ প্রথা বিলোপ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ রোধ ইত্যাদি। ইসলাম ধর্মেও সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব পড়ে, যা উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ওয়াহাবি আন্দোলনের জন্ম দেয়। ওয়াহাবি আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম ধর্মের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের লক্ষ্যে পরিচালিত হলেও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবেও পরিচিতি লাভ করে। এ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে আলিগড় আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব ঘটে। তিনি কেবল যুক্তিবাদের সঙ্গে পূর্ববর্তী সময়কার আবেগ ও আচারনির্ভর গোঁড়া ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতারই সমন্বয় সাধন করেননি, বরং আধ্যাত্মিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আপাতবিরোধী ধর্মগুলোর মধ্যেও সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরু-প্রচারিত সর্বজনীন মতবাদকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দেন। তিনি বেদান্ত দর্শনকে সর্বসাধারণের জন্য সহজলভ্য ও উন্মুক্ত করেন এবং তাঁর ধর্মগুরুর শিক্ষাকে একটি নির্দিষ্ট ধারায় প্রচারের জন্য বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ মিশন গড়ে তোলেন। রামকৃষ্ণের মতানুসারে প্রতিটি ধর্মেই মোক্ষলাভের নিজস্ব উপায় আছে এবং হিন্দুধর্মের সঙ্গে অন্য কোনো ধর্মের অন্তর্নিহিত কোনো বিরোধ নেই। হিন্দুধর্ম ভারতবর্ষের বিভিন্নমুখী কৃষ্টি ও সভ্যতার একটি অপূর্ব সমন্বয়। আস্তিক্যবাদে বিশ্বাস এবং উপনিষদ ও শঙ্করাচার্যের দর্শন সম্মিলিতভাবে একজন হিন্দুকে বিমূর্ত জ্ঞানলাভে সহায়তা করে। শুধু গৌতম বুদ্ধ ও চৈতন্যদেব নন, যিশুখ্রিষ্ট, হজরত মোহাম্মদ (সা.), জরথুস্ত্র এবং অন্যান্য ধর্মের প্রবর্তকগণও হিন্দুধর্মে সমভাবে সম্মানিত।

**সংস্কৃত** ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষা। প্রায় পাঁচ হাজার বছর যাবৎ এ ভাষার চর্চা অব্যাহত রয়েছে। পর্যন্ত অর্থাৎ ঋগ্‌বেদে এ ভাষার

প্রাচীন রূপটি পরিদৃষ্ট হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ ঋগ্‌বেদ থেকে উপনিষদের কাল পর্যন্ত এ ভাষা বৈদিক ভাষা নামে পরিচিত। প্রাচীনকালের সাধারণ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল তাকে কেবল 'ভাষা' বলা হতো। পরে সংস্কারের মাধ্যমে গৃহীত হওয়ায় এর নাম হয় 'সংস্কৃত' (সম্‌-কৃ+ক্ত)।

**সগোত্র জ্ঞাতি** (Agnate) সগোত্র জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে বোঝাতে পদটি ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে কৌম বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে আপন জ্ঞাতিকে বোঝায়। রোমান আইনে এর অর্থ জ্ঞাতিগোষ্ঠী। অভিন্ন পূর্বপুরুষ থেকে আগত স্ত্রীপুরুষ, সন্তানসন্ততি এবং তাদের বংশধরেরা একে অপরের এগনেট বলে বিবেচিত। মর্গান তাঁর *Ancient Society*-তে উত্তরাধিকারের তিনটি প্রধান পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন; যথা ক. মৃতের সম্পত্তি কৌমের সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত হয়, খ. মৃতের সম্পত্তি আরও নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বণ্টিত হয়, গ. মৃতের সম্পত্তি সন্তানসন্ততিদের মধ্যে বণ্টিত হয়ে থাকে। সমাজের ক্রমবিকাশের ধারায় এভাবে মৃতের সম্পত্তি কৌম সদস্য থেকে সন্তানের মধ্যে বণ্টিত হয়ে থাকে।

**সঙ্গীতি** বুদ্ধবাণী সংগ্রহ, সংরক্ষণ, আবৃত্তি ও ত্রিপিটক সংকলনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ সম্মেলন, যা মহাসঙ্গীতি নামেও পরিচিত। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরপর মহাকাশ্যপ স্থবিরের সভাপতিত্বে এবং রাজা অজাতশত্রুর সহযোগিতায় রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এতে ধর্ম ও বিনয়-সম্পর্কিত বুদ্ধবাণী সংগৃহীত হয়। এর ১০০ বছর পর বৈশালীর বালুকারামে রাজা কালাশোকের রাজত্বকালে দ্বিতীয় ধর্মসম্মেলন আহ্বান করা হয়। এতে বিনয়বহির্ভূত দশবস্তু আলোচনা শেষে বুদ্ধবাণী সঠিকভাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়। সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মৌদগলী-পুত্রতিষ্য স্থবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তৃতীয় মহাসঙ্গীতিতে বৌদ্ধসংঘের বিরোধ নিষ্পত্তি হয় এবং ত্রিপিটক পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। চতুর্থ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় সম্রাট কনিষ্কের আনুকূল্যে জলন্ধরে। বসুমিত্র ও অশ্বঘোষ যথাক্রমে সভাপতি ও সহসভাপতির পদ অলংকৃত করেন। এতে *ত্রিপিটক*-এর *মহাবিভাষা শাস্ত্র* পালির পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। শ্রীলঙ্কা, বার্মা ও থাইল্যান্ডে কয়েকটি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়।

**সঞ্জয় মহাভারত** সপ্তদশ শতকে সঞ্জয় রচিত বাংলা মহাভারত। মূল মহাভারতের আঠারোটি পর্বসহ এতে তিনটি উপপর্ব রয়েছে; 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' এরূপ একটি উপপর্ব। সঞ্জয় এ উপাখ্যানটি নিয়েছেন রামদাস নামক জনৈক গায়েন কবির কাছ থেকে। কাব্যমধ্যে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের প্রতিফলন ঘটেছে। সঞ্জয় চন্দ্রবংশের পরিচয় দানের মাধ্যমে কাব্য আরম্ভ এবং যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের মধ্য দিয়ে শেষ করেছেন। কাহিনি-পরিকল্পনা, উপমা-অলংকারের কারণে *সঞ্জয় মহাভারত* মধ্যযুগে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। কাব্যটি রচনায় কবীন্দ্র মহাভারতের প্রভাব রয়েছে। মহাভারত হিন্দুদের কাছে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। কবীন্দ্র মহাভারতে মুসলমান শাসক পরাগল খানের নাম আছে। একটি মতবাদ প্রচলিত আছে যে গোঁড়া ব্রাহ্মণ সঞ্জয় কবীন্দ্রের কাব্য থেকে মুসলমান শাসকের নাম বর্জন করে ভণিতায় নিজের নাম সংযোজন করেন এবং কিছু কিছু বিষয় নতুন যোগ করেন।

**সতীদাহ প্রথা** স্বামীর শব দাহের সঙ্গে বিধবা স্ত্রীকে জীবন্ত দাহ করার হিন্দুধর্মীয় একটি অধুনালুপ্ত প্রথা। সংস্কৃত 'সতী' শব্দটি আক্ষরিক অর্থে এমন সতীসাধ্বী রমণীকে বোঝায়, যিনি তাঁর স্বামীর প্রতি চূড়ান্ত সততা প্রদর্শন করেন এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনের প্রতিও সত্যনিষ্ঠ থাকেন। একটি আচার হিসেবে সতীদাহের অর্থ হলো মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সহমরণের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা এবং ওই অনুষ্ঠানে তূরীবাদক জনতার মাঝে স্বামীর শেষকৃত্যের চিতায় আরোহণ করা। কবে এবং কীভাবে এ ধরনের আচার ধর্মীয় প্রথারূপে গড়ে উঠেছে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। গ্রিক লেখক ডিওডোরাস (আনু. ৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) এক সতীদাহের ঘটনার বর্ণনা দেন। এই বর্ণনার সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত সতীদাহ ব্যবস্থার মিল রয়েছে। অতীতে বিশ্বের বহু সমাজে মানুষের আত্মাহুতি প্রথার অস্তিত্ব ছিল। রাজপুতরা খুব ঘটা

করে এই অনুষ্ঠানটি পালন করত। তুর্কি ও মোগল যুগে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা সফল হয়নি। কলকাতায় ১৮১৫ সালে ২৫৩, ১৮১৬ সালে ২৯৮, ১৮১৭ সালে ৪৪২ এবং ১৮১৮ সালে ৫৪৪টি সতীদাহের ঘটনা ঘটে। রামমোহন রায় ও অন্যদের সুপারিশে ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর লর্ড বেন্টিক এই প্রথার বিলোপ সাধন করেন।

**সত্যধর্ম** হিন্দুদের একটি সাধন পন্থা। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালের বিভাগকে অতিক্রম করে যার স্থিতি, যে ধর্ম সত্যস্বরূপ, পরম পিতার একমাত্র অভিপ্রেত এবং যে ধর্ম অসৎকে সৎ করে, তাকেই বলে সত্যধর্ম। পরম পিতা ও জীবাত্মার মুক্তির উপায় এ ধর্মের প্রধান আলোচ্য বিষয়। মানুষ নিজের কর্মানুসারে আত্মপ্রসাদ বা আত্মগ্লানি ভোগ করে। দেহত্যাগের পর আত্মা পরলোকে অবস্থান করে। পরলোকগত আত্মাসমূহের কয়েকটি পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, আর অবশিষ্টগুলো পরলোকেই অবস্থান করে। সত্যধর্ম মতে, সাকার উপাসনা নেই।

সত্যধর্ম হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করে না। এখানে স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে সবাই পরম পিতার সন্তানরূপে পরস্পর সহোদর-সহোদরা। এ ধর্মে নির্বাণ প্রাপ্তির কথা নেই। পরমেশ্বর অনন্ত ও গুণময়। সাধনার মাধ্যমে জীব যত উন্নত স্তরেই উঠুক না কেন সে পরম পিতার সমান হয় না বা নিজেকে পরমাত্মাতুল্য বোধ করতে পারে না। ফলে বেদান্ত ঘোষিত 'তত্ত্বমসি', 'সোহম্' তত্ত্ব সত্যধর্ম অনুমোদন করে না। পরমেশ্বর অনন্ত গুণের অধিকারী। তাঁর এক বা একাধিক গুণে গুণান্বিত হয়ে সাধক কখনো অনন্ত পরমেশ্বর হতে পারে না। জগৎ ও জীবনের কল্যাণের জন্য সাধককে প্রীতি, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি গুণ অর্জনের সাধনা করতে হয়। আর এ জন্য ঈশ্বরের উপাসনা এবং তাঁর গুণের অনুশীলন সাধনার অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত।

উপাস্যকে আত্মার আভরণ করাকে উপাসনা বলে। পরম পিতার গুণকীর্তন ও স্বীয় পাপ সম্পর্কে উক্তি—উপাসনাকে এ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। উপাস্যের গুণকীর্তন এবং তাঁর কাছে বা তাঁর উদ্দেশে স্বীয় পাপের উল্লেখ করাই উপাসনা। পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করাও এ ধর্মের অঙ্গ। প্রার্থনা তিন ধরনের: পাপ থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা, গুণের নিমিত্ত প্রার্থনা এবং ভিক্ষা। দিনে তিনবার উপাসনা করার বিধান আছে।

**সত্যনারায়ণের পাঁচালী** মধ্যযুগীয় পীর সাহিত্যের একখানি গ্রন্থ। সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের কাহিনি এতে বর্ণিত হয়েছে। বঙ্গে ইসলামের আবির্ভাবের পর লৌকিক দেব-দেবীর অনুরূপ লৌকিক পীর-পীরানির প্রতি এক শ্রেণীর মানুষের বিশ্বাস জন্মে। সত্যপীর, সত্যনারায়ণ, মানিকপীর, গাজিপীর প্রভৃতির উৎপত্তি এভাবেই। সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর অভিন্ন। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ভেদে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের জন্মকথা, উপাখ্যান, মাহাত্ম্য ও মানত প্রায় অভিন্ন। ষোড়শ শতকের কবিচন্দ্র, কবি কঙ্ক, শেখ ফয়জুল্লাহ, শাহ গরিবুল্লাহকে এই পাঁচালী কাব্যের আদি কবি বলে মনে করা হয়। পরবর্তী কবিরা হচ্ছেন: কবিবল্লভ, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, দ্বিজ বিশ্বেশ্বর, ফকির চাঁদ, কবি শঙ্কর, দেবকীনন্দন, শিবচন্দ্র সেন, ভারতচন্দ্র প্রমুখ। কবিবল্লভ প্রণীত ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত সত্যনারায়ণের পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

**সত্যপীর** লৌকিক দেবতা। হিন্দু লেখকেরা পীরের পরিবর্তে 'নারায়ণ' শব্দ ব্যবহার করেন, যদিও মুসলমানদের 'সত্যপীর', আর হিন্দুদের 'সত্যনারায়ণ'-এর মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। সত্যপীরের উপাসনা বিংশ শতকের প্রথম দিকেও প্রচলিত ছিল, বিশেষ করে বাংলার উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে। কাঠের তক্তা দিয়ে সত্যপীরের বেদি তৈরি করা হতো এবং প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হতো মিষ্টি, দুধ, চিনি, পান-সুপারি ইত্যাদি। সাহিত্যে দুটি উপাখ্যান প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথম উপাখ্যান অনুসারে হিন্দু দেবতা শ্রীহরি ফকিরের ছদ্মবেশে জনৈক গরিব ব্রাহ্মণের কাছে এসে তাঁকে সত্যনারায়ণ পূজা দিতে বলেন। ব্রাহ্মণ হুকুম পালন করেন এবং ধনবান হন। দ্বিতীয় উপাখ্যান অনুসারে এক বণিক

সত্যনারায়ণের আশীর্বাদে কন্যাসন্তান লাভ করেন। কন্যা বড় হলে তাঁকে বিয়ে দেওয়া হয়, জামাতাকে সঙ্গে নিয়ে বণিক বাণিজ্যে যান এবং সত্যপীরের উপাসনা না করায় বিপদে পড়েন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী সত্যপীরের ভক্ত ছিলেন বলে সে যাত্রা বণিক বিপদ থেকে পরিত্রাণ পান। জামাতাসহ ফেরার পথে আবারও তাঁর ডুবে মরার উপক্রম হয়, কেননা বণিকের কন্যা স্বামীর সঙ্গে মিলনচিন্তায় বিভোর হয়ে সত্যপীরের প্রসাদ দিতে অবহেলা করেন। পরে অবশ্য সত্যপীরের উপাসনার তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করেন এবং তাঁরা সবাই বিপন্মুক্ত হন। *সত্যপীর কাব্য* সত্যপীর ভিত্তিক প্রথম গ্রন্থ। শেখ ফয়জুল্লাহর প্রতি আরোপিত এই বইটি আনুমানিক ১৫৪৫ থেকে ১৫৭৫ সালের মধ্যে রচিত। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৪-১৫১৯) যে সত্যপীর আন্দোলনের প্রবর্তক, তার অনুকূলে কোনো তথ্য-প্রমাণ নেই।

সত্যপীরকে কোনো মূর্তির অবয়বে দেখানো হয়নি। প্রতীক হিসেবে শুধু সাধারণ তক্তপোষ বসানো থাকত। সত্যপীরের উপাসকেরা সাধারণত গরিব জনগোষ্ঠী থেকে আসত এবং তাদের প্রদত্ত উপচারও ছিল সাদামাটা। সত্যপীরের ধারণায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় রীতির প্রভাব ছিল। এটি মুসলমানদের পীরানি ধারণার স্থানীয় প্রকাশ। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর স্থানীয় জনগণের পীরানি ধারণার সঙ্গে তাদের পূর্বতন দেবতাদের অলৌকিক ক্ষমতার সংমিশ্রণ ঘটে।

**সত্যপীরের ভিটা** নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার অধীনে পাহাড়পুর বিহার থেকে ৩৬৫ মিটার পূর্বে এটি অবস্থিত। সত্যপীরের ভিটায় একটি তারা মন্দির এবং বিভিন্ন আকার ও আয়তনের প্রচুর নিবেদন স্তূপের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। মন্দির অঙ্গনের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ৫০টি পোড়ামাটির ফলক, আট হাতবিশিষ্ট দেবীমূর্তি ও বৌদ্ধধর্মীয় মতবাদ লিপি খোদিত পোড়ামাটির গোল সিলগুলো থেকেই এই ভিটা ও তারা মন্দিরের অভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়েছে। আবিষ্কৃত দেবী মূর্তিটি বৌদ্ধদেবী শীতাতপত্র তারার বলেই মনে হয়।

**সত্তাতত্ত্ব** (Ontology) অস্তিত্বের স্বরূপবিষয়ক তত্ত্ব। নির্দিষ্ট কোনো অস্তিত্বকে আমরা বিশেষ বলি। বলটি, বৃক্ষটি, লোকটি বিশেষ বস্তু। কিন্তু বিশেষই মূল, না বিশেষের পেছনে নির্বিশেষ কোনো সত্তা আছে—এ চিন্তা দার্শনিকদের আদিকালের চিন্তা। অ্যারিস্টটল এই প্রশ্নের জবাবে নির্বিশেষ অস্তিত্ব বা সত্তার তত্ত্ব তৈরি করেন। তাঁর মতে, বিশেষ হচ্ছে খণ্ডিত সত্তা। সমস্ত বিশেষ নিয়ে অখণ্ড নির্বিশেষ সত্তা। কিন্তু তাই বলে বিশেষের সমাহার মাত্রই নির্বিশেষ নয়। পরন্তু নির্বিশেষের প্রকাশেই বিশেষ এবং বৈচিত্র্য। বিশেষ নির্বিশেষের প্রশ্নে প্লেটো, অ্যারিস্টটলের আগে, এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে জগতের বিশেষ বিশেষ বস্তু পরিপূর্ণ সত্তা নয়। পরিপূর্ণ সত্তা বিশেষকে অতিক্রম করে বিরাজমান। নির্বিশেষের সঙ্গে বিশেষের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিশেষ অস্তিত্বের যথার্থতার পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়। অর্থাৎ নির্বিশেষ হচ্ছে বিশেষের নিয়ামক। প্লেটো-অ্যারিস্টটলের নির্বিশেষের এই তত্ত্ব পরাদর্শন বা পরাবিদ্যা বলে অভিহিত হয়। ইউরোপের মধ্যযুগের ধর্মীয় দর্শন প্লেটো ও অ্যারিস্টলের এই তত্ত্বকে ব্যবহার করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করে। সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাসের মধ্যে এই ব্যাখ্যার বিশেষ সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের পর থেকে নির্বিশেষ অস্তিত্বের তত্ত্ব দ্বারা ভাববাদী দার্শনিকেরা বস্তুমাত্রকেই অস্তিত্বহীন এবং ভাব বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। এই প্রয়াসের চরম দেখা যায় জার্মান দার্শনিক উলফের রচনায়। উলফের ব্যাখ্যায় 'অস্তিত্ব', 'বাস্তবতা', 'সংখ্যা', 'কারণ'—এই সমস্ত ভাবের সঙ্গে বস্তুর কোনো সম্পর্ক নেই। হবস, স্পিনোজা, লক এবং অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বস্তুবাদী দার্শনিকেরা অস্তিত্বের এই ভাববাদী ব্যাখ্যাকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে খণ্ডন করেন।

**সত্ত্ব, রজোগুণ ও তমোগুণ** গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে মোট ২৭টি শ্লোকে কৃষ্ণ এই তিনটি গুণ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। জড় প্রকৃতি থেকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমো—এই তিনটি গুণ প্রকাশিত হয় এবং জড় প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে জীব এই তিনটি গুণ দ্বারা আবদ্ধ হয়। সত্ত্বগুণ অপেক্ষাকৃত নির্মল, প্রকাশক

ও পাপশূন্য। অন্তহীন কামনা-বাসনা থেকে রজোগুণের উৎপত্তি, যা জীবকে সকল কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ রাখে। তমোগুণ জীবের ভ্রান্তির কারণ এবং প্রমোদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে। সত্ত্বগুণ প্রবল হলে রজঃ ও তমোগুণ পরাজিত হয়। রজোগুণ প্রবল হলে সত্ত্ব ও তমোগুণ পরাজিত হয় এবং তমোগুণ যখন প্রবল হয়, তখন সত্ত্ব ও রজোগুণ পরাজিত হয়। তিনটি গুণের আধিপত্য বিস্তারে সর্বদা প্রতিযোগিতা হয়। যখন সত্ত্বগুণের বিকাশ হয় তখন মানুষ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয় এবং যথাযথভাবে দর্শন, শ্রবণ ও স্বাদ গ্রহণ করতে পায়। দেহের প্রতি দ্বারে সুখের লক্ষণ প্রকাশিত হয়ে সাত্ত্বিক অবস্থার সৃষ্টি করে। রজোগুণের প্রভাব প্রবল হলে লোভ, কর্মে প্রকৃতি, উদ্যম ও বিষয়ভোগের স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। তমোগুণের প্রভাব বর্ধিত হলে অজ্ঞানান্ধকাম, প্রমোদ ও মোহ উৎপন্ন হয়।

**সদ্ধর্মপুণ্ডরীকসূত্র** সত্যধর্মের শ্বেতপদ্ম সূত্রটি মহাযান বৌদ্ধদের সবচেয়ে প্রিয় শাস্ত্র। বৌদ্ধশাস্ত্র ক্রমাগতভাবে বিস্তার লাভ করে। ভিক্ষুদের অনুশাসন সম্পর্কে যে সামান্য কয়েকটি নির্দেশ করা হয়েছিল তা-ই কালক্রমে ত্রিপিটকের আকার ধারণ করে। অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের মতো পুণ্ডরীকসূত্র প্রথমে মুখে মুখে প্রচার লাভ করে। লিখিতরূপে প্রাচীনতর সূত্রটি ছন্দে এবং পরবর্তীটি গদ্যে রচিত হয়। পুণ্ডরীকসূত্রের আবির্ভাবের আগে মুক্তির কল্পনা ছিল তিন প্রকার বুদ্ধের বদৌলতে শ্রাবকদের মুক্তিলাভ, যাঁরা অন্যদের মুক্তির জন্য কোনো কিছু করতেন না, প্রত্যেক বুদ্ধ যিনি কারও সাহায্য ছাড়া মুক্তি লাভ করতেন এবং যিনি অন্যকে কোনো সাহায্য করতেন না এবং বুদ্ধ যিনি এই জন্মে কারও শিষ্য ছিলেন না কিন্তু পৃথিবীর মুক্তির জন্য চেষ্টিত হন। পুণ্ডরীকসূত্র মতে, প্রথম দুটির বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই। শ্রোতারা যাতে পরম জ্ঞানের সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে তার সুবিধার্থে মুক্তির নানা প্রকার সম্পর্কে বলা হয়। মানুষের মধ্যে যে বুদ্ধ শ্রদ্ধাবান হন তিনি সত্যিকার বুদ্ধের এক প্রকাশ মাত্র। পুণ্ডরীকসূত্র সংস্কৃত থেকে একবার তিব্বতিতে এবং তিনবার চীনা ভাষায় অনূদিত হয়।

কালক্রমে পুণ্ডরীকসূত্রের চিন্তাভাবনা কোরিয়া ও জাপানে প্রসারিত হয়। এই সূত্রের ওপর ভিত্তি করে জাপানে নিচিরন (১২২২-১২৮২) বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। জাপানের প্রতীক সূর্যের সঙ্গে পুণ্ডরীক সূত্রের পুণ্ডরীক যোগ করে নিচিরনের উদ্ভব।

**সন্ধ্যা** সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা যেসব পুত্রকন্যার জন্ম দেন, সন্ধ্যা তার অন্যতমা। তাঁর সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করলে মহাদেব ব্রহ্মার একটি মস্তক ছেদন করেন। ব্রহ্মা সন্ধ্যাকে প্রাত, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন—এই তিন ভাগে বিভক্ত করে নিজ দেহ ত্যাগ করেন। ব্রহ্মা ধ্যানস্থ থাকার সময় মানসকন্যা সন্ধ্যার জন্ম হয়।

**সন্ন্যাস** হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্মের চতুর্থ আশ্রম। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থাশ্রমে জীবনের তিন-চতুর্থাংশ অতিবাহিত করে সর্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করতে হয়। এই আশ্রমে সর্বদা অগ্নিহীন, বাসহীন, স্থিরমতি এবং সদাব্রহ্মভাবে সমাহিত অবস্থান করতে হয়। কেবল ভিক্ষার জন্য সন্ন্যাসী গ্রামের আশ্রয় নিতে পারেন। তাঁকে সঙ্গপরিত্যাগ, ব্রহ্মচর্যাবলম্বন ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে অবস্থান করতে হয়। পুরাণে আছে, যখন বিষয়-বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তখনই সন্ন্যাস অবলম্বন করবে। সমুদয় আসক্তি ত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন করলে পরলোকে মুক্তি ঘটে। সন্ন্যাসই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। যাঁরা এই সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁদের সন্ন্যাসী ও তাঁদের প্রতিষ্ঠানকে আশ্রম বলে। স্ত্রীলোকদের বাসস্থানকে সাধারণত মঠ ও এর অধিবাসীকে মঠধারিণী বলা হয়। প্রধান প্রধান ধর্মগুলোয়, যথা—হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম (লামাবাদী বৌদ্ধধর্ম সহ), জৈনধর্ম, ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও সন্ন্যাসজীবন প্রচলিত। খ্রিষ্টধর্মে সন্ন্যাসব্রত সন্ন্যাসীদের স্বেচ্ছাকৃত নির্জনতা অনুসরণ নীতি থেকে উদ্ভূত। প্রাচ্য-প্রাচীনপন্থী গির্জার মঠধারীরা একসঙ্গে বাস করে সন্ন্যাসধর্ম পালনের নীতি অনুসরণ করেন। সেন্ট বেসিল কর্তৃক প্রচলিত রীতিনীতি অনুসৃত হয়। পাশ্চাত্য দেশে সেন্ট বেনিডিক্টের আমল থেকে সন্ন্যাস ধর্মে সন্ন্যাসীদের একত্রে জীবনযাপন সাধারণ জীবনধারার রূপ পরিগ্রহ করেছে। বেনিডিক্ট অনুসারী মঠগুলো ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত রোমীয় সভ্যতার এবং

পরবর্তী যুগের জ্ঞানের রক্ষক ও উৎস ছিল। রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতে মঠধারী ও মঠধারিণীদের মধ্যে বহু শ্রেণী আছে। ফ্রাইয়ারদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ফ্রান্সিসকান, ডোমিনিকান ও কারমেলাইট সম্প্রদায়। কেউ কেউ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গহীন আবদ্ধ অবস্থায় থাকেন, কিন্তু অনেকেই শিক্ষা, বদান্যতা বা ধর্মপ্রচার কাজে নিযুক্ত থাকেন। জেসুইটরা এবং খ্রিষ্টান ব্রাদার্স সেই সন্ন্যাসধর্মীয় চেষ্টার নিদর্শন। রেফরমেশান যুগে সন্ন্যাসীদের বহু আশ্রম ধ্বংস করা হয়। প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমত সাধারণ সন্ন্যাস ধর্মের কঠোর আদর্শ সমর্থন করেনি।

**সন্ন্যাসী** যিনি ভিক্ষু ধর্ম গ্রহণ করে, সংসার-বাসনা ত্যাগ করে ঈশ্বরচিন্তার জীবন যাপন করেন। গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হয়েছে:

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম চিরেণাধিগচ্ছতি।

অর্থাৎ হে মহাবাহো, কর্মযোগ ব্যতীত কেবল কর্মত্যাগ রূপ সন্ন্যাস দুঃখজনক; যোগযুক্ত মানুষ অচিরেই পরম গতি লাভ করেন।

সন্ন্যাসী দুই প্রকার—মায়াবাদী ও বৈষ্ণব। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সাংখ্য দর্শন অধ্যয়ন করেন আর বৈষ্ণবসন্ন্যাসীরা বেদান্ত-সূত্রের যথার্থ ভাষ্য শ্রীমদ্‌ভাগবত দর্শন অধ্যয়ন করেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা বেদান্ত-সূত্রও অধ্যয়ন করেন, কিন্তু তা তাঁরা অধ্যয়ন করেন শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের শারীরক ভাষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। শ্রীমদ্‌ভাগবত অনুসরণকারী বৈষ্ণবেরা পঞ্চরাত্রিকী বিধি অনুসারে ভক্তিমার্গে ভগবানের সেবা করেন। তাই বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা চিন্ময় ভগবদ্‌ভক্তিতে নানাবিধ কর্তব্যকর্ম পালন করে থাকেন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের জড়জাগতিক কর্তব্যকর্ম সাধন করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, কিন্তু তবু ভগবানের সেবা করার জন্য তাঁরা নানা কর্তব্য পালন করে থাকেন।

**সপিণ্ড** হিন্দু আইনে 'সপিণ্ড' শব্দের অর্থ পিণ্ডদানের অধিকারী। সপিণ্ড দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়: (১) একই ব্যক্তির আত্মীয়সম্ভূত এবং (২) একই পৈতৃক আত্মীয়সম্ভূত। যে ব্যক্তি তিনপুরুষ ওপরের এবং তিনপুরুষ নিচের, তাঁকে সপিণ্ড বলা হয়। তিনটি উপায়ে সপিণ্ড সম্পর্কের উদ্ভব ঘটে। যেমন, (১) পিণ্ডদানের মাধ্যমে, (২) পিণ্ড গ্রহণের মাধ্যমে এবং (৩) সাধারণ পূর্বপুরুষকে পিণ্ডদানের মাধ্যমে। হিন্দু আইনে 'পিণ্ড' বলতে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের আহুতি পাওয়া বা দেওয়াকে বোঝায়। দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা বিধানমতে সপিণ্ড বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দায়ভাগ-বিধানে মৃতের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার লাভ মৃত ব্যক্তির পিণ্ডদানে যুগপৎভাবে অংশগ্রহণকারীদের ওপর নির্ভর করে। দায়ভাগ-মতে, সপিণ্ড সবার অগ্রে উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেন। মোট ২১ জন সপিণ্ড শ্রেণীভুক্ত। একজন হিন্দু, দায়ভাগ বা মিতাক্ষরা যে-মতানুসারী হোন না কেন, নিজস্ব সপিণ্ডভুক্ত কোনো কন্যা বা নারীকে বিয়ে করতে পারেন না। মিতাক্ষরা-বিধানমতে মৃত ব্যতিরেকে তদীয় সরাসরি ষষ্ঠ পুরুষাগ্রবর্তী ও মৃত ব্যতিরেকে তদীয় সরাসরি ষষ্ঠ পুরুষানুবর্তী বংশধরেরা এবং সগোত্র প্রত্যেকের নিজ নিজ ষষ্ঠ পুরুষানুবর্তী বংশধরেরা মৃতের সপিণ্ড বলে বিবেচিত হবে।

**সপ্তজিহ্বা** অগ্নি। অগ্নির সাতটি জিহ্বা—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী বা উগ্রা ও বিশ্বনিরূপণী বা প্রদীপ্তা।

**সপ্তদ্বীপ** পৌরাণিক আর্য ঋষিরা সসাগরা পৃথিবীকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রতিটি বিভাগকে তাঁরা একেকটি দ্বীপরূপে কল্পনা করতেন। জম্বুক (ভারত), কুশ, প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক (শকদের দেশ) এবং পুষ্কর—এই সপ্তদ্বীপ।

**সপ্তপাতাল** তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল এবং রসাতল—হিন্দু পুরাণোক্ত এই সপ্ত অধোভুবন। এই সপ্তপাতালের প্রতিটির দূরত্বের পরিমাণ এক যোজন। এখানে দৈত্য, দানব ও সর্পেরা তাদের পরিবার নিয়ে বাস করে। এরা সকলেই মায়াবী। মায়ার অধীশ্বর ময়দানব এসব স্থানে মনিরত্নসুশোভিত বিচিত্র বাসগৃহ নির্মাণ করেছেন।

**সপ্তম-দিবসীয় ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়** (সেভেনথ ডে ব্যাপটিস্ট) ক্যালভিনপন্থী ব্যাপটিস্টদের সম্প্রদায় শনিবারে শাবাত পালন করে। আমেরিকায় প্রথম রোড আইল্যান্ডে ১৬৭১-এ এটা প্রচারিত হয়। জে সি বাইসেল পরিচালিত একটি জার্মান দল

পেনসিলভানিয়ার এফরাতায় অর্ধসন্ন্যাস জীবনভিত্তিক ধর্মীয় সমাজ স্থাপন করে (১৭২৮-৩৩)। দ্র. শাবাত।

**সপ্তরথী** মহাভারত অনুসারে দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, জয়দ্রথ ও দুঃশাসন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষীয় এই সাতজন রথারোহী অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুকে বেষ্টন করে অন্যায়ভাবে বধ করেন।

**সপ্তলোক** ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ, সত্য—পুরাণে বর্ণিত এই সাতটি লোক নিয়ে সপ্তলোক।

**সপ্তর্ষি** ব্রহ্মার মানসপুত্র সাতজন ঋষি। এই সপ্তঋষি চিত্রশিখণ্ড বা শিখাধারণ করেন বলে চিত্রশিখণ্ডী নামে অভিহিত। বিভিন্ন মন্বন্তরে যে সাতজন ঋষি আবির্ভূত হয়ে ধর্মের ব্যবস্থা ও লোকরক্ষা করেন, তাঁরা আকাশের ঈশান কোণে অবস্থান করেন এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল নামে পরিচিত। মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ—এই সাতজনের যথাক্রমে কলা, অনুসূয়া, ক্ষমা, হবির্ভূ, সন্নতি, শ্রদ্ধা ও অরুন্ধতী নামক সাতজন স্ত্রী। এঁরা সকলেই লোকজননী। প্রত্যেক মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ভিন্ন ভিন্ন। এই সব সপ্তর্ষি স্বয়ম্ভু মন্বন্তরে ছিলেন। মনু চতুর্দশ; সুতরাং সপ্তর্ষিও চতুর্দশ মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন।

**সপ্তশতী** দেবী মহাত্ম্যসূচক গ্রন্থ—চণ্ডী। সাত শ শ্লোক থাকায় নাম সপ্তশতী।

**সপ্তসমুদ্র** হিন্দু পুরাণোক্ত লবণ, ইক্ষু, সর্পি, সুরা, দধি, দুগ্ধ ও জল নামক সাতটি সমুদ্র একসঙ্গে সপ্তসমুদ্র নামে অভিহিত।

**সপ্তাহ** সাত দিন। দিন হিসাবে সময় গণনার একটি একক। পশ্চিম এশিয়ায় প্রাচীনকালে গ্রহের প্রভাবের ধারণা থেকে সপ্তাহ হিসাবে সাত দিনের সপ্তাহের প্রচলন অনুমান করা হয়েছে বলে ওই সময় ভ্রমাত্মকভাবে সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিগ্রহ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে বলে বিশ্বাস করা হতো। দেবতাদের নাম অনুসারেই গ্রহের নাম হয় এবং কনস্ট্যান্টাইন কর্তৃক খ্রিষ্টান সপ্তাহ প্রবর্তনের পরও আগের নামগুলো থেকে যায়। খ্রিষ্টান সপ্তাহের রোববার প্রারম্ভিক ও পবিত্র দিবস। মুসলমান ও ইহুদিদের পবিত্র দিবস যথাক্রমে শুক্র ও শনি। অধিকাংশ ভাষায় লাতিন কিংবা এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ দেব-দেবীর নামের অনুবাদ থেকে দিবসগুলোর নাম গৃহীত। ইংরেজি দিনগুলোর অধিকাংশই প্রাচীন জার্মান দেব-দেবীর নামানুযায়ী।

**সবিতা** ঋগ্‌বেদের ১১টি সূক্তে সবিতার স্তুতি পাওয়া যায়। সবিতা হিরণ্যদ্যুতি, হিরণ্যপাণি, হিরণ্যজিহ্ব। হিরণ্ময় রথে শুভ্র পদ ও লোহিত বর্ণ অশ্ব তাঁকে বহন করে। তাঁর বেশ পীতবর্ণ। তিনি পূর্ব দিকে উদিত হয়ে দুঃস্বপ্ন, রাক্ষস, পাপ প্রভৃতি দূর করেন। বায়ু ও জল তাঁর অধীন। সবিতাকে সূর্য থেকে পৃথক বিবেচনা করা হয়। সূর্যরশ্মিতেই সবিতার দীপ্তি; সবিতা সূর্য পরিচালনা করেন এবং সূর্যের কাছে মানুষের নিষ্পাপত্ব ঘোষণা করেন। সবিতার উদ্দেশে বিশ্বামিত্রের রচিত যে ঋক্ (৩/৬২/১০) প্রত্যহ উচ্চারিত হয়ে আসছে, সেটি গায়ত্রী ছন্দে রচিত বলে গায়ত্রী নামে প্রসিদ্ধ।

**সব্যসাচী** অর্জুনের এক নাম। তিনি উভয় হস্তেই সমভাবে বাণ নিক্ষেপ করতে পারতেন বলে তাঁর এই নাম।

**সমাধিসৌধ** তাসবিয়াতুল কুবুর অর্থাৎ কবরকে পার্শ্ববর্তী ভূমির উচ্চতায় নির্মাণ না করার নির্দেশ হাদিসে থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য দেশের মতো বাংলায়ও কবরগুলোকে পার্শ্ববর্তী ভূমি থেকে উঁচু করা হয়। বিজেতা ও অভিজাত বর্গ, সুফি-সাধক এবং গাজিদের কবরের ওপরে সৌধ নির্মাণ করা হতো। বাংলায় বেশ কয়েকটি সমাধিসৌধ রয়েছে, যেখানে কবর দেওয়া হয়েছে উন্মুক্ত অঙ্গনে। কবরের ওপরে কোনো স্থাপত্যিক আচ্ছাদন রাখা হয়নি। যেমন সিলেটের হজরত শাহজালাল (র.)-এর সমাধি এবং পাণ্ডুয়ার (মালদা, পশ্চিমবঙ্গ) ছোটি দরগায় আলাউল হক (র.)-এর ও নূর কুতব আলম (র.)-এর সমাধি। 'মৃত্যুর পর ধার্মিকের কর্মই তাঁকে নিরাপত্তা দেবে ও আচ্ছাদিত করবে—এই ধারণা থেকে অনেক সময় সমাধিগুলো আচ্ছাদিত করা হয়নি।

**সমুদ্র মন্থন** রামায়ণের বর্ণনায় সত্যযুগে দেবতা ও অসুরেরা অমৃত লাভের আশায় মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকীকে রজ্জু করে ক্ষীরোদ সমুদ্র

মন্থন করতে আরম্ভ করেন। সহস্র বছর মন্থনের পর বাসুকী বিষ বমন ও দন্ত দ্বারা শিলা দংশন করতে থাকেন। দেবতারা ভীত হয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হন। শঙ্খচক্রধারী হরি উপস্থিত হয়ে মন্থনজাত বিষ অগ্রপূজা হিসেবে মহাদেবকে পান করতে বলেন। মহাদেব উত্থিত বিষ পান করে কণ্ঠে ধারণ করেন। বিষের তেজে তাঁর কণ্ঠ নীলবর্ণ হয় বলে তাঁর এক নাম নীলকণ্ঠ। দেবাসুরেরা আবার মন্থন আরম্ভ করলে মন্দরপর্বত পাতালে প্রবিষ্ট হয়। দেবতা ও গন্ধর্বদের প্রার্থনায় বিষ্ণু কূর্ম রূপ ধারণ করে মন্দর পর্বতকে পৃষ্ঠে নিয়ে সাগরতলে শয়ন করেন। আরও সহস্র বছর মন্থনের ফলে ধন্বন্তরির আবির্ভাব হয়। উত্থিত হন অসংখ্য অপ্সরা। 'অপ' থেকে উত্থিত বলে এদের নাম হয় অপ্সরা। দেব বা দানবেরা তাঁদের গ্রহণ না করায় তাঁরা সাধারণ স্ত্রীরূপে গণ্য হন। উত্থিত হলেন বরুণের কন্যা বারুণী বা সুরা। দিতির পুত্ররা তাঁকে গ্রহণ না করে অসুর হলেন ও অদিতির সন্তানেরা তাঁকে নিয়ে সুর হলেন। এরপর ক্রমে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, কৌস্তভ মণি ও সবশেষে অমৃত উত্থিত হলো। এই অমৃতের অধিকার নিয়ে দেবাসুরে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হলে বিষ্ণু মোহিনীরূপে অমৃত হরণ করে আক্রমণকারীদের বিনষ্ট করলেন। দেবতারা বহু অসুর নিহত করে যুদ্ধে জয়ী হন ও ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হন।

মহাভারতে সমুদ্র মন্থনের বর্ণনা কিছুটা ভিন্ন ধরনের। দেবগণ সুমেরু পর্বতে অমৃত প্রাপ্তির মন্ত্রণাকালে ব্রহ্মা তাঁদের অসুরদের সঙ্গে সমুদ্র মন্থনের পরামর্শ দেন। তাঁরা নাগরাজ বাসুকীর সাহায্যে মন্দর পর্বত উৎপাটিত করে কূর্মপৃষ্ঠে স্থাপনপূর্বক বাসুকীকে মন্থন রজ্জুরূপে সমুদ্র মন্থন করেন। দেবগণ বাসুকীর আঙুল ও অসুরগণ মুখভাগ গ্রহণ করেন। বহুকাল মন্থনের পর সমুদ্র থেকে দুগ্ধ ও ঘৃত উৎপন্ন হলো। এরপর ক্রমান্বয়ে সমুদ্র থেকে চন্দ্র ও ঘৃত থেকে লক্ষ্মী, সুরাদেবী, উচ্চৈঃশ্রবা ও কৌস্তভ মণি উত্থিত হলো। শেষে অমৃতভাণ্ড থেকে ধন্বন্তরি ও পরে গজরাজ ঐরাবত উত্থিত হলো। কৌস্তভ মণি নারায়ণ এবং উচ্চৈঃশ্রবা ও ঐরাবত ইন্দ্র গ্রহণ করলেন। এর পরও মন্থন করায় কালকূট বিষ উৎপন্ন হলো। মহাদেব তা পান করে নীলকণ্ঠ হলেন। অমৃত ও লক্ষ্মীর অধিকার নিয়ে দেবাসুরের ভীষণ যুদ্ধে নারায়ণ অসুরদের মোহিত করে অমৃত তাদের হাত থেকে অধিকার করেন। দেবগণ নারায়ণের কাছ থেকে অমৃত পান করেন। সে সময় রাহু নামের এক দানব দেবতার ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়ে উল্লিখিত অমৃতের অংশ পান করে। রাহুর কণ্ঠদেশে অমৃত উপস্থিত হতেই চন্দ্র ও সূর্য তা ব্যক্ত করেন। তখন নারায়ণ সুদর্শনচক্রে রাহুর কণ্ঠচ্ছেদন করেন। তখন থেকেই চন্দ্র-সূর্যের সঙ্গে রাহুর শত্রুতা। অসুরদের পরাস্ত করে দেবগণ ত্রিলোক অধিকার করেন ও অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু সুরক্ষিত করে নারায়ণের কাছে রেখে দেন।

**সরস্বতী** শুক্লবর্ণা, শুক্লবসনা বীণাধারিণী ও চন্দ্রের শোভাযুক্ত রাজহংসবাহনা বিদ্যাদেবী। হিন্দুশাস্ত্র দেবী ভাগবতমতে, তিনি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার স্ত্রী। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণমতে, লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুজনই নারায়ণের স্ত্রী। সরস্বতী বর্ণনায় সাদা বর্ণের প্রাধান্য দেখা যায়, যা তাঁর শুদ্ধতার প্রতীক এবং স্বভাবে সাত্ত্বিক গুণের পরিচায়ক। দেবতা শিব ও বিষ্ণু পর্যন্ত তাঁকে শ্রদ্ধা করেন।

ঋগ্‌বেদের দুটি মন্ত্রে সরস্বতীর উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতে সরস্বতী নামে একটি নদী ছিল বলে জানা যায়, তবে এই নদী কোন পথে প্রবাহিত হতো, তার সন্ধান পাওয়া যায়নি; তাই একে সাধারণত গুপ্তগামিনী হিসেবে বিবেচিত করা হয়। পবিত্র ভূমি প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল সঙ্গম নামে পরিচিত। ধর্মীয় দিক থেকে এই সঙ্গমস্থান হিন্দুদের কাছে খুবই পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। তাদের বিশ্বাস, জীবনে অন্তত একবার প্রয়াগ দর্শন করা উচিত। এভাবে সরস্বতী দেবী ও নদী হিসেবে দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাঁর নানা নাম—বীণাপাণি, ভারতী ইত্যাদি। তিনি ভক্তদের ভেতর থেকে অজ্ঞানতা দূর করে তাদের জ্ঞান দান করেন। তাঁর আশীর্বাদ পেলে মূর্খও জ্ঞানী হতে পারে—ভক্তদের মধ্যে এ বিশ্বাস প্রচলিত। সরস্বতী কবিদের ইষ্টদেবতা। কালিদাসকে বলা হয় সরস্বতীর বরপুত্র।

বাংলাদেশের হিন্দু শিক্ষার্থীরা মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীতে (শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে) সরস্বতী পূজা করে। অধিকাংশ হিন্দু পারিবারিকভাবেও সরস্বতী পূজা করে থাকে। পূজার সময় পবিত্র গ্রন্থ, পাঠ্যপুস্তক এবং ছাত্রদের কলম-পেনসিল দেবীর আশীর্বাদ লাভের আশায় পূজাবেদির ওপর রাখা হয়। এ উপলক্ষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে।

**সর্পপূজা** এমন এক ধরনের পূজা, যেখানে সর্পকে যথেষ্ট সম্মান ও দেবতুল্য জ্ঞান করা হয়। সর্পপূজার বিভিন্ন রূপভেদ আছে। প্রাচীনকালে ব্যাপকভাবে সর্পপূজা প্রচলিত ছিল। বর্তমানেও কোনো কোনো উপজাতির মধ্যে সর্পপূজা প্রচলিত আছে। আগেকার ভারতীয় বৌদ্ধধর্মে সর্পপূজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রোমানরা সর্পকে আরোগ্যকর্তারূপে সম্মান করত এবং জুলু জনগোষ্ঠী সর্পকে গৃহপালিত পোষ্য প্রাণীরূপে লালন করত।

**সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র** ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত একটি আন্তর্জাতিক অধিকারপত্র, যা মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কে ওই সংস্থার প্রথম ঘোষণাপত্র। প্রস্তাবনায় বলা হয়: 'মানব-পরিবারের সকল সদস্যের অন্তর্নিহিত মর্যাদা এবং সমান ও অবিভাজ্য অধিকারের স্বীকৃতি হলো বিশ্বের স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির ভিত্তি।' ঘোষণাটির মধ্যে অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার ৩০ অনুচ্ছেদ-সংবলিত একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। ঘোষণাটি ম্যাগনাকার্টা, মানবাধিকারের ফরাসি ঘোষণা ও আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার সমমানের, যা স্বাধীনতা ও মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য মানবজাতির সুদীর্ঘ সংগ্রামের পথে একটি মাইলফলক।

**সর্বপ্রাণবাদ** আদিম ধর্মবিশ্বাসের প্রথম সোপান। ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ই বি টাইলর সর্বপ্রাণবাদের প্রবক্তা। তাঁর মতে, লাতিন 'অ্যানিমা' শব্দ থেকে 'অ্যানিমিজম' শব্দটি এসেছে। 'অ্যানিমা'র অর্থ 'আত্মা'। সে অর্থে আদিম জনগোষ্ঠীকে অ্যানিমিস্ট বা সর্বপ্রাণবাদী বলা হয়ে থাকে। আত্মা, ভূত, প্রেত, দৈত্য, পিশাচ, দেবদূত ইত্যাদি নামে যা বোঝানো হয়, তার সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস জড়িত। এদের রক্ত-মাংসের কোনো দেহ অবয়ব নেই; ইথারে এদের বিচরণ, এরা অবস্তুগত। তবে যারা এগুলো বিশ্বাস করে তাদের কাছে অতি বাস্তব। প্রেতাত্মা প্রাকৃতিক নিয়মের ধার ধারে না এবং বস্তু, সময় এবং স্থানকে অতিক্রম করে চলতে পারে। অতিপ্রাকৃত, বিস্ময়কর ও রহস্যময় আত্মার ধারণাই সর্বপ্রাণবাদের মূল কথা।

মানুষ নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে আত্মার প্রতি বিশ্বাস এনেছে। আদিম মানুষ জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় আত্মাকে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করে। যে আত্মা মানুষের দেহে অবস্থান করে, সে দেহ ছেড়ে চলে গেলে মানুষের মৃত্যু হয়। এই আত্মাই হলো প্রকৃত আত্মা। স্বপ্নে যাকে দেখা যায় সে দেহের ভেতরে-বাইরে যাতায়াত করতে পারে এবং তাকে বলা হয় প্রেতচ্ছায়া। আত্মা যে কেবল মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেই বিদ্যমান, তা নয়; অপ্রাণীবাচক বস্তুতেও তার অস্তিত্ব আছে। আত্মার অবিনশ্বরতা, মৃত্যুর পর পরপারে গমন, কোনো জীবন বা বস্তুতে অবস্থান এবং পুনরাগমন বা জন্মান্তর সম্পর্কে তাদের মধ্যে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে। এই ধারণামতে, ছায়াসদৃশ বিদেহী আত্মা মানুষের কবরের চারদিকে ঘোরাফেরা করে। ওই আত্মার সাহায্যকল্পে প্রাণী বলি দেওয়া, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় জিনিসপত্র দিয়ে তাকে সহায়তা করার মধ্য দিয়ে আত্মার প্রতি বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটে।

**সর্বানন্দ** চাঁদপুর জেলার মেহার তাঁর জন্মস্থান ও সাধনার ক্ষেত্র। সর্বানন্দ শৈশবে নিরক্ষর ছিলেন। তিনি কোনো এক সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নেন এবং মেহারে জীনবৃক্ষমূলে পৌষ সংক্রান্তির দিন শবারোহণে গুহ্যমন্ত্র ধ্যান করে সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি ১৪২৬ খ্রিষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৪৩৭) দেবী ভৈরবীর দশমহাবিদ্যা রূপ দর্শন করেন। সর্বানন্দ খুলনার সেনহাটি গ্রামে চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারকে আচার্যপদে বরণ করেন এবং তাঁর কন্যা গৌরীকে বিয়ে করেন। সর্বানন্দ *সর্বোল্লাসতন্ত্র* নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থে তান্ত্রিক সাধনার মন্ত্রগুলো সংকলন করেন।

**সহজযান** খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম মতবাদ সহজযানের উদ্ভব ঘটে। এর মূল তত্ত্ব হলো : কঠোর সাধনায় মুক্তি কামনার পরিবর্তে

সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার মাধ্যমে পরম সুখ লাভ করা। এটি চিত্তের এমন এক অবস্থা, যেখানে সুখ ভিন্ন অন্য কোনো বিষয়ের অস্তিত্ব থাকে না। সহজযান মতে, এই পরম সুখ কেবল গুরুর মাধ্যমেই লাভ করা যায়। এ ক্ষেত্রে গুরুই প্রধান এবং তাঁকে বলা হয় 'বজ্রগুরু'। 'বজ্র' মানে শূন্য বা নিরাসক্তি। যিনি সাধনার দ্বারা চিত্তকে সর্ববিষয়ে নিরাসক্ত করেন তিনিই বজ্রগুরু। সহজযানে যে পরম সুখের কথা বলা হয়েছে তা স্ত্রী-পুরুষ সংযোগজনিত সুখ। শরীরকে এখানে সাধনার ক্ষেত্ররূপে বিবেচনা করা হয়।

সহজযানীদের মতে, সংসারও শূন্য, নির্বাণও শূন্য; পাপ-পুণ্য বলতে কিছু নেই। তাই সবই যখন শূন্য তখন উৎপত্তি নেই, নিবৃত্তিও নেই। অন্যান্য মতবাদ যে চিত্তের কথা বলা হয়, তা-ও শূন্য। চিত্তের এই শূন্যতাই পরমার্থ বা নির্বাণ। নির্বাণে সকল ক্লেশের নাশ হয় এবং এর পরম ফল শান্তি।

সহজযানে ইন্দ্রিয় নিরোধ, কঠোর ব্রত ধারণ ইত্যাদি নিয়ম পালন করা বৃথা। শারীরিক কষ্ট করে মানসিক স্থিতিশীলতা নষ্ট কঠোর নিয়মে নয়, অত্যন্ত সহজ পথে ইন্দ্রিয় ভোগের অবসান করতে হবে। সহজিয়া মতে, তপস্যার দ্বারা নিজেকে কষ্ট না দিয়ে বরং ভোগের মাধ্যমে বোধির সাধনা করতে বলা হয়েছে। তাই সহজিয়াপন্থীদের মতে, বোধিলাভের জন্য গুরুর অনুমতি সাপেক্ষে পঞ্চকামের উপভোগ করণীয়। যার এতে নিষ্ঠা নেই তার পক্ষে নির্বাণ লাভও সম্ভব নয়। সহজিয়াদের এই ধর্মমত একসময় বাংলায় প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। মানুষ যা চাইত, বজ্রগুরুরা তা-ই অনুমোদন করতেন। তাঁদের আরেক নাম ছিল সিদ্ধাচার্য। জানা যায়, এরূপ ৮৪ জন সিদ্ধাচার্য ছিলেন। এঁরা উপদেশ কিংবা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়েই নয়, বরং বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর সুরে গান গেয়ে সাধারণ মানুষের কাছে সহজযানতত্ত্ব পৌছে দিতেন। তাঁদের এ গানগুলো রচিত হয়েছে রহস্যময় এক আলো-আঁধারি সন্ধ্যাভাষায়। এ ভাষা শোনামাত্র একরকম অর্থবোধ হয়, আবার গূঢ়ভাবে চিন্তা করলে রহস্যময় অন্য অর্থ হয়। এই আলো-আঁধারি ভাষাই বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন এবং এই ভাষাতেই রচিত হয় চর্যাপদ। চর্যাপদের পদকর্তা লুইপা, ভুসুকুপা, কাহ্নপা, সরহপা, শান্তিপা, শবরপা প্রমুখ সিদ্ধাচার্য সহজিয়া ধর্মমতে দীক্ষিত ছিলেন। আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাকে বলা হয় বাংলা সাহিত্যের আদি কবি।

**সহজিয়া** একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়, যারা সহজপথে সাধনা করে। 'সহজ' শব্দের অর্থ যা সঙ্গে সঙ্গেই জন্মায়। জীব বা জড়ের বাহ্য রূপের সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরেও একটি শাশ্বত স্বরূপ জন্মলাভ করে। এই শাশ্বত স্বরূপই 'সহজ'। এর উপলব্ধির মধ্য দিয়েই যাবতীয় প্রাণী ও বস্তুর উপলব্ধি হয়। আর এই উপলব্ধির প্রণালিই হলো সহজ। 'সহজ' শব্দের আরেকটি অর্থ হলো যা মানুষের স্বভাবের অনুকূল, আর যা প্রতিকূল তা বক্র। এ অর্থে মনুষ্য স্বভাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা না করে বরং স্বভাবের অনুকূল পথে আত্মোপলব্ধির চেষ্টা করাই সহজিয়া মতের লক্ষ্য। সহজিয়াদের বিশ্বাস, সাধনার যিনি লক্ষ্য তিনি জ্ঞানস্বরূপ; তাঁর অবস্থান দেহের মধ্যে, দেহের বাইরে নয়। সুতরাং দেহকে বাদ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না। তাঁকে যুক্তিতর্ক বা গ্রন্থপাঠেও জানা যায় না, জানা যায় কেবল গুরুপদেশ ও সহজ-সাধনায়। তাই সহজ-সাধনায় দেহের গুরুত্ব অনেক। দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড মনে করা হয়। দৈহিক সাধনা বা পরকীয়ার মধ্য দিয়েই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায়।

সহজিয়ারা দুই ভাগে বিভক্ত। বৌদ্ধ সহজিয়া ও বৈষ্ণব সহজিয়া। বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদ সহজযান নামে পরিচিত। বজ্রযানী বৌদ্ধদের মধ্যে মন্ত্র-তন্ত্র, পূজার্চনা, ব্রত-নিয়ম, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদির প্রাবল্য দেখা দিলে তাদেরই একটি অংশ উপলব্ধি করে যে এসব শাস্ত্রাচার পালন নিরর্থক। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বোধি বা বুদ্ধ আছেন এবং কেবল সহজ-সাধনায় তাঁকে উপলব্ধি করতে পারলেই মোক্ষ লাভ করা যায়। যা মানুষের মধ্যে শাশ্বত স্বরূপের উপলব্ধি আনে, তার মাধ্যমে জগতের প্রাণীকুল ও বস্তুনিচয়কে অনুভব করার দর্শনই বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মমতের অন্তর্নিহিত সত্য। বৃহত্তর অর্থে বৌদ্ধধর্মের যে মহাযান ধর্মমত, তাই পরবর্তীকালে বজ্রযান, কালচক্রযান, মন্ত্রযান,

সহজযান ইত্যাদি উপবিভাগে বিভক্ত হয়। ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এসব মতবাদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও নির্বাণ সম্পর্কে সকলে এক। সহজিয়া ধর্মসাধনার অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং ভাগ্যচক্রে সংঘটিত পুনর্জন্মের প্রান্তসীমা অতিক্রম করে নির্বাণ লাভ করা। এমতে যারা দীক্ষিত তারা কতগুলো তান্ত্রিক আচার-আচরণের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে পারে বলে বিশ্বাস করে। এই সাধনতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই বৌদ্ধগান ও দোহার পদগুলো রচিত।

সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণবসমাজে এবং অষ্টাদশ শতকে বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজিয়া ধর্মমতের সম্প্রসারণ ঘটে। বৌদ্ধ সহজিয়াদের মতো বৈষ্ণব ও বাউল সাধকেরাও সাধনার এই পথ ধরে জীবনের স্বরূপ উপলব্ধিতে বিশ্বাসী।

**সহজিয়া বৈষ্ণব** ঈশ্বর সাধনার অন্যতম ধর্মমত ও সম্প্রদায়। চতুর্দশ শতকের কবি বড়ু চণ্ডীদাসকে এই মতের উদ্ভাবক ও প্রচারক বলা হয়। রামী নামে এক রজকিনীর সাহচর্যে তিনি এই তত্ত্ব-দর্শনের সন্ধান লাভ করেন। পরবর্তীকালে খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বৌদ্ধ সহজিয়াদের অনুকরণে এই মত সমাজে প্রচলিত হয়। এই মতের অনুসারীরা নিজেদের সহজ রসিক বা সহজ পথের পথিক মনে করে। এখানে 'সহজ পথ' অর্থ প্রেম, যা মানুষের সহজ ধর্ম। এই প্রেম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ এবং তার জন্য মানবদেহই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। বৈষ্ণব সহজিয়াদের মূল আদর্শ রূপ-প্রেম-আনন্দ।

বৈষ্ণব সহজিয়াদের দার্শনিক মত ও সাধনপদ্ধতি দুইই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের থেকে স্বতন্ত্র। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা পরকীয়াকে সাধনার রূপক হিসেবে গ্রহণ করে, বাস্তব জীবনে নয়। কিন্তু সহজিয়া সাধকেরা বাস্তব জীবনেও পরকীয়ায় বিশ্বাস করে। এদের বিশ্বাস, এর মধ্য দিয়েই সিদ্ধিলাভ সম্ভব।

বৈষ্ণব সহজিয়াগণ কামকে প্রেমে পরিণত করতে চান। তাঁদের মতে, রস ও রতির প্রতীক কৃষ্ণ ও রাধার যে সহজ রসলীলা, তা শুধু স্বর্গের বস্তু নয়, তার সঙ্গে মর্তেরও যোগ আছে। পৃথিবীর নর-নারীও আরোপতত্ত্বের (রূপে স্বরূপের আরোপ, যেমন নর-নারীতে কৃষ্ণ-রাধার আরোপ) মাধ্যমে সীমাবদ্ধ মানবদেহেই সেই রসরতির অপার্থিব স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। এই আরোপ সাধনার দ্বারা যখন স্বরূপ উপলব্ধ হয়, তখন নর-নারীর আকর্ষণে আর কাম থাকে না, তা প্রেমে পরিণত হয়। এভাবে মানবকেই দেবপীঠস্থানে তুলে ধরা সহজিয়া মতের প্রধান লক্ষ্য। তবে এ সহজ-সাধনা অত্যন্ত কঠিন। বৈষ্ণব সহজিয়াদের মতে, সহজ-সাধনা হলো সাপের মুখে ভেক নাচানো, অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়ার আশায় লোভনীয় বস্তু সামনে থাকলেও লোভ সংবরণ করা। চণ্ডীদাসের মতে, এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় কোটিতে মাত্র গুটি কয়েকের।

পরকীয়া বা দেহসাধনাকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে বৈষ্ণব সহজিয়ারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হয়। এ নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ দূরত্বেরও সৃষ্টি হয় এবং সহজিয়াদের সামাজিক মর্যাদা অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হয়। স্বয়ং চণ্ডীদাসকেও এ জন্য ব্রাহ্মণসমাজ ছাড়তে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও পর্যায়ক্রমে এই সহজ-সাধনার প্রসার ঘটতে থাকে এবং একসময় তা ঈশ্বর সাধনার অন্যতম পন্থা হিসেবে স্বীকৃত হয়।

বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় এক বিশাল সাহিত্য গড়ে ওঠে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বৌদ্ধ সহজযানের মূল সূত্রগুলো স্পষ্টভাবে বিধৃত। চণ্ডীদাসসহ সহজিয়া মতের আরও অনেক কবি নিজেদের তত্ত্বসাধনা সম্পর্কে প্রহেলিকাপূর্ণ ভাষায় রাগাত্মক পদ (যে পদে বিশুদ্ধ অনুরাগকেই সাধ্য-সাধন বলে গ্রহণ করা হয়) রচনা করেছেন।

**সাইরেনাস** কুমারীর চেহারাসদৃশ তিনটি পাখি। ইতালির দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলে তাদের নিবাস। তারা তাদের মিষ্টি গান দিয়ে নাবিকদের ভুলিয়ে কাছে টানে। এরপর হত্যা করে।

**সাংখ্য** সেই দর্শনকে বোঝায়, যা আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে। এই দর্শনের প্রবর্তক কপিল মুনি। প্রাচীনতম ভারতীয় দর্শন। এর উদ্ভবকাল গৌতম বুদ্ধের আগে খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতক। *মহাভারত,*

*পুরাণ, চরকসংহিতা, মনুসংহিতা, ভগবদ্গীতা* ইত্যাদি গ্রন্থে এর বিশেষ উল্লেখ থেকে অনুমিত হয় একসময় এই দর্শনের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

**সাংসারেক** গারো সম্প্রদায়ের ধর্মাচারণ। প্রথাগত ধর্মবিশ্বাস, মূর্তিপূজা, পাপপুণ্য, ভগবান, স্বর্গনরক ইত্যাদির কোনো ধারণা গারোদের নেই। জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, ফসল সংরক্ষণ, রোগশোক, মহামারি, ভূত-প্রেত-রাক্ষসী ইত্যাদি অদৃশ্য অপশক্তির অমঙ্গল থেকে বাঁচার জন্য তারা বারো মাসে তেরো ব্রত ও পর্ব-পার্বণ পালন করে থাকে। গারোরা সর্বপ্রাণবাদী ও বস্তুর দ্বৈতসত্তায় বিশ্বাসী এবং প্রকৃত ও জড়বস্তুতে প্রাণ আরোপ করে। সাপ ও বাঘকে মনে করে প্রেতাত্মার দেহীরূপ। কোনো কোনো মানুষ দিনে মানুষ থাকে এবং রাতে বাঘ হয়ে যায়। কোনো কোনো গাছ, পাথর, টিলাকে ভূতপ্রেতের আবাস ভেবে গারোরা এগুলোকে এড়িয়ে চলে। গারোদের অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপন, মহামারির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ব্রত পালন, তাবিজ-তুমার দিয়ে রোগবালাইয়ের নিরাময় ইত্যাদি যাঁরা করেন, তাঁরা সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি। খামাল বা কামাল নামে তারা পরিচিত। অপশক্তির কুনজরের ভয়ে শিশুর সুশ্রাব্য নাম রাখা হয় না। মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা যেন অমঙ্গল না করে, সে জন্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগে ও পরে পশুবলি, পিণ্ডদান, বিবিধ ব্রত পালন এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা হয়। আগে সমভূমি থেকে মানুষ ধরে নিয়ে নরবলিও করা হতো। গারোদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর আত্মা পর্বতের উচ্চতম চিক সাং শিখরে কিছুকাল অবস্থান করে অজানা পৃথিবীর অজ্ঞাত স্থানে ঘোরাঘুরি করতে করতে অবশেষে প্রেতাত্মারূপে ফিরে আসে কিংবা মানুষ বা পশুরূপে পুনর্জন্ম লাভ করে। আত্মঘাতক কিংবা হিংস্র জন্তুর আক্রমণে নিহত ব্যক্তি পশু হয়ে জন্মায়। মৃতের সৎকারে প্রধান পদ্ধতি হচ্ছে মিমাংখাম। মরদেহকে স্নান করিয়ে উত্তমরূপে তেল মাখিয়ে দেয় এক নারী। অন্য নারীরা তখন বিলাপসংগীত গায়। নারী-পুরুষনির্বিশেষে পুরুষেরা মৃতকে কাফন পরায়। সাধ্যানুসারে মূল্যবান বস্ত্র দ্বারা উপাসনা করা হয়। চিতা থেকে এক টুকরো অর্ধপোড়া হাড় এনে মৃতের পূর্ব বাসঘরে খাটিক-এ পুঁতে রাখা হয়। চিতাভস্মের কিয়দংশ খেতে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকজন সাত দিন নিরামিষ ভোজন করে ও মৃত ব্যক্তিকে পিণ্ডদান করে। তারপর ভাত, মুরগি ও শূকরের মাংস দিয়ে শ্রাদ্ধ পালন করা হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় শোকমিছিল। গারোরা মৃত ব্যক্তির শেষ পিণ্ডদানের দিন নাচ-গান ও প্রচুর মদ্যপান করে।

গারোদের কাছে চন্দ্র, সূর্য, বৃষ্টি, নদী, ফসল ইত্যাদি দেবতুল্য। চৈত্র মাসে গারোরা জঙ্গল কেটে ও পুড়িয়ে ধান বপন করে। নিরাপত্তার জন্য আসিরোকা নামক নববর্ষ পালন করে। খেত ও গোলা থেকে উৎপন্ন ফসল যাতে কেউ চুরি করে না নিয়ে যেতে পারে, সে জন্য প্রতিটি ফসল বপন ও সংগ্রহের সময় বিভিন্ন নামে তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে থাকে, যার মধ্যে ওয়াংগালা অনুষ্ঠান সবচেয়ে বড়। সবাই ঘরে মজুত করা মদ পান করে। বিভিন্ন গোত্রের যুবক-যুবতীরা বিশেষ পোশাক পরে, দেহ-মুখ চিত্রিত করে নাচ-গানে মাতাল হয়ে ওঠে। পরস্পরের পছন্দসই যুবক-যুবতীরা বারংবার পরস্পরের মুখে মদ ঢেলে দিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গী বেছে নেয়। মহিষের শিঙা, ঢাক-ঢোল ও সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র একসঙ্গে বাজতে থাকে। শক্তিশালী যুবকেরা ভূতপ্রেত-রাক্ষসীকে ভয় দেখাতে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে তাণ্ডব নর্তনকুর্দনে মেতে ওঠে। ভূতপ্রেত-রাক্ষসীকে দুভাবে প্রশমিত রাখার চেষ্টা করা হয় রোগালা বা ভোগ দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে।

গারো স্বামীরা বাড়িতে ঘরজামাই হিসেবে থাকে ও কাজ করে খায়। সম্পত্তির মালিক মা, তারপর কনিষ্ঠ কন্যা বা মায়ের মনোনীত অন্য কোনো কন্যা। উত্তরাধিকারিণীকে বলা হয় নকমা। স্বামীর অর্জিত সম্পত্তি স্ত্রীর অধিকারে থাকে। সন্তানেরাও মায়ের সম্পত্তি। মায়ের বংশসূত্রে এদের পরিচয়। সন্তানদের লালন-পালনের দায়িত্ব মায়ের ওপর। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ওই বাড়িতে স্বামী থাকার নৈতিক অধিকার নেই। পরিবারে মেয়ের সমাদর ছেলের চেয়ে বেশি। মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে গারোসমাজে পুরুষের চেয়ে নারীদের শিক্ষার হার

বেশি। গারোদের মধ্যে সমগোত্রে বিয়ে নিষিদ্ধ। সমগোত্রের যুবক-যুবতীর সম্পর্ক ভাই-বোনের। গারো সমাজে রয়েছে ১০টি গোত্র। প্রথা ভঙ্গ করে কেউ বিয়ে করলে সম্পত্তি থেকে সে উত্তরাধিকারহীন হয়। গ্রাম থেকে বহিষ্কৃত হয়। দুটি জবাই করা মোরগ পাশাপাশি ছেড়ে দেওয়ার পর এগুলো যদি দাপাদাপি করে একত্র হয়ে যায়, তবে বিয়ে শুভ বলে গণ্য হয়। অনেক সময় যথার্থ গোত্রের মেয়ের পছন্দসই কোনো যুবককে ধরে এনে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এতে ছেলের গোত্রের আপত্তি থাকে না। এদের সমাজে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত। স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী স্বামীর গোত্রের কোনো স্ত্রীবিহীন পুরুষকে স্বামী হিসেবে দাবি করতে পারে। স্বামীর মৃত্যুর পর জামাতা শাশুড়িরও স্বামীরূপে বিবেচিত। এতে মা-মেয়ের মধ্যে সতিনের তিক্ত সম্পর্ক তৈরি হয় না। নাবালিকার সঙ্গে বিয়ে হলে সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত শাশুড়ির সঙ্গে জামাতার যৌনসম্পর্ক বিধেয়। গারো সমাজে একসময় গোষ্ঠী বিয়ে ও অবাধ যৌনাচার থাকলেও পরে বাধানিষেধ আরোপিত হয়। বিবাহপূর্ব অসম সম্পর্কের সূত্রে নারী-পুরুষের যৌনাচার জরিমানা ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। প্রমাণের অভাবে খামাল কিছু কঠিন পরীক্ষা দ্বারা দোষী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে। বিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক অনাচারের শাস্তি হচ্ছে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ।

অক্ষরবিহীন অলিখিত গারো ভাষার নাম আচ্ছিক কথা অর্থাৎ পাহাড়িয়া ভাষা। প্রবাদ, প্রবচন, শোলক, ছড়া-গান ও উপকথায় এ ভাষা ভরপুর। গারো উপকথা অনুসারে জানা যায়, গন্ডারের চামড়ায় গারো ভাষায় এদের লিখিত শাস্ত্র ছিল। কষ্টকর যাযাবর জীবনে তা বিনষ্ট হয়ে যায়।

**সাঁওতালদের আদি ধর্ম** সাঁওতালদের জাতীয় দেবতা মারাং বুরু (বৃহৎ পর্বত)। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁদের আদি পিতা ও মাতার সাত পুত্র ও সাত কন্যা থেকেই সাত গণ বা গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়। এই সব গণ বা গোষ্ঠী হচ্ছে হাঁসদা, মুর্মু, কনকু, হেমব্রন, মারাড়ি, সরেন ও টুডু। মারানডি মারাড়িরই ভিন্ন রূপ। স্থান, জমিজায়গা ও যথেষ্ট খাদ্যসংকুলান না হওয়ায় প্রথমে সব গোষ্ঠী বাস করত হিহিড়ি-পিছিড়িতে। অনেকে চলে যায় চাইচম্পায়। পরে সিলদায় সিকারে। ছোট নাগপুরে ও ওসিরে পর্বতে জঙ্গল সাফ ও চাষের কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জনের জন্য ভূস্বামীদের কাছে তাদের কদর ছিল। উনবিংশ শতকের প্রথমে তারা রাজমহলের সামনে কোচ এলাকায় এসে বন কেটে জমি হাসিল করে। ১৭৯০ সালে ইংরেজ কোম্পানির সরকার ঘোষণা দেয় যে হাসিল করা জমিতে কর ধার্য করা হবে না। তাঁদের নাম অনুসারে পরগনার নাম সাঁওতাল পরগনা। বাংলাদেশে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলায় সাঁওতালদের বাস। তারা প্রকৃতির উপাসক। আবার শিবসহ বড় দেব-দেবীদের তারা পূজা করে। তাদের সৃষ্টিকর্তার নাম ঠাকুর জিয়ো। এদের গোত্র ১২টি। আবার অনেকের মতে, সাঁওতালদের গোত্রের সংখ্যা ১১টি এবং তিন শতাধিক উপগোত্র রয়েছে। এদের মধ্যে নানান বিধিনিষেধ আছে। গোত্রের নামগুলো টোটেম-জাতীয় পশুপাখি, গাছপালা ইত্যাদি থেকে নেওয়া। বর্তমানে বহু সাঁওতাল খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী। পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা অলচিকি লিপি অনুসরণ করে এবং বাংলাদেশে বাংলা।

**সাঁচী** ভারতের ভোপাল শহরের কাছে বৌদ্ধ রাজা অশোকের সময় তৈরি প্রায় ৫৪ ফুট উঁচু স্তূপ অবস্থিত। বুদ্ধের জীবনের বহু ঘটনা চারটি তোরণে অঙ্কিত।

**সাক্ষী শ্রেষ্ঠ** আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ সাক্ষী। এ কথা পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরায় বলা হয়েছে।

**সাগ্রাই** পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোকজনের পুরোনো বছরকে বিদায় এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে পালনীয় একটি চার দিনের উৎসব। এটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে পুরোনো বছরের শেষ তিন দিন এবং নতুন বছরের প্রথম দিন। উৎসবের প্রথম দিন মারমা নারী-পুরুষ মিছিল করে সব বুদ্ধমূর্তিকে নদীর ঘাটে নিয়ে যায় এবং ভেলায় স্থাপন করে চন্দন-জল কিংবা দুধ-জলে স্নান করিয়ে মন্দিরে কিংবা বাড়িতে পুনঃস্থাপন করে। পুরোনো বছরের শেষ দুই দিন পাড়ায় পাড়ায় চলে 'জলক্রীড়া' উৎসব। তারা একে

অপরকে জল ছিটিয়ে পুরোনো বছরের ব্যর্থতা, গ্লানি ও দুঃখকে ধুয়ে-মুছে দিতে চায়। এরপর নতুন বছরের প্রথম দিনটিকে তারা আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে বরণ করে নেয়। এদিন রাখাইন সম্প্রদায় 'রংপানি' খেলায় মেতে ওঠে। চৈত্রের শেষ দুই দিন এবং পয়লা বৈশাখ এই তিন দিনব্যাপী চাকমাদের ভেতর মহাসমারোহে পালিত হয় 'বিঝু' উৎসব। প্রথম দিন 'ফুল বিঝু', দ্বিতীয় দিন 'মূল বিঝু' এবং পয়লা বৈশাখ 'গোজাই পোজ্যার দিন'। প্রথম দুই দিন চাকমারা কোনো কাজকর্ম করে না, আনন্দ উৎসবে কাটিয়ে দেয়। 'মূল বিঝু'ই হচ্ছে তাদের মূল উৎসব। সারা দিন তারা একে অপরের বাড়িতে খাওয়ার উৎসবে মেতে ওঠে। অপরাহ্নে বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে।

**সাজ্জাদাহ** নামাজ পড়ার জন্য মাদুর বা কার্পেট-বিশেষ। আমাদের দেশে জায়নামাজ বলে সমধিক পরিচিত। আরবি সিজদাহ শব্দ থেকে সাজ্জাদাহ শব্দটি উদ্ভূত। একে মুসাল্লাও বলা হয়। বিধিমোতাবেক জায়নামাজ এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যে তা প্রায় একজন মানুষের সমান লম্বা হয়, যাতে সিজদা দেওয়ার সময় শরীরের কোনো অংশ মেঝে ছুঁয়ে না যায়। এর আকার সাধারণের মিহরাবের অনুরূপ।

**সাজ্জাদানশিন** সাজ্জাদার অর্থ নামাজের জন্য ব্যবহৃত, নশিন অর্থ ক্ষমতাসীন। নামাজের সময়ে সাজ্জাদানশিন পদটি অগ্রাধিকার লাভ করে। ওই পদাধিকারীকে কিছু কিছু ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে হয়। ওয়াকফনামায় কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকলেও সাজ্জাদানশিনের উত্তরাধিকারমূলক প্রশ্নটি প্রথাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সাজ্জাদানশিনের ক্ষেত্রে কোনো মহিলা মুতাওয়াল্লি হতে পারেন না। আদালত সাজ্জাদানশিন নিয়োগের সাধারণ ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠাতার কোনো বংশধরকে নিয়োগ করেন। খানকাহ একটি প্রতিষ্ঠান, যা ধর্মীয় উপদেশাবলি প্রদানের জন্য নির্মিত। সাজ্জাদানশিন সেখানকার ধর্মীয় মতবাদ এবং জীবনযাপন-প্রণালিসম্পর্কিত বিষয়ের শিক্ষাদাতা, প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক, তার দান-সংক্রান্ত বিষয়ের প্রশাসক একজন মুতাওয়াল্লির চেয়ে খানকাহর অতিরিক্ত আয় গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর অধিকার ব্যাপক।

**সামবেদ** ধর্মীয় সংগীতের সমষ্টি। চতুর্বেদের অন্যতম গ্রন্থ। অপর তিনটি হলো বেদ ঋক্, যজু ও অথর্ব। ঋক্ মন্ত্রে সুর যোজনা করে গান করলে তা সামবেদে পরিণত হয়। আধুনিক রাগরাগিণীর সঙ্গে সামবেদ তুলনীয়।

**সারবেরাস** তিন মাথাবিশিষ্ট কুকুর। এরা হেডিস নরকের তোরণ পাহারায় নিয়োজিত। গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী, হেডিস হলো পাতালপুরীর সম্রাট, যেখানে মৃতের আত্মারা থাকে।

**সার্সি** ১. গ্রিক কিংবদন্তি অনুযায়ী সার্সি একজন ডাইনি। তিনি তাঁর সম্মোহনী শক্তির জন্য বিখ্যাত। হোমারের বর্ণনায় তিনি সুকেশী। অনেক সময় তাঁকে অন্ধকার ও ইন্দ্রজালের দেবী হেকেটের কন্যা হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে তিনি তাঁর চুলের ফিতা দিয়ে ভাগ্য এবং সৃষ্টি ও ধ্বংসযজ্ঞকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তাঁকে একই সঙ্গে চাঁদের দেবী এবং ভালোবাসার অবমাননার দেবী হিসেবেও বর্ণনা করা হয়। ২. কল্পিত অপরূপ সুন্দর সমুদ্রকন্যা। তিনি ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার অধিকারিণী। ইউলিসিসের সেবায় তিনি নিয়োজিত ছিলেন। তাঁকে ঘিরে ইউলিসিসের ইচ্ছা পূরণ হয়নি। তাঁর সব চেষ্টা বিফলে যায়।

**সালাত** আরবি 'সালাত'-এর চেয়ে আমরা ফারসি 'নামাজ' শব্দের সঙ্গে বেশি পরিচিত। নামাজ দ্র.।

**সালাফি** পশ্চিমা দুনিয়ার বিজ্ঞান এবং যুক্তিশীলতার সঙ্গে ইসলামের পুনঃসংগতিস্থাপন ছিল এই ইসলামি আন্দোলনের লক্ষ্য। এর নামকরণ ঘটে সালাফ আল-সালিহীন বাক্যাংশ থেকে, যার অর্থ 'পুণ্যবান পূর্বসূরি'। জামাল আল-দিন আল-আফগানি এবং মোহাম্মদ আবদুহ এর উদ্যোক্তা। যাঁরা এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেন, মনে করেন, পূর্বসূরিদের অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পরিবর্তে এর মাধ্যমে তাকে বিনাশ করা হয়। আবারও বলা যায়, আধুনিক বিজ্ঞানের যেসব অর্জন পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত, তা অনুসন্ধানের নানান প্রয়াস এই আন্দোলনের

মাধ্যমে উৎসাহিত হয়ে শরিয়ার নিয়ন্ত্রণ থেকে নারীদের মুক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। সালাফি আন্দোলন উত্তর আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রভাবিত করে; অনেকের মতে, মোহাম্মদ আবদুহর সালাফি দৃষ্টিভঙ্গি উনবিংশ ও বিংশ শতকের ইউরোপের যুক্তিশীল, মানবতাবাদী আদর্শের সঙ্গে মুসলমান-জগতের সাক্ষাৎ যোগাযোগের ফসল। এই আন্দোলনের দৃষ্টিতে মোহাম্মদ (সা.) পুণ্যবান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা একজন নৈতিক নেতা, যিনি আরব সমাজ পরিবর্তন এবং সংস্কার করেন। তাঁরা তীব্র সমালোচনা করেন ইসলামের মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিক এবং মরমি ধারার। বিংশ শতকের শেষে নতুন ধরনের সালাফি চিন্তা বিকশিত হয়, যা 'মূলে' ফিরে যাওয়ার ওপর জোর দেয়; এবং সনাতন ইসলাম, বিশেষ করে সুফিবাদের সালাফিয়া শব্দটিকে নিয়ে কোথাও কোথাও সমালোচনা করেন। বর্তমানে 'ফান্ডামেন্টালিজম'-এর আরবি প্রতিশব্দ হিসেবে সালাফি শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

**সালেহ (আ.)** আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। আর্য জাতির ধ্বংসের পর আরবের উত্তরাঞ্চলে আল জের পার্বত্য এলাকায় সামুদ জাতির উত্থান ঘটে। তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য সালেহ (আ.) প্রেরিত হন। সামুদরা অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনের দাবি করলে আল্লাহ তাঁর মোজেজাস্বরূপ পাহাড় থেকে একটি উষ্ট্রী সৃষ্টি করে নির্দেশ দিলেন, যেন তাঁর সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার না করা হয়। সামুদরা আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সালেহ (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা রক্ষা পান।

**সাহাবা** বন্ধু, সঙ্গী। আরবি সাহাবি শব্দের বহু বচন। দ্বিতীয় খলিফা উমরের সময় তাঁর দিওয়ান গঠনের সময় সাহাবিও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাঁরা মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রত্যাদেশকে গ্রহণ করেন। এরপর হাদিসের বর্ণনা দেন। প্রথম চারজন খলিফাসহ ১০ জন সাহাবিকে মহানবী জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেন। আলী ছাড়া অন্য সাহাবিগণকে শিয়া সম্প্রদায় স্বীকার করেন না এবং তাঁদের হাদিসও গ্রহণ করেন না। শিয়ারা আলী ও তাঁর পরিবার এবং তাঁর প্রভাবশালী বংশধরদের হাদিসই কেবল গ্রহণ করেন। সাহাবাদের নামের শেষে 'রাদি আল্লাহু আনহু', সংক্ষেপে 'রা.' অর্থাৎ 'আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন' বলা হয়। প্রায় ১ লাখ সাহাবার মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা হলো প্রথম চার খলিফার। এরপর তাঁদের স্থান, যাঁদের এ জীবনেই জান্নাতের শুভসংবাদ দেওয়া হয়। এঁদের পর তাঁদের স্থান, যাঁরা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আমার সাহাবিরা তারকাপুঞ্জের মতো, তোমরা তাঁদের মধ্যে যাঁদেরই অনুসরণ করো সৎপথ লাভ করবে।'

**সাহেবধনী** এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব নদীয়া জেলার দোগাছিয়া-শালিগ্রামে। এর প্রকৃত প্রবর্তক কে তা জানা যায় না। অক্ষয়কুমার দত্ত বলেন, ওই গ্রামের একজন উদাসীন সাধক এ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তাঁর সান্নিধ্যে ও উপদেশে দোগাছিয়ার দুঃখীরাম, বাগাড়ের রঘুনাথ দাস এবং কতিপয় হিন্দু-মুসলমান মিলে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তন করেন। দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, এ সম্প্রদায়ের উৎসমূলে আছেন একজন মুসলমান ফকির। এঁদের মধ্যে মুসলমান গুরুর শিষ্য এবং হিন্দু গুরুর হিন্দু ও মুসলমান শিষ্য উভয়ই আছে। সাহেবধনীরা জাতিভেদ ও বর্ণভেদ মানে না এবং মূর্তিপূজাও করে না। গুরুর আসনকে সামনে রেখে প্রতি বৃহস্পতিবার তারা একত্রে বসে উপাসনা করে। তারা তাদের উপাস্যকে 'দীনদয়াল', 'দীনবন্ধু' ইত্যাদি নামে অভিহিত করে।

**সিঁদুর** বিবাহিতা হিন্দু মেয়েরা তাঁদের কপালে এবং সিঁথিতে লাল রঙের গুঁড়া বা চূর্ণ ব্যবহার করেন। এটি বিয়ের একটি রীতি এবং স্পষ্টত তা প্রাচীন উপজাতীয় সংস্কৃতি থেকে এসেছে। মানবসমাজের গুরুত্বপূর্ণ একটি রীতি বিয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ সিঁদুরের ব্যবহার প্রাচীন উপজাতীয় সমাজে অবশ্যপালনীয় ছিল। আজও লোধা সমাজে কনের কপালে এবং সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে বিয়ে হয়। এ সময় পুরোহিত বা 'দেহেরি' ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান, যেন বর-কনে সুখে-শান্তিতে সংসার করেন। এঁদের বিয়েতে কোনো মন্ত্র পাঠ করা হয় না। খড়িয়া সমাজে সবার সামনে কনে সম্প্রদান

হলে বর ও কনে নিজ নিজ আসনে দাঁড়িয়ে পরস্পরের কপালে সাত বার সিঁদুর লেপন করেন।

**সিগমুন্ড ফ্রয়েড** (১৮০০-১৯৩৯) ইউরোপীয় দার্শনিক। জন্মস্থান চেকোশ্লোভাকিয়া। ভিয়েনায় বসবাস করতেন। সাইকো-অ্যানালিসিসের জনক। অবচেতন ও অচেতন মনের মতবাদ প্রচার করেন। মানুষের মনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফ্রয়েড অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি, সম্মোহন পদ্ধতি, মনঃসংযোগ পদ্ধতি ইত্যাদির কথা বলেন। ফ্রয়েডের মতে, মানুষ অবচেতন প্রবণতা এবং সংস্কারের প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সে অর্থে সে স্বাধীন নয়।

**সিজদা** প্রণত হওয়া। নামাজের সময় উপুড় হয়ে দুই হাঁটু ও কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে নিবেদন করা। দৈনিক পাঁচবারের নামাজে বহুবার সিজদা দিতে হয়। যাঁরা নিয়ম করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন তাঁদের অনেকের কপালে সিজদার কালো দাগ স্থায়ী হয়ে যায়। ওই দাগ পুণ্যের এবং সম্মানের বলে মনে করা হয়। পবিত্র কোরআনের সুরা কালাম-এর ৪২-৪৩ আয়াতে বলা হয়েছে, 'সেই দারুণ সংকটের দিন যেদিন ওদের সিজদা করার জন্য ডাকা হবে, (সেদিন) কিন্তু ওরা তা করতে পারবে না, অপমানে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকবে, অথচ ওরা যখন নিরাপদ ছিল তখন তো ওদেরকে সিজদা করতে ডাকা হয়েছিল।'

**সিদ্ধার্থ** বৌদ্ধধর্ম দ্র.।

**সিদ্ধি** অর্জন, সাফল্য, সন্তুষ্টি, উৎকর্ষ। সংযম পালন করে যোগের উচ্চতর প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যে পরম আধ্যাত্মিক শক্তি যোগীরা অর্জন করেন এবং কৈবল্য লাভ করেন। সিদ্ধি আট রকম। ভিন্ন ভিন্ন মতে, এই সংখ্যার প্রকারভেদ রয়েছে। যোগতত্ত্ব উপনিষদে আট ধরনের সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে। আলোক জ্ঞান, আলোক দৃষ্টি, দূরবর্তী স্থানে দ্রুত গমন, অতিপ্রাকৃত কণ্ঠশক্তি, যেকোনো আকার ধারণ, ইচ্ছানুযায়ী দৃষ্টির অন্তরালে যাওয়া। যোগীর মলমূত্র লৌহে লেপন করে স্বর্ণ উৎপাদন এবং উচ্চমার্গে ভ্রমণ। ব্যাসের যোগশাস্ত্রের টীকায় অবশ্য উল্লেখ করা হয়েছে, সিদ্ধি হচ্ছে পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র হওয়া অতিশয় সূক্ষ্ম, অতিশয় বৃহৎ, চন্দ্রকে স্পর্শ করার অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা, অদম্য ইচ্ছা, যাবতীয় বস্তুর ওপর নিয়ন্ত্রণ, সকল আকারের প্রতি আধিপত্য লাভ, যোগীর ইচ্ছামতো যেকোনো বস্তু যেকোনো স্থানে স্থাপন। ধ্রুপদ সাংখ্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে, আব ধরনের সিদ্ধিযোগে অতিপ্রাকৃত অর্জনের চেয়ে চেতনার বিকাশই লক্ষ্য।

**সিফাত** আরবি এই শব্দের অর্থ গুণ, গুণাবলি। পবিত্র কোরআনে শব্দটির উল্লেখ নেই। আল্লার সিফাত বা গুণাবলি তাঁর আসমা বা নাম থেকে পৃথক। পবিত্র কোরআনে তাঁর নামগুলো প্রাচীন আরবি কাব্যে প্রয়োগকৃত বিশেষণ-বিশেষের মতো। আল্লাহর জাতের সঙ্গে তাঁর সিফাতের সম্পর্কে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সিফাত শাশ্বত ও আল্লাহর সত্তায় চিরবিরাজমান এবং সিফ্যতগুলো তাঁর সত্তা নয়। আবার সত্তার বাইরেও নয়। আল্লার সিফাত বর্ণনায় বা তাঁর সম্যক উপলব্ধির ক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। এক, আল্লাহর সত্তার একত্ব রক্ষা করা, দুই, এমন ব্যাখ্যা করা, যা আল্লাহর সত্তার ঐক্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং তিন, আল্লাহর সিফাতের মধ্যে কোনগুলো কেবল আল্লাহর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত, এবং কোনগুলো বস্তুজগতের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত তা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা।

**সিলভ্যানাস** রোমক দেব/দেবী। খিল কাঠ ও সব বৃক্ষাচ্ছাদিত অঞ্চলের অধীশ্বর।

**সিসিফাস** গ্রিক পুরাণে করিন্থের রাজার পুত্র। বিখ্যাত ডাকাত। থিসিয়াস তাঁকে হত্যা করেন। তাঁর অপরাধের শাস্তি হচ্ছে নরকে এক বিশাল প্রস্তরখণ্ড পাহাড়ের নিচ থেকে পাদদেশে অনবরত উত্তোলন করা। এই পাথরটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাহাড়ের চূড়ায় পৌছার পরই এটি সঙ্গে সঙ্গে আবার গড়িয়ে নিচে চলে যায়।

**সুকিয়া** মধ্য আমেরিকায় ওঝা বোঝাতে সুকিয়া পদটি ব্যবহার করা হয়। তাদের দেশে ওঝা বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যে রোগব্যাধি ভালো করতে পারে। ফলে ওই সমাজে ওঝার একটা সামাজিক মর্যাদা রয়েছে।

**সুত্তপিটক** বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। ওই গ্রন্থ পাঁচটি নিকায়ে বিভক্ত; দীঘনিকায়, মজঝিমনিকায়, সংসুত্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায় ও খুদ্দকনিকায়। দীঘনিকায়ে ব্রহ্মজালসুত্তে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারার ও

মহাপরিনির্বাণসুত্তে গৌতম বুদ্ধের শেষ জীবনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মজঝিমনিকায় সুত্তের মাধ্যমে বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংসুত্তনিকায়ে ২৮৮৯টি ছোট সুত্ত ৫৬টি সংসুত্তে বিভক্ত এবং বৌদ্ধধর্মের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনায় পূর্ণ। অঙ্গুত্তরনিকায়ে বৌদ্ধনীতি ও দার্শনিক তথ্য সম্পর্কে ১৩০৮টি ছোট ছোট সুত্ত আছে। খুদ্দকনিকায় খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থ, থের-থেরীগাথা, জাতক, নিদ্দেস, পটিসম্ভিদামগ্গ, অপদান, বুদ্ধবংস, চরিয়াপিটক প্রভৃতি গ্রন্থের সংকলনমাত্র।

ত্রিপিটকের তৃতীয় খণ্ড অভিধম্মপিটকে সুত্তপিটকে বুদ্ধের যে ধর্মতত্ত্বকে সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা বিশ্লেষিত হয়েছে। সুত্তপিটকে আলোচিত ধর্মের উচ্চতর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপই অভিধম্ম। অভিধম্মপিটকের অন্তর্ভুক্ত সাতটি গ্রন্থের মধ্যে প্রথম ধম্মসঙ্গণিতে মানসিক ও বাহ্য বিষয়গুলো রয়েছে। ধম্মসঙ্গণির আলোচ্য বিষয় তিন ভাগে বিভক্ত: চিত্ত বা চৈতসিক, রূপ ও সংক্ষিপ্তসার। দ্বিতীয় গ্রন্থ বিভঙ্গের স্কন্ধ, আয়তন, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি বিষয় সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় গ্রন্থে রয়েছে ধাতুকথায় ধম্মসঙ্গণি ও বিভঙ্গের স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতুবিষয়ক আলোচনা। চতুর্থ গ্রন্থ পুগ্গলপুঞ্ঞত্তিকে ব্যক্তিবিশেষের স্বরূপ বোঝাবার জন্য স্রোতাপন্ন, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত। পঞ্চম গ্রন্থ কথাবত্থুতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিথ্যাদৃষ্টি ও বিরুদ্ধবাদ খণ্ডন করে থেরবাদের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ষষ্ঠ গ্রন্থ যমকে খন্ধযমক, ধাতুযমক ইত্যাদি বিষয় এবং সপ্তম গ্রন্থ চব্বিশ প্রকার প্রত্যয়ের কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে।

**সুন্নাহ** রাসুলুল্লাহ (সা.) যা বলেছেন এবং করেছেন, সেসব এবং তাঁর আচরণ সুন্নাহরূপে গণ্য। তিনি কী অনুমোদন করেন এবং কী করেননি, তা তাঁর আচরণ থেকে বুঝে নেওয়া হয়েছে। যে রীতিনীতি বা প্রথা বা কাজ রাসুলুল্লাহর (সা.) সামনে বা জ্ঞাতসারে মুসলমানরা করেছিলেন এবং একাধিকবার করা সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ (সা.) বাধা দেননি, সেই রীতি বা প্রথা বা কাজ রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক অনুমোদিত বলে গৃহীত হয়েছে। আবার যে বিশেষ আচরণ রাসুলুল্লাহ (সা.) সর্বদা পরিহার করে চলতেন, তা তাঁর অননুমোদিত হিসেবে বিবেচিত।

**সুন্নি** সুন্নাহর সমর্থক বা অনুসারী। পবিত্র কোরআনে সুন্নাহ দুভাবে উল্লেখিত হয়েছে—প্রাচীন সুন্নাহ ও আল্লাহর সুন্নাহ। হাদিস অনুযায়ী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর কর্ম, উক্তি ও সমর্থনের দৃষ্টান্ত হলো সুন্নাহ। সুন্নাহর জ্ঞান নামাজে ইমাম হওয়ার অন্যতম মানদণ্ড। সুন্নাহ পবিত্র কোরআনের সমমর্যাদাসম্পন্ন নয় এবং পবিত্র কোরআনের কোনো সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে না, এটা পবিত্র কোরআনের পরিপূরক ও ব্যাখ্যা বলে বিবেচিত। মুসলমান সম্প্রদায় যে তিন মতাবলম্বী—খারিজি, শিয়া ও সুন্নি, তাদের মধ্যে সুন্নিরাই সংখ্যাধিক। সুন্নিদের মতে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতপ্রকাশ করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত কুরাইশবংশীয় ব্যক্তিই কেবল মোহাম্মদ (সা.)-এর খলিফা বা স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন। খারিজিদের মতে, খলিফা হওয়ার জন্য বংশপরিচয় নিতান্তই গুরুত্বহীন। সুন্নিরা ইসলামের চার খলিফাকে (খোলাফায়ে রাশেদিন) স্বীকার করেন। শিয়ারা প্রথম তিন খলিফাকে স্বীকার করেন না। শিয়াদের মতে, আহল আল-বায়াত বা নবী (সা.)-এর পরিবার অর্থাৎ হজরত আলী ও ফাতিমা (রা.)-এর বংশোদ্ভূতগণই ইমামতের অধিকারী। মুসলিম আইনের ইচ্ছাপত্র, উত্তরাধিকার, ওয়াক্ফ, বিয়ে, তালাক, দেনমোহর ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিয়া ও সুন্নি মতে পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশে বেশির ভাগ মুসলমান সুন্নি। আরবি সুন্নাহ শব্দের সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য। সুন্নাহ অর্থ পদ্ধতি রীতি, প্রথা, বিধান, আচরণ ইত্যাদি। সাহাবিরা হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও নির্দেশাদি পূর্ণরূপে অনুসরণ করেছেন বলে তাঁদের উক্তি, কাজ এবং নির্দেশাদিও সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। মহানবী (সা.) ও সাহাবিদের সুন্নাহর অনুসারীরাই সুন্নি। তাঁরা সাধারণত 'আহলু'স-সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আ' নামে অভিহিত হন। সুন্নিরা নিজেদের 'আল-ফিরকাতুন

নাজিয়্যা' অর্থাৎ ত্রাণপ্রাপ্ত দল বলে ধারণা করেন। তাঁদের মতে, এ দলের প্রথম সারিতে আছেন সাহাবিরা। পরবর্তীকালে মুসলিম মিল্লাত কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়। উল্লেখযোগ্য দলগুলো হলো খারিজি, শিয়া, মুতাজিলি ও সুন্নি। সুন্নিরাই সংখ্যায় বেশি। সুন্নি (আহলু'স-সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আ) নামটির উদ্ভব হয় আব্বাসি খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের আমলে (২৩২-৪৭ হি.)। খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল নিজে সুন্নি ছিলেন। তাঁকে 'মুহয়ুস-সুন্নাহ' (সুন্নাহর পুনরুজ্জীবন সাধনকারী) খেতাবে ভূষিত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে সুন্নি দলটি খলিফা ও বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। সুন্নি আকিদা ও মতবাদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে বিশেষ অবদান রেখেছেন আবুল-হাসান আল আশ'আরি (মৃ. হি. ৩২৪) ও আবু মানসুর আল-মাতুরিদি (মৃ. হি. ৩৩৩)। সুন্নিরা কয়েকটি দলে বিভক্ত: (১) মুকাল্লিদ-ফিকহি ইমামদের (যেমন চার মজহাবের ইমামদের) অনুসারীগণ, (২) গায়র মুকাল্লিদ—মাযহাব অস্বীকারকারী, এঁরা সালাফি ও আহল-ই-হাদিস নামে পরিচিত, এবং (৩) আহলুয-যাহিব, আল কোরআন ও হাদিসের কেবল প্রকাশ্য অর্থগ্রহণকারী আরও কিছু উপদল।

**সুফিবাদ** একটি ইসলামি আধ্যাত্মিক দর্শন। আত্মা-সম্পর্কিত আলোচনা এর মুখ্য বিষয়। আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনই হলো এই দর্শনের মর্মকথা। 'সুফ' অর্থ পশম আর তাসাউফের অর্থ পশমি বস্ত্রে পরিধানের অভ্যাস (লাবসুস-সুফ)। মরমিতত্ত্বের সাধনায় কারও জীবনকে নিয়োজিত করার কাজকে বলা হয় তাসাওউফ। যিনি নিজেকে এরূপ সাধনায় সমর্পিত করেন, তাঁকে সুফি বলে। তাসাওউফ বা সুফিবাদ বলতে অবিনশ্বর আত্মার পরিশুদ্ধির সাধনাকে বোঝায়। আত্মার পবিত্রতার মাধ্যমে ফানাফিল্লাহর (আল্লাহর সঙ্গে অবস্থান করা) মাধ্যমে বাকাবিল্লাহ (আল্লাহর সঙ্গে স্থায়ীভাবে বিলীন হয়ে যাওয়া) লাভ করা যায়। যেহেতু আল্লাহ নিরাকার, তাই তাঁর মধ্যে ফানা হওয়ার জন্য নিরাকার শক্তির প্রতি প্রেমই একমাত্র মাধ্যম। তাসাউফ দর্শন অনুযায়ী এই সাধনাকে 'তরিকত' বা আল্লাহ-প্রাপ্তির পথ বলা হয়। তরিকত সাধনায় মুর্শিদের প্রয়োজন হয়। সেই পথ হলো ফানা ফিশশাইখ, ফানা ফিররাসুল ও ফানাফিল্লাহ। ফানাফিল্লাহ হওয়ার পর বাকাবিল্লাহ লাভ হয়। বাকাবিল্লাহ অর্জিত হলে সুফি আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ শক্তিতে শক্তিমান হন। তখন সুফির অন্তরে সার্বক্ষণিক শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করে।

হজরত মোহাম্মদ (সা.) বলেন, 'মানবদেহে একটি বিশেষ অঙ্গ আছে, যা সুস্থ থাকলে সমগ্র দেহ পরিশুদ্ধ থাকে, আর অসুস্থ থাকলে সমগ্র দেহ অপরিশুদ্ধ হয়ে যায়। জেনে রাখো, এটি হলো কলব বা হৃদয়। আল্লাহর জিকর বা স্মরণে কলব কলুষমুক্ত হয়।' সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে কলবকে কলুষমুক্ত করে আল্লাহর প্রেমার্জন সুফিবাদের উদ্দেশ্য।

সুফিবাদ উৎকর্ষ লাভ করে পারস্যে। সেখানকার প্রখ্যাত সুফি-দরবেশ, কবি-সাহিত্যিক এবং দার্শনিকেরা নানা শাস্ত্র, কাব্য ও ব্যাখ্যা-পুস্তক রচনা করে এই দর্শনকে সাধারণের থেকে জনপ্রিয় করে তোলেন। কালক্রমে বিখ্যাত অলিদের কেন্দ্র করে নানা তরিকা গড়ে ওঠে। চারটি প্রধান তরিকা সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে: ১. বড় পীর হজরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) প্রতিষ্ঠিত কাদেরিয়া তরিকা, ২. সুলতানুল হিন্দ হজরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতি (র.) প্রতিষ্ঠিত চিশতিয়া তরিকা, ৩. হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী (র.) প্রতিষ্ঠিত নকশবন্দিয়া তরিকা এবং ৪. হজরত শেখ আহমদ মুজাদ্দিদ-ই-আলফে ছানী সারহিন্দী (র.) প্রতিষ্ঠিত মুজাদ্দিদিয়া তরিকা। এ ছাড়া সুহরাওয়ার্দি, মাদারিয়া, আহমদিয়া ও কলন্দরিয়া নামে আরও কয়েকটি তরিকার উদ্ভব ঘটে।

আরব, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে সুফিরা বাংলাদেশে সুফিবাদ প্রচার করেন। খ্রিষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে যেসব সুফি-সাধক এ দেশে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: শাহ সুলতান রুমি (র.), বাবা আদম শহিদ (র.), শাহ সুলতান বলখি (র.), শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুতশেকন (র.), শাহ

মখদুম রুপোশ (র.), শেখ ফরিদউদ্দিন শক্করগঞ্জ (র.), মখদুম শাহ দৌলা শহিদ (র.) প্রমুখ। এঁরা গভীর পাণ্ডিত্য ও বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলেও কথিত আছে। কয়েকজন সুফি-দরবেশ ইসলাম ও সুফিবাদ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তাঁদের মধ্যে শেখ জালালুদ্দিন তাব্রিজি (র.), শাহ জালাল (র.), শেখ আলাউল হক (র.), খান জাহান আলী (র.) শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা (র.), শাহ ফরিদউদ্দিন (র.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের গুরুসাধকেরা আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে যেভাবে দীক্ষা দান করতেন, সেভাবে মানবপ্রেম তথা সৃষ্টির প্রতি প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রেমার্জন সুফিবাদের মূল আদর্শ। সুফিরা নিজেদের আদর্শ জীবন এবং সুফিবাদের প্রেম-ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের মধুর বাণী প্রচার করে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এ দেশের সাধারণ মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনেও সুফিদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন নদী ও সমুদ্রপথে যাতায়াতের সময় মাঝিরা 'বদর পীরের' নাম স্মরণ করে। শুধু তা-ই নয়, নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে শহরের যানবাহনে পর্যন্ত বিভিন্ন পীর-আউলিয়ার নাম লেখা থাকে। লৌকিক ধারার মুর্শিদি-মারফতি গান, গাজির গান, গাজিকালু-চম্পাবতী কাব্য ও অন্যান্য মরমি সাহিত্য, মাদার পীর ও সোনা পীরের মাগনের গান ইত্যাদি বিভিন্ন পীর-দরবেশকে কেন্দ্র করে রচিত।

**সুফিসাহিত্য** মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা, যা সুফিতত্ত্বকে আশ্রয় করে উদ্ভূত ও বিকশিত হয়। এ প্রেরণা এসেছিল বহিরাগত সুফি সাধকদের কাছ থেকে। তাঁরা মুসলিম বিজয়ের আগ থেকেই আরব-ইরান থেকে বাংলাদেশে আসতে শুরু করেন। ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি সুলতান বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর রাজপুরুষ, বণিক ও বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সঙ্গে ধর্মজ্ঞানী আলেম ও পীর-দরবেশদেরও আগমন বৃদ্ধি পায়। তাঁরা ঢাকা, বগুড়া, পাবনা, চট্টগ্রাম, নেত্রকোনা ইত্যাদি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন এবং খানকাহ, মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদি নির্মাণ করে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সুফিদের উদারনীতি, মানবপ্রেম ও সেবার আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। সুফি ভাবধারার কবিরা বাংলা ভাষায় যে সাহিত্যকর্ম রচনা করেন, তা-ই কালক্রমে সুফিসাহিত্য নামে আখ্যায়িত হয়।

সুফিতত্ত্ব নিয়ে প্রথম এক বিশাল সাহিত্য সৃষ্টি হয় ইরানে। সেখানকার বিখ্যাত কবি আবদুর রহমান জামি, নিজামি, গঞ্জবি, ওমর খইয়াম, হাফিজ, আমির খসরু প্রমুখ ফারসি ভাষায় দিওয়ান, মসনভি, গজল, রুবাইয়াৎ, খমসা প্রভৃতি আঙ্গিকে বহু কাব্য রচনা করেন। তাঁদেরই অনুসরণে বাংলা সুফিসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ।

মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই রাজধানী লক্ষ্ণৌতীতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত *অমৃতকুণ্ড* নামক গ্রন্থটি আরবি ও ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়। এটি সুফিদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল, কারণ এটি ছিল একটি যোগতত্ত্বের গ্রন্থ। হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের কাছে এরূপ মিশ্রধারার গ্রন্থই বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল। বাংলার কবিরা প্রধানত ফারসি ও হিন্দি ভাষায় রচিত সুফিসাহিত্যের গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ করেন। সেসব গ্রন্থের মধ্যে শাহ মোহাম্মদ সগীরের *ইউসুফ জোলেখা*, দৌলত উজির বাহরাম খাঁর *লায়লী-মজনু*, কাজী দৌলতের *সতীময়না-লোরচন্দ্রানী*, আলাওলের *পদ্মাবতী*, নওয়াজিস খানের *গুলে বকাওলী* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলো মূলত প্রণয়কাব্য। কোনো কোনো কাব্যে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু যোগসাধনা ও তত্ত্বের বিবরণ আছে।

মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় সুফিতত্ত্ব বিষয়ে দুই ধরনের কাব্য রচিত হয়েছে। শাস্ত্রকাব্য ও পদাবলি। শেখ জাহিদের *আদ্য পরিচয়* (১৪৯৮), সৈয়দ সুলতানের *জ্ঞানপ্রদীপ* ও *জ্ঞানচৌতিশা* (ষোড়শ শতক), শাহ বু আলীর *যোগকলন্দর* (ষোড়শ শতক), শেখ চাঁদের *হরগৌরী সম্বাদ* ও *তালিবনামা* (সপ্তদশ শতক), আবদুল হাকিমের *চারি-মাকাম-ভেদ* (সপ্তদশ শতক), হাজি মহম্মদের *সুরতনামা* (সপ্তদশ শতক), মির মহম্মদ শফির *নূরনামা*

(সপ্তদশ শতক), শেখ মনসুরের *সির্নামা* (অষ্টাদশ শতক) এবং আলী রজার *আগম ও জ্ঞানসাগর* (অষ্টাদশ শতক) ইত্যাদি শাস্ত্রকাব্যে প্রধানত সুফি সাধনপ্রক্রিয়া, সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য, যোগতত্ত্ব, ধর্ম ও নীতিবিষয়ক উপদেশেরও বর্ণনা আছে। শেখ জাহিদের *আদ্য পরিচয়*-এর শুরুতে আছে সৃষ্টিতত্ত্ব। সৃষ্টির আদিতে সবকিছু ছিল শূন্য; শূন্য থেকে স্রষ্টা, স্রষ্টার অঙ্গ থেকে বিশ্বের সৃষ্টি ইত্যাদির বর্ণনা আছে।

সৈয়দ সুলতানের *জ্ঞানপ্রদীপ* ও *জ্ঞানচৌতিশা* কাব্যের বক্তব্য প্রায় অভিন্ন। *জ্ঞানপ্রদীপ*-এর দশটি অধ্যায়ে দরবেশতত্ত্ব, এবাদত, তনের বিচার, আত্মতত্ত্ব, দীন, জিকির, ব্রহ্মতত্ত্ব ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। হজরত মোহাম্মদ (সা.) ও হজরত আলীর (র.) প্রশ্নোত্তরে এসব তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাঁর দেহতত্ত্বের বর্ণনায় সুফি-ভাবনার সঙ্গে হিন্দু যোগসাধনার মিশ্রণ ঘটেছে। তাঁর মতে, সৃষ্টিকর্তা নিরঞ্জন এবং শূন্যাকার; তিনি মানবদেহেই বিরাজ করছেন। তাই দেহকে জানলে স্রষ্টাকেও জানা হয়।

শাহ বুআলী কলন্দর ইরানীয় ও ভারতীয় অধ্যাত্ম ভাবধারার মিশ্রণে 'যোগকলন্দর' নামে একটি নতুন সাধনপদ্ধতি প্রবর্তন করেন। কাব্যখানি সপ্তদশ শতকের কবি সৈয়দ মর্তুজা রচনা করেন বলে মনে করা হয়। কাব্যের শুরুতে নাসুত, মলকুত, জবরুত ও লাহুত দেহতত্ত্বভুক্ত চার মোকামের ব্যাখ্যা আছে। সুফির নাসুতে মূলাধার, মলকুতে মণিপুর, জবরুতে কলিজা এবং লাহুতে অনাহত চক্র-সম্পর্কিত যোগসাধন-প্রক্রিয়ার কথা আছে। মূলাধারে ধাতুর উর্ধ্বায়ন দ্বারা শক্তির উন্মেষ, মণিপুরে বায়ুর নিরোধ দ্বারা আত্মদর্শন, কলিজায় জ্যোতি ও আত্মার মিলন এবং অনাহতে জ্যোতির্ময় আল্লাহর উপলব্ধি হয়। কবির মতে, মানবদেহেই পরমাত্মার অধিবাস এবং যোগসাধনার দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন সাধিত হয়।

শেখ চাঁদের দুটি কাব্যই প্রশ্নোত্তরের আঙ্গিকে রচিত। *হরগৌরী সম্বাদ* কাব্যে হর ও গৌরীর প্রশ্নোত্তরে যে তত্ত্বালোচনা আছে, *তালিবনাম*য় কবি স্বয়ং এবং তাঁর পীর শাহ দৌলার প্রশ্নোত্তরে তা-ই আলোচিত হয়েছে। গুরুতত্ত্ব, স্রষ্টাতত্ত্ব ও যোগতত্ত্ব এ কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু। এ ছাড়া শিব কর্তৃক গৌরীকে মহাজ্ঞান 'গুপ্তবিদ্যা' দানের বিবরণ আছে। এ ক্ষেত্রে নাথধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

হাজি মহম্মদের *সুরতনামা* কাব্যে ধর্মকর্ম ও বৈষয়িক উপদেশ-নির্দেশ ছাড়াও যোগভিত্তিক দেহতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা আছে। বলা হয়েছে যে, শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারিফত—এই চার আধ্যাত্মিক পন্থায় সিদ্ধি লাভ করা যায়।

শেখ মনসুরের *সির্নামা* এবং আলী রজার *আগম* ও *জ্ঞানসাগর* কাব্যে সুফিশাস্ত্রের বিবিধ তত্ত্ব ও উপদেশ বর্ণনা করেছেন। প্রথম গ্রন্থটি দরবেশি হকিকত ও কথন, তন ও দিলের বিচার, আরোহ তত্ত্ব, নিরঞ্জন তত্ত্ব ইত্যাদি ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

আলী রজার ছিলেন একজন পীর ও কবি। তিনি কানু ফকির নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর কাব্যের ভাষা বেশ উন্নত ও মার্জিত। তাঁর প্রথম কাব্য *আগম*-এর বিষয়বস্তু সৃষ্টিতত্ত্ব, চার মঞ্জিল, জলবায়ুতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও আল্লাতত্ত্ব। *জ্ঞানসাগর* কাব্যে এই একই বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। আলী রজা ফকিরি পন্থা তথা সুফিসাধনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মধ্যযুগে ছন্দোবদ্ধ ও গীতোপযোগী ছোট ছোট পদ্যজাতীয় রচনা 'পদ' নামে পরিচিত ছিল। বৈষ্ণব ধর্মমত অবলম্বনে এরূপ শত-সহস্র পদ রচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন *চর্যাপদ* এবং পরবর্তীকালে রচিত *শাক্তপদ, বাউলপদ* বা গান একই জাতীয় রচনা। সুফি ভাবধারায় রচিত অনুরূপ পদগুলোকে সুফির পরিভাষায় 'গজলিয়াৎ' বা গীতপদ বলে।

আল্লাহ প্রেমময় ও সৌন্দর্যময়। তিনি অনন্ত, অবিনশ্বর ও সর্বত্র বিরাজমান। তিনিই সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা। জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ জীবনান্তে আল্লাহর কাছে ফিরে যায়। প্রেম ও ভক্তির পথে আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়। আল্লাহতে অনুগত বা লীন হওয়া সুফি সাধকের চরম লক্ষ্য। গুরু বা মুর্শিদ সাধককে সেই পথ দেখিয়ে দেন। তিনি গুরুর নির্দেশমতো ইন্দ্রিয়মুক্তি ও চিত্তশুদ্ধির সাধনা করেন। জাগতিক মোহ ও আকর্ষণ থেকে

মুক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের সাধনাই সুফির আধ্যাত্মিক সাধনা। সাধকের মনে নানারকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে। গুরুর চরণাশ্রয়, খোদার কাছে আত্মসমর্পণ, সাধক-চিত্তের নানা আশঙ্কা, অক্ষমতা, অপ্রাপ্তির বেদনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সুফিপদ রচিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এজাতীয় পদাবলিতে এত বেশি ব্যবহৃত হয়েছে যে এ ধারার কবিরা 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' নামে অভিহিত হয়েছেন।

এযাবৎ শতাধিক মুসলমান পদকর্তার রচিত পদের সংখ্যা কয়েক শত। প্রথম শ্রেণীর পদকর্তা হিসেবে আইনুদ্দিন, আফজল, আলাওল, আলী রজা, নাসির মাহমুদ, মীর ফয়জুল্লাহ, শেখ কবির, শেখ চাঁদ, সৈয়দ মর্তুজা, সৈয়দ সুলতান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ মর্তুজা ষাটের অধিক সুফিপদ রচনা করেছেন। কবির ভণিতাযুক্ত এসব পদের শীর্ষে রাগতালেরও উল্লেখ আছে।

**সুরা** পবিত্র কোরআন শরিফের অংশবিশেষের নাম। ৩০ পারা পবিত্র কোরআনে ১১৪টি সুরা রয়েছে। সবচেয়ে বড় সুরা বাকারা এবং সবচেয়ে ছোট সুরা কাওসার। পবিত্র কোরআনের প্রথম সুরা ফাতিহা ও সর্বশেষ সুরার নাম নাস। প্রথম অক্ষর বা অর্থের দিকে লক্ষ রেখে প্রতিটি সুরার স্বতন্ত্র নামকরণ। অবতীর্ণ হওয়ার স্থান মক্কি ও মাদানি। নবুয়তের পর মোহাম্মদ (সা.) যে ১৩ বছর মক্কায় অবস্থান করেন, সেই সময় ৯২টি সুরা অবতীর্ণ হয়। মদিনায় অবতীর্ণ সুরার সংখ্যা ২২, পবিত্র কোরআনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। সব সুরাতেই আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব, রাসুলের সত্যতা, কিয়ামতের নিশ্চয়তা এবং পরকালের শাস্তির কথা আলোচনা করা হলেও, মক্কায় অবতীর্ণ সুরায় বিশেষ করে আকিদা ও বিশ্বাসের ওপর এবং মদিনায় অবতীর্ণ সুরায় নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধ অধিকতর স্থান লাভ করেছে।

**সুরা আদিয়াত** অর্থ—ধারণাকারী অশ্ব। পবিত্র কোরআনের শততম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরার ১ রুকু, ১১ আয়াত। এতে পরকালীন জীবনের প্রথম স্তর কবর এবং হাশরের বিবরণ দান করে মানুষকে সৎকাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

**সুরা আনআম** পবিত্র কোরআনের ষষ্ঠ সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরার ২০ রুকু, ১৬৫ আয়াত। মোহাম্মদ (সা.) হিজরতের সময় মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরার ছয়টি আয়াত মদিনায় অবতীর্ণ হয়। অংশীবাদের আলোচনা, বিশ্বাসীদের পুরস্কার, তওহিদের বর্ণনা, পরকালের জীবন, অমুসলিমদের দ্বারা অত্যাচারিত মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের জন্য সান্ত্বনা আছে।

**সুরা আনকাবুত** (মাকড়সা) পবিত্র কোরআনের ২৯তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরার ৭ রুকু, ৬৯ আয়াত। মিথ্যা বিশ্বাস ও অংশীবাদকে মাকড়সার জাল বা আনকাবুত-এর সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে, 'সর্বাপেক্ষা ভঙ্গুর ঘর'। ঝড়-তুফানের মোকাবিলায় তা সম্পূর্ণ অকেজো। একইভাবে যদি আল্লাহ ব্যতীত যত দেব-দেবীর পূজা করা হয়, তা অকেজো ও অস্থায়ী। সুরাটির শেষভাগে আল্লাহর অস্তিত্ব এবং একত্ববাদের পক্ষে যুক্তি দিয়ে পুনরায় আল্লাহর পথে আপ্রাণ চেষ্টার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

**সুরা আনফাল** (গনিমতের মাল)। পবিত্র কোরআনের অষ্টম সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। ১০ রুকু, ৭৫ আয়াত। এই সুরায় আল্লাহ যুদ্ধজয়ের পর শত্রুর কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ বা গনিমতের মাল সম্পর্কে আদেশ দান করেন এবং হিজরত সম্পর্কেও বলেন।

**সুরা আ'বাসা** (ভ্রুকুটি করল)। পবিত্র কোরআনের ৮০তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ৪২ আয়াত। একবার মোহাম্মদ (সা.) একজন অবিশ্বাসীকে ইসলামের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে বোঝানোর সময় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম নামের একজন অন্ধ ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর দরবারে পবিত্র কোরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তাঁর ওপর বিরক্ত হয়ে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। এ সময়েই তাঁর ওপর তিরস্কারস্বরূপ এই সুরা নাজিল হয়।

**সুরা আম্বিয়া** পবিত্র কোরআনের ২১তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৭ রুকু, ১১২ আয়াত। শেষ বিচারের দিনের আলোচনার মাধ্যমে এই সুরা শুরু করে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের ওপর

বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে অনেক নবী-রাসুলের দৃষ্টান্তও দেওয়া হয়েছে।

**সুরা আ'রাফ** জান্নাত আর জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান। পবিত্র কোরআনের সপ্তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ২৪ রুকু, ২০৬ আয়াত। এই সুরায় সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের দুর্দশা, শয়তানের কুপরামর্শের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি ও সত্যাশ্রয়ীদের সমৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনায় নুহ (আ.), হুদ (আ.), সালেহ (আ.), লুত (আ.) ও শোয়াইব (আ.)-এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এই সুরাতে মুসা (আ.)-এর জীবনীও আলোচিত হয়েছে।

**সুরা আলা** পবিত্র কোরআনের ৮৭তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ১৯ আয়াত। এই সুরার শুরুতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি, সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে পথ দেখিয়েছেন। রাসুল (সা.) কখনো তাঁর আদেশ ভুলে যাবেন না। আল্লাহর অসীম জ্ঞানের কথা উল্লেখ করে মানুষকে সৎ উপদেশ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে মহানবীর (সা.) উপদেশ গ্রহণ করবে এবং পরকালে সে সফল হবে।

**সুরা আলাক** জমাট রক্ত। পবিত্র কোরআনের ৯৬তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ১৯ আয়াত। দ্বিতীয় আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে। এই সুরার প্রথম পাঁচ আয়াত মহানবী (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়, যার দ্বারা তাঁকে নবুয়ত প্রদান করা হয়।

**সুরা আল-ই-ইমরান** পবিত্র কোরআনের তৃতীয় সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। রুকু ২০, আয়াত ২০০। নাজরানের নাসারারা মদিনায় মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজেদের সত্য ধর্মাবলম্বী বলে দাবি করলে এই সুরা অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তাদের সব ভুল ধারণা নিরসন করে এই সুরা অবতীর্ণ করেন। মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে এই সুরা পাঠ করবে, সপ্ত জমিন থেকে সপ্ত আসমান পর্যন্ত তার সওয়াব হবে।

**সুরা আসর** কাল বা অপরাহ্ণ কাল। পবিত্র কোরআনের ১০৩তম সুরা। রুকু ১, আয়াত ৩। কালের শপথ করে এই সুরা আরম্ভ বলে এই নামকরণ হয়েছে। যারা অন্তরে বিশ্বাস রেখে সৎকাজ করে এবং পরস্পরকে ন্যায়পরায়ণ ও সহিষ্ণু হতে উদ্বুদ্ধ করে, তাদের জীবন সার্থক।

**সুরা আহকাফ** পবিত্র কোরআনের ৪৬তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। রুকু ৪, আয়াত ৩৫। আল্লাহর কাছ থেকে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার ঘোষণা করে তওহিদ বা একত্ববাদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে শিরক বা অংশীবাদের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে।

**সুরা আহজাব** পবিত্র কোরআনের ৩৩তম সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। রুকু ৯, আয়াত ৭৩। আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করতে এবং মুনাফিক ও মুশরিকদের কথায় কান না দিতে নির্দেশ প্রদান করে প্রাক-ইসলামিক যুগের জিহার ও দত্তকপ্রথা রহিত করা হয়েছে। মোহাম্মদ (সা.) ও জয়নাবের বিয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

**সুরা ইউনুস** পবিত্র কোরআনের দশম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। এই সুরায় ইউনুস (আ.)-এর বর্ণনা আছে বলে এই নামকরণ হয়েছে। রুকু ১১, আয়াত ১০৯টি। এই সুরায় তওহিদের প্রমাণ ও অংশীবাদের প্রতিবাদ রয়েছে। এই সুরায় অবিশ্বাসীদের সম্বোধন করে তওহিদ, ওহি, নবুয়ত এবং পরকালের সত্যতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

**সুরা ইউসুফ** পবিত্র কোরআনের ১২তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। রুকু ১২, আয়াত ১১১। ইমাম বাজহাকির *দালায়েলুননবুয়ত* গ্রন্থে আছে, ইহুদিরা পবিত্র কোরআনের এই সুরা শুনে ইসলাম গ্রহণ করে।

**সুরা ইখলাস** পবিত্র কোরআনের ১১২তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। রুকু ১, আয়াত ৪। এই সুরায় তওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণার পর আল্লাহর সন্তান-সন্ততি আছে বলে যে ভ্রান্ত ধারণা করা হয়, তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। আল্লাহ সব অভাবের অতীত এবং তাঁর কোনো তুলনা নেই।

**সুরা ইনফিতার** পবিত্র কোরআনের ৮২তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। রুকু ১, আয়াত ১৯। ইনফিতার অর্থ বিদীর্ণ হওয়া। প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ

থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে। এই সুরায় কিয়ামতের বিভীষিকাপূর্ণ বিবরণ আছে।

**সুরা ইনশিকাক** পবিত্র কোরআনের ৮৪তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। রুকু ১, আয়াত ২৫। ইনশিকাক অর্থ ফাটল। প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে। সুরার প্রথমে কিয়ামতের বিভীষিকাপূর্ণ বিবরণ প্রদানের পর আল্লাহ বলেছেন যে, কিয়ামতের সেই কঠিন দিবসে যে ব্যক্তি তাঁর দক্ষিণ হাতে আমলনামা লাভ করবে, তাঁর কোনো ভয় নেই, কিন্তু যারা পেছন থেকে বাঁ হাতে আমলনামা পাবে, তারা জাহান্নামে বাস করবে।

**সুরা ইনশিরাহ** পবিত্র কোরআনের ৯৪তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। রুকু ১, আয়াত ৮। ইনশিরাহ অর্থ উন্মুক্ত করা। এই সুরায় মোহাম্মদ (সা.)-এর বক্ষ উন্মোচন করার কথা বলায় এর এই নামকরণ করা হয়েছে। কষ্টের পর সুখ আসবে। আল্লাহ রাসুলের কাজ সহজ করে দিয়েছেন। তাঁকে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান ও তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে আল্লাহর বাণী প্রচারের জন্য তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে বলা হয়েছে।

**সুরা ইবরাহিম** পবিত্র কোরআনের ১৪তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৭ রুকু, ৫২ আয়াত। কুরাইশদের বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, কেননা, তখন তারাই ছিল ক্ষমতাবান। ইবরাহিম (আ.) ও অন্য নবী-রাসুলদের আবির্ভাব, সত্যের জন্য সংগ্রাম এবং তাঁদের দেশবাসীর বিরোধিতার কথা বলা হয়েছে। মুসা (আ.)-এর উপদেশও রয়েছে। পবিত্র কোরআনের দাওয়াত ইবরাহিম (আ.)-এর দাওয়াতের স্মারক।

**সুরা ইয়াসিন** পবিত্র কোরআনের ৩৬তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৫ রুকু, ৮৩ আয়াত। সুরার প্রথম দুটি অক্ষর থেকে এর নাম। মহানবী (সা.) এই সুরাকে পবিত্র কোরআনের হৃৎপিণ্ড বলে বর্ণনা করেন। আল্লাহর একত্ববাদ ও মহানবী (সা.)-এর রিসালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অংশীবাদের সমালোচনা, পৌত্তলিকদের অমরতা, অবিশ্বাসীদের কূটতর্কের উল্লেখ করে ইসলামের সত্যতা ও কিয়ামতের পুনরুত্থানের বর্ণনা রয়েছে। মহানবী (সা.) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে এই সুরা পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দ্বারই উন্মুক্ত থাকবে। রোদ-তাপ ও বিপদ-আপদ নিরসনের জন্য, মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘবের জন্য এবং মৃত ব্যক্তির শান্তির জন্য তার কবরের পাশে পাঠ করা হয়।

**সুরা ওয়াকিয়া** (মহাঘটনা) পবিত্র কোরআনের ৫৬তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৩ রুকু, ৯৬ আয়াত। এতে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা, কিয়ামতের ভয়াবহতা, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, ঝড়ঝঞ্ঝা, শেষ বিচার, জান্নাতের নিয়ামত এবং জাহান্নামের শাস্তির কথা রয়েছে।

**সুরা কদর** পবিত্র কোরআনের ৯৭তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ৫ আয়াত। পবিত্র কোরআন লাইলাতুল কদরে অবতীর্ণ হয় এবং সেই রাত্রি সহস্র মাসের চেয়েও উত্তম। ফেরেশতারা পৃথিবীতে নেমে এসে পুণ্যবানদের আশীর্বাদ করেন।

**সুরা কমর** (চন্দ্র) পবিত্র কোরআনের ৫৪তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৩ রুকু, ৫৫ আয়াত। তাঁর নবুয়তের সত্য প্রমাণের জন্য কুরাইশরা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করতে বললে মহানবী (সা.) তাঁর অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করলে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এই ঘটনাকেই চন্দ্র-বিদারণ বলা হয়। চন্দ্র-বিদারণকে কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক বিশেষ ধরনের চন্দ্রগ্রহণ বলে ব্যাখ্যা দেন। নুহ (আ.)-এর সম্প্রদায়, আদ জাতি, লুত (আ.)-এর সম্প্রদায় এবং ফেরাউন সত্যের আমন্ত্রণ পেয়েও তা অস্বীকার করে এবং শাস্তিস্বরূপ তারা ভূপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে হারিয়ে যায়। বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জান্নাতের পুরস্কার।

**সুরা কলম** পবিত্র কোরআনের ৬৮তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ৫২ আয়াত। কলমের শপথ করে মোহাম্মদ (সা.)-কে বলা হয়েছে, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও। ইনশা আল্লাহ না বলে যারা বড়াই করেছিল তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

**সুরা কাওসার** (প্রাচুর্য) পবিত্র কোরআনের ১০৮তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ৩ আয়াত। অপুত্রক মোহাম্মদ (সা.)-কে নামনিশানাহীন হতভাগ্য বলে তাঁর শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রূপ

করলে আল্লাহ বলেন যে তাঁকে প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়েছে এবং তিনি তাঁর জন্য তাঁর প্রভুর উদ্দেশে নামাজ পড়ুন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর শত্রুরাই নামনিশানাহীন হতভাগ্য।

**সুরা কাসাস** (ইতিবৃত্ত) পবিত্র কোরআনের ২৮তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৯ রুকু, ৮৮ আয়াত। মুসা (আ.) ও ফেরাউনের এবং কারুনের উত্থান ও পতনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে উপসংহারে বলা হয়েছে, এ জগৎ ধ্বংসশীল, আল্লাহর আদেশ সর্বত্র কার্যকর এবং তাঁরই কাছে সকলের প্রত্যাবর্তন।

**সুরা কাফ** পবিত্র কোরআনের ৫০তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৩ রুকু, ৪৫ আয়াত। সুরার প্রথম সংক্ষিপ্ত অক্ষর কাফ। অবিশ্বাসীদের কথা পার্থিব জীবনেই শেষ, পুনরুত্থান বলে কিছু নেই। প্রতিবাদে বলা হয়েছে, তারা কি দেখে না মৃত মৃত্তিকাকে কীভাবে পুনরায় জীবনীশক্তি প্রদান করা হয়। ওদের আগে অবিশ্বাস করেছিল নুহের সম্প্রদায়, রসবাকীরা, সামুদ সম্প্রদায়, আদ ফেরাউন ও লুত সম্প্রদায়।

**সুরা কাফিরুন** (অবিশ্বাসীগণ) পবিত্র কোরআনের ১০৯তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ৬ আয়াত। একবার কাফিররা মোহাম্মদ (সা.)-এর কাছে প্রস্তাব করে যে, তারা তাঁর ধর্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত, যদি তিনিও তাদের ধর্ম আংশিকভাবে গ্রহণ করেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহর প্রত্যাদেশ হলো: 'বলো, হে অবিশ্বাসীরা! আমি তার উপাসনা করি না, যার উপাসনা তোমরা করো। আর তোমরাও তাঁর উপাসনাকারী নও, যাঁর উপাসনা আমি করি। আর আমি উপাসনাকারী হব না তার, যার উপাসনা তোমরা করে আসছ, আর তোমরাও উপাসনাকারী হবে না তাঁর, যাঁর উপাসনা আমি করি। তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার।'

**সুরা কারিয়া** (মহাপ্রলয়) পবিত্র কোরআনের ১০১তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ১১ আয়াত। কিয়ামতকে মহাপ্রলয় বলে বলা হয়েছে, এ জীবনে যাদের সৎকর্মের পাল্লা ভারী হবে, সেদিন তারাই সুখের জীবন লাভ করবে। আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে গনগনে আগুন হাবিয়ায়।

**সুরা কাহাফ** (গুহা) পবিত্র কোরআনের ১৮তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১২ রুকু, ১১০ আয়াত। এই সুরায়, গুহাবাসীদের বিবরণ স্থান পেয়েছে। সরল পথের আলোচনা করে মোহাম্মদ (সা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে, মক্কাবাসীদের পথভ্রষ্টতার জন্য চিন্তা করা নিরর্থক, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। জ্ঞানান্বেষণে এক আল্লাহ ভক্ত মহাপুরুষের সাক্ষাৎ এবং জুল কারনাইন ও ইয়াজুজ মাজুজের বিবরণ রয়েছে।

**সুরা কিয়ামা** (পুনরুত্থান) পবিত্র কোরআনের ৭৫তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ৪০ আয়াত। এতে কিয়ামতের বর্ণনা রয়েছে।

**সুরা কুরাইশ** পবিত্র কোরআনের ১০৬তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ৪ আয়াত। মক্কার কুরাইশরা শীত ও গ্রীষ্মকালে বাণিজ্য উপলক্ষে দেশ ভ্রমণ করতেন। তাদের উচিত (কাবা) গৃহের প্রতিপালকের উপাসনা করা, যিনি তাদের ক্ষুধায় খাদ্য ও ভয়ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন।

**সুরা গাশিয়া** (আচ্ছাদনকারী) পবিত্র কোরআনের ৮৮তম সুরা। ১ রুকু, ১৬ আয়াত। কিয়ামতের দিন কারও কারও মুখ অবনত, ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হবে, যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যাদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। মোহাম্মদ (সা.)-কে বলা হয়, 'অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেষ্টা। ওদের কর্মের নিয়ন্তা নও।'

**সুরা জারিয়াত** (দ্রুতগামী বায়ু) পবিত্র কোরআনের ৫১তম সুরা। ৩ রুকু, ৬০ আয়াত। জাহান্নাম, জান্নাত, ইবরাহিম (আ.)-এর পুত্রসন্তান, মুসা (আ.) ও ফেরাউন, আদ ও মাসুদ জাতি এবং নুহ (আ.) সম্প্রদায়ের পাপাচার ও পরিণাম, কিয়ামতের নিশ্চয়তা উল্লেখ করে মানবজাতিকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

**সুরা জালজালা** (মহা কম্পন) পবিত্র কোরআনের ৯৯তম সুরা। ১ রুকু, ৮ আয়াত। কিয়ামতের আগে পৃথিবী কম্পিত হবে এবং বারবার উন্মুক্ত করবে। কেউ অনুপরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে আর কেউ অনুপরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখবে।

**সুরা জাসিয়া** (নতজানু) পবিত্র কোরআনের ৪৫তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৪ রুকু, ৩৭ আয়াত। যেদিন কিয়ামত হবে, সেদিন প্রত্যেক সম্প্রদায় ভয়ে নতজানু হবে। আল্লাহর একত্ব ও তাঁর আশীর্বাদের বর্ণনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সৎকাজ করে, সে তা নিজের উপকারেই করে। আর যে অন্যায় করে, তার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে।

**সুরা জিন** পবিত্র কোরআনের ৭২তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ২৮ আয়াত। মোহাম্মদ (সা.)-এর সম্মুখে উপস্থিত একদল জিন পবিত্র কোরআন শ্রবণ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। আল্লাহ অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা এবং তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও কাছে তিনি প্রকাশ করবেন না।

**সুরা জুখরুফ** (পার্থিব চাকচিক্য ও অলংকার) পবিত্র কোরআনের ৪৩তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৭ রুকু, ৮৯ আয়াত। আরবি ভাষায় এ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহর রাসুলদের বিরোধিতার জন্য ধ্বংস, আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর নিয়ামত, ইবরাহিম (আ.), মুসা (আ.), ঈশা (আ.) ও কিয়ামতের কথা উল্লেখ রয়েছে। মোহাম্মদ (সা.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'বলো করুণাময়ের কোনো সন্তান থাকলে আমি সবার আগে তার উপাসনা করতাম।'

**সুরা জুমআ** (জনসমাবেশ) পবিত্র কোরআনের ৬২তম সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ১১ আয়াত। আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। ইহুদিদের অন্যায় আচরণের কথা উল্লেখ করে মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধানের কথা বলা রয়েছে। জুমার আজান হলে সব কাজ বন্ধ করে জুমার নামাজের জন্য দ্রুত গমনের নির্দেশ এবং নামাজ শেষে আবার জীবনের যাবতীয় কর্মে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

**সুরা জুমার** (দল) পবিত্র কোরআনের ৩৯তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৮ রুকু, ৭৫ আয়াত। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী এই দুই দলের পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনার জন্য সুরার এই নামকরণ। আল্লাহর একত্ব, মানুষের দৌর্বল্য ও অকৃতজ্ঞতা, মৃত্যু, কিয়ামত, জাহান্নাম ও জান্নাতের বিষয় বর্ণিত রয়েছে।

**সুরা তওবা** (অনুতাপ বা প্রত্যাবর্তন) পবিত্র কোরআনের নবম সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। ১৬ রুকু, ১২৯ আয়াত। এই সুরার তওবা ও বরাআত (দায়মুক্তি) ছাড়া আরও নাম রয়েছে। শুধু এই সুরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম লিপিবদ্ধ হয়নি। অনেকের মতে, এটি স্বতন্ত্র সুরা নয়, সুরা আনফালের শেষাংশ মাত্র। আলী (রা.)-এর মতে, এটি স্বতন্ত্র সুরা। কাফিরদের সঙ্গে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য চুক্তি বাতিল করার ঘোষণা রয়েছে। অনেকের মতে, এ রকম ব্যাপারে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ব্যবহৃত হয় না। ইসলাম যে জয়যুক্ত হবে, এ বিষয়ে বিশ্বাসীদের তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করা হয়েছে।

**সুরা তাকভির** (গোটানো) পবিত্র কোরআনের ৮১তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ১৯ আয়াত। আবদুল্লাহ ইবনে উমরের এক হাদিসে মোহাম্মদ (সা.) এরশাদ করেন, কেউ কিয়ামতের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা করলে সে যেন সুরা তাকভির, সুরা ইনফিতার এবং সুরা ইনশিকাক পাঠ করে। এই পবিত্র কোরআন সত্য, কোনো উন্মাদ বা শয়তানের বাক্য নয়। এ আল্লাহর তরফ থেকে জিবরাইলের মারফত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয় এবং রাসুল তা ঠিকভাবেই প্রচার করেন।

**সুরা তাহরিম** (হারাম মনে করা) পবিত্র কোরআনের ৬৬তম সুরা। ২ রুকু, ১২ আয়াত। মোহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ বলছেন, 'আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তা তুমি কেন হারাম মনে করো।' আসরের নামাজের পর রাসুল তাঁর পত্নীদের সঙ্গে অল্পক্ষণের জন্য হলেও দোয়া করতেন। মধু পান করার জন্য জয়নাবের গৃহে একাধারে অবস্থান করায়, তাঁর বিলম্ব হলে তাঁর দুই স্ত্রী আয়েশা ও হাফসা অনুযোগ করলে রাসুল আর মধু খাবেন না বলে শপথ করেন। এ জন্য এই সুরার অবতারণা। আয়েশা ও হাফসাকে তওবা করে পারিবারিক জীবনে শান্তি আনার উপদেশ দেওয়া হয়। নুহ (আ.) ও লুত (আ.)-এর পত্নীদ্বয়ের উল্লেখ করে

বলা হয় যে তারা নবীর পত্নী হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় কর্মের জন্য নরক ভোগ করে। অপরদিকে জালিম ফেরাউনের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সৎকর্মের জন্য তার স্ত্রী জান্নাত লাভ করেন।

**সুরা তাকাসুর** (প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা) পবিত্র কোরআনের ১০২তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। রুকু ১, ৮ আয়াত। প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় মানুষ মোহাচ্ছন্ন থাকবে এবং তারা জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে। সেদিন তাদের আরাম উপভোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

**সুরা তাগাবুন** (পরস্পরের লাভ ও ক্ষতি) পবিত্র কোরআনের ৬৪তম সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ১৮ আয়াত। ন্যায় ও অন্যায় এবং লাভ ও ক্ষতির কথা বলা হয়েছে। 'তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা।' আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁকে উত্তম ঋণ দাও।

**সুরা তারিক** (প্রভাততারকা) পবিত্র কোরআনের ৮৬তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ১৭ আয়াত। প্রভাতের তারকার শপথ করে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক মানুষের জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক আছে। পবিত্র কোরআন এই সত্য ও মিথ্যার বিভেদ করে।'

**সুরা তালাক** পবিত্র কোরআনের ৬৫তম সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ১২ আয়াত। বিবাহবিচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ। সুখের কারণ না হয়ে দুঃখের কারণ হলে তালাক দেওয়া যুক্তিসংগত, যদিও বিধিসম্মত কার্যাবলির মধ্যে তালাক আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য। তালাকের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। তালাকপ্রাপ্ত ও তাঁর গর্ভজাত অপ্রসূত বা সদ্যপ্রসূত শিশুর ভরণপোষণ করতে হবে।

**সুরা তাহা** পবিত্র কোরআনের ২০তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৮ রুকু, ১৩৫ আয়াত। পবিত্র কোরআনের সত্যতা ও আল্লাহর একত্ববাদ আলোচনা করে মুসা (আ.)-এর জন্মবৃত্তান্ত, তাঁর এবং তাঁর ভাইয়ের নবুয়তপ্রাপ্তি, ফেরাউনের সঙ্গে জাদুর প্রতিযোগিতা এবং লোহিতসাগরে তাঁকে নিমজ্জিত করে সত্যের জয় এবং অসত্যের পরাজয়ের বিবরণ রয়েছে।

**সুরা তিন** (আজির ফল) পবিত্র কোরআনের ৯৫তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ৮ আয়াত। মানুষকে সুঠাম ও সুন্দর আকৃতিতে ও শ্রেষ্ঠ উপাদানে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু সে কর্মদোষে অধঃপতিত হতে পারে। যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য সম্পাদন করে, তাদের জন্য অশেষ মঙ্গল। আল্লাহ ছাড়া শ্রেষ্ঠ বিচারক কে?

**সুরা তুর** (তুরপতি) পবিত্র কোরআনের ৫২তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ৪৯ আয়াত। শেষ বিদায়ের দিনের বিবরণে অবিশ্বাসীদের জন্য কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। কুরাইশরা মোহাম্মদ (সা.)-কে পাগল, কবি, এবং জাদুকর আখ্যা দিয়ে যেভাবে বাধা দান করে, সেখানে রাসুলকে ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

**সুরা দাহর** (কাল) পবিত্র কোরআনের ৭৬তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ৩১ আয়াত। এককালে মানুষের উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। আল্লাহ মানুষকে দর্শন ও শ্রবণশক্তি প্রদান, সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। পবিত্র কোরআন উপদেশাত্মক গ্রন্থ, যেকোনো লোক ইচ্ছা করলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। দুর্বল মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।

**সুরা দুখান** (ধূম্র বা অনাবৃষ্টি) পবিত্র কোরআনের ৪৪তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৩ রুকু, ৫৯ আয়াত। পবিত্র কোরআন এক মঙ্গলময় রাতে অবতীর্ণ করা হয়। অনাবৃষ্টির এক ভবিষ্যদ্বাণী আছে। আধ্যাত্মিক বলের কাছে পার্থিব ক্ষমতা চূর্ণ হয়। ফেরাউন ও তাঁর সাথিরা লোহিতসাগরে নিমজ্জিত হয়। মুসা (আ.) ও বনি ইসরাইলদের প্রতি আল্লাহর আশীর্বাদের কথা স্মরণ করিয়ে তাদের পথভ্রষ্টতার কথা উল্লেখ করা হয়।

**সুরা দোহা** (মধ্যস্থ রশ্মি) পবিত্র কোরআনের ৯৩তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ১১ আয়াত। একবার কিছুদিন ঐশীবাণী বন্ধ থাকায় মোহাম্মদ (সা.) বিমর্ষ হয়ে পড়লে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয় তাঁকে পরিত্যাগ করা হয়নি। যে অনাথ ছিল তাকে আশ্রয়, যে ভুল পথে ছিল তাকে পথের হদিস এবং যে অভাবী ছিল তাকে অভাবমুক্ত করা হয়। পিতৃহীন ও সাহায্যপ্রার্থীদের

প্রতি কঠোর না হয়ে আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ণনা করতে বলা হয়েছে।

**সুরা নজম** (তারকা) পবিত্র কোরআনের ৫৩তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৩ রুকু, ৩২ আয়াত। মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বাণী ছাড়া নিজে থেকে কিছু বলেন না। তিনি জিবরাইলকে দুবার প্রত্যক্ষ করেন। পৌত্তলিকেরা, লাত উজজা ও মানাতকে যে আল্লাহর কন্যা বলে ধারণা করে, তা ভ্রান্ত। পুনরুত্থান ঘটানোর দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনি সেরা নক্ষত্রের মালিক। আদ ও সামুদ সম্প্রদায়কে তাদের দুষ্কর্মের জন্য অব্যাহতি দেওয়া হয়নি।

**সুরা নমল** (পিপীলিকা) পবিত্র কোরআনের ২৭তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৭ রুকু, ৯৩ আয়াত। পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বাসীদের গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। মুসা (আ.), দাউদ (আ.), সুলায়মান (আ.), সালেহ (আ.), লুত (আ.)-এর বিবরণ ও পাপীদের দুঃখময় পরিণতির কথা বলা হয়েছে। পিপীলিকার কাছে সুলায়মান (আ.) যে শিক্ষা লাভ করেন, তা-ও বলা হয়েছে।

**সুরা নাসর** (সাহায্য) পবিত্র কোরআনের ১১০তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ৩ আয়াত। মোহাম্মদ (সা.)-এর বিদায়ী হজের সময় সুরাটি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহর সহায়তায় ইসলামের পরিপূর্ণ জয়ে পৌত্তলিকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আল্লাহর প্রশংসাকীর্তন ও তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিত।

**সুরা নাহল** (মধুমক্ষিকা) পবিত্র কোরআনের ১৬তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১৬ রুকু, ১২৮ আয়াত। সত্যের জয় অবশ্যই হয়, তবে তার নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং সে সময় পর্যন্ত অন্ধকার বিরাজ করবে। পবিত্র কোরআন কোনো মানুষের রচিত নয়। ইবরাহিম (আ.) সত্যের অনুগত ছিলেন।

**সুরা নাজিআত** (কঠোর আকর্ষণকারী) পবিত্র কোরআনের ৭৯তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ৪৬ আয়াত। কিয়ামত অবশ্যই হবে। মুসা (আ.) তাকে সত্য ধর্মের দিকে আহ্বান করলে ফেরাউন তা প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর কোপগ্রস্ত হয়।

**সুরা নাবা** (সংবদ্ধ) পবিত্র কোরআনের ৭৮তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ৪০ আয়াত। মক্কাবাসীরা পুনরুত্থান সম্পর্কে তর্কবিতর্ক করলে এই সুরা অবতীর্ণ হয়। ধর্মদ্রোহী বিশ্বাসীদের জন্য কঠিন শাস্তি ও আল্লাহভীরু বিশ্বাসীদের জন্য জান্নাতের সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

**সুরা নাস** (মনুষ্যজাতি) পবিত্র কোরআনের সর্বশেষ বা ১১৪তম সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ৬ আয়াত। কুমন্ত্রণার অমঙ্গল থেকে মানুষের প্রতিপালক, অধীশ্বর ও উপাস্যের শরণ করা হয়েছে।

**সুরা নিসা** (স্ত্রীজাতি) পবিত্র কোরআনের চতুর্থ সুরা। ২৪ রুকু, ১৭৬ আয়াত। তৃতীয় হিজরিতে ওহোদের যুদ্ধের পর অবতীর্ণ। এতে উত্তরাধিকার ও এতিমের অধিকার বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চম হিজরি মুসতালিকের যুদ্ধে পানির অভাব দেখা দিলে তায়াম্মুমের আদেশ জারি হয়। এতে মুসলমানদের চরিত্রের কথা বর্ণিত হয়েছে।

**সুরা নুর** (আলো) পবিত্র কোরআনের ২৪তম সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। ৯ রুকু, ৬৪ আয়াত। আল্লাহর নুরের বর্ণনা করা হয়েছে বলে এই সুরার নামকরণ। ব্যভিচার, নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ, মিথ্যা অপবাদ রটনা, আত্মীয়স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য প্রদান, অন্যের ঘরে ঢোকার আগে পালনীয় কর্তব্য, বিয়ে, আল্লাহর জ্যোতি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিষয়ে বিবিধ বর্ণনা রয়েছে।

**সুরা ফাজর** (জোর) পবিত্র কোরআনের ৮৯তম সুরা। ১ রুকু, ৩০ আয়াত। মক্কায় অবতীর্ণ। আদ বংশের ইরাম, সামুদ জাতি ও ফেরাউনের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষের উচিত অনাথদের সম্মান করা, তাদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চনা না করে এবং অভাবগ্রস্তদের অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করা।

**সুরা ফাতহ** (জয়) পবিত্র কোরআনের ৪৮তম সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। ৪ রুকু, ২৯ আয়াত। ষষ্ঠ হিজরিতে মোহাম্মদ (সা.) তাঁর ১৪০০ সাহাবিকে নিয়ে ওমরা পালনের জন্য মক্কার দিকে অগ্রসর হলে হুদাইবিয়া নামক স্থানে কুরাইশদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হন। একটি চুক্তি করে ওই বছর কাবা শরিফে জিয়ারত না করে তাঁরা মদিনায় ফিরে যান। মক্কাবাসীরা চুক্তি ভঙ্গ করায় মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী দুই বছর পর অষ্টম হিজরিতে বাস্তবায়িত

হয়। বলা হয়েছে, 'মোহাম্মদ আল্লাহর রাসুল। তাঁর সহচরেরা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর আর নিজেরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।' যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এবং মহাপুরস্কার প্রদান করবেন।

**সুরা ফাতির** (সৃষ্টিকর্তা) পবিত্র কোরআনের ৩৫তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৫ রুকু, ৪৫ আয়াত। আল্লাহ, আকাশ, পৃথিবী ও ফেরেশতাদের সৃষ্টিকর্তা। মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করুক। আকাশ থেকে আল্লাহ বৃষ্টিপাত করেন এবং বিচিত্র বর্ণের ফলমূল জন্মান। রংবেরঙের মানুষ, জন্তু ও পশু রয়েছে। আকাশ ও পৃথিবীর সদৃশ্য বিষয় এবং মানুষের অন্তরে যা রয়েছে, আল্লাহ তা জানেন। তিনি মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর (প্রতিনিধি) খলিফা করে পাঠিয়েছেন। কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে পৃথিবীতে কেউ রেহাই পেত না। একটা নির্দিষ্ট কালের জন্য মানুষকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে।

**সুরা ফাতিহা** (উদ্ঘাটনকারী বা আরম্ভ) পবিত্র কোরআনের প্রথম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ৭ আয়াত। এই সুরার নানা নাম রয়েছে। যেমন 'উম্মুল কোরআন' (কোরআনের মাতা), 'সব উম মিনাল মসানি' (সাতটি নিত্যব্যবহৃত বাক্য), 'কাফিয়া', 'শাফিয়া', 'তা লিম-উল-মাম আলা' ইত্যাদি। নামাজের প্রতি রাকাতে এই সুরা পাঠ করতে হয়। আল্লাহর প্রশংসা করে যে সরল পথের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে, তার জবাবে যেন সম্পূর্ণ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করা হয়। সুরা পাঠের শেষে আমিন বা তাই কবুল হোক বলা হয়।

**সুরা ফিল** (হাতি) পবিত্র কোরআনের ১০৫তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ৫ আয়াত। মোহাম্মদ (সা.)-এর জন্মের প্রায় ৪০ বছর আগে ইয়েমেনে খ্রিষ্টান শাসনকর্তা আবরাহা কাবা আক্রমণ করলে আল্লাহ আবাবিল পাখির সাহায্যে কঙ্কর বৃষ্টির দ্বারা তার হস্তীবাহিনীকে ধ্বংস করেন।

**সুরা ফোরকান** (ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসা) পবিত্র কোরআনের ২৫তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৬ রুকু, ৭৭ আয়াত। আল্লাহ তাঁর দাস মোহাম্মদ (সা.)-এর ওপর ফোরকান (ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসা) অবতীর্ণ করেছেন। বলা হয়েছে, 'তোমার আগে আমি যেসব রাসুল পাঠিয়েছি, তারা সকলেই তো খাওয়াদাওয়া করত ও হাটেবাজারে চলাফেরা করত।' মুসা (আ.)-কেও কিতাব দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর ভাই হারুন (আ.)-কে তাঁর সঙ্গী করা হয়েছিল। আদ, সামুদ, রসবাকী ও তাদের মধ্যবর্তী বহু সম্প্রদায়কে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন। তিনি আকাশে বুরুজ (রাশিচক্র) সৃষ্টি করেন। যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, অসার কাজকর্ম এড়িয়ে চলে এবং ধৈর্যশীল, তাদের জান্নাত দেওয়া হবে।

**সুরা বনি ইসরাইল** পবিত্র কোরআনের ১৭তম সুরা। ১২ রুকু, ১১১ আয়াত। মোহাম্মদ (সা.)-এর হিজরতের প্রায় এক বছর আগে মক্কায় অবতীর্ণ হয় যখন আল্লাহ তাকে তাঁর নিদর্শন দেখাবার জন্য রাতে এক সফর করিয়েছিলেন মসজিদ-উল-হারাম থেকে মসজিদ উল আকসায়। এই ঘটনাই মিরাজ বলে খ্যাত। প্রতিটি কাজেরই প্রতিফল আছে। পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও দরিদ্রের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ নামে ডাকো বা রহমান নামে ডাকো, তাঁর সব নামই সুন্দর। তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি।

**সুরা বাইয়িনা** (যুক্তি-প্রমাণ) পবিত্র কোরআনের ৯৮তম সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ৯ আয়াত। পবিত্র কোরআন একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। এই সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও যারা মতভেদের সৃষ্টি করে এবং অবিশ্বাস করে, তারা জাহান্নামে থাকবে। যারা বিশ্বাস ও সৎকাজ করে, তারা জান্নাতে থাকবে।

**সুরা বাকারা** (গাভি) পবিত্র কোরআনের দ্বিতীয় সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। ৪০ রুকু, ২৮৬ আয়াত। মহানবী (সা.) এরশাদ করেছেন, 'এই সুরার প্রতিটি আয়াতের সঙ্গে ৮০ জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। এর আয়াতুল কুরসি আল্লাহর আরশের নিচে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এই সুরার এক স্থানে গাভির উল্লেখ করা হয়েছে। মুসা (আ.)-এর উম্মত ও তওরাতের অনুসারীদের ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হয়। মক্কায় যে ধর্ম প্রচারকার্যে ব্যাপৃত ছিল, মদিনায় তা একটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর

একত্ববাদ, সমাজনীতি, রাজনীতি, আইনকানুন, হালাল ও হারাম, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি, রোজা, হজ, জুয়াখেলা, এতিমের প্রতি ব্যবহার, বিয়ে, তালাক, বৈধব্য, যুদ্ধ ইত্যাদি নানা বিষয়ে নির্দেশ দানের পর অসত্যের ওপর সত্যের জয়ের জন্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।

**সুরা বালাদ** (শহর) পবিত্র কোরআনের ৯০তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ২০ আয়াত। মক্কা নগরের শপথ করে বলা হয়েছে যে আল্লাহ মানুষকে শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাকে দুটো চোখ, জিহ্বা আর ঠোঁট দিয়েছেন এবং দুটো পথ দেখিয়েছেন। যারা কষ্টসাধ্য পথ অনুসরণ করে, তারা দাস মুক্ত করবে। দুর্ভিক্ষে এতিম আত্মীয় ও অভাবীদের অন্নদান করবে এবং পরস্পরের প্রতি ধৈর্যধারণ ও দয়াদাক্ষিণ্যের উপদেশ দেবে এবং তারা হবে ডান হাতের সঙ্গী। যারা আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করবে, তারা হবে বাঁ দিকের লোক এবং তাদের আগুন ঘিরে ফেলবে।

**সুরা বুরুজ** (রাশিচক্র) পবিত্র কোরআনের ৮৫তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ২২ আয়াত। যারা অবিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসী নরনারীকে নির্যাতন করে, তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তারা থাকবে জান্নাতে। এই সম্মানিত পবিত্র কোরআন রয়েছে লওহে মাহফুজে (সংরক্ষিত ফলকে)।

**সুরা মরিয়ম** পবিত্র কোরআনের ১৯তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৬ রুকু, ৯৮ আয়াত। জাকারিয়া (আ.) ও ইয়াহিয়া (আ.)-এর কথা বলার পর মরিয়ম ও ঈসা (আ.)-এর জন্মবৃত্তান্ত বলা হয়েছে। ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র বলে যে ধারণা রয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ঈসা (আ.)-এর ওপর শান্তি ছিল যেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন ও শান্তি থাকবে যেদিন তাঁর মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় তাঁর পুনরুত্থান ঘটবে। এ ছাড়া ইবরাহিম (আ.), ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.) ও মুসা (আ.)-এর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

**সুরা মা'আরিজ** (ধাপগুলো) পবিত্র কোরআনের ৭০তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ৪৪ আয়াত। যে শাস্তির সংবাদ প্রদান করা হয়েছে, তা অবশ্যম্ভাবী বলে কিয়ামতের বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই অস্থির। সে বিপদে পড়লে হা-হুতাশ করে আর ভালো হলেই 'না' বলে। যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, সাক্ষ্যদানে অটল, নামাজে যত্নবান, তারা জান্নাতে সম্মানিত হবে।

**সুরা মাউন** (নিত্যপ্রয়োজনের সামগ্রী) পবিত্র কোরআনের ১০৭তম সুরা। ১ রুকু, ৭ আয়াত। দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা এতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, অভাবগ্রস্তকে অন্নদান করে না, লোক দেখানো নামাজ পড়ে এবং সংসারের ছোটখাটো জিনিস দিয়ে অপরকে সাহায্য করে না।

**সুরা মায়িদা** (খাদ্য) পবিত্র কোরআনের পঞ্চম সুরা। ষষ্ঠ হিজরিতে হুদাইবিয়ার চুক্তির পর মদিনায় অবতীর্ণ। ১৬ রুকু, ১২০ আয়াত। ধর্মনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নির্দেশনা রয়েছে। হজের সময় হালাল-হারাম, অজু, গোসল ও তায়াম্মুম, মদ্যপান, জুয়া সম্পর্কে বিধান রয়েছে। মরিয়মপুত্র ঈসা ও হাওয়াবিবির উল্লেখ করা হয়েছে।

**সুরা মুজাদালা** (তর্ক-বিতর্ককারিণী) পবিত্র কোরআনের ৫৮তম সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। ৩ রুকু, ২২ আয়াত। স্ত্রীকে মা বললে সে মা হয়ে যায় না। এই জিহার প্রথা পরিত্যক্ত হয় এবং যারা এ করবে তার কাফফারার বিধান দেওয়া হয়। যারা শপথ করে মিথ্যা বলে তারা শয়তানের দলভুক্ত।

**সুরা মুজ্জাম্মিল** (চাদরে আবৃত) পবিত্র কোরআনের ৭৩তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ২০ আয়াত। এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার সময় মোহাম্মদ (সা.) চাদরে আবৃত ছিলেন বলে তাঁকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন, 'তুমি নিজেকে চাদরে জড়িয়ে রেখেছ। তুমি রাতে প্রার্থনার জন্য দাঁড়াও। রাতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে, অর্ধেক বা তার কিছু কম বা বেশি ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে পবিত্র কোরআন আবৃত্তি করো। লোকে যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধরো এবং সৌজন্য সহকারে তাদের এড়িয়ে যাও।' মুসলমানদের নামাজ কায়েম করতে ও জাকাত দিতে ও আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে বলা

হয়েছে। আল্লাহ রাসুল (সা.)-কে পাঠিয়েছেন এর সাক্ষীরূপে যেমন রাসুল পাঠিয়েছেন ফেরাউনের কাছে। রাসুলকে অমান্য করার জন্য ফেরাউনকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। কিয়ামতকে অস্বীকার করে আত্মরক্ষা করা যাবে না।

**সুরা মুতাফফিফিন** (মাপে প্রবঞ্চনা) পবিত্র কোরআনের ৮৩তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ৩৬ আয়াত। যারা ওজনে বা মাপে কম দেয়, সেই প্রাপক ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে। দুষ্কৃতকারীদের কৃতকর্ম সিজ্জিন-এ এবং সুকৃতিকারীদের কৃতকর্ম থাকবে ইল্লিইন-এ। পার্থিব জীবনে অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের সম্পর্কে তামাশা করে কিন্তু পরজীবনে অবিশ্বাসীদের অবস্থা দেখে বিশ্বাসীরা তাদের উপহাস করবে।

**সুরা মুদাসসির** (পরিচ্ছদাবৃত) পবিত্র কোরআনের ৭৪তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ৫৬ আয়াত। মানুষকে আল্লাহর ভয় প্রদর্শন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা, পবিত্রতা অর্জন এবং বিপদে ধৈর্যধারণের জন্য মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়। কিয়ামত, জাহান্নাম ও তার ১৯ জন প্রহরীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

**সুরা মুনাফিকুন** (ভণ্ডগণ) পবিত্র কোরআনের ৬৩তম সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ১১ আয়াত। মুনাফিকের আচরণ ও তাদের শোচনীয় পরিণতির বিবরণ দান করার পর মোহাম্মদ (সা.)-কে বলা হয়েছে, 'তুমি ওদের জন্য প্রার্থনা করো বা না করো দুই-ই ওদের জন্য সমান।' ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি মানুষকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন করে। মৃত্যু আসার আগে প্রত্যেকের উচিত তাকে যে জীবনের উপকরণ দেওয়া হয়েছে, তার থেকে দান-খয়রাত করা। কারণ, নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেন না।

**সুরা মুমতাহানা** (পরীক্ষণীয়া) পবিত্র কোরআনের ৬০তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ১৩ আয়াত। আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কোরো না।' কিয়ামতের দিন আত্মীয়স্বজন ও সন্তানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না। ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। ধর্মের ব্যাপারে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে নিষেধ করা হয়নি। বিশ্বাসী নারীরা দেশত্যাগী হয়ে মদিনায় আগমন করলে তাদের পরীক্ষা করা দরকার। বিশ্বাসী নারী অবিশ্বাসীদের জন্য বৈধ নয়, আর অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের জন্য বৈধ নয়। বিশ্বাসী নারীরা যারা আনুগত্যের শপথ করে বলে যে তারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক, চুরি, ব্যভিচার বা নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, অপরের সন্তানকে স্বামীর আপন সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং সৎ কাজ মান্য করবে, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করে মহানবী (সা.) আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।

**সুরা মুমিনুন** (বিশ্বাসীগণ) পবিত্র কোরআনের ২৩তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৬ রুকু, ১১৮ আয়াত। মুমিনেরা নিজেদের নামাজে বিনয়নম্র, আবার ক্রিয়াকল্প থেকে বিরত থাকে, জাকাত দান করে, যৌনাঙ্গকে সংযত করে। আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং তারা হবে ফিরদাউসের অধিকারী। আল্লাহ সাত আকাশ সৃষ্টি করেন। পরিমিত বৃষ্টি বর্ষণ করে তিনি গাছপালা ও ফল জন্মান এবং গবাদিপশু থেকে দুগ্ধ পান করান। নুহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা তাঁকে অবিশ্বাস করে তাদের নিমজ্জিত করা হয়। শেষ বিচারের দিনের ভয়াবহতার বিবরণ দিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

**সুরা মুরসালাত** (কল্যাণকর বায়ু) পবিত্র কোরআনের ৭৭তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ৫০ আয়াত। বায়ু, ঝড় ও ঝঞ্ঝার শপথ করে কিয়ামতের সত্যতার ঘোষণা করা হয়েছে। সেদিন দুর্ভোগ তাদের, যারা মিথ্যা আরোপ করে। সাবধানীরা থাকবে ছায়া ও ঝরনাবহুল স্থানে।

**সুরা মুলক** (রাজত্ব) পবিত্র কোরআনের ৬৭তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ৩০ আয়াত। আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি সাত আকাশ স্তরে স্তরে সাজিয়ে সৃষ্টি করেন। যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের জাহান্নামে

ছুড়ে ফেলা হবে। তিনি মানুষকে দিয়েছেন দেখার ও শোনার শক্তি এবং অন্তঃকরণ; অথচ তারা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

**সুরা মোহাম্মদ** পবিত্র কোরআনের ৪৭তম সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। ৪ রুকু, ৩৮ আয়াত। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের পার্থক্য ও ধনপ্রাণ দিয়ে সত্যের জন্য জিহাদের কথা বলা হয়েছে। জিহাদের মধ্য দিয়ে মুনাফিকরা পৃথক হয়ে যাবে। 'আল্লাহ অভাবমুক্ত, আর তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তিনি তোমাদের জায়গায় অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন আর তারা তোমাদের মতো হবে না।'

**সুরা রহমান** (করুণাময়) পবিত্র কোরআনের ৫৫তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৩ রুকু, ৭৮ আয়াত। সুরার প্রথম শব্দ থেকে নামকরণ হয়েছে। আল্লাহর গুণ ও ৩১ প্রকার অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে ৩৯ বার মানুষ ও জিন জাতিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?' কত মহান নাম তোমার প্রতিপালকের, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।

**সুরা রা'দ** (বজ্রধ্বনি) পবিত্র কোরআনের ১৩তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৬ রুকু, ৪৩ আয়াত। রাদ বা বজ্রধ্বনি আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করে, এ জন্য সুরার এরূপ নামকরণ। আল্লাহর একত্ববাদ, প্রেরিত পুরুষ, প্রেরণা ও কর্মফল, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্র এবং সাবধানীদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে।

**সুরা রুম** (রোমকগণ) পবিত্র কোরআনের ৩০তম সুরা। ৬ রুকু, ৬০ আয়াত। পরাজিত রোমকরা শিগগিরই জয়লাভ করবে—সেই ভবিষ্যদ্বাণী ৯ বছরের মধ্যে সত্য হয়। আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ববাদ, তাঁর মহিমা, প্রজ্ঞা এবং অসীম দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শেষ বিচারের দিনের কথা উল্লেখ করে মোহাম্মদ (সা.)-কে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

**সুরা লাইল** (রাত্রি) পবিত্র কোরআনের ৯২তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ২১ আয়াত। মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার বিভিন্ন গতি। কেউ দান করলে, সাবধানী হলে এবং যা ভালো তা গ্রহণ করলে আল্লাহ তার জন্য সুখকর পরিণামের পথ সহজ করে দেবেন। আর কেউ ব্যয়কুণ্ঠ হলে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে ও যা ভালো তা বর্জন করলে তার ধনসম্পদ কোনো কাজে আসবে না এবং তার পতন ঘটবে।

**সুরা লাহাব** (অগ্নিশিখা) পবিত্র কোরআনের ১১১তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ৫ আয়াত। ইসলামের শত্রু আবু লাহাবের ধনসম্পদ ও উপার্জন কোনো কাজে আসবে না। সে ও তার স্ত্রী অগ্নিশিখায় জ্বলবে এমন কথা উল্লেখ থাকায় সুরার এরূপ নামকরণ।

**সুরা লুকমান** পবিত্র কোরআনের ৩১তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৪ রুকু, ৩৪ আয়াত। যারা নামাজ পড়ে, জাকাত দেয় এবং পরলোকে বিশ্বাস করে, তাদের জন্য পবিত্র কোরআন এক কিতাব ও পথনির্দেশক। লুকমান স্বীয় পুত্রের প্রতি আল্লার একত্ব বা তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার, মাতাপিতার সেবা, নামাজ আদায়, জাকাত প্রদান ও বিপদে ধৈর্য ধারণ সম্পর্কে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে। অহংকার না করা, সংযতভাবে চলাফেরা এবং নম্রভাবে কথা বলার জন্য উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে, গলার আওয়াজের মধ্যে গর্দভের গলাই সবচেয়ে শ্রুতিকটু।

**সুরা শামস** (সূর্য) পবিত্র কোরআনের ৯১তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ১৫ আয়াত। সূর্য ও তার কিরণের শপথ করে সুরা শুরু করা হয়। আল্লাহ মানুষকে সুঠাম করে ভালো ও মন্দ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। সামুদ জাতি তাদের নবীকে অমান্য করার জন্য সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়।

**সুরা শুরা** (পরামর্শ) পবিত্র কোরআনের ৪২তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৫ রুকু, ৫৩ আয়াত। আল্লাহর অস্তিত্ব ও মহিমা আলোচনা করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দেওয়া হয়, ইসলাম কোনো নতুন ধর্ম নয়, বরং এর আদেশ পূর্বে নুহ (আ.), ইবরাহিম (আ.), মুসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-কেও প্রদান করা হয়। নামাজ কায়েম করে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সরল পথ ও জান্নাতের খবর দিয়ে সমস্ত বিবাদ পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে মীমাংসা

করার আদেশ করা হয়। মানুষের অমঙ্গল তার নিজের কর্মফলে। আল্লাহর অনুগ্রহ ও শিক্ষার দ্বারা মানুষের অমঙ্গল ও অকৃতজ্ঞতার প্রতিকার হয়। তাঁর অন্যতম নিদর্শন সমুদ্রগামী জাহাজ। নির্ধারিত দিন আসার আগে তোমরা তাঁর ডাকে সাড়া দাও।

**সুরা শো'আরা** (কবিগণ) পবিত্র কোরআনের ২৬তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১১ রুকু, আয়াত ২২৭। মক্কার কুরাইশদের বিরোধিতায় মোহাম্মদ (সা.) অস্থির হয়ে পড়লে তাঁর দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য আল্লাহ মুসা (আ.), ইবরাহিম (আ.), নুহ (আ.), সালেহ (আ.) ও শোয়াইব (আ.)-এর বৃত্তান্তের উল্লেখ করে তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে অত্যাচারীরা অচিরেই ভয়াবহ পরিণাম প্রত্যক্ষ করবে। পবিত্র কোরআন কবিদের রচনা নয় এবং নবুয়ত কবির কল্পনা নয়।

**সুরা সাফফ** (সারি) পবিত্র কোরআনের ৬১তম সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ১৪ আয়াত। বিশ্বাসীদের সারিবদ্ধ হয়ে জমাট সিসার প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে বলা হয়েছে। মুসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয় যে ঈসা (আ.) সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রদান করেন। মুসলমানদের জিহাদ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং স্থায়ী জান্নাতের সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

**সুরা সাফফাত** (সারিবদ্ধ জনগণ) পবিত্র কোরআনের ৩৭তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৫ রুকু, ১৮২ আয়াত। আল্লাহর একত্ব, পরকাল, অবিশ্বাসীদের দুরবস্থা ও বিশ্বাসীদের সুখের কথা বলা হয়েছে। নুহ (আ.), ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কোরবানি, মুসা (আ.) ও হারুন (আ.), ইলিয়াস (আ.), লুত (আ.) ও ইউনুস (আ.)-এর বৃত্তান্ত বয়ান করা হয়েছে। ফেরেশতা বলেছিল, 'আমরা সারি বেঁধে দাঁড়াই ও তাঁর পবিত্র মহিমা কীর্তন করি।'

**সুরা সাবা** পবিত্র কোরআনের ৩৪তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৬ রুকু, ৫৪ আয়াত। আল্লাহর মহিমা ও প্রজ্ঞার বিবরণ দিয়ে দাউদ (আ.) ও সুলায়মান (আ.)-এর ওপর তাঁর বিশেষ দানের উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়েমেনের অধুনালুপ্ত এক সমৃদ্ধিশালী জাতি সাবার তাদের পাপকর্মের জন্য ধ্বংস হয়ে যায়। ধনসম্পদের মোহে আত্মহারা যারা আল্লাহর রাসুলদের অবিশ্বাস করেছিল, তাদের শাস্তি বড় ভয়ংকর হয়েছিল।

**সুরা সিজদা** (প্রণতি) পবিত্র কোরআনের ৩২তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৩ রুকু, ৩০ আয়াত। পবিত্র কোরআনের সত্যতা ও আল্লাহর একত্ববাদ আলোচনা করে বিশ্বাসীদের তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তনের কথা বলা হয়েছে। তাঁর নিদর্শনে তারাই বিশ্বাস করে, যাদের তা স্মরণ করিয়ে দিলে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তারা জান্নাতে এবং যারা সত্য ত্যাগ করে তারা জাহান্নামে বাস করবে। মুসাকে যে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, সে ব্যাপারে সন্দেহ না করার জন্য বলা হয়েছে।

**সুরা হজ** পবিত্র কোরআনের ২২তম সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। ১০ রুকু, ৭৮ আয়াত। কিয়ামত ও পুনরুত্থানের আলোচনা এবং তাঁর যারা অংশী করে তাদের সমালোচনা করে আল্লাহ একত্ববাদের দিকে আহ্বান করেছেন। ইবাদতের কিবলা কাবা শরিফের উল্লেখ করে তিনি হজের আদেশ দিয়েছেন এবং হজের পালিতব্য অনুষ্ঠানের ও কোরবানির নির্দেশ দিয়েছেন। মোহাম্মদ (সা.)-কে সান্ত্বনা দিয়েছেন এই বলে যে, আগে নুহ, সাদ, সামুদ, ইবরাহিম, লুত, সালেহ ও মুসার সম্প্রদায়রা তাদের নবীদের মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং তিনি তার জন্য তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন। প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য তিনি যে নিয়মকানুন নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, তা তারা পালন করে। নামাজ কায়েম, জাকাত দান এবং মহানুভব অভিভাবক ও সাহায্যকারী আল্লাহকে অবলম্বন করার আদেশ করা হয়েছে।

**সুরা হাককা** (নিশ্চিত সত্য, কিয়ামত) পবিত্র কোরআনের ৬৯তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ৫২ আয়াত। আদ, সামুদ, ফেরাউন ও লুত সম্প্রদায় তাদের রাসুলদের অমান্য করার জন্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, সেদিন কিয়ামত হবে এবং কারও কোনো কর্ম গোপন থাকবে না। যাদের হিসাবের কিতাব

তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে তারা জান্নাতে এবং যাদের হিসাবের কিতাব তাদের বাঁ দিকে দেওয়া হবে তারা জাহান্নামে বাস করবে। পবিত্র কোরআন এক সম্মানিত বার্তাবাহকের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। এ কোনো কবির রচনা নয়। সাবধানীদের জন্য অবশ্যই এটা উপদেশ।

**সুরা হাদিদ** (লৌহ) পবিত্র কোরআনের ৫৭তম সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। ৪ রুকু, ২৯ আয়াত। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি ও যুদ্ধে লৌহ অস্ত্রের ব্যবহারের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী আছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর অসীম শক্তি, মহিমা, প্রজ্ঞা এবং অন্য গুণাবলির সঙ্গে সৃষ্টির উপকারে অপরিসীম দান রয়েছে। তিনি সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ। তিনি প্রকাশ্য এবং তিনি গোপন। ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে যা কিছু ঘটে, সবই আল্লাহর জ্ঞানায়ত্ত। দানের গুরুত্বের ক্ষেত্রে অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের আগে ও পরের সংগ্রাম ও দানের মর্যাদা সমান নয়। মক্কা বিজয়ের আগের মর্যাদা সর্বাধিক। পরকালে বিশ্বাসীরা আলোকপ্রাপ্ত হবেন। মুনাফিকরা দুর্গতি ভোগ করবে। যারা তাদের জীবন খেলাধুলা, শোভা, আস্ফালন এবং ধনসম্পদ বৃদ্ধিতে ব্যয় করে, তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ পথপ্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে বহু নবী-রাসুলকে কিতাব ও ফোরকানসহ প্রেরণ করেন। যেমন নুহ ও ইবরাহিম। ঈসার কাছে ইঞ্জিল কিতাব অবতীর্ণ হয়। তাঁর অনুসারীদের নিজেরাই সন্ন্যাস উদ্ভাবন করেন, তাও তারা সঠিকভাবে পালন করেনি। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ দাতা এবং তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।

**সুরা হা-মিম-সিজদা** পবিত্র কোরআনের ৪১তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ৬ রুকু, ৫৪ আয়াত। মোহাম্মদ (সা.)-কে বলা হয়েছে, 'বলো, আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। আমার ওপর প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ, তাই তাঁরই পথ অবলম্বন করো এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।' জাকাত প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদ ও সামুদদের অবিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। মানুষের কান, চোখ ও ত্বক তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। ভালো ও মন্দ দুই-ই সমান হতে পারে না। ভালো দিয়ে মন্দকে বাধা দিতে হবে। মুসাকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারপর তা নিয়ে মতভেদ ঘটেছিল।

**সুরা হাশর** (নির্বাসন) পবিত্র কোরআনের ৫৯তম সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। ৩ রুকু, ২৪ আয়াত। ইহুদিদের নির্বাসনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বলে সুরার এই নামকরণ। মদিনার অদূরে অবস্থিত বানু নাজিরদের বিশ্বাসঘাতকতা, ধৃষ্টতা, মোহাম্মদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের হত্যা করার ষড়যন্ত্রের জন্য নির্বাসনে পাঠানো। তাদের সম্পত্তি মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। বলা হয়, 'আল্লাহ এ জনপদবাসীর কাছ থেকে তাঁর রাসুলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর রাসুলের, তাঁর আত্মীয়স্বজন, এতিমদের, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের, যাতে করে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ধনসম্পদ আবর্তন না করে।'

**সুরা হিজর** (পাহাড়) পবিত্র কোরআনের পঞ্চদশ সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। ৬ রুকু, ৯৯ আয়াত। পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতর মর্যাদার কথা রয়েছে। সুরার শেষাংশে হিজরবাসী বা পাহাড়িদের সত্য প্রত্যাখ্যান ও তার জন্য তাদের শোচনীয় ইতিবৃত্ত উল্লেখ করে সীমালঙ্ঘনকারীদের সাবধান করা হয়েছে।

**সুরা হুজুরাত** (অন্দরমহল) পবিত্র কোরআনের ৪৯তম সুরা। মদিনায় অবতীর্ণ। ২ রুকু, ১৮ আয়াত। নেতার প্রতি কেমন ব্যবহার করতে হবে এবং রাসুল অন্দরমহলে থাকলে কেমন ব্যবহার করতে হবে তার উল্লেখ রয়েছে এতে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশের প্রতীক্ষা না করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না। রাসুলের দরবারে উচ্চ স্বরে কথা বলা ও দূর থেকে রাসুলকে ডাকাডাকি করা উচিত নয়। মুসলমানরা পরস্পরের ভাই, তাঁদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করতে হবে। গুজবের সত্যতা যাচাই করতে হবে। বিদ্রূপ করা বা রটনা পরিত্যাগ করতে হবে। মানুষ একই মাতাপিতা থেকে উদ্ভূত। বংশ বা জাতির ওপর তাদের মর্যাদা নির্ভর করে না।

সত্যিকার বিশ্বাসীরা আল্লাহ ও রাসুলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে ধনেপ্রাণে সংগ্রাম করে।

**সুরা হুমাজা** (নিন্দাকারী) পবিত্র কোরআনের ১০৪তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ৯ আয়াত। দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে সামনে ও পেছনে নিন্দা করে। যে ধনগর্বে নিজেকে অমর মনে করে, তাকে হুতামা নরকে নিক্ষেপ করা হবে। স্তম্ভাকারে দীর্ঘায়িত অগ্নি তাদের অন্তঃকরণ পর্যন্ত পৌঁছাবে।

**সুরা হুদ** পবিত্র কোরআনের ১১তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১০ রুকু, ১২৩ আয়াত। অংশীবাদীদের সম্বোধন করে আল্লাহর একত্বের কথা বলা হয়েছে। আবুবকর রাসুলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনাকে কোন সুরা বৃদ্ধ করেছে?' রাসুল বলেন, 'সুরা হুদ, ওয়াশিয়া, আম্মা ইতাসা আলুন এবং ইয়াশশামস। কেননা এই সব সুরায় কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা রয়েছে।' নুহ, সালেহ, লুত ও শোয়াইব-এর ইতিহাস বর্ণনা করে এতে দুষ্কৃতকারীদের শাস্তির জন্য আল্লাহর বিধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (আম্মা ইতাসা আলুন অর্থাৎ ওরা পরস্পরকে কী জিজ্ঞাসা করছে : সুরা নাবার—প্রথম আয়াত।)

**সূর্য** আর্যদের উপাস্য দেবতা। ঋগ্‌বেদে সূর্যের চারটি নাম—সবিতা, আদিত্য, বিবস্বান ও বিষ্ণু। সূর্যের পিতা কাশ্যপ ও মাতা অদিতি। সূর্যের উদয়াচলে আবির্ভাব, মধ্যাহ্ন আকাশে অবস্থিতি এবং অস্তাচলে গমন বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপ বলে বিবেচিত। সূর্য সর্বদর্শী, স্থাবর জঙ্গমের প্রাণস্বরূপ এবং সৎ ও অসৎকর্মের সাক্ষী। ঊষা সূর্যের জনয়িত্রী। সপ্ত অশ্ব যোজিত একচক্র হয়ে সূর্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন। ইন্দ্র যখন সূর্যকে পরাস্ত করে তাঁর রথচক্র হরণ করেন, তখন স্বর্ভাণু রাক্ষস সূর্যকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে এবং সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। অথর্ববেদে রাহুর উল্লেখ রয়েছে। সূর্য সময়ের স্রষ্টা। তাঁর রথচক্রের ১২টি অরা অনুযায়ী ১২ মাসের সৃষ্টি। ৩৬০ দিনে এক বছর সৃষ্ট হয়। বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার সঙ্গে সূর্যের বিয়ে হয় এবং তার গর্ভে বৈবস্বত, মনু যম ও যমুনার জন্ম। মহাভারত অনুসারে সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম হয়। বৈবস্বত মনু ইক্ষাকুর পিতা। সূর্যের পৌত্র ইক্ষ্বাকু থেকে সূর্য বংশের উৎপত্তি।

**সূর্যপুত্র** পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এখনো অনেক লোকের বিশ্বাস যে শাসক পরিবার সূর্যের বংশধর অথবা তারা সূর্য থেকে জন্মলাভ করেছে। মধ্যযুগে এ ধারণা প্রসারিত হয়। এ ধারণা থেকে সূর্যপুত্র প্রত্যয়টির বিকাশ ঘটে।

**সূর্যপূজা** আদি মানুষ কৃষিকর্মে ঋতু পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করত। সূর্য ছিল এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ। সূর্যকে ঈশ্বররূপে কল্পনা করে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করা হতো। প্রাচীন মিসরে সূর্য সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করে। মিসরের প্রধান দেবতা, সূর্যদেবতা 'রা' বা 'রে' প্রথম রাজারূপে বিবেচিত হতেন। ইকনাতানের রাজত্বকালে সূর্যদেবতা 'অ্যাটন'-এর উপাসনা শুরু হয়। মেসোপটেমিয়ার সূর্যদেবতা শামস, গ্রিসে সূর্যদেবতা অ্যাপোলো ও হিলিঅসের উপাসনা হতো। জরথুস্ত্র, মিথ্যু, রোমক, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে এবং আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের অনেক গোত্রে সূর্যপূজা ও সূর্যদেবতার প্রভাব ছিল।

**সূর্যব্রত** হিন্দু কুমারী মেয়েদের উৎসব। একে লালঠাকুরের ব্রত, সিঁড়িপূজা ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। মাঘ মাসজুড়ে কুমারী মেয়েরা আনন্দে, নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে এ ব্রত পালন করত। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন ব্রতচারিণী মেয়েরা সংযম পালন করত। পরদিন পয়লা মাঘ পাড়ার সব মেয়ে খুব ভোরে দলবদ্ধভাবে চলে যেত নদী বা পুকুরঘাটে। জলে নামার আগে তারা একটি ছড়ামন্ত্র তিনবার আবৃত্তি করত। স্নান শেষে প্রত্যেকে অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক খড়ে আগুন ধরিয়ে সূর্যদেবকে প্রণাম জানাত। এর পরের কাজ বাড়ি ফিরে তুলসীতলায় নির্মিত সিঁড়ির পূজা করা। পূজা শেষে সূর্যদেবের কাছে তারা বর চায়। প্রতিদিন একই নিয়মে এক মাস সিঁড়িপূজা হয়। মাঘ মাসের প্রতি রোববার ব্রতচারিণীরা নিরামিষ আহার করে এবং দুপুরবেলা কলার ভেলা তৈরি করে তাতে আতপ চাল, চিনি, বাতাসা, ঘি, মধু, কলা, প্রদীপ প্রভৃতি সাজিয়ে মাথায় করে নদী বা পুকুরঘাটে যায়। তাদের পেছনে একদল স্ত্রীলোক গান গাইতে গাইতে অগ্রসর হয়। ভালো স্বামী, সাংসারিক মঙ্গল আর আর্থিক সচ্ছলতা কামনা করে তারা ভেলা ভাসায়।

**সূর্যমন্দির, কোণারক** ভারতের ওডিশা প্রদেশে কোণারক অবস্থিত। কোণারক তার সূর্যমন্দিরের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। ১৯০৪ সালে ধ্বংসস্তূপ থেকে খুঁড়ে বের করা হয় এই মন্দির। এই মন্দিরকে একটা রথের আকারে গড়ে তোলা হয়েছিল, যেন ঘোড়ায় রথ টেনে নিচ্ছে। দুই পাশে ১২টি করে ২৪টি চাকা। তার মানে ১২ মাসের ২৪টি পক্ষ। প্রতিটি চাকায় আটটি করে স্পোক; এর অর্থ দিনের আটটি প্রহর। ৯ ফুট ব্যাসের চাকাগুলো ধ্বংসের মুখে। তবে একটি চাকা আজও অক্ষত রয়েছে। নানান দেব-দেবী, বাদ্যরত সুন্দরী, নর্তকী ও গায়িকা—এমনি আরও অনেক মূর্তি রয়েছে মন্দিরের গায়ে।

সেকালে সূর্যমন্দিরের সামনে দিয়ে বয়ে যেত বঙ্গোপসাগর, কাছেই চন্দ্রভাগা নদী। সূর্য উঠলে তার প্রথম কিরণ পড়ত মন্দিরের সূর্যদেব-মূর্তির মুখে কোনাকুনি হয়ে। তাই তার নাম হয়েছে কোণ+অর্ক=কোণার্ক। 'কোণার্ক' শব্দটি লোকের মুখে মুখে হয়েছে কোণারক। পুরাণ মতে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব এই সূর্যমন্দির নির্মাণ করেন। *আইন-ই-আকবরির* প্রণেতা আবুল ফজলের মতে, কেশরী বংশের রাজা নবম শতকের শেষভাগে মন্দিরটি তৈরি করেছেন। অন্য মতে, গঙ্গা বংশের রাজা নরসিংহদেব ত্রয়োদশ শতকে এই মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরে সূর্যের মূর্তি নেই।

**সেনটর** গ্রিক ধর্মে ইকসিজনের বংশধর, অর্ধেক মানবদেহ ও অর্ধেক অশ্বদেহবিশিষ্ট জীব, যারা থেসালিতে বাস করত। এরা বন্য প্রকৃতির হলেও, অনেক সেনটর কাইরনের মতো মানুষের বন্ধু ও শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত হতো।

**সেন্টরি** গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী, থেসালির সম্রাট ইক্সিয়ন দেবতা জিউস কর্তৃক অভিশপ্ত হন। হেরার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে ব্রতী হলে তাকে এক অনন্তকালীন ঘূর্ণমান চাকায় পরিণত করা হয়। সাধারণত তিনি অর্ধেক মানব ও অর্ধেক ঘোড়া রূপে প্রতিনিধিত্ব করেন।

**সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন** মুসলিম শিক্ষার অগ্রগতির জন্য তৈরি একটি সংগঠন। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সৈয়দ আমীর আলী কলকাতায় এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ভাইসরয় লর্ড রিপনের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে মুসলমানদের শিক্ষার প্রশ্নটি স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনার দাবি করা হয়। ইংরেজি শিক্ষার জন্য যে সুযোগ-সুবিধা তখন দেওয়া হচ্ছিল, সেসব মুসলমানদেরও দেওয়ার জন্য এ সমিতি বিশেষভাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্মারকলিপিতে বলা হয় যে ভারতীয়দের উন্নতি নির্ভর করে ইংরেজি শিক্ষা ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের ওপর। ১৮৫৫ সালে লর্ড ডাফরিন এই স্মারকলিপির পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রস্তাব পাস করেন।

**সেবায়েত** হিন্দু আইনে সেবায়েত বলতে কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তির ব্যবস্থাপককে বোঝায়। এ ধরনের সম্পত্তিতে সেবায়েতের কোনো মালিকানা নেই। সেবায়েত হলেন দেবমূর্তির সেবক। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বা দেবোত্তর সম্পত্তির অর্জিত মুনাফার মালিক দেবতা, সেবায়েত নন। তাঁর সম্পত্তির ব্যবস্থাপক হিসেবে কিছু অধিকার ও দায়িত্ব আছে। তিনি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার অধিকারী। ধর্মীয় মন্দিরের শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও ইচ্ছুক ব্যক্তিদের পূজার ব্যবস্থা করা এবং মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করা তাঁর কর্তব্য। তিনি কেবল আইনগত বিশেষ প্রয়োজনে দেবোত্তর বন্ধক দিতে ও হস্তান্তর করতে পারেন।

**সৈয়দ আমীর আলী** মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের কাজে অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৯) জন্মস্থান চুঁচুড়া, হুগলি জেলা। এমএ পাসের পর অধ্যাপনা, আইন ব্যবসা, সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত হন। ১৮৬৯ সালে তিনি বলেছিলেন যে, নিম্নশ্রেণীর কৃষিজীবীদের মাদ্রাসাতে পড়া ঠিক নয়, কারণ তাদের বিদ্যাশিক্ষা করা হলো প্রকৃতিবিরুদ্ধ, প্রত্যেকটি মানুষেরই সৃষ্টি হয়েছে একেকটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। খিলাফত আন্দোলনের তিনি ছিলেন সমর্থক। অল্পবয়স্ক অপরাধীদের জন্য রিফর্মেটারি স্থাপনে তিনি ছিলেন উৎসাহী। ইসলাম ও ইতিহাসের ওপর তাঁর দুটি গ্রন্থ বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য : *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম* এবং *এ হিস্ট্রি অব দ্য স্যারাসিন*। কেউ কেউ ফারসিকে পুনরায় রাজভাষা করার পক্ষে প্রচার চালালে তিনি এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেন। তিনি মহসীন ফান্ড দিয়ে মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসার বদলে ইংরেজি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার পক্ষে ছিলেন। তিনি নারীশিক্ষারও পক্ষে ছিলেন।

**সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, নবাব** (১৮৬৩-১৯২৯) বাঙালি মুসলমান কৃষকসমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণের অগ্রনায়ক। পৈতৃক নিবাস ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল। তিনি মাতৃভাষার চর্চা ও আধুনিক শিক্ষার প্রসার চাইতেন। তিনি প্রাইমারি শিক্ষা ও মাতৃভাষার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। কৃষিশিক্ষা ও নারী শিক্ষা বাঙালি মুসলমানদের জন্য অতি জরুরি বিবেচনা করে তিনি বহু উদ্যোগ নেন। তিনি মাদ্রাসা-শিক্ষার যুগোপযোগী সংস্কার চান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান ছিল। মুসলমানদের স্বধর্ম ও স্বভাষা চর্চার লক্ষ্য থেকে *ভার্নাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল, প্রাইমারি এডুকেশন ইন রুরাল এরিয়াজ, ঈদুল আজহা* এবং *মৌলুদ শরিফ* ইত্যাদি শিরোনামের গ্রন্থ তিনি লেখেন।

**সোমপুর মহাবিহার** প্রাচীন বাংলার অন্যতম বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার। পাহাড়পুরের খননকৃত বিহার কমপ্লেক্সের সঙ্গে সোমপুর মহাবিহারকে অভিন্ন মনে করা হয়। পাল বংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপাল (আনু. ৭৮১-৮২১ খ্রি.) এ বিহার স্থাপন করেন। ধ্বংসাবশেষ থেকে কিছু মাটির সিল পাওয়া গেছে, যেখানে উৎকীর্ণ রয়েছে 'শ্রী-সোমপুরে-শ্রী-ধর্মপালদেব-মহাবিহারিয়ার্য-ভিক্ষু-সংঘস্য'। লামা তারনাথ এবং অন্যান্য তিব্বতীয় উৎস থেকে জানা যায় যে, বরেন্দ্র জয়ের পর দেবপাল এটি নির্মাণ করেন। পাল শাসকেরা ছিলেন বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী। তাঁরা বেশ কিছুসংখ্যক বিহার স্থাপন করেন। এশিয়ার প্রায় সর্বত্রই অতি দ্রুত এগুলোর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তিব্বতীয় গ্রন্থ *Pag-Sam-Jon-Zang*-এ উল্লেখ আছে যে, রাজা মহীপাল নিয়মিতভাবে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সোমপুর বিহার পরিদর্শন করতেন।

একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গের বর্মণ শাসকদের সেনাবাহিনীর অভিযানের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সোমপুর মহাবিহার বিদ্যমান ছিল। বিপুলশ্রীমিত্রের নালন্দা তাম্রশাসনে উল্লেখিত আছে যে, তাঁর পূর্বপুরুষ করুণাশ্রীমিত্র সোমপুর বিহার ত্যাগে রাজি না হওয়ায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। সংস্কারের পর এ মন্দিরের জাঁকজমকের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, 'জগতাম্ নত্রৈকবিশ্রামভূঃ' (জগতে চোখের একমাত্র তৃপ্তিদায়ক স্থান)। নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে অনেক তিব্বতি ভিক্ষু এই বিহার পরিদর্শন করেছেন। অতীশ দীপঙ্কর বেশ কয়েক বছর এখানে অতিবাহিত করেন। এখানে বসে তিনি তিব্বতি ভাষায় 'মাধ্যমক রত্নপ্রদীপ' অনুবাদ করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক দীক্ষাগুরু রত্নাকর শান্তি ছিলেন এই বিহারের 'স্থবির'। মহাপণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র এর একজন আবাসিক ভিক্ষু ছিলেন। কালমহাপদ, বীরেন্দ্র এবং করুণাশ্রীমিত্রসহ আরও কয়েকজন পণ্ডিত তাঁদের জীবনের বেশ কিছু সময় এ বিহারে অতিবাহিত করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আগত ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেনদের আগমনে বৌদ্ধবিহারের পতনের সূচনা এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এ এলাকা মুসলমানদের অধিকারে এলে এটি চূড়ান্তভাবে পরিত্যক্ত হয়।

**সৌভাগ্য স্পর্শমণি** ১৯১৫ সালে ইমাম গাজ্জালির বিখ্যাত গ্রন্থ *কিমিয়া সাহাদাত*-এর বাংলায় অনুবাদ করেন মির্জা ইউসুফ। অনুবাদটি পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। দেড় হাজার পৃষ্ঠার কলেবরবিশিষ্ট গ্রন্থটি 'দর্শন পুস্তক', 'এবাদত পুস্তক', 'ব্যবহার পুস্তক', 'বিনাশন পুস্তক' ও 'পরিত্রাণ' শিরোনামযুক্ত মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করে কীভাবে মানুষ পূর্ণতা অর্জন করতে পারে এবং সংযম ও শুদ্ধ চিন্তার সাহায্যে আল্লাহর সঙ্গে একত্ব লাভ করতে পারে, তার ব্যাখ্যা রয়েছে এই অনুবাদগ্রন্থে।

**স্টার অব ডেভিড** ইহুদি ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতীক। একটি সমভুজাত্রিভুজের ওপর আরেকটি সমভুজ ত্রিভুজ বসিয়ে নির্মিত ছয়টি কৌণিক বিন্দুসমন্বিত তারকাচিহ্ন।

**স্ত্রীধন** হিন্দু আইনে স্ত্রীধন বলতে নারীর সম্পত্তিকে বোঝায়। যার ওপর তার চূড়ান্ত মালিকানা রয়েছে এবং তিনি ইচ্ছানুসারে স্ত্রীধন দখল, ভোগ বা হস্তান্তর করতে পারেন। স্ত্রীধন বিভিন্ন উপায়ে অর্জিত হতে পারে। যেমন দানমূলে, উত্তরাধিকারসূত্রে, বণ্টনমূলে, স্বীয় পরিশ্রমে, শিল্পকলা বা বিশেষ বিদ্যা দ্বারা বা ব্যক্তিগত নৈপুণ্যগুণে। কোন কোন সম্পত্তি স্ত্রীধন বলে গণ্য হবে, তা নির্ভর করে অর্জনবিধির মূল ভিত্তির ওপর। কোনো হিন্দু রমণীর আত্মীয়দের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপহারসামগ্রী এবং তাঁর অলংকার ও সাজসজ্জা, তদুপরি বিবাহ অগ্নির পূর্বে অপরিচিত কর্তৃক যে উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয় তা স্ত্রীধন। স্ত্রীধনসম্পন্ন কোনো রমণী মারা গেলে ওই ধন তাঁর উত্তরাধিকারীদের ওপর বর্তায়। মিতাক্ষরামতে, বিয়ে-যজ্ঞাদির সময়ে পিতা, মাতা, স্বামী, ভ্রাতা এবং মাতুলের তরফ থেকে দান বা উপহার হিসেবে যা পাওয়া যায়, তাকে স্ত্রীধন বলা যায়। স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের সময়ে প্রথম স্ত্রীকে প্রদেয় আনুতোষিক স্ত্রীর স্ত্রীধন হিসেবে গণ্য হবে।

**স্মৃতি** যা স্মরণে রাখা হয়েছিল। প্রাচীনকালের মানুষের পালনীয় ঐশ্বরিক নির্দেশাবলি, যা ঋষিরা গুরুশিষ্য পরম্পরায় স্মরণে রেখেছিলেন এবং যা পরবর্তীকালে মুনিরা পুস্তকাকারে সংকলন করেছিলেন, তাই সংহিতা অথবা স্মৃতিশাস্ত্র নামে খ্যাত। এই সংহিতাগুলোকে ধর্মশাস্ত্রও বলা হয়। ধর্মীয় আইনের উৎস হিসেবে শ্রুতির পরই স্মৃতির স্থান।

**স্মৃতিযুগ** হিন্দুধর্মে বেদ ভিন্ন ধর্মীয় আচার-আচরণসংক্রান্ত অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও টীকাগ্রন্থের ব্যবহার প্রচলিত আছে। সেগুলো 'স্মৃতিশাস্ত্র' নামে অভিহিত। স্মৃতিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নয়, কারণ সময়ের পরিবর্তন ও জ্ঞানের বিকাশ সাপেক্ষ এর সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়। হিন্দুধর্মের বহুমাত্রিকতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পাওয়ার জন্য বৈদিক সাহিত্যের পাশাপাশি স্মৃতিশাস্ত্রেরও চর্চা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে ধর্মীয় মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারত, এমনকি পুরাণগুলোরও চর্চার প্রয়োজন আছে।

**স্মৃতিশাস্ত্র** হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধসংবলিত শাস্ত্র। বাংলায় পাল রাজাদের সময় (আনু. ৭৫০-১১৫৫) বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। এর ফলে তান্ত্রিক ধর্ম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মুসলমান শাসনামলে চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) প্রবর্তিত উদার বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে হিন্দুদের মধ্যে চিরপ্রচলিত বর্ণপ্রথার কঠোরতা অনেকটা শিথিল হয়। সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধী তান্ত্রিক ধর্ম স্ত্রীলোক ও শূদ্রকে ধর্মাচরণে পর্যাপ্ত অধিকার দেয়। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণ্য সমাজের নেতারা স্মৃতিনিবন্ধগুলো রচনা করে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের সাহায্যে জনগণকে নিয়ন্ত্রিত করতে প্রয়াসী হন।

বঙ্গীয় বা গৌড়ীয় স্মার্ত সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটে তিনটি যুগ ধরে—রঘুনন্দন-পূর্বযুগ, রঘুনন্দনযুগ ও রঘুনন্দনোত্তরযুগ। রঘুনন্দন-পূর্বযুগের স্মার্তদের মধ্যে প্রাচীনতম ভবদেব ভট্ট আনুমানিক ৮০০-১১০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময় আবির্ভূত হন। তিনি বালক, জিকন প্রভৃতি নামে যে প্রাচীনতর স্মার্তদের উল্লেখ করেছেন, তাঁদের কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। *কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি, প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ* (বা নিরূপণ) ভবদেব রচিত সুবিদিত স্মৃতিগ্রন্থ। সে যুগের অপর বিখ্যাত স্মৃতিকার জীমূতবাহনের (আনু. ১০৫০-১১৫০) দায়ভাগ বাঙালি হিন্দুদের সম্পত্তির স্বত্বাধিকার ও উত্তরাধিকারক্রম সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক রাজা বল্লাল সেনের (আনু. ১১৫৮-৭৯) নামাঙ্কিত *দানসাগর* ও *অদ্ভুতসাগর* দুটি সুপরিচিত স্মৃতিগ্রন্থ। তাঁর গুরু অনিরুদ্ধ *হারলতা* ও *পিতৃদয়িতা* রচনা করেন। লক্ষ্মণ সেনের কর্মাধ্যক্ষ বা প্রধান বিচারপতি হলায়ুধের *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* একখানা প্রামাণিক গ্রন্থ। শূলপাণি (আনু. ১৩৭৫-১৪৬০) অন্তত ১১টি স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর *শ্রাদ্ধবিবেক* ও *প্রায়শ্চিত্তবিবেক* দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ। *স্মৃতিরত্নহার* রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র (আনু. পঞ্চদশ শতকের পূর্বার্ধ) কর্তৃক রচিত। রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণি রচিত বহু নিবন্ধের মধ্যে *কৃত্যতত্ত্বার্ণব* একখানা

বিখ্যাত স্মৃতিগ্রন্থ। এই যুগের কুল্লুকভট্ট মনুস্মৃতির জনপ্রিয় টীকা *মন্বর্থমুক্তাবলি* রচনা করেন।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য (পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক) বিভিন্ন বিষয়ে ২৮টি তত্ত্ব অর্থাৎ স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াও রঘুনন্দনের সমাজসংস্কারকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। যে তন্ত্রশাস্ত্র ব্রাহ্মণসমাজে উপেক্ষিত ছিল, তার বিপুল জনপ্রিয়তা লক্ষ করে রঘুনন্দন সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে তান্ত্রিক দীক্ষাকে স্বীকৃতি দেন। জ্যেষ্ঠার পূর্বে কনিষ্ঠা ভগ্নির বিয়ে নিন্দিত হলেও তিনি বিধান দেন যে বিশেষ কোনো কারণে জ্যেষ্ঠার বিয়ে বিলম্বিত হলে কনিষ্ঠার বিয়েতে কোনো দোষ নেই। তাঁর প্রায় সমকালীন গোবিন্দানন্দ *দানক্রিয়াকৌমুদী, বর্ষক্রিয়াকৌমুদী* প্রভৃতি চারটি গ্রন্থ ছাড়াও শূলপাণির *প্রায়শ্চিত্তবিবেক* ও শ্রীনিবাসের *শুদ্ধিদীপিকার* টীকা রচনা করেছিলেন।

রঘুনন্দনোত্তর যুগের অধিকাংশ স্মৃতিগ্রন্থই হয় মূল গ্রন্থগুলোর সংক্ষিপ্তসার, না হয় পৌরোহিত্যের উপযোগী প্রয়োগবিষয়ক। চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (১৮৩৬-১৯১০) স্বাধীন চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর *উদ্বাহচন্দ্রালোক, শুদ্ধিচন্দ্রালোক* ও *ঔর্ধ্বদেহিক চন্দ্রালোক* নামক তিনটি গ্রন্থে। তিনি নানা বিষয়ে রঘুনন্দনের মত খণ্ডন করে নিজস্ব মতামত দিয়েছেন। ব্রিটিশ শাসকদের বিচারকার্যের সুবিধার্থে তাঁদেরই উদ্যোগে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (মৃত্যু ১৮০৬) এবং বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (আনু. ১৭০০-১৭৮৮) অপর কয়েকজনের সহযোগিতায় যথাক্রমে *বিবাদভঙ্গার্ণব* ও *বিবাদার্ণবসেতু* (১৭৭৬) নামক দুখানি স্মৃতিগ্রন্থ সংকলন করেন।

স্মৃতিগ্রন্থগুলোয় আলোচিত বিষয়গুলোকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা আচার, প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবহার। কোনো কোনো গ্রন্থে মৈথিল্য, উড়িয়া ও কামরূপীয় গ্রন্থের উল্লেখ আছে। কোনো কোনো গ্রন্থে দুর্গাপূজা সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে কুমারীপূজাকে অপরিহার্য বলা হয়েছে। দশমীকৃত্যের মধ্যে শবরোৎসব বিহিত হয়েছে। এতে ভক্তরা গায়ে লতাপাতা জড়িয়ে কাদা মেখে পরস্পর অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করত।

জীমূতবাহনের মতে, পিতার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার জন্মে, কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে জন্মমাত্রই পুত্র পিতার সম্পত্তির অংশভাগী হয়। স্মৃতিনিবন্ধসূত্রে প্রতিফলিত সমাজে দেখা যায়, প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে যোগ্য পাত্রের অভাবে কন্যা আমরণ পিতৃগৃহে থাকবে, তথাপি অযোগ্য পাত্রে তাকে সমর্পণ করা উচিত নয়। উল্লিখিত অদ্ভুতসাগরে নানা প্রকার অশুভ লক্ষণ এবং সেগুলোর প্রতিকার সম্পর্কে লোকবিশ্বাস দেখা যায়। রঘুনন্দনের মতে, কিছু অশুভ লক্ষণ হলো : গাছে অকালে ফুল ফোটা বা ফল ধরা, মাথায় কাক বা শকুনের পতন, গৃহোপরি বানর, পেঁচক প্রভৃতির অবস্থান ইত্যাদি। স্মৃতিশাস্ত্রের এসব বিধিনিষেধ আগের মতো পালিত হয় না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, উত্তরাধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রভাব এখনো অটুট রয়েছে।

**স্যাটার্ন** গ্রিক পুরাণ কথিত জুপিটারের পিতা। স্বর্গের সিংহাসন থেকে তাঁর পুত্র কর্তৃক উৎখাত হলে তিনি পালিয়ে আশ্রয় নেন ইতালিতে। তিনি সেখানে জনগণকে কৃষি ও উপকারী শিল্পকলায় দীক্ষা দেন। যে সময়ে তিনি এসব কাজ করছিলেন, ইতিহাসে তা স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত।

**স্যারপিনন** গ্রিক পুরাণমতে, জুপিটার ও ইউরোপার পুত্র। তিনি ছিলেন প্রাচীন এশিয়া মাইনর অঞ্চলে অবস্থিত লিসিয়ার রাজা। ট্রয় অবরোধকালে তিনি খুবই আলোচিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি প্যাট্রোক্লাসের হাতে নিহত হন।

**স্বস্তিক, স্বস্তিকা** সংস্কৃত স ও অস্তি শব্দদ্বয়ের সন্ধিরূপ। অর্থ সৌভাগ্য বা অস্তিত্ব। ইন্দো-এরিয়ান, হিট্টাইট, কেল্ট ও গ্রিকরা স্বস্তিকা ব্যবহার করত। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হিন্দু স্বস্তিকা বৃত্তের এক-চতুর্থাংশ বিন্দু দ্বারা অলংকৃত হয়। এশীয়, ইউরোপীয়, আফ্রিকীয় ও আদি আমেরিকান সংস্কৃতিতে স্বস্তিকা শিল্পের মোটিফ বা ধর্মের প্রতীক হিসেবে বহুদিন ধরে চালু আছে। এই প্রতীকের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা বিভিন্নভাবে অনুমান করেছেন : ১. সূর্যের প্রতিরূপ, ২.

অগ্ন্যুৎপাদক অরণিদ্বয়ের পরস্পর সমকোণভাবে তির্যক অবস্থান, ৩. ধ্যানস্থ বুদ্ধদেবের তির্যকৃস্থিত পদদ্বয়, ৪. ঘটে সিন্দুর রেখাঙ্কিত গণেশমূর্তি। হিন্দুরাজারা স্বস্তিকা বালি দ্বীপে নিয়ে যান এবং তা এখনো সেই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। হাইনরিশ শ্লিমান ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী জার্মান পণ্ডিতের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাচীন জার্মান, গ্রিক ও বৈদিক সংস্কৃতির নিদর্শন হিসেবে নাৎসিরা এই প্রতীক গ্রহণ করে এবং ফ্যাসিজম, বর্ণবাদ ও শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদের প্রচারণা চালায়। দক্ষিণ এশিয়ায় নানা কাজে এবং নানা অনুষ্ঠানে, এমনকি নির্বাচনী প্রচারেও স্বস্তিকার ব্যবহার রয়েছে।

**স্বস্তিকাসন** যোগীর আসন বিশেষ। জানু, উরুদ্বয়ের মধ্যে দুই পদতল রেখে সরল হয়ে উপবেশন করলে স্বস্তিক আসন হয়।

## হ

**হক, হাক** অর্থ স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা। আলহাক-এর অর্থ স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট, চিরস্থায়ী, বাস্তব। আরবি 'বাতিল' শব্দটি হক-এর বিপরীত অর্থজ্ঞাপক। হক আল্লাহর অন্যতম নাম। হক এর বিপরীত অর্থজ্ঞাপক। হক-এর অর্থ সত্য বলে অনুবাদ করা হলেও পণ্ডিতেরা মনে করেন এর নিকটতম প্রতিশব্দ বাস্তব। হক শব্দটি বিধিবিধানের ধারণা থেকে উৎপন্ন 'অধিকার কর্তব্য' অর্থও নির্দেশ করে। আল্লাহর হকের সঙ্গে মানুষের হকের কোনো সম্পর্ক নেই। সুফিদের মতে, হক সাধনার সর্বশেষ স্তর। মারেফাতেরও পরে। হক আল ইয়াকিন হলো এমন প্রকৃত নিশ্চয়তা, যা প্রত্যক্ষ বিশ্বাস। বিজ্ঞানগত বিশ্বাস লাভের পর হালের অবস্থায় বাস্তব সত্তায় বিলীন হওয়ার পর মানুষ অর্জন করে। সুফিদের মতে, হুকুকু আল-নাফস হচ্ছে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় এবং তা হক নয় অর্থাৎ যা নাফস কামনা করে, কিন্তু তার জীবনধারণের জন্য আবশ্যকীয় নয়।

**হজ** ইসলামের পাঁচটি আরকান বা স্তম্ভের পঞ্চমটি। হজের আভিধানিক অর্থ 'কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করা', 'সংকল্প করা' কিংবা 'চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করা'। শরিয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট সময়পরিসরে কাবা ঘর প্রদক্ষিণ, আরাফাত ময়দানে অবস্থান, সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে গমনাগমন, মিনায় অবস্থান প্রভৃতি কাজ হজরত মোহাম্মদ (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করার নামই হজ।

পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের জন্য নির্মিত প্রথম ইমারত হচ্ছে মক্কাস্থ কাবা (৩ : ৯৬), যা 'বায়তুল্লাহ' বা 'আল্লাহর ঘর' নামে অভিহিত। আল্লাহ হজরত ইবরাহিমকে (আ.) আদেশ দেন : 'আমার গৃহকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য, যারা তওয়াফ করে এবং যারা সালাত-এ দাঁড়ায়, রুকু করে ও সিজদা করে। এবং মানুষের কাছে হজের ঘোষণা করে দাও, ওরা তোমার কাছে আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উষ্ট্রের পৃষ্ঠে, ওরা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।' (২২: ২৬-২৭)। এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত ইবরাহিম (আ.) সর্বপ্রথম কাবাকে কেন্দ্র করে হজের প্রবর্তন করেন। তাঁর আহ্বানে লোকেরা মক্কায় হজ সম্পাদন করার জন্য আসতে থাকে। তিনি ও পুত্র ইসমাইল (আ.) কাবা ঘর পুনর্নির্মাণ করেন (২: ১২৭)। তখন থেকে প্রতিবছর বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন কাবা শরিফে হজনিমিত্ত সমবেত হতে থাকে।

পরবর্তী এক পর্যায়ে কাবায় ৩৬০টি দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নানাবিধ অন্যায় ও অশালীন অনুষ্ঠানও উদ্‌যাপিত হতে থাকে। এসব কারণে নবম হিজরিতে হজরত মোহাম্মদ (সা.) নিজে হজ পালন করতে যাননি; আবুবকর (রা.)-এর নেতৃত্বে ৩০০ সাহাবির একটি দল পাঠানো হয়। দশম হিজরিতে নবী করিম (সা.) স্বয়ং হজের নেতৃত্ব দেন।

**হঠযোগ** যোগের একটি ধারা। পতঞ্জলির ধ্রুপদ যোগের পর নবম-দ্বাদশ শতাব্দীতে হঠযোগের বিকাশ। এই যোগের কঠোর শারীরিক অনুশীলনকে রাজযোগের প্রস্তুতি হিসেবে গণ্য করা হয়। হঠযোগ অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রের যোগ। সূর্য প্রাণের সেই নিঃশ্বাসের দ্যোতক যা বুক থেকে নাক ও মুখ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে এবং চন্দ্রযোগ বায়ুর যা দেহের তলদেশ থেকে পা পর্যন্ত পরিভ্রমণ

করে। এভাবে শরীরের সমস্ত জীবনীশক্তিকে সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

**হনুমান** রামায়ণ মহাকাব্যের অন্যতম নায়ক। তাঁর মাতা অঞ্জনার সঙ্গে বায়ু দেবতার বিয়ে হয়। বায়ু দেবতার সঙ্গে অঞ্জনার মিলনে হনুমানের জন্ম। যেকোনো পাখির চেয়ে হনুমান দ্রুত উড়তে পারতেন। শৈশবে তিনি সূর্যকে ফল মনে করে তা খেতে গিয়েছিলেন। ইন্দ্র তাঁকে চোয়ালে আঘাত করে বাধা দেন। ক্রুদ্ধ বায়ু দেবতা হনুমানকে নিয়ে এক গুহায় আশ্রয় নেন। ফলে পৃথিবীতে কেউ নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না। দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা গুহায় গিয়ে হনুমানের ক্ষত ভালো করে দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বায়ুর সন্তানের 'হনুমান' নাম হয়, যার অর্থ—'যার চোয়াল বড়'। ব্রহ্মা হনুমানকে যেকোনো আকার ধারণ করার বর দেন। অন্যান্য দেবতাও নানা বর দেন। তিনি বাগ্মী ছিলেন। সুগ্রীবের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি সুগ্রীবকে রামের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে অনুপ্রাণিত করেন। সমুদ্র উল্লম্ফন করে রামকে সীতার সংবাদ দেন এবং রামের পরিচর্যা করেন। রামভক্তদের কাছে হনুমান আদর্শ ভক্ত হিসেবে বিবেচিত। লৌকিক বিশ্বাসে হনুমান তাঁর ভক্তদের অশুভ প্রেতাদি থেকে রক্ষা করেন।

**হরিচাঁদ ঠাকুর** হিন্দুধর্মীয় সাধক ও মতুয়া সম্প্রদায়ের গুরু। ১৮১১ সালে গোপালগঞ্জ জেলার ওড়াকান্দি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা যশোমন্ত ঠাকুর ছিলেন একজন মৈথিলী ব্রাহ্মণ এবং নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। হরিচাঁদের (১৮১১-৭৭) স্কুলের গণ্ডিবদ্ধ জীবন ভালো না লাগায় স্কুল ত্যাগ করে তিনি মিশে যান সাধারণ মানুষের সঙ্গে। প্রকৃতির আকর্ষণে তিনি ঘুরে বেড়ান গ্রাম থেকে গ্রামে। দৈহিক সৌন্দর্য, স্বভাব-সারল্য, সংগীতপ্রিয়তা এবং পরোপকারী মনোভাবের কারণে তিনি বন্ধুদের কাছে খুবই প্রিয় ছিলেন। তিনি ভালো ভজনও গাইতে পারতেন। হরিচাঁদ বাল্যকাল থেকেই ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তিনি চৈতন্যদেবের প্রেম-ভক্তির কথা সহজ-সরলভাবে প্রচার করতেন। তাঁর এই সাধনপদ্ধতিকে বলা হয় 'মতুয়াবাদ', আর এই আদর্শে যারা বিশ্বাসী তাদের বলা হয় 'মতুয়া'।

মতুয়াবাদ সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা—এই তিনটি মূল স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ মতবাদে সকল মানুষ সমান; জাতিভেদ বা সম্প্রদায়ভেদ মতুয়াবাদে স্বীকৃত নয়। শিষ্যদের সিংহভাগই সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক। তারা তাঁকে বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করে। তাদের বিশ্বাস: 'রাম হরি কৃষ্ণ হরি হরি গোরাচাঁদ। সর্ব হরি মিলে এই পূর্ণ হরিচাঁদ।' হরিচাঁদ সন্ন্যাসজীবনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর ধর্মসাধনার মূল কথা হলো: 'গৃহেতে থাকিয়া যার হয় ভবোদয়/ সেই যে পরম সাধু জানিও নিশ্চয়।'

মতুয়াদের প্রতি হরিচাঁদের ১২টি উপদেশ আছে, যা 'দ্বাদশ আজ্ঞা' নামে পরিচিত। সেগুলো হলো: ১. সদা সত্য কথা বলবে; ২. পিতামাতাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করবে; ৩. নারীকে মাতৃজ্ঞান করবে; ৪. জগৎকে ভালোবাসবে; ৫. সকল ধর্মের প্রতি উদার থাকবে; ৬. জাতিভেদ করবে না; ৭. হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করবে; ৮. প্রত্যহ প্রার্থনা করবে; ৯. ঈশ্বরে আত্মদান করবে; ১০. বহিরঙ্গে সাধু সাজবে না; ১১. ষড়রিপু বশে রাখবে এবং ১২. হাতে কাম ও মুখে নাম করবে। হরিচাঁদ তাঁর জীবন ও আদর্শ নিয়ে কবিয়াল তারকচন্দ্র সরকার *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত* (১৮৭৭) গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর জন্মতিথিতে প্রতিবছর ওড়াকান্দিতে দেশ-বিদেশের মতুয়ারা সম্মিলিত হন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

**হরিদাস ঠাকুর বা যবন হরিদাস** বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক ও পদকর্তা। আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে যশোর জেলার বুড়ন গ্রামে জন্ম। শৈশবে এই ব্রাহ্মণ-সন্তান মুসলমান ঘরে প্রতিপালিত হন বলে যবন হরিদাস নামে খ্যাত। তিনি চৈতন্যের ভক্ত ছিলেন এবং তাঁরই সম্মুখে পুরীধামে প্রাণ ত্যাগ করেন।

**হরিদ্বার** শিবালিক পর্বতের পাদদেশে গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত হিন্দুদের তীর্থস্থান। বার্ষিক মেলায় এবং দ্বাদশ বর্ষ অন্তর অনুষ্ঠিত কুম্ভ মেলায় লাখ লাখ লোকের সমাগম হয়।

**হরিশ্চন্দ্র** হিন্দু পুরাণে বর্ণিত সূর্যবংশীয় রাজা। তিনি একবার শিকার করতে গিয়ে ঋষি বিশ্বামিত্রের

কোপদৃষ্টিতে পড়েন। ঋষির অভিশাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশ্বামিত্রকে তিনি রাজসিংহাসন দান করে স্ত্রী শৈব্যা ও পুত্র রোহিতাশ্বকে নিয়ে কাশী গমন করেন। দারিদ্র্যের তাড়নায় স্ত্রী ও পুত্রকে বিক্রয় করে ঋষিকে দক্ষিণা দান করেন। তারপর চণ্ডালের ক্রীতদাস হিসেবে শ্মশানে শবদাহের কাজে নিযুক্ত হন। স্পর্শাঘাতে রোহিতাশ্বের মৃত্যু হলে শৈব্যা তাকে শ্মশানে নিয়ে এসে কাঁদতে থাকেন। হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী ও পুত্রকে চিনতে পারেন। মনের দুঃখে হরিশ্চন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী উভয়েই পুত্রের চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হলে বিশ্বামিত্র তাঁর দানধর্মে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর রাজ্য-সম্পদ ফিরিয়ে দিয়ে স্বর্গপ্রাপ্তির বর দেন।

**হরেকৃষ্ণ মন্ত্র** ভক্তিসহকারে ভগবানের সেবা করে কৃষ্ণভাবনা অর্জন না করলে শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারা যায় না।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১০/১৪/২৯) বলা হয়েছে:

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রাসাদলেশানুগৃহীত এব হি।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নোন চান্য একোঽপি চিরং বিচিম্বন।

'হে ভগবান, আপনার শ্রীচরণকমলের কণামাত্রও কৃপা যে লাভ করতে পারে, সে আপনার মহান পুরুষত্বের উপলব্ধি অর্জন করতে পারে। কিন্তু যারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধির উদ্দেশ্যে কেবলই জল্পনাকল্পনা করে, তারা বহু বছর ধরে বেদ অধ্যয়ন করতে থাকলেও আপনাকে জানতে সক্ষম হয় না।' কেবল জল্পনাকল্পনা আর বৈদিক শাস্ত্রের আলোচনার মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলা ইত্যাদি জানতে পারা যায় না।

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।'

এই মহামন্ত্র কীর্তন করে ভক্তিযোগ অনুশীলন করা শুরু করে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হলেই কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানা যায়।

ভগবদ্‌গীতার সপ্তম অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে:

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ।

'কামনা-বাসনা দ্বারা যাদের বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, তারাই বিভিন্ন দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়।' ভগবানের পরম ধাম ছাড়াও বিভিন্ন দেব-দেবীর নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন গ্রহলোক আছে। বিভিন্ন দেব-দেবী গ্রহলোকে যান এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত কৃষ্ণলোকেই গমন করে। ত্রিবিংশতিতম শ্লোকে বলা হয়েছে, 'দেবান দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি'—অর্থাৎ দেব-দেবীরা বিভিন্ন দেবলোকে যান, এবং যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তারা কৃষ্ণলোকে যায়। কৃষ্ণ এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর কেউই নির্বিশেষ নন। তাঁরা সকলেই সবিশেষ ব্যক্তিত্ব। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তাঁর নিজস্ব গ্রহধাম আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীরও ভিন্ন ভিন্ন গ্রহলোক আছে। বিভিন্ন দেব-দেবীর এবং ভগবানের রূপ একই সঙ্গে বিদ্যমান এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ সদানন্দময়। বেদেও বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর হচ্ছেন আনন্দময় এবং তিনি 'অভ্যাসাৎ' অর্থাৎ তাঁর প্রকৃতি অনন্ত চিন্ময়গুণে বিভূষিত। গীতাতে ভগবান বলেছেন, যদিও তিনি অজ, তবু তিনি আবির্ভূত হন।

**হস্তরেখাবিদ্যা** হাত ও হাতের রেখা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কারও মানসিক অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ নির্ধারণ করার বিদ্যা। প্রাচীন ব্যাবিলন ও কালদিয়া অঞ্চলে এ বিদ্যার শুরু বলে মনে করা হয় এবং সেখান থেকে তা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। হস্তরেখাবিদ্যা দুই রকমের: ক. Cheirgnomy বা হাতের বিশ্লেষণ এবং খ. Cheiromancy বা হস্তরেখার বিশ্লেষণ। প্রথমটিতে হাতের বিচার করা হয়। এতে হাতের ত্বক ও গঠন, বৃদ্ধাঙ্গুলসহ অন্যান্য আঙুলের নমনীয়তা, দৈর্ঘ্য ও দূরত্ব বিশ্লেষণ করা হয়। কারও বৃদ্ধাঙ্গুল নমনীয় হলে তার দ্বারা বোঝায় যে, তার মনোবৃত্তিও নমনীয় এবং সে আপসকামী। কিন্তু আঙুলটি অনমনীয় হলে বোঝায় যে, সে আপসহীন এবং নিজের সিদ্ধান্তে অনড়। এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলের সঙ্গে অন্যান্য আঙুলের দূরত্ব থেকেও ব্যক্তির অপর গুণাগুণ জানা যায়। অন্যান্য আঙুল থেকে বৃদ্ধাঙ্গুল যদি বেশি দূরে অবস্থিত হয়, তাহলে

বুঝতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উদার প্রকৃতির ও বন্ধুভাবাপন্ন এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তিটি স্বাধীনচেতা তাই সে অন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা পছন্দ করে না। আবার সুবিন্যস্ত তর্জনী স্বাধীন মনোবৃত্তিকে সূচিত করে।

তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি ফাঁক থাকলে বুঝতে হবে ব্যক্তিটি চিন্তা-ভাবনায় স্বাধীন এবং কেবল যুক্তিতর্কের সাহায্যেই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে কনিষ্ঠা ও অনামিকার মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকলে তার দ্বারা বোঝায় যে ব্যক্তিটি স্বাধীন মত অনুসারে কাজ করে থাকে। এ ধরনের ব্যক্তিকে দিয়ে তার মতের বিরুদ্ধে জোর করে কোনো কাজ করানো সম্ভব নয়। সে একাকী কাজ করতে পছন্দ করে, সহযোগী বা দলের সঙ্গে নয়। সব আঙুলের মধ্যেই ফাঁক থাকলে বুঝতে হবে সে প্রচলিত নিয়মের বাইরে নতুন নতুন উপায়ে প্রথাবিরোধী কাজ করতে উৎসাহী। আবার আঙুলের মধ্যে কোনো ফাঁক না থাকলে বুঝতে হবে ব্যক্তিটি প্রচলিত নিয়মকানুনের বাইরে যায় না এবং সে একজন কৃপণ ও স্বার্থপর।

Cheiromanc পদ্ধতিতে প্রধানত হস্তরেখা বিশ্লেষণ করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে করতলের স্ফীতির সঙ্গে রেখাগুলোর অবস্থানও বিচার করা হয়। হাতের রেখাগুলো মানুষের বিভিন্ন গুণাগুণ নির্দেশ করে। হাতের তালুতে বেশ কতগুলো লম্বা ও গভীর রেখা থাকে, যেগুলোকে বলা হয় মাথা, হৃদয় এবং জীবনরেখা। এ ছাড়া আরও কতগুলো রেখা আছে, যেগুলো ভাগ্যরেখা, সূর্যরেখা ও বিবাহরেখা নামে পরিচিত। হস্তরেখাবিদ কারও হাত দেখার সময় প্রধান রেখাগুলো কত মোটা এবং তাদের শুরু ও শেষ এবং এগুলো কোন কোন রেখার সঙ্গে মিলিত হয়েছে ইত্যাদি বিষয় বিচার করেন।

**হাজরে আসওয়াদ** কাবা শরিফের প্রাচীরে প্রোথিত কালো পাথর। প্রাক-ইসলামি যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই পাথরকে পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। হজের সময় এই পাথরের স্থান থেকেই তওয়াফ বা প্রদক্ষিণের সূচনা হয় ও প্রত্যেক প্রদক্ষিণে এই পাথরকে চুম্বন করতে হয়।

**হাদিস** আরবি শব্দটির অর্থ কথা বা বাণী। ইসলামি পরিভাষায় হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর কথা, কাজ এবং সমর্থনকে হাদিস বলা হয়। মুসলমানরা হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিটি কথা সংরক্ষণ করেছেন, যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন তাঁরা মহানবী (সা.)-এর হাদিস মুখস্থ রাখেন। পরবর্তীকালে হাদিসগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়। *বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, নাসাই, আবু দাউদ* এবং *ইবনে মাজা*—এই ছয়টি হচ্ছে প্রামাণিক হাদিস সংকলন। যেহেতু ইসলামে আল্লাহর আদেশের সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর আদেশ পালন করাও কর্তব্য, সেহেতু হাদিস মেনে চলাও অবশ্য কর্তব্য। ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে ধারণ ও বোঝার জন্য পবিত্র কোরআনের সঙ্গে হাদিস জানাও জরুরি। মহানবী (সা.)-এর কথা, কাজ ও তাঁর সমর্থনগুলো হাদিস। সাহাবি ও তাবেয়িদের কথা, কাজ ও সমর্থনকেও হাদিস বলা হয়। হাদিসের দুটি অংশ সনদ ও মতন; হাদিস যাঁরা বর্ণনা করেন তাঁদের রাবি এবং রাবিদের নামের পরম্পরাকে সনদ এবং হাদিসের ভাষ্যকে মতন বলা হয়। হাদিস প্রধানত তিন প্রকার: কাওলি, ফিলি ও তাকরিরি। বক্তব্যমূলক হাদিসকে কাওলি, কার্যসূচক হাদিসকে ফিলি এবং সম্মতিসূচক হাদিসকে তাকরিরি বলে। এ ছাড়া হাদিসের অন্য রকম বিভাজনও আছে। স্বয়ং রাসুলের (সা.) হাদিস মারফু, সাহাবির হাদিস মাওকুফ এবং তাবিয়ির হাদিস মাকতু নামে অভিহিত।

**হাফসা** হজরত ওমর ফারুক (রা.)-এর কন্যা এবং হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর স্ত্রী। বদরের যুদ্ধে স্বামী কুরাইশবংশীয় ইবনে হুজাফা শহীদ হলে হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে পরিণীতা হন। তিনি লেখাপড়া জানতেন।

**হাবিয়া** জাহান্নামের এক নাম। সুরা কারিয়া-র ৮-১১ আয়াতে বলা হয়েছে, 'কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে তার জায়গা হবে হাবিয়া। সে কী, তুমি তা জানো? (সে) এক গনগনে আগুন।'

**হাবিল ও কাবিল** হজরত আদম (আ.) ও বিবি হাওয়ার দুই পুত্র। পবিত্র কোরআনে এই দুই ভাইয়ের উল্লেখ থাকলেও নামকরণ করা হয়নি। এঁরা উভয়েই আল্লাহর নামে কোরবানি দেন কিন্তু

কাবিল যখন বোঝেন তাঁর কোরবানি নামঞ্জুর হয়েছে, তখন তিনি ক্রোধে হাবিলকে হত্যা করেন।

**হাম** বাইবেলে বর্ণিত হজরত নুহ (আ.)-এর দ্বিতীয় পুত্রের নাম। হজরত নুহ (আ.)-এর এই পুত্রই অবিশ্বাসী হয়ে নুহের (আ.) নৌকায় আরোহণ না করায় সমুদ্রগর্ভে ডুবে যান। পবিত্র কোরআনে অবশ্য হামের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

**হামজা, হজরত হামজা (রা.)** মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর পিতৃব্য ও বিখ্যাত বীর। আমির হামজা ও জঙ্গনামা পুঁথিতে তাঁর বীরত্বগাথা লেখা রয়েছে। প্রথম জীবনে তিনি ইসলামবিরোধী থাকলেও মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি আবু জাহেলের দুর্ব্যবহার দেখে পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অসীম বীরত্ব দেখান। ওহোদের যুদ্ধে জনৈক হাবশির গোপন বর্শাঘাতে তিনি নিহত হন।

**হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.)** আবদুল মুত্তালিবের শেষ বয়সের দুই ছেলের একজন, বীর শক্তিমান যোদ্ধা। নবী (সা.)-এর নবুয়তের প্রথম দিকে ইসলাম কবুল না করলেও পরে যখন জানতে পারেন আবু জাহেল তাঁর প্রতি কটূক্তি ও ভ্রুকুটি করেছেন, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হন এবং নবী (সা.)-কে সমর্থন জানিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনিও 'আল্লাহর সিংহ' নামে খ্যাত। বদরের যুদ্ধে তিনি পরাক্রমে জিহাদ করেন এবং তৎকালীন অমুসলিম কুরাইশ যোদ্ধা আবু সুফিয়ান (র.)-এর স্ত্রী হিন্দার পিতা উতবা ইবনে রাবিয়াকে হত্যা করেন। আরেক যুদ্ধে তাঁর দুই ছেলেকেও মেরে ফেলেন। হিন্দা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, একদিন তিনি হামজার যকৃৎ ভক্ষণ করবেন। পরের যুদ্ধেই, ওহোদে তিনি শহীদ হন এবং হিন্দা শুধু তাঁর যকৃতের একটা অংশ চিবাননি, অঙ্গচ্ছেদও করেন।

**হায়েজ** মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব। ইসলামি মতে, এ সময়ে শরীর নাপাক থাকে। ফলে এই সময়ে মেয়েদের নামাজ পড়া, রোজা রাখা, কাবা ঘর তওয়াফ করা, পবিত্র কোরআন স্পর্শ করা, মসজিদে প্রবেশ করা ও সহবাস নিষিদ্ধ। কমপক্ষে নয় বছর বয়সে ঋতুস্রাব শুরু হয় এবং ৫৫-৬০ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে, যার পর্যায়কাল তিন দিন থেকে ১০ দিন।

**হায়াসিনথাস** গ্রিক পুরাণে বর্ণিত স্পার্টার এক সুদর্শন তরুণ। অ্যাপোলো তাঁকে ভালোবেসেছিলেন। ডিসকাসের সঙ্গে ক্রীড়ারত থাকা অবস্থায় দুর্ঘটনাবশত তিনি নিহত হন। অ্যাপোলো তাঁর দেহের রক্তধারাকে একটি ফুলে পরিণত করেন। ফুলের নাম 'হায়াসিন্থ্'। এটা অবশ্য 'নীল পাথর' হিসেবেও পরিচিত।

**হারকিউলিস** গ্রিক পুরাণ-কথিত জুপিটারের পুত্র। রোমক কিংবদন্তির নায়ক। তিনি তাঁর শক্তিমত্তা ও অসমসাহসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁকে এমন ১২টি কাজ দেওয়া হয়, যা ছিল প্রায় অসম্ভব।

**হারমেনিউটিক্স** ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত একটি বিদ্যাচর্চা। আধুনিক হারমেনিউটিক্সের সবচেয়ে বড় প্রভাবশালী পণ্ডিত হচ্ছেন প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মতাত্ত্বিক Friedrich Schleiermacher (১৭৬৮-১৮৩৪)। তাঁর Element of Grammar, Hermeneutics and Criticism (১৮০৮) শীর্ষক ব্যাকরণ, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং গ্রন্থ-সমালোচনার গ্রন্থকে ব্যাখ্যাতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সংমিশ্রণে দাঁড় করিয়েছেন। ডিলথি বলেন, হারমেনিউটিক প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হচ্ছে 'লেখক নিজেকে যেভাবে বোঝেন, তার চেয়েও ভালোভাবে [তাকে, তার কর্মকে] বোঝা।'

মার্টিন (Scripture sola, 'শুধু পবিত্র গ্রন্থের জোরে') পোপের বহু শতকের কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে এবং পবিত্র গ্রন্থের লেখায় ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানায়। লুথার উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইবেলের একটি কোর্স পড়াতেন। তিনি বাইবেলের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন, যাতে গির্জার পুরোহিতদের বিশদ ব্যাখ্যার স্থানে, লেখার পরিবর্তে ছিল সাদা ফাঁকা জায়গা। লুথারের প্রতীকী এই কর্মটির পর ব্যাখ্যার কাজ আবার নতুন করে শুরু হয়। এই ধারার ভাবনা হচ্ছে, খোদ পবিত্র গ্রন্থ সবচেয়ে ভালোভাবে নিজ ব্যাখ্যা দান করে, আর পাঠক যদি নিজেকে সেটির পাঠে সমর্পণ করেন, তাহলে আসল অর্থ সহজে উদ্ভাসিত হবে, ব্যাখ্যায় সনাতনী কর্তাব্যক্তিদের সাহায্য লাগবে না।

আধুনিক দর্শনের ভাষাগত মোড়-ঘোরার সঙ্গে হারমেনিউটিক্স নতুন ধরনের তাৎপর্য লাভ করে, কিন্তু সাচ্চা কিংবা চূড়ান্ত ব্যাখ্যার ধারণা সমস্যাজনক বলে বিবেচিত হওয়াতে পুরোনো নিশ্চয়তাগুলো হারিয়ে যায়। তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব সম্ভবত নিৎসের এই কথাগুলো: 'না, বাস্তব ঘটনা বলে কিছু নেই, আছে শুধু তার ব্যাখ্যা।' হারমেনিউটিক্সের প্যারাডক্স হচ্ছে যে এটি অনস্বীকার্যভাবে একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া। ক্ষুদ্র বিষয়টি সমগ্রে স্থাপন না করলে বোঝা যায় না, আবার সমগ্র বুঝতে হলে ক্ষুদ্র বিষয়গুলো বোঝা জরুরি হয়ে পড়ে। এটিই 'হারমেনিউটিক চক্র'। অর্থ 'বাইরের' থেকে বোঝা সম্ভব নয়। আমাদের হাতে আছে শুধু একের পর এক ব্যাখ্যা। পবিত্র কোরআনের হরমেনিউটিক্স সম্পর্কে সমকালীন অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ চিন্তা করছেন কীভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে পবিত্র কোরআনকে একটি মুক্তিকামী গ্রন্থ হিসেবে পাঠ করা যায় তা আবিষ্কার করা। তাদের পূর্বানুমান হচ্ছে: ধর্মীয় জ্ঞান আর সব জ্ঞানের মতো সামাজিকভাবে নির্মিত। পবিত্র কোরআন কী বলে বা না বলে তা নির্ভর করে 'কে' এটি পাঠ করছেন, কোন 'পদ্ধতি' এবং কোন পরিপ্রেক্ষিতে' পাঠ করছেন—এসব বিষয়ের ওপর। আসমা বারলাস বলেন, পবিত্র কোরআন-পাঠ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে করেছেন পুরুষেরা, এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য। এই পাঠ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঘটেছে পিতৃতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিতে, এটিও ঐতিহাসিকভাবে সত্য। এই পূর্বানুমানের ভিত্তিতে তার বক্তব্য পবিত্র কোরআন আসলে নারীদের তুলনায় পুরুষদের অগ্রাধিকার দেয় না। প্রথমত, আল্লাহ এক এবং অভিন্ন, সার্বভৌমত্ব অভিন্ন। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ। তিনি কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন না। (সুতরাং, আল্লাহ পিতৃতন্ত্রের মতো ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন না, যা নারীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করে)। এবং তৃতীয়ত, আল্লাহ সৃষ্ট-কিছুর মতো না। তিনি লিঙ্গীয় পরিচিতির ঊর্ধ্বে (সুতরাং, আল্লাহ 'পুরুষ' হিসেবে সম্বোধন করা একটি ভাষাগত দুর্বলতা, এটি কোনোভাবেই সঠিক নয়)। যে ইসলামি নারী-পণ্ডিতরা কেরানীয় হারমেনিউটিক্সের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন, তাঁদের অনেকে পশ্চিমা বা 'নারীবাদী'দের মতো কেন মনে করেন না। যে ধর্ম নিপীড়নমূলক ধর্মে বিশ্বাস নারী মুক্ত নন, মুক্ত হতে পারেন না ইত্যাদি।

**হারাকিরি** ১৮৬৮ সালের আগে জাপানে সম্রাটের প্রতি অবাধ্যতার জন্য হারাকিরি বাধ্যতামূলক ছিল। শাসনকর্তা অপরাধীর হাতে একটি মণিমুক্তাখচিত ছোরা ধরিয়ে দিত। অপরাধী তা দিয়ে নিজের পেট ফেড়ে ফেলত। শাসনকর্তার সহকারী তলোয়ার দিয়ে অপরাধীর শিরশ্ছেদ করত এবং ছোরাটি সম্রাটের কাছে ফেরত পাঠানো হতো। জাতীয় দুর্দিনে বা কোনো নীতির প্রতিবাদে বা অসহ্য জীবনের ইতি টানতে কেউ কেউ হারাকিরির সম্মানজনক আত্মহত্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে।

**হারিতি** অশুভ যক্ষী, যে শিশুদের খেয়ে ফেলত। বুদ্ধের হাতে ধর্মান্তরণ ঘটে। দেবযোনি যক্ষরা কুবেরের অনুচর এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মুখ বিকৃতাকার ও পিঙ্গলাক্ষ। তারা ভালো হতে পারে, আবার মন্দও হতে পারে। তারা জানে, কোথায় গুপ্তধন রক্ষিত আছে। মানবীদের প্রজননে তারা সাহায্য করে থাকে। পূর্বজন্মে হারিতি এক রাখালের স্ত্রী ছিল। তার নাম ছিল অভিরাতি এবং সে রাজগৃহে বাস করত। যখন সে অন্তঃসত্ত্বা ছিল তখন এক উৎসবে তাকে নাচতে হয়। নাচের ফলে তার গর্ভপাত হলে সে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। পরের জীবনে সে রাক্ষসী হতে চায়, যেন সে নগরের সব শিশুকে খেয়ে ফেলতে পারে। যক্ষী হিসেবে জন্ম লাভ করে যক্ষ রাজা পঞ্চিকার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তাদের ৫০০ পুত্র জন্মে। শিশু-মাংসের জন্য ক্ষুধার্থ হলে সে নগরে গিয়ে শিশু চুরি করতে লাগল। এই জন্য তার নাম হারিতি। ভীতসন্ত্রস্ত নাগরিকেরা বুদ্ধের শরণাপন্ন হয়। বুদ্ধ হারিতি গুহায় গিয়ে তাকে দেখতে না পেয়ে ৫০০ শিশুর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ প্রিয়ঙ্করকে নিয়ে এসে তার ভিক্ষার ঝুলিতে লুকিয়ে রাখে। গুহায় ফিরে এসে হারিতি অস্থির হয়ে পড়ে। একজনের পরামর্শে সে বুদ্ধের কাছে যায়। বুদ্ধ তাঁকে বললেন, 'তুমি এত মন খারাপ করছ কেন। তোমার এত ছেলে আছে,

শুধু একটা হারিয়েছে। তুমি মানুষদের চিন্তা করো, যাদের একটা বা দুটো ছেলে তুমি খেয়ে ফেলেছ। এক শর্তে তোমার ছেলেকে ফিরিয়ে দেব যদি এই ছেলে খাওয়া বন্ধ করো।' হারিতি শুধু কথাই দিল না, সব শিশুকে রক্ষা করার ভার সে নিল। তার ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার পর সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা এখন কী খেয়ে বেঁচে থাকব।' বুদ্ধ বললেন, 'আমি ভিক্ষুদের বলে দেব তারা তোমাকে ও তোমার ছেলেদের প্রতিদিন যেন খেতে দেয়।' হারিতি-কাহিনির মূল সংস্কৃত পাঠ হারিয়ে গেছে, এখন কেবল তিব্বতি ও চীনা অনুবাদে বেঁচে আছে। হুয়ান সাং ওই সিং থেকে জানা যায় প্রত্যেক বৌদ্ধ মঠে হারিতির পূজা হতো। ভারত থেকে লোল, তিব্বত, চীন, মধ্য-এশিয়া, জাভা ও জাপানে হারিতির পূজা প্রবর্তিত হয়।

**হারুত ও মারুত** দুজন ফেরেশতা। কথিত আছে, পৃথিবীতে বাস করলে মানুষের মতো পাপাচার করবে না বলে ফেরেশতারা দাবি করলে আল্লাহ ফেরেশতাদের পরীক্ষার জন্য তাঁদের প্রতিনিধিরূপে হারুত ও মারুতকে পৃথিবীতে পাঠান। কিন্তু এক সুন্দরী স্ত্রীলোকের আকর্ষণে তাঁরা পাপে লিপ্ত হন। ফেরেশতারা এতে লজ্জিত হন এবং আল্লাহ পরকালের পরিবর্তে ইহকালেই হারুত ও মারুতের জন্য শাস্তির বিধান করেন। তাই তাঁদের বাবিলে কারারুদ্ধ করে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

**হারুন (আ.)** হজরত মুসা (আ.)-এর ভাই। তিনি ৪০ বছর ধরে বনি ইসরাইলের সর্দার ছিলেন। হজরত মুসা (আ.)-এর নেতৃত্বে বনি ইসরাইলের মিসর থেকে প্যালেস্টাইনে গমনের সময় তিনি তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন।

**হাল** অবস্থা। সুফি সাধনার এই পর্যায়ে সাধক ভাববিহ্বল হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় পৌছানোর জন্য ধ্যান, জিকর, সংগীত ও সাধনার অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। সুফিদের মতে, 'হাল' আল্লাহর রহমতে প্রাপ্ত একটি মানসিক অবস্থা।

**হালকার গান** ফকিরালি গান। এই গানের প্রধান কেন্দ্র চট্টগ্রামের মাইজভান্ডার। এ ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায়, বিশেষত ময়মনসিংহে এই গানের ভক্ত অনেক। হালকার গান বিভিন্ন ধরনের হয়। এগুলো বিশেষত রূপকধর্মী, এ ছাড়া মুর্শিদি ও মারফতিও আছে।

**হালখাতা** প্রধানত ব্যবসায়ীদের একটি উৎসব। বাংলা নববর্ষের দিন ব্যবসায়ীরা নতুন হিসাব খোলেন এবং তাদের ক্রেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি বিতরণ করেন। শহর ও গ্রাম উভয় স্থানে হালখাতার প্রচলন রয়েছে।

**হালাকা** বিশেষ বিধি বা সাধারণভাবে আইনকে বোঝায়। বাইবেলের প্রাচীন কাহিনির ওপর ভিত্তি করে রচিত ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ *তালমুদ* ও তৎপরবর্তী সাহিত্যের আইনসংক্রান্ত অংশও বোঝায়। হালাকার বহুবচন হালাকোথ বলতে আইন সংকলন বোঝানো হয়।

**হালাল ও হারাম** হালাল অর্থ বিধিসংগত এবং হারাম অর্থ অবৈধ। ইসলামি পরিভাষায় যেসব কাজ পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ স্পষ্টভাবে অনুমোদন করেছে সেসব হালাল আর যেসব কাজ নিষিদ্ধ বা অবৈধ বলা হয়েছে সেসব হারাম।

**হালিমা সাদিয়া** হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর স্তন্যদায়িনী ধাত্রী মা। তিনি বনু সা'আদ গোত্রের কন্যা ছিলেন। ছয় বছর পর্যন্ত বালক মোহাম্মদ (সা.) হালিমা সাদিয়ার গৃহে অবস্থান করেন।

**হাশর** ইসলামি মতবাদ অনুসারে এমন একদিন আসবে যেদিন আল্লাহ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং উভয়ের ভেতর অবস্থিত সকল বস্তু ধ্বংস করবেন এবং মানুষকে তাঁর কর্মফল দেবেন। এই দিনই হবে হাশরের বা কেয়ামতের দিন। ফেরেশতা ইসরাফিল (আ.) শিঙায় ফুঁ দিলে প্রত্যেকটি জীবের মৃত্যু ঘটবে এবং পুনরায় ফুঁ দিলে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে শেষ পর্যন্ত যতকিছু এই জগতে এসেছে সবকিছুর পুনরুত্থান হবে এবং মহাবিচারক আল্লাহ মানুষের বিচার করবেন। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে হাশরের বিস্তারিত বিবরণ আছে।

**হাশিয়াহ** আরবি শব্দটির অর্থ পার্শ্ব। এই শব্দ দিয়ে বিশেষত পবিত্র কোরআনের পার্শ্বটীকা বোঝায়। কোনো গ্রন্থের টীকা মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করার জন্য ক্ষুদ্র অক্ষরে উভয় পাশে বা বিষয়বস্তুর নিচেও মুদ্রিত থাকে।

**হাসন রাজা** বা **হাছন রাজা** লেখাপড়া তেমন না জানলেও সহজ সরল সুরে আঞ্চলিক ভাষায় হাজার খানেক পদ বা পল্লিগীতি রচনা করে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস পেতেন। ২০৬টি গান নিয়ে হাসন রাজা (১৮৫৪-১৯২২) প্রধান গানের বই *হাছন উদাস* প্রকাশিত হয় ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর অন্যান্য বই *মৌলিক ব্যবহার* ও *হাছন বাহার*। বিভিন্ন গানে তিনি নিজেকে 'পাগলা হাছন রজা', 'উদাসী', 'দেওয়ানা' বা 'বাউলা' বলে অভিহিত করেছেন। মরমি গানের মধ্য দিয়ে তিনি জাগতিক বিষয়ের ওপর বক্তব্য রেখে লোকশিক্ষায় তাঁর অবদান রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর হিবার্ট লেকচারে *হাছন উদাস*-এর অন্তর্ভুক্ত একটি গানের উল্লেখ করেছেন। তাঁর বোন ছহিফা বিবিও ছিলেন একজন কবি; বাংলা ও উর্দু রচনায় দক্ষ। জন্মস্থান সুনামগঞ্জ।

**হাসাদ** হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা। অন্য ব্যক্তির ধন-সম্পদ বা মান-মর্যাদা বা সৌভাগ্যে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে তাঁর অমঙ্গল কামনা করা। ইসলামে এটিকে অনেক গর্হিত কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে হাসাদ পরিত্যাগ করার নির্দেশ আছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি হিংসা পোষণ করে, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়।

**হাসান (রা.)** হজরত আলী ও ফাতিমা (রা.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি তৃতীয় হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আট বছর বয়সের সময় তাঁর মাতামহ রাসুল (সা.) ইন্তেকাল করেন। তাঁর সৌন্দর্য ও নম্র-ভদ্র ব্যবহারের জন্য সবাই তাঁকে স্নেহ করতেন। তিনি ইসলাম শাস্ত্রগুলোয় পারদর্শী, সুবক্তা, ধর্মপরায়ণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। দানশীলতায় তিনি আদর্শস্থানীয় ছিলেন। বিদ্রোহীদল কর্তৃক খলিফা হজরত উসমান (রা.)-এর অবরোধকালে তাঁর গৃহে পাহারারত যুবকদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। হজরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর কুফার লোকেরা সমস্ত মুসলিম সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র খলিফা হওয়ার উদ্দেশ্যে হজরত হাসান (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হন। হজরত হাসান (রা.)-এর সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তখন তিনি খিলাফত ত্যাগ করে হজরত মুয়াবিয়ার সঙ্গে সন্ধি করেন এবং মদিনায় বাস করতে থাকেন। আট বছর পর তাঁকে বিষপানে হত্যা করা হয়।

**হাসান ইবনে সাবিত (রা.)** ৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় জন্ম। তাঁর কাব্যে তৎকালীন মরুভূমি ও বেদুইন জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাব্যধারার ব্যতিক্রম শহুরে পরিবেশ প্রতিফলিত হয়েছে। গাসসানিবংশের রাজাদের দরবারে তিনি তাঁর কাব্যজীবন শুরু করেন। মহানবীর (সা.) হিজরতের পর হাসান মদিনায় তাঁর কাছে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধবাদী কবিদের মোকাবিলায় তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ কাব্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। কথিত আছে যে বনু তামিম গোত্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক কাব্য প্রতিযোগিতায় শ্রোতারা তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে সমগ্র গোত্রই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। হজরত আবুবকর এবং ওমর (রা.)-এরও অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। হজরত ওমর (রা.)-এর মৃত্যুর ওপর রচিত তাঁর শোকগাথা বিখ্যাত। তিনি ১২৫ বছর জীবিত ছিলেন।

**হাসান বসরি** আধ্যাত্মিক জগতে তিনি অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর কাছে বহু বিদ্বান লোক শিক্ষা গ্রহণ করতেন। হাসান বসরি শিক্ষাসংক্রান্ত সমাবেশেই সর্বসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন; কারণ, অপর সময়ে তিনি প্রধানত আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন।

**হাসিদিম বা আসিদীয় সম্প্রদায়** প্রথম দিকে এরা ছিল ইহুদি ধর্মমতের অনুসারী। হিব্রু ভাষায় হাসিদিম শব্দের অর্থ হলো ধর্মপরায়ণ। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ থেকে ১৭৫ অব্দের মধ্যে এই ধর্মসম্প্রদায় গড়ে ওঠে। চতুর্থ অ্যানটাইওকাস (১৭৫-১৬৩ খ্রিষ্টপূর্ব) যখন ঘোষণা করেন যে, ইহুদিরা গ্রিক দেবতার উদ্দেশে বলিদান করতে বাধ্য হবে, তখন হাসিদিমরা তার বিরোধিতা করে। আধুনিক হাসিদিম সম্প্রদায় *তালমুদ* গ্রন্থের কঠোর যুক্তিবাদের বিরোধী। তাঁরা মেসাইয়ার আশু আগমন ও উপাসনায় বিশ্বাসী। উক্রাইনে এদের বহু অনুসারী ছিল। এখন প্রধানত নিউ ইয়র্ক ও ইসরাইলে এদের বসবাস।

**হিউগানট** ফ্রান্সের ক্যালভিনিস্ট প্রটেস্ট্যান্ট। খ্রিষ্টধর্মের একটি ধারা। ১৫৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ধর্মসভায় ফ্রান্সে প্রেসবিটারিয়ান ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হলে

এতে সদস্য হিসেবে যোগ দেন সর্বশ্রেণীর বহু মানুষ। ধর্মযুদ্ধের (১৫৬২-৯৮) পর চতুর্থ হেনরি ন্যানটস-এ রাজাজ্ঞা জারি করেন, হিউগানটদের প্রতি ধর্মীয় ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন করা হয় এবং ২০০ শহরে প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। লা রশেল ও মঁতোবা ছাড়া অন্য সব দুর্গের অধিকার থেকে হিউগানটদের বঞ্চিত করার অভিযোগে তাদের বিদ্রোহকে কার্ডিনাল রিশালিয়া বেয়ানে ক্যাথলিকবাদ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে অজুহাতস্বরূপ ব্যবহার করেন (১৬২১-২২)। অন্য এক প্রটেস্ট্যান্ট বিদ্রোহের (১৬২৫) ফলে রিশালিয়া লা রশেল দখল করে (১৬২৮) নেন। আলেস শান্তিচুক্তি (১৬২৯) অনুসারে হিউগানটরা সব ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়। চতুর্দশ লুইয়ের শাসনকালে প্রটেস্ট্যান্ট নির্যাতন চরমে পৌছলে ১৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ন্যানটস-এ প্রচারিত রাজাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। অগণিত হিউগানট ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড ও আমেরিকায় পালিয়ে যায়। এসব জায়গায় নাগরিক জীবন ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের অবদান রয়েছে। সেভেন (Cevennee)-এ প্রটেস্ট্যান্ট কামিসাররা চতুর্দশ লুইয়ের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে (১৭০২-১০)।

**হিউম্যানিজম** বিশ্বে ইউরোপীয় নবজাগরণকালে প্রাচীন গ্রিক ও রোমক শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে আগ্রহ, ওই বিষয়ে চর্চা। ধর্মীয় বা ধর্মতত্ত্বীয় চিন্তার পরিপন্থী সম্পূর্ণ মানবিক চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি পূরণে বা মানুষের ঐহিক সত্তার বিকাশে যুক্তিনির্ভর পন্থার সন্ধানে নিয়োজিত জীবনদর্শন।

**হিউয়েন সাং** (৬০৫-৬৬৪) চীনা বৌদ্ধ পণ্ডিত ও পরিব্রাজক। এটা তাঁর ধর্মীয় নাম, আসল নাম চেন ই। জন্ম চীনের হুনান-এ। ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬ বছর ভারতীয় উপমহাদেশ ভ্রমণ করেন; তক্ষশীলা ও নালন্দার বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন এবং পরিশেষে ৬৫৭টি বৌদ্ধ গ্রন্থ ও ১৫০টি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের স্মৃতিচিহ্ন সঙ্গে নিয়ে চীনে প্রত্যাবর্তন করেন (৬৪৫)। বাকি জীবন এসব গ্রন্থের অনুবাদে এবং *হিউইউচি* নামে ভ্রমণকাহিনি রচনায় অতিবাহিত করেন। এই বইটি তাৎকালীন পাশ্চাত্য দেশগুলোর একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। গ্রন্থটি *মোক্ষদেব* নামেও পরিচিত। এতে হিন্দু সভ্যতার প্রশংসনীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ। তখন হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতের রাজা। হিউয়েন সাংয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। ৬৪৩-এ হিউয়েন সাং দুটি বিরাট ভারতীয় সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন; এদের একটি কনৌজ ও অপরটি প্রয়াগে অনুষ্ঠিত হয়। মহাযানপন্থী বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও চীনা পণ্ডিতের 'অপরিমিত প্রতিভা'র পরিচয় দেওয়াই ছিল কনৌজ সম্মেলনের উদ্দেশ্য। এতে ২০ জন রাজা, হাজার হাজার বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্যবাদী ও জৈন ধর্মতত্ত্বজ্ঞ পুরোহিত উপস্থিত ছিলেন; বুদ্ধের একটি স্বর্ণমূর্তি একটি উচ্চ চূড়ায় স্থাপন করা হয়েছিল।

সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের উচ্চারণে তাঁর নাম জুয়ানজ্যাং বা হুয়ান-সাং। তিনি ভারত ও বাংলা-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ লিখে গেছেন। ৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে হেনান প্রদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই ধর্মগ্রন্থ ও চৈনিক ধ্রুপদি গ্রন্থগুলো ও প্রাচীন জ্ঞানী লোকদের লেখা পাঠে আগ্রহী হন। লুওইয়াং নগরে অবস্থানকালে হিউয়েন-সাং ১৩ বছর বয়সে বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। সুই রাজবংশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার কারণে তিনি সিচুয়ানের (জিচুয়ান) জিংদুতে চলে যান। সেখানে ২০ বছর বয়সে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থের সন্ধানে সমগ্র চীন ভ্রমণ করেন। অবশেষে তিনি তাং সম্রাট তাইজংয়ের শান্তিপূর্ণ শাসনাধীন চ্যাংগান-এ পৌছান। এখানে এসেই হিউয়েন-সাং-এর ভারত ভ্রমণের ইচ্ছা প্রবল হয়। ফা-হিয়েন-এর ভারত ভ্রমণ সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন এবং তিনিও চীনে পৌছানো বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের অসম্পূর্ণতা ও ভুল ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে চীন থেকে যাত্রা শুরু করে হিউয়েন-সাং উত্তরের বাণিজ্য পথ ধরে মধ্য-এশিয়ার কুচ হয়ে উত্তর ভারতে পৌছান। কনৌজ নগরে তিনি সম্রাট হর্ষবর্ধনের আতিথ্য লাভ

করেন। তিনি মগধের বিভিন্ন বৌদ্ধ তীর্থস্থান পরিদর্শন করেন এবং নালন্দা মঠে অধ্যয়নে সময় অতিবাহিত করেন। এরপর তিনি বাংলার বিভিন্ন অংশ (পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশ) এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করেন, তবে এবার খোটান হয়ে দক্ষিণ-পথ ধরে।

হিউয়েন-সাং ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বাংলায় আসেন। উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষে তিনি গঙ্গা অতিক্রম করে বাংলায় প্রবেশ করেন এবং পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে 'পুন-ন-ফ-তান-না' রাজ্য অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্ধনে পৌছান।

রাজা ভাস্করবর্মণের আমন্ত্রণে তিনি পুণ্ড্রবর্ধন থেকে পূর্ব দিকে ১০০ লি (লি: চীনে প্রচলিত দূরত্বের একক—এক মাইলের আট ভাগের তিন ভাগ) অথবা এর কাছাকাছি দূরত্বে একটি বড় নদী অতিক্রম করে কিয়া-মো-লু-পো অর্থাৎ কামরূপ দেশে পৌছান। এখান থেকে দক্ষিণে ১২০০ অথবা ১৩০০ লি ভ্রমণ শেষে তিনি 'সান-মো-তা-চা' (সমতট) দেশে পৌছান। তাঁর বর্ণনামতে, এ সমৃদ্ধ দেশটির পরিসীমা ৩০০০ লি এবং এটি সাগরতটে অবস্থিত। রাজধানীর পরিসীমা ২০ লি। এখানে জমি নিয়মিত চাষাবাদ করা হয় এবং পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদিত হয়। এর আবহাওয়া নমনীয়, অধিবাসীদের আচরণ অমায়িক। ...এখানে রয়েছে ৩০টির মতো সংঘারাম এবং এগুলোতে পুরোহিতের সংখ্যা প্রায় ২০০০। তারা সবাই স্থবির সম্প্রদায়ভুক্ত। এখানে প্রায় ১০০টির মতো দেবমন্দির রয়েছে। সমতট থেকে প্রায় ৯০০ লি পশ্চিমে 'তান-মো-লি-তি' (তাম্রলিপ্তি) দেশ। তার বর্ণনামতে, সমুদ্র-তীরবর্তী এ দেশটির পরিসীমা ১৪০০ অথবা ১৫০০ লি এবং রাজধানীর পরিসীমা ১০ লি। নিম্নভূমির এ দেশটির ভূমি উর্বর, তাপমাত্রা বেশ উষ্ণ। মানুষগুলো চটপটে পরিশ্রমী ও সাহসী। হিউয়েন-সাং বৌদ্ধ এবং অ-বৌদ্ধদের এখানে পাশাপাশি বাস করতে দেখেছেন। এখানে প্রায় ১০টি সংঘারাম এবং প্রায় ১০০০ পুরোহিত ছিলেন। হিন্দুমন্দিরের সংখ্যা ছিল ৫০। এখানে প্রচুর পরিমাণ মূল্যবান সামগ্রী ও রত্ন পাওয়া যায়।

তাম্রলিপ্তি থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৭০০ লি ভ্রমণ করে হিউয়েন-সাং 'কি-লো-নু-ফা-লা-না' কর্ণসুবর্ণ দেশে পৌছান। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী দেশটির পরিসীমা প্রায় ১৪০০ অথবা ১৫০০ লি এবং রাজধানীর পরিসীমা প্রায় ২০ লি। দেশটি ঘনবসতিপূর্ণ, অধিবাসীরা ধনী এবং তাঁরা আরামের জীবন যাপন করেন। এ নিম্নভূমির মাটি দোআঁশ। নিয়মিত জমি চাষ হয় এবং নানা ধরনের ফসল ফলে। এখানকার আবহাওয়া নমনীয় এবং অধিবাসীরা সৎ ও অমায়িক। জ্ঞানচর্চায় তারা গভীরভাবে আসক্ত। এখানে বিশ্বাসী ও বিধর্মী বৌদ্ধ ও অ-বৌদ্ধ দুই ধরনের মানুষই রয়েছে; তবে বিধর্মীদের সংখ্যাই বেশি। এখানে রয়েছে প্রায় ১০টি সংঘারাম এবং প্রায় ২ হাজার পুরোহিত। এখানে হিন্দুমন্দির রয়েছে ৫০টি।

৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে হিউয়েন-সাং চীনে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। তাইজং তাঁকে বিভিন্ন উচ্চ পদে যোগদানের প্রস্তাব দিলে তিনি রাজি হননি। ৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বৌদ্ধ রচনার অনুবাদে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন।

**হিজজাতুল-ওয়াদা, বিদায় হজ** হিজরির দশম বর্ষে হজরত রাসুল (সা.)-এর জীবনব্যাপী সাধনা ও ইসলাম প্রচারের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে যায়। আরবদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু প্রতিনিধিদল মদিনায় এসে তাঁর কাছে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা করে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যান এবং সেখানকার সমস্ত লোককে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেন। এ বছরের শেষ দিকে হজ পালন করার জন্য রাসুল করিম (সা.) মক্কা যাত্রা করেন। লক্ষাধিক সাহাবিও তাঁর সঙ্গে যাত্রা করেন। হজপালন উপলক্ষে জিলহজ মাসের ৯ তারিখে আরাফাত প্রান্তরে অবস্থানকালে বিশাল জনসমুদ্রের সম্মুখে তিনি যে খুতবা দান করেন, ইসলামের ইতিহাসে তা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই মহামূল্য ভাষণটিকে ইসলামের সার এবং তাঁর অন্তিম উপদেশ ও বিদায়বাণী বলা চলে। এটাই তাঁর শেষ হজ এবং এখান থেকে মদিনায় ফিরে যাওয়ার অল্পকাল পরই তিনি ইহজীবন ত্যাগ করে অনন্তের পথে

যাত্রা করেন। এ জন্যই এই হজ বিদায় হজ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তিনি বলেন, 'মূর্তিপূজা যেন তোমাদের মধ্যে আর ফিরে না আসে। শিরক কোরো না, চুরি কোরো না, মিথ্যা বোলো না, ব্যভিচার কোরো না। আজ থেকে সুদ গ্রহণ রহিত হলো, ঋণদানকারী কেবল ঋণের মূলধন ফেরত পাবে। কারও ওপর জুলুম করা চলবে না। গচ্ছিত ধন অবশ্যই তার মালিককে ফিরিয়ে দেবে। জাহিলিয়া যুগের শোণিত প্রতিশোধ প্রথা রহিত হলো। বুঝে দেখো, জেনে রাখো, সব মুসলমান ভাই ভাই। আল্লাহর চোখে সকলেই সমান। কেউ কারো ওপর অবিচার কোরো না। তোমাদের জীবন ও ধনসম্পদ পরস্পরের কাছে তেমনি পবিত্র, যেমন পবিত্র আজকের এই দিন, যেমন পবিত্র এই মাস, যেমন পবিত্র এই শহর। নারী জাতির প্রতি তোমরা সদ্ব্যবহার করবে। নারীর ওপর পুরুষের যেমন অধিকার, পুরুষের ওপর নারীরও তেমনি অধিকার। মনে রেখো, আল্লাহকে সাক্ষী করে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের গ্রহণ করেছ। দাস-দাসীর প্রতি তোমরা সর্বদা সদয় ব্যবহার কোরো। তাদের ওপর কোনোরূপ জুলুম কোরো না। তোমরা যেমন খাবে তাদেরও তা খাওয়াবে। আজ থেকে কৌলীন্য প্রথা রহিত হলো। কেবল সৎকার্য দ্বারাই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে। যে নিজে পরিচয় দেবে, তার ওপর জুলুম করা আল্লাহর অভিশাপ। হে মানবমণ্ডলী, আমার কথা হৃদয়ঙ্গম করো। আমি তোমাদের কাছে যা রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরো, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। এর একটি আল্লাহর কিতাব, অন্যটি তাঁর নবীর সুন্নত। যারা উপস্থিত আছ তারা আমার এসব বাণী অনুপস্থিত সব মুসলিমের কাছে পৌছে দিয়ো। হয়তো অনুপস্থিতদের কতক লোক এর দ্বারা বেশি উপকৃত হবে।' ভাষণ শেষ করে রাসুল (সা.) আকাশের দিকে মুখ তুলে ভাবে বিভোর হয়ে আবেগের সঙ্গে বললেন, 'হে আল্লাহ, আমি কি তোমার বাণী যথাযথভাবে পৌছাতে পেরেছি? হে প্রভু, আমি কি আমার কর্তব্য সুসম্পন্ন করতে পেরেছি?' তখন শ্রোতাদের লাখো কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'হে আল্লাহ, শ্রবণ করো, হে প্রভু, সাক্ষী থাকো।' তারপর কিছুক্ষণ অবনত মস্তকে মৌন থেকে করুণ স্বরে বললেন, 'বিদায়।' আরাফাত ময়দানের এই বিদায়ভাষণ দেবার সময়ই পবিত্র কোরআন মজিদের এই সর্বশেষ বাণীটি নাজিল হয়, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন সম্পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই দীন মনোনীত করলাম।' এর পর রাসুলুল্লাহ (সা.) সূর্যাস্তের পর আরাফাত ত্যাগ করে মুজদালিফায় গিয়ে রাত্রিযাপন করেন এবং মাগরিব ও এশার নামাজ একসঙ্গে সম্পন্ন করেন। পরদিন প্রাতে মিনায় পৌছে সেখানে তিনি তিন দিন অবস্থান করেন। মিনায় অবস্থানকালে আকাবা উপত্যকায় তিন স্থানে কঙ্কর নিক্ষেপ, পশু কোরবানি, মস্তক মুণ্ডনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে মক্কায় ফিরে এসে কাবা ঘরের তওয়াফে জিয়ারত ও সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সায়ি করেন। এই রূপে হজের ক্রিয়াদি শেষ করে মক্কায় তিন দিন অবস্থানের পর তিনি মদিনায় ফিরে যান। সেই থেকে প্রতিবছর হজের সময় মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজের যাবতীয় ক্রিয়া-পদ্ধতি আদর্শরূপে প্রতিপালিত হয়ে আসছে।

**হিজব** একাধিক অর্থ আছে। (১) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ কার্যকারিতার জন্য নামাজ পড়া। হিজবুল বাহার (সমুদ্র প্রার্থনা) এমনি এক নামাজ। সুফি সংগীতে পাওয়া যায়। নাবিকেরা এই নীতি মেনে চলে বেশি এবং ইবনে বতুতা এই নিয়মেই তাঁর 'রিহলা' শুরু করেছিলেন। (২) এই শব্দটি দিয়ে পবিত্র কোরআনের ষাটতম অংশকেও বোঝানো হয়।

**হিজরত** মক্কার কুরাইশদের অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠলে হজরত মোহাম্মদ (সা.) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মক্কা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। কুরাইশরা এমন হিংস্র হয়ে ওঠে যে তারা হজরত মোহাম্মদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের কিছুসংখ্যক আবিসিনিয়া ও কিছুসংখ্যক মদিনায় (তৎকালীন নাম ইয়াসরিব) পাঠিয়ে দেন। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের জুন

মাসের এক রাতে তাঁর সাহাবি হজরত আবুবকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে তিনি গোপনে মদিনা অভিমুখে রওনা হন। মদিনাবাসীরা হজরত (সা.)-কে ও তাঁর অনুসারীদের সাদরে গ্রহণ করেন। মক্কা থেকে মদিনায় হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর এই প্রস্থানকে বলা হয় হিজরত। হিজরতের পর ইসলাম দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে মদিনাতেই ইসলামের গোড়াপত্তন হয়। কথিত আছে যে ৮ রবিউল আউয়াল (২০ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রি.) সোমবার হজরত মোহাম্মদ (সা.) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে মদিনায় উপস্থিত হন। অন্য মতে, ২ বা ১২ রবিউল আউয়াল তাঁরা মদিনায় পৌছান। হিজরতের বর্ষের ১ মহররম (১৬ জুলাই ৬২২) থেকে হিজরি সন গণনা শুরু হয়। হজরত ওমর (রা.) তাঁর খিলাফতের আমলে এ সাল প্রবর্তন করেন।

**হিজাব** পর্দা বা অবগুণ্ঠন। নরনারীর সম্পর্কের পবিত্রতা ও শালীনতা রক্ষার জন্য ইসলামে অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ হয়েছে। অন্য কারও গৃহে বিনানুমতিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। গৃহের বাইরে বা পথে যাতায়াতকালে পুরুষ ও নারী উভয়কেই দৃষ্টি আনত রাখতে ও গোপনাঙ্গ হেফাজত করতে আদেশ করা হয়েছে। অধিকন্তু নারীদের তাদের অলংকারাদি ও রূপসজ্জা নিকটাত্মীয় ছাড়া অন্যের কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এ জন্য মাথা ও বুক আবৃত করে চাদর ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। তবে শরীরের যে অংশ স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায়, যেমন—মুখমণ্ডল, হাত ও পায়ের পাতা খোলা রাখা দোষের নয়। হজরত রাসুল (সা.) স্ত্রীলোকদের কাছ থেকেও কোনো জিনিস চাইতে হলে মুসলমানদের পর্দার আড়াল থেকে চাইবার উপদেশ দিয়েছেন।

**হিতবাদ বা উপযোগবাদ** (Utilitarianism) সর্বাধিক-সংখ্যক লোকের জন্য সর্বাধিক পরিমাণে কল্যাণসাধনই নৈতিকতার মাপকাঠি। জেরেমি বেনথাম এই মতবাদ উদ্ভাবন করেন এবং জন স্টুয়ার্ট মিল ও হারবার্ট স্পেনসার এর উন্নতি সাধন করেন। জি ই মুর তাঁর *এথিকস* নামক গ্রন্থে (১৯১২) হিতবাদ সম্পর্কে একটি বিশেষ মতবাদ প্রকাশ করেন। এতে তিনি আনন্দের সঙ্গে মঙ্গলকে সমীকরণের নীতি পরিত্যাগ করেন।

**হিতোপদেশ** ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলার প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সংস্কৃত *পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ* অনুবাদ করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যতম পণ্ডিত গোলকনাথ শর্মার অনুবাদেও *হিতোপদেশ* (১৮০২ খ্রি.) প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাসৌকর্যে ও প্রকাশলালিত্যে মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদটিই অধিকতর চিত্তাকর্ষক।

**হিত্তিনের যুদ্ধ** জেরুজালেমরাজ লুজিনিয়াঁর গাই (Guy of Lusignan) ও সালাহউদ্দিনের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩/৪ জুলাই এ যুদ্ধ হয়। ১ জুলাই টাইবিয়ারিয়াস বিজয় শেষ করার দুই দিন পর খ্রিষ্টান-শক্তিকে তিনি পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। জেরুজালেমরাজও তাঁর সঙ্গী শাটিইওয়ের রেজিন্যাল্ডকে বন্দী করেন। মহানুভব সালাহউদ্দিন ভগ্নহৃদয় লুজিনিয়াঁর গাইকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করেন এবং পরের বছর মুক্ত করে দেন; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক রেজিন্যাল্ডকে তিনি ক্ষমা করেননি। রেজিন্যাল্ড সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে একাধিকবার শান্তিপূর্ণ কাফেলার ওপর আক্রমণ চালান এবং তাঁর আবাসস্থলের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করেন। সালাহউদ্দিন স্বহস্তে এই ব্যক্তিকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করেন এবং এবার তা পূরণ করেন। অতিথির প্রতি আরবদের বৈরীসুলভ ব্যবহার না করার ঐতিহ্যের সুযোগ গ্রহণ করে বন্দী অবস্থায় শিবিরে থাকাকালে রেজিন্যাল্ড পান করার জন্য এক পাত্র পানি চান, কিন্তু সে পানি অন্য লোকে দেন বলে সালাহউদ্দিনের সঙ্গে তাঁর মেহমান-মেজবান সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হিত্তিনের যুদ্ধ জয়ের ফলে সিরিয়াসহ প্যালেস্টাইনের প্রায় গোটা খ্রিষ্টান এলাকা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়।

**হিদায়েত** আল্লাহর পথপ্রদর্শন। আল্লাহ সব দেখতে, শুনতে ও বুঝতে পারেন এবং আমাদের সবকিছু তাঁর সচেতনতার মধ্যেই ঘটে। তিনি তাঁকেই পথপ্রদর্শন করেন, যার প্রতি তিনি তুষ্ট (২ : ১৪২, ৪ : ১৭৫; ৫ : ১৮; ৬ : ৩৯; ১০ : ২৫; ২২ : ৫৪;

২৪ : ৪৬) আর যাকে ইচ্ছা তাঁকে পথভ্রষ্ট হতে দেন (৭ : ১৫৫; ১৩ : ২৭; ১৪ : ৪; ১৬ : ৯৩; ৩৫ : ৮; ৭৪ : ৩১)। তিনি অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না (২ : ২৫৮; ৩ : ৮৬; ৫ : ৫৪; ৬ : ১৪৪; ৯ : ১৯,১০ : ৯; ২৮ : ৫০; ৪৬ : ১০; ৬১ : ৭; ৬২ : ৫) অথবা যাঁরা কাফির বা অবিশ্বাসী (২ : ২৬৪; ৫ : ৭০; ৯ : ৩৭; ১৬ : ১০৭) আর যারা পাপে উদ্বুদ্ধ করে সেই কাউমুল ফাসিকিনকে (৫ : ১১১; ৯ : ২৮,৮০; ৬১ : ৫; ৬৩ : ৬)। তাঁর প্রদর্শিত পথই একমাত্র সৎপথ, যে ওই পথ ধরে সে পথভ্রষ্ট হয় না। ইচ্ছা করলে তিনি সবাইকে জোর করে পথ দেখাতে পারতেন, কিন্তু তিনি বল প্রয়োগ করেন না। সত্য এসেছে তাঁর কাছ থেকে, যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক (১৮ : ২৯)।

**হিন্দু আইন** হিন্দুদের বিশ্বাস ও জীবনযাপন-প্রণালিকে নিয়ন্ত্রণ করে, এমন কতিপয় বিধিবিধান, প্রথা ও আচরণবিধির সমাহার। হিন্দু আইন দুটি ধারায় বিভক্ত: দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা। দায়ভাগের রচয়িতা বাঙালি স্মৃতিকার জীমূতবাহন। প্রধানত *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি* অনুসারে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও উত্তরাধিকারক্রম বিষয় অবলম্বনে দায়ভাগ রচিত। এর রচনাকাল আনু. খ্রিষ্টীয় একাদশ থেকে দ্বাদশ শতকে। অন্যদিকে মিতাক্ষরা (আনু. একাদশ শতক) হচ্ছে *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির* বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এটি রচনা করেন বিজ্ঞানেশ্বর। উত্তরাধিকার ও উত্তরাধিকারক্রম নির্ধারণে দায়ভাগ বঙ্গে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। দত্তক সম্পর্কে কুবেরের *দত্তকচন্দ্রিকা* (আনু. ষোড়শ শতক) ছিল শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃত রচনাবলিতে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাতে মনে হয়, বাংলায় হিন্দু আইন খুব ব্যাপক ও জটিল আকারে বিকশিত হয়। বাংলায় ব্রিটিশ শাসকর কর্তৃক সম্পত্তি বণ্টন, উত্তরাধিকার ও উত্তরাধিকারক্রম নির্ণয় ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে দেওয়ানি আইনগুলো প্রযুক্ত হতো সম্ভবত ভারতের অন্যান্য অংশে ব্যবহৃত সাধারণ নিয়মানুযায়ী। বাংলায় এই সাধারণ দেওয়ানি আইনগুলো ব্রিটিশদের উদ্যোগে দুটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে: একটি *বিবাদার্ণবসেতু*, অন্যটি *বিবাদভঙ্গার্ণব*। প্রথমটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন হ্যালহেড ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়টি অনুবাদ করেন কোলব্রুক ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে। এরপর আনুষ্ঠানিক বিচারপদ্ধতির প্রয়োজনে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রণীত হয় দেওয়ানি কার্যবিধি।

১৯৪৭ সালের পর ভারতে হিন্দু আইনের পরিবর্তন ঘটে। ১৯৫৫ সালে ভারতে আমূল পরিবর্তিত নতুন বিবাহ আইন প্রচলিত হয়। বহুপত্নীর বিধান বিলুপ্ত হয়। বিবাহবিচ্ছেদ পদ্ধতিরও প্রবর্তন করা হয়। ১৯৫৬ সালে অপর একটি ধারাবলে দায়ভাগ বা মিতাক্ষরা নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারক্রম পরিবর্তিত হয়। পিতা বা মাতার মৃত্যুর পর সম্পত্তিতে পুত্র-কন্যা উভয়ের সমান অংশ এবং স্ত্রী বা স্বামীর এক-তৃতীয়াংশ পাওনা স্বীকৃত হয়। দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা উভয় ধারার চর্চা পরিবর্তিত হয় এবং ভারতের সব হিন্দুর জন্য একই আইন কার্যকর হয়। পাকিস্তানে সেই পুরোনো হিন্দু আইন বলবৎ থাকে। বাংলাদেশে দায়ভাগ পদ্ধতি কার্যকর রয়েছে।

**হিন্দু কলেজ** রাজা রামমোহন রায় এবং ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে এ দেশের মানুষকে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানই ছিল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য। উনবিংশ শতকে বাংলাদেশের পাশ্চাত্য প্রভাব যে নবজাগরণের সূত্রপাত, তার পেছনে হিন্দু কলেজের বড় অবদান ছিল। ডিরোজিও এবং রিচার্ডসন শিক্ষার্থীদের মনে যেভাবে বিপ্লবের বীজ বপন করে দেন, তার ফলেই এই কলেজ থেকে 'ইয়ং বেঙ্গল' দল আবির্ভূত হয়। ডিরোজিও শিক্ষার্থীদের ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি—সব বিষয়েরই দোষ-গুণ বিচার করে নিজেদের কর্মপন্থা নির্ণয় করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক রিচার্ডসনের শিক্ষার মূল কথা ছিল, আত্মশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। ১৮৮৫ সালের ১৫

এপ্রিল কলেজটি বন্ধ করে দিয়ে সেই বছরের ১৫ জুন 'প্রেসিডেন্সি কলেজ' নামে তা পুনরায় চালু করা হয়।

**হিন্দুদর্শন** হিন্দুদর্শন ছয় ভাগে বিভক্ত। কপিলকৃত সাংখ্য, পাতঞ্জলিকৃত যোগ, কণাদকৃত বৈশেষিক, গৌতমকৃত ন্যায়, জৈমিনীকৃত পূর্ব-মীমাংসা বা মীমাংসা ও বেদব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত।

**হিন্দুধর্ম** হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম। বহু প্রাচীন ধর্ম। প্রকৃতি ও অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া হিন্দুরা পাপমোচনের জন্য তীর্থযাত্রা ও গঙ্গাস্নানও করে থাকে। এই ধর্ম অনেক বিবর্তনের ভেতর দিয়ে আজকের রূপ লাভ করেছে। এই ধর্মে নির্দিষ্ট কোনো ঐশীগ্রন্থ না থাকলেও বেদ ও গীতায় হিন্দুধর্মের বিস্তারিত আলোচনা আছে। বেদব্যাস চারটি বেদ সংকলন করেন। উপনিষদ আধুনিক হিন্দুদর্শনের মূলসূত্র। উপনিষদে পরমাত্মার কথা বলা হয়েছে; পার্থিব সন্ধান মায়া, মায়ামুক্তি বা মোহমুক্তি অনেক প্রাচীন হলেও কালক্রমে এর উল্লেখযোগ্য সংস্কার হয়। তার মধ্যে বর্ণাশ্রম প্রথা ও ব্রাহ্মণদের প্রভাব ক্ষুণ্ন করা এবং সতীদাহ প্রথার বিলোপ উল্লেখযোগ্য।

**হিন্দুদের সাকার ও নিরাকার উপাসনা** উপনিষদে বর্ণিত নিরাকার ব্রহ্ম সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখিত ধারণার পরিবর্তন ঘটে এবং বর্তমানে হিন্দুরা নিরাকার ব্রহ্মের বিভিন্ন ক্ষমতাকে সাকার কল্পনায় দেবতা হিসেবে পূজা করছে। এসব দেবতার প্রতি রয়েছে তাদের প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা। নিরাকার ঈশ্বরের চেয়ে সাকার ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্পণ অনেক সহজ। নিরাকার ঈশ্বর সম্পর্কে উপনিষদীয় মতবাদের সঙ্গে বিভিন্ন দেবতার প্রতি ভক্তিপূর্ণ পূজার্চনার মিশ্রণ একটি নতুন ধর্মীয় চেতনার জন্ম দেয়, যা ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। বাকাটক (দ্বিতীয়-চতুর্থ খ্রি.), পল্লব (চতুর্থ-ষষ্ঠ খ্রি.), ভগদত্ত (কামরূপ : সপ্তম-অষ্টম খ্রি.) এবং অন্যান্য রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈদিক ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। তৎকালীন বিভিন্ন শিলালিপিতে বৈদিক আচার-আচরণ ও যজ্ঞগুলোর উল্লেখ রয়েছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে মূল বৈদিক ধর্মের সুষ্ঠু সমন্বয়। এর প্রকাশ দেখা যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—পরমেশ্বরের এই ত্রিমূর্তি কল্পনায়। ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা, যাঁর মধ্যে ঔপনিবেশিক ব্রহ্মের অনেকটা প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি কখনোই শিব বা বিষ্ণুর মতো প্রাধান্য পাননি। বিভিন্ন সম্প্রদায় ত্রিমূর্তিকে স্বীয় সম্প্রদায়ের ঈশ্বরের তিনটি প্রতিরূপ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

হিন্দুসমাজকে দুটি মূল ধারায় ভাগ করা যায় : ক. সাম্প্রদায়িক ধারা, যারা নিজ সম্প্রদায়ের দেব-দেবী, যেমন বিষ্ণু, শিব, কালী প্রভৃতি ব্যতীত আর কাউকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে না এবং খ. সাধারণ ধারা, যারা মূল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী এবং প্রায় প্রতিটি দেব-দেবীরই পূজার্চনা করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেবতাবিশেষের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেও তারা প্রধান প্রধান বৈদিক আচার-আচরণ পালন করে থাকে। এভাবেই স্মার্তরা বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সূর্য ও গণেশ—এই পঞ্চদেবতার নিয়মিত পূজার সুপারিশ করেন। একই সঙ্গে সর্বদেবতায় বিশ্বাসী হিন্দুরাও স্বাধীনভাবে বিভিন্ন দেবতার পূজা করতে পারেন। সমুচ্চয়বাদ অনুযায়ী একজন হিন্দুর জন্য ব্রহ্মোপাসনার পাশাপাশি সংসারধর্ম পালনও অবশ্যকরণীয় এবং সে জন্য কর্মমীমাংসা এবং বেদান্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। উপবীত ধারণ, গায়ত্রী মন্ত্র জপ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য আচার-আচরণ ও মূল নীতির সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষ্ণু ও শিবের অভিন্নতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায় স্কন্দ উপনিষদে। শিব-পার্বতীর অর্ধনারীশ্বর মূর্তির মতো হরি-হর মূর্তি এ মতবাদেরই বহিঃপ্রকাশ। এমন কিছুসংখ্যক সমর্থক আছে যারা নিজেদের উপাস্য দেবতা ভিন্ন অন্য কোনো দেবতাকে পূজা করে না।

**হিব্রন** জেরুজালেমের উত্তর-পশ্চিমে জর্দান রাজ্যের নগর। আধুনিক আরবি নাম আল-খলিল। মুসলমান ও ইহুদিদের কাছে পবিত্র স্থান। বাইবেলে উল্লেখ আছে, এখানে ইবরাহিম (আ.) তাঁর পারিবারিক কবরস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। ম্যাকাবিয়ান, রোমান ও ক্রুসেড নামক প্যালেস্টাইনীয় যুদ্ধে হিব্রন বিশেষ ভূমিকা রাখে।

**হিব্রু** ইহুদি জাতি ও ইহুদি ধর্ম দ্র.।

**হিব্রুজ** ধর্মের প্রতি আহ্বান। খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্বের ইতিহাসে এর শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হিব্রুজ শব্দের মাধ্যমে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের পত্রকেও বোঝায়। প্রচলিত উপকথায় এগুলোকে সেন্ট পলের পত্র বলা হয়েছে। পুরোনো ধর্মের ওপর নতুন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর জন্য এই বই রচিত। এবং এতে ফেরেশতারা এবং হজরত মুসা (আ.)-এর ওপর হজরত ঈসা (আ.)-এর প্রভুত্ব ঘোষণা করা হয়।

**হিরো** আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন সুন্দরী নারী। ভেনাসের যাজিকা। অ্যাবিডোসের লিয়ান্ডা তাঁর প্রেমে পড়েন। হিরোকে একনজর দেখতে তিনি প্রতিরাতে প্রাচীন হেলেসপন্ট সমুদ্রে সাঁতার কাটতেন। কিন্তু একসময় তিনি দুর্ভাগ্যবশত ডুবে মারা যান। হতাশায় নিমজ্জিত হিরোর সেই দুঃখে সমুদ্রে সলিলসমাধি ঘটে।

**হিলফুল ফুজুল** প্রাক-ইসলামি যুগে আরববাসীদের শান্তিচুক্তি। এই চুক্তি সম্পাদনে কিশোর মহানবী (সা.) বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তিনি যুবকদের শান্তি রক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী করে তোলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকার কারণে দিন দিন নিজেরাই দুর্দশাগ্রস্ত হচ্ছেন, এমন উপলব্ধি করে আরবরা জুবাইর ইবনে আবদ আল-মুত্তালিবের প্রস্তাবে হিলফুল ফুজুল নামক চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হন।

**হিলা, শরিয়া বা হালালা** ধর্মত কোনো বস্তুকে সিদ্ধ করে নেওয়া। প্রাক-ইসলামি যুগে নিয়ম ছিল, পরিত্যক্তা স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে হলে তাকে অন্যত্র শর্তসাপেক্ষ বিয়ে দিতে হবে। ইসলামে হালালা অর্থে নতুন স্বামীর সঙ্গে শর্তবিহীন বিয়ে ও সেই স্বামী কর্তৃক স্বেচ্ছায় তালাকের পর পূর্ব স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রী পুনরায় গ্রহণ করাকে বোঝায়।

**হুতামা** পবিত্র কোরআন-বর্ণিত প্রজ্বলিত হুতাশন। পবিত্র কোরআনের ১০৪ সুরা হুমাজার ১-৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে ও পেছনে লোকের নিন্দা করে, যে অর্থ জমায় ও বারবার তা গোনে, ভাবে যে তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কখনো না। তাকে তো ফেলা হবে হুতামায়। হুতামা কী, তুমি কি তা জানো? এ আল্লাহরই প্রজ্বলিত হুতাশন যা হৃৎপিণ্ডগুলোকে গ্রাস করবে, ওদের বেঁধে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভে।'

**হুদমানাচ** রংপুরের রাজবংশী কৃষকরমণীদের মধ্যে প্রচলিত একধরনের নৃত্যশৈলী। 'হুদুমা দেও'-এর পূজা উপলক্ষে এই নাচের আয়োজন করা হয়।

**হুদাইবিয়ার সন্ধি** মক্কার বাইরে হুদাইবিয়ায় হজরত মোহাম্মদ (সা.) শিবির স্থাপন করেন এবং কোরবানির জন্য প্রস্তুতি নেন। খালিদ ইবনে আল-ওয়ালিদ তাঁকে বাধা দেন। পরে দুই পক্ষের মধ্যে এক যুদ্ধবিরতি সম্পাদিত হয়। হিজরতের পর মক্কা ও মদিনার মধ্যে এটি প্রথম শান্তিপ্রিয় যোগাযোগ। পবিত্র কোরআনের সুরা ফাতহ-এর ১ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তোমার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় অবধারিত করেছেন।' পবিত্র কোরআনের সুরা ফাতহ-এর ২৫ আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওরাই তো অবিশ্বাস করেছিল ও তোমাদের নিবৃত্ত করেছিল মসজিদ-উল-হারামে যেতে ও বাধা দিয়েছিল কোরবানির পশুদের কোরবানির জায়গায় পৌঁছতে। (আল্লাহ মক্কায় জোর করে ঢোকার নির্দেশ দিতেন) যদি (ওদের) মধ্যে বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী না থাকত, যাদের কথা তোমরা জানো না, যাদের পদদলিত করলে সেই অজানা অপরাধের জন্য তোমাদের দোষারোপ করা হতো। (কিন্তু তিনি এই স্থির করলেন) যাতে যাকে ইচ্ছা তিনি নিজ অনুগ্রহ দান করতে পারেন। যদি ওরা পৃথক থাকত, আমি অবিশ্বাসীদের মারাত্মক শাস্তি দিতাম।'

**হুদুদ** হাদ্দ এই শব্দের বহুবচন। আল্লাহর বেঁধে দেওয়া সীমারেখাগুলো বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ অপরাধ, যেমন চুরি ও ব্যভিচার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বিধান দেওয়া হয়েছে

(৫: ৪১; ১৭: ৩২; ২৪: ২-৫)। হাদ্দ কঠোরভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে যেন মানুষ পাপের শাস্তিটা সামান্য চোখে না দেখে এবং অপরাধ না করে। বিচারে নিশ্চিত হতে হবে যে অপরাধ করা হয়েছে। এক চুল সন্দেহ থাকলে হাদ্দে ফেলা যাবে না। নবী (সা.) বলেছেন, 'যত দূর সম্ভব মুসলমানদের হাদ্দ থেকে দূরে রাখো। সামান্যতম সন্দেহ থাকলে ছেড়ে দাও তাদের, কারণ বিচারে ভুল হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে বিচারকের পক্ষে ক্ষমা করা সহজ (তিরমিজি, মিশকাত, কিতাবুল হুদুদ)।'

**হুনাইনের যুদ্ধ** মক্কা থেকে তায়েফের পথে এই মরূদ্যানে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে ইয়াজিদ ও হারিফ সম্প্রদায়ের যুদ্ধ। এই সেই প্রথম যুদ্ধ, যেখানে খালেদ মুসলমান সৈন্যদের পক্ষে যুদ্ধ করেন। পবিত্র কোরআনের ৯ সুরা তওবা-র ২৫-২৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তোমাদের তো বহু ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন। আর হুনাইনের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যার আধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি, আর পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য ছোট হয়ে গিয়েছিল ও তোমরা পেছন ফিরে পালিয়ে গিয়েছিলে। তারপর আল্লাহ তাঁর কাছ থেকে তাঁর রাসুল ও বিশ্বাসীদের প্রশান্তি দেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর অবিশ্বাসীদের তিনি শাস্তি দিলেন। এটাই অবিশ্বাসীদের কর্মফল। এর পরও যাকে ইচ্ছা আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন, আল্লাহ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'

**হুসেন (রা.)** হজরত আলী ও ফাতিমা (রা.)-এর পুত্র। তিনি ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে (চতুর্থ হিজরি ৫ শাবান) জন্মগ্রহণ করেন।

**হেকটর** গ্রিক পুরাণ-কথিত প্রিয়াম ও হেকুবার পুত্র। ট্রোজানদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি অ্যাকিলিসের হাতে নিহত হন। অ্যাকিলিস তাঁর লাশ ট্রয় নগরের দেয়াল বরাবর তিনবার টেনে নিয়ে যান।

**হেকেট** গ্রিক কিংবদন্তি অনুযায়ী হেকেট হলেন একজন পরাক্রমশালী দেবী। একই অঙ্গে তাঁর তিন রূপ। তিনি উর্বরতা ও সমৃদ্ধির দেবী, চন্দ্রদেবী এবং রাত, ভূত ও ছায়ার রানি।

**হেরা** অলিম্পীয় দেবীদের রানি হলেন হেরা। তিনি গ্রিক কিংবদন্তির দেবতা জিউস ও রেয়ার জ্যেষ্ঠতম কন্যা। হেরার আরাধনা করা হয় প্রধানত বিয়ে ও জন্মের দেবী হিসেবে। ময়ূর ও গরু তাঁর পবিত্র প্রাণী। তাঁর রোমক সমকক্ষ হচ্ছেন জুপিটারের স্ত্রী ও দেবতাদের রানি জুনো।

**হেরা গুহা** হেরা নামক গিরি গুহাতে হজরত মোহাম্মদ (সা.) নবুয়তপ্রাপ্ত হন। সেখানেই জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর প্রত্যাদেশ লাভ করেন। এটি মক্কা নগরির উত্তর-পূর্বে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। নবুয়ত লাভের আগে এই নির্জন গুহায় মোহাম্মদ (সা.) ধ্যানমগ্ন হতেন। যেদিন তাঁর বয়স ৪০ বছর পূর্ণ হয়, সেদিন এখানেই ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) তাঁর কাছে আল্লাহর ঐশী বাণী নিয়ে আসেন, যার প্রথম উচ্চারণ ছিল, 'পাঠ করো'। স্বর্গীয় বাণীর আবির্ভাবের জন্য এই গুহাকে 'জাবলুন নুর' বা 'জ্যোতির গিরি'ও বলা হয়।

**হেরেম** আরবি শব্দটির অর্থ নিষিদ্ধ। প্রচলিত অর্থে প্রাসাদের যে অংশে পরপুরুষের যাতায়াত নিষিদ্ধ। বাগদাদ, দিল্লি প্রভৃতি মুসলিম রাজপ্রাসাদের অনুকরণে আধুনিক সামন্ত যুগ পর্যন্ত অভিজাত মুসলমানদের বাড়িতে হেরেম নামে বিলাসী কামরা দেখা যেত।

# সহায়ক গ্রন্থ

A. L. Basham, *The Origins and Development of Classical Hinduism*, Beacon Press, Boston, USA, 1989.

Benjamin Walker, *The Making of World Faith*, Rupa & Co., Delhi, India, 2004.

Christopher Cook (ed.), *Pears Cyclopaedia*, Pelham Books Ltd., London, UK, 1984.

John L. Esposito, *The Oxford Encyclopaedia of The Modern Islamic World*, Oxford University Press, New York, USA, 1995.

Joseph M. Kitagawa, *The Religious Traditions of Asia*, Macmillan, New York, USA, 1989.

Keith Crim (ed.), *The Perennial Dictionary of World Religions*, Harper & Row, San Francisco, USA, 1981.

Narada MahaThera, *The Buddha and His Teachings*, Singapore Buddhist Meditation Centre, Singapore, 1973.

Roshen Dalal, *The Penguin Dictionary of Religion in India*, Penguin Books, London, UK, 2006.

Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam*, Rupa & Co., Delhi, India, 1999.

Troy Wilson Organ, *Hinduism : Its Historical Development*, Barron's Educational Series, INC, New York, USA, 1974.

————————, *Britanica Ready Reference Encyclopaedia*, vol. I-X, Encyclopaedia Britanica (India), Pvt. Ltd., Delhi, India, 2005.

————————, *The Wordsworth Encyclopaedia of World Religions*, Wordsworth, London, UK, 1999.

————————, *A Dictionary for Believers and Nonbelievers*, Progress Publishers, Moscow, Russia, 1985.

আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম ও ২য় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২।

আজিজুল হক (অনূদিত), *সহীহ বোখারী শরীফ*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮২।

আবদুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮।

আবদুল হাকিম, খান বাহাদুর (সম্পাদিত), *বাংলা বিশ্বকোষ*, ১ম-৪র্থ খণ্ড, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৬।

আবদুল্লাহ আল-মুতী, আহমদ রফিক, মনসুর মুসা, হায়াৎ মামুদ ও হাশেম খান (সম্পাদিত), *শিশুবিশ্বকোষ*, ১ম-৫ম খণ্ড, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৫-ডিসেম্বর ১৯৯৭।

আবুল ফজল, *কুরআনের বাণী*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১।

————————, *হাদিসের বাণী*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১।

আমিনুল ইসলাম, ড., *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০৬।

আশুতোষ দেব (সংকলিত), *নূতন বাঙ্গালা অভিধান*, দেব সাহিত্য কুটীর প্রা. লি., কলকাতা, ২০১১।

এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭৬।

ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা*, ১ম ও ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

কাজী আবদুল ওদুদ (অনূদিত), *পবিত্র কোরআন*, ভারতী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৬৬।

ক্ষিতিমোহন সেন, *কবীর,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯১১।

————————, *হিন্দুধর্ম,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ২০০৮।

————————, *ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা,* দিব্যপ্রকাশ, ২০০৮।

চৌধুরী শামসুর রহমান, *সুফিদর্শন,* দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০২।

জহিরুল ইসলাম, *মুসলমানকোষ,* পূর্বা, কলকাতা, ২০১৩।

ডি. মায়াল এডোয়ার্ডস, *ধর্মদর্শন,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৭৭।

দীনেশচন্দ্র সেন, *রামায়ণী কথা,* নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৮।

নীরুকুমার চাকমা, *বুদ্ধ : ধর্ম ও দর্শন,* অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৭।

প্রজ্ঞানন্দ স্থবির (অনূদিত), *মহাবর্গ,* যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৩৭।

ফরহাদ খান, *প্রতীচ্য পুরাণ,* প্রতীক, ঢাকা, ২০১০।

বিপ্রদাস বড়ুয়া, *বৌদ্ধবাদ, স্মৃতিদর্পণ, লোকনীতি,* বান্দরবান এড অ্যান্ড প্রিন্টার্স, চট্টগ্রাম, ২০১৩।

মইনুল হাসান, *মুসলমান সমাজে সংস্কার আন্দোলন,* মৃত্তিকা, কলকাতা, ২০০৪।

মিলন দত্ত (সংকলিত), চলিত ইসলামি শব্দকোষ, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৮।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর, *ইসলাম প্রসঙ্গ,* মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১১।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও ড. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *আইন শব্দকোষ,* অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (অনূদিত), *কোরানশরিফ : সরল বঙ্গানুবাদ,* মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০।

————————, (সংকলিত), *কোরানসূত্র,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

যোগনাথ মুখোপাধ্যায় (সংকলিত), *ইতিহাস অভিধান (ভারত),* এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, ২০১১।

রাজকৃষ্ণ রায় ও শরচ্চন্দ্র দেব (সংকলিত), *ভারতকোষ,* ১ম-৫ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৭৩।

রাজশেখর বসু (অনূদিত), *বাল্মীকি রামায়ণ,* নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৮।

————————, (অনূদিত), *মহাভারত,* নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৯।

————————, (অনূদিত), *শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা,* এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৩৬৮।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন, *ইসলাম ধর্মের রূপরেখা,* চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০০০।

শানজিদ অর্ণব, *ধর্মকোষ,* দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২।

শ্রীমদ ভক্তিচারু স্বামী (অনূদিত), *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যথাযথ,* ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০০৪।

সা'দউল্লাহ, *ইসলামে ধর্মীয়-রাজনৈতিক গোষ্ঠী,* অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৬।

————————, *ইসলামে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসব,* অনন্যা, ঢাকা, ২০০০।

————————, *ইসলামে শরিয়া আইন,* অনন্যা, ঢাকা, ২০০১।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া,* ১ম-১১শ খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩।

সুধীরচন্দ্র সরকার (সম্পাদিত), *পৌরাণিক অভিধান,* এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৪০৮।

সুবলচন্দ্র মিত্র (সংকলিত), *সরল বাঙ্গালা অভিধান,* নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রা. লি., কলকাতা, ২০০৯।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত, *ভারতবর্ষ ও ইসলাম,* ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৯৮।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অনূদিত), *মনুসংহিতা,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯১১।

সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত) *জেন্ডার বিশ্বকোষ,* ১ম ও ২য় খণ্ড, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *বৌদ্ধধর্ম,* নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১।

হাসান শফি, *ইসলাম ও মৌলবাদ,* শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭।

**ওয়েবসাইট**

www.google.com